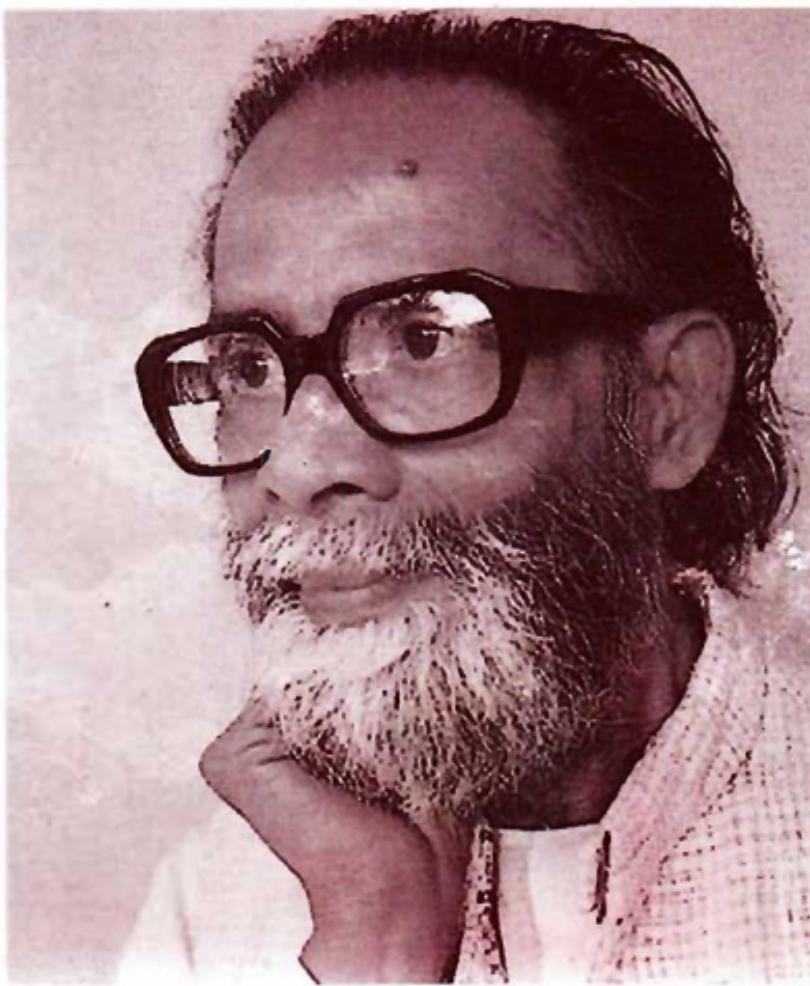


শ্রীকৃষ্ণমান
ত্রিপর্যাস
সংস্কৃত



বণী আদম
জননী
ক্রীতদাসের হাসি
চৌরসঞ্চি





শওকত ওসমান এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা: শেখ মোহম্মদ এহিয়া, মাতা: গুল আর্জান বেগম। জনু ২ জানুয়ারি ১৯১৭, পশ্চিম বঙ্গের হৃগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে। পাড়ার নাম মেহেদি-মহল্লা।

গ্রামের মাদ্রাসার লেখা-পড়া শেষে ১৯২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাস-এ-আলিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস করেন। এখান থেকেই বি.এ পাস ১৯৩৯ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বাংলায় এম. এ. ১৯৪১ সালে।

ছাত্র জীবনেই বিয়ে করেন হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনকে ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।

১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দেশ- বিভাগের পর অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করে অপশান দিয়ে চট্টগ্রাম গভর্নেন্ট কমার্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে দুই বাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায় তাঁর পুরো পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তখন থেকে চট্টগ্রামে ৩৪বি চন্দনপুরায় বসবাস করেছেন। ১৯৫৮ ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং পূর্বে মোমেনবাগে কেনা জায়গায় বাড়ি করেন এবং আমৃত্যু ৭এ মোমেনবাগে কাটিয়ে গেছেন।

১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কাটান কলকাতায়।

১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করেন, লেখায় পূরো সময় দেবেন বলে।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভীষণ মনোকষ্টে ভোগেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালে।

ভ্রমণ করেছেন নানা দেশ : পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক ও ইরান।

১৯৯৮-এ ২৯-এ মার্চ হঠাৎ সেরিব্রাল এ্যাটাকে আক্রান্ত হন। ১৪ই মে সকাল ৭-৪০ মিনিটে সশ্রিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। প্রথম কিছু দিন লেখেন কবিতা। পরে আসেন গদ্য। নিরন্তর লিখে গেছেন, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনৈতিক লেখা, শিশুতোষ রচনা, এমন কি কাব্য রচনাও করেছেন ব্যাঙ আকারে। অনুবাদও করেছেন প্রচুর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অঙ্গুষ্ঠভাবে লিখে গেছেন। বাংলা একাডেমী, স্বাধীনতা ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন দেশের সব পুরস্কার ও পদক। তাঁর 'জননী', 'ক্রীতাদাসের হাসি', 'রাজসাক্ষী' ও জলাংগীসহ বেশ কিছু ছোটগল্পের সংকলন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

তাঁর পরিবারের সব সদস্যই শিল্পী। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুলবন ওসমান সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরুকলা ইন্সটিউটের শিল্পকলার ইতিহাসের প্রফেসর। মধ্যম পুত্র আসফাক ওসমান মৃৎশিল্প-শিল্পী। তৃতীয় সন্তান ইয়াফেস্ ওসমান স্থপতি। কনিষ্ঠ পুত্র জানেসার ওসমান চলচ্চিত্র নির্মাতা।

ISBN 984-458-228-8





আমাদের প্রকাশিত এই মেখকের বই-

উপন্যাস

অনন্তী

ক্ষীতদাসের হাসি

হস্তারক

মুক্তিশূর/আত্মবন্ধু

কালরাত্রি খণ্ডিত্র

রাহনামা ১ ও ২

উত্তরপর্ব মুজিবনগর

স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর

সময়

উপন্যাসসমগ্র ১-৩

গল্পসমগ্র

কিশোরসমগ্র ১-২

শঙ্ক ওমান

উদ্দিয়াম

মমগ্র

১

সময় প্রকাশন

উপন্যাসসমগ্র ১

শওকত ওসমান

চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১০

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০০১

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০০



সময়

সময় ২২৮

প্রকাশক

ফরিদ আহমেদ

সময় প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচন্দ ও অলংকরণ

কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ

ওয়াটার ফ্লাওয়ার

২৮/এ কাকরাইল, ঢাকা

মুদ্রণ

সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

UPANASSAMAGARA-I by Shawkat Osman. First Published : April 2000, 2nd Print : September 2010 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan. 38/2ka Banglabazar, Dhaka.

Web : www.somoy.com

E-mail : f.alimmed@somoy.com

Price : Tk. 500.00 Only

ISBN 984-458-228-8

Code : 228

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্রাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫



সূচি পত্র

বণী আদম ১৫

জননী ১১৯

ক্রীতদাসের হাসি ৩১৭

চৌরসকি ৩৮৭

শওকত ওসমান : সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৫৯

ভূমিকা

বাবার উপন্যাসসমগ্র প্রকাশের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে আসে ‘সময় প্রকাশ’। ইতোমধ্যে এই প্রকাশনী ‘মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র’ শিরোনামে পাটটি উপন্যাসের সংকলন বিগত বইমেলা ২০০০-এ প্রকাশ করেছে। শোভন ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে। উক্ত সংকলনের প্রকাশিত চারটি উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের পরের রচনা। একটি রচনা মুক্তিযুদ্ধের পরের হলেও বিষয়টি ২১-এ ফেব্রুয়ারিয়ার ভাষা আন্দোলন নিয়ে। সংকলনে এটি এই যুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা গেছে যে ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। যার ক্রম ধরে আসে শাহীনতা যুদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশ হিসেবে প্রকাশ পায়।

এবারের উপন্যাস সংকলনটি সমগ্র উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। এতে থাকছে মোট চারটি উপন্যাস। বৃণী আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি ও চৌরসকি।

বৃণী আদম উপন্যাসটি লেখকের প্রথম রচনা।

বইটি মুদ্রণের আগে লেখক লিখছেন “প্রয়ত্নাব্রিশ বছর পূর্বে—প্রায় দুই প্রজন্মের কাল— এই উপন্যাসের কিয়দংশ বেরিয়েছিল অবিভক্ত বন্দে “আজাদ” পত্রিকার ইদ-সংখ্যায়। তারপর নানা কারণে “বৃণী আদম” আর পুনৰ্কাকারে বের হয়নি। পাশ্চালিপি পাওয়াই দায় ছিল। সৌভাগ্যক্রমে পাশ্চালিপি আবার হাতে আসায় বইটি শেষ করতে পারলাম।...”

আরো লিখেছেন, “নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে এই উপন্যাস ভালো লাগলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। তবে এক যুগের দলীল হিসাবে বইটির কিছু মূল্য থাকবে— আমি সেই বিশ্বাস রাখি।”

এই উপন্যাস বৃহৎ বাংলার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ত্রিশের দশকের পটভূমিতে লেখা। যখন এটি রচনা করেছেন তখন লেখকের বয়স বড় জোর ছাবিশ-সাতাশ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি যথেষ্ট পরিপূর্ণ। এই বয়সে যেখানে সাধারণত: লেখকগণ রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেন, সেখানে শওকত ওসমান বেছে নিয়েছেন সমাজের সবচেয়ে নিম্নবিষ্ট এবং একটি প্রাক্তিক মানুষকে। এই মানুষটির নাম হারেস। হারেস বালক থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে গ্রামের এক ধনাত্য ব্যক্তির বাড়িতে। হারেসের জন্ম এক তাতি পরিবারে। বাবা মারা যাবার পর মা সলিম মুনশীর বাড়িতে দাসির কাজ নেয়। এবং তাঁর মৃত্যু হলে হারেস ঐ বাড়িতে ভূত্যের ভূমিকা পালন করে চলে।

দেখতে দেখতে হারেস বড় হয়। কিন্তু মানসিকভাবে খুব একটা বাঢ়ে নি, কিছুটা হাবা টাইপের। এ-ধরনের লোকদের মালিক পক্ষ খুবই পছন্দ করে। হারেসের জন্মে শত্রু খাওয়া আর

বছরে দুটো লুঙ্গি-গামছা বরাদ্দ। গুদামঘরে শোয়া একটা ছেঁড়া মাদুর ও কাঁথা। এদের মতো আদর্শ নফর আর কোথায় মিলবে। কাজের এন্ডিক-ওদিক হলে গাধার মতো পিটুনি দিলেও কোনো উচ্চ-বাচ্য নেই... সব দিক দিয়ে সুবিধে এমন লোক হলে।

এই হারেস একদিন অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটিয়ে বসে। এই যন্ত্র-মানবটি একদিন সলিম মুনশীকে বলে বসে, “পনর বছর আপনার গোলাম— তার কি কোনো দাম নেই, বেতন নেই?”

লেখক তারপর লিখছেন, “এমন উচ্চারণ মনিবের কানে অবিশ্বাস্য। জন্মহাবা কি করে এমন উচ্চারণ করতে পারে?”

যতই হাবা হোক হারেস জানে এই উচ্চারণের ফলাফল কি হবে, তাই “তার নিজের ঘরে এসে খাচায় বন্দী পাখিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেও রাত্রির অঙ্ককারে গায়ের হয়ে গিয়েছিল।”

তারপর শাভাবিকভাবেই তার জায়গা হয় শহরের বস্তিৎ। একসঙ্গে অনেকের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। গ্রামের জীবনের কথা আহরহ মনে পড়লেও সেখনে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

কাজ সে একটা সহজে পেয়ে যায় শরীরের শক্ত বাঁধনের জোরে। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হিসেবে কাজ করে চলে। অন্যান্য জোগাড়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয় আরিফের সঙ্গে। তাদের গ্রামে যাতায়াত শুরু করে। এক সময় আরিফের সহায়তায় বিয়েও করে হারেস। আরিফের ঘরের লাগোয়া বসবাস শুরু করে।

একদিন বন্যা ঠেকান বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় তাদের সমষ্টি বাড়ি ঘরদোর বানে ভেসে যায়।

অনেকে কষ্টে আবার জীবন গড়ে তোলে আরিফের জোর হারেস।

এই সময় আরো এক বিপদ এসে পড়ে তাদের ওপর, মহাঞ্চা গাঙ্কীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন তখন তুঙ্গে। গ্রামেও পুলিশী অত্যাচার চলতে থাকে।

লেখক লিখছেন “১৯৩১ সাল। বৃহস্পি-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে সারা দেশে।...”

হারেস আরিফদের সামগড় গ্রামেও পুলিশ হানা দেয়।

একটি সমাজের বৃহস্পির গণ-আন্দোলন ব্যক্তিগত যে সংকটের সৃষ্টি করে লেখক সেদিকটিও সামগড়ের এক বিধবা বৃদ্ধা মারফত তুলে ধরেছেন। বৃদ্ধার ছেলে নবীন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গ্রাম ছেড়ে গেছে, তাই বৃদ্ধা চিন্তকার করে শাপান্ত করছে... “ঐ তে পোড়ার-মুখো গাঙ্কী আমার ছেলেটাকে শুধু নিয়ে গেল,... আরে ব্যাটাখেকোর দল গরীবের ওতে কি হবে?”

লেখক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,

“অখ্যাত পক্ষীর বৃদ্ধা।

জগতের কোন খবর রাখে না। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের উপর ভিত্তি করে সে পৃথিবীকে রচনা করে।”

এই সামগড়ে এসে হারেস পাড়ার কাউকে পায় না। পুরো গাঁ খালি। পুলিশের অত্যাচারে সবাই পালিয়ে গেছে।

হারেস যখন পলাতক পরিবারের সদস্যদের ঝোঁজ করছে তখন কখনো কখনো তার নিজের পুরাতন জীবনের কথা ভাবে। এই ভাবনার এক ফাঁকে পাঠক জানতে পারে যে হারেস শুধু সলিম মুনশীকে মাইনের কথাই বলেনি, হাত মুচড়েও ধরেছিল এবং একটা লাখিও মেরেছিল পেছনে... ফলে তাকে গ্রাম ছাড়তে হয় আঘাতকার জন্যে।

সামগড় থেকে বেশ দূরে নদীর ওপারে গঞ্জে বাঁধের ওপর লোকজন আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে হারেস স্ট্রী সোহাগ ও তিন বছরের পুত্র কিবরিয়াকে পায়। সাথে বঙ্গু আরিফ ও তার পরিবারকেও।

দুই বঙ্গু তর্ক করে শহরে যাবে না গ্রামে। হারেস গ্রামের পথ ধরে। আরিফ বলে, “শেষে আমাদের সবাইকে শহরেই যেতে হবে রাজাসাবের তালাসে। দেখো আমার কথা ফলে কিনা।”
সবাই গ্রামের পথ ধরে। কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি।

জননী এর পরের রচনা। এটিও বিভাগ-পূর্ব বাংলার পটভূমিতে লেখা।

বই হয়ে বেরোয় অনেক পরে। সম্ভবত : ১৯৫৮ সালে।

কাহিনী শুরু হচ্ছে এভাবে :

আলী আজহার খী মহেশডাঙ্গার মামুলী চাষী।

এক কথায় লেখক সরাসরি চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

আজহার খী মামুলী চাষী হলেও তার বংশধররা ছিল খানদানি খী পরিবার। এই পরিবারের চতুর্থ পূর্বপুরুষ আলী মজহার খী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারত হতে এসেছিল। এই ভদ্রলোক পার্শি ভাষায় ছিল পারদর্শী।

উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টি এই পূর্ব-পুরুষদের ত্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের চিত্র দিয়ে শুরু। এই সময় ওহাবি আন্দোলন চলছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।

লেখক লিখেছেন,

“এদেশে তখন ইংরেজের প্রতাপ ও আক্রমণ নানাদিকে প্রচলিত হইতেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সুদূর কাবুল হইতে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ওহাবি আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সময়কার কাহিনী।”

এই গ্রামে ত্রিটিশ বাহিনীর ক্যান্টনেমেন্টের সঙ্গে মজহার খীর বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং ওহাবি যোদ্ধাগণ শাহাদত বরণ করেন।

উপন্যাসের এই প্রথম অধ্যায়টি আজহার খীর বংশ ও মানসিকতা বোঝার জন্যে সাহায্য করে। কিন্তু আসল কাহিনী শুরু হয় এই উপক্রমণিকাটি পার হয়ে।

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা পাছি চাষী বউ দরিয়াবিবিকে। লেখক তার রান্নাঘরের বর্ণনা দিয়ে কাহিনী এগিয়ে নিয়েছেন। এই পৃষ্ঠাতেই আমরা পাছি তার কিশোর সন্তান আমজাদকে যে মার পাশে বসে আছে। সারা কাহিনী জুড়ে ঘার অবস্থান এবং তার চোখে লেখক অনেক কিছুই দেখান।

জননী উপন্যাসও বাংলার গ্রিশের দশকের উপাখ্যান। এর মধ্যে আমরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা কীভাবে গ্রামে সংঘটিত হয় এবং কীভাবে খনী হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের ব্যক্তিগত ও গ্রেণিঞ্চার্থ রক্ষার্থে গরীবদের মধ্যে দাঙ্গা লাগায় তা দিনের মত পরিকার করেছেন লেখক।

এই উপন্যাসেও আমরা পাছি বাংলার সেই প্রাচীক মানুষ আজহার ও দরিয়াবিবিকে। এ-ছাড়া তাদের সঙ্গে যাদের ওঠা-বসা সেই চন্দ্রকোটাল, সাকের, আমীরণ এরা সবাই প্রাচীক মানুষ।

জননী উপন্যাসে অনেকে বিভূতিভূষণের পথের পঁচালির ছায়া দেখতে পেয়েছেন— যেমন হারিহর-সর্বজয়ার সমান্তরাল আজহার-দরিয়া, অপুর সমান্তরাল আমজাদ, আসেকজান যেন অপুর পিসির প্রতিচ্ছবি।

এখানে একটা কথা মানতেই হবে যে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবন ধারায় মাঝেও তরে প্রচুর পার্থক্য আছে।

তা-ছাড়া ১৮৬০ সালে ভারতবর্ষে প্রথম যে আদমশুমারি হয় তাতে দেখা যায় বাংলায় মুসলমানের অনুপাত হিন্দুদের তুলনায় বেশি। তখন এটা ছিল ৪৫% ও ৫৫% যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম। সুতরাং এটা কীকার করতেই হবে যে জননী উপন্যাসে সেই বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য যে-জীবন-চিত্র থেকে বাস্তিত ছিল।

পথের পাঁচালিতে অগৃহ হল নায়ক, জননীতে দরিয়াবিবি প্রধান চরিত্র। পথের পাঁচালিতে হরিহর-সর্বজায়া অপুকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জননীতে আজহার-দরিয়া দু'জনই মৃত্যুবরণ করছে। দরিয়াবিবি আস্থাহত্যা করে এবং কাহিনীরও সেই সঙ্গে সমাপ্তি।

জননী উপন্যাসে অনবদ্য চরিত্র হল চন্দ্র কোটাল। এই লোকটি যাত্রা দলে গান-অভিনয়-ভাঙ্ডের ভূমিকায় নামত।

তার কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোনো পার্থক্য ছিল না। ভাগ্যহত হলেও জীবনকে সব সময় হেসে খেলে গ্রহণ করে।

তাড়ি খেয়ে, গান গেয়ে জীবনকে সব সময় তৃঢ়ি মেরে বিশাদ কাটিয়ে হাস্যরসে ভরে রাখে। মুখে অনেক পালা-গানের কলি লেগেই আছে। তার মধ্যে একটি হল:

তগবান তোমার মাথায় বাঁটা,
ও তোমার মাথায় বাঁটা
যে চেয়েছে, তোমার দিকে
তারই চোখে লজ্জা-বাটা।
ও ছড়িয়ে দিলে, ছড়িয়ে দিলে
মারলে ভারে তিলে তিলে
ও আমার বৃথাঞ্জিসল কাটা।
ও তোমার মাথায় বাঁটা।

এই চন্দ্র কোটাল আজহার বী-র পরিবারের একজন অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী। বালক আমজাদ এই কাকাকে খুব ভালবাসে। আজহার বী রাজমিস্ত্রির কাজে ঘরের বাইরে গেলে তার বর্ণার জমি রক্ষা করে এই চন্দ্র কোটাল। নানা রকম খাবার দিয়ে সাহায্য করে।

দরিয়াবিবি চরিত্রটি এক আস্থা-সম্মান বোধ সম্পন্ন মহিলার চরিত্র। হাজার দারিদ্রের মধ্যেও যে নিজেকে অনের সাহায্যের হাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে চলে, কিন্তু আজহার বী-র মৃত্যুর পর, আজহারের দূর সম্পর্কের ব্যবসায়ী ফুপাতভাই এর লোভ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। এবং যার ঔরসের সন্তানকে জন্মাদারের পর গলায় দড়ি দিয়ে আস্থাহত্যা করে।

দরিয়াবিবির মৃত্যুর পর তার পূর্ব-স্থায়ীর ঘরের সন্তান মোনাদির, আমজাদ ও চন্দ্রকোটাল জীবিকার জন্যে শহরে যাবে হ্রিয় করে। কাহিনীর শেষাংশে আমরা দেখি, “দরিয়াবিবির কবরের পাশে তিনটি ছায়া মৃত্তি দণ্ডায়মান ইহাদের চেনা যায়। মোনাদির, আমজাদ ও কোটাল।

মোনাদির হঠাৎ ঢুকরাইয়া উঠিল।

কোটাল আগাইয়া আসিয়া বলিল, “চাচা বেটাছেলে, মার জন্যে কি এত কাঁদে?” ... অশ্রু কুকু কঠে সে নিজেও বলিয়া ফেলিল, “দরিয়াবিবি, সেলাম... সেলাম...”

এই দুটি উপন্যাসে পঞ্চমবঙ্গের হগলী-হাওড়ার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় বর্তমান বাংলাদেশের পাঠকদের কিছু অসুবিধা হতে পারে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর লেখক পঞ্চমবঙ্গ ছেড়ে চলে আসেন পূর্ববঙ্গে। ফলে গ্রাম-জীবনের সঙ্গে তাঁর যে-বিজ্ঞেন ঘটে সেটা আর জোড়া লাগে নি। ফলে বাংলাদেশের গ্রাম ভিত্তিক কোনো উপন্যাস আর তাঁর হাত থেকে বেরোয় নি। তাঁর রচিত অনেক ছোটগাল্পে পূর্ববঙ্গের জীবন বাস্তববাদি ভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তববাদি কোনো উপন্যাস আর আমরা পাই নি।

পাকিস্তান পর্বের সামরিক শাসনের ফলে সরাসরি অনেক কথা বলা যাবে না বলে শাওকত ওসমানে রূপকর্ধী উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর মধ্যে ক্রীতদাসের হাসি অন্যতম। তৃতৃ রূপকর্ধী উপন্যাসগুলোর মধ্যে নয় অনেকে এটি লেখকের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করেন।

এই উপন্যাসটি ১৯৬২ সনের রচনা।

প্রথমে এই উপন্যাসটির উপক্রমণিকাটি ছিল প্রায় উনত্রিশ পৃষ্ঠা। পরে এটিকে লেখকের সর্ব পৃষ্ঠার নিয়ে আসেন।

কিন্তু এই ব্যাপরটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে একটি গল্প ফেঁদেছেন যে এক বাঙালীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাঁর পিতামহ ফরিদউদ্দীন জোনপুরীর সহযোগিতায় একটি পাঞ্জলিপি আবিষ্কার করেন। এটা আসলে একটা হেয়ালি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু একটা ঐতিহাসিক গক্ষ ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে পূর্বাভিক লেবাস পরিয়ে দেয়া—যার ফলে সত্য-মিথ্যা জড়াজড়ি করে পাঠকের মাথায় বেড়ে ওঠে। ফলে একটা রহস্য ভেরি হয় এবং অনেকে একে সত্য ঘটনা বলেও মনে করবেন। আর সত্য বলতে কি বাস্তব ওপর একটি স্মারক-গ্রন্থ তৈরি করতে গিয়ে এ-রকম একটি প্রবন্ধও পেয়েছিলাম। যাতে মূল বক্তব্য হল শাওকত ওসমান এ-যুগে একটা বিরাট আবিষ্কার করেছেন— অর্থাৎ পাঞ্জলিপি— এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লেখাটি না পড়েই কম্পেজ করতে দিয়েছিলাম। পরে ক্রফ সংশোধনী করতে গিয়ে আমার আকেল গুড়ুম।

লেখাটি কোথায় যে রাখলাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এ-থেকে একটা কথা প্রমাণ হয় যে শাওকত ওসমান মানুষের কাছ থেকে তাঁর এই রচনার সত্যতার স্বীকৃতি আদায় করে ছেড়েছেন।

আমরা জানি আরব্য উপন্যাস হল এক হাজার এক রজনীর গল্প। কিন্তু ফরিদউদ্দীন জোনপুরী জানান আসলে তাঁর কাছে যে পাঞ্জলিপিটি আছে তাতে জানা যাচ্ছে গল্প আরো একটি আছে।

এই উপক্রমণিকাটি প্রথম পুরুষে লেখা।

“এই আবিষ্কার আমাকে পাগল করে তুলেছিল।...

শহরে ফিরেই মৌলানা জালালের সহায়তায় ‘আলেক লায়লা ওয়া লায়লানে’র শেষ কাহিনীটা বাংলায় তরজমা করে ফেললাম।

বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকদের মমতার জন্যেই ত পৃথিবীতে বাঁচা।”

সাহিত্যিক শাওকত ওসমান সব সময় বিনয়ের সঙ্গে বলতেন যে বাংলা ভাষার তিনি একজন নগন্য সেবকমাত্র।

উপক্রমণিকা শেষেই আমরা পাছিই একটি পৃষ্ঠা— পুরো পৃষ্ঠার মধ্য ভাগে লেখা:

যদিও আমরা উপক্রমণিকাতে পাছি, মৌলানা জালাল পাণ্ডুলিপি যেটে জবাব দিলেন, “জাহাকুল আব্দ অর্থাৎ গোলামের হাসি।”

লেখক কেন গোলামের হাসি উপন্যাসের নাম দিলেন না, এই প্রশ্নটি কারো কারো মনে উদয় হতে পারে।

সংক্ষিপ্ত: গোলাম শব্দের মধ্যে তেমন জোর পান নি। ক্রীতদাস শব্দের মধ্যে একটা ব্যঙ্গনা আছে। গোলাম একটি তৃচ্ছ-তাছিলাকর শব্দ, এদিক থেকে ক্রীতদাস শব্দের মধ্যে একটা আভিজ্ঞাত্য আছে। ক্ষমতাটা না হলেও শব্দের গান্ধীর্ঘতার দিক থেকে। আর আমরা এই উপন্যাসের ক্রীতদাস তাতারীকে তেমনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবেই পাই।

এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে যে দ্রুতি তা হল একদিকে খলিফা হারুনের রশীদের মনের অশান্তি, অন্যদিকে ক্রীতদাস তাতারী ও তার প্রেমিকা ক্রীতদাসী মেহেরজানের প্রাণ খোলা হাসি। একদিক বিশাল সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য, আর একদিকে বিস্তুরী, পদবীন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। খুবই অসম দ্বন্দ্ব, কিন্তু সৃষ্টি মানুষ আসলে যে একই জায়গায় অবস্থান করে সেটাই আমাদের মনে করিয়ে দেন লেখক। যেমন বাংলার আর এক কবি বলেন, সবার উপরে মানুষ-সত্য....

ক্রীতদাসের হাসিকে উপন্যাস না নাটক বলা হচ্ছে-এ-নিয়ে একটা তর্ক হতে পারে। উপক্রমণিকাটুকু বাদ দিলে এটি দৃশ্য-কাব্যে বিভক্ত পুরো নাট্য গুণে ভরপূর। ক্রাইস্ট-ক্রমশ: এগিয়ে চলেছে এবং একটা চূড়ান্ত পরিপতির দিকে এগিয়ে গেছে। খলিফা হারুনের রশীদ ধন-দৌলত পদ-মর্যাদা সব দিয়েও তাতারীকে হাসিতে পারে নি, প্রেমিকের হৃদয় ভরা ভালবাসার বন্যামাথা হাসি।

অভিসারে বেরিয়ে ক্রীতদাসী মেহেরজান গোলামখানায় প্রবেশ করে— তারা হাসা-হাসিতে লিঙ্গ হয় তা কানে যায় খলিফার। খলিফা তখন তার বুদ্ধিমান জগ্নাদ মশকুরের সঙ্গে নৈশ বিহারে। খলিফা বলে, কারা হাসছে?

মশকুর, গোলামের হাসি জাঁহাপনা?

হারুন, গোলামের এমন হাসি হাসতে পারে?

মশকুর, পারে, আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বইন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আস্থাদ পায়। ওরা হাসে।

হারুন, ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।...

তারপর এক সময় বলে, ...আমি এমনই হাসি হাসতে চাই....

হাসির নেপথ্যের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় উন্মোচিত হয়। মেহেরজান ও তাতারীর প্রেমের ব্যাপারটা খলিফা জানতে পারে এবং তাতারিকে গোলামের জীবন থেকে মুক্তি দেয়। দেয় প্রচুর দাসী, দৌলত, শর্ত একটাই খলিফাকে হাসি শোনাতে হবে। সব কিছু পেয়েও তাতারী তার হাসি তুলে গেল।

খলিফার জিদ তাকে হাসতেই হবে। তাতারীরও জিদ সে হাসবে না।

খলিফা বাগদাদের দুই বিখ্যাত কবি আতাহিয়া ও নওয়াসকে দাওয়াত দিয়েছে তাতারীর হাসি শোনাবে বলে।

হারুন, হ্যা, তাতারী তোমার হাসি শুনিয়ে দাও...
তাতারী, হাসতে পারছি না, আমিরুল মুমেনীন।

বারবার নির্দেশ দেবার পরও গোলাম রাজী না হলে হারুন কিংবা হয়ে জগ্নাদকে তাতারীর গদ্দান নিতে বলে। তখন কবি আতাহিয়া বলে, ...সব সময় হাসি আসে না। কবি নওয়াস বলে, অমি ত আপনাকে, নুরগ্লাহ আগেই বলেছি, উপাদান লাগে।

অর্থাৎ হাসির উপাদান।

এরপর হারুন তাতারীকে সময় দেয় অন্য সময় হাসার।

কিন্তু তার পরদিন থেকে তাতারী নিজের মধ্যে আরো গুটিয়ে যায়।

খলিফা বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তকীকে পাঠাল তাতারীর মনোরঞ্জনের জন্যে, কিন্তু তাতেও কিছু হল না, বরং নর্তকী বুসায়না তাতারীর সৎ-আত্মার সংস্পর্শে এসে আস্থাত্যা করল।

শেষে হারুনর রশীদ তাতারীর প্রেমিকা মেহেরজানকে নিয়ে যায় কয়েদখানায়, তবুও তাতারী নিরক্ষত। হাসি ত দূরের কথা কোন কথাই বলে না সে। মেহেরজানকে যখন প্রহরীরা কয়েদখানা থেকে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাতারী— মেহেরজান, মেহেরজান বলে ডাক দেয়, তারপর বলে, শোন্ হারুন রশীদ— খলিফা বলে, বেতমীজ, জাহাপনা বল। তাতারী বলে, শোন্ হারুনর রশীদ, দীরহাম, দৌলত দিয়ে ঝীতদাস গোলাম কেনা চলে। বাল্পী কেনা সম্ভব!— কিন্তু— কিন্তু ঝীতদাসের হাসি— না... না... না... না... পতন ও মৃত্যু।

এই সময় বেগে কবি আবু নওয়াসের প্রবেশ, বলে, আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আত্মারই প্রতিধ্বনি।

শাধীনতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝতে লিঙ্গয় কষ্ট হবার কথা নয়। এই বার্তাটিই লেখক এই ক্লপক উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠককে জানিয়ে গেছেন।

এই উপন্যাসে আর্বি-পার্শি শব্দের মুখ্য ব্যবহার লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে ঝীতদাসের হাসি একটি অপূর্ব সংযোজন।

১৯৬২ সালে এটি আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান নিজ হাতে পুরস্কার তুলে দেন লেখকের হাতে। পরে সরকার বুঝতে পারে যে এটির মাধ্যমে আসলে সামরিক শাসকদেরই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তারা যে-রকম আর্বি-পার্শি মুক্ত বাংলা চায়, মক্কা-বাগদাদের কাহিনী শুনতে চায় তাদের মত করেই শওকত ওসমান প্রতিশোধ নিয়েছেন।

সবাই বুঝতে পারে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য... দুঃখিনী পূর্ব-বাংলার মুখে কেন হাসি নেই।

এর আট বছর পর বাংলার তাতারীরা পাকিস্তানের খলিফা ইয়াহিয়া খানকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

চৌরসঙ্গি উপন্যাসটি ১৯৬৬ সালে লেখা। তখন পাকিস্তান আমল। দুটি পাকিস্তান—পূর্ব ও পশ্চিম। কেন্দ্রে সামরিক অধিকর্তা আয়ুব পী বসে। পূর্ব-প্রান্তে মোনেম বী। দুই বী দু'জায়গায় রাজত্ব করছে। বড় ভজুর পশ্চিমে, পুরবেটি অংশে তার গোলাম, কিন্তু নিজ অঞ্চলে মালিক।

উপন্যাসটি চেরদের নিয়ে লেখা। একজন তাগড়া মূর্খ রিকসাইলা কিভাবে ফিল মালিকের ধর্মঘট ভাঙ্গার সাহায্যে এসে কালু সর্দারে পরিগত হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে যা আমাদের সমাজে অহরহ ঘটছে। কাহিনীর বিস্তারিতে বেশ জট পাকান হয়েছে। শহরে দুই চোররা দ্বন্দ্বে

পড়ে যাচ্ছে। ব্যবসায় দুই দলেরই মন্দা।

এই উপন্যাসে একটি ধারণা বা কলসেন্টকে রূপ দেয়া হয়েছে। পাঠক বুঝতে পারে উচ্চবিত্তের মূলাবোধ মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের মত নয়, এর মধ্যে আছে বিপুল পার্থক্য। কাহিনীর বড় তৎপর্য পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরালভাবে টানা যায়। একদিকে পশ্চিম আর একদিকে পূর্ব যেন দুই চোরের সঙ্গি। কাহিনীর বিষ্টার এই পর্যন্ত।

কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীতে সব সংঘাতই স্বার্থের সংঘাত। পূর্ব ও পশ্চিমের সঙ্গিটি কার্যকর হয় মাত্র পঁচিশ বছর। পরবর্তীতে আবার সংঘাত এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব-পশ্চিম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সঙ্গিটি গেল ভেঙে।

এই উপন্যাসে শওকত ওসমানের সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়ে গেছে একাত্ত্ব।

চারকুমা ইলেক্ট্রিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

বুলবন ওসমান
৩.৪.২০০০

বলী আদম



প্রকৃতি তাকে বঞ্চনা করেছিল ।

প্রকৃতি তাকে কোলে ঠাই দিয়েছিল ।

এমন পরিহাস মানুষের জন্যে আজও ধাঁধা বৈকি ।

বঞ্চনা এবং আশীর্বাদ দুই কি করে এক খোঁটে মেলে?

হারেসের জীবন আখ্যায়িকা তাই বিস্তারিত কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না । সে জন্মেছিল মুসলমান তন্ত্রবায় সম্পদায়ে । তাদের অধিকাংশই দরিদ্র । শুধু তা-ই নয়, সমাজেও তারা ব্রাক্ষণ-সমীপে শূন্দের মত, যদিও মুসলমান সমাজে জাতিভেদ অনুপস্থিত । কার্যত: ইতিহাসের রায় অন্য রকম ।

হারেসকে প্রকৃতি বঞ্চনা করেছিল । আকেলের পর্যায় যদি অতি নিম্নে থাকে গ্রামে তাদের ‘হাবা’ ‘গোবা’ ‘ঝগা’ নানারকম নামে ভূষিত করে । এমন অবস্থায় বাঁচার পরীক্ষা দিতে হয় নানা কাঠিন্যের ভেতর দিয়ে ।

প্রকৃতির আশীর্বাদও পেয়েছিল বৈকি হারেস । শরীর পেয়েছিল যেন লোহার মুণ্ডু । অনাচার, অনিয়ম সেখানে সাধারণ স্বাস্থ্য-বিধির তোয়াকা রাখে থোড়াই । ভরা-রোট, মরা-রোট যে-কোন অবস্থায় দিন চলুক, শরীর ঠিক আছে । অসুখ-বিসুখ, তা-ও খুব ছেটখাট, কোথায় দাঁত বসাতে পারে না ।

এইভাবেই হারেস বেড়ে উঠেছিল মীর প্রষ্ঠ নামক গ্রামে সলিম মুনশীর আশ্রয়ে । বিরাট জোতদার তিনি । প্রতিপন্থিশালী স্থানীয় শরীফ । বাপ হারিয়ে হারেস এসেছিল এই বাড়িতে । একা নয় । মা ছিল সঙ্গে । হারা সন্তানের প্রতি তার মমতা ছিল অপরিসীম । নিজেই পরম্পুরাপেক্ষী । তার আভিজ্ঞানসীমানা ত খুব ছোট । তবু তারই ভেতর বুঝা যেত এক রমণীর স্বেহের পরিচয় । মা বাড়ির খাদেমো বা পরিচারিকা, সন্তান ফাই-ফরমাস খাটার চাকর সেই আট বছর বয়স থেকে । সন্তানের পদোন্নতি হয় । চাষবাসের কাজেও হারেসকে লাগিয়ে দেওয়া হোত পরে । মা তা দেখে যেতে পারেনি । সামান্য অসুখেই সে পৃথিবী ত্যাগ করে । হারেস মার মনিবের বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেনি । কারণ, উপায়হীন । যাবে কোথায়? তাঁতের পেশা বাপের আগেই উঠে গিয়েছিল । পরে জমিজিরাতহীন চাষী । তাদের অনেকের নিজস্ব ভিটাও থাকে না । হারেসদেরও ছিল না । নিরাশ্য হারেস মায়ের আশ্রয়-বন্ধিত হলেও জোতদারের আশ্রয়চ্যুত হয় না । মেহনতের ব্যাপারে হারেসের কোন দ্বিক্ষণি ছিল না । প্রায় বিনা বেতনে, কিছু খোরপোষের বিনিময়ে কাজের এমন যন্ত্র পেলে, কে তা হাতছাড়া করবে? সলিম মুনশীর যে সম্পত্তির তায়দাদ এত বেশি তা হিসাবের ফল । হারেসের ক্ষেত্রে তিনি হিসেব করতেন না, এমন রায় দেওয়া কঠিন ।

আর এক দিকে হারেস প্রকৃতির আশীর্বাদ পেয়েছিল, মনে করা যেতে পারে, যদি এমন প্রাণ্তির অমন কদর কেউ দেয় । হারেস পশু-পক্ষী ভয়ানক ভালবাসত । পাখি-পোষা

ত তার বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। পোষ্য থাকলে কিছু করণীয় লাজেমী বা বাধ্যতামূলক। হারেস তা অনুভব করত নিশ্চয়। কারণ, সে একজনের পোষ্য। তবু যতই কাজ থাক তার, এক ফাঁকে নিজের পোষ্যের খবরদারী সে নেবেই। অনেক সময় দেখা গেছে সারাদিন মাঠে খাটুনীর পর সে আবার মাঠে গেছে রাতে ফড়িং ধরতে। সামান্য একটা দেশালাইয়ের কাঠি জুলালেও ফড়িং এসে জোটে। তারপর অঙ্ককারে টপাটপ শিকার। সাপের ছোবলে মরতে পারত হারেস। শুধু পাথী নয় পশুর প্রতি মমতাও ছিল প্রচণ্ড। সলিম মুনশী নিজের গাই গুরগুলো হারেসের হাতে ছেড়ে নিশ্চিত থাকতেন। বাচুর হোলে কোলে করে ধরত হারেস এবং দাইয়ের মত পরিচর্যা শুরু করত। অথচ দুধের কি স্বাদ সে জানে না। কারণ, গোয়ালা দুধ দু'য়ে মালিকদের হাতে তুলে দিত। তাদের কেউ কোনদিন এক বাটি খাওয়ার জন্যে হারেসকে অনুরোধ করেনি। একটি দুধেল গরু অস্বীকৃত মরে যায়। পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি ত মাঝাতা আমলের। বলা যায়, রোগের চিকিৎসা করা গেল না। হারেস খুব কেঁদেছিল, একদিন অনাহারে রইল। অথচ, কাজের কেতায় অনেক সময় তার হা-পা কেটে যায় বা কোন ছোটখাট জখম হয় শরীরে, হারেস আঃ উঃ শব্দও করে না। জুলা-পোড়া যেন কোন ব্যাপারই নয়। গাঁয়ের অনেকে বলত, হাবা হলে অনেক লাভ আছে। মাঠের কাজে পায়ে তিন-চারটে কাঁটা ফুটলে একদিন সেগুলোর মোকাবিলায় বসত হারেস। অপরিসীম তার সহনক্ষমতা। তা না হলে এইসব অস্বাভাবিকতার মুখোযুধি হতো কীভাবে?

গাঁয়ের কিছু লোক ওকে নিয়ে তামাশা করতে^১ সাধাসিধা মানুষ। তা-কে কোন অনুরোধ করলে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা পাবে স্ট্যান্ডামের পাশে বিশাল মাঠ। সেখানেও আরো আকর্ষণীয় একটি দিঘী আছে প্রাচীম কালের। এখন মজে গেছে। অনেকখানি দামঘাসে ভরা। মাঝখানে পদ্মফুল এখনও ফোটে। হারেস সাঁতার জানে। কিন্তু দামঘাসে বোঝাই থাকলে হাত-পা চালানো সহজ হয় না। সহজেই পেশী আর কার্যক্ষম থাকে না। ঠিক এই কাও ঘটেছিল হারেসকে নিয়ে। কিন্তু হারেস বলেই বুঝি সে ডুবে মরেনি। পদ্মফুল সে তুলেছিল ঠিকই। ফেরার পথে পায়ের পেশী আর তেমন সাহায্য করছিল না। পাড়ের কাছাকাছি এক হাঁটু জলের উপর মূর্ছাহত হারেসকে পরে অনুরোধকারীরাই তুলে এনেছিল। মুনশীর কানে গেলে তামাসার বাজিকরদের বেশ শাস্তি হতো। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ ছড়ায়নি। হারেস ত বলবে সাঁতার দিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তার বেশি অভিযোগের আর কী আছে? মানুষ অনুরোধ করবে কোন কাজের, সেই কাজ অসমাঞ্চ থাকার কথা হারেস বুঝতে অক্ষম। অবিশ্যি হারেসের মত লোক দিয়ে খুন করালে তা প্রকাশ হতে দেরী হবে না, তাই সলিম মুনশী তাকে অমন পরিকল্পনার ভেতর রাখেনি। জমি জায়গা সম্পত্তি রাখতে গেলে প্রয়োজনে খুনও বাঞ্ছনীয়, জোতদার মুনশী তা খোলাখুলি বলতেন। অবিশ্যি তার তেমন কোন অপবাদ দিতে পারবে না কেউ। তবে এই এলাকার লোক সবাই জানে, মুনশী সাহেব ধড়িবাজ জিন্দি এবং দাদ-লেনে-ওয়ালা বাদ্দা। জমি জায়গা নিয়ে মামলায় তার মত ঝানু দ্বিতীয় একটি লোক খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। চাকরবাকর কি, তার নিজের ছেলে-মেয়েরাই তটস্ত থাকত জনন্দাতার কাছ থেকে বছদূরে। আর জনন্দাত্তী তো দুজন থাকতোই মুনশীর পরিবারে। ভাল নতুন ফসল পাওয়ার পর নতুন বৌ না এলে মানায় না। যৌবনকালের খসলৎ অবিশ্যি আর নেই প্রৌঢ় মুনশীর। তবে দুই স্ত্রীর ডালপালা

আছে ত। সেখানে যৌথ পরিবারের সংগতি—সুষমা রক্ষা বেজায় দায়। ফলে, জোতদারের মেজাজ ইদানীং বেশ চড়া হয়ে থাকত। তার চোটপাট যেত চাকরবাকচরদের উপর দিয়ে। গালাগাল খেত জনমুনিশেরা। গায়ের সালিশে তিনি প্রধান। তার রায় অনড়। সেখানে “দশ জুতা লাগাও, বিশ জুতা লাগাও” —এমন আপীলহীন ফল বেরুত।

হারেসের কথা না বললেও চলে। মুনশী কর্তৃক নাম উচ্চরিত হওয়া মাত্র তার পিলে কাঁপত। ভেতরে এমন হাওয়া যে সে অনেক সময় সঠিক জবাব দিতে ভুলে যেত। এক জিজ্ঞাসা, জবাব অন্য প্রশ্নের। এমন ঘাবড়ে গেলে নিতান্ত বিচক্ষণ মানুষও ত উল্টোপাল্টার ফেরে পড়বে। হারেস এই জন্যে মার খেত এবং প্রচণ্ড মার। মুনশী সাহেবের লাঠির বাছড়ির দাগ পিঠে বহুৎ আছে। তার মা আর দেখার জন্যে জগতে নেই। সুতরাং হারেসের জন্যে সহানুভূতি প্রকাশের প্রশ্ন অবাস্তর। জোতদারের ছড়ি কেড়ে নেবে বা অনুরোধ করবে, “আর না, মিয়া-সাহেব” —এমন বলার কেউ ছিল না। পড়ে পড়ে খুবই মার খেত হারেস। কিন্তু তার জন্য সে চিকার প্রকাশের মত দুর্বলতা দেখাবে, তেমন বাস্ত্ব হারেস নয়। তখন তার চোখ মুখের পেশী নানা আকার ধারণ করবে, হাত বার বার পিটুনীর জায়গায় পৌছবে, কিন্তু হারেসের গলায় তার প্রকাশ নেই। এক রকম শব্দ তার গলায় তখন খুব মনোযোগ দিলে শোনা যেত। কার অত গরজ? অনেক সময় শাস্তিদাতাই হাল্লাক হয়ে পড়ত। মার শেষ হলে হারেস ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিত, তখন চোখের জল কিনারায় উকিবুকি দিত, উচ্ছলে পড়ত না। মুনশী সাহেব নিজে অবাক হয়ে যেতেন কিনা আঢ়াকে মালুম। মন মনে ভাবতেন, মার বোধ হয় ওর শাস্তির নয়।

প্রচণ্ড মার খেলে হারেস সেদিন আর স্মরণের আহার করত না। বড় বাড়ি, কে কার খৌজ রাখে? কেউ টেরও পেত না, হারেসের কী হলো। তার ঘরে আর কারো শোয়ার জায়গা ছিল না। হিসেব সামান্য বিশেষ দিতে হয়।

গোয়াল ঘরের পাশেই একটি বড় ছিটে- বেড়ার ঘর তৈরি করেছিলেন সলিম মুনশী। বাঁশের খুঁটি আর বাঁধারির ফ্রেম, ফাঁকগুলো বাঁশের কঞ্চি বা গাছের সরু ডালপালা দিয়ে ছেয়ে পরে এক দেড় ইঞ্চি পুরু মাটির প্রলেপের সাহায্যে তৈরি ঘরকে এলাকায় বলা হয়: ছিটে বেড়ার ঘর। মুনশী সাহেব এটি গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতেন। ধান-চাল নয়— পাট, কুমড়া বা ওই জাতীয় কোন ফসল রাখা হোত এই ঘরে। সেখানে বুর্বুর যায়, অন্য লোককে বিশ্বাস করা দায়। হারেস যতই অবাধ্য হোক, মনিবের আমানত খেয়ানত করবে, তা মুনশীর হিসেবে ছিল না। এই গুদাম-ঘরে জানালা ছিল বেশ উপরে, তাও সংখ্যায় একটি। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় তার ভেতর হারেস ঘুমাত। কোন অভিযোগ ছিল না তার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনেও। কারণ, কারো কাছে মনের কথা খুলে বলার লোক ত সে নয়। জীবনকে যারা এমন সহজভাবে গ্রহণ করে, তাদের মনের হিদিস, কে বলতে পারে? এক একটি মানুষ চির-বক্ষদুয়ার জানালাহীন দৃংগ বিশেষ। যারা জানালা খোলে তাদেরও কি সব হিদিস অপর লোকে টের পায়? সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। বিশেষতঃ হারেসের মত বোধশক্তির অধিকারী মানুষের কাছ থেকে। সেখানে সবই অনুমানের ব্যাপার।

তবে ভীতি-জাত কিছু চেতনা, বোধ হয়, হারেসের প্রথর ছিল। পাখি-পোষা মনিব

ভাল চোখে দেখবে না। এই অনুমান সে কীভাবে করত? তার খাঁচা পাখি সবই গুদামঘরে লুকানো থাকত। একটা ডিপা তাকে দেয়া হয়েছিল। রাত-বিরেত যদি দরকার হয়। হারেসের তা দরকার ছিল না। অঙ্ককারে সে পেশাব পায়খানার জায়গায় ঠিক পৌছে যেত। পরবর্তী কাজ সারতে বাড়ির পেছনে পুরুর নয় ডোবা পর্যন্ত যেতে হয়, তা একদম মুখস্থ এবং অঙ্ককারে মুখস্থ হারেসের। তার আলো প্রয়োজন পাখিকে খাওয়াতে অথবা রাত্রে ফড়িং ধরতে। সংসারে যাদের চাহিদা ন্যূনতম তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীও ত কম লাগে।

কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে হারেসকে কিছু বলতে হোত না। লুঙ্গি গামছা বাণসরিক বৰাদ আছে। হারেস ত অপচয়কারী নয়। সে হেফাজতের ব্যাপারে নিজের দিকে খেয়াল নাই কৱুক, মনিবের জিনিস সে নষ্ট হতে দিতে অক্ষম। তা দেখা গেছে, যখন রবি-ফসলের মৌসুম শুরু হয়। তখন হারেসের ডিউটি বদলে যায়। সে তখন রাত্রে মাঠের অধিবাসী। কুঁড়েঘরের ভেতর আরো পাহারাদার থাকত। অনেকেই ঘুমাত। হারেস ঘুমাত অবিশ্যি, কিন্তু তা একটানা ঘুম নয়। ঘুম আর বিশ্যাম সে মিলিয়ে নিত। মনিবের কিছু বলার থাকত না। তরমুজ, বাঙ্গী প্রভৃতি এমন ফসল চুরি হয় নানা কারণে। গঞ্জে ত খুচরো বিক্রী হয় না। শতে শতে দৰ। এক চাষির নৰকইটা হয়েছে, কি দুশ নৰকই হয়েছে। সে একশ' করতে চায়। তখন বহু রক্ষক ভক্ষক সাজে। দশটা তরমুজ গাপ করে দিলো। হারেসকে এমন অনুরোধ বৃথা। বেশী পীড়াপীড়ি করলে হারেস জবাব দেবে, “আমি ত পারব না। মুনশী সাবকে জিগাই নাই?” অমন জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় থাকবে এই তল্লাটে কোন বাপের ব্যাটা? সলিম মুনশী তাকে চিবিয়ে দেবে না?

এই হারেস, এই শাস্ত শ্রীয়মান সর্বসহ তারেস যেন সর্বসহ বসুন্ধরা একদিন এক কাও করে বসল। সে কী তার অজানিতেও অথবা আগন্তের পাহাড় শুল্ক ছিল মাত্র। বন্দরে তার চুল্লি জুলছিল যার বাস্প-তাপ অন্তর্নিজ-সীমানায় বন্দী থাকতে নারাজ। বছরের পর বছর তবে কী নানা উপাদান সত্ত্বিয়েছিল, শুধু কোন এক অনুষ্টকের অপেক্ষার্থী— যেটুকু সময়মত আবির্ভাবের ফলে আতস-বাজি শুরু হয়ে গেল? তার বলকে চোখ আর দেখার পথ পায় না। আশপাশে যারা থাকে তাদের ঝটিলে ব্যতিক্রম ঘটনা সব ওলটপালট এত দ্রুত সম্পন্ন করে যে হিসাব থেমে যায়, অনুমান কূল হারিয়ে ফেলে।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু সামান্য নয়। পেছনে প্রস্তুতি ছিল বৈকি। নচেৎ এমন কাও কখনই ঘটতে পারে না। যন্ত্রমানব— যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি মানব, হঠাত রক্তমাংস নির্মিত মানবে পরিণিত হবে— এ কি বিশ্বাসযোগ্য, না বিশ্বাস করা যায়? হারেস সলিম মুনশীকে বেইজ্জত করেছিল। “পনর বছর আপনার গোলাম— গোলামের মত মেহনত করেছি— তার কি কোন দাম নেই, বেতন নেই?” হারেসের মুখ থেকে এই উচ্চারণই ত মনিবের পক্ষে চৰম অপমান, তার আভিজ্ঞাত্য ও আত্মসম্মানের পরম অবমাননা। এমন উচ্চারণ মনিবের কানে অবিশ্বাস্য। জন্মহাবা কি করে এমন উচ্চারণ করতে পারে?

কিন্তু কার্যতঃ ঘটেছিল আরো প্রচণ্ড ধরনের বেইজ্জতি। তা যথাস্থানে বর্ণিতব্য। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখলেই চলবে, কথাগুলো উচ্চারণের পর হারেস আর দেরী করেনি। সে এক দৌড়ে তার নিজের ঘরে এসে খাঁচায় বন্দী পাখিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেও রাত্রির অঙ্ককারে গায়ের হয়ে গিয়েছিল।

এলাকা ছেড়ে পালানোই তখন মুক্তি এবং যত দূরে দূরে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। সেই পথের হাদিস অবিশ্য বিচিত্র। মুক্ত আকাশে তলায় স্বয়ং নিজের প্রতু সাজা রাতারাতি ত সহজ নয়। খেয়াঘাট, জনপদ তিনদিনে বহু দূরে ছিটকে পড়েছিল হারেস। শেষে এক নগর-অভিমুখী পথিকের দলে সে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। তার গুদামঘরে কিছু পয়সা ছিল। খোঁয়াড়ে গুরু ধরে দিলে, ইজারাদার ধরাট বাবদ পয়সা দেয়। পনের বছরে সপ্তম্য মাত্র কয়েক টাকা। তা নিতে ভুল করেনি হারেস। পয়সার কদর তার কাছে স্বাভাবিক আর দশ জনের মত প্রতিভাত হয়েছিল। বিচিত্র ব্যাপার অবিশ্য।

তার ত গন্তব্য ছিল না। কথার্বার্তায় আলাপ। একদল লোক। তারা এক সভায় যাচ্ছে। কৃষক সমিতির সভা। কৌতুহলী হারেস আর বেশি কথা বাড়ায়নি। সে-ও সভার সামিল হয়েছিল। দলে পথে একটি মানুষ তার প্রতি কেন জানি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার নাম ঠিকানা জেনে যায় হারেস। হারেসের ঠিকানা অপর পক্ষ জানতে চায়নি। জিজ্ঞেস করলে, কি জবাব দিত, বহুদিন হারেসকে এই প্রশ্ন বেশ অসৌয়াস্তির মধ্যে চুবিয়ে রেখেছিল। দশ জনের দলে থেকে বক্তৃতা শোনা একদম নতুন নয়। কয়েক বছর আগে সে এক জনসভায় হাজির ছিল। এইটুকু তার বেশ মনে আছে।

আনন্দনা হারেস।

হঠাতে অজানিত আনন্দে তার বুক ভরে উঠে, অথচ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই তখনকার সঙ্গী।

শোনিতের কল্লোল-ধ্বনি-শিল্পীভূত পথচারী শুভাঞ্জনবের কোন না-মেটা আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট প্রতীক-মূর্ছনা-তরঙ্গে হিল্লোলিত করে। ইতিহাসের যাত্রা-পথ অ্যাকুলতা-দীর্ঘ আর্তনাদ মানে না; কোমল খিল্লী-বেষ্টিতে হৃদয়কে জানেনা; গভীর সম্মোহনে তার হৃদসপ্রিল রেখা পরিচয় ত্বর হৃদয়ের বিগ্রহ-ই ছিঁড়ে যায় কাল নির্জন পথ-প্রান্তে যুগ-সন্ধি মৃষ্টরের মারী-কৃষ্ণ কান্তারে কান্তারে। হে হেজরত আদম, আমরাও শুনেছি প্রপিতামহের মুখ থেকে-মানবের আদি পিতা তুমি। খনিচ্যাত ধরিত্রীর রুক্ষ শক্ত ভূমির উপর উলঙ্গ নিষ্কিণ্ড। সেদিন বেহেস্তের তরুণতা সঙ্কোচে পলায়মান তোমাকে সামান্য কক্ষকের ঝণ দিতেও তীব্র ঘৃণা। আল্লার লানতে ভৈরব রংগ্রূরপে নিকটে তুমি লাঙ্গনা-পর্যন্তু। প্রপিতামহের প্রবাদেই মুখের, আল্লার রহমত করেছিল। তোমার ক্রন্দন-জিৎ বন্দেগীর বিনিময়ে॥ আবস্থামীর জিজ্ঞাসু নয়নের দিকে চোখ মেলে চাও হে পিতা, আদম। পেয়েছিলে তুমি আল্লার রহমত? তোমার লানৎ-অভিশাপের হলাহল-সংক্রমণ নেই, তোমার গোলাম বংশধরের রক্তে নেই? তবে কেন জোয়ারীর এক দানা জোটেনা আমাদের জঠরে। কেন আমাদের কটী-তট প্যায়না বক্ল পরিমাণ চীন বসনশোভা। তোমার অভিশঙ্গ বিবৰ্ণ দিনের স্বাক্ষর আমাদের শ্রান্তি-ক্ষত শরীর। রোগ-ক্লিন পান্তুর বেলায় পৃথিবীর রঙিন মেওয়া— আমাদের লুক্ক ঠোট থেকে সরে যায়। তোমার অতীত-লাঙ্গনার স্বাক্ষর-আমাদের অসহায় ত্যাগিত নয়ন। হে আদি পিতা, চোখ খুলে তাকাও, জবাব দাও তোমার অবিশ্বাসী বিদ্রোহী সন্তানদের। জবাব দাও॥

সভা ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাতে ঝড় উঠলো। বার শহরের পল্লী। একটা মাঠে মণ্ডপ বাঁধা হয়েছিল। ঝড়ের ধাক্কা এসে লাগে হোগলার চালের উপর। সভাস্থলে হটগোল শুরু হয়। চারিদিকে ইতঃক্ষিণ নরমিছিল।

এই জনসমূহে হারেসও ছিটকে পড়ে এক কিনারায়। তার সঙ্গে ছিল পথে চেনা এক কৃষক বঙ্গ আরিফ। তাকে আর চোখে পড়ে না।

হারেস জোর গলায় ডাকল, আরিফ মিয়া। আরিফ মিয়া।

কলরব চারিদিকে। হারেসের কর্তৃপক্ষ এখানে হারিয়ে যায় অরণ্য রোদনের মতো। আরো কয়েকবার জোর কঠে ডাকল হারেস।

বাড়ের তাওব আর থামে না। বেশিক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। উপস্থিত জন-মণ্ডলী যে-যার গভৰ্বের স্নাতে বহমান।

হারেস হঠাৎ দৌড় আরপ্ত করল। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক আসে। হয়ত বৃষ্টি নামবে এখনি। স্থানুর মত আর অচলতা আঁকড়ে থাকা চলে না।

একটু এগিয়ে হারেস একটা কাটাখালের পাড়ে এসে পড়ল।

ভালুকপে চোখ মেলান যায় না। উন্নত বেগে ধূলিকণা বাতাসের সঙ্গ-অভিলাষী। এক এক জায়গায় ঘূর্ণিবাতাসে নাকমুখ বঙ্গ হয়ে আসে। তবু হারেস পথের রেখাটুকু একবার চিনে নিতে চায়। কাটা খালই বটে। দু-পাশে ব্যবসাকেন্দ্রের আভাস। পাটের শুদ্ধায়, কল-কারখানা। জনপন্থী নয় জায়গাটা হারেসের বুঝতে বিলম্ব হয় না।

হঠাৎ গুরু পায় হারেস। বমি চাড়া দিয়ে উঠে গলার ওপাশে। কাটা খালের পচা পানির গুরু। হারেস তা জানে না, তাই আরো জোরে দৌড়ায়। খালের নৌকার মাঝি-মাল্লারা হৈ চৈ শব্দ করে। হারেসের কানে আর কিছু পৌছায় না। চোখের কোণে বন্দী পথের অস্পষ্ট রেখাই শুধু তার কাছে একমাত্র সন্তু তখন।

ঘড়ঘড় শব্দ শুনে হারেস একবার থামল। কয়েকটা গোরুর গাড়ি জোরে হেঁকিয়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপর্যুক্ত নেই। এখানে পথ খুব সংকীর্ণ। এক পাশে ঘেরাও দেওয়া একটা বটের চারা রাত্তিসে মাথা কুটছে চারিদিকে। তারই পাশে হারেস দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার দমকা বাতাস। কচি বটের ডালের ঝাপটা এসে লাগল মুখে। চোখের পাতায় ধূলার জুলা অনুভব করে হারেস। পেছনের দিকে তাকাল সে একবার। কালো আকাশ ভেঙ্গে মেঘের দল বন্য মহিমের মত ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে আসছে। ধূসর ইষৎ কালো, ঘন কালো আর কাজলা রঙের ফেনা সমগ্র আকাশ চতুর ছেয়ে ফেলে। ঝঁঝঁা-বৃষ্টির ভূমিকা শেষ হোতে আর বেশি বাকি নেই। গো-শকটের চাকার দ্রুত ক্রেক্ষার মিলিয়ে যাচ্ছে অতিক্রান্ত পথের ওপারে। ঝঁঝঁার দমক পায়ের পেশী ধরে নাড়া দেয়। স্থির হোয়ে চলা বিপজ্জনক, বাম হাতের কনুই চোখের উপরে রেখে হারেস দৌড় দিল।

কয়েক মিনিট পরে অনুভব করে হারেস এই পথে সে শুধু এক। আর কোন সঙ্গী নেই তার। নেই থাক। বেপরোয়া হারেস দৌড় দিতে থাকে। বড় বড় ফেঁটা বৃষ্টি ঝরল ধূসর পথের উপর। হারেস কনুইয়ের উপর অনুভব করে পানির ছোঁয়াচ। চোখের জল তার ক্লান্ত নয়নের কন্দর থেকে বেরিয়ে এলো নাকি?

আরো জোরে বৃষ্টির দামাল প্রহরী হেঁকে উঠে। একটা আশ্রয় এখনই খুঁজে নিতে হয়। দু-পাশে তাকাল হারেস। একদিকে খালের ঢালু কিনারা। তার উপর বেপারীদের নৌকার মাঝি-মাল্লা কুট্টীর ভেতর ঢুকে পড়েছে। মাঝি হালের উপরকার মাচান থেকে সেঁধিয়ে পড়েছে নীচে। খালের পাড়ের উপর সওদাগরের গদি নেই আর। বিরাট কারখানার

ফটক। নেপালী দারওয়ান চোরা ফটক খুলে গুমটির ভেতর বসে আছে। বৃষ্টি পড়ছে। আর বাছবিচার চলে না। হারেস এই জগতে অনভ্যন্ত মুসাফির। দ্বিধাগ্রস্ত ভয় লাগে তার। ফটকের গহ্বরে সে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। উত্তুঙ্গ চিমনীর সারি গশ্তীর অবয়ব আকাশের ঢাঁড়াইয়ে আরোহণরত। সারা দিনের ধোঁয়াজাল যেন মেঘের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হোয়ে আবার পিঞ্জর বন্দী হওয়ার লোভে ভ্রায়মাণ চারিদিকে। একটা চিমনীর দিকে হারেস একবার চেয়ে দেখল। কয়েকটা লোহার তার তীর্যক মাটির দিকে নেমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। যেন বিদ্যুৎ অভিনব কালো রঙ পরে এই মাত্র বিলিক দিয়ে গেল। গোধূলী সক্ষ্যায় বিলীন হোয়ে গেছে এতক্ষণ। নিরন্দিষ্ট সূর্যের অনুপস্থিতির আক্রমণে বর্ণ দরিদ্র ধূসর মেঘের দল সন্ধ্যার মুখ চেপে ধরে। তারই আর্তনাদের গোঙানি কি বাতাসে? হাত-পা আচড়ানোর আওয়াজ লৌহ ফটকের ওদিকে ডেঙ্গে পড়ে। না, এখনও কাজ চলছে। নাইট শিফ্টের কর্মব্যন্তি ঝড়ের বিরাট সিফনীর বেসুরো অস্তরারপে আচমকা স্তুক পটভূমির উপর ব্যঙ্গধনি ছড়িয়ে যায়। খট-খটাং-খট। পথের রেখা মিশে গেছে অঙ্ককারে। চমকানো বিদ্যুতের বিবস্ত দীর্ঘ একটা অশথ গাছের ছায়া দেখা গেল নিমেষের জন্য। হঠাতে সে সঁ শব্দ হয় হারেসের চারপাশে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে, পত্রপূর্ণ একটা উড়ত ডাল এসে লাগল আঙুলের ডোগায়।

বার শহর।

প্রতিবেশীদের গৃহদীপও জুলে না আর। শেষ হংসো কী মহানগরের দরিদ্র আঘায়ের ঠিকানা?

অপরিচিত পথে হারেস থামে না। মাথা ধোঁয়ার কোন আশ্রয় নেই এইখানে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এল একবার। দমকা বাতাসে পাতলুন বৃষ্টির কুয়াশা আবার সরে গেলো। হিম-শৈত্য ঝঁঝঁা স্নোতে ভেসেছে জোয়ার-জলের মত। ক্লান্ত হারেস ক্রূর আবেষ্টনীর গারদখানায় বাইরের নীল আকাশের ইশারা দেখল এই মাত্র। তবু চলা থামে না। এইবার ঝড়ের দোলা সৈর্বৎ মন্দীভূত; কিন্তু প্রাপ্ত-ধারায় নামল বৃষ্টি।

হারেসের পরণে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। হাতে একটা লাল গামছা। প্রথম ঝাপটায় তার কাপড়-চোপড় বেশ ভিজে গেছে। আর এক মিনিট বাইরে থাকা সম্ভব নয়। ভিজে কাপড়ে রাত কোথায় কাটবে কে জানে? চমকানো বিদ্যুতের আলোয় হারেস দেখল, একটা কাঠের বেড়ার পাশ দিয়ে সে হাঁটছে। বেড়ার ওপারে কতগুলো ক্রশ চিহ্ন, তার পরেই ছোট গীর্জার গশ্তীর পটভূমি। আর বিলম্ব করল না হারেস। একলাফে বেড়া পার হোয়ে, কবরস্থানের কুন্দু শৃতিস্তম্ভের উপর দিয়ে গীর্জার প্রাঙ্গণে পৌছল সে। বড় ক্লান্ত, হঁফিয়ে উঠেছে হারেস।

বহু পুরাতন গীর্জা। ক্যাথলিক পাদ্মীরা বহুদিন আগে বার-শহরের পল্লীর পাশে এই আরাধনার আস্তানা গড়েছিল। গ্রামের ভেতর নমশ্কৃ আর গরীব মুসলমানদের বাস। রুটির সঙ্গে ধর্মেরও একদিন যোগ ছিল। ধর্মযাজকেরা মানবপ্রেমিকের খোলস পরে বহু পূর্বে ধীরে ধীরে জয় করেছিল অধিবাসীদের হনদয়। ধর্মের বীজ বুদ্ধিমত্তার উর্বর মাটিতে ফলবন্ত হবে, সে ভবিষ্য-দৃষ্টি শ্রমণদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের কথা। তারপর সৌর জগতের বহু নক্ষত্র খসে গেছে। আগকারী যীশুর সঙ্গে আর

কুটির কোন যোগাযোগ নেই। অধিবাসীরাও ধর্মে মতিহীন। বছর দশেক আগে গীর্জা পরিত্যক্ত হয়েছে। আশপাশে গ্রামের লোক আগের আলো আর চায় না। স্থানীয় ক্রিচানেরা জীবিকার স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেছে। গীর্জার পাশেই খাল। তার ওপারে লোহার কারখানা ব্ল্যাস্ট ফার্নেস, চিমনীর উন্নত মস্তকের কাছে গীর্জার ক্রেস্ট লজায় নুয়ে পড়ে। কারখানার মালিক নাগরমল ভাদুরিয়ার বিরাট সৌধের পাশে গথিক স্থাপত্যশিল্প নিতান্ত প্রাচীনতার দুর্গন্ধ ছড়ায়। নিরুদ্ধিষ্ঠ জেসুট পাদ্মী আর তার মূরীদগণের অন্তর্ধান কী তারই প্রমাণ বহন করে না?

গীর্জার দরজা বন্ধ। ‘এইলের’ সম্মুখটা খুব প্রশংসন নয়। একদিকে কতগুলো চড়ুই আর কবুতরের ডানা ঝাড়ার আওয়াজ অঙ্ককারে আলোড়ন তোলে। হারেস বসে পড়ল ভাঙা চতুরের উপর। তার আগে আরো এখানে বিহঙ্গ-প্লাতক এসে জুটেছে তা’হলে? হাসি পায় হারেসের। লুঙ্গি আর ফতুয়া ভিজে গেছে। অন্তত: সারারাত গায়ে দেয়া চলে না। হারেস কাপড় ছাঢ়ার কথা ভাবল। আর একটু দেরী করা দরকার।

আরিফের সঙ্গে আসার সময় সে তাকে দু-আনা পয়সা দিয়েছিল। বিকালে ছ’পয়সার মুড়ি কিনেছিল সে। আর খাওয়া হয়নি। বন্ধু কাছ-ছাড়া হোয়ে গেছে।

ক্ষুধার্ত হারেস মুড়ি খাওয়া আরম্ভ করল। গামছার উপর তার সতর্ক চোখ ছিল। তবু দু’একফোটা বৃষ্টি মুড়ির ভেতর সেঁধিয়েছে। ঠাণ্ডা মুড়ির আস্বাদ ভাল নয়। তার অভাব পূর্ণ করে ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়না।

বৃষ্টি ঘরছে ঘরবার। গীর্জার ক্রেস্ট শিখর থেকে বৃষ্টি স্রোতে নেমে আসে। হারেস আনমনে মুড়ি খায়। ঠাণ্ডা লাগছে তার ভিজে কোপড়ে। তাই তাড়াতাড়ি হাত চালায় সে। খাওয়ার শেষে সে গামছা পরল। লুঙ্গি মজুরী নিঙড়ে গীর্জার সম্মুখে ছোট দেয়ালের উপর যেলে দিল। বৃষ্টি শীকর এখানেও থামে না। নিরুপায় হারেস আবার এসে বসে পড়ল চতুরের উপর। ক্ষুধা মিটেছে, পানির পিপাসা এখনও মেটেনি। হারেস আবার উঠে পড়ল।

বৃষ্টি জল ক্রেস্টের উপর থেকে উত্তরের এক কোণে সশব্দে মাটির উপর আছড়ে পড়ে। আঁজলা পাতল হারেস। হিম আকাশের পানি পিপাসা মেটায় না শুধু, শৈত্যের বানও আনে হারেসের উলঙ্গ শরীরে। গীর্জার দরজার সোজাসুজি থামের এক কোণে হাত-পা গুটিয়ে হারেস যেন এবাদতে বসল। এখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার কোন জুলুম নেই।

মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুতের আলো হানা দিয়ে যায়। গীর্জার সম্মুখে কত ক্রুশের আবছা-মুর্তি। হারেস আর কোন দিন গীর্জা দেখেনি। গোরস্থানে কোন কথা-ই তার মনে উঠল না। ভাঙচোরা কোন বড়লোকের বাগান বোধ হয়। হারেসের মনে হোলো গীর্জা নয়, পোড়োবাড়ি। চারিদিকে অঙ্ককার। আশ্বস্ত হয় হারেস। রাত্রি-যাপনের কোন হাঙ্গামা নেই। পোড়োবাড়ির বাসিন্দা শুধু ভূত। হারেস প্রেতিনীর ভয় করে না।

স্যাতসেতে মেঝে। ঠাণ্ডা লাগে হারেসের। শুম ধরে না। আর্তস্রা বৃষ্টির রাগিনী কেঁদে যায়। উপরে দূরস্থ কবুতরগুলো পাখা ঝাড়ছে। নীড় থেকে খড়কুটো, শুকনো বিষ্ঠা পড়ে। একবার পাখি-তাড়নো শব্দ করল মুখে। গীর্জার ফটকের সোজাসুজি ছোট আর একটা ফটকের মুখে অশথের ভাঙা ডাল ঝড়ে উড়ে এসেছিল। তারই পাতার সাহায্যে হারেস বিছানা রচনা করল। হাজার বৃষ্টি মাথা কুটলেও আর কোন অসুবিধা নেই তার।

প্রেতায়িত নির্জনতা। বাইরে বৃষ্টির মৃদু-নিনাদ। হারেসের ঘূম আসে না। অচেনা জায়গা। কাল কোথায় কাটিবে তার? পথ-ঘাট চেনা নেই। হারেস কোন ভয় করে না। বুক তার হাঙ্কা মনে হয় না কোথাও। মুক্তির ঝঁঝাশাসে পৌজারের হাহাকার ছিন্ন পত্রের মত উড়ে যাচ্ছে আজ। হোসেন জমাদারের দহলিজে গ্রামে এমনই রাত্রি কেটেছিল তার কয়েক বছর আগে। আজ কারো তোয়াঙ্কা রাখে না সে। হারেস অশ্বথ পাতার উপর শয়ে হাঙ্কা নিঃশ্বাস ফেলে। আকাশের অঙ্গন চুরমার করে আজ বৃষ্টি আসুক; হিমাত্তির রক্ষ পৌজার শুভ্রিয়ে আসুক হিমবাহ ছোওয়া আরণ্যক-প্রভঙ্গন। হারেস কারো কাছে বন্দী নয়। তার মাথার উপরে উচু শুধু নীল আকাশ। পাশ ফিরে চোখ বুজল হারেস।

বৃষ্টি এবার থেমে আসছে। টিপটিপ শব্দ গীর্জার প্রাঙ্গণে। ক্রুশতোলা অঙ্গনের তরমতায়। নবজাত শিশুর হৃদস্পন্দনের মত টিপ টিপ ধৰনি। সর্বৎসহ ধরিত্রির প্রাণকন্দরের চঞ্চলতা যেন জেগে উঠেছে— টিপটিপ। স্বপ্নে আবর্তে চোখ বোজা হারেস ঘূরে বেড়ায়। ঝিঁঝির একটানা ঐক্যতান নির্জন গোরস্থানের ভয়াবহতা আরো প্রসারিত করে। ঝুপ ঝুপ টিপ্পটিপ। কয়েকটা ব্যাঙের ডাক, কয়েক মুহূর্ত পরে থেমে গেল। হারেসের চেতনায় কোন কিছুর দাগ পড়ে না। আবার প্রকৃতির ষড়যন্ত্রের সবকিছু মন্ত্রণা সে যেন শুনতে পায়। তবে ঘূম আসে না কেন? পরিশ্রান্ত দুই চক্ষে ঘূম নামুক একবার। সারারাত্রি কী ঝিঁঝিরা জেগে থাকবে? বৃষ্টির করুণা ছাড়িয়ে দেবে অতন্ত্র আকাশ?

গুরু-বিহুল মাতাল-রাত্রি শ্বাপনের মত পা ফেলে ফেলে আসে।

চোখ মেলে অঙ্কারের পট-আবর্তনে হারেস দেখতে পায়: কর্ষিত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে সে হাঁটছে, ফসলের বন্যায় শ্যামল মার্গাদিকচক্রবালের অভিসারে উন্মাদিনী। চেয়ে আছে সে। হারেস বুঝতে পারে না, তার চোখে ঘূম নামছে। ঝড়ের পর অরণ্যের সীমানা জুড়ে লীলা-গতি বাতাসের প্রবাহন ঘূম, ঘূম, ঘূম।...

বৃষ্টিম্বাত আকাশ ছিঁড়ে লাল সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে খালের উপর।

হারেসের ঘূম ভেঙ্গেছিল খুব সকালে। এই জায়গার নির্জনতা তার কাছে অশ্বোয়াত্তিকর। তাড়াতাড়ি সে বেড়া ডিঙিয়ে আবার খালের কিনারায় এসে দাঁড়াল।

জীবনে হারেস আর কোনদিন শহর দেখেনি। অবাক-বিস্ময়ে সে চোখ মুছে। গ্রামে লোকের মুখে মহানগরের বহু কাহিনী তার শোনা ছিল। কৃষক-পল্লীর বহু চেনা মুখ গাঁয়ের ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে চলে যায়; সে ত ছিল তার কাছে কাহিনী মাত্র। আজ সে নিজেই ঝুপকথার রাজকুমার। অবাক-বিস্ময়ে হারেস দৃষ্টির আকুলতা মেটায় মাত্র। না, দেখার ত্বক্ষা তার মেটে না। চিমনীর ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে, রেল গাড়ীর হশ হশ শব্দ আসে নিকট থেকে। একটা পোল দেখা যায় কয়েক শ' গজ দূরে। ট্রেনের ইঞ্জিন হাইসেল দিয়ে পার হয়ে গেল। মাল-গাড়ির একটানা বগীগুলোর চাকা খটখট শব্দ করে। নানারূপ শব্দ, শুধু শব্দ চারিদিকে। বহুরূপী কথকের কথকতা চলছে দিকে দিকে। এই কী মহানগর? শ্যামলিমার সঙ্গীতে অভ্যন্ত হারেসের কানেও কিছু কটু লাগে না। আলেফ-লায়লার জীনের বাদশার দেশ। হজরত সোলেমানের তাঁবেদার কোন দৈত্য পুরীর তোরণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হারেস। পেছনে গীর্জার গঞ্জীর মৌন মূর্তি। পটভূমির শুভমেঘ শুরে শুরে বাতাসে এলিয়ে দিচ্ছে শরীর। প্রিয়তমার কাছে দেহে-মনে বাঁধা পড়ার ছলে কোন ঘোড়শী সুকুমারী

যেন এলানো অবয়বের সঙ্গে বসনের শাসন-শৈথিল্যরত। চার্ট-ইয়ার্ডে খেত পাথরের ক্রুশ নেই। বর্ধার বিবর্ণ ভাঙচোরা কাঠের ক্রুশ। এগুলো কবর, হারেসের বুঝতে দেরী হয় না। আজ তা গা শিউরে উঠে না। কৌতুহলী দৃষ্টি তন্ত্রণ করে কবরস্থান। মাটির উচু চিবির পাশে পাশে কোথাও দু-একটা নিঃসঙ্গ ফুলের গাছ ঝড়ে নুয়ে পড়েছে। পাতাপুতি উড়ে এসেছে কাল রাত্রে। দারিদ্র্যের বাপ্স এখানেও শাপিত। হারেসের হঠাত মনে পড়ে, এখানেও দীন-জন আছে নাকি। গ্রামের জমিদার আসকার হোসেনের কবর খেত পাথরে মোড়াই করা কত সুন্দর। শহরেও আছে তাদের মত বিশুইন মানুষ। চাল-চুলো ছিল না এদের বোধহয়, তাই নির্জন বার-শহরের একটিরে জীবনের শেষ-বেলায় খড়-কুটোর মত আটকে গেছে। শহরের শোনা এতদিনের কাহিনী কী তবে স্রেফ ঝুটের জোলুস। এই কী মহানগর?

কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে হারেস। লাল রঙের বিজ এবার স্পষ্ট দেখা যায়। হারেস কৌতুহল মেটাবার জন্য এগিয়ে গেলো।

খালপাড়ের পথ সংকীর্ণ। কাঁচা মাটির সীমানা শুরু হয়েছে। কয়েক পা গেলে পথের বাঁক গিয়ে মিশেছে একটা উচু-চিলা চারা খেজুরের জঙ্গলে। একটা উদ্ভিত শিরীষের গাছে প্রভাত-বায়ুর আলোড়ন বাজে। হারেস এগিয়ে গেলো। হোক সরু পথ, বেশ পরিষ্কার ধূবধবে। এমন বালি মাটির পথ, ইট-পাথরের রাজ্যে : উচু-চিলির পরে আবার সমতল পথের রেখা। শিরীষ গাছের সম্মুখে কুন্দু জলাশয়। নীল আকাশ স্নান করে স্বচ্ছ পানিতে। সবুজ দাম-ঘাসে ডরা পানির কিনারা। পাতিহাস একটাই ছিঁড়ণ হয়ে ভাসছে। কাছে গেরস্তর ঘর আছে কোথাও। হারেসের দৃষ্টি-চক্ষেল। জলাশয়ের পরে পানাভরা জলা-ভূমি, তারপর মাঠ, দূরে নারিকেলগাছের মাথা ছাড়িয়ে চিমুটার ধোয়া উঠছে। শুধু এইখানে বার-শহর থেমে যায়নি। জলাশয় থেকে বামদিকে কয়েক বিঘা জমি দূরে খড়ো চালের ঘর। একদল শূয়ুর এইমুখে ছুটে আসছে। ডোম-চামারের পল্লী বোধ হয়। শূকরের ভয়ে হারেস আর দাঁড়িয়ে থাকে না।

টেলিফারের তারে বসে দাঁড়কাক কোলাহল করে। নামহীন লম্বা-লেজে একটা পার্শ্বী একাকিনী ডাকছে। হারেসের ছলে দৃষ্টি হঠাত লাল ত্রীজের উপর থামে।

দূরে সিগন্যাল পড়েছে। গাড়ি থামার প্রতীক্ষা করে হারেস। হশ-হশ শব্দ নিকটতর হয়। ত্রীজের উপর ইঞ্জিন ছুটে এলো এক মুহূর্তে। স্তম্ভিত হারেস চেয়ে আছে। তার অচেতন মন মানুষের কারিগরি আর পৌরুষকে সালাম জানায়। বাতাসে আজ অচেনা স্পর্শ। পোড়া পেট্টোর গন্ধ এলো একবলক। হারেস জোরে নিঃশ্বাস টানে। অস্ত্রিতায় স্বামুদ্রল ক্ষেপে উঠে। এই মাত্র ইস্রাফিলের সিঙ্গা যেন বাজল, হারেসের ধরিত্বী চুরমার হোতে থাকে সম্মুখে।

একটা লঞ্চ এলো ঘড়ঘড় শব্দ করে। হারেস অত কৌতুহলী নয়। গঞ্জের দিনে সে বড় স্টীমার দেখেছে নিজের চোখে। প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকিয়ে থাকে হারেস। কত দেশের না লোক এই নগর তীর্থে এসে জমছে। রেলিঙের ধারে একটা গৌরবর্ণ ছেলে বসেছিল। যাত্রার দলের গ্রামের ছেলে চন্দনার কথা হঠাত মনে পড়ল।

লঞ্চের পেছনে ধোয়া ওড়ে।

হারেসের হাই ওঠে। এতক্ষণ মুখে পানি দেয়নি সে। খালের উচু-নীচু পাড় থেকে সে

নীচে নামল।

কোন রকমে হাত-মুখ ধোয়া সারে হারেস। লোনা পানি মুখে রাখা যায় না।

চোখের পাতা বুজে উপরে পানি ছিটিয়ে নিল সে। তন্দ্রাহীন মহানগর জেগে উঠেছে সর্বক্ষু মেলে। ফ্যান্টেরীর হইশেল বাজছে দিকে দিকে। সৰ্বের বিসর্পিল রশ্মি কান্তিহীন উভাপ ছড়ায় রাত্রিজাগা গৃহমুখী মজুরের চোখের উপর। ব্রীজের উপরে রাস্তার পথিক অনেক। পুলের তলা দিয়ে থাল পাড় এগিয়ে গেছে। নিঃসঙ্গতা হারেসের আর ভাল লাগে না। ক্ষিধে লাগছে। গ্রাম থেকে যে মানুষেরা মহানগরে আসে, তাদের সঙ্গে পরিচয়ের লোভ পদে পদে। হারেস রেলের বাঁধ ধরে উপরে আরোহণ করতে লাগল। বহু আরোহীর পায়ের দাগ রয়েছে চারপাশে।

পুলের উপরকার জগত হারেসের কাছে আরো বিচ্ছিন্ন লাগে। এতক্ষণ সুড়ঙ্গপথে সে যেন হাঁটেছিল। উপত্যকার কোন সংবাদ তার জানা ছিল না। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু কলকারখানার চিহ্ন। চিমনির গায়ে যেন দিকচক্রবাল হয়ড়ি খেয়ে এসে পড়েছে। উন্নর পার্শ্বে রেলওয়ে ইয়ার্ড। বগী টানাটানি আর ইঞ্জিনের দৌড় দেদার দেখা যায়। কোথাও হঠাৎ স্টিম ছাড়ার ভশ-শ শব্দ হয়। হারেস চংমৎ করে।

একটা রেলিং-এর উপর সে কিছুক্ষণ বসে রাইল। উন্মুক্ত দৃষ্টি শুধু অহেতুক চলে, দিক পরিবর্তন করে আবার বিস্ময়ের তীব্র মাত্রায় বোবা হয়ে যায়। এই কী মহা-নগর?

পুলটা কচ্ছপের পিঠের মত, দুই দিকে ইষৎ দাঙ্গু। ইঞ্জিন আরোহণের দৃশ্যটা তাই মনোরম মনে হয়। প্রথমে হেড লাইটের দুই চক্র যেন ঝর্কটি করে, তারপর ইঞ্জিনের অন্যান্য অবয়ব ভেসে উঠে পুলের সমতলে ফেঁয়েকটা ইঞ্জিন গমনাগমনের ছবি হারেস দুই চোখে এঁকে নিল।

অকস্মাত চমকে উঠে হারেস। পুলের ওপর থেকে হল্লা শোনা যাচ্ছে। কালো মানুষের মূর্তি একসঙ্গে অনেকগুলো দেখা যায়। শোরগোল আরো বাড়ে। হল্লার মাঝখানে আবার জুড়ি-গান শোনা গেল। কৌতুহলী হারেস চেয়ে থাকে।

একদল লোক আসছে। তার সম্মুখ দিয়েই তাদের পথ। পরনে নীল প্যান্ট, গায়ে হাফ-শার্ট। পায়ে কারো জুতা নেই। হারেস চেয়ে আছে। মানুষ এত কালো। একজন হাসছিল। মনে হবে মুখপোড়া হনুমান দু'পায়ে হাটতে শিখে এইমাত্র দাঁত বের করেছে। সারবন্দী দল আরো নিকটতর হয়।

হারেস অবাক। বোধহয় কাজ থেকে ফিরছে এরা। এত কালিবুলি সর্বাঙ্গে! তবু শোরগোল কমে না। একটা পোড়া বিড়ি হারেসের সম্মুখে এসে পড়ল। দলের ভেতর থেকে কে একজন ছুড়ে আর কী। হারেসের ভাল লাগে না এই হঞ্জোড়। এমন ইতর মানুষ এরা। হাবার মত সে চেয়ে থাকে কেবল।

দলের একজন চলার সময় বলে, সকালে গামছা কাঁধে বসে আছ যে।

হারেস জবাব দিতে চায়। সে ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। পেছন থেকে একজন গান ধরে:

রাত বারোটা বসে বসে
পোড়ারমুখো এলো শেষে....

দলের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত গানের কলির দোহার আর থামে না। হারেসের কানে এসে বেঁধে, রাত বারোটা বসে বসে... ...

এমন ইতর মানুষ সব। যেন্নি চেহরা, তেমনি ব্যবহার। মনে মনে হারেস বিরক্ত হয় খুব। গাঁয়ের লোকেরা এর চেয়ে টের ভালো। ভাবে গাঁ-ছেড়ে আসে কেন কিষাণেরা? এক বছরে কত চেনা লোক যে তার গ্রাম ছেড়েছে। মুনশীদের মামুদ, মাঝপাড়ার কিরণ, চৌধুরীদের সাজেদ, হাসীব আরো বহু চেনা মুখ। এই বুঝি শহরের মানুষ! আজই গ্রামে ফিরে যাবে সে। কি লোভে মীরগাঁয়ের লোক শহরে পড়ে আছে?

হারেস উঠে পড়ল।

ব্রীজের সম্মুখে পথ স্টেশনের দিকে হারিয়ে গেছে। জন-সমাগম এই দিকে আরো বেশি। হারেস গ্রামের পথ চায়। তাই আবার থমকে দাঁড়ায়।

কিন্তু কোন্ গ্রামের তার গন্তব্য থামবে?

তার প্রতিপালক সলিম মুনশীর আশ্রয় ত সে নিজেই পায়ের ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। আরো গ্রাম আছে, তার নিজের জন্মভূমি গ্রাম। হারেসের কাছে ঝাপসা ঠকে অতীত শৈশবের কথা। গ্রামে জীবিকার কি উপায়ই-বা খোলা আছে?

হারেসের মন মুশড়ে যায়। পথঘাট সে আদৌ চেনে না। আরিফের সঙ্গে দু'দিন হেঁটে এসেছিল সে। আরিফকেও আজ খুঁজে পাওয়া দায়। তার ঠিকানা মনে আছে। কিন্তু একদিনের পরিচয়ে বঙ্গুত্ত্বের দাবী করতে পারে সেইচ্ছাত্তার বুদ্ধি খেলে যায়।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশের নীল উবে গেছে। বাতাসের আলোড়ন থেমে গেলে এক-একবার নীল আকাশের ইশারা পৃথিবীর মানসের চোখে ধরা পড়ে। হারেসের ভাল লাগে না কিছুই। ক্ষুধা আরো বাঢ়ে। মাত্র জটী পয়সা আছে পকেটে। বিনা আহারে হেঁটে হেঁটে গ্রামে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

হারেসের মনে হলো সে ভিক্ষা করবে শহরে। পরমুহূর্তে আঞ্চাধিকারে তার মন ভরে ওঠে। হাত পাতবে সে এমন পাট্টা জোয়ানের চেহারা নিয়ে।

নেই ভিক্ষা করুক সে, তবু গ্রামে তাকে একদিন ফিরে যেতে হবে।

হারেসের সামনে একদল মজুর পথিক। এরাও দল বেঁধে চলেছে, কিন্তু এই মজুরদের অবয়ব শান্ত। কোন দামালপনার চিহ্ন নেই মুখে।

হারেসের নিকটবর্তী হওয়া-মাত্র সে একজনকে জিজ্ঞাসা করে, এখানে কোন কাজ পাওয়া যাবে?

—কি কাজ চাও তুমি। ঘরামির কাজ জানো?

—খুব।

মাঝবয়সী লোকটা। একটা কাটারী হাতে। ছেটকরে দাঢ়ি ছাঁটা তার। পরনে দোতা-করা ধূতির তহবন। হারেসের দিকে সে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ!

—তোমার বুঝি কাজ নেই?

—আমাদের সঙ্গে চলো। আজ লোক কম আছে। মিস্ট্রীকে বলব। কাজ হবে। হারেসকে ঘিরে আরো কয়েকজন জটলা পাকায়।

—এ কে, মিস্ট্রী? জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নাম আলি।

—বেকার। কাজ নেই। তাই কাজের খোজে এসেছে।
আলি বলে, ভালো কাজ হবে কয়েকদিন। তোমাদের বাড়ি কোন জেলা।

—মেদিনীপুর। হারেসের সলজ্জ জবাব।

—তোমরা ক'দের?

—মমিন। আমার নাম হারেস।

আলি একটা বিড়ি ধরিয়ে দু-টান মেরে হারেসের হাতে দিল। খাও ভাই।

—আমাদের বাড়িও মেদিনীপুর।

হারেস অঙ্গীয়তায় গলে পড়ে। বিড়ি টানতে থাকে সে।

—আর দেরী করো না। চলো। মেট-মিঞ্চী (বড় মিঞ্চী) আজ শিগগীর আসবে।

পিপাসা স্কুধা দুই এক সঙ্গে হানা দেয়।

পথ চলার সময় সে বলে: আলি মিয়া, রাস্তায় মুড়ি থেতে পাব? সকাল থেকে কিছু খাইনি।

—আহা খেয়ে আসো নি। চলো। রাস্তায় মুড়ি পাওয়া যায়।

আবার লাল ত্রীজ পার হয়ে এলো তারা। গ্রীষ্মের সূর্য আপন মহিমা বিস্তার করে।

হারেস মাথায় গামছা বাঁধে। বড় চড়া রোদ্ধূর। পূর্বের দিগন্গন ঝলমল করে।

—আচ্ছা মীর গাঁ শহর থেকে কতদূর?

বাসেদ বলে, সেখানে তোমার বাড়ি নাকি?

হারেস ইতস্তত করে, পরে বলে, না এমি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

শোল-সতের ক্রোশ।

হারেস আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। সেলিম মুন্শীকে হয়ত এরা চেনে। মুন্শীকে সে কম অপমান করেনি, প্রতিশোধের দাঁওয়ে থাকবে সে। চুরি করে পালিয়ে এসেছি এমন বদনাম দিতে পারে। পুলিশের কাছে সংবাদ পৌছুবে। ঘেমে উঠে হারেস।

আর কোন কথা বলে না।

আবার উৎরাইয়ের পথ। বাঁধের ঢালু-পথে তারা নামতে থাকে।

হারেস মিঞ্চীদের অনুসরণ করে।

বাঁধের কোলে পথ। তার পাশে একটা মুড়ির দোকান।

হারেস মিয়া, আলী ডাকে।

—কি ভাই।

ওই, বলিয়া আলী মুড়ির দোকানের দিকে আঙুল বাড়ায়।

—একটু দাঁড়াও, ভাই।

বাসেদের মুখে খই ফুটে: দাঁড়ালে চলবে না। তুমি মুড়ি কিনে নাও। গামছায় বাঁধো, তারপর থেতে-থেতে একদম কারখানা। সেখানে ভাল পানি পাবে। নাও, দেরী করো না।

হারেসের তীব্র উদ্যম দেখা যায় হঠাত। মুড়ির দোকানে বেশি বিলম্ব হয় না তার।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে সে ভাবে কত রোজ দেবে তা ঠিক করা হোল না। দেখা যাক।

বাসেদ, আলি ও অন্যান্য ঘরামিরা দ্রুতপদে চলে।

দেশলাইয়ের ছোট কারখানা। তারই কলেবর-বর্ধনের আয়োজন। কলের মালিক আপাততঃ খোলার চালের একটা ‘শেড’ তৈরি আরম্ভ করেছেন।

প্রায় পনর-জন ঘরামি। জন-পাঁচেক রাজমিস্ত্রী সারাদিন কাজ করে। খোলার ঘর হোলেও কোণগুলো ইটের পিলার। তাই রাজমিস্ত্রীও এই যত্নে বাদ পড়েন।

চড়া রোদুর উঠে আকাশ জুড়ে। চালে হারেস কর্মব্যস্ত। পুরাতন খোলা সাজানো হয় চালের উপর। সারা গায়ে সেই জন্য বেশি ময়লা লাগে। লুঙ্গির উপর বাঁধা লাল গামছায় ঝুল হোয়ে যায়। ঘামেও কম কষ্ট হয় না। হারেস আগেও ঘর ছেয়েছে মনিবের। আজ নতুন লাগে এই কাজ। খড় আর খোলার ভেতর কত ব্যবধান। গ্রামে খড়ের চাল-ছাওয়া অন্য রকম বিধি তার। মেটে গুরু ছড়ানো থাকে সেখানে। এক-একটা আঁটি ঝুলে বাঁধারীর মীচে পরিপাটি খড় বিছানে আর মাঝে মাঝে ডিঙির গেরো দেওয়া— সে কাজ আজকের থেকে স্বতন্ত্র। এখানে পোড়া-মাটির নিয়ে কারবার। দাগ ধরা লালচে খোলার দিকে চেয়ে হারেস আরো শ্রান্ত হয়।

লম্বা-চওড়া শরীরের অনুরূপ কতটুকু খোরাক পেয়েছে সে আজ। গাঁয়ে অন্ততঃ দু-মুঠো ভাতের কষ্ট ছিল না। সাদা বরফের কুঁচির মত রাতের স্বপ্ন একবার হানা দিয়ে গেল হারেসের মনে।

খোলা বসানো কাজ হারেস জানে না। তাই প্রথমে সে জোগাড়ের কাজের ভার নিয়েছিল। বাঁধারী বয়ে আনা, মিস্ত্রীদের ঝুঁড়ি-মাথামুক্তি খোলা পৌছে দেওয়া, টাকিটুকি ফরমাশ শোনাই হারেসের কর্তব্য।

আলি বলে তুমি খোলা বসাতে জানো? হারেস আজকাল বাঁকা জবাব দিতে শিখেছে : অনেকদিন আগের অভ্যেস। দু-একদিন দেখলেই ঠিক হোয়ে যাবে।

হারেস সেই জন্য মিস্ত্রীদের কাজের দিকে চেয়ে থাকে। আনমনা হয় না সে।

মই বয়ে বারবার চালে ওঠার জন্য তার ক্লান্তি আরো বাঢ়ে।

বাসেদ মিস্ত্রী তামাকখোর। কলকে আর তামাক তার সঙ্গেই থাকে। হঠাত হাঁকে সে: হারেস, একটু ত মাক সাজো ভাই, নিচে কলকে আছে।

চালের উপর হারেস এক বাঁকা খোলা নিয়ে বসেছিল। মিস্ত্রীদের হকুম মাফিক পৌছে দেওয়া। বাসেদ মিস্ত্রীর হাঁকে সে সন্তুষ্ট হয়। তবু খানিকক্ষণ নিচে বিশ্রাম পাওয়ার সুযোগ এলো।

বুড়ো আঁশফলের গাছ। গোড়াটায় পোকা ধরেছে। বর্ষার জল পোকা খাওয়া গর্ত ক্রমশঃ বাড়ছে। গাছের দুনিকের মোটা ছাল ঝুলে পড়েছে ঝালরের মত।

বাসেদ মিস্ত্রী তারই ভেতর তার ধূমপানের মাল মশলা লুকিয়ে রাখে। পূর্বদিকের চালেও কয়েকজন ঘরামি কাজে লেগেছে। নেশাখোরের সে-দলেও অভাব নেই। বাসেদ হঁশিয়ার লোক।

আঁশফল গাছের ছায়ায় সে তামাক সাজে। একটা সাদা ঠোঙায় একমুঠো কয়লা রয়েছে মাত্র। উপর থেকে বাসেদ মিস্ত্রী আবার হাঁকে, দু-তিনটে কয়লা দিস মাত্র, বাপ।

প্রোঢ় লোক। এই সামান্য ইতর সমোধন হারেস গায়ে মেঘে নিল। তুই শব্দ তার কাছে বড় তেতো লাগে।

কয়লা ধরে উঠে। হারেস গাছের ছায়ায় আনমনা বসে থাকে। বাঁবা করছে বাইরে গ্রীষ্মের দুপুর। শিল্পজগতের আকাশ-ছোয়া, ক্লিন্স। ট্রেনের ভইশেল, লোহা-পেটানোর আওয়াজ, সড়কে গরুর গাড়ির চালকদের হাঁকাহাঁকি। একটু শান্তি নেই। দশ মিনিট পরে যদি মিস্ত্রী একবার ডাক দিত!

কারখানার পাশে ঘন কলা-ঝোপ। পোড়ো জাঙালের মত বন্য আবহাওয়া। পাশ দিয়ে সরু সুরক্ষীর রাস্তার দাগ চোখে পড়ে। তার ওদিকে বোধ হয় নির্জন পল্লীর সীমানা শুরু হয়েছে। কান পেতে হারেস শোনে। না, এই দিক থেকে ইতর কোলাহলের ঢেউ তেসে আসে না। অঁশফল গাছের গুড়ি বয়ে এক-রাশ কালো পিংপড়ে দল-বেঁধে নিচে নামছে। সকলের মুখে সাদা সাদা কোন আহারের কণা। গাছের উপরে হারেস দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কয়েক হাত দূরে আরো কয়েক লক্ষ পিপীলিকার বিরাট ছাউনি নিশ্চল বসে আছে। বিশ্বামের জন্য এরাও তামু পাতে মাকি! ঈষৎ মোটা কয়েকটি পিংপড়ে তার ভিতর স্থির উপবিষ্ট। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হারেস। সেনাবাহিনীর বিশ্বাম দেখে সে। দু'মিনিট পরে আবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়। গাছের বাকল এতক্ষণ চোখে পড়তো না, কালো দাগ ছাড়। এখন গাছের ছাইরঙ সমতলের উপর কালো কালো সঞ্চারিণী ফুটকী নেচে বেড়ায়। কালো পাথরের একটা চাঁ যেন পাহাড়ের গা-বয়ে ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে, খসে পড়ছে।

হারেস, নিয়ে আয় বাবা কলকেটা।

চোখ ফিরিয়ে নিতে হয় হারেসকে। হঠাৎ চমকে উঠে সে। সলিম মুনশী তার আগেকার মনিব যেন এই মাত্র ডাকল। তারপুর শক্ত হোয়ে দাঁড়ায় হারেস। না, এখানে কোন মুনশীর চৌক্ষিপূর্ণ নেই। তবু চমকায় কেন সে? আঘাধিক্ষারের প্রশংস্তি সে নিজেই রচনা করে।

শ্বেচ্ছায় হারেস মইয়ের উপর ধীরে ধীরে উঠে। চালের উপর সে বাসেদ মিস্ত্রীকে কোন প্রশ্নের আগেই তার মুখ বন্ধ করে দেয়: আপনার কয়লা সামান্য ভিজে গেছে। গাছের গর্তে বৃষ্টির পানি জমে স্যাতস্যাতে হয়ে রয়েছে।

দাও বাবা, শিগগীর।

ধোঁয়া ছাড়ে বাসেদ মিস্ত্রী।

আর একবার নিচে যাও। বাখারিশুলো মুছে ফেলো। হা, তোমার কাটারী নেই। কিনে ফেলো একটা। মাতালের বোতল, ঘরামীর কাটারী। আমার কাটারী নিয়ে যাও, দেখো চটা না উঠে।

বাসেদ মিস্ত্রীর কাটারী সত্যি ধারাল আর চকচকে।

গাড়ি-গাড়ি পচানো বাঁশের স্তুপ পড়েছিল কারখানার প্রাঙ্গণে। কয়েকজন ঘরামি এখানে বাখারী তৈরি করে। দীর্ঘ বাঁশের ফটক্ট শব্দ বেরোয়।

হারেস আর একজনের সাহায্যে একটা বাঁশের কাটারী বসিয়েছে মাত্র, চালের উপর থেকে আলিও নেমে এলো।

—এই দোষ্ট।

হারেস হাসে পেছনে ফেরে।

—কি খবর ভাই !

—একটা বিড়ি খেতে এলাম। উপরে মিঞ্চী রয়েছে।

আলি বিড়ি ফোঁকে, হারেস কাজে ব্যস্ত। দরদর ঘাম বইছে তার শরীরে।

—যা গাঁটওয়ালা বাঁশ বাবা।

হারেস একটা বাঁশের বাখারী তুলতে পারল না। কয়েক জায়গায় ভেঙ্গে গেলো তারপর সে মন্তব্য করে।

—একটান ফুঁকে নাও, ভায়া।

আলি আবার ডাকে। একটু বসো ভাই। মিঞ্চীর এমন জবর কাটারী পর্যন্ত হার মেনে গেলো।

হঠাতে হারেসের মাথা ঘোরে! দুর্দান্ত পরিশ্রমের ভোগ সে সহ্য করতে পারে। আজ সহিষ্ণুতার সীমানা ক্রমশ : সংকীর্ণ হোয়ে আসছে।

আলির পাশে বসে সে বিড়ি ফোঁকতে লাগল। চোখ ধোঁয়া হোয়ে আসে তার। বাল্পা দৃষ্টি পৃথিবীর সবকিছু অবিকল স্পর্শ করতে পারে না। খড় খড় প্রতিভাস চকিতে মিলিয়ে যায়।

নিজের দুর্বলতার কাছে হারেস হার মানে। *

—আলি-ভাই, আজ সকাল-সকাল একটু ছুটি দেবে না মিঞ্চী। কাল থেকে পেটে দানাও পড়েনি।

বড় লজ্জা পায় হারেস। বাসেদ বিজের মত মাথা দোলায়।

—ছুটি চেয়ো না। তুমি আমার সঙ্গে আগাড়ে দাও। চুপচাপ বসে থাকবে।

হারেস কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি বিনিময় করে।

চলো, উঠে পড়ো। তাড়া দিল আলি।

তিন-গাছা বাখারী হাতে হারেস চালের উপর উঠে এলো।

—বাসেদ চাচা, হারেস আমার এদিকে থাক। তুমি কাসিমকে ডাকো। জোয়ান লোক দরকার আমার।

হারেস কোমরের গামছা বেঁধে এগিয়ে গেল। দুপুর ঢলে পড়ছে, এবার বিশ্রামের ছুটি।

হারেস একবোধা বাখারীর উপর সটান লম্বা শয়ে পড়ল। অন্যান্য মিঞ্চীরা মুড়ি খায় আর গল্প করে। হারেসের ঘূম আসে না। শ্রান্ত দেহ শুধু এলিয়ে পড়ুক। ক্ষধার্ত পেশি-নিচয় শীতের সাপের মত বিশ্রাম পাক ক্ষণিক।

একটা ঝুপার চকচকে টাকা হাতে আঁশফল গাছের নিচে হারেস বিদ্যম্বে চেয়ে থাকে। এতো অভাবনীয়। এক টাকা রোজ তার! তার নিজের একটা টাকা ঝুপে রৌপ্য চাকতি সে এই জীবনে প্রথম দেখল। গাঁয়ে সারাদিন মুনিশ খেটেও ছ-আনার বেশি কেউ রোজগার করতে পারে না।

শহরকে নতুন চোখে দেখে হারেস। সকাল থেকে কত অভিযোগ ঘৃণা জমে উঠেছিল তার বুকে, সব নিমিষে মুছে যায়। হারেস ক্লান্ত মজুরদের অনুসরণ করে।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে একটা ট্রেন চলে গেল, ইঞ্জিনের ফিনকি আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। চিমনীর ওপারে জমেছে বর্ণ-বিচ্চি মেঘ। গোধূলির আধো অঙ্ককার পটে ঝাকড়া

শিরীষ গাছের অবয়ব কালো-রেখা-সমন্বিত। কোন ফুল নেই, পাতা নেই, এই গাছে যেন। শুড়ি থেকে দশ গজ দূরে মোটা দুটো ডালের খাড়াই, তার উপর বসে আছে একটা সঙ্গীহীন কাক। এই নীরিহ বায়সও শুধু অবয়বে নিজের পরিচয় হারিয়ে ফেলে না। আবছায়ার ফাঁক দিয়ে শুক্র আকাশ মৌন। নিচে মানুষের পৃথিবীর কোলাহলে-বিলুপ্তিরে রাত্রির অভিনন্দন জানায়।

একে একে ফুটে উঠছে গ্যাসের আলো পথের প্রাণ্টে প্রাণ্টে। শিল্পকেন্দ্রের সায়ঃ-সঙ্গীত শ্রান্ত হারেসের কানে সম্মোহনীর মদিরা ঢালে। শ্রান্তি, শ্রান্তি। ঝুপার চাকতিটা সে ফুতুয়ার ময়লা পকেটে বার বার আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে। গ্রামে আর সে ফিরতে পারে না। আশ্রয়দাতা সলিম মুনশীকে বেইজ্জত করে এসেছে সে। আর কোন আশ্রয় নেই। গ্রামের এত মায়াই বা কেন? জন্মভূমি। জন্মভূমি তার কাপড় ঘোগাতে পারে না, পারে না উদরপূর্তি দুর্ঘাটে অন্ন দিতে। ভিখারিনী মা স্বামীর ভিটের মায়া কাটিয়েছিল। গোলামীর মহতা পরিত্যাগ তার পক্ষে আরো সহজ, আরো সহজ।

খাওয়ার সময় চলে গেছে। ক্ষুণ্পিপাসা পর্যন্ত এখন বিশ্বামরত। শুধু শরীরটা মাটিমাটি লাগছে। আর কোন কষ্ট নেই হারেসের। নিমাঞ্জিনের পকেট কঠি-তটে এক ভরি ঝুপাসহ দুলছে। তার তেতুর হাত পুরে দিল হারেস। যদি পথে সারাদিনের রোজগার খোয়া যায় কল্পিত আশঙ্কায় তার মুখে কাল দাগ পড়ে।

আলি, বাসেদ, শুকুর আরো ঘরামীরা কেউ হারেসের সম্মুখে, কেউ পেছনে। সকলেই নানা কথায় ব্যস্ত। হারেস শুধু নিষ্ঠন। সে আজ অস্থাকেন্দ্রিক উর্গায়। জাল বুনে চলেছে সীমানাহীন। অষ্টৈ জলে ঘৰ্ণ্যমান নৌকার মন্ত্র পাকনা-খাওয়া স্নোত স্নোতস্তরে সে শুধু দিক সামলায়।

আবার লাল ব্রিজের বাঁধ। সন্ধিময়দেকে গেছে ব্রিজের রঙ। মাথার উপর দুটো লাল নক্ষত্রের মত ছোট আরো সংকেতের নিশান খাড়া করে রাখে।

ত্রীজ পার হোয়ে আরও অনেক দূর আনমনা এগিয়ে এসেছে হারেস ঘরামিদের সঙ্গে। কিন্তু কোথায় চলেছে সে? নিষ্ঠুর ব্যস্তের মত প্রশ্নটা তার মেরুদণ্ডে একবার নাড়া দিল।

আলি হঠাৎ উদ্ধার করল তাকে।

—তোমার বাসা কোন্ দিকে, হারেস খুব পরিচিত হন্দ্যতার সুর। বহুদিন-কার চেনা যেন হারেস।

আমার বাসা।— হারেসের মুখে আর কথা ফোটে না। সলিম মুনশীর সামনে যেন সে দাঁড়িয়ে আছে।

— তোমার বুঝি বাসা নেই। রাত্রে বাসা ঠিক করে নাও।

আলি দুষ্টির হাসি হাসে। হারেস এই রসিকতার কিছুই উপলক্ষ করে না।

—না ভাই। আমি মোটে কাল দেশ থেকে এসেছি কি না। চুপ করল হারেস। আলি চলার সময় একটা বিড়ি ধরায়। বাসেদ মিঞ্চি সকলের আগে আগে।

—তোমার বাসা নেই। বেশ লোক ত। এসেছ শহরে। এখানে মাঠ ঘাট নেই যে পড়ে থাকবে। পুলিশে ধরবে।

পুলিশের নামে হারেস আতঙ্কিত হয়। বোবা শিশুর মত সে আবার নিজেকে অসহায় মনে করে। বাইরে ঘূমানোর জন্য লাল-পাগড়ির সুনজর উপভোগ করতে হয় শহরে।

রেলওয়ে ইয়ার্ডে হাজার পাওয়ারের ফ্লাড-লাইট জুলছে। শাস্টিৎ-এ যাচ্ছে গাড়িগুলো। দিনের আলোর মত কাজ চলছে চারিদিকে। বিশ্রাম ভুলে গেছে মহানগরের মানুষ। সমগ্র শহর এখনই হারেসকে গিলে ফেলবে বোধ হয়। না, আর এই দানব-পূরীর কুন্ডানলে এক মুহূর্ত নয়। নিমাঞ্জিনের পকেট কটি-তটে জানান দেয়। টাকার উপর আঙুল চালায়, খানিক পরে পরে মুখ খোলে হারেস।

—পুলিশে ধরে, সত্তি?

—সত্তি নয় ত ঝুট। রাতে যদি চুরি করতে বেরোও।

—তৌবা!

আলি উচ্চাস্থে হাসে, তৌবা! একদম সত্য পীর। তোমার মত যদি চোরও তৌবা বলে।

—তা হোলে আজ ইস্টিশনে রাত কাটাব।

—সেটা মন্দ যুক্তি নয়।

আলি সহজে দমে না। ইস্টিশনে পুলিশও আছে। গাঁট-কাটাও আছে। সে ত আরো জ্বালা। গ্যাসের আলো পড়ে হারেসের মুখে। আলি সেদিকে তাকায়। কালো কৃয়াশালেপা মাঠের মত হারেসের মুখাবয়ব।

—শোনো। শহরে কোথাও সহজে রাত কাটানো চলে না। তবে একটা জায়গা আছে।

নিজের বাক্য অসমাপ্ত রাখে আলি। ক্ষেত্রসূক হারেস জিজ্ঞেস করে, কোন জায়গা?

—সে তোমার দ্বারা হবে না। ক্ষেত্র নেহায়েৎ গেইয়া।

হারেস কথাটা গায়ে মেখে নিল। অবিশ্য রাগ হয় তার। তার অঙ্গতার সুযোগ নিতে আলি কসুর করে না।

—তবে এক কাজ করো, আজ আমাদের ওখানেই চলো।

আলিকে বোবা মুশকিল। হারেসের চোখে সে একটা গোলক-ধাঁধা বিস্ময়। অথচ দিলখোলা মনে হয় তাকে। তার প্রমাণ সে নিজেই দিতে বিলম্ব করে না।

—তোমাকে নিয়ে রংগড় করা যাবে। আর কখনও শহরে আসনি। বেশ লোকত। অথচ মেদিনীপুরে বাড়ি।

হারেস বলে, গরীব মানুষের ছেলে। আমাদের অত সখ কিসের?

—রাখো বাজে কথা। আমি মিত্রীকে বলছি।

আলি এগিয়ে গেল দ্রুতপদে। দুমিনিট পরে সে আবার হারেসের সামিল হয়।

—দোষ্ট। কেল্লাফতে। মিত্রী বলে, তাল-ই হল। বাসার ভাড়া কমে যাবে।

বাসেদ এই দলে বয়োজ্যষ্ঠ ব্যক্তি। ঘরামির কাজেও নিপুণ। এই জন্য সকলে মিত্রী বলে ডাকে।

—বাসাটা মিত্রীর। তাই একবার জিজ্ঞেস করে নিলাম।

ভারী উপকার করলে।

কৃতজ্ঞ হারেস আলির দিকে চোখ ফেলে না। আনন্দমনা তারা শহরের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে কখন, সারি সারি গ্যাসপোস্টের আলোকমালায় আলি হঠাতে অনুভব করে।

—হারেস, আর বাসা ফিরতে দেরী নাই। তোমার কটা জিনিষ কেনা দরকার। একটা মাটির বাসন আর পেয়ালা।

—কি হবে?

—ভাত খাবে না? না, চোরের ভয়ে তুমি মাটিতে ভাত তরকারী ঢেলে খাবে।

হারেস লজ্জিত হয়।

—তোমার আরো দুটো জিনিস দরকার। গামছা। ঘরামির কাজে হরদম লুঙ্গি পরে ঢেলে না। যা ময়লা উঠে।

হারেস সম্মতি দিল। গামছার দাম দেওয়ার সময় হারেসের কষ্ট হয়। ছ'আনা ছ'গশা কড়কড়ে পয়সা দোকানদার কেটে মিল। ক্যাশ-বাস্কের দিকে হারেস চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তামার পয়সায় পকেট আরো ভারী হতে থাকে। সেইটুকুই সান্ত্বনা।

দোকান থেকে বেরিয়ে আলি বলে, এক পয়সার বিড়ি খাওয়াও, দোষ্ট।

হারেস একটা তামার পয়সা বের করে দিল। হঠাতে দরাজ হয়ে উঠে না তার মন। আলির পাণ্ড্য পড়ে তার রোজগরের আনন্দ মাটি হয়ে যাচ্ছে।

কুমোরের দোকানে আর দু'আনা গেল।

গলির মুখে এসেছে তারা, আজও বৃষ্টি নামলুঝির্কর শব্দে। হারেস আলির দ্রুত পদক্ষেপের উপদেশ পালন করে। দৌড়ে কেন্ত্বিলাভ এই। দু-বালক বৃষ্টির ছেঁয়াচে দু'জনেই বেশ ভিজে গেল।

—গোসল হোয়ে যাক। দুপুরে বড়বেয়েমেছি।

আলি বলে।

হারেসের কোন আপত্তি নেই। তার বাড়তি কাপড় কোথায়, সেজন্যেই একটু অশ্রোয়াত্মি।

কোন পথই চেনে না হারেস। গোলক-ধাঁধার মত অঙ্ককার পথে তারা চলে।

আবার দেখা যায় ইলেকট্রিক আলো। হারেস চেয়ে দেখে সম্মুখে একটা মসজিদ। খুব জরাজীর্ণ হোলেও ভেতরে চুনকামের জোলুস রয়েছে। কয়েকটা বাড়বাতি ঝুলছে। ইলেকট্রিক বাল্ব জুলছে মসজিদের দরওয়াজায়। ইমাম সাহেব কোরান তেলাওয়াত করছেন। আল্লাহো আলা কুল্লে সাইয়িন কাদীর... হারেসের কানে স্পষ্ট তার প্রবাহ-নিনাদ।

এইখানে কী তাদের গন্তব্য শেষ?

আলি হারেসকে নিয়ে মসজিদের পাশে আর একটা আঙ্কা-গলির ভেতর ঢুকলো।

মহানগরীর অট্টালিকা শ্রেণী বিদ্যুতের আলোয়-আলোয় সমুজ্জ্বল। চাঁদের আলো এখানে থমকে দাঁড়ায়। বিধি-নিষেধের বেড়ি ভীত প্রকৃতি। মানুষের দস্ত ইটে-ইস্পাতে মূর্ত হচ্ছে দিবারাত্রি। সকলের জন্য এই দস্ত নয়।

বাসার ভেতর ঢুকে হারেসের নিঃশ্বাস বক হয়ে আসে। এইখানে আদমের সন্তানেরা

বাস করে? আটফুট বাই ছয়ফুট ছিটে বেড়ার কামরা। তারই ভেতর সাতজন প্রাণীর মাথা-গোঁজার ঠাই!

বাসেদ মিঞ্চী আগেই পৌছেছিল। সে হারেসকে প্রথম অভিনন্দন জানাল: এসো। কাপড় বেড়ে ফেল। একদম ভিজে গেছ যে। ভাল, তোর একটা ছেঁড়া লুঙ্গি দে, বাবা।

কাপড় ছাড়তে লাগল হারেস। চোখ তার খোলা থাকে। ছেট খোলার ঘর। নিচে শ্যাওলা লাগে। এইজন্য কয়েকটা দরমা বিছানো মেঝের উপর। একদিক খালি পড়ে রয়েছে।

বাসেদ মিঞ্চী বলে, হারেস তোমার মাথার উপর দুটো দরমা রয়েছে। বিছিয়ে নাও।

বোৰা যায়, সারাদিন দরমা বিছানো থাকে না। স্যাতস্যেতে মেঝেয় ক'দিন বা দরমা টিকিবে। ঘরামিরা কাজে যাওয়ার সময় আবার দরমা উপরে কড়ি-বাঁশে তুলে রাখে। এ-ঘরে কড়িকাঠ নেই। সেইজন্য কড়ি-বাঁশ!

টানা দড়ির উপর আরো অনেকের কাপড় শুকাচ্ছে। হারেস নিজে আর্দ্র বসন হাতে ইতস্ততঃ করে, নিংড়ানোর জায়গা খুঁজছে সে।

বাসেদ মিঞ্চী ইশিয়ার লোক। বলে: যাও বাইরে কাপড় নিংড়ে এসো।

উপদেশ অন্যায়ী হারেস বাইরে দাঁড়িয়ে জরিপ করে চারিদিক। এই বাসার পাশে আরো দুটো খোলার ঘর। কিন্তু এক চৌহানি ঘেরা। একটা সদর দরজাও আছে। চট বুলছে। আলির সঙ্গে আসার সময় অক্কারে এই স্থানেই সে এসেছিল। উঠান নেই এতটুকু। দেড়হাত চওড়া হবে না বাড়ির ভেতরভুক্তির পথ। সম্ভবতঃ উঠানের অভাব এই সংকীর্ণতার ভেতর মেটানো হয়। একটা বুদ্ধিশেয়ারা গাছ দেওয়ালের পাশ দিয়ে উপরে বিরল ভালপালা মেলে দিয়েছে। তার ফ্রেজায় কয়েকটা ভাঙ্গা কলস উপুড়-করা।

বৃষ্টি তখনও থামেনি। প্রতিবেশীদের ঘরে আলো জুলছে। তাদের দাওয়া আছে ঘরের। বাসেদ মিঞ্চীর বাসায় সে সৈরের বালাই নেই। চরম দীনতার এইদিক হারেসকে পীড়িত করে। গরমের সময় সে ঘুমোবে কোথায়? ঐ ঘরে জানলা নেই, দাওয়া থাকলে চলত, তা থেকেও আল্লার মরজী তারা বন্ধিত। প্রতিবেশীদের হিংসা হয় হারেসের। সৌভাগ্যবান বটে ওরা!

ঘরের এক কিনারায় উঠান-চুলায় রান্না চলে। কাঁচা কয়লার ধোয়া বহুক্ষণ ঘিরে আছে আনাচে-কানাচে। নিঃশ্বাস-গ্রহণে হারেস বুবতে পারে। ক্ষুধায় অবশ শরীর। ইঁড়ির দিকে চেয়ে শ্বেয়ান্তি পায় হারেস। অপরিচিত পরিবেশে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। ল্যাম্পের আলোয় একদিকে আলি মিঞ্চীর সঙ্গে পেঁচিশের কড়ি চালছে। শুকুর মাঝে মাঝে ইঁড়ির আধেয় পরীক্ষা করে যায়। হারেসকে কেউ ফাই-ফরমাশ করে না। মেহমানের মর্যাদা তার অঙ্কুণ। বৃষ্টির জন্য ঘরটা ঠাড়া। হারেস খুব অশোয়ান্তি বোধ করে না তাই।

খাওয়া-দাওয়ায় অনেক রাত্রি হয়ে যায়। হারেসের বালিশ নেই, আলি তার ছেট বালিশের অংশীদাররূপে তাকে আমন্ত্রণ জানাল।

আবার কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে হারেসের মাথা। কিন্তু ঘূর্ম আসে না তার। আকাশের নিচে যারা দিন শুজরান করে, পেটরা বন্দী হওয়া তাদের কাছে লোভনীয় নয়।

আজ খোরাকি পড়েছে মাথাপিছু চার আনা। হারেসের পয়সা মিঞ্চী নিজে দিয়েছে।

আপনি করেছিল হারেস। মিত্রী বলেছিল এক বেলার জন্য আর কি খোরাকি দেবো?

সহানুভূতির অর্দ্ধতায় হারেস অনেকটা আরাম পায়। তবু এই আবেষ্টনীর ভেতর সে বেশীদেন থাকবে না। কিছু সম্ভয় তার প্রয়োজন। শুধু সে কয়দিনের জন্য প্রতীক্ষা। গ্রাম, গ্রামের ফসল আর মাটির আহ্বান সে কী করে ভুলবে?

নর্দমা-পচা ভ্যাপসা গন্ধ আসে থেকে থেকে। হারেসের মাথা ধরে। তন্ত্রাক্রিট দুই চক্ষু, তবু ঘূম নামে না।

আলির নাক ডাকে, সে আর এক বিপদ। বড় সঙ্কুচিত হারেস ভাল করে পাশ ফিরে উঠে পারে না। পাছে কাউকে লাথি লাগে। দরমার উপর খেজুর পাতায় তেলাই-পাটি বিছানো, তবু স্যাতস্যাত করে পিঠ। মেরুদণ্ডে কে যেন বরফের কৃতি বসিয়েছে।

অনভ্যন্ত জীবনের নতুন অধ্যায়। হারেসের বিদ্রোহী মন তারমুরে হ্যাত চীৎকার করে উঠবে :হে আল্লা, আমাকে প্রাণ ফিরে দাও। এক ফালি জমি, দুটো বলদ একটা কুঁড়ে। আর কিছু নয়, হে-রহমানের রহীম। সারা দুনিয়া তোমার। তোমার গুণাগার বান্দাকে এতটুকু নেয়ামত তুমি দিতে পারো না? তোমার ভান্দার কী শূন্য হয়ে যাবে? এতদিন যে আলো-বাতাস তুমি দিয়েছিলে তাও আজ বদ্ধ করে দিলে?...

বৃষ্টির আওয়াজের পিঠে এতরাত্রে হারমোনিয়ামের স্বর ভেসে আসে। বন্তীর কোন মাতাল গান করছেঃ পিলে, পিলে, মোরি রাজা।

হারেসের হাসি পায়। পিলের বেদনায় এতরাত্রে কে আবার গান জুড়ে দিল? তার জন্য রাজার কাছে আবেদন!

দুতিন মাসের ভেতর পাড়া আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে হারেসের উন্নত পরিচয় ঘটে। অভ্যাসের অনুষঙ্গ এক রকমের আস্বাদও পায় হারেস এই জীবনে। পলাতক হওয়ার কোন পথ নেই। আসামের চা-বাগানের কুলীর মত শুধু প্রাচীর-প্রবেশের সময় বা বাইরের জগতের জন্য মমতা উচ্ছলিত হয়ে উঠে। তারপর প্রভুদের দৃর্শ্যের ভেতর সেঁধোলে ধীরে ধীরে বাহির-পৃথিবীর মৃত্যু ঘটে। হারেস জানে, সঞ্চয় দরকার, নচেৎ শহর-ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই তার। আরিফের গায়ে যেতেও এক টাকা ভাড়া লাগে। এই পরিছদে সে বন্ধুর বাড়ি যেতে পারে না। তার আতিথেয়তার জন্য প্রস্তুতিও দরকার। বন্ধুর স্ত্রী আছে। ছেট ছেলে আছে। তাদের কাছে খালিহাতে যাওয়া দৃষ্টিকূট। প্রথম যেদিন দেশলাইয়ের কারখানার কাজ শেষ হয়ে গেলো, হারেস আরো অনুভব করে, খোদার দরবারে রোজগারের পথ রোজ খোলা থাকে না। শহরে বেকার বসে-বসে খাওয়া নিজের মাংসে উদরপূর্তির সমান। পুঁজি ভাঙ্গতে হয় দিন-দিন। তিন দিন বেকার বসেছিল সে। যত্নগাদায়ক তার চেয়ে আর কিছু নেই হারেসের কাছে। বাসেদ মিত্রী নতুন কাজের সক্ষান এনে মৃত ধড়ে প্রাণ সঞ্চার করে। ঘরামিদের ভেতর তার খাতির অহেতুক নয়, হারেস-বোঝে। অবশ্য বাসেদ মিত্রী তার জন্য এক আনা দু-আনা কমিশনী পায়।

প্রথম প্রথম মিত্রীর এই উপরি-রোজগার সে সমীহর চোখেই দেখেছিল। আজকাল দু-আনা পয়সা দিতে তার কষ্ট হয়। কৃতজ্ঞতা আর চক্ষুলজ্জার জন্য সে চুপ করে থাকে।

আলির মত বেপরোয়া জওয়ান পর্যন্ত টু শব্দ করে না।

যন্ত্রায়িত জীবন এখনও দূরে।

হারেস কৃপণের মত কিছু সঞ্চয় করে, যদিও খুব সামান্য। ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা চোখে মরীচিকা টেনে আনে। মাঝে মাঝে আসে জগন্দলের মত দিন, খরা গ্রীষ্মের রাত্রি। দরমার উপর ছট্টফট করতে হয়। হারেস এই জন্য বাইরে রোয়াকে শোয়। অবিশ্য এই বাড়ির সীমানায় রোয়াকের কোন চিহ্ন নেই। কলা-বিবির বস্তির মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পাড়ার রান্না, স্নান, কাপড়-ধোওয়ার জন্য এই পানি ছাড়া কোন উপায় নেই। কলের জলে শুধু পিপাসা মেটে। বস্তি অঞ্চলে সবাই হারেসের বাড়িওয়ালার মত নয়। আরো বাড়িওয়ালা আছে যাদের ভাড়াটে ঘর যাই হোক, নিজেদের বসত বাড়ির রঙ আলাদা। পুকুরের পূর্বকোণে এমনই বাড়িওয়ালার এক রোয়াকে সে শয়ে থাকে। রাতে ভয় কর নয়। পাড়ার বেলেঘার দল হল্লা হবে; যখন তার পাশ দিয়ে মাতলাঘির অভিনয় চলে, হারেস ঘুমের ভানে পড়ে থাকে নিজীবের মত। স্বাস্থ্যের জন্য, এমি তয় লাগে এই সব ছোক্রাদের। পরনে সিলকের লুঙি আর গেঞ্জি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পানের পিকে দাঁত-রাঙা শহরের বিপজ্জনক মনে হয়। হারেসের নিঃসঙ্গ গ্রাম্য-মন এই সব মানুষদের ঠিকানা জানে না। পাহাড়াওয়ালা দাগী আসামীর সঙ্গানে কোন কোন রাত্রে সুপটি মেরে আসে। হারেসকে একদিন রূলের গুঁতোয় পাহাড়াওয়ালা জাগিয়েছিল। তয় পেয়েছিল বৈকি হারেস। আজকাল আর সে-তয় নেই তার। প্রাত্মক করে। আলি পশ্চিম কোণে কোথায় পড়ে থাকে। অবশ্য সে ঘুম ছেলে। পাড়াত্তি এমন বহু ছেঁড়ার সঙ্গে তার মাঝামাঝি বেশি। পশ্চিম-উত্তর কোণে একটা 'কেলাই' আছে তাদের। আলি সেখানে প্রায় যায়। হারেসও একদিন গিয়েছিল। সেই একসময় মাত্র। দেওয়ালে বহু উলঙ্গ নারী-মৃত্তির ছবি আর ক্লাবের সভ্যদের রসিকতা সে বরদাস্ত করতে পারে না। এইখানে থেকেই সেদিন রাজার কাছে আবেদন গড়িয়েছিল। আলিও ঢালাই-পিলাইয়ে ওস্তাদ। তার প্রতি এক রকমের সহানুভূতি-মাঝি ঘৃণা পোষণ করে হারেস। অথচ আলি খুব খারাপ লোক নয়। এই বাসায় আসার পরদিন রাস্তার পাকা পায়খানাটা পীরের আস্তানা বলে হারেসকে সালাম করতে বলেছিল। বেচারী সে, আলির ধূর্তামির কাছে। বাসেদ মিত্রী-ও সেদিন হেসেছিল, নৃতন লোক পেয়ে তোরা যা-তা শুরু করেছিল। দু-মাস যাক, হারেস তোদের এক হাটে কিনে এক হাটে বেচবে। মিত্রীর ভবিষ্যবাণী ঘোল আনা পূর্ণ হয়নি। শহরে জীবনের আট-ঘাট তার অচেনা নয়, অবশ্য আলীর কাছে সে এখনও ছেলে-মানুষ। পারবে সে ইতর গুণাদের সঙ্গে মিশতে? পাড়ার এক পকেট-মার আলির বক্স। হারেস লোকের সঙ্গে এখনও ভাল করে হিন্দী-জবান চালাতে শেখেনি। তার বাড়িওয়ালারা বাংলা, হিন্দী, উর্দ্ধ জবানের খুঁড়ী দিয়ে বেশ কথা বলে। হারেস তত কায়দা-দোরস্ত নয়। বাড়িওয়ালা মেহেরালি খাঁটি শহরে বাসিন্দা নয়। গ্রামের সঙ্গে পঁচিশ বছর আগেও যোগ ছিল, আজ তা নাম-মাত্র। বাড়িওয়ালার ছেলে তাদের পুরাতন গাঁয়ের এক মেয়ে বিয়ে করে এনেছে। গাঁয়ের সঙ্গে নতুন করে মিতালি পাতানোর চেষ্টা। বাড়ি ভাড়া দেয়, ওরা-ও কিন্তু বড়-লোক নয়। বাড়িওয়ালার আবাজান চল্লিশ বছর আগে শহরে এসেছিলেন। গাঁয়ে তার স্ত্রী ছিল। এখানে ছিল রক্ষিতা। এই সম্পত্তি সে-ই বিমাতার। নিঃস্তান বলে

সে সতীনের ছেলেদের লিখে দিয়ে গিয়েছিল। পিতার পাপের পশ্চাতে এমন লুক্ষায়িত আশীর্বাদ ছিল, বাড়িওয়ালা আজ তোয়াজের সঙ্গে তার গল্প করে। ইম্পাতের কারখানার মিট্টী, ছাঁটাইয়ে পড়ে চাকরি গেছে, তাই বাড়ির আক্রম মাটি করেও মেহের আলি বাসেদকে একটা কাম্রা ভাড়া দিয়েছিল সাত টাকায়। এক ঘরে পিতা, অন্য ঘরে থাকে পুত্র। বয়টে ছেলের সঙ্গে মেহের আলির প্রায় দাঙ্গা বাধে। আলির বক্সু সে। মাঝে মাঝে তার বিবিজানের রান্না তরকারী পাঠায় নাসিম আলির জন্য। হারেসের এমন হৃদ্যতা নৈপুণ্য কোথায়? সংগ্রহের মরীয়াপণ তার জগতের সীমানা আরো সংকীর্ণ করে ফেলে। ছেট কাঠের বাক্স, তালা-চাবি পর্যন্ত হারেস কিন্তে ভুলেনি।

যেদিন অবেলায় বাসা ফেরে হারেস প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ করে। পাশের খোলার ঘরে থাকে ফরিদপুরের একদল ছাতাওয়ালা। তার পাশে কয়েকজন ফেরিওয়ালা। তাদের ব্যবসা খাতু অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। আমের মৌসুমে আমফেরী, নচেৎ পেঁয়াজ অথবা আলুর ব্যবসা। একজন সন্ধ্যাবেলা গোস্ত ফেরী করতে বের হয়। কসাইদের অবিক্রীত গোস্ত রাত্রে বস্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা সন্তায় কেনে। এই লোকটার নাম কাসেম। মাথায় চালী, তার উপর বসান একটা ল্যাস্প, কাসেম হেঁকে যায়: হাওড়া, চায় হাওড়া। গোরুর গোস্ত হাওড়া। শিয়ালদহ খাসী বা ধাতীভাগলের গোস্ত। এই অঞ্চলের যারা খবর রাখে না, এমন বাসিন্দারা কাসেমের হাঁক শুনে তাকে পাগল ঠাওরাবে সহজে। ছেঁড়া লুঙ্গ পরা একটা লোক হাওড়া নিলামে বিক্রি করতে চায়। উন্নাস্ত ত বটেই। ছাঁটের গোস্ত মাঝে মাঝে বাসেদের বাসায় ওঠে। নচেৎ তারা সকলেই নিরামিষ-ভোজী। আদা-রসুনের পয়সা খরচ হারেস পছন্দ করে না।

ছাতাওয়ালাদের বাসা হারেসের জন্ম-আকর্ষণ, কারণ এখানে পুঁথি পড়া হয়! বর্ষার দিনে ওদের চুলায় রান্না চলে; আর পুঁথি সুর করে পড়ে কেউ। সোনাভানের পুঁথি, জৈগুন বিবির পুঁথি, বীর হানিফার লড়াই। যেদিন গুলে বাকাউলী পড়া হয় সেদিন আরো লোক জমা হয়। রজব মোহাম্মদের গলা সানাইয়ের মত, সবাই মন্তব্য করে। সকালে বাঁটের বাণিল, ছাতার কাপড়, শিকের বোৰা কাঁধে সে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যার আগেই ফেরে, তারপর পুঁথি নিয়ে বসে। বাসার অন্যান্য কাজ থেকে সে রেহাই পায়। বৃষ্টির দিনে বাসায় রান্নার পালা পড়ে এই জন্য হারেস হ্যাত বের হতে পারে না, কিন্তু তার কান খাড়া থাকে। গাঁয়ে বহুবার সে পুঁথি শুনেছে। মহরমের সময় সলিম মুনশী পর্যন্ত দশ দিন শহীদে কারবালা পড়তেন। শহীদ ইমাম ও তার পরিবারবর্গের দুঃখ-কাহিনী হারেসের চোখেও আন্ত অশ্রুধারা। পাঠক স্বয়ং কাঁদতেন। আলিও পুঁথি পড়তে পারে, তবে রজবের সমান নয়। হারেস লেখা-পড়া জানে না। তার কম দুঃখ নয় সেই জন্য। আলির গুণের সীমা নেই। রজবের সঙ্গে আলির হামেহাল মেশামেশি।

আলি বড় রাগায় রজব মহাম্মদকে।

—ও ছাতি হারাবে, তাই। কটা ছাতি হারালে?

রজব কোন কোন দিন রাগে জবাব দেয় না।

—তোমার ছাতি ত একখানা। রোজ একবার করে হারাও নাকি? মনজুও ছাতি একবার হারিয়েছিল।

—খামাখা ফাইজলামি, বালা না ।

আলি নাছোড়বান্দা ।— এই দেখ আমার ছাতি । তারপর সে ছত্রিশ ছাতি ফুলিয়ে আটগ্রিং ইঞ্জিং করে ।

হারেস বলে, তুমি খামাখা রাগাও । রজব ভাই, আজ শাহ এমরানের পুঁথিটা পড়ো ।

আলি আবার বলে, তোমার হালার বোনের খবর কী? রজব তখন বাঁশের মাচা থেকে পুঁথির দণ্ডের পাড়ে ।

—চটে গেনে দোষ্ট । আচ্ছা, শীতের দিনে তোমরা হাল গায়ে দাও, না শাল গায়ে দাও?

মেদিনীপুরের আরো ঘরামি থাকে অন্যান্য বাসায় । পুঁথি শোনার জন্য তারাও জয়া হয় । সকলে হো হো শব্দে হেসে ওঠে ।

রজব খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে । তারপর মিষ্টি গলায় শুরু হয় তার পুঁথি-পাঠ । তখন আলিও চুপ করতে বাধ্য হয় । নুরনেহার বিরি করুণ কাহিনী তিনশ' কত বছর আগেকার গ্রাম্য কবির লেখনী আঁকা :

তুফান হৈলা সে বছর থোদার গজব ।
সাগরের জলোচ্ছাসে ভাসি গেল সব ॥
জলস্তুল একাকার করল মওলাজি ।
চলের পানিতে ডুবি মৈল যত নাম্বুজ-মাবি
শতে শতে মরল মানুষ, কারে কেবা চায় ।
ঘরের চাল ভাসি কেহ পড়ল দরিয়ায় ॥
গরু মরল, মহিষ মরল, তুফান হৈল ভারী ।
ধানের দর চড়িয়া হৈল টাকায় পাঁচ আড়ি ।
কেহো বেচে ঝী-পুত্র, কেহো বেচে মেয়ে ।
পেট ফুলিয়া মরে কেহ সিঙ্ক পাতা খেয়ে ।

বড় মিষ্টি রজবের কষ্টস্বর । ক্লান্ত দিনের শেষে শ্রান্তি-হর আনন্দের সংষ্ঠিত মাধুর্য তার কষ্টে প্রকাশ পায় ।

রজব হয়ত নাক পরিক্ষারের জন্য পড়া বন্ধ করে । তখন আলি হাঁকে : ছাতি হারানোর কাজ কে করিবে রদ । তার সাক্ষী আছে ভাই রজব মহম্মদ ।

আবার হাসির হররা চলে । আলি রজবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, রাগ করছো, দোষ্ট, মাথার কিরা?

দু-জনে দৃষ্টি বিনিময় হয় । রজব হাসে আর পড়া শুরু কলে ।

ফেরিওয়ালাদের বাসায় ছোটখাট ব্যাপারে মাঝে মাঝে বড় ‘কাইজ্যা’ বাধে । সেদিন পাড়ার অনেকের বিশ্রামস্তুল থাকে না । নচেৎ পরিশ্রান্ত দিনের দুঃখ-লাঘবের এমন জায়গা আর নেই । বাসেদ মিস্ত্রী পর্যন্ত আসরে জয়া হয় ।

হারেসের খুব ভাল লাগে পদ্মা-অঞ্চলের এই মানুষদের । শহরে ছোড়াদের চেয়ে তার মন বেশি টানে ছাতাওয়ালা নিরীহ জনেরা । আলি এখানে আসে, এইটুকু হারেস পছন্দ করে না । এই একটা মাত্র জায়গায় সে প্রাণ খুলে হাসতে পায় ।

মুক্তির নিঃশ্বাস এসে লাগে চারিদিক থেকে। হারেস অনুভব করে, কারো তোয়াক্তা নেই আর। তার টাকা সে ইচ্ছামত খরচ করতে পারে। সখ- মেটানোর ভার তার নিজের উপর। শরীর আর সামর্থ যদি থাকে, উজ্জ্বল দিনের আলো লাগবে বৈকি ভবিষ্যতের উপর। সলিম মুনশী নেই এখানে। দৈনন্দিনতার নিষ্ঠূর নিষ্পেষণ স্বতঃই অভর্তিত। পিঙ্গরবন্ধ জীবনের শেষ আর্তনাদ দিগন্তের মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু গঠনের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ব্যক্তিত্বের সৌধ-রাজি।

মহানগরে বর্বর সংকীর্ণতার মধ্যেও আগামী দিন ধূলিশ্বাই হয়ে যায়নি। কি দিত তাকে আশ্রয়-দাতা সলিম মুনশী? পুরাতন পরিশ্রমের কোন মূল্য ছিল না। দাসত্বের হাটে কানা-কড়ি বিনিয়ম চলত না তা দিয়ে। শ্রমের প্রতি বিন্দুর সঙ্গে আজ সওদা-সন্তার জড়িত। হাতছানি দিয়ে যায় আকাশ আর পৃথিবী। অদম্য স্পন্দনে হারেস আজকাল কথা বলে। কথা বলে না ত সে, তার ইচ্ছার বাঞ্ছয় রূপ করে পড়ে মুখ থেকে। হাসির উচ্ছ্বসিত স্নোত উদ্যমের নতুন বীজ-সংগ্রহে ভেসে চলে বাক্য-বাক্যান্তরে। মহা-নগর যদি দিত বাতাসের এক ফোঁটা ঝল্কা নিঃশ্বাস, দিত যদি এক ফালি সূর্যের কিরণ উভাপ, ঘামের ফেটায় সে সোনার ফসল বৃন্ত। শুধু এই সামান্য রূক্ষ অন্টন। নগরের ঘরীটিকা গ্রামের প্রতিভাস বোনে। চার পাঁচ মাসে নতুন করে সে শহরকে চিনেছে। খিমিয়ে যায় কখন কখন-ও হারেস। ক্যানেলের উপর খুলনা-চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকা আসে। মাঝাদের সঙ্গে গল্প করার ফুসরত পায় তখন সে। বাসার কুন্দুগ্রহের তাকে আটকাতে পারে না।

খান বাহাদুর এরফান চৌধুরীর বাগানবাড়ী-সম্পত্তি চৌধুরী সাহেব নিজেই এখানে বসবাস করছেন।

বাগানবাড়ির ভেতর হারেসের কাজ চলছে। একটা টিনের আটচালা তৈরী হবে। হাজারীবাগ থেকে তিনটে বুনো ভুলুক আনিয়েছেন তার জন্যই আটচালা।

এমন জায়গায় কাজ করতে হারেসের খুব ভাল লাগে। বিরাট বাগান-বাড়ি মাঝখানে পুকারিণী আছে। চারিদিকে কলা-গাছের বাগান। তারই ছায়ায় ঘরামিদের কাজ চলছে। কয়েকজন ছুতোর মিঞ্চী তাদের সামিল হোয়েছে।

সারাদিন গায়ে রোদ লাগে না বিশ্রামের সময়। হারেস চারিদিক তদারক করে এলো, গায়ের চিহ্ন ফুটকী-রূপে লুকিয়ে রয়েছে এখানে। কলা গাছে কলা পেকে রয়েছে। নীল সবুজ কলা-পাতার দিকে চোখ ফেরালে হারেসের মনে পড়ে সলিম মুনশীর পুকুর পাড়ের কলা। চাষীদের জমির সীমানানির্দেশক কলা-গাছ শহরে আমদানী করেছে যেন। কেয়ারীর ভেতর ফুল ফুটে রয়েছে। পুকুর ছাড়া একটা খিল আছে। জাওলা মাছ ভেসে বেড়ায়, শুকনো এক চাঁ ঢেলা ফেলে দিয়েছিল হারেস। বুদ্ধুদের সঙ্গে অনেকগুলো সিঙ্গ মাছ উঠলো। লোভ হয় হারেসের, বাগানের মালি নিষেধ করে, ঢেলা ছঁড়ো না, মাছ মরে যাবে। গিস-গিস করছে কইয়ের দল। মালি বললে, বর্ষার সময় পানির সৌত ধরে এখানেও মাছ ওঠে। টেনিস-কোটে একবার আধ-ডজন কই-মাছ উঠে গিয়েছিল। খান বাহাদুর সাহেবের পুত্রবধু একজন শ্বেতাঞ্জলি খুব হেসেছিল টেনিস-কোটের দুর্দশা দেখে। বর্ষার

সময় টেনিসের মৌসুম চালায় এই কৈ মাছের দল! Too black like the natives খান বাহাদুরের পুত্র স্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল: নেটিভদের মতই মীন-বঙ্গুরা ডেঙ্গুরাস, ছোঁয়া যায় না, কাঁটা আঁটে-পৃষ্ঠে। যেমন সাহেবের সঙ্গে মালীর ভাব আছে, নেটিভ-জবানে সে পরে বুবিয়ে দিয়েছিল মালীকে রসিকতার মর্মার্থ

শালগমের নীল পাতার নিচে মাটি কি পরিপাটি করে সাজানো : এরাই জানে চাষ। হারেস ভাবে। নটে শাকের এত রকম সে আর কোনদিন দেখেনি। লাল-নটের গাছগুলো মানুষ-উঁচু। ডাটার রক্ষিতা লোভের তৃষ্ণা আনে জিভে। বাড়ির বারান্দার নিচে লতা-ফুল বাখারীর বেড়া জড়িয়ে ফটক রচনা করেছে। মালিদের ঘরগুলোও বেশ ভালো। বাইরে পা বাড়ালেই কলাগাছের নীল আমন্ত্রণ। সিংহদ্বার দিয়ে ঘটোরের যাতায়াত হারেসকে চকিত করে। সুশোভন পরিচ্ছদ আক্রান্ত নরনারী বের হয়। সুশ্রাব্যদের দর্শন মেলে। একবার গান শোনা গেল। মাতালের উল্লমিত চীৎকার নেই এই দ্বীপের ভেতর। চারিদিকে কোন লোকালয় নেই। উঁচু গাছের ডালপালা শুধু দেখা যায়। বর্ষাস্নাত তাজা পাতা, পুঁথি জমাট মেঘের মত।

হারেসের সঙ্গী মালী বহু কাহিনী বলে। খিলের এক পাশে একটা কবর। খান বাহাদুরের যিরাটী বাইজীর শেষ আশ্রয়। রাত্রে এইদিকে কেউ আসে না। বদ্র-রহ বাইজী রাত্রে ঘুরে বেড়ায়। মালি বলে, নাপাকে লেবাসে মরলে এই দুর্দশা-ই ঘটে। নৃত্য-সম্বলিত মদ্যপানের সময় বাইজী মারা গিয়েছিল। খান বাহাদুরও হৃদস্তুগে ভুগছেন। দিন-রাত্রি কোরান তেলাওয়াৎ করেন। হাদিস ছাড়া তিনি কথা বলেন না। এক বড় পীরের মূরীদ হয়েছেন সম্পত্তি। মালীরা কেউ বৌ নিয়ে বাগানে থাক্কাতে পারে না। খান বাহাদুর জীবনে বহু ভুল করেছেন, আজ তা শোধরাতে ব্যস্ত। বিজ্ঞ পরীক্ষায় ফেল করেছেন, তাই ছেলেদের উপর পরীক্ষার জন্য বড় কড়াকড়ি তারাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। সাহেব বহুদিন দেশান্তরে ছিলেন, আরবাজানের সঙ্গে মতান্মেক ঘটেছিল। শ্রেতাঙ্গনী পার্শ্বে তিনি ফিরে এসেছেন। মালীর কাছে জানা গেল, পুত্রের পিতার উপদেশ মানে না, এই জন্য মালী চাকর-বাকরদের উপর তিনি তাঁর নসীহৎ ফুরমান। পরহেজগারীর শত প্রশংসাকীর্তন রোজ শোনা যায়। খান বাহাদুর সাহেব নিজে সঙ্গাহে একবার তার পীর সাহেবের দীর্ঘার-লাভে যান। সেইদিন বাগান-বাড়ির ভৃত্যদের ছুটি। মালী তাই হাসি-মুখে বলে, হজুরের ধর্মে মতি হোক আরো। হারেস বোকার মত দৃষ্টি ফেলে। ঐশ্বর্য্য নিয়ে মানুষ কী করে? গ্রাম কর তৃচ্ছ।

বিশ্বামীর সময় হারেস ঘুরে বেড়ায়। একটা ছাতিম গাছের তলায় সে তিনটে ভলুক দেখতে লাগল। শিকলে খুব মজবুত করে বাঁধা মালী আশ্বাস দেয়, হারেস তবু কাছে যায় না। এই ভলুকদের দৌলতে তাদের ঝুঁজী চলছে। লোমশ কালো প্রাণীর দিকে মালী কয়েকটা শালগম ছুড়ে দিল। হড়োছড়ি পড়ে যায় জন্মদের ভেতর।

খান বাহাদুর সাহেব নাকি একটা চিড়িয়াখানা তৈরী করবেন বাগানে। মহুয়া গাছের চারা এসেছে ছোট নাগপুর থেকে। আল্লার চরেন্দাদের বেশি তক্লিফ দেওয়া অন্যায়। মহুয়ার বন্দোবস্ত চলছে তাই। আরো একটা ভলুকের অর্ডার দিয়েছেন খান বাহাদুর। নর আর মাদী জোড়া তৈরী করছেন, আল্লার কুদরৎ। একটা ভলুকের জোড়া নেই। এই জুলুম

গোনাহ! চতুর্থ ভল্লুক সামনে সঞ্চাহে আস্বে। বিপজ্জন চৌধুরী সাহেবে সঙ্গীহীনতার দুঃখ ভাল-কৃপেই বোঝেন!

বারান্দায় দাঢ়িয়ে খান বাহাদুর ইরফান চৌধুরী ভল্লুক দেখছিলেন। মালীর চোখ পড়ে তাঁর উপর। হারেসও সেই সঙ্গে চেখ ফিরিয়েছিল। সফেদ লেবাস, কলিদার পিরহান-লুঙ্গি, শুভ্র শুশ্রাঙ্গজিসহ খান বাহাদুর দাঢ়িয়ে স্মিত হাসি হাসছেন। হারেস আড়চোখে চায় শুধু। সলিম মূল্শীর উন্নত সংস্করণ জীবনের প্রথম চোখে পড়ল তার। গৌর তনুর মহিমা বারান্দা আলো করে রেখেছে। দর্শন দেওয়ার মত পলক মাত্র, আবার খান বাহাদুর আড়ল হোয়ে গেলেন। মালি সাহেবের পরিচয় দিল।

প্রকৃতির মায়া তুচ্ছ হোয়ে যায় হারেসের কাছে। পশ্চাতে পড়ে থাকে নীল দুর্বা বনের উপর সূর্যমুখীর ইঙ্গিত, শস্য ক্ষেত্রে সর্পিল আহ্মান, বাড়ল বাতাস-ছোওয়া ঝাউয়ের মর্মর, খান বাহাদুরের কেয়ারীর অসংখ্য নামহীন কুসুমের ডাক। চোখ খুল্বে না হারেস, চোখ ফেরাবে না সে কোন দিকে। বাগান-বাড়ির ইমারতের ইটে বরং স্বেহ-মতার প্রস্তুবণ অন্তঃশীলা। বিশ্রামের সময় প্রায় শেষ। হারেস আট চালার দিকে ফিরে যায়।

টিনের চালের উপর শুয়ে-শুয়ে লিচু গাছের ছায়ায় বাসেদ মিঞ্চী বিড়ি ফুঁকছে। ঘন পাতার আবরণে রোদুর লাগে না। টিনও এখানে শীতল।

নিচে ছোকরা ঘরামি আর ছুতোর মিঞ্চীদের ভেতর তখন হাসির বন্যা নেমেছে। হিঁহি শব্দে আটচালা মাঝ। হারেসেরও কৌতৃহল জাগে।

ছুঠে এলো আলি।

—এই হারেস!

যে ছোকরা ছুতোর মিঞ্চী আবদুলকে যিরে হাসির জটিলা চল্ছিল, সেও এলো হারেসের কাছে। আলি তার মুখ চেপে ধরে। —আরে ওকে ওসব বলিস্বিনি, ওর ‘জান’ উড়ে যাবে।

এত লোকের ভেতর মনের শুমোট কেটে যাব হারেসের। হাসে সে।— কি হোলো বলই না ছাই।

আবদুল জবাব দেয় : আমি বলতে পারবোনা, জিজ্ঞেস কর আলিকে।

—কি হোলো, আলি-ভাই।

মুখ ঝাম্টা দেয় আলি : আমি জানিনে। জিজ্ঞেস কর ওই আবদুল ছুতোরকে।

আরো তরুণ মিঞ্চীরা এসে জমে।

আবদুল বলে, ওসব উন্তে নেই। কাঁধের ফেরেন্টা সরে যায়।

আলি হারেসের মুখের কাছে হাত নাড়ে, গাছ দেখেছো?

—কি গাছ?

—কি গাছ আবার। আবদুল গাছ দেখে হাস্তে।

হারেস আর অনুরোধ করে না, থাক আমি শুন্তে চাই নি কিছু।

আবদুল তখন সবিস্তারে বর্ণনা করে। খান বাহাদুরের জানালার পালিশ সামান্য চটে গিয়েছিল। সেইজন্য ডাক পড়েছিল আবদুল মিঞ্চীর। সেখানে চৌধুরী সাহেবের পালঙ্গের উপর একটা বই দেখে এসেছে সে।

—কি বই।

—ইংরেজী বই।

হারেস বোকার মত বলে, তাতে হাস্বার কী আছে?

—বইতে নয়। খালি ন্যাংটা ছবি ভরা।

—পাড়ার ক্লাবে ত বল ছবি রয়েছে। কি বল, আলি?

—আরে সে ছবি হোলে ত ভাল হোত। এই ছবির ব্যাপার আলাদা।

তারপর সে মুখ টিপে-টিপে হাসে।

আবদুল বলে : দুই কাঁধের দুই ফেরেন্টা সরে যাবে সে ছবি দেখলে। তৌবা!

তারপর আবদুল বর্ণনা করে, রাধিকা কৃষ্ণ আর তমাল তরুর একত্রিত কেমন রূপ সে দেখে এসেছে।

—আরো কত রকমের তেলেসমাঝ যে রয়েছে রে ভাই, যদি ইংরেজী পড়তে জান্তুম!

হারেসের চিন্তার গতি এইদিকে শুরু। সে বিশ্বাস করে না। বলে, কোরান-হাদিস পড়ে খান বাহাদুর সাহেব। তুমি ভুল দেখেছ।

—আজ ওসবের ধারে পা দেয়নি, হলফ করে বলতে পারি। আলি হঠাত হারেসের দলভুক্ত : একটা ছবি ছিড়ে আন্তিমে কেন?

—এতদূর বুকের পাটা আমার নেই।

—কাল যদি কোন কাজের জন্য ডাকে, আমাকে নিয়ে যাস। আবদুল আফসোস করে।

—আরে তোমরা বিশ্বাস করবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি, খান বাহাদুর খুব মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে। জোহরের নামাজের সময় আল্মারিত বই বক্ষ করে উঠে গেল।

এক ছোকরা মিঞ্চী ফুট কাটে। এই ত আসল পরহেজগার লোক। ভাল মন্দ দুই নেড়ে-চেড়ে দেখে কিন্তু নিজে খারাপ হয় না।

হাসির ট্রেক্যান চলল পাঁচ মিনিট ব্যাপী।

বাসেদ মিঞ্চী নেমে এলো, সব শুরু।

—আজ যে খুব জমেছ সবাই। চালাও, বাবা, এবার যাও। কাজে না লোক্সান দিতে হয়।

ফুরোনে কাজ নিয়েছে এবার মিঞ্চী বেশি মুনাফার আশায়।

আবার শুরু হয় কর্ম-ব্যক্ততার কোলাহল। কোন কোন ছুতোর মিঞ্চী তার কাটে। লোহার গরাদ কাটে দু-জন! ঘরাম্বিরা বাখারী ছেলে। সবাই কাজে মনোযোগী।

খান বাহাদুরের রুচির বাহবা দিতে হয়। ভল্লুকের জানালার পাশে ইট পড়ে রয়েছে অনেক। ওখানে উঠবে নকল পাহাড়। তার উপর বুনো গাছপালা। ভল্লুকের বন্দী-জীবন বিস্তৃত হওয়ার নানা উপায় তিনি উদ্ভাবন করেছেন। গাছের গুড়ি কয়েকটা বাগানে পড়ে রয়েছে, পশুর আবাস-ভূমির মধ্যে পুতে দিতে হবে। বন-বিহার যেন না থামে।

এলাহি কারখানা!

ভল্লুকের দোল্নার জন্য পাহাড়িদের কাছ থেকে মোটা বুনো লতা আমদানী করেছেন খান বাহাদুর। পিঞ্জরা তৈরীর পর একজন ভালুক-পোষার শিকারীকে বেতন দিয়ে নিয়োগ

করবেন তিনি ।

মালী বলে, এলাহি কারখানা । পূর্ব বাংলায় বিরাট জামদারী, টাকার সুমার নেই ।
খেয়ালও তেমি ।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে । বাসেদ মিঞ্চীর হকুম, হাত চালু করো । ভাল কাজ
উঠছে না ।

হারেস ফাঁকি দেয় না আদৌ । মিঞ্চীর কাছে দুর্নামের ভাগী হোতে চায় না । এমন
জায়গায় মন দিয়ে কাজ করা চলে । দূরে কোথায় বৃষ্টি নেমেছে । ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকে
গাছপালা কাঁপে । হারেস প্রান্তরের আস্বাদ উপভোগ করে । সারা বছর কাজ চলত এইখানে ।
একটু ঠাঁই পাওয়া যেত মালীদের সঙ্গে অথবা ভরুকরক্ষী রূপে ।

ওপারের আকাশ ঘন-নীলের বিস্তারে মুড়ি দিয়ে অজ্ঞাতবাসে চলেছে । লিচুর পাতা রং
হারিয়ে ফেরে নিমেষে নিমেষে । মেঘগর্জন প্রতিধ্বনি দিয়ে আকাশ আর পৃথিবীর ফাঁক ভরে
দিয়ে যায় । দুই বিপরীত-মূর্খী ভিন্ন রং স্নাতের মধ্যবর্তী রেখার উপর হারেসের মন ভারসাম্য
ঠিক রাখে । দারুণ হাত চলে তার । বাসেদ মিঞ্চীর শাশিত চোখ এদিকে রেহাই পায় ।

চুলা ধরিয়ে হারেস বসেছিল ।

উঠানের ভেতর হঠাত দাপাদাপির আওয়াজ শোনা যায় । বেরিয়ে এলো হারেস ।
একি! বাড়িওয়ালা আর তার ছেলে হাতাহাতি করছে । মুখে কথা নেই কারো ।

হারেসের আগমন-মাত্র একটি বর্ষিয়সী রমণী ঘৰে চুকে গেল । তরুণীর কঠের
চাপা কান্না শোনা যায় অন্য ঘরে ।

এইবার হাঁকাহাকি শুরু হয় ।

মেহেরালি চীৎকার করে : শুয়োরের জোচা, কমিনা তুমি টাকা ওড়াবে বেফজুল ।

—আমি আমার পয়সা খরচ করেছি । ফের কথা বলবে ও বুড়ো হাড় চুর করে দেব ।
বাপ বলে রেয়াৎ রাখব না ।

হাতাহাতি আবার শুরু হয় । ঘুষি আর কিল ।

হারেস প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় । তারপর সে মাঝখানে ঝাপিয়ে পড়ে :
বাড়িওয়ালা সাহেব, করছেন কী ।

নাসিমকে একদিকে ঠেলে দিল সে । মেহেরালির রোখ থামে না ।

—দাঁড়া, হারামজাদা ।...

পেয়ারা গাছের গুড়ির কাছে নাসিম একটু বেকায়দায় পড়েছিল, এই সুযোগে মেহেরালি
এক ঘুষি ঝাড়ে পুত্রের মুখের উপর ।

—বাপ না আমার ইয়ে ! নাসিম একটা ভাঙা কলসী নিয়ে ছুঁড়ে মারল বৃক্ষের মাথার
উপর । গুড়িয়ে গেল কলস মেহেরালির পায়ে লেগে । আর একটা কলস তুলেছে নাসিম,
হারেস হাত থেকে কেড়ে নিল ।

নাসিম পাট-সিল্কের লুঙ্গি পরেছিল । কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে । কলসীর কানা
লেগে মেহেরালির পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল । হাউমাউ শব্দে কান্না শুরু করে বাড়িওয়ালা ।
বৃক্ষবয়সে পুত্রের হাতের মারণ তার কপালে ছিল ! খেদ-কীর্তন করে সে ।

চট্টের আকুর ওপারে পাড়ার লোক জড়ো হোয়েছিল । কৌতুহলী চোখ ছেঁড়া ফাঁকে

খুব নেঘাবান। গালিগালাজি দিল মনের সাথে মেহেরালি।

হারেস নাসিমের দুই হাত ধরে হিড়হিড় শব্দে টেনে নিয়ে গেল চটের ওপারে।
পাড়ার একজন চেনা লোক-কে সে অনুরোধ করে, এ-কে একটু ফাঁকে নিয়ে যাও, ভাই;
মেহেরালির বৃক্ষ পর্দানশীনা স্তৰী-ও শেষে বাইরে এসেছে। স্বামীর হাতের উপর সাদা
ন্যাকড়া জড়ায় সে।

—আপনি রাখুন চাচি, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

কথা বলে মেহেরালির স্তৰী : দাও, বাবা। যেমন কপালে সেধেছিলাম।

আধ-ঘোমটা তবু ছাড়ে না বৃক্ষ।

হারেস ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল। হঠাৎ ক্ষেপে উঠে মেহেরালি। অসমাঞ্ছ
ব্যাণ্ডেজগুৰু সে ছেলের ঘরে ছুটে গেল। বউ ভেতরে হাউমাউ জুড়ে দেয়। হারেস অন্দরে
প্রবেশের সাহস পায় না।

—আছড়ে ভেঙে ফেলব। একটা ছোট গ্রামোফোন দু-হাতে, বেরিয়ে এলো মেহেরালি।
হারেস তা-কে সুযোগ দিল না। বৃক্ষের হাত থেকে গ্রামোফোন ছিনিয়ে নিয়ে হারেস বলে,
ভেঙে কী হবে, কিনেছেন ত জিনিসটা টাকা দিয়ে!

এই গ্রামোফোন কেনার জন্যই পিতা-পুত্রে দুর্দশ। তার ভূমিকা হারেস জানে না।
কলের গানের বাস্তুটা সে নিজের ঘরে রেখে এলো।

—ছেলেমানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, তাৰে জন্য আৱ কেন? হারেস হৃদয়তার
পথ রচনা করে, চাচা, একটু শৰবৎ খাও।

বাইরে পাটের চট ঝুল্ছে। ভেতরের আশ্রিত আৱ থাকে না। মেহেরালির স্তৰী বউ-কে
শাপান্ত আৱাস্ত করে। হারামজাদী কুটনীৰ বৰ্ষাই ত সংসারে আগুন লাগায়। সখেৰ আৱ
কামাই নেই। আজ এ্যা কাল তা। কৰে আৱ একটা ভাতারেৰ বায়না ধৰবে!

হারেস কানে আঙুল দিতে বাকী রাখে। বগড়াটা এক-তৰফা। নাসিমের বউ কোন
জবাব নিষ্কেপ করে না।

চাচি, এক গ্লাস শৰবৎ করে দাও। হারেস বৃক্ষকে সমোধন করে।

চাচি শৰবৎ নিয়ে এলো। বৃক্ষ গলা ভেজার পৰ নিজেৰ দুঃখকীর্তন করে। ঢালাইয়েৰ
কাৰখানার মিস্ত্ৰী, আজকাল রোজ কমে গেছে, ছেলে বেফজুল পয়সা খৰচ করে। সারাদিনেৰ
খাটুনিৰ পৰ এই বেল্লিকপনা সে সহজ কৰতে পাৱে না।

চাচি মিষ্ট-পানি বিতৰণেৰ পৰ আবাৱ কটুকাটব্য পৱিবেশন করে। বৌৰ শুণ গ্রামেৰ
শ্রাদ্ধ চলে।

মেহেরালি তিৰক্ষাৰ কৰে : থামাখা গলাবৃজি কৰো না। বউ আমাৰ লক্ষ্মী। নিজেৰ
বংশেৰ গুঁড়ো এনেছি, ছেলেৰ গুণগেৱাম দেখো।

—বউ-মা, কেঁদো না।

শান্ত মানুষেৰ মত মেহেরালি বলে। চাপা ফুপানি আৱ থামা জানে না।

সন্ধ্যাৰ অন্ধকাৰে দাওয়াৰ উপৰ হারেস বসে থাকে। বেগানা মৱদ নয় সে আৱ।
তাৰ পৱিচয় দু-দিন পৱেও পেয়েছিল সে। চাচি পৰ্দাৰ আইন অনেকটা শুখ কৰেছেন।

বৃক্ষ স্বাভাৱিক গলায় বলে, বউ-মা, কাল থেকে তোমৱা আলাদা খাও। ওৱ মুখ

দেখব না আমি ।

হারেস বাধা দিল ।— চাচা, আর কেন ! লেবু কচলে তেতো করছেন ।

—না, বাবা, আমার রাগ বড় খারাপ ।

হারেস কোন সুযোগ গ্রহণ করল না । রান্নার কতদূর, সে উঠে এলো অজুহাতে ।

চুলো নিতে গেছে । আবার কাঁচা কয়লা নিয়ে বোঝা-পড়া । হারেসের মেজাজ বিগড়ে যায় । কোন হাঙামা সে পছন্দ করে না । নির্বিবাদ জীবনের জন্য ঠাই খুঁজে নিতে হবে তা-কে ।

বসার কোন অবসর মেলে না । রান্নার পালা ছাড়া আরো কাজ আছে । মিঞ্চির কাপড়-কাটারী ধোও, পরিষ্কার করো । আজকাল কেউ খাতিরও করে না । আলির সঙ্গ পর্যন্ত বিশ্বাদময় । মিঞ্চি যাকে কমিশনী ছেড়ে দেয়, বাসার সকলের হিংসার পাত্র সে । অথচ তার মেহনতের দিকে কেউ তাকায় না । আলি ঠাট্টা করে, মিঞ্চির জামাই । অন্দরে হন্দ্যতা হারালেও সদরে সে সহানুভূতির লোক পায় । ফরিদপুরের ছাতাওয়ালা, তা-ছাড়া মেহেরালি । রান্না তরকারী আজকাল তার জন্যই ও-ঘরে পৌছায় । মেহেরালি দাওয়ায় বসে গল্প করে । নাসিমও তার সমর্থক । ওদের জীবনের সঙ্গে সে যিশে যেতে পারে না । দায়িত্বহীন দিন-যাপনের বছদিনকার অভ্যাস হারেস নিশ্চিহ্ন মুছে-ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করে ।

রজব একদিন তার ভুল ভেঙে দিয়ে গেল ।

আচ্ছালামো আলায়কুম ।

টিপ্টিপ্ বৃষ্টি মাথায় রজব এসেছে তাদের ডেরার পুঁথি-পড়া ছেড়ে । সকলে অবাক হয় ।

দরমার উপর বসে রজব বলে, দ্যাতে যামু বাই ।

আলি হাসে : ছাতি হারাবে না !

রজবও হাসি বিনিময় করে শহরে সংলাপ জুড়ে দেয়, সত্যি বল্ছি ।

হারেস দৃঢ়ঘৃত হয় । এমন পুঁথি-পড়া আর শোনা হবে না !

—আবার আসব ।

আলি বলে, দ্যাশে যাবে কেন ?

—আমাদের কী শহরে থাকা পোষায়, গাঁয়ের লোক । বর্ষাৰ সময় আবাদ সেৱে আসি । দু'মাস সেৱেই আবার চলে যাই । গৱীবের জন্য এই শহর নয় । কেঁচোৱ মত গর্তে বাসা বানানো ।

রজব চলে গেল । হারেসের কানে তার সমন্ত কথা বাজে । এখানেও বক্সন ! গ্রামের বেড়ি সে কেটে ফেলেছে, নতুন রকমের জিঞ্জীৱ ঝুলছে এখন-তা বেড়ি নয় সত্যি, তবু বক্সন !

পরদিন সকালে হারেস রজবের বাসায় গেল । সত্যিই সে দেশে পাড়ি দিয়েছে ।

দু-সঙ্গাহের মধ্যে বাগান-বাড়িৰ কাজ সমাপ্ত । চতুর্থ ভল্লকেৰ দৰ্শন হারেস পেয়েছিল । দু-দিন আবার বেকার । নতুন কাজ যোগাড় হয়নি । হারেসের কাছে অসহ্য ।

সেও ট্রেন চড়ে বসল । আরিফকে পত্র দিয়েছিল হারেস । বন্ধু তাকে সাদর সম্মানণ জানিয়েছে । পথের আলাপ সে অবহেলায় নিঃশেষ করতে চায় না ।

লোকাল ট্রেন বার-শহরের পল্লী ছেড়ে প্রান্তরে এসে পড়ল । হারেসের উন্নত দৃষ্টি অবলেহন করে দিগন্ত আর গ্রামের চিত্রপট সদৃশ কুটির । জলা-জাঙালের খন-ছবি ট্রেনের গাড়ির সঙ্গে পলক দেখা যায় মাত্র । একটি মুহূর্ত তবু অবিনশ্বরতার ছাপ দিয়ে যায় তারা মনে । মুহূর্ত দিয়েই ত নিরবচ্ছিন্ন মহাকালের মাল্য রচিত ।

সকালের হাওয়া খোলা জানালায় ঢেকে ।

হারেস তার পুঁটলীর দিকে আন্মনা দৃষ্টি জাগ্রত রাখে । গৃহীর মত সেও আজ অতি-বিচারী । কী আছে তার পুঁটলীতে? দোস্তানীর জন্য তাঁতের শাড়ি, বন্ধুর জন্য লুঙ্গী আর ছেলেদের খাবার । এই সামান্য উপটোকনে মন সরে না । সম্ভিত পঁচিশ টাকার দশ টাকা খরচ করে ফেলেছে সে । আজকাল হারেস ধূতি পরে । গায়ে সাদা হাফ-শার্ট । পকেটমার শহরে বিপজ্জনক । টাকা কয়টা সে ধূতির খোঁটে বেঁধে কোমরে গুঁজে রেখেছে । যায়াবর জীবন কী তার শেষ হোলো?

অতীতে এক চাষীর কুঁড়ে ঘর আর লাউয়ের মাচাং তার চোখে ঝঁকেছিল নীড়ের স্ফুর । সফলতা আরো কত দূরে কে জানে, তবু গৃহীর মতই সে ট্রেনের কামরায় বসেছিল । আরিফের বাড়ির ছবি আঁকছে সে । পথে কুড়ানো হ্রদ্যতা, তার মত অবহেলিত মানুষের কাছে অমূল্য । আনন্দের নিঃসাড় যাতায়াত ধর্মনীর মঞ্চে সে অনুভব করে । বিবাগী চোখের কোণ আধআধ বুজে আসে ।

প্রভাত সূর্যের নবারুন দশ-দিশে বিচ্ছিন্নি । বর্ষাধৌত নীলিমার চকিত স্পর্শ আলোয় আলোয় আরো মন্দিরা-সিক্ষ হোয়ে উঠে ।

দূরে কয়েকটা ঝাঁকড়া অশ্বে শুশাথায় জমে রয়েছে লাল মেঘ । শরাবের গেলাস চুরমার করে শাকী খুনের পান্শালা খুলেছে । বসুক্রার সাজসজ্জা' নেপথ্যে প্রলুক্ত করে মুসাফিরদের । রেল-লাইনের দুই পাশে কাকচক্ষু জলাশয়ে মাছরাঙ্গা ঝাপ দিয়ে পড়ে । সাদা শালুকের বনে জলপিপি চঙ্গ দিয়ে ডানা মোছে । পূর্ব আকাশের সূর্য জলাশয়ের হিল্লোলে কাঁপে । লাঙ্গল কাঁধে বেরিয়েছে গাঁয়ের কিশাণ । বলদ আর গো-পালের ছায়া পড়ে জলের উপর । একটা কালো গাই ত্বক্ষা মেটোল ইইমাত্র । মুখ তুলে নিঃশ্বাস ছেড়ে সে-ও দলবর্তী হয় । বিস্মিত পানির আয়নায় পশুর মুখ এখনও কে যেন ধরে রেখেছে ।

ছবির পর ছবির শোভাযাত্রা । শেষ দৃশ্যটি হারেস-কে প্রলুক্ত করে । চলন্ত ট্রেনে সরে গেছে দূরে । হারেস তবু চোখ বাড়াল জানালা থেকে । অন্য মুখে বাঁক নিয়েছে ইঞ্জিন । আর কিছু দেখা যায় না । ছবি দেখার আকুলতা হারেসের মনে গুম্রে উঠে । বিবর্ণ শহরকে অনেক দূরে ফেলে এসেছে সে ।

অচেনা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে । ফেরীওয়ালারা হাঁকে । ভিখারীরা মাছির মত জানালা ছেপে ধরে । হারেস একটা ভিখারিণী দেখল, তার কোলে ছেলে । সম্মুখে একজন বালক দাঁড়িয়ে বয়েছে । বছদিন আগে মার সাথে সে-ও হ্যাত এমি বেশে সলিম মুন্শীর দহলিজে দাঁড়িয়েছিল । বছদিন পরে মার ঝাঙ্গা স্মৃতি ভেসে এলো । করুণার এতটুকু দাগ নেই তাতে । হারেস একটা পয়সা ছুড়ে দিল । ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, সে অন্যদিকে মুখ ফেরায় ।

গন্তব্য স্থানে ট্রেন পৌছল। প্রায় কাঁচা-দুপুর। এখান থেকে তিন মাইল পথ সামগড়। গায়ের নাম বেশ মনে আছে হারেসের। জিজ্ঞাসাবাদের ক্রটি রাখল না সে।

প্ল্যাটফর্মের সাদা বেড়ার ফটক পার হোয়ে পুটলী কাঁধে হারেস ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায়।

তিন-গাঁ। অচেনা ভুই। তবু পরিচয়ের অনাস্বাদিত মিষ্টতা চারিদিকে। কতদিন পরে খোলা মাঠের বুকে অবাধ বিচরণের নেশা আবার ফিরে এসেছে। রৌদ্র আর ঘামের উৎপীড়ন হার মানে সহজে।

ডিস্ট্রিট বোর্ডের কাঁচা সড়ক আধ মাইল কয়েক মিনিটে শেষ হোয়ে গেল। তারপর গায়ের আল আর সংকীর্ণ সড়কের পথ। বর্ষার সজীবতায় লুটোপুটি খায় তরম্লতা। ছোঁয়ার প্রবল ত্বক্ষা জাগায় নয়নে। প্রবাসী-পুত্রের জন্য সব কিছু জননীর মত অপেক্ষা করছে। সমতল বাংলাদেশের গ্রাম পরম্পর বিভিন্ন নয়। তবু নতুন মনে হয় এ-ই দেশের পরিবেশ। হারেসের কৌতুহলের সীমা থাকে না। অবোধ শিশুর মত সে পার্শ্ববর্তী খাদে কালো পানকোঠীর জল-বিহার দেখতে থাকল একবার।

উচু ভিটের পাশে পথ। সারগান্দায় ভরা বাস্তুর ঢালু জমি। পুই শাকের লম্বা সরুজ ডগা পাতায় পাতায় পূর্ণ। উঠানের প্রান্তে একটা পাঁচ বছরের উলঙ্গ মেয়ে আঙ্গুল মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। নিচে কেউ নামে না। জোরে পা চালায় হারেস। এই জনপদ ঘন-বসতি। মুক্ষাশে ব্যস্ততার চিহ্ন। ডোবা থেকে কারো ঘোমটাপরা পুত্রবধু ধূচনী করে চাল ধূয়ে ত্বিয়ে গেল। হেলানো তাল-গাছের উপর বসে দু-জন ছেলে ছিপ ফেল্ছে। একজন একটা পুঁটি তুল্ল। হারেস চেয়ে চেয়ে দেখে, পায়ের কামাই মেই তার।

এক ফাঁলি ফাঁকা মাঠের পাশে ঝুঁয়েকটা পান-বুরুজ। খুব ছোট অবিশ্য। পাটকাঠির বেড়ার ধারে একজন লোক পানের লতা বেড়ার উপর তুলে দিতে ব্যস্ত। হারেস থামল।

— সামগড় এখান থেকে কতদূর, মশাই?

— আর কোশ-টাক পথ।

হারেসের ক্লান্তি নেই। আর এক ক্রোশ পথ বেশীক্ষণ লাগবে না।

বুরুজের ভেতরে কয়েকজন পান তুলছে। হারেস আবার ডাকল: কিছু যদি মনে না করেন, শ' খানেক পান দেবেন। কত দাম?

— একটু দাঁড়ান।

পানের বুরুজের ভেতর থেকে কয়েক মিনিট পরে লোকটা বেরিয়ে এলো।

— দিন দু-আনা পয়সা। পঞ্চাশটা পান আপনাকে খেতে দিলাম।

হারেস বড় আপ্যায়িত হয়। অক্রেশে দু-আনা পয়সা বের করে দিল সে।

গাঁটোরীর ভেতর পান রাখার সময় আনন্দে তার দুই চোখ উজ্জ্বল হোয়ে উঠে। লৌকিকতার ঘোল-কলা এইমাত্র মেন পূর্ণ হোল।

জনপথ শেষে আবার মঠো পথের অভিসার।

সামান্য ক্লান্তি অনুভব করে হারেস। মেঘ-ছেঁড়া রৌদ্রের উত্তাপ ঢঢ়া। বাতাস থেকে গেছে কিছুক্ষণ। পাট আর ইক্ষু ক্ষেত্রের আওতায় সামান্য বাসাও সেঁধোতে পারে না।

ধানের গাছ জেগে রয়েছে শান্ত প্রহরীর মত। মাঠ সবুজ আর নীল। ভাঙা কঁচা-পথে বর্ষার পানি জমে রয়েছে। কাদায় নামতে হোলো হারেস-কে। ধারে ল্যাঠা বা টাকী মাছ বসেছিল, লাফিয়ে পানিতে মিশে গেল। আধহাঁটু পানি কিন্তু কাদা বেশী। কোন রকমে পা ধুয়ে ওপারের আলে উঠে পড়ল হারেস।

পান শুকিয়ে যেতে পারে, গাঁঠুরী নামিয়ে ভাল করে কাপড় চাপা দিল সে। তাজা পানের আস্থাদ কেমন কে জানে, হারেস পান ছোয় না। পানে রাঙা ঠোঁট মাকে অত্তুত দেখাত!

ধানবন্দের মাঝখানে মাঠে পানি এসে জমেছে! তিওরের মেয়েরা হাঁকনী জাল নিয়ে ডান্কিনে মাছ ধরছে। চিল উড়ে মাথার উপর। এক-জোড়া দাঁড়কাক মাছের লোভে ক-ক শব্দ ডেকে গেল। সামান্য আগে মাঠের ভেতর ছিপছিপে পানি বাঁধ দিয়ে সেচনে লেগেছে তিনটি উলঙ্গ ছেলে। সবাই উলঙ্গ, মাথায় কাপড় বেঁধেছে। সর্বাঙ্গে লাল পলি মাটির কাদা। কালো ছেলেটা সেজেছে যেন।

— খোকা, মাছ আছে ত? হারেস জিজ্ঞেস করে।

— বেশি নেই। জবাব এলো।

— সামগড় কতদূর থেকে।

— সামগড়? আর পুয়োটাক রাস্তা। এই যে একটা বাঁকা তালগাছ ওর পাশ দিয়ে সোজা চলে যাও। তারপর কয়েকটা পাড়া পার হোল্লেই সামগড়।

ছেলেদের বাঁধের ওপারে ধান গাছের গোড়ায় পানি। একটা মাছ লাফিয়ে পড়ল। বড় সন্ধা পুঁটি। ছেলেটা রেগে উঠে, দূর ঘৃণাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে একটা মাছ পালালো। সোজা যাও।

চ্যাংড়ার বেয়াদপী হজম করল হারেস, এখনও পথ পড়ে রয়েছে। বাক্যব্যয়ের সময় নেই তার।

মাঝ-গগনে আশ্বিনের সূর্য। দু-পাশে মেঘ। সক্ষীর্ণ তির্যক রেখায় আলোক ঝরে সাঁওতালের নীল-পালক গৌজা তীরের মতো। মুখের উপর তঙ্গ ছোঁয়াচে অনুভব করে হারেস। গামছা বের করে মাথায় দিল সে। আলপথ ঘাসে ভরা। পচা শামুকের খোলা ঠোকারায় দাঁড়-কাক। তার কটু গক্ষে পথ-চলা দায়। জমির সরস মাটির গুগলীর দল চরে বেড়ায় ঠোঁটে ভর দিয়ে। চরাট পথে আঁকাবাঁকা দাগ লেগে রয়েছে।

বাঁকা তালগাছের পর জন-বসতি। গাছের ছায়ায় পথ অপেক্ষাকৃত শীতল। গামছা গাঁঠুরীর ভেতর রাখল হারেস। এক জায়গায় তেঁতুল গাছের ছায়া এত ঘন আজ সূর্য উঠেছে কিনা সন্দেহ হয়। পচা ডোবার উপর বর্ষার ছাপ সামান্য বিবর্ণ মাত্র। পাকা পানাপাতা দেখা গেল দু-একটা।

সঙ্গতিপন্থ পল্লী বোধ হয়। হারেসের চোখে পড়ে, দু-একটা ভদ্রাসন, ইমারত, টিনের আটচালা, ইটের প্রাচীর— যার গাঁ-ঘেঁষে ফণি-মনসার বন ভীত-জনক আবছায়া ফেরে পথের উপর। পাকা সিঁড়ি মনসা-বাড় ভেদ করে উপরে উঠে গেছে কারো সদরে। দু-একজন পথচারীর সঙ্গে হারেসের দেখা হয়। আর কারো সঙ্গে কথা বলে না সে।

সরু নালার তলা দিয়ে ঝিরিবিরি মৃদু স্নোত বাতাসে কাপছে। উপরে তাল গাছ

ছ্রাধারী। বিশ্রামের জন্য হারেস একটু দাঁড়াল। মরা গাছ ফেলা রয়েছে নালার উপর। সহজেই তা পার হোয়ে গেল হারেস। বড় তেষ্টা পেয়েছে তার। জমি-সংলগ্ন একটা পুকুর। পদ্মপাতার থালা শুধু উপরে সাজানো। একদিকে ছোট ঘাট। হারেস নেমে গেল। পদ্মের নাল স্বচ্ছ-জলে দেখা যায়। শ্যাওলার সঙ্গে চুনো মাছ ঘূরছে নালের গায়ে গায়ে। কুলকুচি করে ঠাণ্ডা জলে পা ডোবায় হারেস।

পথ আর শেষ হোতে চায় না কি? আলের উপর তার সম্মুখে আরিফ-কে দেখে হারেস উৎকৃষ্ট হোয়ে উঠে। হাঁটুর উপর লুঙ্গী তোলা। পায়ে একরাশ কাদা।

— আরিফ জাই!

আরিফ পেছনে ফিরে তাকায়। হারেসের বেশ-ভূষা স্বতন্ত্র। বাবুয়ানীর ছোঁয়াচ লেগেছে খানিকটা। তাড়াতাড়ি চিন্তে পারে না সে। শার্ট গায়ে হারেস-কে সে প্রথম দেখেনি। একটু বিলম্ব, চেখের ধাঁধা। তারপর ছুটে এসে সে দুই হাতে হারেস-কে জড়িয়ে ধরে। পত্র লিখেছিল বস্তু। এত তাড়াতাড়ি তার প্রতীক্ষা সফল হোলো!

পুটলী ছিনিয়ে নিল যেন আরিফ। হারেসের কম পরিশ্রম হয়নি। পথিক দুই বস্তু। আরিফ নিজের ‘হালতের’ সাফাই দিল: জমির এক-কোণে কিছু পানি আছে। কড়াই বুনব। রোজ তদারকে বেরুতে হয়। না হলে রক্ষে আছে? ছেলেরা মাছের লোভে হিচে ফেলবে। ধান নষ্ট করবে। হারেস বলে, একটু আগে পদ্মপুরু ধূয়ে নিলে ভাল হোত।

— না, একদম নিজের ডোবায় গিয়ে সাফ-সুরক্ষিত।

দু-পাশে ধান-জমি, রোদে পা যেমে রয়েছে বানের ঈষৎ-ধারাল পাতা এসে লাগে, কুটকুট করে শরীর। আর সামান্য পথ।

— এত দূরে জমি তোমার, হারেস বলে।

গাঁয়ে জমি পাওয়া দুষ্কর। এ-গাঁয়ের নাম শাতিপুর। আমাদের সীমানায়।

হারেস অভিযোগ করে: অত দূরে লাঙল-বলদ ঠেলে-আসা, বাজে মেহনৎ করতে হয়।

— তা ছাড়া উপায় নেই। এক বিষে দুই জমির জন্যে কাচারীতে কী হাঁটাহাঁটি না করেছি। নায়েব-কে ঘূষ দিয়ে তবে উদ্ধার।

হারেসের দিকে তাকাতেই আরিফ বলে, বড় যেমেছ ভাই তুমি। এ যে খেজুর গাছ-ওয়ালা ভিটে—।

মালেকা শাড়ি পরে হাসে। আরিফ বস্তুর দেওয়া লুঙ্গীর রং বার-বার দেখে। মালেকার হাসি আরো সেইজন্য।

— বস্তুকে ও দাওয়াৎ দিসে। ভাল খাবার যোগাড় করো। ডোবায় সকালে মাছের ‘ফুট’ দেখেছি। বিকালে জাল নিয়ে যাও।

স্ত্রীর কথা আরিফ আন্মনা শোনে। মুখে তার কালো ছায়া পড়ে। আতিথেয়তার চরমে কল্পনা তার মনেই আঁকা আছে শুধু, বস্তুর জন্যে কিছু দৈ যোগাড় জরুরী। জাল ফেলে গয়লা-পাড়া যাওয়াই যুক্তি-যুক্ত।

— তুমি রান্না ভালো করো আজ।

মালেকা বলে, একদিনে ত আর বাবুচিনী হোয়ে যাবো না। যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

— তুমি ত বাবুর চিনি।

— কি করে।

আরিফ মুখ গম্ভীর করে। — মিষ্টি গন্ধ না পেলে নায়েব-বাবু পাড়ায় এত ঘুরঘুর করে। বাবুর চিনি বৈকি তুমি।

কথা শেষ হয় না। হঠাৎ হেসে ফেলে আরিফ।

— যাও, ও সব ইয়ার্কি আমি পছন্দ করিনে।

— আজ আবার নীল শাড়ী পরেছ।

নুনের ছিটা দেয় আরিফ কাটা ঘায়ের উপর।

— তোমার চোখ কী ফুটে গেছে!

নিজের চোখের উপর আরিফ দুই হাত চাপা দিল।

— আহা শুধু আমার পোড়া চোখের জন্যে এত বাহার।

হাত চাপা খোলে না আরিফ। সামান্য আঙ্গুল ফাঁক করে সে বলে, এইবার বলো তোমার জন্যে নয়। আমি ত অঙ্গ-লাচার।

দাঁত চেপে জোরে হাসে মালেকা। চোখে দৃষ্টিম ভরা।

— এমন করে দিন কাটলে চলবে। মেহমান ধরে এনেছ, থবর আছে?

মালেকার রং শ্যাম, চোখ দুটি ডাগর। দেঙ্গুবয়ব ঝঁঝৎ স্তুল। মান ছাপ থাকলেও চেহারার ভেতর উজ্জ্বলতা আছে যা মনেরই স্বীকৃতিকাশ বলা চলে।

— যো হৃকুম, জালটা এনে দাও।

মালেকা রান্না ঘর থেকে জাল তালে রাখে। দুটি মাত্র ঘর। বাইরে খড়ো দহলিজ আছে, হারেসের আস্তানা সেইখানে।

— ইন্দুরে কেটে গেছে ক'জায়গা দেখো। খিয়ে-জালটা যা-তা করে রাখবে। মালেকা জাল খুলে দেখে।

— অত ঝাল ঝাড়তে হবে না। সুতো আনো। দু-জনে হাতাহাতি সেরে ফেলি।

মাত্র দু-ঘর পড়শী। আরিফের মা-বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছে। জ্ঞাতি প্রতিবেশী একজন আছেন। বড় ঝাগড়াটে। আরিফের সঙ্গে তাদের বনিবনা কম। নির্জন দীপের স্বাধীনতা দু-জনে উপভোগ করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগীতার ভাবই তাই বেশী। পুত্র রসূল, তাদের পাঁচ বছরের ছেলে। কিছুটা বেপরোয়া স্বাধীনতা সেই খর্ব করেছে শুধু।

বিঘে দুই জমির পর অন্যান্য প্রতিবেশীদের ঘর। রসূল দেখতে যায় সেদিকে। স্বামী-স্ত্রীকে তাই ছেলের সামনে কিছুটা স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়।

জাল সেলাই প্রায় শেষ, এলো রাসূল।

— বাপ, তোমাকে চাচা ডাকছে।

চাচা অর্থাৎ হারেস।

আরিফ জবাব দিল: তুই তার কাছে ছিলি ত বাবা। কেমন শহরের মিঠাই এনেছিল তোর জন্যে।

— আমি ত তার সঙ্গেই গল্প করছি ।

রসূল বলে, জাল সেলাই করছ মাছ ধরবে?

— তোর চাচা খাবে কী রাত্রে? তা বলে তাকে বলিস্নি এ-কথা ।

— না, বাবাজী ।

রান্নাশালের মাচাং থেকে একটা মুর্গী ফরফর শব্দে উড়ে এলো, তারপর কর্ণবিদায়ী ডাক কটকট শব্দ ।

মুর্গীর পালকে সূতা বেঁধে চল্ছে জাল সেলাই । ডাক শব্দে মালেকা বিরক্ত হয় : খালি ডাকনি আছে । আগুর সাথে দেখা নেই । এমন হারামী মুর্গী কার গাদায়, কার চালে আগু পেড়ে আস্বে ।

— ওটার গলায় ছুরি চালাও । আরিফ উত্তরের অপেক্ষা করে ।

— বেশি ধাঢ়ী রাখবে না একটা । বন্ধুর জন্য দুপুরে একটা করেছ, কাল অন্য একটা ধরো । তবে ধাঢ়ী নয় ।

কথা ধরে আরিফ : হাত চালাও । আমার এদিক ত শেষ ।

— আমি ত মন্দ নই, রাগ হোল বুঝি । আসলে বন্ধুর নামে নিজের ‘নোলা’ সড়সড় করছে । জিভটা দেখি ভজুরের!

রসূল উঠানের উপর খোলামকুচি কুড়ায় । ডোবার ধারে ব্যাঙছিরি খেলাবে সে ।

আরিফ ডাকে, রসূল ।

— কেন বাপজী ।

— তোমার মার সঙ্গে একটু জাল ধর তো সেলাই করুক । আমি তোমার চাচার সঙ্গে কথা বলে আসি ।

খড়ো দহলিজ । তবু বেশ ধৰধৰে লাল-মাটির লেপনে চক্চক করছে ছিটে বেড়ার দেওয়াল । হারেসের আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয়নি । মাদুরের উপর রঙীন কাঁথা মেলা । মালেকা বালিশের ঢাক্কনী তৈরী করেছিল অবসর সময়ে । হারেসের জন্য তাও দহলিজে বেরিয়েছে । বেনু সিপটীর ভাল পাখা হয় । মালেকা তার ধারে ধারে ন্যাকড়া রাঙিয়ে ঝালুর তৈরি করেছিল । হারেসের হাতে সেই পাখা । কম কৃতজ্ঞ নয় সে । ঘুমানোর পূর্বে দুই চোখ আনন্দে অনিছায় বুঁজে এসেছিল ।

আরিফ ও কম লৌকিকতা বজায় রাখে না । দহলিজে পা দিয়েই সে বলে, কোন কষ্ট হয় নি, হারেস ভাই ।

— এত আদর আমার জীবনে বোধ হয় এই পয়লা-বার পাওয়া । আমার সব কাহিনী ত তৃমি শোনিনি ।

অতীত-কে কবর দিতে চায় হারেস । সাধু ইচ্ছা হঠাৎ বেরিয়েছে মুখ থেকে ।

— ঘুম হোয়েছে ভাল । পথ হেঁটে যা কষ্ট পেয়েছ ।

হারেস হাসে ।— দেড় ক্রোশ পথ আবার পথ-হাঁটা ।

— আর একটু ঘুমোও ।

আরিফের উদ্দেশ্য, সেই অবসরে আমি মাছ ধরে আসি ।

হারেস অনুনয়-সুরে বলে, না আর ঘুমোব না । রসূলের সঙ্গে কত কথা হলো!

— না, তবে ঘুমোও ! শয়ে জিরোও । আমি পান পাঠিয়ে দিচ্ছি ।
— পান ত আমি খাই না ।
— খেতে দোষ কী । আর দোস্তানীর হাতের পান ।
লজ্জা পায় হারেস । দুই জওয়ান চোখের হাসি বিনিময় করে ।
— এত পান কেনের কী দরকার ছিল ?
মাথা দেলায় হারেস ।— এ ভাল বিপদ, আমি খাই না বলে আর কেউ খাবে না ।
আবার হাসে হারেস ।
— আমার একটু কাজ আছে । এক ঘণ্টার ভেতর আসব । সঙ্গ্য-বেলা বেড়ানো
যাবে ।

আরিফ চলে গেল ।

দহলিজের কামরায় বসে হারেস হাই তোলে । আরো খানিক ঘুমোবে নাকি সে ।
বহুদিন পর এসেছে অখণ্ড বিশ্বামৈর আমন্ত্রণ । সম্মুখে ফাঁকা মাঠ । দক্ষিণের হাওয়া আসে
ধান ক্ষেতের মর্মর বুকে । খোলা খট্টখটে প্রাঙ্গন । দহলিজের পূর্ব টেরে শুধু কয়েকটা
বসতি । তার কোন কোলাহল পৌছায় না । এমন জায়গায় ঘূম আসারই কথা ।

বালিশের ঢাক্কনী দেখতে লাগল হারেস । সংসার-নিপুণ নারীর স্পর্শ ঝঁজে না সে ।
কারিগরির প্রশংসা-উন্মুখ মন তার । হারেস পুনরায় শয়ে পড়ে ।

ক্লিষ্টমুখ শহরের বৈকাল এখানে নামে না । বিশ্বামৈ, বিশ্বামৈ ত সে চায় ।

নৈশ ভোজনের সময় আরিফ বস্তুকে নিজে ধৈরে নিয়ে এলো । দুপুরের আতিথেয়তা
সে বাইরে সম্পন্ন করেছিল । বেগানা পুরুষ, ভাড়ার পর্দানশীনরা পাছে কিছু বলে ।

হারেস ঘরে চুকে দমে যায় । দায়িত্বের চিহ্ন চারিদিকে প্রকট । ভাড়ার ঘর আর
শোয়ার ঘর একসঙ্গে মিশে আছে । আলুনায় ময়লা কাঁথা ঝুলছে । একদিকে মাচাঙ্গে
কাঠের রং-চটা সিন্দুক, অন্যান্য তৈজসপত্র । মেঝের বিছানা বেশ তক্তকে । এই জৌলুষ
অন্য দিকেও পরিষৃষ্ট । মামুলী হলেও নিজস্ব শালীনতা আছে তার । বাতাস খেলে, পুবের
জানালাটি বড়, রৌদ্রের উঁকি সকালেই পাওয়া যায় । তবু ভাল লাগে না হারেসের । আরো
প্রার্থ চেয়েছিল সে বস্তুর কাছে । এরা কী তবে তারই মতো গৃহসূখী ভাগ্যহৃত ?

চূড়ির আওয়াজ আসে আনাচ-কানাচ থেকে । হারেস বোঝে উঁকি-বুঁকি মারছে কেউ ।
নতুন লোক-দেখার কৌতুহল গায়ের মেয়েদের সহজে নিবৃত্ত হয় না । সঙ্কোচ লাগে
হারেসের । স্বাভাবিক হোতে পারছে না সে ।

পিদিয় জুলছিল ঘরে । জানালার ওপরেও আলো ঠিকরে পড়ে । ভিটের পার্শ্ববর্তী
গাছের ছায়া ঘিরে জমাট অঙ্ককার । কুঁচ বকের প্রেতায়িত কষ্টস্বর ডোবার ভেতর প্রতিধ্বনি
তোলে । বাইরের থম্ভমে পৃথিবী ।

ঘরে খাওয়ার আয়োজন চল্ছে । আরিফ ছুটাছুটি করছে । দরজার সম্মুখে সে দাঁড়িয়ে
থাকে, এগিয়ে যায় । মালেকা ভাত ব্যঙ্গনের থালা নিয়ে আসে ।

হারেস রাজভোগের দিকে চেয়ে লজ্জিত হয়, মনে মনে হাসে । মুগীর গোস্ত, মাঞ্চর
মাছ, দই, শাক, ডাল আর আলু ভাজা । তার মত ঘরামীর জন্য রাজভোগ ছাড়া কী !

পিতলের চক্ককে থালা । মালেকা নিজে তেঁতুল দিয়ে পরিষ্কার করেছে ।

থালা দুই বক্সুর জন্য আলাদা।

খাওয়ার সময় এক কাও ঘটে গেল। হারেসের থালার উপর বড় বাটি উপুড় করা। হাসিমুখে বাটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা মুগীর ছানা চিকচিক করে দরজার উপর গিয়ে পড়ল।

বাইরে চৌকাঠের ধারে চাপা হাসির স্বরধ্বনি বাজতে থাকে। আবার নতুন থালা এলো। আগেকার থালার উপরে সামান্য ভাত ছিল মাত্র।

আরিফ হাসে : দোষ্টানীর কাছে ঠকে গেলে, ভাই!

— তা ঠক্কামই ত। কাঁচা মুগী যদি খাওয়ানোর ইচ্ছা ছিল আগে বল্লেই চলত। হারেস হাসে। শুধু হাসি নয়। প্রাণদেবতার জন্য অঙ্গলি।

ডাল কম পড়েছিল, আরিফ বাইরে গেল একবার। মালেকা ডাল নিয়ে অঙ্ককারে প্রতীক্ষা করছে।

ফিস্ফিস আওয়াজ ওঠে, এমন বোকা বক্সু তোমার।

হারেসও শোনে আর মুখ টিপে-টিপে হাসে।

— তোমার দোষ্টানী বলছে বড় বোকা বক্সু আমার।

হারেস জবাব দিল না। খানিক পরে সে বলে, দোষ্টানীর কাছে বোকা হতে দোষ নেই।

রসূল ঘূরিয়ে পড়েছিল। তার অভাব হঠাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। হারেস জিজেস করে, রসূল কোথায়?

— সে ঘূরিয়ে পড়েছে।

— আহা! ছেলের যাও ঘূরিয়ে পড়েছে।

হারেস সহজ হয় নিমিষে। মীরুণ্ণা থেকে বহু কাল আর স্থানের দূরত্ব পার হয়ে এসেছে সে। খাওয়ার সঙ্গে শত প্রকার আনন্দ বন্যার চেউয়ের মত ভেঙে পড়েছে।

আরিফ হাতচানির ইশারা বোঝে। থালা ছেড়ে বাইরে এলো, চৌকাঠ থেকে সে বলে, দোষ্টানীর জবাব : ছেলের মা ঘুমোলে ছেলের বাপ-চাচা পানি খেয়ে ঘূরিয়ে পড়তে এতক্ষণ বাধ্য হোত।

সঙ্কোচ কেটে যায়। প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে জোর-গলায় হারেস বলে, এ-ভয় দেখাবেন না, আমিও রান্না জানি।

মধ্যস্ততার পদ আরিফের। প্রশ্নকারীর মুখের কথা অপরের নিকট গোচরীভূত করে।

— তবে হাতে চূড়ি দেখছি না কেন?

— ওটা মেয়েদের একচেটে ব্যবসা নয় যে হাতে চূড়ি দরকার হবে। কাল খুন্তি দিয়ে দেখবেন।

— মকতবের মৌলানা নই যে আবার পরীক্ষা নেবে। বাধা দিল আরিফ।

— কথা বলেই পেট ভরাতে চাও, দোষ। সেও আবার থালায় এসে বসল।

হারেস দেখে, ঘরে একটা ভাঙা তক্ষপোষও নেই। মাটির শিশুরা মাটির সঙ্গ ছাড়তে চায় না যেন!

রাত্রি হয়েছিল অনেক। দহলিজে এলো তারা। আরিফ বলে, আমি এখানে ঘুমোব।

- কি দরকার! ভয়টয় নেই আমার।
— তবু নতুন জায়গা। আরিফ সন্তুষ্ট হয় না।
— না, তুমি ঘরে যাও।

মৈশ বাতাসের আনাগোনা শুরু হোয়েছে। মেঘহীন মধ্য-গগন। নীলের উপর তারার চুম্বুড়ি বাঁচীজীর চকিত, বাঁকা চোখ-ইশারার মত।

গভীর পরিত্পিণ্ডি হারেসের বুকে। বানভাসি খড়কুটো হঠাৎ নীড়-রচয়িতা বিহঙ্গনীর গলার পালকের স্পর্শ পায়। বিস্মিত হারেস। মিঠুর পরিবেশের ভেতর প্রাণসন্তার এত উদ্ধাম কল্পনা!

জুলুম-অন্যায়ের শত ত্রুর-চক্র-নিষ্পেষণ এদের ধ্বংস করতে পারে না, শত মৃত্যুরে মরে না ওরা। ওদের প্রাণতরু বিদীর্ণ পাষাণেও মূল মেলে।

আরিফের বলদ-জোড়া আথালে খড় চিবায়। দহলিজের বাম পাশে কয়েকটা খুঁটা। একটায় ছাগল বাঁধা রয়েছে।

হারেস চেয়ে চেয়ে দেখে। লাঙলও আছে তার বন্ধুর। তার সঙ্গে যদি মেহনতের শরীর থাকে, আর কী চাই একজন জওয়ানের? ঘিঞ্জি শহরের চেয়ে এই জীবনের মাদকতা দের বেশী।

আরিফ বলে, আমার বলদ-জোড়া জয়ীফ অঙ্গলো দিয়ে চাষ চলে না।

— একটা দামড়া কিনে দু-বছর টানলেই বলদ। জবাব দিল হারেস।

— তা-ও কিনেছিলাম পাঁচ টাকার মড়কে শেষ হোয়ে গেল। এই দুটো টিকে আছে কোন রকমে। বাবার আমলের বলদ। আমি কিছু করতে পারিনি ত ভাই!

হারেসের গোপন কামনা বগ্নাহান ঘোড়ার মত ছুটে চলে। তারই দ্যোতনায় সে আবার জিজ্ঞেস করে: এক জোড়া বলদের দাম কত?

— চল্পিশ-পঞ্চাশ।

একটু নিরাশ হয় হারেস। সহজে নিতে আসে না তার উৎসাহ।

— আচ্ছা, এক কাজ করা যায়। দুটো দামড়া কেনা যেতে পারে দশ-বারো টাকায়। দেড় বছর সেই ত লাঙলের জুগগি হবে।

আরিফ বন্ধুর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে। — তা হয়, বন্ধু। তোমার কাছে লুকোব না। কিন্তু এক সঙ্গে অতঙ্গলো টাকা। আবার যদি মড়ক লাগে।

— সব কাজে কপাল-টোকা। কিছুটা ঝুঁকি ত নিতে হয়।

আরিফ সায় দিল: তা নিশ্চয়। তবে ছাগলে বেশি লাভ।

— তোমার ছাগল দেখছি মোটে একটা।

— সে আর এক দুঃখের কথা, দোষ্ট। দুটো ধাঢ়ী ছিল। একটা দেখছ তো। সেটাকে পালতে দিলাম। আমার ঘরে মোটেই বিয়োল না। হরি নাপিতের ঘরে গিয়ে চার বাচ্চা। দুটো খাসী দুটো পাঠী। আমাকে ধাঢ়ী একটা খাসী! আর পাঠী বাচ্চা দিয়ে গেল। মড়কে সব খতম।

— যত বড় গরীবের উপর।
হারেস বিজ্ঞের মত বলে।
প্রভাতের সূর্য বাঁশ-বনের মাথায় ঝলমল করে। হিমেল আশ্বিনের সকাল উৎপন্ন হোতে থাকে।

— একা-লোক ক'দিক দেখি। রসুল যদি একটু বড় হোত!
নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতা কাটানো এত শক্ত। হারেসের মনে দোলা লাগে।
— জমির দিকে মন দিলে এ-সব কাজ হয় না। ছাগল রাখলে খৌয়াড়ের পয়সা দিলে চলে না। এত তদারকী একার দ্বারা হয় না।
আরিফের খেদ বড় করুণ শোনায়।

— তোমার জমি-জায়গা গাঁয়ের ভেতর সব নয়?
আমার জমি? আরিফ হাসে। — বাবার আমলে জমি-জায়গা যা ছিল তখন-ই ‘বেচারাম’ লাগে। এখন ফতুর। সব ‘বেচারাম’-এর পেটে। ভাগে চাষ করছি। নিজের জমি থাকলে, এমন দূরবস্থা! যেগুলো খাজনায় তার হার বিষে- পিছু তিন-চার টাকা।

হারেস দুঃখিত হয়। বন্ধুরও নিজস্ব জমি নেই।
— কিছু জমিয়ে জমি কেনার চেষ্টা করো না?
আরিফের হতাশা মুখের চুক-শব্দে বেরিয়ে পড়ে।
— কি করে জম্বে। ভাগচাষীর আবার জমে। তোমার দোতানী সংসার বোঝে, তাই বেঁচে আছি। দিন-আনা, দিন-ঝাওয়া। বর্ষকালে ঝুকাবার ঘরের খোরাক ছিল, তাই কোন কষ্ট হয় নি। এবার কায়ক্রমে চেষ্টা করব কিছু জমাতে।
— নিজের ভবিষ্যৎ একটু দেখা দরকার।

— তা কি আর ভাবি না। অসুস্থিসূখ রোগদেড়ি বড়-ঝাপটার পেছনে ত মাঝে মাঝে ফতুর হোতে হয়। ভাল আছে। হওয়া অদ্বি অসুস্থি। কবরেজ কম পয়সা নিয়েছে।
জীবন-সংগ্রামের কাহিনী হারেস শোনে। গৃহসূখ তবু তাকে প্রলুক্ষ করে। আরিফ বলেছিল, সে নিঃসঙ্গ। সেই কথার বুদ্বুদে তার মন ভরে যায়।

একবার দহলিজের ভেতর গেল সে। তার শার্ট ঝুলছে। পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট-সহ বাইরে এলো সে।

— দোষ্ট, এই পাঁচ টাকা দিয়ে একটা ছোট দামড়া কিনো।
আরিফ ইতস্ততঃ করে। বন্ধুর অযাচিত করুণা লজ্জা ঢেকে দেয় তার সর্বাঙ্গে।
— না, তা হয় না। তুমি মেহমান, দুদিনের জন্য এসেছ। এ ভাল দেখায় না।
হারেস জোর করে নোট তার হাতে ঘুঁজে দিল। ঘুম দিচ্ছে নাকি হারেস? নিঃশ্বাস ফেলার জায়গাটা স্থির করে ফেলেছে সে। শাসরোধী জীবিকা-সংগ্রামের বোঝা তার ভাল লাগে না।

অন্দরে মালেকা ভারী অস্ত্রিষ্ঠ হয়।
— একি তোমার ব্যাভার শুনি। চিরকাল হাভাতে। মেহমানের কাছে ঘরকন্নার কথা!
আবার টাকা নিয়েছ হাত পেতে!
— আমার বন্ধু। বলতে দোষ কী!

মালেকা আরো ক্রুদ্ধ হয় : বঙ্গুর কাছেই লোক গোপন করে। কাল সন্ধ্যায় কেরোসিন ছিল না। তাই বোতল দিয়ে বল্লাম, সদর দিয়ে যেও না। মেহমান কী ভাববে। কাল বলেছিলাম, খিড়কী দিয়ে যেতে!

রাগাবিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে মালেকা আরিফের উপর।

— আমি ও খিড়কী দিয়ে গেছলাম।

— সব কথা ভেঙে না বল্লে তুমি বোঝ না। যাও, টাকা ফেরৎ দাও।

— মনে কষ্ট করবে।

মালেকার আর কথা চলে না। পাঢ়াগাঁয়ের মেয়ে। সেও মনের হাদিস রাখে।

বিকালে হারেস বাজারে আরো দু-তিন টাকা খরচ করল। আরিফের ছেলেকে কিনে দিল একটা জাপানী খেলনা মোটর। মিষ্টি আর শাক-সজী বাড়ির জন্য।

কিসের নেশায় খরচ করে হারেস? তবু সে আনন্দ পায়। সঞ্চয়ের প্রতিজ্ঞা হঠাৎ শিথিল হোয়ে যায়।

মালেকা রাত্রে স্বামীর উপর আগুন হোয়ে উঠে।

— তোমার বঙ্গুকে নিয়ে থাকো। আমি চল্লাম। পয়পয় করে বলছি মেহমানের উপর এত জুলুম করবে তুমি। হা-ঘরে, হা-ভাতে!

— আন্তে কথা বলো। তার কানে পড়বে।

আরিফ মালেকার ত্রোধ উপলক্ষ করে।

— সত্যি বড় অন্যায় হোয়েছে।

— শুধু অন্যায়। ঘাট।

মালেকার মুখ ক্ষেত্রে অপূর্ব শ্রী ধীরণ করে। আরিফ সে-দিকে চোখ ফেলতে সাহস করে না।

আন্মনা সে বঙ্গুর কাছেই সক্রৈ উপস্থিত হয়। দহলিজের কোণে পিদিম জুল্ছিল। হারেস বাইরে অঙ্ককারে একা।

রসূল সব ফাঁস করে দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর কলহ হারেসের কানে যায়। মালেকার প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগে। রাত্রে খাওয়ার সময় আবহাওয়া আরো সহজ করে ফেলে হারেস।

রসূলের মধ্যস্থতায় সে বলে, দোতানী সাহেবা, মাফ করবেন। আমাকে পর মনে করবেন না। আরেফ আমার ভাইয়েরই সমান।

মালেকা অনুমান করে সব-কিছু। রসূলের মারফৎ জবাব আসে : মা, আপনাকে সালাম জানালে। আপনার ব্যাভারে তা বুঝতে বাকী থাকে না।

আরিফ নিষ্ঠক। বঙ্গুর খাওয়া-দৌওয়ার যোগাড় তার থায়ল। এই কয়েকদিন তার অন্য কোন কাজ নেই। কৃষক সমিতির জবর সদস্য সে, আজ কয়েক দিন অনুপস্থিত।

হারেসকে এ-সব ঝঞ্জাটে ফেলতে চায় না সে। বারো মাস দুঃখ ত লেগেই আছে। বিদেশী বঙ্গু একটু নিশ্চিত হোক।

চাষবাস জনমনিশ ছাড়া খাটে আরিফ। নচেৎ সংসার চলে না। তারও খৌজ রাখে না

সে। অজানিতেই সে নিজের আহওয়ালের কথা বলে ফেলেছিল সেদিন। হঁশিয়ার খুব আরিফ তারপর।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হারেস পছন্দ করে না। এত দূরে দূরে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর। আঞ্চলিক সামগ্ৰী চায় সে। অথচ নিজে সে কিছুই বলে না। অযাচিত সামগ্ৰী মূল্যচ্যুত হয়, সে জানে।

দশ-বারো দিন পরে মালেকা আরিফের হাতে নিজের দু'ছড়া পৈঁচি দিয়ে বলে, বঙ্কক রেখে এসো। বঙ্কুর পয়সায় এতদিন খাতিরদারী করলে, নিজে কিছু করো, মুনিশ পর্যন্ত খাটলে না ক'বিন।

মাথা নিচু করে আরিফ।

— যাও, আমি রাগ করছি নাকি।

— আর ছাড়িয়ে দিতে পারব? হতাশাব্যাঙ্গক ছায়া আরিফের চোখে।

— যাক না পৈঁচি। আমার কপাল ত আর যাবে না তার সঙ্গে।

গমনোমুখ আরিফকে মালেকা আরো বলে, কিপটেপনা করো না, ভাল মাছ তরকারী এনো।

হারেসও আরিফের সঙ্গে যাওয়ার অভিপ্রায় জানায়। রাজী হয়নি আরিফ। শেষে এক শর্তে সে মত দিল: বঙ্কু হাটে এক পয়সাও খরচ করবে না।

গঞ্জে বেনেদের দোকান প্রথম গন্তব্যস্থল। টাকুঞ্জি-ভাণ্ডার ত সেখানে। আরিফ তাই বিব্রত হয়। হারেসের সম্মুখে বঙ্কুর ব্যাপার তার পক্ষে সন্তুষ্ট নয়।

অজুহাতের আশ্রয় খোঁজে সে। গঞ্জের এক-টেরে বকুলতলায় হাটবার, হাটবার বৈরাগীর গান করে। আজ খুব আসুন জমেছিল। এক বুড়ো বৈরাগীর সঙ্গে বৈরাগিনী এসেছে। তা নিয়ন্ত্ৰিতিক ব্যাপার কিন্তু এই বৈরাগিনীর রূপ হাটে ফেটে পড়ছে। বয়সে নিতান্ত কঁচা। একতারা জুড়ে কীর্তন চলছে। ছেলেছোকরা হাটের লোক ভেঙ্গে পড়ছে এই আস্তানায়।

আরিফ হারেস দু'জনেই গান শোনে। অবশ্য আরিফ অন্যমনক্ষ।

মনোহর শাহী কীর্তনের দুটো পদমাত্র দোহার চলছে। আরিফ বলে, দোষ্ট তুমি গান শোন আমি এখনই আসছি।

— আমি সঙ্গে যাব।

— না।

হারেস আনন্দ পায়। খঙ্গনী একতারা বাজছে। রূপসী বৈরাগিনী মন্তব্যের আকর্ষণও বটে। রসিক হাটুরের মুখে কোন কথা আটকায় না। বানবন পয়সা পড়ছে বকুলতলার রোয়াকে।

এই সময় হাট জমাট বাঁধে। ভিড় পাতলা করে দিয়েছে বৈরাগিনী। ‘চলচল অঙ্গ নবনী বহিয়া যায়’ ভিড়ের মাঝ থেকে একজন ব্যঙ্গ করে গানের সুরে। দর্শকদের মধ্যে দাঁত চাপা থাকে না কারো।

হারেসেরও হাসি পায় আজ। দূরে আরিফ চোখে পড়ে তার, বেনের দোকানের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। বেনের দোকানে আরিফ! মীরগাঁ ছেড়েছে হারেস এক বছর। গাঁয়ের মানুষ

বেনের দোকানে কত দুঃখে উঠে, সে জানে। হয়ত দোস্তানীর গহনা খরিদে গেছে আরিফ।

গানের মউজ উঠেছে। তারি মধ্যে ফিরে এলো আরিফ।

—ভাই, আমি বাজার করি। তুমি গান শোনো।

বৈরাগিনীর কষ্টস্বর চলন-সই যিষ্টি। অঙ্গভঙ্গী আর বয়স সে-অভাব পূর্ণ করে। হারেস
আরিফকে সম্মতি দিল।

ননদিনী, বলগে নগরে।

মরেছে রাই কলক্ষিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

তপস্থী-তপস্থিনীর সরু-মোটা দুই গলা মিশে অপূর্ব ঝাঙ্কার তোলে।

এখানে সকলেই ডুবতে বসে।

কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে হারেস পেছনে তাকায়, আরিফ।

—তুমিও ডুবতে বসেছ নাকি, বক্সু। চলো বাড়ি ফিরি।

হারেস হেসে বক্সুর অনুসরণ করে। একটু দূরে এসে সে বলে, বেনের দোকানে
গিয়েছিলে কেন?

বেমালুম ঝুটের বেসাতি শুরু হয় : দোস্তানীর গহনা দরকার।

—কিন্তে না?

—না দরে পড়ল না।

—চলো, বেনের দোকানে গহনা দেখে আসি।

—তা হয় না। বাধা আসে আরিফের কাছ থেকে।

—আমি কিছু খরচ করব না।

হারেসের জিদ এড়াতে পারে না আরিফ।

রূপার বিছার দর জিঞ্জাসা করে সে দোকানে।

—দশ আনা ভরি রূপা। ছ-ভার হয় এখন, ওজন করব?

—দশ আনার কম হয় না?

দোকানদার জবাব দিল, ওই ত তোমার সঙ্গে এইমাত্র নতুন পৈঁচি বক্স দিয়ে গেল,
কত করে দর ধরলাম জিজ্ঞেস করো।

আরিফ মাটির সঙ্গে মিশে যায়। হারেস তার দিকে তাকায় না।

—কটাকায় বক্সক রাখলে, দোকানী?

—পনর টাকা।

—যাক পরে আসব।

দুইজনে বেনের দোকান থেকে নেমে পড়ল। আরিফ মুখ-নীচু করে হাঁটে। হারেসের
কষ্ট হয়। না-ধরাহোঁয়া সান্নিধ্যের মধ্যে তার আসন টল্ছে। এত দূরে দূরে মানুষের
হৃদয়ের সীমানা।

আশ্চর্যের খন্দ ঘেঁষ উঠে যায়।

হারেসের দুই চোখ সজল হয়ে উঠে।

দু-দিন পরে হারেসকে এগিয়ে দিতে এলো আরিফ। দুই বক্সুর মন হাঙ্কা নয়, অজ্ঞানিত
আশ্বাদের শৃঙ্খি হারেসের বুকে। মাঝে মাঝে অদৃশ্য আঘাতে সব বিশ্বাদ হয়ে যায়।

রসুল বলেছিল— মা বল্লেন, আবার কবে আসবেন। তারপর কলাপাতায় বাঁধা এক ঠোঙ্গা খাবার দিয়েছিল সে হারেসের হাতে।— মা তৈরী করেছে, নাস্তা করবেন।

—আসব বৈকি বাবা। এ-ত আমার আপনার ঘর। মাকে দোয়া বলো।

বালকের আধ-ভাষ, অদৃশ্য নারীর মতো সে ছিঁড়বে কি করে। রসুল আবার ছুটে এসেছিল। হারেস হাতে একটা সিকি শুঁজে দিতে ভুলেনি।

পাড়া ছাড়িয়ে একবার পেছনে তাকিয়েছিল হারেস। ভিটার উপর এক নারী গাছের আঢ়ালে চেয়ে আছে। বালকের চোখ তারই দিকে নিবন্ধ। তরুণতার ভেতর অজানা আকর্ষণ।

মাঠে দুইজনের সংলাপ চলে।

—আবার এসো ভাই, শিগগীর। একটা চিঠি দিও।

—নিশ্চয়। বড় ভারাক্ষান্ত হারেসের মন। আপন করে নিতে মানুষকে এত দেরী হয়। সলিম মুন্শী বিশ বছরেও দূরে রয়ে গেল। আরিফ কী তাদের স্বগোত্র! ব্যবধানের পাহাড় শুধু পদে পদে।

হঠাতে হারেস বলে ফেলে, তুমি জান ত ভাই আমি মরীন।

আরিফের মন তার ক্ষত উপলক্ষ্মি করে না। লৌকিকতা রক্ষার জন্য বলে, তাতে কী হোয়েছে, আমি কোনু সৈয়দের বাচ্চা?

—তুমি ত শেখ।

—ও কথা আমি মনেও জায়গা দিই না। সমস্তির ভেতর চুকে দু-বছরে বহুত কথা শিখেছি। ও-সব ফাঁকা কথা। এই জন্যে বুঝি তুমি কষ্ট পেয়েছ!

—না।

—আমারও কষ্ট হবে তা-হলেওসব খোদার শান। দু-জনে বিপদে এক জায়গায় হোয়েছিলাম। না-হলে কে কা, কে চিন্ত।

কথার মোড়-ফিরে যায় তখনই : আবার আসবে বলো। গরীব আমরা তুমি ত জান।

পথের উপর দাঁড়ায় হারেস : নিশ্চয় আসব। হয়তো এক হঙ্গা পরে দেখবে ঝুপ করে এসে পড়েছি।

হাঙ্কা মনে হাসে হারেস।

দিগন্তের শুভ্র মেঘের পটভূমি হেলান দিয়ে তাল-গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সবুজে নীলে প্রান্তর একাকার।

বারণ শোনে না, স্টেশন পর্যন্ত হারেসের সঙ্গে এলো আরিফ।

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পড়েছে। ট্রেনের ছাইশেল শোনা গেল।

ফ্যান ফেলতে আলি বাইরে এসেছিল। চটের পর্দার উপর হারেসের ছায়া দেখে সে লাফিয়ে উঠে। সোজাসুজি হারেসের হাত ধরে সে হাঁকে, এসো-এসো অমাবস্যার চাঁদ, ডুমুরের ফুল। একদম বারো দিন গায়েব!

—দোষ্টের বাড়িতে দেরী হয়ে গেল।

—না ডুব মেরেছিলে। চোখ মটকায় আলি।

- বারো দিন কেটে গেল। আশ্চরয়ে। হারেসের চোখেও বিস্ময়।
- চলো বাসার ভেতর। আলির অভিনন্দন।
- সঙ্গে সঙ্গেই হারেস বলে, মিষ্টি এখন-ও আসে নি?
- না, আজ ক'দিন কাজ পড়েছে। তাগাদায় গেছে।
- শার্ট খুল্তে খুল্তে হারেস জিজ্ঞাসা করে, কোথায় কাজ হচ্ছে?
- আরে বাজে কথা রাখো। বলছি তোমার ভাত চাপাতে হবে। ছোট ইঁড়িটা ধুয়ে আনি।
- আমি হোটেলে খেয়ে আসব।
- তা হয় না।
- এতক্ষণ ভুলেছিল হারেস, হঠাৎ মনে পড়ে তার বন্ধুর বাড়ির পাথেয়র কথা।
- আমার সঙ্গে খাবার আছে।
- হিসেবী হারেস খোরাকী খরচ আজ দিতে চায় না।
- দেখি খোলা যাক।
- তোফা। একজনের জন্য যথেষ্ট। এক ডজন পূর-পিঠে। দুটো বড় চিংড়ি আর আলু ভাজা।
- ভাগভাগি করে খেলেই চলে যাবে।
- আলি ভাজা-আলুর টুকুরো মুখে পুরে বলে, ঠিকস্থায়।
- দর্শনার উপর বসল হারেস। কাজ হচ্ছে কোথায়?
- ঘরামির কাজ নেই। রাজমিষ্টীদের শ্রেণীগাড়। দুই জনে এক সঙ্গে মুখ বাঁকায়।
- আলির হিংসা হয় যেন : তুমি যাজ্ঞোর পর চারিদিন কাজ ছিল না, শহরে বসে খোরাকী খেতে হোলো। তোমার বর্ণন ভাল!
- সোয়াস্তির নিঃশ্঵াস ফেলে হারেস। বন্ধুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা বাড়ে। হাতে মুখ ধোয়ার পর যেমে উঠে সে। কড়িকাঠের মাথায় ছোট জানালা বাতাস সেঁধোবার পথ-ও নেই। আলি চুলোর পাশে ঘায়ে স্নান করছে। এমন সময় আবার গ্রামোফোন বাজায় কে?
- তাদেরই পাশের ঘরে গ্রামোফোন বাজেছে। বাড়িওয়ালার ছেলে নাসিমের এত দৃঢ়সাহস!
- হারেস কৌতৃহল জানায় : নাসিমের গ্রামোফোন নাকি।
- হ্যাঁ।
- তরকারী কুট্ছে আলি। হারেসের দিকে না-চেয়েই সে জবাব দিল।
- বাপ-ব্যাটায় ঝগড়া মিটে গেছে?
- কুকুরের ঝগড়া। খ্যাক। তারপর লেজগড়িয়ে মুখ সোঙাসোঙি।
- থুথু ফেল্তে বাইরে গেল আলি।
- তা-হলে বারো দিনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অবাক হোল সে, বাড়িউলী চাটীর মুখের পর্দা খসে গেছে। হারেসকে সামগড়ের কথা জিজ্ঞাসা করল। নাসিম আবাজানের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে গেল।
- একে একে সবাই আস্তানায় জুটে। মিষ্টি চটে গেল হারেসের উপর। কাজ পড়েছে। বেশি লোক নেই তার। এমন ঢুব দিয়ে বসে থাকা অন্যায়। শুকুর দেশে চলে গেছে।

বাসার একজন লোক কমেছে হারেসের কাছে তা সুসংবাদ। হাত-পা ছাড়িয়ে শোয়ার জায়গা হবে। খোরাকী মাথা পিছু বেশি পড়বে, তা জেনেও সে আনন্দিত হয়।

মেহেরালি গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করে, ছ-বছর বয়স পর্যন্ত সে গাঁয়ে ছিল। গাঁয়ে মানুষ। আঞ্চীয়-স্বজন রয়েছে। আজকাল যাতায়াত বন্ধ হোয়ে গেছে। ছেলের বিয়ের সময় বৃদ্ধ একবার গ্রামে গিয়েছিল। সেও সাত বছরের কথা।

মেহেরালির রোয়াকে বাতাস বেশ আসে এই আকর্ষণ। নচেৎ গঁজ তার সঙ্গে জমে না। বয়সের ব্যবধান সব ফাঁক স্থির রাখে।

হারেস খেই টানে, গাঁয়ে কে আছে আপনার?

—চাচারা ভায়েরা আছে।

—তারা চাষবাস করে না?

—কেউ-কেউ চাষ-বাস করে। গরু ব্যাপারী আছে দু-জন। এই সব কাজ আর কী!

বৃদ্ধ থামে। হাই উঠে হারেসের। বেশি রাত-জাগা তার পক্ষে ভাল নয়। বাসায় ঘুমোনো দুক্র র। একবার ভাবল, রোয়াকে যায়। কার্তিকের হিম ঝরছে। মাথা ধরেছিল হারেসের। তাই সাহস হয় না তার।

আলিও শুমায় না। বাসায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল। মিঞ্চী শুমিয়েছে। এই সুযোগ।

—হারেস, চলো বাইরে একটু ঠাভা হোয়ে আসি। আপত্তি দেখা দিল না তার।

পুকুরের পাশে রোয়াক। পানীর শীতলতা অন্তর্ভুক্ত আছে। দু-জনে এক সঙ্গে বসে।

হারেস নিতান্ত স্তন্ত্র। হঠাতে বেহেশ্ত থেকে ছিটকে পড়েছে সে। রুক্ষ পৃথিবীর সঙ্গে তার আদাওতি চল্ছে। আরিফের সঙ্গে সময় জীবন কাটানো সহজ। পোষ মান্ত বন্য জঠর উটের মত। তার-ও পানির দরকার হয়, হারেস ভুলে গিয়েছিল।

—এত ভাবো কেন? আলি খেটে তোলে।

—না, এমি চুপচাপ।

আলি বিশ্বাস করে না: ভেবে কোন লাভ আছে। যে ক'দিন বাঁচবে খালি ফুর্তি করো। বাঁচবে না ত বেশি দিন।

—কেন! উদ্ধিগ্ন হারেস।

—বাঁচবার আছে কি। খেটে পেট ভরবে না। বাড়ির লোককে খাওয়াতে পারবে না দু-মুঠো।

হারেসের এই চিন্তার প্রতি অবজ্ঞা ঘোর। পরিশ্রমের মূল্য আছে বৈকি।

—তার চেয়ে ফুর্তি করো। মন যা চায় তাই কারো। মরবার পথ পরিষ্কার করে রাখো।

ঈষৎ অবজ্ঞার সুরে হারেস জবাব দিল: তুমিও পরিষ্কার করছ নাকি?

—আলবৎ।

আলির চেহারা যেমন মজবুত তেমন ধারালো। এই বয়সে সে জীবনের প্রতি বিত্ত্ব। ভবিষ্যৎ যখন রুদ্ধ, আঞ্চলিকাস হারিয়ে ফেলা সহজ ও স্বাভাবিক।

—বারো বছর শহরে এসেছি। তুমি আমাকে নতুন কী শেখাবে? ও সব দূরের কথা। বাসেদ মিঞ্চী হোতেই তোমার তিন-জন্ম লাগবে।

কথাটা বড় চড়া ঠেকে হারেসের কাছে। ঘুমের অজ্ঞাত দেখায় সে।

—বারো দিন ত ঘুমিয়ে এলে, চাঁদ।

জবাব দিল হারেস : কাল ত আমাকে চাঁদ হোয়ে ঘুমোতে দেবে না। ইট মাথায় ভারায় উঠতে হবে।

পুরুরের ওপারে হার্মোনিয়ম ডুগী একসঙ্গে বেজে উঠল। রাজার নিকট আবেদনের গান নয় আজ। উল্লিখিত চীৎকার।

আলি উঠে পড়ল।

—যাও। আমি একটু ঘুরে আসি।

হারেসের মাথা ধরেছে বিশ্বী। বাড়িওয়ালা বেশি রাত সদর-দরজা খোলা রাখা পছন্দ করে না। আলি তবু রোজ দেরী করে।

ডিবা কে নিভিয়ে দিয়েছে। অঙ্ককারে অতিকচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে হারেস বিছানায় শয়ে পড়ল।

ঘুমোতে দেবে না ত আলি। আমার পাশে জায়গা তার। আঁধারে খেঁলে ছাড়বে আজ। নচ্ছার!

পিয়নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবাক হয় রসুল। আরিফের বিশ্বয়ের সীমা থাকে না। রসুলের নামে টাকা এসেছে!

—কে টাকা পাঠিয়েছে, পিয়ন-মশাই।

—হারেস আলি, কলা-বিবির বক্তৃতা কল্কাতা থেকে। রসুলের নামে মানি-অর্ডার। পিয়ন বলে, একটা পিদিম আসে। খানিকটা ভুংৰো-কালির দরকার।

আরিফ বোকার মত জিজ্ঞেস করে কি হবে?

—ওর টিপ-সই দরকার।

এত কারিগরি, আরিফের জানা ছিল না। ভুংৰো-কালির জন্য পিদিম আনার দরকার নেই। ধান-সিন্ধু-করা হাঁড়ির তলায় কালি পুরু জমে থাকে। সে একটা হাঁড়ি আনল।

পিয়ন বলে, খোকা, তোমার বুড়ো আঙুলটা দেখি। একটা কাগজও সে বের করে।

রসুল পুতুলের মত কাজ করে। টিপ দিল সে ফার্মের উপর। কচি আঙুলের সরু রেখা পিতা-পুত্র বোৰা-চোখে দেখে।

তিন-ইঞ্চি কাগজ ছিঁড়ে দিল পিয়ন। আরিফ যথা-সামান্য লেখা-পড়া জানে। পড়তে লাগল সে। হারেস লিখেছে, মাসখানেক দেরী হবে তার সামগড় আস্তে। দোষ্টানী আর রসুলকে দোয়া।

পনর টাকা!

রসুল আগেই মার কাছে ছুটে যায়। টাকা হাতে পেছনে পেছনে আসে আরিফ।

মালেকা রান্না ছেড়ে বেরিয়ে এল উঠানের উপর।

—এই নাও, বন্ধু পাঠিয়েছে।

দুটো করকরে নতুন কারেক্সী মোট। মালেকার মুখে কথা সরে না। সে শুধু আঙুল

বুলায় নেট দুটির উপর ।

বজ্জাহতের মত তিন জন শক্ত ।

মালেকা বলে, পৈঁচি বুঝি তার সম্মুখে বন্ধক দিয়েছিলে?

—না ।

—না! বুটি কথা বলবে তবু ।

আরিফ নিজের কথায় অনড় ।

—আমার পৈঁচি ছাড়িয়ে আনো ।

নিজের উলঙ্গ হাতের দিকে তাকায় মালেকা ।

—বস্তুকে আর একবার আসার কথা লিখে দাও । পিয়নের কাছ থেকে টিকেট নিলে না!

মনি-অর্ডার ফর্মের শেষাংশ পড়ে শোনাল আরিফ ।

হাঁড়ি এচে যাচ্ছে, মালেকার সেদিকে খেয়াল নেই । পোড়া গন্ধ নাকে গেলেও আরিফ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল । রসুলে নামে মনি-অর্ডার এসেছে, সে বিজয়ীর মত আর দুই প্রাণীর গতি-বিধি অবলোকন করে ।

পাঁচ-হয়টি পাতিহাস কুঁড়োর প্রাতরাশের জন্য কাঁক-কাঁক শব্দ তোলে, মালেকার আশে পাশে থপথপ হলুদ পা ফেলে ঘোরে । তাদের অস্তিত্ব সকলে বিস্তৃত । উঠানে মাটির বাসনে পানি ছিল, হাঁসগুলো তাই শোষে । চৰকুৰ, শব্দে উঠান বালা-পালা!

রৌদ্রলাগা রাঙচিতা বেড়ার উপর একটা গ্রীষ্মগতি মাথার করাত তুলে বসেছিল । মালেকার শূন্য দৃষ্টি তার দিকে কী পৌছায়? তবু সেই প্রথমে নিষ্পত্তিতা ভাঙে ।

—ভূমি বলেছিলে, আগে জমিদার বাড়তে কাজ করত । মা-বাপ কেউ নেই । একটা থিত করে দাও । ছন্দছাড়া হোয়ে কত্তি দিন ঘুরবে?

—এবার আসুক । বলব ।

—আগেই বলা উচিত ছিল ।

মালেকা আজ তার স্বাভাবিক আস্তা নয় । অন্য সময় হোলে সে বলত : কিগো বস্তুর একা-একা কড়িকাঠ শুণে আর কদিন কাট্বে । একটা গোছগাছ করো, নিজে ত—।

তারপর হাস্ত মালেকা । বাইশ বছর বয়সের চাপল্যের কাছে কিশোরীও হার মানত ।

আজ স্বিন্ফকষ্টে সে বলে : খুনের সমঙ্গটাই কী আসল । পরই আপন হয় । আমার কুটুম্বেরা আমাকে দেখে? দুটো ভাই আছে খৌজও নেয় না!

—বাড়তি ঘরদোর থাকত ।

আরিফের চোখে হতাশা ।

—ঘর নেই, কেন? রান্নাঘরটার দক্ষিণে একটা জানালা কেটে দিলেই হয় । উঠানে তালপাতা দিয়ে একটা চাল বানাও, সেখানে রান্না করব ।

ঝল্মল করে মালেকা উৎসাহে ।

—পাড়ার দু-ঘর কত আপনি তুলবে । বলবে, বেগানা লোক চাল নেই চুলো নেই ।

—তার জন্য ভাবতে হয় না । আমি বলছি নাকি সে একা আসুক । না আমি রাজীই হব । লোক নিন্দেমন্দ করবে । বিয়ে দিয়ে কনে আনো বস্তুর জন্যে । দুশ্মনের মুখে ছাই

পড়বে ।

আরিফ এবার কোণঠাসা । তারও মুখ আশায় উজ্জ্বল হোয়ে উঠে । মালেকা একা বলে
রাতবিরেত কোন কাজে যেতে পারে না সে । চোর-ছ্যাচড়ের অভাব নেই দেশে । হারেস
এলে সে নিশ্চিন্ত । গিরিসুড়ঙ্গে নতুন পথের সন্ধান পায় আরিফ ।

—যেরকম ধাতের লোক, তার সঙ্গে ঝগড়া হবে না কোনদিন ।

বেপরোয়ো এবার আরিফ । —সে পরের কথা । হয় হবে ।

আস্থ মালেকা । আর একটু রং চড়ায় সে : পরস্ব বেদনার ভয়ে মা ছেলে চায় না !
তারপর মূখে আঁচল চাপা দিল সে ।

—আবার ফাজলেমি শুরু করেছ ।

—তরকারীর হাঁড়ি ধরে গেছে । দুড়দাড় শব্দে ছুটে পালায় মালেকা ।

একপাল পাতিহাস রংবেরং ডানা ছড়িয়ে ছুটে গেল তার সঙ্গে ।

রাজমিষ্টীর যোগাড়ের কাজে মেহনৎ বেশি । ইটের ঝুড়ি মাথায় ভারার উপর সাবধানে পা-
ফেলা; সতর্কতার জন্য পরিশ্রম আরো বিরক্তিকর । দুপুরে ঝৌঝৌ করে রোদ, চারিদিকে
ইমারত তেতে উঠে, হারেস গরমে হাঁপায় । আজকাল খরচ শুরু কমিয়ে ফেলেছে সে ।

শরীর তার ধর্ম বজায় রাখে । কাঁপ দিয়ে জুর এলো একদিন দুপুর বেলা ।

ইট-ভেজাবার চৌবাচ্চার পাশে অনেকক্ষণ বেসেছিল সে । কামিন মেয়েরা ইট মাথায়
ভারার উপর উঠছে । নারিকেল ডাঙাৰ বষ্টী থেকে আসে জহীন, খাতুন আরো অনেকে ।
বাটুরী মেয়েরা এসেছে ছাদ পিট্টে । সরকার ভাঙে বেলেঘাটার মিয়ার বষ্টীর জবেদা । সে
শুধু একা আসে না । সঙ্গে আসে বাবো, বিছৰ বয়সের ছেলে খলিল । সেও যোগাড়ে । আধ
রোজ তার । একটা ছোট ছেলেকে ছাতার নিচে ঘূম পাড়িয়ে রাখে বিধবা জবেদা । এক
বছর হোলো সে বেওয়া হোয়েছে ।

এই বেইজ্জতির ভেতর জঠৰ-সংস্থান । হারেসের কাছে নতুন এই দৃশ্য । আলির
মতো আরো যোগাড়ে আছে । চোখঠারা ছাড়া যারা কথা বলে না । সব কামিনদের গায়ে
কুণ্ডা থাকে না, ইতর ইশারার সুবিধা ঘটে । বাসেদ মিষ্টীর কথা কানাঘূষা চলে । চালচলন
বদলে গেছে তার । দু-ভাগ করে মাথায় সিঁথি কেটে সে পান চিবোয় আর মজুরনীদের
ভেতর গল্প করে । আলির কথা সত্য নাকি, সেও চার ফেলেছে আজ-কাল ।

জবেদার ছোট ছেলেটার হঠাৎ ঘূম ভেঙে যায় । মাথা দুই হাতে চেপে বসে ছিল
হারেস । তার বাসা যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ।

ছুটে এলো জবেদা ।

ভেইয়া, একটু ছেলেটাকে কোলে নাও । মিষ্টী বকবে । আর দুটো ইট ভেঙে আসি ।

আমাৰ জুৰ । হারেস কাঢ়ৰে উঠল ।

নিরুপায় জবেদা । মাই দিতে বসল সে । বজ্জাত ছেলেৰ কান্না থামে না । রৌদ্রের
ভেতৰ দু' থাপড় দিল সে ।

হাঁ-হাঁ করে উঠে হারেস । —বহেন, দুধেৰ বাচ্চার উপৰ রাগ ফলাছ ।

—রাগবো না? সে ত সরে পড়লো। দায়টা কী আমার একলার!

খলিল যোগাড়ের চেয়ে মিষ্টীর ফাইফরমাস বেশি শোনে। এরা সকলে ইসুফ মিষ্টীর লোক। ভারী রগচটা সে।

চারতলা বাড়ি। দোতলা শেষ হোয়ে গেছে। জানালা চুনকামের কাজ প্রায় সমাপ্ত।

গরাদে মুখ বাড়িয়ে ইসুফ মিষ্টী হাঁকে : জবেদা, এটা আশনাইয়ের জায়গা নয়, কাজের জায়গা।

হারেসের মুখে কে যেন কালি লেপে দেয়।

জবেদা স্তুতি থেকে আবার এলোপাথাড়ি দু-ঘা দিয়ে উঠে পড়ল। দশ মাসের ছেলে তাতানো রোদে পড়ে চেঁচায় শুধু।

হারেস কোলে তুলে নিল তাকে।

মিষ্টীর শেন চোখে বজ্জ্বাত পড়ে : হারেস, তুমি-ও-। বদ্ধেয়াল ছাড়ো বলছি, তোমার মিষ্টী-কে?

কয়েকটা বাউরী মেয়ে চৌবাচ্চার ইঁট ফেলছিল। তারা হাসে।

—ই বাবু তর লড়কা?

জবেদা নিজের জায়গায় সুরক্ষী ভাঙছিলো। হাতুড়ী হাতে ছুটে এলো সে। বাউরী মেয়েদের লক্ষ্য করে সে বলে, ছিনাল-রা, দাঁড়া!

বাউরী মেয়েরা তেড়ে এলো। অশ্বীল গালগালি শুরু করে তারা। হঠাগোলোর অরাজকতা।

বাসেদ মিষ্টী ঘটনাস্থল তদারক করে। বাউরী মেয়েদের দিকে কড়ে আঙুল তুলে বলে, ভাগ, যে যার কাজে যা।

হারেসের ফরিয়াদ সকলের অঙ্গই ওঠে : জুর হোয়েছে মিষ্টী। আমি বাসায় চলে যাই।

—তা যাও। তবে ছেলে কোলে বসে কেন?

মিষ্টীর এমন ক্রুদ্ধিত হারেস কোন দিন দেখেনি।

জবেদা এক হাতে আঁচলে চোখ মোছে, অন্য হাতে হাতুড়ী চালায়। ঘুমিয়ে পড়ছে তার দুধের বাচ্চা। মজুরনীর কড়াপড়া আঙুল পিঠে লাল হোয়ে বসে গেছে। ছেঁড়া ছাতার তলায় শইয়ে দিল তাকে ধীরে ধীরে হারেস।

সূর্যের চোখ শিবনেত্রের মত জ্বলছে, তদুপরি জুর-গায়ে বাসা-ফেরা। বিত্তশায় মন ভরে উঠে তার। বিত্তশায় বস্তু সে খুঁজে পায় না। বমি এলো এক ঝলক।

—ভেইয়া।

ইমারতের প্রাঙ্গণে নামল হারেস। আবার কে ডাকে, ভেইয়া।

—মেরা খলিল কো জরা বোলা দেনা। জবেদার কঠস্বর। হারেস পেছনে চোখ ফেরায় না। গ্রামে ফিরে যায় না কেন এরা? এমন বেইজ্জত আর ইতর চোখের নিচে কাময়ীর প্রয়োজন আছে কিছু! তার মত গ্রাম থেকেই কী এসেছে তারা? অদৃশ্য বর্বর হস্ত ঠেলে দিয়েছে তাদের মহানগরের দিকে। গাঁয়ে খুদকুড়ো জুটে না?

বাড়িউলী-চাচি এই দুর্দিনে যথেষ্ট হামদর্দী, সহানুভূতি দেখিয়েছিল। বিকালে সাগ

রেঁধে দিল। আঞ্জির গাছ থেকে কষা আঞ্জির পেড়ে দিয়ে বলেছিল, মুখ খারাপ হোয়ে গেছে তোমার চিরোও বাবা। ছিলকা খেয়ো না।

মেহেরালি অনেকক্ষণ বসেছিল কাছে। জুরের তখন উপশম-সময়। একদম অবশ্য ছাড়ল না।

আলি সকলের আগে এলো। তার রান্নার পালা। মিন্তী আগেই ছুটি দেয়।

অবাক হয় হারেস। আলির সহানুভূতি আরো অপ্রত্যাশিত। উঠান-চুলা আজ বাসার ভেতর ধরাল না সে। ধোয়ায় হারেসের কষ্ট হবে। পুকুরের ধারে এই কাজ নিতান্ত দুঃসাহস। পথিক আর পদচীরা ধোয়ার চোটে শুধু মুখ নয়, হা-গুঁফ তেড়ে আনবে। হয়ত গালিগালাজ খেয়েই চুলাসহ আলি বাসায় ফিরছিল। হারেস তার খোঁজ রাখেনি।

ডালে খোসা বেশি। আলি কুলায় খোসা চয়ন করে। সঙ্ঘায় শোয়া ভাল নয়। দু-তিন জনের বালিশ দরমার উপর পেতে উঁচু করে দিয়েছে আলি। হারেস ঠেস দিয়ে বসে আছে।

আলি হাসে : প্রথম দিনেই জুর।

হারেস অত ক্ষিপ্রবুদ্ধি নয়। —কি ভাই?

—পয়লা দিনে জুর পড়লে। জবেদার কপাল!

হারেস বলে, তৌবা, ও-কথা মুখে আন্তে তুমিও! জুর হোয়ে ধুকছিলাম তখন। আমার চেয়ে বয়সে কত বড়।

বয়সে বড় হোলেই ত জমে। কাঁচা লোককে গড়ে পিটে শিখিয়ে নেয়।

অন্য সময় হোলে হারেস গালাগাল দিয়ে বসত। আজ চুপ করে গেল, সে, গায়ে মাখল না কিছুই।

—এত বেইজতির ভেতর কাজ করছে; তুমি এমন কথা মুখে আনো!

—কষ্ট হয় এ-সব দেখে? আলি চোখ মটকায় আর বলে, আপনার জনের দুঃখ দেখলে কষ্ট হয় বৈকি।

হারেস চোখ ঝুঁজে বসে রইল। আলি তার অবস্থা উপলব্ধি করে।

—ও হারেস, ভাই!

—বলো।

—অত সহজে রেগে যাও। কষ্ট করবে কী করে। অমন হাজার হাজার শহরে। ইসুফ মিন্তীর কামীনদের খবর রাখো? আর জবেদার কাছে এগিয়ো না, ও একটা আগুন। আমি ত আগে থেকে চিনি ওদের। আর এক বাড়িতে কাজ করেছিল আমাদের সঙ্গে। স্বামীটা পিলে ফেটে মরল। তার এক-বছর আগে বিছানায় পড়ে, জবেদা শুরুকী ভাঙচে। সংসার চালিয়েছে। এমন জাঁহাবাজ মেয়ে। আমি চিনি না জবেদাকে? ছুঁয়েছ কী মরেছ। হাতুড়ি দিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দেবে।

হারেসের রোগাক্রান্ত শরীরে অপূর্ব অনুভূতি বয়ে যায়। তার আদর্শের বিগ্রহ আলীর কাছেও মহিমার আরো ছড়ায়।

আলি সাগু কিনে আন্তে। ভাতের পর চড়াবে হারেসের সাগু।

—কার জন্য সাগু আন্তে? হারেস জিজেস করে।

—আশ্নাই করতে গিয়ে দুপুর থেকে জুরে ভুগছি। আমি খাব! আল্লা রে!

হতাশ-ব্যঙ্গক দুই চোখ উল্টয় উপরের দিকে আলি। হেসে ফেলে হারেস।

—বেশ। পয়সা নিয়ে গেলে না।

—পয়সা কি তুমি দেবে না পরে। আমি হোটেল খুলেছি নাকি বিন-পয়সার? তোমার ব্যাপ আগে শহরে এসেছি। দেখে-দেখে সব সয়ে যাবে। গভারের চামড়া না হোলে রোজ মরতে ইচ্ছে করবে। খাও, দাও, পিয়ো।

কল্পিত গ্রাসখান দুই হাতে আলি ঠোঁটের উপর তুল্ল। হারেসের মাথা ধরে আছে। নচ্চারটা আজ নিতান্ত ভাল মানুষ। হারেসের হাঙ্গা মন বিশ্রামের আনন্দ পায়।

মেহেরালি রাত্রে হারেস-কে দেখে গেল। নাসিমের সঙ্গে কোন সোরোখা (সম্পর্ক) নেই।

উত্তেজনার সঙ্গে বৃক্ষ বলে : আলাদা করে দিয়েছিলাম, বউমার কষ্ট হবে বলে এক সঙ্গেই খাই।

বাসেদ মিঞ্চী ছিল বাসায়, সে নাসিমের আরও নিন্দা করে।

হারেস চুপচাপ থাকে। দুপুরের মত জুর নেই তার। শান্ত আবহাওয়ার ব্যাকুলতায় তার মন ছটফট করে। বিদেশেই যদি মরেই যায় সে। কোন নাম নিশানা থাকবে না তার। সাগ খেয়ে চোখ-বুঝে শুয়ে পড়তে চায় সে। দুর্বল পেশী ভয়ের খনি। ভয় পায় হারেস।

আলি উপর-উপরি দুটো দর্ব্মা মেলে দিল নিচের থেকে না ঠাভা উঠে।

হারেস বলে, তুমি শুবে কিসে?

—আমি আজ বাইরে শোব।

কার্তিকের হিমেল রাত্রি। আলি কারো বাঁধা মানে না। এই সব ব্যাপারে মিঞ্চী চুপচাপ থাকে। শুকুর ঘরামি শো-বেচারা মানুষ। কারো পাঁচে-সাতে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। বড় হিসেবী, বড় সংকীর্ণ তার জগত, মিঞ্চীর খয়ের খী আলি শুকুরকে মোটে পছন্দ করে না। চলিশ পার বয়স, চুরুক দাঢ়ী এক কাঁচা মুখে। আলির বাড়াবাড়ি দেখে সে মুখ খোলে।

—ঠাভায় কোথায় শোবে?

—আমার শোয়ার জায়গার অভাব নেই হজুর!

সহজ কঠেই বলে আলি। হজুর শব্দট সম্মানার্থক নয়, শুকুর তা বোঝে না। বাইরে চলে গেলো আলি।

এত রাত্রে দুধ নিয়ে এলো বাড়িউলী চাচি। ফিরিয়ে দিতে হারেসের সাহস হয় না। অথচ এই দুধ তার ঠোঁটে স্বাদবাহী নয়। ছাগল পুষেছে তিনটে বাড়িউলী। আঞ্জির গাছের গোড়ায় দিনরাত্রি বাঁধা থাকে। ছাগলের মুতের গুঁড়ে বাসায় টেকা দায়। দুধের প্রতি অভিজি জন্মে গেছে হারেসের। আজ ঘূম আস্বে না সহজে। গরু মেরে জুতো দান আর কী। বৃক্ষা রম্পণীর মমতাকে শ্রদ্ধা জানাল হারেস তবু। একবার বল্বার ইচ্ছা হোয়েছিল তার : চাচি বক্রীর নাদাড়ীগুলো পরিষ্কার করে রেখো রোজ, পচে যা গঞ্জ উঠে!

পয়সা চিন্লে কি নাক-কান চোখ বুঝে যায়? বাসেদ মিঞ্চীর কোন অভিযোগ নেই বাসা নিয়ে। ঘূমিয়ে পড়েছে সে নির্বিবাদে।

গায়ে শার্ট, তার উপর কাঁথা ছিল হারেসের। নিচে লুঙ্গি পাতা ছিল, তবু শীত-শীত লাগে। কাঁপ দিয়ে জুর আস্বহে বোধ হয়। হারেস আঁধারে একটা ধূতি কাঁথার সঙ্গে জুড়ে দিল।

সকালে হারেসের জুর ছিল সামান্য। গা-হাতে ব্যথা খুব। আলি ভয় পায়, পাছে বসন্ত না উঠে। হারেস-কে সে কিছু বলে না।

শুকুর হারেসের উপর চটে উঠে। অন্ধকারে সে শুকুরের ধূতি গায়ে দিয়েছিল।

—ধূতিটা ধুয়ে রাখলাম, কাজে যাব পরে। তুমি গায়ে দিয়ে বসে আছ!

বাসেদ মিঞ্চী বাসায় ছিল না, সে সকালে রোজ বাজারে যায়। মাস গেলে হিসাবও তার কাছে। আলি শুকুরের দিকে তাকায় একবার, প্রথমে কোন কথা বলে না সে।

—তুমি রংগী মানুষ যার-তার কাপড় গায়ে দেবে?

আলি ধমক মারে : কি হোয়েছে, হাদিছ অন্তন্ত হোয়ে গেল!

—তুমি আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে কেন?

—ঝগড়া! অসুখ লোক ভুলে নিয়েছে। কি হোয়েছে ধূতিটার?

—ময়লা দেখতে পাও না!

বড় সাহেবের কেরাণী-বাবু কিনা, যাবে যোগাড়ে দিতে ওর আবার ফর্শা ময়লা।

—আসুক মিঞ্চী। শুকুর শাসায়। —আসুক নো তোর বাবা।

আলির মেজাজ আগুন হোয়ে উঠেছে। তবু পুরাতন-জমা বাল ছাড়ে সে।

হারেস অনুনয়-বিনয় করে, ঝগড়া কঁচো না। আমি নিজে ধূয়ে দেব।

—বাপের বয়সী তুমি না-হলে এখন লোক বাসা থেকে দূর করে দিতাম দু' ঘুসিতে, ব্যস।

চিট হোয়ে গেছে যেন শুকুর। আর কোন কথা নেই মুখে তার। গজগজ করে সে বাইরে গেল।

—আলি, ঝগড়া করো না, ভাই।

—ঝগড়া! আলবৎ করব। হয় ওর অসুখ। মুখে মুতে দেব! ব্যাটা জাত-পাজি। মিঞ্চী-কে যদি লাগায় আমি ওর দাঁত ভেঙে ছাড়ব।

হারেস ক্রতৃতায় নুয়ে পড়ে। ঘাম দিছে শরীরে তার। জুর ছাড়ে। আলিকে আরো ভাল লাগে তার। কি বলবে সে আলিকে।

বাজার থেকে ফিরে এল বাসেদ মিঞ্চী।

ভিজে বেড়ালের মত শুকুরও তার অনুসরণ করে। চুপচাপ থাকে হারেস, আলি রান্নার কাজ করছে নিখণ্ডে।

সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য হারেস হাত বাড়িয়ে দিল মিঞ্চীর দিকে : একবার হাতটা দেখো ত মিঞ্চী, জুর বোধ হয় ছাড়ে।

হারেসের শরীরের উত্তাপ পরীক্ষার পর নাড়ী দেখল বাসেদ। —জুর নেই এখন। নিপুণ ভিষণের মুখ থেকে যেন জবাব এলো।

—আল্লা আল্লা করে কালকের দিনটা এমি যায়, পরশ্ব থেকে তাহলে কাজে যেতে পারব।

—গায়ে গিয়েছিলে। দু-জায়গায় আলাদা পানি। ম্যালেরিয়ায় না ধরে।

আশঙ্কা উঠাপন করে বাসেদ।

সহানুভূতি জানায় শুকুর : না, সেরে যাবে।

আলি ট্যাংরা মাছ কুটছিল। চোখ তুলে আবার সে নামিয়ে নিল তখনই।

বুড়ো মেহেরালি এলো খবর নিতে। খুব সকালে বক্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। বাঁধা খরিদ্দার আছে। দুধ বিক্রী করে আটটাৰ ভেতৰ ফিরতে হয়, ঢালাইয়ের কারখানার আয় ছাড়া তার সংসার চলে না। সেখানে হাজিরি বেলা ন টায়।

সদর-দরজার চট্টের ওপারে চাটি বা তার বৌ কোনদিন পা-বাড়ায় না। আঘীয় আছে কয়েকজন নারিকেল ডাঙায়। তাদের সঙ্গে মোলাকাতের বেলা আসে রিকশা, তারও চট্ট পুরু করে যেরা থাকে। মরদ্রা কেউ ঘরে না থাকলে হারেস বালতি ভরে পুকুরের পানি এনে দেয়। গোসল-রান্না তারই সাহায্যে চলে। মেহেরালি তা জানে। এই জন্যে হারেসের দাম এখানে বেশি।

—বড় নেক্কার ছেলে মিস্ত্রী। জুর ছেড়েছে দু'পিল 'কুইলেন' দিলে হয়। ঘরে 'কুইলেন' আছে।

মিস্ত্রী আপনি জানায়। শরীর স্বভাবের উপর ছেঁড়ে দেওয়াই ভাল। বৃক্ষের গলার রগ পর্যন্ত উপরে ভেসে উঠেছে। সাদা দাঢ়ী ভাঙা কেয়ালের উপর। বছ রেখান্বিত চোখের তারা। তার দয়ার্দু স্বর মার স্পর্শের মত বুকের কিনারা ছুঁয়ে যায়।

বেশি দেরী করতে পারে না মেহেরালি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হয় তাকে।

মিস্ত্রী খেই টানে ধীরে ধীরে : শাঙ্ক খেয়ে থাকো কালকের দিনটা।

মাথা নেড়ে সায় দিল হারেস আরো দু'দিন এইভাবে কালক্ষেপ, দু'দিনের রোজগার পর্যন্ত নষ্ট! হারেসের মাথা ঘোরে।

সুন্দূর ভবিষ্যৎ সম্মুখে মরীচিকার মত নেচে বেড়ায়। এখনই চলা থেমে যাবে তার। ওয়েসীসের শ্যামলিমা লাগবে না চোখে?

দুর্বল শরীর। হারেস মিস্ত্রীর কাছ থেকে তাই দোতলায় কাজ নিয়েছিল। নিচের থেকে কোন মজুর ইট দোতলায় বইয়ে দেবে। বাকি উপর তলায় যোগানের ভার হারেসের উপর। এখানেও কষ্ট কম নয়। ঘন্টা দুই কাজের পর গা বমিবমি করে তার। আবার মিস্ত্রীর আশ্রয়। বাসেদ মিস্ত্রী এই সহানুভূতি দেখায়।

—আচ্ছা নিচে যাও, ঝুড়িতে ইট বোঝাই করে মজুর কী কামিনদের মাথায় তুলে দেবে।

হাপ ফেলে বাঁচল হারেস। চোবাচ্চা থেকে ভিজে ইট বোঝাই করে সে। বাউরী কামিনেরা মস্করা করে, হারেস কোন জবাবই দেয় না।

প্রায় আদুল-গায়ে মেয়ের দল তার কাছে দাঁড়ায়। ঝুড়ি তুলে দেওয়ার সময় বেপর্দা আরো বাড়ে। কেউ কৃত্তি পরেনি এরা।

আলি বিড়ি চাইতে এলো। নেশায় গলা জুলছে তার।

—বেশ জায়গায় দিয়েছে তোমাকে । চৌবাচ্চা নয়, পুকুরের ধার । টোপ ফেলো আর
শিকার তোলো ।

ধর্মক দিল হারেস : আবার বেফাস কথা বোলছ ।

—তুমি এ-দিকে একদম থাজা । দাও বিড়ি ।

একটা বাউরী মেয়ে এলো ঝুড়ি হাতে ।

—এই জস্নী আমার সঙ্গে স্যাঙ্গ করবি? স্যাঙ্গ মানে নিকা ।

কি নির্বিকার হারেস ইট বোঝাই ঝুড়ি তার মাথায় তুলে দিল ।

যাওয়ার সময় হাসে মেয়েটা, বলে : তুর বাবার সঙ্গে স্যাঙ্গ করিছি ।

হারেস ঝুব খুশী । বদমাস আলিটার মুখের মত জুতো দিয়েছে ।

আলি একটা অশ্লীল গালি দিল । আরো অশ্লীলতর দেমাক দেখাল মেয়েটা ।

—তুমি যাও, আলি ।

—হারেস ভায়া, তুমিই একা রাজত্ব করো ।

বিড়ি ফুঁকে জোরসে আলি । উঠে পড়ল সে ।

কার্তিকের শ্রেষ্ঠ-প্রাণ । রৌদ্রের তেজ কমেনি । ঝাঁঝা করে চারিদিকে ।

জবেদা আরো কামিনদের সাথে সুরক্ষী ভাঙছে । তার ছেট ছেলেটা ছাতার নিচে
ঘুমাচ্ছে । পেট ভরা আছে নিচ্য ।

জবেদার মুখে হাসিখুশীর ভাব । ঘামে নেফ্রেও সে কাজ করছে । হারেস একবার
তাকালো তার দিকে ।

খলিল এইমাত্র এসে দাঁড়াল মায়ের কাছে ।

হঠাৎ চোখাচোখি হয় দুজনের জবেদা ডাকে, ভেইয়া ।

কামিনরা উপরে গেছে । আস্তৃত দেরী হবে । হারেস জাবেদার কাছে প্রায় ছুট মেরে
গেল ।

—ভেইয়া ।

পান খায় জবেদা । দাঁতে লাল দাগ ভরা । হাসে সে ।

—ভেইয়া, খলীল কা নৌকৱী হয়া ।

—কোথায়?

—উ বালিগঞ্জ মে । সাব কা খানসামা কা ‘বয়’ ।

খুশী হয় হারেস ।

জবেদাই বলে, খানাপিনা বাদ চার রূপেয়া দেগা । কাম শিখ জানেসে আওর ।

উৎফুল্ল জবেদা পুত্রের ভবিষ্যৎ যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ।

পায়জামা আর হাফ-শার্ট পরে খলিল দাঁড়িয়েছিল ।

জবেদা আদেশ করে : মামা কো সালাম করো ।

বিস্মিত হারেস । খলিল তার কদমবুসী করছে । দোয়ার জন্য কি বলতে হয় সে জানে
না । —বেঁচে থাক, বাবা । বেঁচে থাক বাবা ।

জবেদা পান পুরল মুখে । কাপড়ের খোটে চুন বাঁধা ছিল, আঙুলের ডগা দিয়ে জিঁড়ে

লাগায় সে ।

পান খাওয়ার চেয়ে কথা-বলার উৎসাহ তার বেশি : মাহিনা দো-রোজ ছুট্টি ।

প্রকৃতিস্থ হোয়ে কথা বলে না জবেদা । পুত্রের বিচ্ছেদ-ব্যথা তার কষ্টস্বরে ফুটে উঠে ।

হারেস নিজের জায়গায় ফিরে এল । কামিনরা গোলমাল শুরু করেছে । বাটপট বিদায় করে দিল তাদের ।

জবেদার ছোট খোকা হঠাতে কঁকিয়ে কাঁদে । নিজেই ছুটে গেল হারেস ।

কোলে তুলে কয়েকবার দোলানো মাত্র আবার ঘূমিয়ে পড়ল সে । বেশ হষ্টপুষ্ট বাঁধন শিশুর । কৃশ তনুর উপরেও তা বোঝা যায় । একটা কাঁথা আর ছেঁড়া কাপড়ের উপর শয়ে থাকে সে । নিচের ভাঙ্গা ইট পেরেকের মত বেঁধে না কি ?

ধীরে ধীরে শিশুকে নাখিয়ে রাখল হারেস । একবার চারিদিকে তাকাল সে । না, জবেদা কাজ করছে মুখ নীচু করে । হারেস একটা আধুলি বের করল পকেট থেকে, তারপর কাঁথার উপকার কাপড়ের খোটে শিষ্ঠি দিয়ে বাঁধল সে, কাঁথার একপাশ তুলে হারেস শিশুর পিঠের নিচে রাখল খোটখানা ।

—তুর লাড়কা-সে খুব মহবৎ ।

একটা বাউরী কামিন ঝুঁড়ি হাতে ঠাণ্টা করে । হারেস নিঃশব্দে ইট তুলে দিল । ক্ষমতা থাকলে সে ইট ছুঁড়ে মারত মাগীর মাথায় ।

হারেসের মুখ্যবয়ব দেখে কামিন দ্রুত পদে আড়াল হোয়ে গেল ।

জবেদা পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে । খলিল চলে গেল বোধ হয় । হারেস ভাবে ।

পড়ুন বেলা । রঞ্জিত কার্তিক ক্ষেন হিমবাহের স্বপ্ন টেনে আনে ।

ঘাবড়ে যায় বাসেদ মিঞ্জি স্বয়ং । কোন কাজ নেই হাতে । বাসার তিনচার-জন দু-দিনপরে দেশে চলে গেছে । আলি অপেক্ষা করতে জানে । হারেস আরিফের পত্র পেয়েছিল, কোন জবাব দিল না । কাজের সুরাহা না করে সে আর আঝীয়তা চায় না ।

অখণ্ড অবসর । হারেস ফেরীওয়ালাদের সঙ্গে যুক্তি করে । আলুপট্টলের ব্যবসা মন্দা । কোন উৎসাহ পায় না সে ।

আলি সকালে রান্না করে, দুপুরে ঘুমায়, তারপর বিকাল থেকে রাত-দুপুর পর্যন্ত সে লাপাতা । ভাবনার কোন লক্ষণ দেখা যায় না শরীরে । গাঁটে কড়ি খসছে প্রতিদিন, তবু বেহেস । হারেসের সহিষ্ণুতা সীমার শেষ প্রাপ্তে ।

খাওয়ার পর দুপুরে সেও ঘুমায় । পরিশ্রান্ত শরীরে ঘুম সহজে নামে । অবসর জীবনে নির্দ্রাব তোষামুদি দরকার হয় ।

আলি বলে : তোমার চিন্তা ছাড়া কথা নেই । এই আমার দিকে তাকাও । আমি ভেবেছি একদিনও? ছোট ভাইগুলোর পড়াশুনা হবে না নিশ্চিন্ত । আমি আর কী করতে পারি । তার চেয়ে এখন থেকেই খুটে খেতে শিখুক । এক পয়সা দিই না বাড়িতে ।

হারেস সায় দিল না : তুমি পারো ।

—দু' বছর পরে তুমিও পারবে, দোষ্ট । চকচকে খিলানওয়ালা শহরের দালান দেখে প্রথমে আমিও তোমার মত কত কী মনে করতাম । আন্তে আন্তে সব বিলকুল ঠাভা । পাতা-চাপা কপাল দু'এক জনের হয়ত আছে, লক্ষ-লক্ষ কপাল তা হয় না । একদম জগদ্দল পাথর ।

হারেস বিরক্ত হয় ।

—কথাই বলো ছাই । এক-আধজনের পাতা-চাপা বরাত দেখে নিজের বরাতটা-কে যদি তাই মনে করো, খুব ভুল করবে ।

আলির লম্বা বুলি হারেস শুনতে চায় না । শুয়েছিল সে ঘুমোনোর ভান করে । পিঠের উপর আঙুলের টোকা দিল আলি : তোমাকে আজ ঘুমোতে দিচ্ছিনে ।

—একটু ঘুমোই ।

শিশুর মত হারেসের বগলে কাতুকুতু দিতে শুরু করে আলি ।

নাছোড়বান্দা সে । উঠে পড়ল হারেস । শীতের বেলা । কুয়াশায় মত ধোঁয়ার শহরে প্রায় সক্ষ্য নেমেছে ।

হারেস শেষ ত্রৃণ-থন্ড অঁকড়ে ধরে : রান্না করবে না আজ ?

—রান্না । না । মিঞ্চী খাবে না । বাইরে গেছে কাজ ধরতে । আজ আসবে না । চুলা ধরানো ঝিঞ্চাট কেন আর । দু-জনে হোটেলে বেয়ে থেব ।

হারেসের শেষ বাণ আলি দক্ষ ওঝার মত ক্ষমিতিয়ে দিল ।

—চলো বেরিয়ে পড়ি ।

হারেস আমাশা-রোগীর মত জবাব দিল, না ।

—আমার সঙ্গে যেতে এত মন আঁটা (টক) কেন ?

—চলো ।

আলি কৃত্রিম কোপন-কঠে বলে, উঠ ছুঁড়ি তোর বে । ধূচনী মাথায় দে । —তাই করলে তুমি । একটু সাজাগোজো ।

—আবার সাজবার দরকার আছে ?

—তুমি জংলী রয়ে গেছ । আজ কী ইট বইতে যাবে নাকি ? এখন যাচ্ছা বেড়াতে । ফিট্ফাট বাবু । তোমার ধোওয়া সার্ট ধূতি বের করো ।

আলি নিজের বাস্তু থেকে পরিচ্ছদ বাইরে রাখে । হারেসের প্রসাধনে বেশি বিলম্ব হয় না ।

আলি তবু হাসে ।

—হাসছ কেন ?

—মাথাটা আঁচড়াও ।

আয়না চিরলী দেওয়ালে লটকানো । মিঞ্চীর দৌলতে এটা যৌথ সামগ্রী ।

আলি নিজের কাপড় পরে হাততালি দিল । বেশ মানিয়েছে তোমাকে । বৈকালিক ভ্রমণের জন্য এত প্রসাধন আর বেশ-ভূষার অভাব হারেস কোনদিন উপলব্ধি করেনি । আলির দৈনন্দিনতা অনেকখানি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ । নতুন ঠেকে তার নিজেকে ।

আলির পায়ে জুতা। সে পাদুকাহীন। পার্থ্যকটা আজ বড়ো হয়ে দেখা দিল তার
কাছে।

গলি মুখে বিড়ির দোকানে পান কিন্নল আলি।

— ঠোঁট রাঙা করে নাও, দোস্ত।

হারেসের হাতে সে পান দিল এক খিলি।

দু'জনে গায়ে চাদর জাড়িয়েছে। সঙ্ক্ষ্যার উলঙ্গ বাতাস হি হি করে এলো একবার।
ঘোর সঙ্ক্ষ্য। ধোঁয়া জমে রয়েছে চালের উপর, অঙ্ককার আরো গাঢ় মনে হয়।

স্তিমিত গ্যাস-পোষ্ট জ্বলছে। ড্রেনের উপর কুয়াশার অবলেপন। আর এক বক্তীর মুখে
এসে পড়ল তারা।

—হারেস বলে, একঘণ্টা খুব ঘোরালে। এই বক্তীর ভেতর আবার কি দরকার?

—এসো।

আলি হারেসের হাত ধরে। আধ-অঙ্ককার চারিদিকে। বিড়ির আগুন দেখা চারপাশে
মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। গঞ্জে মেলার সময় এমনি
ধরনের মেয়েরাই ভিড় করে।

হারেস হাত-ছাড়ানোর চেষ্টা করে।

—কোথায় নিয়ে এলে আলি।

—এসো না ছাই।

জোরে টান পড়ে হারেসের হাতে। পিদিমের আলো দেখা যায় এবার। ঘুপ্টি মেরে
পণ্যঙ্গনারা বসে আছে গলির মুখে। তাদের সাব দিয়েই আলি অগ্রসর হয়। মাকড়সার
জালের টানে মাঝির মত অনুসরণ করে হারেস।

একটা উঠান। মাঝখানে কল রয়েছে। চারপাশে কুঠরী-কুঠরী খোলার ঘর। কোন
ঘরে পিদিম জ্বলছে, কোন ঘর অঙ্ককার।

উত্তর কোণ থেকে নারীকষ্ট ভেসে এলো, একা পারনি আজ আবার বস্তুকে এনেছ।
থামল না আলি।

দক্ষিণ কোণে দাঁড়িয়ে সে ডাকে : করিমন।

একটা মেয়ে পিদিম হাতে বেরিয়ে এলো। এমন উলঙ্গ পরিচ্ছদে নারী তার দেহ
ঢাক্তে পারে? শুধু কাচুলী পরে রয়েছে সে। শাড়ীর আঁচল কাঁধের উপর বুকের এক
কোণে ঘেঁষে উঠেছে।

—এসো।

নেশা-গ্রাসের মত হারেস তক্ষপোষের উপর গিয়ে বসল। জীৰ্ণ আস্বাব ঘরের দারিদ্র্য
চাপা দিতে পারেনি।

আলি হাঁকে — করিমন বিবি, হাতে ভাল খন্দের আছে? বস্তু এসেছে।

—খন্দের। কেন আমি কি পচে গেছি।

—বস্তুর সামনে এসব বেয়াদবী।

একটা চড় তুলল আলি। সরে গেলো না করিমন। গাল পেতে দিল।

—মারো।

বিরাশি সিক্কার চড় গালে এক সিক্কায় শেষ হলো। খিলখিল হাসে করিমন। হারেস ঘেমে উঠে। সলিম মুনশীর মেয়ে কামরুনের সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হলো নাকি?

—বঙ্গকে একটু আদর-টাদর করো।

—তোমার বোৰা বঙ্গ ত কথাই বলে না।

নধর-যৌবনা করিমন। মুখের শ্রী নেই। সমুখে উঁচু দাঁত হাসির সময় বীভৎস মনে হয়। হারেস একবার তাকিয়ে দেখল।

দরদর ঘাম ছুটছে হারেসের শরীরে। হঠাৎ উঠে পড়ল সে। এক দৌড় মেরে এলো উঠানের উপর।

পেছনে পেছনে ধাবমান আলি হাসে: হারেস, তোর মত বোকার ঘারা কিছু হবে না জানি। গিয়ে সামনের পচা পার্কের উত্তরে বসে থাকিস, ঘন্টা থানেকের ভেতর ফিরব।

দুর্গুনুর ঝুকে পা ফেলে হারেস। আলির শেষ কথার রেশ তার কানে অস্পষ্ট।

দু-ছাঁচের মাছখানে গলি। মেয়েরা খরিদ্দারের আশায় বসে থাকে। তার মাঝামাঝি আসা-মাত্র একটা মেয়ে তার পাশ কাটিয়ে বলে, কুকুর কি ঘি-ভাতের গন্ধ পেল নাকি লো! ছুটে পালাচ্ছে। পাশে তার সঙ্গী রয়েছে বোৰা যায়।

—দ্যাখ খুন করে পালাচ্ছে নাকি?

নেপথ্যে অন্য কর্ষ্ণস্বর। হারেসের ভয় পায়। দ্রুত পদে গলি পার হোয়ে সে দৌড় আরম্ভ করে। শীতের দিনেও শার্ট ভিজে গেছে তার চুচাদর খুলে ফেলতে সে বাধ্য হল। ঐ ত পার্ক। পার্কের পাশে এসে পড়েছে সে। হারেস চৃপচাপ গিয়ে বসে পড়ল ঘাসের উপর। সুড়ঙ্গ পথে অজগর সাপ ধাওয়া করেছিল তার পেছনে— এইমাত্র রেহাই পেয়েছে সে।

এক ঘন্টা পরে সত্যিই এলো আলি। মুখে তার হাসি উপচে উঠছে।

—মাফ করো, ভাই হারেস। তোমাকে নিয়ে গিয়ে অন্যায় করেছি। তুমি চৃপচাপ বসে থাকলেই পারতে।

হারেস তবু কথা বলে না।

—বাজে কথা রাখো, বাসা চলো।

আলি সামান্য উদ্বিগ্ন : মিঞ্চিকে এসব কথা বলো না কিছুই। এক গাঁয়ের লোক।

—আমার দায় কেঁদে গেছে।

—এত যখন রাগ করছ, তুমি যাও বাসায়। আমি নর্দমায় শয়ে থাকব।

হারেস একটু নরম হয়। কথা বলে না। আলি তার অভিমান ভাঙানোর ক্রটি করে না।

—এমন করে কদিন বাঁচবে? অসুখ-বিসুখ হোলে।

ক্ষুণ্ণ হারেস মুখ খুলেছে।

— বাঁচবার জন্য এইখানে কেউ আসে না।

মাথা ঝুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করে হারেসের। কি হোয়েছে আলির? এমন জোয়ান, দুর্বল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, জীবনের উপর তার কোন মায়া নেই? আলিটা পাগল!

—আরো কিছু দিন শহরে থাক। তারপর বুঁবৰে।

শান্ত কষ্টে বলে আলি। ক্ষোভে তার গলা বুজে আসছে যেন।

হারেস পথ হাঁটে। আর কথা বলা তার পক্ষে নিষ্পত্তিয়োজন। গ্যাসের আলোয় আলির মুখ দেখল হারেস। চপলতাহীন স্তম্ভিত চোখের পাতার নিচে কাজল ছায়া পড়েছে। সেও শূন্য দৃষ্টি হাঁটছে। জনবহুল মহানগরের পথবর্তী আর কিছু নিশ্চিহ্ন মুছে গেছে। পৃথিবীর প্রথম প্রভাতে উলঙ্গ আদম হাঁটছে মাটির উপর।

হোটেলে নৈশ-ভোজন সমাপ্ত। বেঙ্গির উপর বসে দুইজনে হারেস-আলি নিশ্চিন্তে বিড়ি ফোঁকে।

হোটেলওয়ালার ছেলেকে পয়সা মিটিয়ে দিল আলি। দু'জনের পয়সা পাঁচ আলা সে একাই দিয়েছে।

—আমার পয়সা তুমি দিবে কেন?

—রাখো। আলি হারেসের হাত তার পকেটের ভেতর ঝুঁটিয়ে দিতে বাধ্য করল।

বিড়ি পুড়েছে। কারো ওঠার শক্তি নেই যেন। দু-জনেই স্তুক। ধোয়ার দিকে আলি শ্রান্ত দৃষ্টি মেলে।

হারেস জিজ্ঞাসা করে, করিমন মুসলমান?

—তা কি করে জান্ব হিন্দু না মুসলমান।

—এর নাম যে করিমন।

আলি সোজাসুজি হারেসের দিকে তাকায়: এ অঙ্গীদা দুনিয়া। এখানে হিন্দুর মেয়ে মুসলমান সাজে। মুসলমান সাজে হিন্দু। বামুনের মেয়ে এলে বলে দাসী। আর দাসী এলে হয় দেবী। জাত খোয়ানোর জন্য এখানে কাঢ়ুকোড়ি চলে। কে কত তাড়াতাড়ি জাত দিতে পারে। আবার বেমালুম।

আধ-পোড়া বিড়ি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে পড়ল আলি।

—চলো। বসে লাভ নেই।

হারেস স্তুক হয়ে বসেছিল। এত খবর আলি রাখে দুনিয়ার!

গলির মুখে মহরমের ঢোল বাজছে। প্রথম জাগরণের দিন আজ। খুনেরা চাঁদ পলাসীর আকাশে অস্তিত্ব। গলির মোড়ে একবার আলি দাঁড়ায়।

পান খাওয়া তার নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস, আজ পান খেতে ভুলে গেল সে।

এত রাত্রেও ছাগলদের ঘাস খাওয়াচেহ মেহেরালি।

হরিং প্রান্তরের ত্রদ ঝল্কায়, দীপের মত ভাসে প্রাম আর কিষাণদের কুটীর। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক, জনপদের অলি-গলি হারেসকে নিশির মত ডাকে। ক্লিন মহানগরীর জীবন সংগ্রামের ফাঁকে অবসর-পিপাসু মন সামগড়ের দিকে ছোটে। বন্ধুর পরিবারবর্ণের জন্য ছোট-খাট টাকিটুকি জিসিন কেনায় মেলে মাদকতার আশ্বাদ। দুদিন-একদিন। আবার ফিরে আসে হারেস শহরের চতুরে। অতিথেয়তার জোলুষ করে গেছে, তা যাক। প্রাণের বিনিময়ে হারেস উৎফুল্ল।

আরিফের অনুরোধ বহবার সে প্রত্যাখান করে।

—আমি তোমার সংসারের সব ঠিক করে ফেলেছি। দু-হাত এবার এক করে নাও।
বলে আরিফ।

হারেস রাজী হয় না : কত খরচ জানো। আরো দু-মাস যাক। আর বলদ নেই,
চাষবাস চলবে কী করে?

—অত ভাবনা কিসের। এখনও দু-টো জয়ীফ বলদ আমার আছে। পালা করে চাষ
চলবে।

—অনেক ঝঁঝাট তার।

কিছুই ঝঁঝাট নেই। আগে জরু করো। দেখবে আপসে এসে গেছে গুরু।

আরিফ প্রাণ খুলে হাসে।

তবু আপনি তোলে হারেস : বিয়ের খরচ বাদ দিলে তুমি।

—তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই। খোদার দিন চলে যাবে। তোমার মতের জন্য যা
দেরী। দোষ্টানী ত ‘জান’ খেয়ে মারলে। একটা জান্ কতবার খেতে দিই।

—তবু ভেবে-চিন্তে কাজ করা ভাল।

—না আর ভাববার কিছু নেই।

হারেস জানে, সংসার ছাড়া তার চলবে না। আলির মত বাউভেলে জীবন তার জন্য
নয়।

—আর দুটো মাস। মাঘ-ফাতেম আর কিছুই বলিতে হবে না।

—এত মাথা খরচ করলে সংসার হয় না। আমরা কি সুখে আছি? বারো মাস কষ্ট
লেগেই আছে, তবু সংসার না করে উপায় নেই। মৌলবী সাহেবে ত বলেন, শত বিয়ে করা
'ফরজ'।

—দু-মাস তর সইবে না?

আরিফ মুখ তার করে।— নিসইলে লাঠি-ঠ্যাঙ্গা ত করতে পারি না। আমার নিজের
কম সুবিধা হয় না, একদিকে আমার উপকারই করলে। একা ঘরে থাকতে পারে না। দু-
জন হলে আমিও শহর-বাজারে রোজগারের পথ দেখি। ধান-রোয়ার পর চার মাস ত
বেকার বসে থাকি।

এই অনুরোধ দোলা দেয় হারেসের মনে।

—দু-মাস, বঙ্গ। দু-মাস। কিছু টাকা পয়সার দরকার।

আরিফ সেদিন আশ্বস্ত হোয়েছিল। হারেসের মত মানুষ ঝুট কথা বলে না, অন্ততঃ
বঙ্গুর নিকট।

—থাকার ঘর নেই। হারেসের আতঙ্কিত মনের আর এক আবিক্ষার।

হারেসের পিঠে হাতের তালু ফেলে আরিফ সশঙ্কে।

—বলছি তো সব ঠিক আছে।

—সব ঠিক। তোমার একদিনের মেহনৎ।

আরিফের কথা মত পরদিন হারেস নিজেই সাহায্য করেছিল বঙ্গুকে। কোন লজ্জা
নেই তার। পাড়া-পড়শীর এখন সকলেই হারেসকে চেনে। শহরের রোজগারী, তার
খাতিরও তাই বেশি। একটা নতুন তাল-পাতার চালা তুলে ফেললে দু-জনে। কঢ়ির

বেড়া আৰ কাদা-ধৰানো কাজ আৱিষ্ক স্তৰীৰ সাহায্যে পৰে সম্পন্ন কৰেছিল। রান্না ঘৰেৱ
জানালা ছিল না। হারেস নিজেৰ হাতে বাকি রাখল না কিছুই। আলো বাতাস খেলে এই
যা রক্ষে। ছেট ঘৰে তাৰ কোন আপত্তি নেই। নতুন মাচাঙ্গেৱ জন্য বাঁশ কেটেছিল
আৱিষ্ক। এক সংগ্ৰহে রান্না ঘৰেৱ চেহারা ফিরে গেল। কিষাণেৱ বাসৱ-শয্যা পাতা চলে
এখন স্বচ্ছন্দে। সবচেয়ে বেশি উৎসুক মালেকা। নারীসঙ্গীৰ অভাব মিটিবে তাৰ। নতুন
চাচিৰ স্বপ্ন দেখে রসূল।

শহৰে আৱো রোজগারেৱ পথ হারেস নিজেই আবিষ্কার কৰেছে। বাসায় খৰচ লাগে না তাৰ।
আলিৰ কাছে সে কৃতজ্ঞ। ফিসাৰীৰ বাবুৱা বৰ্ধীৰ সময় কলা-বিবিৰ বস্তীৰ পুৰুৱে পোনা
ফেলে যায়। ফাশন-চৈত্রে মাছ তুলে বিক্রী কৰে অথবা অন্য পুৰুৱে চালাচালি কৰা হয়।
একদিন রাত্ৰে আলি হারেসকে নিয়ে গেল পুৰুৱ ধাৰে। গ্যাস নিভিয়ে দিল আলি নিজে।
তাৰপৰ গামছা দিয়ে দুজনেৰ মাছ ধৰা শুৱ কৰে। গিস্টিগিস কৰছে আধ-পোয়া তিন-
ছটাক ওজনেৰ পোনা। বেশি দেৱী হয় না দু-বেলাৰ খোৱাকিৰিৰ মত মাছ-শিকাৰে। বাসেদ
মিঞ্চি সবই জানে। পয়সাচৰ ব্যাপার তাই সে চুপ কৰে যায়। দেখেও দেখে না। শুকুৱ
ঘৰামি দেশে গেছে। আলি কুটনামিৰ ভয় পায় না। তাছাড়া পাড়ায় এমন চুৱি কেউ গায়ে
মাখে না।

বাসায় চাউল যোগায় হারেস। যথেষ্ট লাভ থাকে তাৰ। আৱো উপৰি পাওনা হয়।

হারেস চাউল আনে ক্যানেলেৰ নৌকা থাকে। বৱিশাল নোয়াখালীৰ মাঝিমাল্লা খালে
জমায়েত হয়। শুমোট বাসায় হারেসেৰ মেস টিকত না। এইখানে সে হাঁফ ফেলে বাঁচত।
মাঝি-মাল্লাদেৱ সঙ্গে তাৰ পৰিচয় হোই সূত্রে। চাল, মুগী, ডিম, পাট নৌকায় আমদানীৰ
প্ৰকাৰ বহু। মহাজনেৰ মাল মাল্লাৰ উনিশ-বিশ কৰে বৈকি।

হারেসেৰ কাছে তাৰ কোন সন্ধান জানা ছিল না। এক মাস আগে অবেলায় সে
খালেৰ ধাৰে পায়চাৰী কৰেছিল। কাজেম মাল্লাৰ সঙ্গে হঠাত দেখা। বৱিশালেৰ লোক। সৱু
থুংনীৰ উপৰ এক গোছা দাঢ়ি, প্ৰৌঢ়-বয়ক্ষ বেঁটে মানুষ। এক নৌকায় তাৰ সঙ্গে গত
বছৰ আলাপ হোয়েছিল।

—কোথায় যাবে? আস্সলামো আলায়কুম।

কাজেম মাল্লা নাগৱিৰক সংলাপ জুড়ে।

—এমি বেড়াতে বেৱিয়েছি। আলায়কুম অআসসালাম।

—খালেৰ ধাৰে এমি বেড়িয়ে লাভ কি!

—ঘোৱা-ফেৱা আৱ কি!

কাজেম মাল্লাৰ অ্যাচিত প্ৰীতি রহস্যজনক।

—ব্যবসাৰ জায়গা। এখানে লোক পায়চাৰী কৰে না, তা-হলে গড়েৱ মাঠে যাও।

থুংনী-শুক্র কাজেমেৰ দাঢ়ি নড়ে।

—কি ব্যাপার। কাজেম সাহেব!

—ব্যবসা জানো না। বলি, বাসায় কি খাও?

—ভাত !

—ভাত ! হাসে কাজেম মাল্লা । ভাত কি এমি আসে, না দরকার হয় ।

—চাল দরকার হয় বৈকি ।

কাজেম মাল্লা তারপর হারেসের কর্তব্য বাখলে দিয়েছিল । এশার নামাজের সময় মাঝি ব্যস্ত থাকে । সেই সুযোগে বহুৎ চাল বের করে দিতে সক্ষম সে । বাজারের চেয়ে এক আনা সস্তা ।

কাজেমের কাছে হাতে খড়ি হারেসের । এখন বহু মাল্লা কাজেমের মত তার সমর্থক । বহুৎ চাল আনে হারেস । গায়ের ঢেকি-ছাঁটাই সরু চাল, দামও সস্তা । বাড়িওয়ালা মেহেরালীর সঙ্গে হারেসের হৃদ্যতা আরো প্রসারিত । অন্দরে চুকে মেহেরালির সঙ্গে সে গল্প করে । চাচি এক পাশে বসে পান ভাণ্ডে কী গল্প শোনে । মেহেরালির বৌ কথা বলে না । কিন্তু ঘোমটা দিয়ে সম্মুখে আসতে তার কোন লজ্জা নেই ।

হারেস ভাবে, তার অচেনা দুলহিন খুব পয়মন্ত । শহরে আরো কত রোজগারের পথ আছে কে জানে ? তার গতিবিধি সম্বন্ধে আলি স্বেফ অঙ্ক । অজুহাতে পোক হোয়ে উঠেছে হারেস ।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে । আলির ইন্সফা-দেওয়া জীবন তার কল্পনার বাইরে । আরো দু-মাস । সঞ্চিত কড়ির পেছনে হারেস নির্বিবাদ গ্রাম-জীবনের ছবি আঁকে । শহর তার জন্য নয় । রঞ্জব ছাতাওয়ালার কথাগুলো সে ভুলে যায় না সহজে । রঞ্জব দেশে গেছে আর ফেরেনি । এখন নাকি সে লক্ষণ । অভিলাঙ্ঘিকের বুকে কোথাও ভাসছে তার জাহাজ । চাঁটগা থেকে সে লক্ষণে ভর্তি হোয়েছিল ।

রান্নার পালা ছিল, আলিকে মিস্ত্রী আঁপেই ছুটি দিয়েছে । শোয়ান্তি নেই এই অবসরে । চুলা ধরানোর যা হাঙ্গাম তার চেয়ে কম্প্লেক্স থাকাই চের ভার । ধোঁয়ায় ঘামছিল হারেস । কাঁচা কয়লা এত কাঁদায় মানুষকে

বহুক্ষণ কসরতের পর চুলা চম্কে উঠে । তবু শান্তি নেই ।

মিস্ত্রীর হাত পা ধোঁয়ার পানি এক বালতি আলাদা তোলা থাকে । শূন্য বালতি নিয়ে হারেস পুকুর থেকে ফিরছে, নাসিমের দাওয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে তার বৌ ।

হঠাতে হারেসের কানে যায়, একটু দাঁড়াও ভাই ।

কৌতুহল হয় হারেসের । পাছে কেউ দেখে ফেলে, বদ্নাম দিতে কতক্ষণ । নাসিম হয়ত ছুরি মেরে বসবে । মেহেরালির স্ত্রী যদি দেখে!

হারেস প্রথমই জিজ্ঞেস করে, চাচি কোথায় ?

—সে ঘুমাচ্ছে ।

বালতি চটপট মাটির উপর রেখে সে বলে, কি দরকার ?

ফিসফিস শব্দে নাসিমের বৌ বলতে থাকে : তুমি সামগড় যাও তাই বলছি । ওখান থেকে দু-কোশ আমার বাপের বাড়ি নবীপুর । এদের দেশে আংশীয় ছিল বলে আমার এখানে বিয়ে হয় । চাচাকে বলো, ছ-বছর হোলো । আর বেশি দিন হোলে আমি বাঁচব না । পাড়া-গায়ের মেয়ে এমন করে কি দিন কাটাতে পারি? একটা কথা বলার লোক নেই । এক বালতি পানিতে নাওয়া-খাওয়া !

ଦୋକ ଗିଲେ ନାସିମେର ବୌ, କଥା ଫୁଟଛେ ତାର ଗଲାଯ । ହାରେସ ତାର ମୁଖ ଦେଖେ କୌତୁଳବଶତଃ । ଫର୍ସା ରଂ । ଡାଗର ଦୁଇ ଚୋଥ । ଚେହାରାଯ ଜୌଲୁଷ ନେଇ । ଗଲାଯ ଏକରାଶ ଜୁଲୀର ଦାଗେର ମତ ରଂ ଫ୍ୟାକାସେ ହୋଯେ ଏସେହେ ।

—ଆଜକାଳ ଶାଉଡ଼ି ଦେଖିତେ ପାରେ ନା । ଓ ତ ରାତ୍ରେ ରୋଜ ଥାକେ ନା । ବାପ ବ୍ୟାଟାଯ ବନି-ବନା ନେଇ ।

ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୁଯ ହାରେସେର । ପର୍ଦାନଶୀନା ଏକ ମେଘେ ସହିକୁତାର ସୀମାପ୍ରାଣେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ିଯେଛେ । ତାଇ ଜନପଥରେ ଉପର ।

“ଶ୍ଵଶୁରେର ମମତାର ଜନ୍ୟେଇ କୋନ ରକମେ ବେଁଚେ ଆଛି । ଆମାର ବାପକେ ବଲେ ଭାଇ । ବିଯେର ପର ଏକମାସ ଛିଲାମ ବାପେର ବାଡ଼ି । ମା ମରେ ଗେଛେ, ଅବର ପେଯେଛିଲାମ । ଆର କତଦିନ ଏମନ କରେ ବାଁଚବ, ଆଗ୍ଲା— ।”

ଚଲେ ଗେଲୋ ନାସିମେର ବୌ । ଶେମେର ଦିକେ ସେ ତ କଥା ବଲଛିଲ ନା, କାନ୍ଦା କଥା ହୋଯେ ମୁଖ ଦିଯେ ଝରଛିଲ ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲେ ଯାଯ ହାରେସ । ବାଲ୍ତିର ହ୍ୟାନ୍‌ଡେଲ୍‌ଟା ନିଯେ ସେ କିଛକଣ ନାଡ଼ାଚାଡ଼ା କରେ ।

ସଦର ଦରଜାଯ ପାଯେର ଶକ୍ତ ହଠାତ୍ କାନେ ଆସେ ହାରେସେର ।

ଏମନ ଭାବେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଥାକା ଅଶୋଭନ । ଦ୍ରମ୍ତପଦେ ଫିରେ ଏଲୋ ହାରେସ ନିଜେର ବାସାୟ ।

ମାର୍ବାଖାନେ ଏକଟା ଦେଓଯାଲେର ବ୍ୟବଧାନ । ପାଶେର କାମରାଯ ଥାକେ ନାସିମ ଆର ତାର ବୌ । କିଛୁଇ ଜାନେ ନା ସେ । ଧିକ୍କାର ଦେଇ ନିଜେକେ ହାରେସ ।

ଦେଓଯାଲେ କାନ ପାତଳ ସେ । ବୋରୁଦ୍ୟମାନା ଶୈରୀର ଡୁକ୍‌ରେ-ଓଠା ସ୍ଵର କି ସେ ଶୁଣତେ ପାରେ ନା?

ତାର ମନେର ଉପର ବିଭିନ୍ନକାମୟ ବହୁଭ୍ୟର ଜାଲ ବିଭାର କରେ ମହାନଗର ।

ସାମଗ୍ରେର ପୌଚ କ୍ରୋଶ ଦକ୍ଷିଣେ ଆରିଫ ଦୁଲ୍ହିନେର ଖୋଜ ପେଯେଛିଲ । କନେର ମା-ବାପ ନେଇ । ଚାଚିର କାହେ ମାନୁଷ । ଦଶ ଟାଙ୍କା ଖରଚ । ଦୁଲ୍ହିନିକେ ପାଲକି କରେ ନିଯେ ଏଲୋ ଆରିଫ । ତାର ଘରେଇ ଶାଦୀର ଆଞ୍ଚାମ ।

ପଞ୍ଚମ ବଙ୍ଗେ ଏହି ପ୍ରଥାକେ ‘ତୁଲେ ଦେଓଯା’ ବଲୋ ହୁଯ । ସେ କନେର ବାପ-ମା ଶାଦୀର ଖରଚ ବହନେ ଅକ୍ଷମ, ତାରା ଦୁଲାର ଘରେ କନେ ପାଠିଯେ ଦେଇ । ମେଥାନେଇ ବିଯେ ହୁଯ । ବଡ଼ କରଣ କନେର ପିତା-ମାତାର ଜନ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାପାର । ପ୍ରଥା କେଉ ଭାଲ ଚୋଥେ ଦେଖେ ନା । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାର ଉପର ଜୟାଇ ହୁଏ ।

ମୋହାଗ ଖାତୁନେର ପିତା-ମାତା ଛୋଟ ବେଲାଯ ମାରା ଯାଯ । କେଉ ଛିଲ ନା ଏହି କାରଣ୍ୟେର ଅଂଶିଦାର ହୁଏଯାର ମତ । ବୃଦ୍ଧ ଚାଚି ହୁଯାତ ଏକବାର ଚୋଥେର ପାନି ଫେଲେଛିଲ ।

କନେକେ ମାଲେକା ନିଜେର ଗହନା ଖୁଲେ ପରିଯେ ଦିଲ । ମୋହାଗ ଖାତୁନେର ଜନ୍ୟ ହାରେସ ଗହନା ଗଡ଼ିଯେଛିଲ । ତା ସାମାନ୍ୟ । ହାସୁଲୀ, ତାବିଜ ଆର ଦୁଟୋ ପୈଚି । ବାକି ତୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଲ ବକୁ ଆରିଫ ।

ଶାଦୀର ଦିନେ କୋନ ହଙ୍ଗାମା ବିବାଦ ପ୍ରତିବେଶୀଦେର ସଙ୍ଗେ ରାଖା ଅଶୋଭନ, ଅମଗଲ । ବୃଦ୍ଧ ମୟେଜ୍‌ଟୁନ୍‌ଦିନ ଆର ଫ୍ୟେଜ୍‌ଟୁନ୍‌ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରତିବେଶୀର ହାତେ ଧରଲ ଆରିଫ । ମାଲେକା ତାଦେର ଦ୍ଵୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜୀଯେର କାହେ ମାଫ ଚାଇଲ । ଅନାଦୁଷ୍ମର ବିବାହ । ତରୁ କୋନ ଖୁତ ରାଖିବେ ନା ଆରିଫ ।

হারেসকে সে কোন কাজ করতে দেয় না। বলে : তুমি আজ কোন কাজ ছুঁতে পারবে না।

বারো তের জন অতিথির খাওয়াবার সরঞ্জাম মাত্র। বিয়ের লগ্ন রাতে। দু-খানা পাল্কি বন্দোবস্ত করা হোয়েছিল। দুলা-দুলহীন একবার ঘুরে আসবে। ঘরেই বিয়ে, তা-বলে পাল্কি চড়বে না দুলা-দুলহীন! আরিফের মুক্তির পেছনে মালেকার সায় ছিল আরো বেশি।

গাঁ থেকে নওশার পোশাক নিজে গিয়ে আন্ত আরিফ। মালেকার দিয়ে গেল দুটো বেল ফুলের গড়ে-মালা।

ঘরের দুটো ছোট খাসী ছিল, গোস্তের জন্য আর কোন হাঙ্গামা নেই। পাকওয়ান, ক্ষীরের জন্য আটা চাল মালেকা বন্দোবস্ত করেছিল খোরাকির অংশ থেকে।

অপ্পের ভেতর ভাল সরঞ্জাম।

রসুল লুঙ্গি আর সার্ট পরে মাথায় টুপি দিয়েছে। চাচার সঙ্গে সে মিত-বর রূপে পাল্কি চড়বে। তার হাঁকাহাকি বিয়ে বাড়ির আর এক সমারোহ।

ময়েজউদ্দীনের রান্না ভাল। পাড়ার শাদী উপলক্ষে বাবুটি রূপে তারই ডাক পড়ে। সেও খুব ব্যস্ত। খাশী জবাইয়ের পর গোস্ত খুরথার কাজে সে মুরুক্কিয়ানা করছে। আলু ছেলে তার ভাই। খাশীর গোস্ত আলুর তরকারী আর ভাত— অতিথি সৎকারের জন্য এই বন্দোবস্ত।

ফয়েজউদ্দীন দশ বারো খানা ইট দিয়ে চুল্পি তৈরি করেছে।

গাঁয়ের ‘ষোল-আনা’র ডেগচী আছে। টোর্টা করে পাল, বরের পোশাক এবং এই জাতীয় সামগ্রী কিনে রাখা হয়।

আজ ডেগচী পাওয়া গেল না। ষোল-আনার জিনিসের ভাস্তরী রিয়াসৎ কাজী ঘরে নেই। আরিফ-ময়েজউদ্দীন ভারী রাঁধ করে।

আরিফ বলে, আসলে চাচা ওসব চালাকি। আমরা কিষক সমিতি করি কিনা, তাই বেইজ্জতী করবার ফন্দী। কাউকে ত “দাওয়াৎ” করিনি। সে একটা কতা।

—আসুক, কাজী। ডেগচী গুঁড়ো করে পাড়ার হিস্যা নিয়ে নেব। আরিফ ক্ষোভে গুম হোয়ে দাঢ়ায়। ভেবো না, চাচা, তোমার হাঁড়ি আমি বন্দোবস্ত করছি ওপাড়া থেকে। এই ত ক’জন লোক।

ফয়েজ কাজ ছেড়ে এলো তামাক খেতে। দুই সহোদর। সমীহ করতে হয়, পেছনে ফিরে সে তামাক খায়। লৌকিকতা বজায় রাখার ভাল ফন্দী।

সে মন্তব্য করে : আগে ‘ষোল-আনা’ কতজন হোত। বিয়ে শাদীর ব্যাপার না হয় ছাড়ো; খাল-কাটা, গাঁয়ের বিচার-আচার, —কথায় কথায় লোক আদালত ছুটে নাকি?— আজকাল! সে-দিন গেছে রে বাবা। এখন সবাই হাম-বড়া।

সায় দিল ময়েজ। কনিষ্ঠ সহোদর গুড়ুক ফুঁকছে, তাই সে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে কথা বলে, পাল্টা ত ছিঁড়েছে বহুত জায়গায়, আর নতুন পাল হবে? ধৃৎ। মুরুক্কীরা কেমন জেন্দেগানী কাটিয়ে গেল মিলে-মিশে। এখন ও-সব চলবে না।

ফয়েজ বড় ভাইয়ের হাতে হুঁকো-কক্ষে ফিরিয়ে দিল। ষোল আনার টাকা যা ওঠে,

সব ত রিয়াসৎ কাজীর কাছে জমা । হিসেব চাও আজ নয় কাল । আঠার মাসে বছর ।
আরিফ বড় তামার হাঁড়ির বন্দোবস্ত করে ফিরে এসেছিল । তারও তামাকের নেশা ধরে ।
ময়েজউল্লিনের পাশে সে বসে পড়ল ।

ফয়েজ ডাকে, আরিফ ।

—কি চাচা ।

—একটা কাজ করো দিকি বাবা । বিয়ে-দানী বাবদ তুমি কটাকা দিবে ।

—গরীব মানুষ পাঁচ টাকা ।

—বেশ তাই দাও । কিন্তু আর মোড়লদের হাতে দিও না । মকতবে দাও এক-টাকা ।
মৌলবীর চলে না । তুমি নিজে তার হাতে দিয়ে এসো । এক টাকা দাও রাস্তার জন্যে । দু-
টাকা নাপিত ধোপাদের ভাগ করে দিও ।

—আমিও তাই ভেবেছি, চাচা । মোড়লদের হাতে এক আধলা হেঁয়াব না এবার ।
বেলা শেষ হোয়ে এলো । মাগরেব হোতে আর আধ ঘন্টা বাকি নেই । হাতের কাজ চটপট
সেরে ফেলো, চাচা ।

আমারো বেশি দেরী নেই । রাঁধতে কতক্ষণ আর লাগবে । আজ আরিফের দৌড়ধাপের
অন্ত নেই । একটু জিরোয় সে দক্ষিণের হাওয়ায় অন্দরে মালেকার অবস্থা কাহিল ।
ফয়েজের স্তৰী প্রোঢ়া হাজেরা খুব সাহায্য করছে ।

সোহাগ-খাতুন হলুদ মাখা কাপড় পরে বসে আছে । হাতে যাঁতি । এ-টা সব সময়
কাছে থাকে । ‘আক্র’ হওয়ার আগে প্রয়োজন যাঁতি কাছ-ছাড়া করতে নেই । দুপুরে কম
হলুদ মাখায়নি তাকে । ঘরের এক কক্ষে ত্রিয়মান হয়ে সে বসে থাকে । মালেকা তার
খবরদারী করে । দু-দিন কিছু খায়নি সে । ভিন্ন জায়গা । মন ভাল না-থাকাই স্বাভাবিক ।

আটার গরম পাকওয়ান দিয়ে গেল মালেকা দু’খানা । —খেয়ে ফেলো বোন । তোমার
কি ভুক্ত লাগে না? সোহাগ খাতুন আঙুলের ডগায় তোলে ভাঙা পাকওয়ান ।

হাজেরার-দেওর-বৌ আরো ও-পাড়ার দু-তিনটে নিম্নিত্ব যেয়ের আগমনে খাওয়া
বক্স করে দিল, হাত গুটিয়ে নিয়েছে সোহাগ খাতুন । ঘোমটা টানে সে । সোহাগের চেহারা
মাঝামাঝি আড়ঙ্গের । মুখে সারল্যের ছাপ ফুটে উঠছে । সুন্দরী নয় সে, তবু লাবণ্য আছে
তার চেহারায় । দুলহিনের মুখ দেখে সকলে ।

বড় বিব্রত হয় সোহাগ ।

হাজেরা বলে : খাওনা, মা ।

—জী না । অস্কুট কর্ষস্বর সোহাগের ।

আহা, কচি মেয়ে । চৌল্দ বয়স হবে না । মা-বাবা-মরা অনাথ মেয়ে গো!

সহানুভূতির রেশ চলে মুখে মুখে ।

ঘোমটা টানা আছে সোহাগের । চোখ দিয়ে তঙ্গ অশ্রু পড়ে ফেঁটাফেঁটা । মৃত জননীর
মুখ হয়ত ভেসে উঠছে অসহায়া সোহাগের সম্মুখে ।

তার উদ্ধারে এলো মালেকা । — আরে পাকওয়ান পড়ে আছে ।

তারপর সে দুলহিন বেষ্টন-কারিগীদের উদ্দেশে বলে : চাচি সকলকে নিয়ে উঠে পড়ো। কনে তো রোজ দেখবে। ওদিকে কাজ কত। কনে-বরের মুখে ক্ষীর দিতে হয়। তা তৈরি করে রেখেছি। তুমি থালায় ঢালবে, চাচি। মুরুকী মানুষ-তোমার হাতের 'সাইত' আল্লার দোওয়ায় ভাল হবে।

চেঁড়ী-বৃন্দ সরে গেল নিমেষে। হাঁফ ফেলে বাঁচে সোহাগ। মালেকা অভিমান করে : খেলে না ত দুটো পিঠে। বরের আনন্দে খাওয়াও আর মুখে রোচে না। না?

সোহাগ বোবার মত চুপচাপ।

—ঘোমটা খুলো না, আমি ত নতুন বর নই, এত লজ্জা। নিজেই ঘোমটা খুলে মালেকা। আরে, একি! বিয়ের দিনে লোক কাঁদে? চোখ মুছিয়ে দিল সে।

মান-ভাঙালোর সময় নেই মালেকার। জিনিস-পত্র এ-দিক ও-দিক হোতে পারে। মোক্ষম অঙ্গ হোঁড়ে সে, আমার মাথা খাও, বোন, কেঁদো না। খেয়ে নাও—

মালেকা আবার কর্মক্ষেত্রে। বেহারার দল একটা হাঁস চায়। বিয়ের দিনে ডাল-ভাতে মন উঠে না। মুগ্গী হাঁসের খোদল ছুঁতে হোল রাত্তে।

খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্জাট চুক্তে রাত এগারোটা বেজে গেল। মৌলবী সাহেব 'আকদ' পড়িয়ে গেলেন। দেন মোহর বাঁধা হল পঁচিশ। পঁচিশ টাকা বাদ জেয়োৱ।

দুর্দান্ত মেহনৎ করে আরিফ। হাঁড়ি-বাসন পরিষ্কার, মেহমানদের খাতিরদারী নওশা-দুলহিনের পাঞ্চী মাঠ থেকে ঘুরে এলো, তারপর বেহারাদের দেনা-পাওনার ঝঞ্জাট—হাজার গন্ডা কাজ এসে জমে। আরিফ পঞ্চাংপদ হয় না।

দুঃখের কোন ছায়া নেই এই সংস্কৃতে। পানাপুকুরে স্বানার্থী ঢেউয়ে ঢেউয়ে পানার দল সরিয়ে যেন অবগাহন করছে। ফাঁকা পানির ওপাশে পানার বেষ্টনীর কথা সে ভুলে যায় স্বচ্ছন্দে।

এত রাত পর্যন্ত জেগে রইল রসুল, সক্ষ্যায় যার ঘুম আসে। পালকি-চড়ার সাধ মিটে গেছে তার।

—বউ দেখতে এসো সকালে, চাচা। আরিফ ফয়েজ আর অন্যান্য চার-পাঁচজন আমন্ত্রিত বন্ধুদের অনুরোধ করল।

লৌকিকতার কোন ঝুঁটী করবে না আরিফ। হারেস আজ নওশাহ— নতুন সন্তাট। এই সব হাঙামার উর্ধ্বে তার আসন। বন্ধুর দুরবস্থার কথা সে কল্পনায় জানে মাত্র।

তিনদিন পরে মালেকা বায়না ধরে। দুলহিন-কে সে নিজের বাড়ি আন্বে। দুলার শৃঙ্খল নেই বলে দ্বিরাগমন হবে না বুঝি? আরিফ প্রস্তাব পছন্দ করে নি। আবার পালকি-খরচ খামাখা। তিরিশ টাকা দেনা হোয়ে গেছে।

দুলহিনে মুখ-দেখানি দুটি টাকা মালেকা সোহাগের আঁচলে বেঁধে দিয়েছিল।

— তোমার পাওনা রেখে দাও, বোন।

মেহদি-রাঙা দুল্হিনের আঙুলের শীষে রূপার টাকা চকচক করে। -তুমি রেখে দাও,
বড় বুরু।

এত কথা জানে সোহাগ! মালেকা বুরু-ভাকে আরো গলে পড়েছিল। কিন্তু টাকা সে
ছোঁয়ানি।

শেষ পর্যন্ত রাজী হলো আরিফ। দুলহিন পাল্কি চড়ে ঘুরে এলো কয়েক মাঠ। রসূল
পাল্কির দরজা ফাঁক করে সক্ষা-লাগা বাইরের দিকে শিশু-দৃষ্টি মেলে অবাক হয়েছিল
বুব। নতুন খালার (মা বলেছে: চাচি নয়, তোর খালা-আম্বা) সেঁদা-গন্ধ শরীর আর
কাপড় তাকে কম বিস্মিত করে নি।

হারেস বাড়াবাড়ি পছন্দ করে নি। দুই বছু হার মানে গার্হিণ্য ধর্মের কাছে। মালেকার
উৎসাহের উপর নতুন শৃঙ্খলা জাগে হারেসের। শুধু কি তাই? আরিফ হারেসের ঘর দখল
করবে আজ। তার ঘরে নতুন দুলা-দুলহিন। হারেস অবাক হয় সোহাগের দিকে চেয়ে।
তিনিদিন মুখ ফুটেছিল না তার। আজ ঘোমটার আড়ালে সে দৃষ্টি বিনিময় করে। এক বাটি
দুধ এনে তার হাতে দিল। দরজার ওপরে চূড়ির নিক্ষেপ। হারেস উপলক্ষ্মি করে, শিক্ষার্থীর
'ওস্তানী' আছে পেছনে। পানীয় পান করে সে।

দুধের বাটি নিয়ে ফিরে গেল সোহাগ। একটা নীল পাড় শাড়ি পরেছে সে। বেশ
মানায়। নব-বধূর সঙ্কোচহাস করে পাঁত্লা পরিচ্ছদ। দরজার ওপারে ফিসফিস আওয়াজ
থামে না। অনিচ্ছুক কোন মক্কেলা-কে উকিল সলা-পুরীমৰ্শ দিতে ব্যস্ত যেন।

হঠাৎ ছিটকে পড়ে সোহাগ ঘরের ভেতর। কে যেন তা-কে ঠেলে দিয়েছে। বাইরে
চাপা হাস্য ধ্বনি। টাল সামলে সোহাগ হাস্যে।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে সোহাগ হারেসের পাশে। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস
আসে সন্তর্পণে। সোহাগের নিঃশাসনক্ষের স্পন্দন অনুভব করে হারেস। বাড় উঠেছে
যেন পৃথিবীর কোন সীমাপ্রান্তে। দুর্মকা ঝাপটা ধ্বনি তার এগিয়ে আসছে বিদ্যুৎবেগে।
তারি দোলা লাগল পাঁজরে। মুখে বুকে বাতাসের ক্ষিপ্রোধ দ্রুত ধাক্কায় সমগ্র শরীরকে
সঙ্গী করে নিতে চায় শূন্য... শূন্যে মহাশূন্যতার দিগন্তে। হারেস তাই সবলে আঁকড়ে ধরে
সোহাগ-কে। মাটির ময়তা ধিরে আসে নিবিড়ে, কাল-স্থান-হীন অপরূপ স্বাপ্নিক ফেনিল
আবর্তে, নতুন ত্ণাক্তুরের ঘুমের মত হঠাৎ শব্দের জন্ম-মৃত্যুর সমারোহে। মাটি আর
পৃথিবী, স্বপ্ন আর জাগরণের শিহরণ। নিমীলিত নেত্র পদ্মের কোরকে কোরকে ভ্রম শিশুর
আর্তনাদ আর দংশন।... যা আবৃত্ত ছিল তা অনাবরণের মহিমা লাভ করে যা অনাবৃত্ত ছিল,
তা দেহের আবরণে ঢাকা পড়ে। উন্নাদ চেতনারা ছুটে আসে নিঃশব্দ দ্রুত... কম্পমান
সমুদ্র ফেনিল উচ্ছাসে প্রতিধ্বনি করে বিরাট নৈংশব্দের নিনাদগাসী অধিত্যকা কন্দরে...

হারেস ভোরে জেগে উঠল। সোহাগ খাতুন তখন ঘুমে অচেতন। ভোরের আলো ছড়িয়ে
পড়েছে জানালার পাশে। চেয়ে থাকে হারেস। বড় কঢ়ি মুখ, দুই পক্ষ নীরবতায় বুঁজে
রয়েছে। পাঁপড়ির দল কালো ছায়া ফেলেছে আলো-স্নাত গভদেশের উপর। অধ্যুষিত দীপ
আবার শ্যামলিমায় ভরে গেছে... কিরঘীজ-কুমার কি খিমা বাঁধল জনপদের বুকে? স্বপ্নাচ্ছন্ন

হারেসের মন। সোহাগের আরো বুকের পাশে মুখ লুকায় সে। ঘূম ভেঙে গেল সোহাগের। আলোর শিহরণ দ্বিধা-লজ্জা টেনে আনে। টাটির খিল খুলে সে বাইরে গেল।

আনন্দমুখের আলস্যে হারেস শয়ে থাকে। বাধা দিল না সে সোহাগকে। অবসরের মৌমাছি গান করছে চারিদিকে। বাসেদ মিস্ত্রীর ঝংকুটি নেই, ধোয়ার সঙ্গে অশ্রুর নিগড় বাঁধার ঝংগুটি নেই; রুক্ষ নগরী দূরে কোথায় সরে গেছে, কল্পনায় তার অস্তিত্ব আঁকা ও দৃঃসাধ্য। অবসর, সন্ধ্যার চুম্বন ছোওয়া প্রাত্মরের ঘুমের মত অবসর...

বর্ষার পর আরিফ হারেসের সঙ্গে শহরে রোজগারের পথ দেখবে। এই ক'মাস বেকার বসে থেকে লাভ নেই। সংসারে নির্জনতা কেটে গেছে। মালেকাও এখন নিঃশব্দ।

হারেসের কল্পনা বিপরীত। গ্রামে থাকবে সে সারা জীবন। নীচের সফল স্বপ্ন তৃষ্ণার সন্ধ্যার সম্মুখে আর মেলে ধরবে না। শুধু গতরের মেহনৎ অটুট থাকুক তার।

জমির জন্য আরিফকে সে অনুরোধ করে। হঠাৎ জমি পাওয়া মুশ্কিল। নায়েবের কাছে দুই জনেই ধর্ণা দিয়েছিল। খুব চড়া সালামী চায় সে। হারেস মিরাশ হয়, জমি চাষের জন্য তিরিশ-চলিশ টাকা সালামী দিলে আর ঘরে কি উঠবে। মধ্যবিত্ত যারা জমিদারের কাছ থেকে মৌরসী করে নেয় জমি, তাদের বাঁধা বন্দোবস্ত চাষী আছে। নতুন প্রজার কোন দরকার নেই। আশ্বাস দিল আরিফ: দু'এক মৈস সবুর করো। আমি দাঁও পেলে নিয়ে নেব।

আরিফ মিথ্যা বলেনি। অনেক সময় পুরুষের চাষীর প্রতি জমিদার ও জমিওয়ালারা বিরক্ত হোয়ে উঠে, নতুন চাষী প্রয়োজন হইয় তাদের— সেই একটা সুযোগ। প্রজা সামান্য অবাধ্য হোলে, বশ্যতায় পাঁচ মৈস হোলে ছুতা-নাতা করে জমিওয়ালারা উচ্ছেদের চেষ্টা করে। খবর রাখার দরকার যি? গায়ে এমন ব্যাপার বহু ঘটছে। সুতরাং হারেসের দুচিন্তার কোন কারণ নেই। আরিফ চেষ্টার কোন কৃটি করবে না।

সোহাগ হারেসের প্রস্তাৱ পছন্দ করে না।

— তা হয় না। তুমি গায়ে চাষ করবে। শহরে কত রোজগার। এই দেশের কতজনের অবস্থা ফিরে গেল।

সোহাগের কথা নিতান্ত অবহেলাযোগ্য নয়। দু'একজনের কপাল চমকে উঠে বৈকি। কিন্তু দু'হাজার জনের নয়। সোহাগের ভুল শুধু সেইখানে। একটা ব্যতিক্রমকে আইন বলে মেনে নিতে কোন বাধে না। মেয়েরা একটা ভাত টিপে অন্যান্যের সিন্ধ হওয়ার খবর ঠিক করে।

— এখানে থেকে কি হাড়ে লক্ষ্মী জোটে। লোকের অবস্থা দেখছ না?

হারেস চূপ করে। যুক্তি সে খুঁজে পায় না। সে সকলের ব্যতিক্রম, এইটুকু সহজে প্রমাণ করতে পারে— হারেস এই যুক্তির আশ্রয় খোঁজে কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

— এখন জমি ত পাওয়া গেল না। শহরে-ই যাব। তবে পরে।

সোহাগ খুশী হয়।— বেশ, পরে বেশি রোজগার হোলে নিজে জমি কিনে ফেলতে পারবে।

হারেস নতুন দৃষ্টি ফেলে মহানগরের উপর। সোহাগের বুদ্ধির মনে মনে প্রশংসা করে সে।

রাত্রির মদিরা-সৌরভে আরো বুক ভরে আসে।

পরম্পর জীবনে অনেকটা মিল আছে। তাই সহানুভূতি ও সাহচর্যে অচ্ছত বস্তুত গড়ে উঠছে দু-জনের ঘধ্যে।

পুরাতন স্মৃতির খেই টেনে আনে হারেস।

— চাচির কাছে মানুষ, লাঞ্ছনা-গঙ্গা দিত খুব?

সোহাগ জবাব দিল : না, চাচি আমার খুব ভাল মানুষ। তারও কপাল ভাঙা। চাচি ধানের নৌকায় কাজ করত। ঝড়ে নৌকাড়ুবি হোয়ে মারা গেল। চাচির ভায়েদের মোটের উপর সচ্ছল অবস্থা। তারা-ই ত সংসার চালাত চাচি। আমি বাড়তি লোক সংসারে, তারা পছন্দ করত না আমাকে টানুক চাচি। এইজন্যে কুলোত না ভাদের টাকায়। চাচি লুকিয়ে ধান ভান্ত। সেই মাঝুরা আরো রাগ করত তাই।

— চাচিকে এখানে আনলে হয় একদিন।

সোহাগ কোন সায় দিল না। আবেগ-স্নাতে সে বলে যায় : আসার দিন পাক্ষী তুলে দেওয়ার আগে তার কি কান্না। আমারও খুব কান্না পেয়েছিল।

সোহাগের পিঠের উপর হারেস হাত বুলায় গভীর স্নেহে।

— বিয়ে ঠিক হওয়ার পর চাচির ভাই কি হাস্তোম্ব না বাধালে। সে বলে, তুমি এতদিন টেনেছ মেয়েটাকে, বরের কাছ থেকে টেকা চাও। দশ-বিশ যা হোক। চাচি সেদিন কড়া কথা শুনিয়েছিল, বেচে খাব মেয়েটাকে।

অকস্মাৎ নিভে যায় সোহাগ।

হারেস কি প্রশ্ন করবে ঠিক করতে পারে না। এমনি ভাকে, সোহাগ।

— জী।

— আর কথা বলছ না।

চুপ থাকে সোহাগ খাতুন। ভিজে চোখের পাতা মোছে সে অঙ্ককারে, হারেস কিছু জানে না।

— আমার ঘুম পায় কি না।

— চাচিকে একদিন দাওয়াত দাও।

সোহাগ বলে, না। আগে সংসার গুছিয়ে নিই। তারপর। চাচি এসে যেন সুখী হয়।

হারেসও তাই ভাবে। সংসারের সবদিক গুছিয়ে ফেলতে হবে ধীরে ধীরে। পাঁজরের আরো নিকটে আসুক সোহাগ, আরো নিবিড়ে আসুক ঘুম।

আরিফের সংসারে নির্জনতা কেটে গেছে। তার কাম্যও ছিল তাই। নানা কাজে সে ব্যস্ত থাকে। শুধু মুনিশই সে থাটে না। কয়েকদিন মালের নৌকায় দাঁড়ির কাজ করে সে। মালেকা আর অভিযোগ করবে না, ‘আমি একা এমন বুনো জায়গায় থাকব কি করে।’ রোজগারের পথ খোলে ধীরে ধীরে। কেবল গাঁয়ের কাজের উপর আর নির্ভর করতে হয়না। বর্ষার পর সেও হারেসের সঙ্গে নগরে জীবিকা সংঘেরে আশা পোষণ করে।

এক মাস পলকে কেটে গেল। হারেস সঙ্গে যা টাকা এনেছিল শহর থেকে, খরচ

করে। জমি পাওয়ার বহু চেষ্টা আপাততঃ ফলবতী হয় না। আরিফ মাত্র পাঁচ-ছয় বিষে জমি চাষ করে। তার ভাগ সে দিতে চেয়েছিল। হারেস রাজী হয় না। এই জমিতে তোমার সংসার ঠিক মত চলবে না, ভাই।

মালেকা মনের সঙ্গীবতা রক্ষা করে নানা উপায়ে। হারেসের বিভাগের দেনা সে নিজেই জানে না। আরিফ খোলাখুলি দেনা বন্ধুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাকি ছিল শুধু মালেকার অনুমোদন। সেদিন ভয়ানক রেগেছিল মালেকা এই প্রস্তাবে।

— গরীব, তাই বলে মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে নাকি তুমি?

মিইয়ে গিয়েছিল আরিফ। শালীনতার এত বাঁধ-রক্ষা গরীবের পোষায় না।

মালেকা অবিশ্য আরো সঞ্চক্তে পড়েছিল। একদিন সোহাগের হাত থেকে পৈঁচি খুলে নিল সে, কেবল পরিকার করার অজুহাতে, ক্ষুণ্ণ হোয়েছিল সোহাগ। হারেসের সঙ্গে আলাপও হোয়েছিল এই প্রসঙ্গে। তার মনে কোন বক্তৃতার ছাপ পড়ে না। নিজের জিনিস ফেরৎ নিয়েছে অধিকারী, তার জন্য আবার কেউ মনঃক্ষণ হয়?

দুদিন পরে সোহাগ মত বদলাতে বাধ্য হোয়েছিল। বেনের দোকানে বিক্রী হোয়ে গেল হাতের পৈঁচি জোড়া। দেনার জের মিটেছিল বিয়ের তার দৌলতে। হারেস সোহাগের কাছে ব্যাপারটা শোনে শুধু। হাতের টাকা ফুরিয়ে এসেছে তার, বন্ধুর উপর বেশি জুলুম করছে সে জল্লাদের মত। সোহাগ গায়ে মুনিশ খাটা পর্যন্ত পছন্দ করে না। স্ত্রীর মন ঘৃণিয়েছিল বৈকি সে, নচেৎ একমাসে একদিনও সে জেনেন রঞ্জির হিল্যায় বেরুল না কেন। রোজ না হোক, কাজের খুব অভাব ছিল না গাঁয়ে।

দু-মাস পরে ফিরে এলো হারেস মহামুগ্রে। দানা খুঁটে খাওয়ার পর এই দিকে কেবল খোলা।

অভ্যন্তর পরিবেশে তেমন বিরক্তিক্ষম কিছু নেই। আলির বল্লাহীন জীবনে কোন পরিবর্তন হয় না। বাসেদ মিস্ত্রী রোজগারে ফেপে উঠেনি শুধু, খোল্তাই হোয়েছে চেহারা তার। নিজের হাতে কাজ করে না সে। মিস্ত্রী ঘরামী যোগাড় করাই তার বর্তমান কাজ। মাঝ থেকে আসে মোটা দস্তুরী। বুড়ো মেহেরালী ছাগল নিয়ে তেমনি বেরিয়ে যায় সকালে, গভীর রাত্রেও ডিবা জ্বেলে ঘাস খাওয়ায় গৃহপালিত জীবদের। নাসিম আরো বেয়াড়া হয়ে গেছে। ফরিদপুরের ছাতাওয়ালারা উঠে গেছে অন্য কোথাও, নতুন ভাড়াটে এসেছে সেই ঘরে। ছেউ বিড়ির কারখানা। পাঁচ-ছয় জন কারিগর দিন-রাত কাজ করে। ঘরের চেহারা ফিরে গেছে। উপরে কাঠের মাচাঙ পাতা। খলি ভরা বিড়ির পাতা ও শুকোর শুদ্ধাম। নিচে কারখানা আর শোয়ার জায়গা। বহু সিনেমার প্লাকার্ড মাটির দেওয়ালে আঁটা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীর সম্মেলন। দু-টো ঘেরাটোপ চুলার ভেতর দিন-রাত আগুন জুলে, তারের ছাউনীর মাথায় চলে বিড়ি সেঁক। হারেসের সঙ্গে সকলের পরিচয় জয়ে না। পুথি পাঠের আনন্দবর্যী আন্তর্নার করণ পরিণতি।

রাজ-মিস্ত্রীর যোগাড়ে। হারেস সকালে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। বিকালে ক্যানালের দিকে বেড়াতে গেল। পরিচিত মাল্লা অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। রঞ্জির পথ বক্ষ। মাঝিরা আজ-কাল ভাগ চায়। তেমন ঈমান ব্ৰহ্মাদ করে লাভ নেই। হারেসের ভাল লাগে না ব্যাপারটা। সামান্য আয়ের পথও এমন আঁধা-গলিতে পরিণত হবে। ধোঁয়া ঠেকে

চারিদিকে তার। নৈরাশ্যের পাতলা কুয়াশা জাল মেল্ছে যোজন-যোজন। সৎ উপার্জনের উপায় বিশ্বৃত হোতে শিখছে হারেস।

ফিশারীর বাবুরা মাছ ছেকে নিয়ে গেছে। পুকুরের তলায় শুগলী আছে কিনা সন্দেহ।

শহরের সব অসুবিধা ভোলা যায়। সোহাগের আকর্ষণ হারেস মনকে কি দিয়ে ভোলাবে? শহর আর নগর। পেঙ্গুলামের মত দিক পরিবর্তন। মিস্ট্রী রাগ করে। যদি এত ঘরের-ই টান, শহরে আসার কি দরকার। বাসেদ মিস্ট্রীর কষ্টস্বরে দরদ উঠে গেছে। ছুটির নাম করে না এক আধ ঘণ্টা। তীক্ষ্ণতর তার দুই চোখ। ফাঁকির যো নেই। আলি নেহাঁ খাঙ্গা বাসেদের উপর। শুকুর সকলের ঘনোভাব মিস্ট্রীর কাছে পেশ করে। সেই একমাত্র মিস্ট্রীর প্রিয় মজুর। তোয়াজের গুণ জানা আছে শুকুরের। অ্যাচিত-ভাবেই সে মিস্ট্রীর গামছা ধোয়, ফাই-ফরমাস আবিক্ষারের পর তামিল করে।

এমন জ্যাগায় মন ভাল থাকে না হারেসের। আরিফের পাশাপাশি সকলের তুলনা করে সে কল্পনায়। ক্ষুক্র রোমে তার শরীর রিপি করে। অথচ মুখোমুখি অভিযোগের কোন সাহস পায় না হারেস।

অবসরের ফাঁকে সে বেরিয়ে আসে মেহেরালির দাওয়ায়। পরম নিশ্চিন্তে এখানে কথা বলা যায়। স্বেহ-বৎসল বৃদ্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পাই। গলি-ঘোরা বাতাস এসে লাগে দাওয়ায়। ক্লান্ত শরীরে তা পরম উপাদেয়। স-উৎসাহে ছঁকার নলিচা টানে হারেস। বয়সের বিভেদটুকু মেহেরালি নিজেই মুছে দিয়েছিল।

প্রশ্ন করে মেহেরালি : শহরে তোমাদের পোষায় না। ছোটবেলা থেকে আমরা এসেছি কিনা। সব সয়ে যাচ্ছে। গায়ে আমার মন টেকে না। বৌমাকে নিয়ে এসো না।

— না, তারা দু-দিন থাকতে পারবেন না।

— ওসব বাজে কথা। এই যে আমার সোনার বৌমা, আজ ক'বছর রয়ে গেল।

মেহেরালির স্ত্রী সংলাপের শরীক নয়, পান সাজছিল সে চৌকাটের ওপারে। হঠাৎ ছুটে আসে তার মন্তব্যের বান : নিয়ে যাওয়ার মুরোদ থাকলে ত? পাঁচ সাত টাকা খরচ করে একবার মেয়েটাকে দেখতে এলো না।

— চুপ করো। মেহেরালি একটু ঝুঢ় হয়।

থামে না মেহেরালির স্ত্রী : মেয়ের বাড়ি এলে খরচ আছে, না-হয় না জুটলো, খালি হাতে এলে কি গর্দান যেতো।

— আল্লার ওয়াল্টে টুড় একটু থামাও।

নাসিমের বৌ অপর ঘরের ছাঁচার পাশে উঁকি মারে। হারেস কল্পনা করে তার অবস্থা। অবাক হয়, হারেস। এত কাছাকাছি থাকে, তবু কারো মনের হদিস কেউ জানে না। পাগলা গারদের অধিবাসী নাকি।

পান চিবোয় বোধ হয় মেহেরালির স্ত্রী। কষ্টস্বর তার খুব স্বাভাবিক নয় : সত্যি কথা বল্লেও তুমি চটে উঠো।

— চুপ করো। তুমি বৌর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছে। বৌর বাপের সঙ্গে দিলে তার চাল-চলনের অত হিসেব নিতে।

মেহেরালির স্ত্রী নামাজের পাটীতে বসল একটু পরে। ঝগড়া থেমে যায়। অন্য কথা

পাড়ে হারেস। মেহেরালি ধূমপানে অন্তিম ভূবিয়ে রাখে। আনন্দনা প্রশ্নের জবাব তার মুখে। দাওয়ার এক-কোণায় গিয়ে সে ডাকে : বৌমা। ফিসফিস অস্পষ্ট কঠের ডাক।

হারেস চেয়ে দেখে নাসিমের বৌ ঘোম্টা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

— কিছু মনে করো না, মা। বুড়ো বয়সে ওর মাথার ঠিক নেই। কতগুলো ভাই তোমার। মরেছে ওর চোখের সম্মুখে। মাথার ঠিক থাকবে কেন?

— না বাবাজী, আমি কিছু ত মনে করিনি।

নারী-কঠের করণ মিনতি ঝরতে থাকে।

হারেসের পাশে এসে বসল মেহেরালি।

— দুনিয়াটা বড় ঝঙ্গাটের জায়গা। আল্লা কি কপালে সুখ রেখেছে। হাঙ্গামা কাঁহাতক পোয়ানো সহ্য হয়।

হারেস কোন জবাব খুজে পায় না : সহ্য করা ছাড়া উপায় কি।

আবার এক চিলিম তামাক সাজল হারেস। বৃন্দ দম ভরে ফোকে। ধোয়া দিয়ে বুকের আগুন নিভানোর চেষ্টা চলে।

— সুখী হও, বাবাজী। আল্লা সুখে রাখুক। ঘর সংসার পেতেছ, আল্লার কাছে দোয়া মাঞ্ছি।

হাত তোলে আকাশের দিকে মেহেরালি।

তারায় ছেয়ে রয়েছে অগাধ আকাশ।

লাঞ্ছিত বৰ্য অপত্যস্নেহের ভীরু ধারা আধাৰ থোঁজে অন্ধকারে।

হারেসের দিকে চেয়ে থাকে মেহেরালি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পান প্রেতে বেরোয় হারেস আলির সঙ্গে। সে হাসে, বুড়োর সঙ্গে খুব জমিয়েছিস। দোয়ানু থলি ঘেড়ে দিয়েছে আজ।

হারেস ঠোঁট চেপে হাসে।

আলির মুখের তোড় চলে : ও সব ফুস মন্তব। আমার বাবাজী রোজ নামাজের পাটীতে দোয়া করে, তার ছেলে যেন গোটা কল্কাতা ট্যাকে গুঁজে ঘরে ফিরে। ভাবছি, গড়ের মাঠ-টা নিয়ে ফেরা যায় কি না।

এত হাস্তে পারে আলি! মেহেরালির সাদা-শুশ্রাল মুখ বার বার ভেসে উঠে হারেসের সম্মুখে।

কলা-বিবির বন্তীর বিবিরা অনেকে পর্দানশীনা। শ্বামীগুত্তের ইঞ্জত তারা রক্ষা করে বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ না রেখে। হারেসের বাসার দু-তিন খানা বাড়ি ছাঁড়িয়ে কাঁচা নর্দমার সরু রেখা। পাশে তার চেয়ে সংকীর্ণ গলি। দু-পাশে আরো বাসিন্দাদের আবাস-ভূমি।

জবেদ ঘরামির সঙ্গে তার আলাপ হোয়েছিল এই গলির ভেতর। সকালে সে দোকানে ঠোঁঙা বিক্রি করতে যায়। খুব বেশী হাঙ্গামা নেই। বাঁধা দোকানদার আছে বহু তার। হারেসের লোভ জেগেছিল একদিন। সংসারে আর এক প্রাণী বাড়িয়েছে সে। রোজগার

বাড়ল কৈ?

ঠোঙা তৈরি করে জবেদের স্তৰী। আরো ছোট ছেলেপুলের সাহায্য গ্রহণ করে সে। পর্দানশীনা সংসার শুভ্যে রাখে দক্ষতার সঙ্গে। তার দশ বছর বয়সের ছেলে কাসেম এ-বিষয়ে খুব নিপুণ। পুরাতন খবরের কাগজ সে কাঁচির মুখে উড়িয়ে ছাড়ে। হারেস অবাক হোয়েছিল তার নৈপুণ্যে। আধিপোয়া, এক পোয়া অথব পাঁচ-পো দেড়সেরী ঠোঙা সে মার আদেশ-মত চটপট কেটে যায়। একবার জিজ্ঞাসা করে শুধু। কাসেমের সঙ্গে খাতির জমিয়ে তার বিদ্যে উজাড় করে নিল হারেস। কয়েকদিন হোটেলে এক পয়সার সমচাপিঠে আর সিঙ্গল চা ব্যয় হয়েছিল মাত্র।

বন্তীর এক বিক্রীওয়ালার কাছ থেকে হারেস কাগজ কেনে। সকাল আর রাত্রির অবসরে সে-ও ঠোঙা তৈরি করে। লাভ মন্দ নয়। উপরি-রোজগারের আশ্বাদ টাট্কা।

আলি হাসে, এবার ইমারত তুলবে দেখি। কিন্তু ভাই খেজুর পাতা দিয়ে শেষে ইমারত সেলাই না করতে হয়। তার ব্যঙ্গ হারেস গায়ে মাখেনি। নিজের কাজে হরদম মশগুল থাকে।

সোহাগের কথা সে ভুলতে পারে না। দায়িত্ব, দায়িত্বের বোৰা রয়েছে কাঁধে।

প্রথম মাসে কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছিল হারেস সংসারে খরচ বাবদ।

তিন মাস পরে আবার সামগড় ফিরে এলো হারেস। হাতে নতুন সঞ্চয়ের কড়ি। এবার সঙ্গে সে এক বস্তা পুরাতন কাগজ বয়ে নিয়ে আলিলা। রসূল ছাড়া আর কারো জন্য কোন কিছু ঘূৰ্ষ সে আনতে পারেনি শহর থেকে সোহাগের জন্য অল্পদামী শাড়ী মাত্র।

সোহাগ বলে, কাগজ কি হবে?

হারেস বের করে কাঁচি। দু-বার ঝন্টুল নাচিয়ে সে বলে, নতুন বৌর কান কাটা যাবে। রক্ত যাতে মাটিতে পড়ে তার কাগজ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর হারেস যখন ঠোঙা কাটতে বসল, সব হেঁয়ালি তখন পরিষ্কার হোয়ে যায় সোহাগের।

— ঠোঙা কেটে কি হবে।

— কি হবে। কচি খুকির মত কথা বলো না।

গম্ভীর হোয়ে যায় হারেস। চোখ নীচু করে সে কাঁচি চালায় শুধু। কচকচ শব্দ উঠে নিমুম দুপুরে।

— শহরে বিক্রি হয়। দোকানদার কেনে। তোমাদের খাবার আনি কিসে খবর রাখো।

চার চোখের দৃষ্টি মেশে। শিশিৎ হাস্যে কাজ করে হারেস। হঠাৎ গলা ঝাঁকারী দিয়ে ডাকে আরিফ। ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেল সোহাগ।

— আ রে। আসামাত্র আবার কাজ শুরু করেছ। এ-কি তুমি ঠোঙা তৈরি করতে জানো!

— বসো, মাদুরের ওপাশে। শিখতে হয় ভাই।

— এসেই এত ব্যস্ত। গল্পসম্ভ করো।

কাঁচি থামে না হারেসের।

— গল্পও করছিলাম।

— তবে উঠে যাই।

হাত বাড়িয়ে বাধা দিল হারেস।

— তোমার সঙ্গে বুঝি গল্প করা বারণ।

আরিফ একটা বিড়ি ধরায়।

— এত ব্যস্ত, সংসারে লোক বাড়ছে, রোজগার না বাড়ালে চলবে কেন?

হঠাতে থামল হারেস।

— লোক বাড়ছে মানে?

আরিফ মুখ টিপে-টিপে হাসে।

— এখন কিছু বলব না। ছ-মাস যাক। মিঠাই খাব।

কাঁচির শব্দ এবার বোবা, খসে পড়ছে যেন কাঁচি হাত থেকে। বিচিত্র অনুভূতির রেশ হারেসের মনে। সংসারে রেখে যাবে সে আদমের শৃতি? এত উজ্জ্বল স্বপ্ন-ঘেরা তার চারদিক!

— সত্যি? বিশ্মিত হারেসের মুখ থেকে ছিটকে পড়ল যেন কথাগুলো।

— সত্যি।

আরিফের দুই চোখ উজ্জ্বল।

ঢলা দুপুর অপূর্ব রাগিনীর রেশ বাজিয়ে যায়। বুড়ো বাড়ির ঈষৎ অঙ্ককার মেঝের ওপর।

সব কাজে ছেদ পড়ল হারেসের। একটুকাগজেও আর কাঁচি চলে না।

আরিফ চলে যাওয়ার পর এলো সোহাগ। ধীরে ধীরে মেঝের উপর পা ফেলে সে।

নব-মাতৃত্বের উল্লাস-বিজয়নী মন্ত্রীর দিকে যেন চোখ ফেলতে পারে না হারেস।

হঠাতে উঠে পড়ে সে, সোহাগের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

— রসূলের বাপ যা বলে গেল সত্যি?

সোহাগ কোন কথা বলে না। শ্মিতচৌটি, লজ্জায় আনন্দে সে হারেসের বুকে মুখ বুকানোর জন্য অগ্রসর হয়।

হাতে টাকা ছিল। হারেসের পীড়াপীড়িতে আরিফ একটা দামড়া বাছুর কিনে আনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে।

বাছুরটা বুব তেজী। হারেস চোখ ভরে দেখে।

— হ্যাঁ ভাই আরিফ, তোমার পছন্দ আছে।

আরিফ প্রশংসা হাসিমুখে গ্রহণ করে।

— দেখবে সামনে বছর, পাকা জিনিস।

— জমির চেষ্টা করো। আমি ত ঘোড়া না কিনে চাবুক কিনে বসে আছি।

আরিফ উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করে না: জমি নিশ্চয় পাবে তুমি। কপালের গড়বড়ি। দেবী হচ্ছে এই যা।

— মাস দুই পরে আর একটা। জোড়া হেলে-গৱু দরকার। আর তোমার ত দরকার আছে। বুড়ো গৱু আর পচাঁ লাঙলে ভাল চাষ হয়না।

বন্ধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তার গরুর প্রতি ব্যঙ্গ সহজে এহণ করতে পারে না সে।
ভাল-লাগে না আরিফের। নিষ্প্রত চোখে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

— আচ্ছা আর একটা দামড়া দেখব। প্রাণ-হীন জবাব মাত্র।

দুপুরে দুইজনে ঠোঙার কাগজ কাটে। আরিফও শিখছে হিস। হারেস বলে, আমি
শহর থেকে কাগজ আনব, তোমরা তৈরি করে রাখো সবাই মিলে, ফের নিয়ে গিয়ে বেচে
দেব। ভাল ব্যবসা চলে।

উৎসাহিত হয় আরিফ।

মালেকা নতুন বোনের সঙ্গে ব্যস্ত। বন্ধুদের খৌজ আর সে রাখে না। ফাইফরমাস
শোনে রসূল।

রাত্রে সোহাগ বলে, আমার জন্যে কাপড় এনো না। বুরু কি মনে করবে। শহরে তার
কেউ নেই বলে, একটা জিনিসও পায় না। তোমার কাপড় আমি লুকিয়ে রেখেছি। নতুন
কাপড় দিয়ো, তবে বের করব।

সৌজন্যের অন্যান্য দিক বিচার সব সময় হারেসের পক্ষে কুলায় না।

— ঠিক। আমার ভূল হোয়েছে।

সোহাগের শরীর চার মাসে বেশ বদলেছে। ময়ুরের ছানার নীড়-কাল কেটে গেছে।
হারেস সংসারের প্রতিচ্ছবি দেখে তার ভেতর।

স্কুদ্র পরিবারটি ঘিরে নব-নব উত্তেজনা। পরম উৎসাহে কাগজে আঢ়া লাগায় আরিফ।
ময়দা গরম করে সোহাগ কি মালেকা। রসূল একটা ঘূড়ির জিদ ধরেছিল। তাও অপূর্ণ
রইল না। নিজের হাতে ঘূড়ির কাঠি তুলে হারেস।

শহরে ফেরার দিন ঠোঙার বস্তা স্টেশন পর্যন্ত মাথায় বয়ে আনল আরিফ।

হারেস সোহাগের চেয়ে বেশি ভাবে তার আগামী বংশধর মুকুলের কথা। প্রবাসের
বিচেদ-ব্যথায় ফিকে রং পথের সঙ্গীত রূপে ছড়িয়ে পড়ে, মাঠে মাঠে চলত ট্রেনের
হইশেলে, যাত্রীদের কলতানে। চরাচরে বিস্তারিত তার মৃচ্ছনা।

সাতদিন একটানা বেকার। হারেস চোখে অঙ্ককার দেখে। বাসেদ মিঞ্চী দেশে চলে
গেছে। সেও হাল ছেড়ে দিল নাকি? ঠোঙার কাজ হাতে আছে, তবু রক্ষা। কিন্তু তার
রোজগারে সংসার চলেনা। আলি কাজের সঙ্গানে ছুটোছুটি করে। আল্লা হঠাৎ এমন-ভাবে
কুজি বন্ধ করে দেন গরীবের। হতাশা-ফ্লিষ্ট দুই চোখে হারেস ভাবে।

আলি আর এক মিঞ্চীর কাছে কাজ যোগাড় করল দু-দিন পরে। তার উপর হারেসের
কৃতজ্ঞতা আরো বাড়ে। অনিশ্চয়তার কষাঘাত হারেস জীবনে আর পূর্বে কোনদিন অনুভব
করে নি। চুপ করে থাকা তার অভ্যাস, তাই তার মনের ঠিকানা কেউ জানে না। নিবুম
দেখলে আলি হারেসকে তিরক্ষার করে।

কয়েকদিন পরে ফিরে এলো বাসেদ মিঞ্চী। বেকার দিনের অবসান ঘটে। শোয়াস্তির
নিঃশ্বাস ফেলে হারেস।

তবু মন তার মুষড়ে যায়। আবার হঠাৎ কোনদিন বন্ধ হোয়ে যেতে পারে কাজ।
আশঙ্কার বিভীষিকা বারবার মনে উঁকি মারে। ভাল লাগে না শহর, গায়ে এক-কাঠা ভুই
পাওয়ার যো নেই। নীড় রচনা করেছে সে। ঝাড়ের দোলা দোলা বোধ হয় আর কোন

কালে থামবে না । তারই আস শুধু ।

বন্তীর জীবন খিমিয়ে গেছে । ক্লাবে গান-বাজনা চীৎকার হল্লা বন্ধ । ফেরীওয়ালাদের কারবার লোপাট । খাঁ খাঁ করে ঘরখানা । চেনা মুখ অনেক সরে গেছে দূরে দূরে । মেহেরালী রাত্রে খক্খক কাশে । হাঁপানি রোগ ধরেছে বুড়োর । তবু ছাগল সঙ্গে রাতারাতি সে বেরিয়ে পড়ে । গলার উপর মোটা শিরা মাংসের স্তুপ পেছনে ফেলে যেন আরো অগ্রসর হোতে চায় । তিন চার খানা মাদুলী ঝুলছে মেহেরালির গলায় । সেদিকে আর হারেস বেশি যেঁষে না । বড় কর্কশ কাশি মেহেরালির ।

কাজ থেকে ফিরে আসার পথে একদিন হারেস দেখে বাসার সদর দরজায় একটা রিঙ্গাওয়ালা হল্লা করছে । আরো কয়েকজন বন্তীর বাসিন্দা ভিড় জমিয়েছে । একটু দ্রুতপদে এগিয়ে এলো হারেস ।

পথেরই একজন লোক বলে, রিঙ্গাওয়ালার ভাড়া অন্ততঃ আর্দ্ধেক দেওয়া উচিত । দু-ঘন্টা দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

— দ্যাখো না বাবু । সওয়ারী না যায় এত দেরী করার কি দরকার ছিল ।

ব্যাপারটা আঙিনার ভেতরে চুকে উপলব্ধি করে হারেস ।

মেহেরালির সম্মুখে আর এক বৃন্দ দাঁড়িয়ে আছে সে নাসিমের শ্বশুর । মেয়েকে নিতে এসেছিল । নাসিমের বৌ বাপের সঙ্গে যেতে নারাজ । রিঙ্গায় উঠে সে নেমে গেছে ।

— কি হোলো, চাচা । হারেস জিজেস করে ।

এই দ্যাখো না বাবা— আমার বিয়াই এসেছে অনেক দিনের পর । বৌ-মা যেতে চায় না । একবার দশদিন ঘুরে আসুক । তা বেয়াড়া যেয়ে ।

নাসিমের মা শাপাস্ত করছে— এমনজীহাবাঁজ-চুকরী, কারো কথা শুন্বে না । ঝাঁটা দিয়ে কলাবিবির বন্তী থেকে বিদেয় ক্ষেত্রে ইচ্ছে করে ।

হারেস-ই নবীপুরে আরিফের প্রারফৎ পাঠিয়েছিল । বিশ্মিত সে । কি হোল নাসিমের বৌর? বিগত অবেলার কথা তার মনে পড়ে । নাসিমের বৌর মিনতি এখনও তার কানে স্পষ্ট নিনাদিত ।

— একটু বুঝিয়ে-সুবিয়ে দেখো চাচা । মুকুরীয়ানা করে হারেস ।

খক্খক করে কাশল মেহেরালি বুকে হাত চাপা দিয়ে খানিকক্ষণ । দম ফেলে সে ।

— দু-ঘন্টা এই কিংতি হচ্ছে । কাপড় পরে রিঙ্গায় এসে বসেছিল পর্যন্ত । তারপর যা নামল, আমরা দু'বিয়াই হেরে গেছি ।

নাসিমের শ্বশুরের বয়স ষাটের কম নয় । কৃশ চেহারা । বোবার মত সে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে । বাইরে রিঙ্গাওয়ালা হাঁকছে অন্ততঃ আর্দ্ধেক ভাড়া তার চাই-ই ।

নিরুপায় বৃন্দ ভাড়া চুকিয়ে এসে আবার মেহেরালির কাছে দাঁড়ায় ।

— আজকের মত ঘরে যাও, বৌ-মার বোধ হয় মন খারাপ । পরে এসে নিয়ে যেয়ো ।

— না, আর এ-মুখ করব না । মেয়ে হোয়ে বাপের ইঞ্জত রাখল না ।

ক্ষোভে ঢোখ ফেটে পানি আসছে তার । গাঁয়ের নিরীহ মানুষ । বড় মায়া হয় হারেসের । মেহেরালি হতবাক— ফ্যাল-ফ্যাল নেত্রে চেয়ে থাকে ।

— চাচি, তোমার বৌ হঠাৎ বেঁকে বসল কেন? জিজ্ঞেস করে হারেস।

মেহেরালির ঢ্রী জবাব দিল না।

মেহেরালি বৈবাহিকের হাত ধরে হঠাৎ : মাফ করো ভাই আমাকে। তোমার মেয়ের কোন কষ্ট নেই। আমি যদিন বেঁচে আছি মায়ের কোন কষ্ট হবে না। পরে এসে নিয়ে যেয়ো।

শিশুর ঘত চোখের পানি ফেলে বৃক্ষ। চট্টের পর্দা সরিয়ে সদর দরজার আড়ালে হোয়ে গেল সে। বড় শুধু চলার ভঙ্গী। বৃক্ষের ভাঙা চিবুকে অশ্রু জমে রয়েছে।

স্তন্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল হারেস। এমন ছিলাম মেয়ে জীবনে আর দেখেনি সে। এত মিথ্যে ছলা-কলা এরা জানে। তার সঙ্গে প্রেম নিবেদনের জন্য কি সেদিন এত অছিলা করেছিল নাসিমের বৌ!

রাগে হারেসের দুই চোখ পুড়তে থাকে। ঘনঘন সে নাসিমের ঘরের দিকে তাকায়।

দু-দিন পরে অবেলার গা-ঢাকা অঙ্ককার পথে হারেস বাসায় প্রবেশ করে। সদর দরজার পাশেই এক ছায়া-মূর্তি নড়ে উঠল হঠাৎ। হারেস চেনে এই মানবীকে। কোন কথা না বলে সে নিজের পথে এগিয়ে এলো।

চুলো নিয়ে আবার হাস্তামা। ধোয়ায় চোখ বুঁজে আসে। কাঁচা কয়লা আজ যেন জ্বলতে চায় না।

দরজার উপর নাসিমের বৌকে দেখে হারেস অসোয়াস্তি অনুভব করে। এমন ভর সন্ধ্যায় যদি নাসিম দেখে, খুন করে ফেলবে সে—

আর পা বাড়ায় না নাসিমের বৌ।

হারেস রুক্ষকর্তৃ বলে, এখানে কেন্দ্ৰ

নাসিমের বৌর মুখে ঘোমটা প্রস্তুত সরে গেছে।

সে বলতে থাকে, তুমি আমার চের উপকার করেছিলে ভাই। আমার কপালপোড়া কি করব।

— এখন যাও শিগগির।

— সবাই ঘুমাচ্ছে তাই ত এলাম। কোন ভয় নেই।

— তুমি যাবে কি না। বড় কর্কশ হারেসের গলার স্বর।

— এত রাগ করছেন কেন ভাই। আমি এখনি যাচ্ছি।

— তবে যাও।

— আমার কথাটা শেষ করে নিই।

— যাও।

নাসিমের বৌ আর সময় দেয়না নিঃশ্বাস ফেলার। বলতে থাকে সে : বাবাজীর সঙ্গে কি করে যাব। গেলে এখানে ঢোকার জায়গা থাকবে না। মা ছেলের নিকে দেবে, নতুন বৌ আসবে। আর আমার জায়গা থাকবে এখানে? সেখানে গরীব বাপ-ভাইদের গলার কাঁটা হোয়ে ঝুলে লাভ কি। তুমি সেদিন কি না ভেবেছ, ভাই। বাপ যদি গরীব না হোত—

আর দাঁড়ায় না নাসিমের বৌ। পলকে প্রাঙ্গণের ঘুপটি অঙ্ককারে মিশে গেল সে।

হতবাক হারেস। চুলায় ফুঁ দিতে সে ভুলে যায়। বাইরে এলো সে। ছোট দাওয়ার এক কোণে নাসিমের বৌ দাঁড়িয়ে আছে। মাফ চাইবে হারেস একটি বারের জন্য। সদর দরজায় পাতালির শব্দ সব গুড়িয়ে দিল। হারেস পথ-চলার ভান করে। চট্টের পর্দা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার বিপরীত মুখে ফেরে সে। দাওয়ায় তখন কোন ছায়ামূর্তি নেই। নাসিমের বৌ চলে গেল। গৌর রং তার ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে, নিষ্পত্তোখ দু-টো কাতর মিনতি ভরা। ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় না হারেস। এই জাহান্মের ভেতর কেমন করে নসু-বৌর দিন কাটবে, হারেস ভাবে। হাঁপানি বেড়েছে মেহেরালির। তার মৃত্যুর পর একদিন গলায় দড়ি দিয়ে ঘরবে নসু-বৌ নির্ধার্ণ।

আরো এক বছর কয়েক মাস।

হারেস মাত্র দু-বিষে জমি আদায় করেছে। তার উপর শুধু নির্ভর করা চলে না। আজকাল আলাদা দুই পরিবার। সোহাগের মর্যাদা মাত্তে উন্নীত। বাপের মত-ই পাট্টা চেহারা হারেসের ছেলের। আরিফ পছন্দ করেছিল নাম, কিবরিয়া। সোহাগের নাকি নামটা পছন্দ হয়নি। বঙ্গুর মনে কোন দাগ পড়ে হারেস তা চায়না। আকিকার সময় খামাখা ব্যয় করেছিল হারেস। তার জের সহজে মিটল না। একটা মাত্র হালের গরু। আরিফের বুড়ো গরু মাসে-মাসে ঝাগ নিতে হয়। আর একটা দামড়া ঝষ্টুর কেনার পয়সা জুটছে না। নতুন বৎশধরের জন্য ব্যয়-ভার আরো বেশি। সন্তাব জ্ঞায় আছে দুই পরিবারে। টানাটানির সংসারে পাছে ঝগড়া বাধে, আরিফ তাই নিজেই পৃথক হোয়ে গিয়েছিল।

দু-মাস শহর থেকে ফিরেছে হারেস। বৌজাধান ছড়িয়ে গিয়েছিল সে। নতুন অঙ্কুর হাত-উঁচু ধানগাছে পরিণত। চাষবাস সেরেই আবার কর্মহুলে ফিরে যেতে চায় সে, টুংটাং কাজ হয়মাত্র। বাসেদ মিত্রী অনেক লোক ছাঁটাই করে দিয়েছে। তার প্রিয় শুকুর পর্যন্ত অন্যত্র চলে গেছে।

এইবার বৃষ্টি নামল বিলম্বে। আষাঢ়ের শোষাশ্ব। বীজ বাড়ছে, অথচ বৃষ্টি নেই। আবাদের অসুবিধা।

বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে কর্মব্যস্ততা কোলাহল বেড়ে চলে। দিন নেই, রাত নেই, ধান-রোয়ার কাজ চলছে। বিদেশ থেকে কিষাণ এসেছে কত। যাদের জমি খুব বেশি, তারা একা কুলিয়ে উঠতে পারে না। বিদেশী মূনীশদের বলা হয় কিষাণ। কোন সঙ্গিপন্ন চাষীর বাড়িতেই তারা অবস্থান করে। খাওয়া দাওয়াও সেইখানে। ভূমিহীন চাষীরা কিষাণেরা বর্ষার সময় কাজে গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়ে।

হারেসের জমি সামান্য। কয়েকদিনে তার আবাদ নিজেই শেষ করে ফেলে। তার পর সে-ও কিষাণদের সঙ্গে রোজগারের পছা দেখে।

মাঠের আবাদ শেষ হोতে কয়েক সন্তাহ লাগে। বৃষ্টি নামে মাঝে মাঝে। পনর দিনে সমস্ত মাঠ ঝল্সে উঠে রঞ্জে রঞ্জে।

গত তিনদিন থেকে অঞ্চলে বৃষ্টি নেমেছে। ‘নাবী’ অর্থাৎ বিলম্বিত রোয়া যাদের বাকি ছিল, তারা শেষ করতে পারে না। দহলিজে বৈঠকে কিষাণেরা গুঞ্জন করে। পাট-

শনের দড়ি কাটে কেউ ; কোথাও পঁচিশে কি তাস চলে । দাবার নেশায় মাতে বুড়োর দল ।

হাবসী মেঘেরা আকাশের চারি প্রান্তের ছাউনী ফেলে । বিদ্যুতের ঘন-ঘন চমকে জলে তাদের শিবিরাগ্নি । বৃষ্টির আকাশ বসুধার কন্দরে কন্দরে অনুভূত হয় । তরুণতা আনন্দে কাঁপে ।

হারেস বসে থাকে ছেট ঘরে । কিবরিয়া হামাগুড়ি টানতে শিখেছে মাত্র । ওই ত হারেসের খেলার পুতুল । উঠানের চুলাশাল ভিজে গেছে । ঘরেরই এক কোণে দুটো ইঁটের উপর হাঁড়ি দিয়ে রান্না চড়ায় সোহাগ । মালেকা আজ অন্য বন্দোবস্ত করে না । সোহাগদের হাঁড়িতে চাল আর আলু দিয়ে গেল ।

আরিফ ঘরে নেই । নৌকায় গেছে সে তিনদিন । বৃষ্টির প্রকোপের সাথে সকলের উৎসের বাড়ে । মালেকার পাশে রসূল বসে থাকে । হাত-পা সেঁধিয়ে আসছে মালেকার বুকের ভেতর । হারেস নদীর ঘাটের দিকে টোকা মাথায় এক বার ঘুরে এসেছিল সকালে । না, কোন নৌকা আসার সম্ভাবনা নেই আজ । বারগাঙের চড়ায় দু-টো নৌকা মারা গেছে, ঘাটে মাঝিদের কাছ থেকে সে শুনে এসেছিল । কাউকে কিছু বলে না সে । তারও মন উঠিগু । কিবরিয়ার সঙ্গে আন্মনা খেলামাত্র, প্রাণের যোগ আসে না ।

তর-সঙ্ক্রান্ত ফিরে এলো আরিফ । একটা বড় ইলিশ মাছ তার সঙ্গে । সমস্ত শরীর ভেজা । আর কোন জিনিস আনার সুযোগ হয়নি আজ ।

সোহাগ ইলিশের চকচকে তনু দেখে । মালেকার মুখে পুনরায় হাসি ফোটে । আধঘন্টা পরে ইলিশ মাছের তাজা গন্ধ বাদল হাওয়ায় আরো মিষ্টি লাগে ।

বৃষ্টি ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই । অঙ্কুরে মেঘের ছায়ায় আরো পুরু হয় । জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছিট আসে । সন্তর্পিত বাতাসে প্রদীপের শিখা অন্তোনুখ । একটা তালপাতার চুটি ঘিরে দিল জানালার মুখে সোহাগ ।

মালেকার শরীর ইদানীং খারাপ । সংসারের অবস্থা তদ্রুপ । মুখে হাসি লেগে থাকে, তবু প্রাণ সেখানে অনুপস্থিত । বর্ষার দিনে ঘাটের কাজ । সব সময় কাদা ঘাঁটতে হয় । পায়ে হাজা ধরেছে । বেলাবেলি শুয়ে পড়ে সে । রান্নাঘরের চালের তালপাতা দু-খানা খসে গেছে । চুলোর মুখে বৃষ্টির পানি জমছে । নিজের চোখে দেখেও আজ গাফলতি ধরে তার । আরিফ কাঁথা গায়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । বারগাঙ থেকে নৌকা তুলতে বার-জন দাঁড়িমাঝি অঙ্গুর ছিল ।

দশ ঘন্টা অনবরত আকাশ-প্রপাত খোলা । সোহাগের ভয় লাগে পাছে ছিটে-বেড়া দেওয়াল না ভেঙে পড়ে । ছোট শিশুর বক্ষ-স্পন্দন তার মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হয় । হারেস ঘুমিয়ে পড়েছে । ভয় আরো বাড়ে । বাঁশবনে টপটপ বৃষ্টির নিনাদ থেকে থেকে বাতাসে গোঙানির ভেতর হাত-পা দুমড়ানো কোন আততায়ির শিকারের নিশ্চল চেষ্টার মত শোনায় । এত বৃষ্টি মিকাইল ফেরেশতার অনুচর-দল পৃথিবীর উপর ঢেলে দিল । সোহাগের ঘূম পাতলা । শিশুর গায়ে না ঠাণ্ডা লাগে তাই নিজের আঁচল তার বুকের উপর জড়িয়ে রাখে । পীড়িত-মুষ্টির ভেতর কঢ়ি শিশুর হাত ।

মালেকা ভাবে ফসলের কথা । রসূলের ভবিষ্যৎ আঁকে সে । করুণ করে তোলে বৃষ্টির আওয়াজ মানুষের চিন্তাবিত আবেষ্টনীকে । পূরবীর মৃচ্ছনা বেহালার তার-নির্গত কানুনার

মত লুটিয়ে পড়ছে অন্ধকারের সমভূমির উপর; মানুষেরা চিন্তা যে-অন্ধকারের অবয়ব-হীনতায় মৃত্তি পায়। গায়ের কাপড় আদুল করে ফেলেছে রসূল ঘুমের ঘোরে। যথা-সম্ভূত করে সব মালেকা। দয়কা বাতাস চালের কানাচে মাথা কুটে। হাজার প্রকারের লঘু আওয়াজ মন পীড়িত করে। নিভে গেছে ঘরের কোণে রেড়ির তেলের মৃত প্রদীপ। ইঁদুর খুট-খাট করছে মাচাঙ্গের নিচে ছড়ানো ভাত খুটে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। মুষিকের লোডে সাপ বেরোয় বর্ষার রাত্রে। খোলা জানালা বক্ষ করে দিল মালেকা। আরিফ নাসিকা-ধনিনিরত। পরিশ্রান্ত চেতনা, বাহির জগতের খবর চায় না আর।

সোহাগের ঘূম ভেঙেছিল দুপুর রাত্রে। বৃষ্টি থেমে গেছে। আবার মেঘ-ছেঁড়া চাঁদ লুটোপুটি খায় গ্রামের উপর। তালপাতার চাটি জানালার মুখ থেকে সে সরিয়ে দিল। ভ্যাঙ্গা গরম ঘরের ভেতর।

হঠাতে গোলমাল কানে ভেসে আসে তার। গোলমাল নয় ত, বহু মিলিত কঠ্টের আর্তনাদ। ডাকাত পড়ল কোথাও। এমন ঘন-ঘটা ডাকাতির অনুকূল। ভয় পায় সোহাগ। ধীরে ধীরে সে হারেসের পিঠে ধাক্কা দিয়ে ডাকে; উঠে দেখো, বাইরে গোলমাল। আরো বাড়ছে কোলাহল।

শুধু একা জাগল না। আরিফ, মালেকা দু-জনেই ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। রসূল ঘুমে অচেতন।

বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ-ছেঁড়া ফুটফুটে জোছনা আস্কাশে।

আরো পাড়া-পড়শীরা জেগে উঠল।

দৌড়ে এলো আরিফ দহলিজে। বাইরে মাঠের দিকে সে চেয়ে দেখে। নৌকায় আসার সময় বন্যারোধী বাঁধের দুর্দশা তাস-চোখ এড়িয়ে যায় নি। টুইটুমুর ভাসছে বাঁধ। মুখোমুখি পানি। সেচ বিভাগের কভার বাঁধ তদারকে বেরিয়েছিল। আশঙ্কা জাগে মনে। হারেসকে সে খোলাখুলি বলে, বৈধ হয় বাঁধ ভেঙেছে।

দু-মিনিটের ভেতর হতভম্ব হোয়ে দাঁড়ায় আরিফ। আঙ্গুল বাড়িয়ে একবার বল্ল সে: ওই।

হারেস প্রশ্ন করে : কি।

জলের সরু রেখা দূরে মাঠে। ধীরে ধীরে বাড়ছে তার অবয়ব। পাঁচ মিনিটে বন্যার জল ছুটে আসবে। দৈর্ঘ্য প্রস্ত্রে তার স্রোত-শরীর বাড়ছে, বাড়ছে শুধু। জোছনায় দেখা যায়, হাজার-লক্ষ বুনো ঝাঁড় ছুটে আসছে। প্রতিযোগিতা-রত বলীবর্দ্দ-দল। আগে জায়গা পাওয়ার জন্য গুঁতোগুঁতি করছে, একে অপরের পিঠের উপর দু-পা তুলে হুক্কার রত। ধৰল জীবন্ত সমুদ্র ক্ষেপে উঠেছে। দ্রুত ধাবমান বন্য বলীবর্দ্দ।

হতভম্ব আরিফ।

এমন সময় ফয়েজউদ্দিন ছুটে এলো। হাঁফ ফেলছে সে। তার-ও মুখে কথা বেরোয় না। বুড়ো মানুষ। হঠাতে কানার সুরে সে বলে, আরিফ, আরে দাঁড়িয়ে কি দেখছ। বিশ সালের বানের কথা মনে নেই? চলো। জিনিস পন্তের গুটোবে।

মুখ খুলে আরিফ, হারেস, চলো শিগ্গির। গিয়ে কি বা হবে। চলো চলো।

ফয়েজউদ্দিন ত্রস্ত দোড়াতে পারে না। কাঁপছে তার পা। একবার হেঁচট খেয়ে সে-

ও দৌড়ে চলে ।

নৈশ সুষ্ণু গ্রাম জেগে উঠেছে । মৌজার বাঁধ ভেঙে গেছে । ছুটে আসছে কালমাসা বরুণ দেবতার রাক্ষসেরা । খোয়াজ খেজের রূদ্র-সাজে বেরিয়েছেন নিজে । বসুক্রাণ যেন কত ত্স্ফার্ত, তাই তার এত করুণা । রসবন্ত হোক শুক ধরিত্বা । জল-কল্পোল ধ্বনি আর নৈশ মানব-মানবীর চিঙ্কার আর্তনাদ, অবলা গৃহপালিত জীবদের আতঙ্কিত ডাক— সব মিলে রচনা করছে খোয়াজ খেজেরের বিজয়ায়াত্মার আঞ্জাম । বুম-বুম শব্দ হয় দূরে দূরে । নির্দিত পশ্চার উপর তাতার দস্যুর তেগ বেদেরেণু নির্মাতায় থান-থান হয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে মনুষ্য-দেহের সঙ্গে; গোঙ্গালী উঠেছে আবার পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে, শুধু উত্তপ্ত রক্তের তরঙ্গ ‘স্টেপির’ শ্যাম-তৃণ বর্ণলালিত্যে ভরে রাখে । এখানে রক্তের ফেঁটা নেই— ফিকে হয়ে গেছে তা জলতরসের আবরণে । তাতার-দস্যুর দুরাগত অশ্বকুর-ধ্বনি শোনা যায় । বুম-বুম-স্স-স্স ।

শোকার্ত জননীর মত মালেকা কাঁদে । গৃহস্থালীর মত টুকি-টাকি জিনিস-পত্র । নিরাপদ ভাঁড়ার-ঘর কোথায়? চালের হাঁড়ি, কাপড় ক-খানা একটা বাল্ল উঠানের উপর ফেলল সে । সোহাগ নীরবে কাঁদে । বুকে তার কিবরিয়া ঘুমায় । মালেকাকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই তার । ঘূম-ক্লান্ত চোখে রসূল খালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ।

শাবল আনল আরিফ । হারেসের সহায়তায় সে উঠানের একপাশে চালের পাশাপাশি গর্ত খোঁড়ে । বাঁশ ছিল বেড়ার কাছে । চারটে বাঁশের উপর ধান-ঝাড় টাপ্তি তুলে দিল হারেস । অসুরের মত তার শরীরের বিক্রম আজ্ঞা

তারপরই আরিফ দৌড়ে গেল দহলিজে । একটু দূরে জাম-তলা । বন্যার পানি জামতলার সীমারেখা ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছে । তিন মিনিট লাগবে না তাদের ভিটেয় পৌছুতে । ফিরে এলো সে উঠানে । মেয়েস মই হেলিয়ে দিয়েছে মাচাঙ্গের সঙ্গে । সোহাগ-মালেকা ধীরে ধীরে উঠেছে উপরে ধূম ধূম শব্দ হলো হঠাৎ । আরিফের ফুরসুৎ নেই । দহলিজের উঠানে তখন হাঁটু পানি । দহলিজ ছমড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে । চন্চন পানি বাড়ছে । আর দেরী করা উচিত নয় । গৃহস্থালীর আরো কিছু জিনিস যদি রক্ষা পায় ।

চংচং শব্দ হয় পানির উপর । ফয়েজউদ্দীন আবার ছুটে এলো পানি ভেঙে ।

— একি চাচা, শিগ্গির চলো । বুড়ো মানুষ । এখনি ডুবে যাবে ।

হাউমাউ করে উঠে ফয়েজ । তার বক্ষব্য, ময়েজ মাঠের কুঁড়েয় থাকে, গাইগোরূর ব্যবসা তার । আজ দু-দিন ফেরেনি ।

— সে নিশ্চয় গাঁয়ের অন্যদিকে উঠেছে । তুমি চলো । শিগ্গির ।

পানি হাঁটুর উপর আরিফের ।

নড়তে চায় না ফয়েজউদ্দীন । কল্পনাশক্তি হঠাৎ তীব্রতম হয়ে উঠে তার । বৃন্দের ঝাঙ্গা দৃষ্টির উপর ঝলক খেলে : দূরে পানির রেখা । ধড়মড়িয়ে জেগেছে ময়েজ । কাণ্টে দিয়ে সে কচকচ কাট্ল গরুর গলার দড়ি । উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে অবলা জানোয়ারের দল । পেছনে হাঁপ-এন্ট জয়ীফ কদম ফেলেছে ময়েজউদ্দীন ।...আর মাত্র বিশ গজ দূরে উত্তাল জল-রেখা, ক্রমশঃ উত্তালতর । ছুটেছে ময়েজউদ্দীন...মুখ থুবড়ে পড়ল একবাৰ...আবার ছুটেছে...আবার...পিছনে ধাবমান পানির অট্টৱৰ... আবার ঝলক এলে হাবুড়ুৰু খাচ্ছে

ময়েজ...সামনে একটা গরুও নেই, লেজ ধরে কিশোর বয়সের মত সে সাঁতার কাটবে। গর্জমান জলস্তোত্র পৃথিবীর আলো-বাতাস কেড়ে নিল... কোন মানুষের ছায়া নেই দূরস্ত পানির উপর...একটু দূরে ভেসে ঘোল যেন ময়েজউদ্দনি!...

আরিফ হিচড়ে টানে ফয়েজউদ্দনিকে। দুই জনে বাড়ীর দিকে এগিয়ে এলো। জোঞ্জায় বসুকরা লুটোপুট খায়। তবু অঙ্ককার রাত্রি নয়। বোদার কাছে আরিফ শোকরিয়া জ্বাপন করে। ছেলেপুলে নিয়ে আরো খারাবীর অন্ত থাকতো না।

উঠানে হালের বলদ তিনটে বেঁধে আরিফ বলে, যা ব্যাটারা বাঁচিস ত ভালই। কার সঙ্গে আর ঝগড়া করব তা নিয়ে।

দুই চালের মাঝখানে ছাগল কঢ়া তুলে নিল সে। তৈ তৈ করে পানি।

আধঘন্টার ভেতর প্রলয় চারিদিকে। ছিটে বেড়ার ঘর প্রথম ঝলকেই পড়ে গেল। ভাঙা চালের উপর ছাগল চীৎকার করে। উঠানে বলদেরা কেবল মুখ তুলে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাচাঙ্গের উপরে সোহাগ-মালেকা আর রসুল-কিবরিয়া। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আরিফ ও হারেস।

বাইরে চীৎকার আর কোলাহল। মাঠ দেখা যায় উপর থেকে। আরো কী পানি বাড়বে, আতঙ্কিত হয় হারেস। গরু-বাছুর কিছুই জীবিত থাকবে না। মাঠের বীজাঙ্কুর পচে তিন চারদিন। আরিফ বোবা। কোন কথা নেই মুখে। মৃদু স্বরে কাঁদে মালেকা। রসুলের কৌতুহলের অন্ত নেই। সে এখনও জেগে আছে।

আরিফ হাঁকে, ফয়েজ চাচ।

বৃক্ষ হেঁকে, উন্তর দিল, তারা চালের কোনায় বসে আছে।

এই তুফানে ডাকাতির খুব সুবিধা। কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। জোঞ্জায় কয়েকটা নৌকা দেখা গেল মাঠে ডাকাতেরা সুযোগ পেয়েছে কী?

একটু পরে মাঠের ভেতর আবার হাঁকাহাঁকি শোনা যায়। হারেস-আরিফ চেয়ে দেখে, একটা ভাসমান চালের উপর কয়েকজন লোক বসে আছে। বাবা গো-মা-গো-চীৎকার তাদেরই। গাছপালার আড়াল হোয়ে গেলতারা পলকে। আর্তনাদ বাতাসেও পাখা মেলে। কান্না শুরু করেছে ময়েজ চাচার স্ত্রী।

ভস্মীভূত প্রাসাদের দিকে স্মার্ট চেয়ে আছে। উন্মুক্ত-দৃষ্টি হারেসও চেয়ে আছে। সোহাগ বিশ্রাম-রত। কিবরিয়া হারেসের কোলে।

চালের একটা বাখারী ভেঙে আরিফ মাচাঙ্গের উপর রাখল। — রসুলের মা, এটা তাল করে রাখো। সাপের জুলুম বড় জুলুম। মাঠ থেকে সব ভিটের গাছপালায় চালে উঠবে। ঘুমিয়ো না কেউ। ছেলেরা ঘুমোক।

নৌকা বাওয়ার পারিশুল্ষিণি ঘিরে আসে। আরিফের মাথা ঘোরে। একটু ঘুম-তারও উপায় নেই। মইয়ের উপর জোরে ভর দেওয়া চলে না। বহু দিনের পচা বাঁশ ভাঙতে কতক্ষণ। হারেস মাচাঙ্গের উপর। শিশু-কোলে মইয়ে ভার দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়ানো চলে। পর্দানশীল মেয়েরা অশ্বোয়াস্তি অনুভব করে। পরিবেশের তাগিদে সব সহ্য করতে হয়।

ছাগলগুলো বহুক্ষণ চীৎকারের পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

শেষ রাত্রে বৃষ্টি এলো একবার জোরে। সোহাগ এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল। সেও এবার ভুক্রে কাঁদে, মালেকার কান্নার-শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে। তালপাতার টোকা মাথায় দিতে সে নারাজ। আরিফের ধমকে সকলে ঠাণ্ডা। কিবরিয়া মার বুকে মাংস পিণ্ডের মত জড়িয়ে রয়েছে। মাই খায় সে চুক্তুক্ শব্দে। কয়েক মিনিটে বৃষ্টি ছেড়ে গেল। তবু রক্ষা। শীতে ঠক্ঠক্ত কাপে আরিফ। সব নীরবে সহ্য করে সে। এত জলুম শরীরে কি সইবে? আঘাবিশ্বাসে ঘা লাগে তার।

উঠানের খুঁটির দিকে লক্ষ্য রাখছিল হারেস, বন্যার পানি বাঢ়ছে কি না। তোর রাত্রে ধমকে দাঁড়িয়েছে বন্যা। আরো যদি বাড়ত, হারেসের আতঙ্ক মনে আর কোন নালিশের ছায়া পড়ে না।

ময়েজউদ্দিনের স্তীর কান্না থামে না এখন-ও।

খোয়াজ খেজের, তোমার বন্যা কী পানির চুম্বক, এত চোখের পানি টেনে আনে?

সকালে চড়া রোদ উঠল আকাশ ছিঁড়ে। আরিফ ভিজে কাপড়ে উঠানের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। সাঁতার কেটে সে দেখে আসুক অন্যান্য দিকের দুর্দশা। রান্নাঘরের চাল উপুড় হোমে রয়েছে। পাঞ্চ ভাতের হাঁড়ি ভাসছে। একটা 'মেটা বাঁশে থ' দিয়ে আরিফ দেখে, সামান্য দু-একটা খড়-কুটো পড়েছে মাত্র ভাতের উপর। এত দুঃখেও হাসি আসে।

হাঁড়িটা ভাসিয়ে নিয়ে এলো সে, মইয়ের কাছে।

— হারেস, ভাত ঠিক আছে, সকলটা সকলের চলবে। নেমে এসো।

হারেস মাচাঙ থেকে ধীরে ধীরে সামে। সে বলে, আর পানিতে থেকো না। উঠে এসো। ক'দিন থেকে যা গেলো তোমার উপর দিয়ে।

মইয়ের সিডির উপর দাঁড়িয়ে কাপড় নিঙড়ায় আরিফ। একটা আধ-গুক্না গাম্ভা পরল সে।

সরার উপর ভাত ঢেলে দুইজনে মুখে তোলে। সোহাগ কিছু খায় না। স্যাতসেঁতে কাপড় পরে এই সংকীর্ণ জায়গায় বসে-থাকা তার সহ্যের বাইরে। প্রায় মৃচ্ছা-গ্রস্ত সারা শরীর। মালেকা শীতের রাত্রের কুকুরের মত হাত-পা বুকে চুকিয়ে শুয়ে আছে। সে-ও কিছু মুখে তোলে না।

রসূল অবাক হোয়ে চারদিকে দেখে। তার চাখল্য বাপের ধমকে শান্ত। পানিতে পড়লে আর কি পাওয়া যাবে তাকে। আরিফের কথাগুলো তার কানে ভয়ের দাগ ফেলে।

কিবরিয়া-কে নিয়ে আরো মুশ্কিল। তার দুধের প্রয়োজন। চাল থেকে ছাগলটা নামানো কষ্টকর। তবে বন্যার পানি ক্রমশঃঃ কম্বছে। তিন চার ঘণ্টা পরে উঠান শুকিয়ে যাবে; তখন একটা ব্যবস্থা হবে। আপাততঃ সে মাই-দুধ খেয়ে থাক।

এত বেলা হোলো, ময়েজ উদ্দিনের কোন পাঞ্চ নেই। সমগ্র পরিবার এবার মাত্র শুরু করেছে। মেয়েদের মত উচ্চকষ্টে কাঁদে ফয়েজউদ্দিন।

আরিফ আবার ভিজে কাপড় পরে বলে, আমি ওদের বাড়ি যাই। এই তুফানে কী

আর বেঁচে আছে বুড়ো মানুষ। যাওয়ার দরকার।

এক বুক পানি ভেঙে আরিফ চলে গেলো। ঘন্টা-খানেক পরে সে ফিরে আসে। বেলা
প্রায় দুপুর।

হাঁড়ি থেকে চাল ঢালে সে গামছায়।

হারেস জিজ্ঞাস করে, কী হবে।

— খাবে না, আজ?

— রান্না করবে কোথায়?

হাসে আরিফ, রান্না। রান্না খেতে চাও ওই মুখে।

তারপর সে পানিতে ডুবায় সমস্ত গামছাতরা চাল। মিনিট পনর পরে সে একটা চাল
টিপে দেখল। বেশ নরম হোয়েছে এবার।

— এসো, ওদের দাও। রাত্রেও এই খেতে হবে। পানি ভিটে থেকে নাম্বতে কাল-
সকাল।

এমন সময় সোহাগ মালেকা দুইজনে বিনিয়ে-বিনিয়ে কানূ শুরু করে। ধীর কঠেই
সে বলে, কেন্দে কোন ফল আছে? আপাততঃ দুটো চাল-ভিজে খেয়ে থাকো।

চোখের পানিতেই ঝিপ্পহরে ভোজন আরম্ভ হয়। আরিফ আবার চাল ঢালে গামছায়।
হারেস প্রশ্ন করে, আবার কেন?

— চাচাদের ওখানে যাই। ওদের ত আজ রান্নাকুচাপবে না।

অন্য প্রশ্ন তোলে হারেস : একটা লোক নৌকানিয়ে এলো না এ-দিকে খোঁজ নিতে।

— কে কার খোঁজ করে? সেবারকার মত ইয়ত সরকারের লোক আসবে চাল ডাল
নিয়ে বানের পনর দিন পর। তুমিও চলো ছাঁটু পানি মোটে নিচে। ওরা হাত-মুখ ধো'ক।

দুইজন ফয়েজউদ্দীনের বাড়ির দিকে চলে। ভিটের সংলগ্ন সরু রাস্তা। নিচে উদ্বাস্ত।
হারেস বলে, একটু থামো।

উদ্বাস্তুর উপর একটা অশথ-গাছ জেগে আছে। গোড়ার দিকে পানি মাত্র। হারেস
সাঁতার কেটে গাছে চড়ে।

— কি হলো তোমার। আরিফ হাঁকে।

হারেস ডালপালা ভাঙছে তখন।

— গরুণ্ডলো না খেয়ে মরবে খেয়াল আছে?

আরিফ অনুতঙ্গ। ছুঁড়ে দিতে লাগল ডালপালা হারেস। নেমে এলো সে একটু পরে।
আবার ছোট্ট সাঁতারের প্রয়োজন।

ছাগলের দুটো ডাল ঢালে পৌছে দিল আরিফ। হেলে গরুর সম্মুখে হারেস। নিজের
হাতে ডাল ধরে থাকে সে। ক্ষুধার্ত জীব পরম-নিষিণ্ঠে বান-ভোবা গাছের পাতা চিবোয়।

আরিফ ও হারেস দু-জনের সোয়ান্তি থাকে না। ফয়েজউদ্দীনের দাওয়া উঁচু। অনেক
আগেই পানি সরে গেছে। তার উপর কাদা গায়ে হাউড়ীর মত বসে আছে ফয়েজউদ্দীনের
স্ত্রী। বাড়ির কেউ কিছু স্পর্শ করতে চায় না। দু'জনের পীড়াপীড়িতে শেষে সকলে এক
গাল চাল মুখে তোলে মাত্র।

আরিফ সান্ত্বনার কথা বলে, এখনও পানি সরে নি। কমুক পানি। গায়ে কোথাও না

কোথাও আছে, চাচা।

কিন্তু আরিফ জানে সেও মরীচিকার জাল বুনছে। তার চোখ শুষ্ক থাকে না।

যেন বিশ্রাম তাদের জন্য হারাম আজ। রসুলের কঢ়ি গলার হাঁক আবার শোনা গেল।
আশঙ্কিত দুই জনে বিধবার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে।

প্রায় অবেলা। আরিফ ভাবে, এই কাল-রাত্রি কী কাটবে, খোদা?

বন্যার পানি সরে গেল কয়েক দিনে। আবার নৃতন করে সাংসারিকতায়, নৃতন নীড়-
রচনায় ব্যস্ত আরিফ ও হারেস। মালেকা এবং সোহাগের গহনা পোদারের দোকানে
মাটির দরে বাঁধা পড়ল। সারা মৌজার অলঙ্কার পিতল-কাঁসার তৈজস বেনের দোকানে
বন্দী। বন্যার পানি ফুরায়, চোখের পানি আর ফুরায় না। আরিফের জয়ীফ হালের গর্ভ
মড়কের ঝড়ে ভাগড়ে পৌছল। ঝঞ্চা-বিচুরি বিচিত্র জগতের সম্মুখে হারেস। সহজে
দম্বার পাত্র সে নয়। এখনও মহানগর আছে, বন্যা যেখানে পৌছুতে পারে না।

আবার কলাবিবির বক্তী।

এখানেও যেন ঝড় বয়ে গেছে কয়েক মাসে। হারেস প্রথমেই আবাক হলো নৃতন বাসায়
উঠে গেছে বাসেদ মিত্রী। হাঁপানী রোগে মেহেরালি ইন্তেকাল করেছেন। নাসিম এক সিদ্ধকাটা
মামলায় ফেরার আসামী। নৃতন ভাড়াটিয়া এসেছে। তানেক্ষেন্দুটো ঘর ছেড়ে দিয়েছে মেহেরালির
স্ত্রী। একই ঘরে থাকে শাস্ত্রী আর পুত্রবধু। দুই জনের মধ্যে সন্ধির অপূর্ব হস্যতা দেখে
হারেস। নাসিমের বৌ ফুঁপিয়ে কাঁদে হারেসের সম্মুখে। মেহেরালির স্ত্রী বড় নরম গলায়
সান্ত্বনা দিতে থাকে। মাথা-গৌজার ঠাঁই আছে, কারো তোয়াক্কা করে না সে। নৃতন বাসার
ঠিকানা দিল মেহেরালির স্ত্রী নিজে। নিষিমত হওয়ারই কথা। নৃতন বাসার ঘর অনেকটা
প্রশস্ত। দক্ষিণদিক খোলা। লোহার গিরাদ রয়েছে জানালায়। অবশ্য পাহা নেই। তজপোষ
ফেলা পাশেই। এখানেই মিত্রী ঘূমোয়। তার পাশে নীচে দরমা বিছিয়ে অন্যান্য মিত্রীরা
দিনরাত শুজরান করে। অনেক টাকা করেছে মিত্রী দস্তৱী খেয়ে। হারেস বোঝে, মিত্রীও
সরে যাচ্ছে। উপরে উঠেছে সে টাকার বেলুনে চেপে। অমোঘের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জেগেছিল
একদিন, আজ হারেসের কোন কিছু মেনে নিতে বাধে না।

বাসার আর একজন গর-হাজির। আলি। মিত্রী নাকি স্বভাব চরিত্রের জন্য একদিন
জুতো-পেটা করেছিলো তা-কে বাসায়। এতদূর গড়িয়ে যেত না ব্যাপারটা। মিত্রীর মুখের
উপর জসনী কামিনের খেঁটা দিয়েছিল আলি। তারপর হাতাহাতি। সেই রাত্রেই আলি
বাসা ছেড়ে চলে যায়। মিত্রীর দশটা টাকা, এক সেট যন্ত্রপাতি সব তার সঙ্গে উধাও।
মুষড়ে যায় হারেস। এই সংবাদে। মায়া হয় আলির জন্য। মনের কথা বোঝে এমন
ক'জন পাওয়া যায় শহরে? নতুন মুখ বাসায়। কারো সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হয়নি পর্যন্ত।
তার চেয়ে আরো চ্যাংড়া ছোকরার দল। উত্তর দিকে কোন জানালা নেই। এক কোণে
ইটের চুলো। কাঠের আগুন গন্ধন জুলছে।

মিত্রী তজপোষে বসে ব্যবরের কাগজ পড়ে, হঁকা টানে। তজপোষের এক কোণে
শ্রিয়মান একটা লোক বসেছিল। মাথা নেড়া, গায়ে মোটা চাদর লেপটানো। একটু পরে

চেনে হারেস। শুকুর ঘরামি। এমন বদ্ধাল। বাসায় থাকে সে? বাসায় নতুন অধিবাসীরা চুপিচাপি বলে, ভিক্ষে করতে এসেছে মিস্ত্রীর কাছে। এই শরীরে কি কাজ করবে, জওয়াব দিয়েছে মিস্ত্রী। মাঝে মাঝে দু-চার পয়সা ভিক্ষে নিতে আসে। অথৈ-পানিতে হারেস। মিস্ত্রীর সর্দারীতে পনর বিশ জন খাটে, একজন অকর্মণ্য লোককে তার সামিলে চালিয়ে নিতে পারে না মিস্ত্রী? বহুৎ দস্তুরী মেরেছে ওর উপর দিয়ে। কোন বাক্যালাপের আগেই শুকুর অঙ্ককারে মিশে গেছে। মিস্ত্রী হেঁট হয়ে কাগজে তন্মায়। ভালমন্দ জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেল না, তার জন্য অস্বোয়াস্তি লাগে হারেসের। মেহেরালিও নেই। হাঁফ-ফেলার সংকীর্ণ জগতটুকু রঞ্জ হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

নৈশ-ঘুমের পর অবসাদ কেটে যায় হারেসের। দুমড়ানো পেশী ধমনীর ভেতর নতুন সূ�্যের উত্তাপ জাগে। ঠোঙার কাগজের জন্য খুব সকালেই সে বিক্রীওয়ালার বাড়ি গিয়েছিল। অবসর রোজগারে ফলবন্ধ করবে সে। দায়িত্ব সহিষ্ণুতার ভেতর প্রায় প্রাচুর্যের আবাদ ঢালে।

কয়েকদিন পরে বাসেদ মিস্ত্রী কাছে আলির খৌজে এলো তার বাবা কাসেম। পাশাপাশি গায়ের লোক। পান তামাকে অতিথি-সংকার করে মিস্ত্রী। আজ কত মাস আলি লাপাতা। ঘরে একটা পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। বৃন্দ আলির কামাই চায় না, শারীরিক কুশলটুকু শুধু কাম্য তার। মিস্ত্রীর মুখে কিছুই আটক থাকে না। বৃন্দ হেঁট মাথায় শোনে। তবু আশ্বাস দিল মিস্ত্রী, দু-একদিন থাকো এখানে খৌজ করে দেখাস্কাক। হারেস জানে, মিথ্যা আশ্বাস।

সেদিন সন্ধ্যায় ঠোঙাকাটা বন্ধ রেখে সে নিজেই অঙ্ককারে অলিগলি পার হয়। বছদিন আগে আলির সংগে এই জাহানামের পথে স্টেপা বাড়িয়েছিল। বৃন্দের করুণ অবয়বের তাগিদ হারেসের ব্যগ্রতার পেছনে কাজ করে।

তেমনি অঙ্ককার গলি। গ্যাসের মিফকে আলো সভয়ে দূরে পিছলে পড়ে। খোলার চালের ছায়ায় এক-প্রহরের সাকীরা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তাদের পান-পাত্র নেই শুধু। বিড়ির বিরল আগুন মাঝে মাঝে ধিমিয়ে উঠে।

পথ ভুল হয়নি হারেসের। দুই চালের ছাঁচের মীচে আঁধাগলি, তারপর ছোট কলতলার প্রাঙ্গণে। কোণে আলির আস্তানা।

অপ্রত্যাশিত আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘরের এক কোণে প্রদীপ জুলছিল। মান-আভায় চারপাশ স্পষ্ট নয়।

— তুমি। বিশ্বিত-চোখে আলির সমোধন।

— বেশ। বাসা ছাড়লে আর দেখা করলে না।

— তোমার দেশের গেরো এর্তদিনে কেটেছে বুঝি। চপল কষ্ট আলির।

— এই আস্তানা এখনও ছাড়োনি?

— এখানেই তা থাকি আজকাল। নির্লজ্জের মত আলি বলে।

সম্মতির প্রতীক্ষা না করেই ভাঙা তক্ষণের উপর বসল হারেস।

— এখানে থাক, ক্ষতি নেই। দেশে মা-বাপ আছে একটু খবর দিতে পারো। তোমার বাপ এসেছে।

আলির মুখে যেন কালি লেপে দেয় কেউ।

— আছে কোথায়?

— মিত্রীর বাসায়।

করিমন বাইরে ছিল। সেও এক পাশে এসে দাঢ়ায়। তার পূর্বের চেহারা ক্ষয়ে
গেছে। ফ্যাকাশে রুগ্ন শরীরের দিকে একবার মাত্র সলজ্জ দৃষ্টি ফেলে হারেস।

— আর কোথাও বাসা পাওয়া গেল না? প্রশ্ন করে হারেস।

বাসা পেলেই ত যাওয়া চলে না। এই যে দাঁড়িয়ে আছে হারামজানী মেনী বেড়ালের
মতো। কাঁটা গিলে বসে আছে। এখন ফেলে কোথা যাওয়া যায় বলো না? আর এক
পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই ওর। মরবে কী শেষে? যাক কঠা দিন।

জবাবের তোড়ে একলা ভাসে আলি: ফেলে যাই কোথা। মরবে কী। গায়ে মানুষের
চামড়াটা এখনও আছে, হারেস।

অবনত-দৃষ্টি হারেসের। কোন জবাব নেই তার মুখে। করিমনের দিকে সে তাকাবার
কোন চেষ্টা করে না। স্কীতোদরা এক শীর্ণদেহী নারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাত্র।

— এখন কাজ হচ্ছে কোথায়। হারেস জিজ্ঞেস করে।

দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল আলি; আন্মনা জবাব দিল: চটকলে।

— রোজগার-পাতি কেমন?

— চলে যায় কোন-রকমে।

হাই তোলে আলি।

— তোমার বাপ এসেছে কাল। আসল প্রসঙ্গ উপ্থাপন করে হারেস।

— এসেছে, আমার ঠিকানা বলো না। গোটা তিনেক টাকা দিচ্ছি; দেশে পাঠিয়ে
দিও। আমার নাম করো না, খবরদার।

বাইরে কতগুলি নারী-কর্তৃর ইতর গালি-গালাজ শোনা যায়। একটু পরে একটা
পুরুষের হৃষ্কার শোনা গেল।

— শালার টিক্কতে দেবেনো দেখছি।

উঠে পড়ল আলি। দ্রুত বাইরে এলো সে। কৌতুহল মেটাতে হারেস-ও তার অনুসরণ
করে।

তখনও ইতর ঝাগড়া চল্ছে। করিমনের সামনে দুজন যুবতী যেয়ে। যেয়ে ত নয়,
বাঘিনী। খন্খনে গলায় হাঁকে, মরবি; শোধ-পোত রোগ হোক। আমার মানুষ ভাঙিয়ে
নিলে বাপ-ভাতারী। ফের কথা বল্বি ত পেটে লাখি মারব।

বাঘিনী পা তোলে সহকারে।

— তোর মত ভাইয়ের সামনে—

বাঘিনীদের পচাতে রোগা তালপাতার সিপাইয়ের মনুষ্য-সংকরণ এক ব্যক্তি। তারও
দরাজ গলা। এক পা নেই। কাঠের সাপোর্টার বগলে সে হাঁকছে, জিভ টেনে ছিঁড়ে
ফেল্ব।

আলি মাঝখানে পড়ে চীৎকার করে: এই হারামজানীরা যে-যার ঘরে যা বলছি, না
হোলে খারাবীর শেষ থাকবে না। মুগ্র দিয়ে ধুমসোবো।

বুন্দের মত মিলিয়ে গেল সব। পাশের কুঠরীতে ঢুকে পড়ল যেয়ে দুটি। তালপাতার

সিপাই কঙ্গারুর মত দাওয়ার দিকে লাফিয়ে আড়াল হয়ে গেল।

— এই শরীর নিয়ে হারামজাদীদের সঙ্গে ফের ঝগড়া করতে এসেছিস। যা ঘরে—।

হারেসের উদ্দেশ্যে আলি বলে, থাক কটা দিন। তারপর মরুক আর বাঁচুক। এই কটা দিন হঙ্গামা পোয়াতেই হবে। দেখছ ত কাও-কারখানা।

হারেসের সারা গায়ে যেন কয়েক শ' কেঁচো চরছে, এক মিনিট আর এখানে নয়। আলি তার হাত ধরে টানে: চলো, বাইরে যাই।

পুরাতন পার্কের রং বদলেছে, তবু চেনে হারেস। পুরাতন দিনের সেই পার্ক।

আলি পকেট থেকে তিন্তে টাকা বের করল।

— বাপকে দিও। খবরদার আমার কথা কিছু বলো না।

রহস্যময় আলি। কৌতৃহলের নেশা যোগায় পদে পদে। হারেস জিজ্ঞেস করে, এই ঝগড়া মেটাতেই আছ তুমি?

— কি করি ভাই, এমন পাড়ায় থাকলে এসব গা-সওয়া হয়ে যায়।

— আজ কি নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল?

বড় কৌতৃহলী হারেস।

— সে তোমার শুনে কাজ নেই।

— এই ঝোঁড়া লোকটা কে?

— ঐ শালা ত ঝগড়ার মূল। ঐ দুটো মেয়ের বড় ভাই। আগে কোন কারখানায় কাজ করত। মেসিনে পাটা সাফ হয়ে যায়। কেসানী ক্ষতিপূরণ সামান্য দিয়েছিল। তা উকীল-পেশকার আর মুহূরীতে থেলে। শেষে বেকার। কী আর করে। দেশ থেকে ঐ দুটো বোন নিয়ে এলো। ওদের রোজগারীতেই ত চলে। নিজেও বন্দের ধরে আনে।

— তৌবা। দুই কানে আঙুল দিল হারেস।

— এত লজ্জা কিসের, হারেস। আজকাল ওর ছোট একটা ভাই মাসে-মাসে এসে টাকা নিয়ে যায়। গায়ে তার সংসার চলে।

— তৌবাআস্তাগফের...।

— আর একদিন এসো। হারামজাদীরা ফের ঝগড়া লাগাবে কী, ভাই।

উঠে পড়ল আলি।

— আর একবার এসো হারেস। আমি কী এখানে থাকব নাকি। দিন-মাস হারামজাদীর। এই কটা দিন যাক। তারপর মরুক আর বাঁচুক—।

১৯৩১ সাল। বৃটিশ-বিরোধী আধীনতা আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে সারা দেশে। পঞ্জিকার পাতা উল্টে উল্টে চলে মাস। মাস বৎসরে কৃক্ষিগত। বহমান দিন-স্নোত রিজ স্লেইরে উপল সঞ্চয় করে আনে। নিরাশা আবার উজ্জ্বল দিনের হাতছানি... চাকার মত একই গতি পথে বারবার প্রত্যাগমন। নিষ্ঠুর দৈনন্দিনতার পদক্ষেপ জগদ্দল: কোথাও ক্ষণ-শৈথিল্যে ভবিষ্যতের মরীচিকা রচনা করে।...

ধূমায়িত তন্দুরের চতুরের উপর জীবনের সড়ক মেলা।

হঠাৎ একদিন হারেস অনুভব করে রাজপথে বাতাস ফিরে গেছে। শোভাযাত্রা চলছে,

নর-মিছিল এগিয়ে যায়। রক্তপাগড়ীর মুখোস নরমুণ্ডের উপর ভাসে। পরাধীন দেশের শৃঙ্খল-উন্নোচনের আঞ্চাম চলছে।

পথে পার্কে বক্তৃতা শোনে সে। দেশজাগরণের বাণী। সেই দেশকে সে চেনে না। উন্নাদনায় প্রাণ জেগে ওঠে না, একদিন পুরাতন আশ্রয়-ত্যাগে যেমন উন্নাদনার আহ্বান পেয়েছিল সে। আরিফ তার কাছে উন্নাদ। জমির জন্য তার সংগ্রামের পদ্ধতি সে নিজেই দেখেছে, তার নিজেরও জমি দরকার, তবু নিষ্প্রাণতার ব্যঙ্গ চতুর্দিকে। বিংশ শতাব্দীর এই মহানগর ছেড়ে আরাধ্য আর কোথাও যৌজে কেন মানুষ? হারেসের কাছে মানচিত্রে শুধু দেশ আঁকা থাকে।

শহরে সামগড়ে...সকলে হারেস নয়। তারা কখন দাঁড়ায়, সঙ্গীনের সম্মুখে বুক পাতে। রক্তাক্ত পাঁজর চেপে পতাকা-ধারী বজ্রমুষ্টি খোলে না। গ্রামে প্রান্তরে পিচালা রাজপথে তাদের শৌর্যের কাহিনী মুখে মুখে ছড়ায়, দাবাপ্পির মত কাসেদবাহী জ্বালাময়ী প্রোত আগুন লাগায়— তারতের দহন-উন্মুখ প্রাণেশ্বরের স্তূপে...

বাসেদ মিস্ত্রী খবরের কাগজ পড়ে। কারো কোন কৌতুহল ছিল না এতদিন সংবাদপত্রে। এখন বাসার সকলেই উন্মুখ হয়ে শোনে। অনেকে নিরক্ষরতার জন্য অনুত্তাপ করে আর কান খোলা রাখে।

বোমা বিদারণের ঘটনা, পুলিশ-স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকের সংঘর্ষ... লোমহর্ষণ ঘটনার অন্ত থাকে না। তারি সঙ্গে একদিন ভেসে এলো সমগ্রিড় অন্যান্য মৌজার উপর জুলুমের কাহিনী। বন্য শ্বাপদেরা রক্তের আস্বাদ পেয়েছে যোজায় যোজায়...

সামগড়...

হারেসের মানসিক চাপ্পল্য থামে না। সেদিন বিকালেই সে স্টেশনে পৌছায়। রাত্রি হবে বাড়ি পৌছুতে, তবু পেছ-পা করে না হারেস। সময়-মত স্টেশনে থাম্ব না ট্রেন। তখন সক্ষ্য উৎৰে গেছে।

আর কোন সঙ্গী ছিল না। একা একাই হেঁটে এলো হারেস। সারা-পথ। দু-পাশের গাঁ নির্জন। কচিৎ কোথাও আলো জুলছে। যেউ ঘেউ কুকুর ডাকে নৈশ গ্রামকে আচ্ছন্ন করে। কোন ভিটের দিকে তাকায়নি হারেস। সামগড়ের সীমানায় চুকে তার বুক দুরদূর করে। অজানা আশঙ্কা ছেয়ে আসে। নিয়তির কোন দস্তাদেশের যেন সে প্রতীক্ষা করছে।

দহলিজ অঙ্ককার। এত-রাত্রে আলো জুলার কোন কথা নেই এখানে। ভিটের উপরেই ভয়াবহ নির্জনতা। পিদিমের এতুকু আলো বাইরে সরে না। হাতে পুটলী, হারেস উঠানে দাঁড়াল। কয়েকবার নাম ধরে ডাকল, রসূল-রসূল। কোন সাড়া শব্দ নেই।

পুটলি নামিয়ে সে দেশলাই জুলে। দুই ঘরের টাটি খোলা। বহু তৈজস-পত্র মাটির হাঁড়ি উঠানে চুরমার ছড়ানো। একটাও প্রাণী নেই।

কোথায় গেল তারা? রসূল, আরিফ, সোহাগ। হারেসের মাথা দিয়ে আগুন ছোটে। ধোঁয়ার রাশ চোখের সামনে। তবু ভারসাম্য হারায় না সে সহজে। ফয়েজ চাচাদের বাড়ি হারেস ঘুরে এলো। তেমনি নিঃস্তম্ভ। তেমনি অঙ্ককার।

সম্পদ হারানো আশঙ্কায় কেঁপে-কেঁপে ওঠে হারেসের মন। দাম্পত্য-জীবনের শত খন্ডচিত্র দ্রুতগতি ভিড় জমায় চোখের সম্মুখে। আরিফের উপর বিত্তস্থায় তার মন ভরে

যায়। খাল কেটে কুমীর আনার কী প্রয়োজন? রাজরোষের কাছে তাদের মত সামান্য গেরস্থ চাষীর কতটুকু ক্ষমতা। এই তার প্রায়চিত্ত। ইতঃক্ষিণ তৈজসের দিকে চেয়ে হারেস ঠোঁট দংশন করে শুধু।

কোথায় গেল তারা। ভাঁটির দিকে নদীপথে বারো মাইল আরিফের শৃঙ্গের বাড়ি। বৈমাত্রেয় শালা আছে মাত্র। তার গন্তব্য কি এই ভাঁটির দিকে। পুটলীর ভেতর খাবার ছিল সামান্য ছেলেদের। কারো জন্য আর প্রতীক্ষা করে না হারেস। শুরু-পিপাশা-ক্রান্ত সে, বসে বসে নৈশভোজন সম্পন্ন করে।

ডোবায় এক আঁজলা পানি খেয়ে সদরে বসল খানিকক্ষণ হারেস। না, যত দূরই হোক, আরিফের আস্তীয় বাড়ি খোজ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

হাঁটতে শিখেছে কিব্বিয়া। কচিহাতের স্পর্শ যেন লেগে রয়েছে তার হাতে। হোক অঙ্ককার। এই পথেই সে হাঁটবে। দুঃখের মৌতাতও নেশা বৈকি। নিশ্চিন্ত হারেস দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটে।

ভাঁটিপথে নদীর বাঁক এইখানে কয়েক মাইল চওড়া। কোলে কোলে অসংখ্য শুন্দ্র গ্রাম। সড়কের পথে হারেস আর হাঁটে না। লোকালয়ে প্রবেশের কৌতুহলই বেশি তার। কারো কাছে যদি কোন সঙ্গান পাওয়া যায়। সে-ত একটি পরিবারের খোজ চায় মাত্র।

গ্রামের অভ্যন্তরে হারেস পথিকের দৃষ্টি মেলে। জনশূন্য। কোন লোকের সাক্ষাৎ ঘটে না। কলাবনের ধারে কতগুলো কিষণ-পল্লী। একদল মুগী কোথা থেকে ছুটে এলো। সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা। কোন লোকের তাড়া পায়নি। স্বতঃই ছিটকে পড়ছে ছানাগুলো।

সরু সড়ক ছেড়ে পাড়ার ভেতর সেঁধেয়ে না হারেস। কয়েক কাঠা জমির পর আর একটা পাড়া। ছোট ভদ্রাসন চোখে পড়ে। সান-বাঁধানো জীর্ণ পুকুর সমূখে। এখানে সকালের নাস্তা শেষ করা মন্দ যুক্তিস্বর্য।

হারেস এগিয়ে গেল। সদর-দরজা খোলা। ঘরগুলো পাকা নয়। খড় আর পরিপাটি ছিটে-বেড়ার দৌলতে তৈরি ভিন-গায়ের অন্দর মহলা। গলা-খাঁকারী দিয়ে হারেস ঢুকে পড়ে। না, কোন জন-মানব নেই। পাশাপাশি কতগুলি ঘর। এরা ত দরিদ্র। হয়ত কোনকালে ইট-পোড়ানোর সৌভাগ্য ছিল। তৈজস-পত্র ছড়ানো রয়েছে উঠানে। চালের কোণায় লাঠি-ঠেঙা চালিয়েছে যেন কোন পাওনাদার কাবুলীওয়ালা।

এই ঘরগুলোর বাস্তব লোটানে একটা ছোট-বাগান। সেখানে খড়ো-ঘর দেখা যায়। হারেস-কে নেশা পায়। মানুষ, মানুষের সঙ্গ পাওয়া যাবে না এতটুকু।

উদ্বাঞ্ছুর পথে ফণী-মনসার বেড়া। গা বাঁচিয়ে চলে হারেস।

একটা বড় আটচালার মত খড়োঘর। জন-মানবহীন। হঠাত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হারেসের কানে পড়ে। কিন্তু কোথায় মানুষ। দিনের ছায়া-অঙ্ককারে কী ভূত নেমেছে?

সাহসী হারেস ঘরের চারি পাশ তন্ত্রণ করে দেখে। তৈজসের বালাই নেই। কাঠের সিন্দুক কয়েকটা চোখে পড়ল। বাঁশের মাচাঙে শুধু তুলোট পুঁথির স্তুপ।

দুটো উচু সিন্দুকের মাঝখানে মাদুরের উপর এক বৃক্ষ শায়িত। সিন্দুকের উপরেও পুঁথির স্তুপ। তাই তার নিঃশ্বাস কানে আসে, মানুষটিকে চোখে পড়ে না।

পাশে এসে দাঁড়ায় হারেস। বৃক্ষ চোখ বুঁজে নিঃশ্বাস ফেলছে। অদ্রুত এক রকম

ঘড়ঘড় শব্দ হয় বুকে ।

— আপনি কে? হারেস জোরেই বলে ।

কোন সাড়া নেই । নিঃশ্বাস পতন আর ঘড়-ঘড় ধ্বনি সমতায় চলে ।

অদ্রলোক বৃক্ষ ব্রাক্ষণ । গলার উপবীতে তার পরিচয় । শুভ ছলে শিখা-বাঁধা । হারেস কিংকর্তব্যবিমৃচ্ট । অস্তমিত জীবনের কোন কাজে লাগবে সে । কারো সাহায্যের প্রত্যাশা এখানে বাতুলতা ।

বৃক্ষের দিকে চেয়ে থাকে হারেস, একাগ্র দৃষ্টি । নিঃশ্বাসের বেগ ধীরে ধীরে নিঃস্তেজ হয়ে আসছে । ব্যাদানকৃত মুখ আর ঠোট নড়ে । হারেস বোঝে জাকানদানী শুরু হয়েছে । পানি, পানি দরকার । সে কি করে ব্রাক্ষণের মুখে পানি দেবে? বিচারের কোন সময় নেই । দৌড়ে ভদ্রাসনের দিকে ছুটে এলো হারেস । কলা-পাতায় পানি নিয়ে সে ফিরে এলো । আর নিষ্ঠেজতর নিঃশ্বাস ঘড়ঘড় বৃক্ষের আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে লঘু শব্দে ।

হঠাতে বৃক্ষের পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে হারেসের । নলীভাঙ্গা ক্ষত-দাগে পুঁজ জমে রয়েছে । সেবার সুযোগ আর এক মিনিট পর কিছুই থাকবে না । বিন্দু বিন্দু পানি গড়িয়ে দিল হারেস । এক বার চোখ মেলে চাইল বৃক্ষ ব্রাক্ষণ, তার পর সব থেমে গেল । নিঃশ্বাস আর মুখের আওয়াজ ।

অপরিচিত জায়গা । কর্তব্য শেষ করেছে হারেস । আর এখানে নয় । চেনে না হারেস বৃক্ষ ন্যায়রত্ন শিরোমণি মহাশয়কে । সারা জীবন বৃক্ষের মত আগলে বসেছিলেন এই জ্ঞান-ভাণ্ডার । একদিন স্বাধীনতার আলোয় পঙ্খিতেমনি নতুন করে যাচাই করবে অবহেলিত এই ঐশ্বর্য । তারই প্রতীক্ষায় শিরোমণি মহাশয় কোনদিন গ্রাম ত্যাগ করেননি । যোগ-প্রক্রিয়া সমগ্র দেশের পরাধীনতার শক্তিল চুরমার করে ফেলবেন তিনি । আটচালার পাশে তার ধ্যানাসন আর উপচার পড়ে রয়েছে । দু-দিন আগে পাশের পাড়ায় আগুন লাগিয়েছিল বৃক্ষিশ সরকারের রক্ষাক্ষেত্রী বরকদাজেরা । পূজা-উপচার ফেলেই লাঠি কাঁধে ঘাট বৎসরের বৃক্ষ এগিয়ে গিয়েছিলেন । সারা জীবনের বিশ্বাস কি ধূলিশ্বার হয়েছিল নিমেষে? লাঠি তার হাতে । সরকারের পীড়কের দল বৃক্ষ দেখে বোধ হয় দয়া করেছিল । মাত্র এক ঘা পায়ের নলীর উপর । রক্তাক্ত পদ-যুগল টেনে টেনে বাগানের এই নির্জনতায় হঠাতে নিজেকে আঘাত করেছিলেন ন্যায়রত্ন শিরোমণি মহাশয় ।

পুঁথির কফিনে সমাহিত বৃক্ষের আঘা শুভ নিকলক মহিমায় ঘুমায়...

জন-পদের এলাকা । সরু গলি-পথ বাঁশবন আর ছায়া সুনিবিড় সংকীর্ণ সড়ক । কুমোর পাড়ায় কোন জন চিহ্ন দেখা গেল না । চাকের পাশে অনেক চৰ্চ কাঁচা মাটির ইঁড়ি । হারেস কল্পনায় এই পল্লীর দুর্দশা স্মরণ করে ।

নদীর বাঁকে জেলেপাড়া । কয়েকটা ছোট ছেলে-মেয়ে চোখে পড়ল হারেসের । বাঁশের উপর জাল মেলা । কোন জওয়ান ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না ।

সড়ক ছেড়ে হারেস তাই পাড়ার ভেতর চুকে পড়ল । ছোট ছোট কুটীর । নাতি প্রশংস্ত দাওয়া । কোন ঘরের দাওয়াই নেই মোটে । ছোট ছেলেরা জিজ্ঞাসু-নয়নে শুধু উকি মারে ।

হারেস কয়েক জনকে কাছে ডাকে, কেউ আর সাড়া দেয় না। চুপিচুপি ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে পড়ে। এই নাবালকের দল, এদের জিজ্ঞেস করার বা কী আছে?

একটু এগিয়ে হারেস কান্না শুনতে পায়। মরা-কান্না জুড়েছে যেন কে। কৌতুহল প্রশংসিত হলো এক মিনিট পর। উঠানে দুটো চারা কলাগাছ, তার সোজাসুজি দাওয়ায় বসে একটা বৃক্ষ মেয়ে কাঁদছে। ধীবর-পল্লীর মেয়ে নিসদেহে। সমুখে তার একটা খোলা চাবি-জাল। বাঁশের খোলস্টা একটু দূরে। কাঁদছে এই বৃক্ষ খুব জোরে। হাত-পা মূচ্ছা-গ্রস্ত রোগীর মত থরথর করছে। পরনে তার বানজলে লাল-ময়লা কাপড়, সমগ্র শরীর ভালঝরপে ঢাকা নয়। বৃক্ষার আবরণ পক্ষে হয়ত যথেষ্ট।

হারেসকে দেখে বৃক্ষ কান্নার সুরেই বলে : হ্যাগা বাছা, আমার নবীনকে দেখেছ?

— কে নবীন?

তারপর বৃক্ষ হাউমাউ করে কান্না জোড়ে। তার পুত্র নবীন আজ চার মাস ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এতটুকু খবর পর্যন্ত দেয়নি।

কল্পনার বেগ একটু থাম্বলে হারেস জিজ্ঞেস করে, নবীন কোথা গেছে?

— তা কি আমি জানি। ঐ যে স্বদেশী স্বদেশী পেয়েছে, সেই বিট্কেলেরা আমার ছেলেকে নিয়ে গেল। আমি বুড়ো মানুষ একা।

আবার বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে নবীনের মা।

— নবীন কাঁদিন গেল।

— তিন মাস বাবা। ঐ যে পোড়ার মুখোর কি চেউরী পেয়েছে।

তারপর বৃক্ষ গালাগালি জোড়ে : “ঐ যে পোড়ার-মুখো গাঙ্কী আমার ছেলেটাকে শুন্দি নিয়ে গেল, কি যে হোলো। আরে ব্যাটার্কেকোর দল, গরীবের ওতে কী হবে? এই দ্যাখনা বাবা আমাদের জমিদারবাবুও ত ‘মাত্রম মাত্রম’ (বন্দে মাতরম) করে। গাঙ্কী টুপি মাথায় দেয়। তাদের সঙে গিয়ে আমাদের কি হবে? এই দ্যাখো না বাবা, জমিদারের জনেই ত এই দশা। মাছ ধরবে নদীতে। তারও দাও জলকর। পেটে ভাত আছে দু মুঠো? তুই নবীন, জেলের ছেলে, তোর ওসব সাজে?...হতচাড়া গাঙ্কী দেশটা জুলিয়ে ছাড়লে। ওসব জমিদার বাবুদের সাজে। তাদের ঘরে ভাত আছে। তাদের দলে গেলে গরীবের কী-হবে? জমিদার জলকর ছেড়ে দেবে...খাজনা ছেড়ে দেবে?”

বৃক্ষ অতঃপর তার নবীনের উপর অজস্র অভিশাপ বর্ষণ করে : “বুড়ো মাকে দেখলি নে, তো ভাল হবে না। পোড়ার-মুখ ব্যাটা। তোকে খামখা পেটে ধরেছিলাম। সভা-সমিতি-মিটিং ওসব করবে জমিদার বাবুরা, বাঁদরের মত নাচবে গাঙ্কী-গাঙ্কী করে, তোর কী স্বার্থ আছে তাতে? দ্যাখ, পুলিশ কি করে গেল? হতভাগা পেটে ধরেছিলাম।”

বৃক্ষ একাই যেন সব কথা বলবে, আর কাউকে মুখ খুলতে দেবে না। তার আদিখ্যোত অব্যাহত থাকে : “জমিদার বাবু কতার (কর্তার) পেটে এমন ‘নাথি’ (লাখি) মারলে মরেই গেল দুদিনের জুরে। তারাই ত স্বদেশী হয়েছে গাঙ্কী-গাঙ্কী রবে পাড়া মাথায় করে। বুক্ষুলে নবীন তুই কেন যাবি তাদের পেছনে? গাছে তুলে মই বেড়ে নিলে। তোর মা বোন হেথা পড়ে রইল পুলিশের মার খেতে। জমিদারের গুষ্টি ত শহরে থাকে...।”

অখ্যাত পল্লীর বৃক্ষ।

জগতের কোন খবর রাখে না। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের উপর ভিত্তি করে সে পৃথিবীকে রচনা করে।

হারেস বলে, “মাসী, নিজের ছেলেকে অমন গাল দিছ কেন? গান্ধীর রাজত্ব হলে দেশের সুখ হবে। ইংরেজ চলে যাবে।”

— “মড়ার কথা। সুখ হবে। জমিদার থাকবে ত থাকবে। তারপরে আবার সুখ? অমন সুখের মুখে ঝাঁটা।”

পদাঘাত-লাঞ্ছিত মৃত শ্বামীর শোক উঠলে উঠে যেন আবার বৃদ্ধার। আবার কান্না জুড়ে সে।

হঠাৎ এক সময় থামে এবং বলে, “বাবা, নবীনের সঙ্গে যদি দেখা হয়, বলিস বাবা, তার মা এখনও বেঁচে আছে। কাকপঙ্কীকে জিগাই তার কথা।”

বৃদ্ধ হারেসের দুই হাত ধরে অনুনয় জোড়ে “বাবা, বলিস—বলিস। ভগবান তোদের মংগল করবে।”

— বলব, মাসী।

হারেস বৃদ্ধাকে স্তোক দেয়। জানে বৃথা স্তোক। কারণ, পুলিশের গুলিতে বহু লোক মারা গেছে। সে আর অপেক্ষা করে না।

ধীবর-পল্লীর শেষ প্রান্তেও বৃদ্ধার আহাজারী ভেসে আসে, “নবীন রে নবীন...।”

আরো ক্রোশ দুই দূরে খেয়াঘাট পেরিয়ে হারেসের গন্তব্য।

পল্লীর জনবিরল পথে সে হাঁটে। শব্দ মন খা খা করে। আর এক দিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন সে সলিম মুনশীর বন্দীশালা ছেড়ে পথে নেমেছিল। সেদিন ছিল মুক্তির নিঃশ্বাস বাতাসে। আজ ভারাক্রান্ত আঘিপল্লব পথের রেখা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না।

হারেস জানত, এই সব এলাকায় ঘন বসত। কিন্তু এখন তার চিহ্ন গায়েব। পথিক দু'একজন সামনে পড়ে। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে, দায়সারা জওয়াব মেলে। তখন তার সভার কথা মনে পড়ে। সেখানে বক্তা অগ্নিবর্ষী শব্দে বর্ণনা দিচ্ছিল, বৃটিশের পুলিশ গ্রামে গ্রামে কী রকম জুলুম চালিয়েছে। আতঙ্কে বহু গ্রামের মানুষ দূরে দূরে চলে গেছে যেখানে পুলিশের পথে পৌছানো খুব সহজ নয়। আরিফের কথা বার বার মনে পড়ে হারেসের। সলিম মুনশীর গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েছিল সে ঠিকই। কিন্তু কাছে কয়েকটি টাকা ছাড়া আর ত কিছু ছিল না। সেখানে প্রথম সমস্যা, তার নিকটে কোথাও থাকা মানে বিপদ ডেকে আনা। সলিম মুনশী যেরকম উগ্র মেজাজের মানুষ, তার হাত মুচড়ে ধরেনি সে শুধু, একটা লাখিও মেরেছিল পেছনে। এমন বেইজ্জিতির বদলা সলিম মুনশী কী ভাবে নেবে, তা ভাবতেও শিউরে ওঠে হারেস। তার গায়ের চামড়া অন্ততঃ আন্ত থাকবে না। হারেস তাই এলাকা-ত্যাগের জন্যে হেঁটেছিল। আহারের কথা প্রথম দিন ত মনেই হয়নি। কোন রকমে এক পয়সার মুড়ি আর পানি হলেই চলে গেছে। তৃতীয় দিনে আরিফের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। কথায় কথায় কোন আসল হন্দিস অবশ্যি সে আরিফকে জানায়নি। গায়ের নাম জিজ্ঞেস করলে-অন্য গ্রামের নাম বলে দিয়েছে। কিন্তু আরিফের কাছ থেকেই সে শুনেছিল

যেখানে তাদের কৃষক কমিটির মিটিং হবে সেখানে থেকে তাদের এলাকা বিশ মাইল। তারা ট্রেনে এসেছে। তারপর পায়ে হাঁটা। হারেসও ত এইভাবে মজবুর এলাকায়। সেও বৌকের মাথায় ট্রেনে চড়ে বসেছিল। টিকেট ছিল না এবং টিকেট করতে পয়সা লাগে তা-ও তখন হারেস মনে জায়গা দেয়নি। তার একমাত্র লক্ষ্য তখন দূরে-দূরে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়া যেখানে সলিম মুনশীর নাম গুরু নেই। নেমে ত গিয়েছিল সে এক সময় ট্রেন থেকে। নসীবই বলতে হয়, নচেৎ স্টেশনে তার কাছ থেকে কেউ টিকেট চেয়ে বসল না কেন? এমন কোন দুর্বিপাকের সম্ভূতীন হয়নি কেন সে? তখন রেলওয়ে পুলিশের কাছে কী জবাব দেওয়ার পাকত তার? হয়ত আসল ঠিকানাই বলে বসত সে। তার ফল, আবার সলিম মুনশীর কবলে। হয়ত থানায় ডায়েরী করে রেখেছে মুনশী বাড়ি থেকে গহনাপত্র কি-কি চুরি গেছে।

অতীতের ভাবনা হারেস'কে ধিরে ধরে। নিকটস্থ এলাকা কেন জনবিরল সে ত সভায় প্রনেছিল। আরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ নসীবের ব্যাপার বৈ কি। সে কৃষক সমিতির সদস্য। সমিতির ডাকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আরো কৃষকেরা এখানে জমায়েত হয়। আরিফ ট্রেনে এলেও আবার পথ হেঁটেছিল পাঁচ মাইল। এই হাঁটা-পথে হারেসের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে ছিল আজ হারেস দেখতে পায়। আরিফ তার জীবনের যোড় ফেরার আর এক নিমিত্ত। অবশ্য আর এক মিটিং-এর কথা হারেসের মনে পড়ল। তা হয়েছিল মীরপুর বা মীর গাঁয়ের পাশেই। সেখানে মুনশী তাকে পাঠিয়েছিল এক আস্তাপুরের খৌজ নিতে। সেখানেই হারেস প্রথম প্রনেছিল, মানুষ মানুষের উপর ঝুলুম করে কেন? জীবনে সে প্রথম নাড়া খেয়েছিল। সে ত মনিবের গোলাম। মনিবের খেদমত করাই সওয়াব-পুণ্যের সামিল। সভার বজা এই ফাঁকিবাজির বিশদ বিবরণ দিয়েছিল, কিভাবে আরাম-আয়েশ-লুট্নেওয়ালারা নিজেদের দৈহিক সুখ বজায়ে সমাজের আদব-কায়দা নিয়ম করে। সেই কাহিনী শোনার পর ধোঁয়াতে শুরু করেছিল সে। দাউ দাউ জুলে উঠতে আরো পাঁচ বছর লেগে যায়।

হারেস পথ হাঁটে আর ভাবে। নানা দুষ্পিত্তার উদয় ঘটে। গ্রাম ছেড়ে এত দূর পাড়ি দিতে হয়েছে সকলকে। কেমন আছে তার পা-পা-হাঁটি কিব্রিয়া? কেমন আছে রসূল? আরিফের কী দশা হয়েছে, কে জানে? জমি হয়ত কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম। কিন্তু অন্যান্য জিনিস? ঘরের তৈজসপত্র তেমন কিছু নয়। কিন্তু ছাগল, গরু? গরু গেলে ত চাষবাসের সুযোগ আবার মেলা দায় হবে।

চালু পায়ের সঙ্গে হারেসের মন পাল্লা দিতে থাকে। দূর-অতীতের হানা যেমন তাকে ব্যাকুল করে তোলে তেমনই নিকট-অতীতের ছোবল।

মাঝে মাঝে হাসি পেয়ে যায় হারেসের। নিজের অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে মেলানোর চেষ্টা করে সে। করুণামিত্রিত অবজ্ঞার সাথে সে তার কৈশোর এবং নবোজ্জিন্ম ঘোবনের দিনগুলো যাচাই করে। মানুষ অমন আহাম্বক হয় কী করে? কিন্তু হয়। সে ত সারাজীবন নির্বোধ ভারবাহী পশ্চর মতই থেকে যেতে পারত। আশ্চর্য কিছু নয়। বহু হাবা-গোবা আছে নিক্ষয় পৃথিবীতে। তারা যেমন জন্মায়, তেমনই থেকে যায়। তাদের কোন পরিবর্তন হয় না। সেও ত তেমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারত। আল্লার কাছে শোকর, সে নিজেকে চিনতে শিখেছে। আপন আস্তপরিচয়ে বিমোহিত হয় হারেস।

এক ঘটনায় তার আরো হাসি পেয়ে যায়। এখন অনেক জিনিস সে তলিয়ে দেখতে শিখেছে। ছেলে হোক মেয়ে হোক—প্রত্যেকেই বয়স অনুযায়ী নতুন নতুন চাহিদার সম্মুখীন হতে বাধ্য। সলিম মূনশীর চার মেয়ে। নিজে জোতদার হোলেও বিয়ের ব্যাপারে তার নজর নব্য কেতার অফিসার জামাই। তিনি মেয়ের তেমন ভাল বিয়ে দিয়েছিলেন। বাকী ছিল ছেট মেয়ে কামরুন। যুৎ্মত জামাই পাছিলেন না নিশ্চয় মূনশী। তাই মেয়ের বয়স সোমথ থেকে আরো উর্ধ্বে ধাইছিল। যৌবন-ডগমগ কামরুন একদিন তাকে গোয়াল ঘরের পাশেই নির্জন তালবনের দিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। হাবা নামেই হারেস মূনশী পরিবারে ছেলেবেলা থেকে পরিচিত। কি ফরমাস? কামরুন বলেছিল, তার বুকে ঘামাচি হয়েছে, তা মেরে দিতে। হারেসের সামনে সে তার বুকের কাপড় সরিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কামরুনের বর্তুলাকার সুগঠিত দুই স্তুরের দিকে বেশ নিরীক্ষণের পর হারেস জবাব দিয়েছিল, “না, বুবু, ঘামাচি একটাও নেই”। এক থাপ্পড় কসিয়ে কামরুন সন্তর্পিতে অক্রুহল ত্যাগ করেছিল। হাবা আরো হাবা হয়ে যায়। তার কি অপরাধ— সেদিন হারেস হাদিস করতে পারেনি। আজ তার হাসি পায়। তখন তার বয়স কুড়ি ছাঁইছাঁই। অথচ পরিস্থিতি-বিচার তার সাধ্যে কুলায়নি। সোহাগকে ঘটনাটা বহুবার বলার ইচ্ছা হয়েছে নিজের অতীতের পরিচয় দিতে। কিন্তু সে অত দূরে এগোতে পারেনি। পৌরুষসচেতন হারেস আত্মসংলাপে এমন দিনের কাহিনী শেষ করে।

আজ পথ হাঁটার সময় পুরাতন দৃশ্য বার বার মুঠে এলো। কোথায় আছে কামরুন আর তার জামাই। মেয়ের বিয়ে দিতে সলিম মূনশী দেরী করেনি। অবিশ্য শেষ জামাই আর এক জোতদারের ছেলে এবং কলেজ প্রযোগ পড়া নয়। বহুকাল পরে হারেসের মনে এমন বিশ্লেষনের উদয় ঘটে।

সলিম মূনশীর বাড়ি ছাড়ার পর দুলাড় বেগে হাঁটার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হারেসের। তখন পেছনে ছিল প্রচণ্ড বিপদের আশংকা। আজ তেমন কিছু নেই তবু জোরেই হাঁটে মাঝে মাঝে হারেস। ভবিষ্যতের নানা কল্পিত ছবি তার সামনে ‘খাবি খায়’। কি ঘটেছে, কে জানে? জিনিসপত্র গেছে? যায়-যাক। কিন্তু প্রাণ? বাড়িছাড়া, অনিয়ম আহার কেন-বহু রকমের অনিয়মের শিকার সবাই, গোটা এলাকা। শারীরিক অসুখ-বিসুখ ত খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। চোখের সামনে সকল-কে না দেখলে আর স্বোয়াস্তি নেই। হারেস তাই দ্রুত পদ। আবার হাঁফ ধরে ক্লান্তির চোটে। তখন হারেস নিজেই ঝিমিয়ে যায়। তবে বুক বেশ বাঁধা আছে। কারণ, সদ্য শহর-ফেরত। বেশি নয়, সঞ্চিত কিছু টাকা তার বিরাট ধনি। এখন ওদের সঙ্গে দেখা হলেই একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো সহজ হবে।

খেয়াঘাট তখনও মাইল দুই দূরে। হারেস দেখে বেশ কিছু লোক সেদিক থেকে আসছে। ব্যাবহার সে এগিয়ে যায় খোঁজখবর জানতে। সঠিক খবর ত পথের পথিক দিতে পারে না তাকে। তবে একটা খবরে সে প্রচন্ড স্বোয়াস্তি পায়। খেয়াঘাটের ওপারে বহু লোক জমায়েত হয়েছে নানা দিক থেকে। সকলেই নিজ নিজ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল দুই হঙ্গা। এদিক এখন শান্ত। তাই সকলে আবার নিজ নিজ নীড়-সন্ধানী। হারেস ভাবে, হয়ত আরিফও বাড়ি ফিরছে। কিন্তু তার সঙ্গে কী সকলে আছে? আতংকে দিশেহারা হয়ে যায়। পালানোর সময় সকলে এক সঙ্গে ছিল ত? হারেসের মেহনতে-পেটাই শরীর।

সহজে কাবু হয় না। বড় বড় দু-মনী ধানের বস্তা সে অক্ষেসে সলিম মুনশীর গোলায় তুলত। আজও মেহনত তার ভীতি উৎপাদনে অক্ষম।

কিন্তু দুচিন্তায় সে সহজে কাবু হয়ে যায়। আগত পথিকের মুখে আর এক সংবাদে হারেসের সোয়ান্তি আরো ধসে যায়। খেয়াঘাটে দু'তিন হাজার লোক জমেছে। নদী ছেট। তবু আধুনিক বেশি লেগে যায় খেয়া পারাপারে। নৌকা মাত্র তিন-চারখানা। সেগুলো পনর-বিশজনের বেশি প্যাসেঞ্জার নিতে অক্ষম। জোয়ার আছে। তখন আরো সময় যায়। পূর্বে ত এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়নি। একটা নৌকাই যথেষ্ট ছিল। ঘাটের ইজারাদাব নৌকা বাড়িয়েছে, কিন্তু সামাল দেয়া দায়। খেয়াঘাটে পৌছানোর জন্যে তবু উদয়ীব হারেস। কল্পনার তরী সে ভাসিয়ে দেয় বৈকি। দু'হাজার লোক। ওইখানে যদি তাদের পাওয়া যায়, আর কোন কিছু প্রয়োজন নেই। চার-পাঁচ দিন দেরী হবে বাড়ি ফিরতে। তা হোক, খোলা আকাশের মীচে শোয়া ত তার কাছে নতুন নয়। সলিম মুনশীর ফসল তোলার সময় সে মাঠে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছে। খড়ের বিছানা। খড়ের আঁটি বালিশ। গামছা শুধু খড়ের উপর বিছানো। এখন ত অনেক আরাম সহজে পাওয়া যাবে। প্রিয়জনের সান্নিধ্য বোধ হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে আরামপ্রদ। বাসর-শ্যার চেয়েও লোভনীয়। আকাশের মীচে বাল্লা কষ্টকর নয় তেমন কিছু। গ্রামে বনভোজন করে হারেস দেখেছে। এবার নিজেই বনভোজনের শরীক। আগেও সে এমন অবসরের উৎসবে যোগ দিয়েছে। কিন্তু স্বেফ যোগাড়ের বেশি তার মর্যাদা ভাঙার উপরে ওঠে নি। সে তত্ত্বাবায় সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমান ভাই-ভাই হলেও জোলা-শিরোনামে অবজ্ঞাত। তার সঙ্গে শরীফ মুসলমানেরা এক কাতারে খেতেই বসবে না। আজ কার তোয়াক্কা? শহরে গিয়ে তার কতটুকু প্রত্যয় বেড়েছে, নিজেকে রঞ্জি নিজে উপভোগ করো। কারো ঝুঁকুঠির জায়গা সেখানে নেই। গাঁয়ে এমন হাত্কারীতা অসম্ভব। হারেস তার হিসিস করতে চায়। কিন্তু বুদ্ধিতে কুলায় না। পৃথিবীর বুকে যেমন নানা সম্পদ লুকিয়ে আছে, তেমনই সমাজের বুকে। খুঁড়ে বের করতে না জানলে মাথা-ঠোকাই সার। নানা দুর্ভোগ তখন জমে থাকে মানুষের জন্যে। অবশ্যি সব মানুষের জন্যে নয়। এক দলের যথন পৌষ মাষ এবং তারা ছেট দল-তখন বহু মানুষের সর্বনাশ পোয়াতে হয়। খেয়াঘাট আর কত দূরে? দ্রুত পা চালায় হারেস।

সূর্য তখন পাটে নামছে।

খেয়াঘাটের এক মাইল দূর থেকে কোলাহল শোনা যায়। অনেক মানুষের জমাট হাঁকড়াক। আবছা হয়ে আসছে পৃথিবী। সম্মুখে রাত্রি। কিন্তু শুক্রপক্ষ। হারেস কালই তার হিসেব জেনেছিল। আবছা আলোয় কী এত মানুষের ভিড়ে তাদের খুঁজে বের করা যাবে? কেউ যদি শুধু তাদের সামান্য হিসিস দিত সে এমন ব্যাকুল হতো না। আল্পার কাছে শোকর, আকাশ বেশ পরিষ্কার। উন্মুক্ত আকাশের তলায় রাত-গুজরান তেমন কষ্টকর হবে না।

খেয়াঘাট পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা নেমে গেল। হারেস তাই সামান্য নিশ্চিত। কিন্তু এখানেও সমস্যা কম নয়। ওপারে যাওয়ার পারাপারী সংখ্যায় খুব কম নয়। জনা পঞ্চাশ তখন ও বাকী। সকলের উদ্দেশ্য একই। খৌজে বেরিয়েছে আপনজনের। হারেসের তর সয় না। কিন্তু আবছা অঙ্ককারে নদী পার হওয়া খুব নিরাপদ নয়। মাঝি বোঝাই নৌকা

নিয়ে নোঙ্গর খুলতে রাজী না সহজে। সকলের তাড়া। সকলেই অগ্রাধিকার চায়। ফলে বচসা এবং দেরী হয়।

হারেসের ক্ষেপ আরো এক নৌকা পর। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওপারের দিকে। কয়েক শ' বিঘা জুড়ে আস্তানা পড়েছে। প্রদীপ নেই। তার জায়গা নিয়েছে ইটের উপর তৈরি অস্থায়ী চুলো। তার আলোয় ওপারের কোন কোন জায়গা বেশ দেখা যায়। আসলে এলাকাটি বন্যারোধী বাঁধ। গাছপালা আছে মাঝে মাঝে। এইসব জায়গায় আশ্রয় পেতে বসে আছে গৃহভিত্তু নিকটস্থ এবং দূর-দূরান্ত এলাকার লোক।

পার হওয়ার সময় হারেস হাতের পুঁটলি বেশ বাগিয়ে রাখে। দৃতিনখানা কাপড় আছে। যদিও শীতের মৌসুম নয়, ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা সিরসির করতে পারে। তাছাড়াও আরিফ এবং আর সকলের সম্বল এখন কি কারো জানার কথা নয়।

ঘাটমুরির পয়সা দিয়ে জমিনে পা রাখতেই হারেসের বুক টিপটিপ করে। কী আছে তার নসীবে কে বলবে? অঙ্ককার হলেও সে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হেঁকে যাবে—“এখানে সামগড়ের কেউ আছে নাকি, ভাই?” কিন্তু অত সহজে সে জমিনে দাঁড়াতে পারে না। ক্লান্তির চোট দু'দিন থেকে তার উপর রগড়ানি চলেছে সারা শরীরে। তাই হারেস বাঁধে উঠে এক জায়গায় দুর্বাসারের উপর বসে পড়ল। নদী বাঁধের কোলে। তবে সমতল জায়গা আছে। সেখানে অনেকেই বসে আছে যার যা আছে তাই নিয়ে আশ্রয় পেতে। হারেসের চোখে পড়ল এক বুড়ো লোক বেশ স্ট্যান লম্বা শুয়ে আছে গাঁঠীর উপর মাথা দিয়ে। দিব্য ঘুমোছে ভদ্রলোক। এই বয়সে তার পক্ষে বাইরের জগৎ মিথ্যে হয়ে যায়, যদি শারীরিক বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন থাকে। হারেস ভাবলে, বয়স তাকে রেহাই দিয়েছে। এক আধ-বয়সী মহিলার চারপাশে তিন চারটি কুঁচো ছেলে রীতিমত খেলায় মন্ত। ওদের বয়স পাঁচ থেকে দশের ভিত্তির। মেয়েটি নির্বিকার। কে জানে, নিজের কোন চিন্তা তার পরিবেশ সচেতনতা কেড়ে নিয়েছে। বসে-বসে চোখ যদুর যায়, সে দেখে। কিন্তু এই ভাবে তার চলবে না। সে ত বৃন্দ নয় অথবা রমণী নয়। তার কর্তব্য আছে এবং এই কর্তব্য কারো চাপানো কর্তব্য নয়, বরং নিজের গরজের তাগিদ।

আশ্রয়ের এলাকা মাইলখানেক জুড়ে। বাঁধের উপর গাছ। এই গাছতলা অনেকে অধিকার করেছে। দিনের বেলা রোদুর থেকে ত বাঁচা যাবে। যারা তেমন জায়গা পায়নি, তারা নদীর কিনারার কাছে গেছে। পানিও ত সমস্যা। জলদি জলের অভাব মিটলে অবস্থান অনেকখানি আরামপ্রদ হয়। হারেস এসব ভাবছিল বৈকি। কিন্তু এই আবছা শুক্রপক্ষের রাত্রে কোন স্পষ্ট মুখ দেখতে পাওয়া ত দায়। দিনের বেলা হলে অনেক মেহনতে বেঁচে যেত। নদীর জল মিষ্টি। নামার আগে সে বেশ পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছিল। গলার জোর অন্ততঃ সহজে মিহিয়ে যাবে না। বিশেষতঃ তার মত গাঁট্টাগোট্টা জওয়ানের। কিন্তু বাঁধ, লোকে কী ভাববে? হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার দিয়ে এগোনোর চেয়ে লোককে জিজ্ঞেস করে-করে এগোলেও ত বাঞ্ছা প্রৱণ সন্তুর। এখানে পাশাপাশি বসে অনেকে গল্প করছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা পড়লে ওদের তালভঙ্গ হবে। তখন কে কী বলে বসে কে জানে। তবে হারেসের মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা কথা জিজ্ঞেস করা খুব অশোভন নয়। সবাই ত আত্মীয়-স্বজনের খৌজে এখানে জড়ে হয়েছে।

শেষে হারেস গ্রাম্য কায়দাই শুরু করল বাঁধের এক প্রান্ত থেকে। সে বেশ জোর-জোর হাঁক মারে, “সামগড়ের কেউ আছেন নাকি, ভাই?”

কয়েকবার হাঁক দিল হারেস। রাত্রির বিশ্রাম অনেককে নীরব করে দিয়েছে। অবিশ্য রাত্রি বেশী হয় নি। হারেস ভাবে, তার গলার জোর কত দূর আর পৌছাবে? জায়গাটা ত কম নয়। আধক্রোশ ত হবে। নিজের মনেই উচ্চারণ করে হারেস।

প্রথমে কোন দিকে আর সাড়া না পেয়ে বড় নিষ্ঠেজ হয়ে যায় হারেস। আরিফের আঙীয়ার আছে এই এলাকায়। কিন্তু সে ত বৈমাত্রেয় ভাই মালেকার। তার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ ছিল না। বিপদে পড়ে আরিফ যদি পুরাতন আঙীয়াত আবার ঝালাই করতে আসে, সে কথা আলাদা। আর এখানে তারা এসেছে বাড়ির উদ্দেশে, তার ত কোন নিশ্চয়তা নেই। এইসব ভাবনা-চিন্তায় হারেস খুব কাবু। এক সময় সে একটু ফাঁকা জায়গা বসে পড়ে। বেশির ভাগ লোক ক্রমশঃ শুয়ে পড়েছে যে-যার জায়গায়। পথিক ক্রমশঃ করে আসে। নীরবতার মাত্রা বাড়ে। হারেস তাই বসে সোয়াস্তি পায় না। তারও ঘূর্ণ পায়। কিন্তু এই আঙ্কারা সে মনের জোরেই খেড়ে ফেলে দিলে, বরং নিজের অজানিতে হেঁকে উঠল, ‘সামগড়ের কেউ আছেন নাকি, ভাই?’

প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ হেন ভেসে যায়। হারেস মুষড়ে পড়ে। তার ছিন্নমূল জীবনে শিকড় গজিয়েছিল, সব বোধ হয় আবার উৎপাটিত না হয়ে যায়। এমনই আশংকায় আন্দোলিত হারেস। ছেলেবেলার দারুণ কৃত্ত্বাতর দিনগুলো অক্রম্য হানা দিয়ে যায়। সলিম মুনশীর বাড়ির কাজকর্ম ত কখনও কম থাকত না। ভোরবেলা উঠে গুরু-ছাগলের খবরদারী করতে শিখেছিল সে সেই আট বছর বয়স থেকে। সকাল হলেই মুনশীর ফরমাস, বিবিদের ফরমাস তাদের ছেলেমেয়েদের ফরমাস থাই ধাই শুরু হতো। ওই বয়সেই সে কিন্তু সামাল দিতে পারত। অনেক সময় ঘুমন হতো যে প্রায় দুপুর কাছাকাছি এলেও কেউ জিজেস করত না, তার নাস্তা হয়েছে কি না। নাস্তা মানে একটা ছোট বাটির এক বাটি মৃড়ি, সেই পাত্তা ভাত। কালেভদ্রে সলিম মুনশী সাহেব বা বিবি সাহেবদের ঝুটো কোন কিছু-সামান্য পিঠা বা ওই জাতীয় কিছু।

হারেস কয়েকবার হাঁক দিয়ে ক্লান্ত হলেও সে পায়ের কায়াই দেয়নি। হেঁটেই চলেছে সে। খেয়াঘাটের আশপাশ ত সে আগে দেখেছে এবং জরীপে কোন কসুর করেনি। কাফেলার শেষ প্রান্তে এসে পড়ল হারেস। তখনই তার চোখে পড়ল জনাকয়েকের এক জটলা।

সবাই কিন্তু ঘুমোচ্ছে অঘোর। বছর তিনেকের শিশুও আছে ওই দলে। ওরা গুনে দেখল হারেস, মোট পাঁচজন। শিশুর অস্তিত্ব তার কাছে বিরাট আকর্ষণ। হারেস আরো দেখল, দলে দুইজন মেয়ে। একটি মেয়ে তার শিশু নিয়ে একদিকে কাঁৎ হয়ে শুয়ে আছে। সামান্য ফাঁকে আর একটি মেয়ে, তার আট-ন’ বছরের সন্তান এবং একজন পুরুষ সন্তানের পাশে। চাঁদের আলো আছে ঠিকই। কিন্তু স্পষ্ট ত কিছু দেখা যায় না। আবরুর ব্যাপার আছে ঠিকই। খুব নিকটে যাওয়াও নিরাপদ নয়। তার মতলব সৎ এমন হয়ত অনেকেও নাও ধরতে পারে। তখন ত ফ্যাসাদ বেধে যেতে পারে। মেয়েছেলেদের ঝামেলা না থাকলে হারেস কাছে গিয়ে তদন্ত করে দেখত।

সাত-পাঁচ ভাবনার মধ্যে হারেসের মনে ফন্দী খেলে যায়। তার হাঁক ত দোষের কিছু

নয়। সকলেই হারানো আঙ্গীয়জনের খৌজে এখানে জড়ো হয়েছে অথবা বাড়ির উদ্দেশ্যে
রওয়ানা দিয়েছে। সেখানে একটা হাঁক কি খুব অশোভন? অবিশ্য অনেকের ঘুমের ব্যাঘাত
ঘটবে। তা ঘটুক। সামাল দেওয়া সেখানে কঠিন হবে না।

তবু হারেস সামান্য তফাতে গেল এবং জোরে হাঁক দিয়ে উঠল, ‘সামগড়ের কেউ
আছেন নাকি, ভাই’। একবার নয়। উপরপরি তিন-তিনবার। কষ্ট নয় শুধু, হারেসের
চোখ বিশেষ সক্রিয়। চোখ তেড়েতেড়ে দেখা যা-কে বলে, সে তা-ই করছিল।

ফল ফলতে দেরী হয়নি। দংগলের পাঁচজনের মধ্যে যে-মেয়েটি তার ছোট সন্তান
নিয়ে ঘুমোছিল সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। হারেস লক্ষ্য করে, ঘুম ভেঙ্গে শুধু বসা নয়,
সে চংমং ইতিউতি তাকায়। হারেস তখন আবার হাঁক মারে। এবার তার দিশাহারা হবার
দশা। সদ্য শুভাংগা মেয়েটি লক্ষ্য করেই দৌড়ে এলো, পেছনে তিনি বছরের শিশুটি
তখন কান্না ঝুঁড়ে দিয়েছে, “মা-মা” রবে।

সবই দ্রুত ঘটে যায়। সোহাগ খাতুন কখন হারেসের বুকে বাঁপিয়ে পড়ে ফোপাতে
শুরু করেছে সে বুবতেও পারেনি। জাগস্ত অবস্থায় স্বপ্নের মত দ্রুত ঘটনা একটার পর
একটা ছায়া ফেলে যায়। অকৃত্তলে কখন তারা ছ'জন একে অপরের সান্নিধ্যে বিছেদের
ব্যবধান মুছে ফেলতে তৎপর-এসবই যেন নিমিষের খেলা। কিবরিয়া কাঁদছিল বাপের
আলিঙ্গনের ভেতর-এক হাতের আলিঙ্গন। অন্য হাতে ত আরিফ বাঁধা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে
রসূল ফোপাতে শুরু করেছে।

নাটকীয় পর্ব সহজে কাটে না। আশপাশের ঘুমকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু কেউ
বিরক্তি প্রকাশ করে না। পরিস্থিতি এক ধরনেন্তর বীতাস। তার স্পর্শ সকল গায়েই লাগে।

অকৃত্তল ছেড়ে তারা একটু ফাঁকে গিয়ে আস্তানা পাতল যেন অপর কারো ঘুম বা অন্য
কিছুর বিষ্ণু না ঘটে। কারণ, তাদের কুকুত এই মাত্র শুরু হয়েছে। এখনও চার পাঁচ ঘণ্টা
রাত্রি আছে। এই সময়-সীমা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। বিছেদ সব সময় চিন্তাভাবনার
ভাঁড়ার ঘরে পরিণত হয়। তার ফটক-উন্মোচনের শুধু একটা সূত্র দরকার। তার মিছিল
আরম্ভ কথার। চিন্তা ভাবনা প্রকাশের এই আদিম উপায় এমন ক্ষেত্রে আর বিরতি জানে না।

তবু এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুখনিদা সংখ্যায় হয়ত খুব বেশি হয় না
মানুষের জীবনে। কিন্তু তার আচ্ছন্নতা কে না চায়?

আকাশ ফর্সা হওয়ার পূর্বেই বয়োজ্যেষ্ঠরা উঠে পড়েছিল বৈকি। বালক দুজনের ঘুম
ভাঙ্গতে হলো। কারণ, সকাল-সকাল নদী পার হয়ে গেলো সূর্যের খরা থেকে অনেকখানি
রেহাই পাওয়া যাবে। ভাড়া বেড়ে গেছে। লোতে অন্যান্য এলাকার নৌকাও এসে জুটেছে।
ঘাটে নেমে হারেস কাল শুনেছিল। তারপর হাঁটা পাঁচ ক্রোশ বাচাদের নিয়ে। তার জন্যে
আজ কেউ পিছপা নয়। এমন কী দুই রমণী পর্যন্ত।

নাস্তার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মুড়ি কলার ব্যবসা চাহিদার ডাকে ত তিনি চার দিন
আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় আরিফ এক প্রস্তাৱ দিল। তা শুনে হারেস খ’। কারণ, বন্ধুর মুখে এমন
কথা শুনতে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

আরিফ বললে, “ঘর-দোর সব ত গেছে। আবার নতুন পত্তন। হারেস, চলো না

শহরে যাই। সেখানেই নসীবের লড়াই শুরু করা যাক।”

“শহরে? বিস্মিত হারেস একটু থেমে যোগ করেছিল, “আরিফ-ভাই, শহর সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। তাই এমন কথা বলছ।”

আরিফ জবাব দেয়, “এটা ঠিক আমি শহরে যাইনি। কিন্তু এটা বুঝি শহরে রোজগারের নানা ধান্দা করা যায়, গায়ে তা সম্ভব নয়।”

হারেস হার-মানা সুরেই বলে, “তা ঠিক। কিন্তু হঙ্গামা অনেক ভাই।”

“জীবনই ত হঙ্গামা।” দার্শনিক-সুলভ জবাব আরিফের। পরে সে আরো বলে, “আমার মতে, নতুন যখন আবার ঘর-বাঁধা। শহরে চলে যাই না কেন?”

“অনেক হঙ্গামা। আমরা ছ’জন তাদের থাকার জায়গা কোথা পাচ্ছ?”

“ঘর-ভাড়া নেব।”

“গায়ে আলো-বাতাস পাও। সেখানে তাও কিনতে হয়। বেশি আলো-বাতাস চাইলে বেশি টাকা। নচেৎ কড়ায় আলু সেদ্ধ।”

এই ধারায় কথা কাটাকাটি চলে মুড়ি থেতে-থেতে। মেয়েরা শোনে। ছেলে দু’জন শোনে না। শেষে হারেস বলে, “ভাই আপাতত সামগড়ে ফিরে যাই। তারপর আমি শহরে গিয়ে চেষ্টা করব, কী করা সম্ভব। আমি ত গায়ে থাকতে চাই।”

“তবে শহরে গেলে কেন?” আরিফের প্রশ্ন।

হারেস চট করে জবাব দিতে পারে না। শেষে বলে, “নসীব আমাকে নিয়ে গেছে।”

“আমার নসীবকেও তা-ই তুমি বলে দাও।” এইটুকু উচ্চারণের পর আরিফ হাসতে থাকে।

“সে ব্যবস্থা পরে হবে।”

“শহরে রোজগারের ধান্দা অনেক। নসীব খোলার পথও অনেক। আমি তা-ই মনে করি। তোমাকে দেখে আমার সেক্ষেত্রে বার বার মনে হয়।”

“সে-দেখা যাবে। আপাততঃ নিজেদের ভিটায় ফিরে যাই চলো।”

হারেস জবাব দিয়ে উঠে পড়ল। আরিফও ওঠে এবং বলে, “শেষে আমাদের সবাইকে শহরেই যেতে হবে রোজগারের তালাসে। দেখো-আমার কথা ফলে কিনা।”

সামনে ক্রোশ ক্রোশ পথ।

খেয়াঘাট পার হয়ে তারা তৈরি হয়। শুধু তারা নয় আরো শত শত জন। দীর্ঘ কাফেলা। সকলের কিছু না কিছু বহনযোগ্য গাঁঠরী আছে। রসূলও ব্যতিক্রম নয়।

সূর্য তখনও আকাশে স্বর্ণ-থালি।

সকলে এগোয়।

কিবরিয়া বায়না ধরেছিল, সেও হাঁটবে। তার কথার অমান্য সম্ভব হয়নি কয়েক মিনিট। তারপর হারেস তাকে কাঁধে তুলে নিল।

জননী



আলী আজহার থা মহেশডাঙ্গার মামুলী চাষী।

গ্রান্ট ট্রাক্স রোড এখানেই সরলরেখায় গ্রাম-গ্রামান্তরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ট্রাক্স রোডের পাশেই সরু গ্রামের পথ। কয়েক মিনিট ইঁটিলেই প্রথমে পড়ে আলী আজহার থার বস্তি। সম্মুখে একটি বড় দহলিজ। বাম পাশে ছোট ডোবা। পূর্বধারে প্রতিবেশীদের খড়োঘর। কয়েকখানা কলাগাছের সবুজাভ পাতা চালের ভিতর উঁকি মারিতেছে। উঠানে কেহ বোধহয় কলাগাছ রোপণ করিয়াছিল। আসন্ন বৈকালে এই অঞ্চল ভয়াবহ ঠেকে। জনবিরল গ্রাম। অরণ্যনীর ছায়াভাস আগাছার জঙ্গলে সর্বক্ষণ কালো দাগ আঁকিয়া রাখে। বর্ষাকালে পথঘাট দুর্গম। বাড়ে পাতাপুতি, হেলানো বাঁশবনের কঢ়িও আর কাদায় রাস্তা চলা বিপজ্জনক। বেতবনের ঝোপ-নিঞ্চল বিষাক্ত সাপ দিনেও আশেপাশে বিচরণ করে।

আলী আজহার থাকেও এই পথে হাঁটিতে হয়। লাঞ্চ কাঁধে হালের বলদ দু'টিকে ভর্তসনার আহ্বান দিতে দিতে বহুদিন দেখা গিয়াছে সে আনন্দে পথ হাঁটিতেছে।

আজ এই থা-পরিবারের কোন ছেলেকে দেখিয়া বুঝা মুশ্কিল, একশ' বছর আগে তাহাদের পূর্বপুরুষেরা বাঙালি ছিলেন না। আলী আজহার থার চেহারা পাট্টা জোয়ানের। বেঁক ফর্সা। শুধু এই অবয়বে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে সে বৈশিষ্ট্য-পৃথক। নচেৎ কিষাণ-পল্লীর ভিতর তার অন্য কোন মাহাত্ম্য-গুণ নাই, যের জন্য শতজনের মধ্যে সে প্রথমে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

আলী আজহার থা জানে, তার পূর্বপুরুষেরা এই গাঁয়ের বাসিন্দা ছিলেন না।

দহলিজের ডোবার পাশ দিয়ে আর একটা সরু সড়ক কিছুদূর সোজাসুজি পচিমে জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার মধ্যে আবিলোপ্ত সাধন করিয়াছে। ভিটার তিনিদিকে ঘন ফীলমনসার কাঁটার ঝোপ। আর একপাশে বেউড় বাঁশ আর বেত এবং অন্যান্য আগাছার রাজত্ব। ভিটার আশেপাশেও বহু খণ্ড আর চূর্ণ ইট পড়িয়া রহিয়াছে। অতীতে এখানে ইমারত ছিল তার প্রমাণ ইট ছাড়া আরো বহু উপাদান আছে, গ্রামের জনপ্রবাদ-ইতিহাসকে নানা রঙে যা সংজীবিত রাখে। দুপুরে সাপের ভয়ে এইদিকে কেউ আসে না। থা-পরিবারের লোকেরা অবশ্য ভয় করে না। জুলানির জন্য এই ভিটার ঝোপকাড় শুধু তাহারাই সাহস করিয়া কাটে। ইহা আর কাহারো সহ্য হয় না। কোন না কোন বিপদ জড়াইয়া আসে এই রাজ্যের জুলানির সঙ্গে। মহেশডাঙ্গার শেখেরা একবার একটি চারা অশখ গাছ তুলিয়া তাহাদের উঠানে ঝোপণ করিয়াছিল। চার বছর পর সেই বাড়ির মুকুবী নাকি বজ্জ্বাঘাতে উঠানেই মারা যায়। আরো বহু দুর্ঘটনার জন্য থা-পরিবার এই রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভিটার চাতালের গাছপালা তাহারাই ভোগ করে।

ভিটা সংলগ্ন একটি বড় পুকুরিণী ছিল। বর্তমানে মজা পুকুর মাত্র। পাড়ে কাঁটাবন দুর্ভেদ্য। কয়েক বছর আগেও পদ্মপাতায় পুকুরের সামান্য পানিও দেখা যাইত না। বর্তমানে

জীবনের দ্বিতীয় নামও অন্তর্হিত হইয়াছে। খাঁর পুকুরে পীরের কুমির ছিল। সেই প্রবাদ এখনও মুখে মুখে ফেরে।

আলী আজহার খাঁ সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। তবে পাশ্চাতে তাঁর দখলের যথেষ্ট সুনাম ছিল এই অঞ্চলে। আজহার খাঁ পিতার এই মহিমা-গুণ কিছুই পায় নাই। তার পিতামহ আলী আমজাদ খাঁ নাকি আরো পারদশী পঞ্চিত ছিলেন। সওয়া শ' বছর আগে তাঁর প্রপিতামহ মজহার খাঁ এই গ্রামে অকস্মাত নাজেল হইয়াছিলেন। এই বৎশের তিনিই আদি-পিতা। শান্তি-সংকৃত দ্বন্দ্ববা তাঁর আমলেই ছিল। তারপর খাঁ পরিবারের অধঃপতনের যুগ। ইয়ারতের আকাশ হইতে আলী মজহার খাঁর বংশধরেরা আজ খড়োঘরের মাটিতে নামিয়াছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি সব নিরন্দিষ্ট। মাটির কাছাকাছি আসিয়া আলী আজহার খাঁও অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিগত ইতিহাসের স্মৃত তার কাছে ধূসূর মরীচিকার মতো মাঝে মাঝে জীবন-সংগ্রামের নিরাশা-ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ মুহূর্তে ভাসিয়া আসে বৈকি!

আলী আজহার খাঁর রক্তে পূর্ব পুরুষদের যাযাবর নেশা আছে যেন। আবাদের পর আর কোন কাজ থাকে না। ফসলের অনিষ্টয়তা নীড়ে কোন মোহ জাগায় না। আজহার তাই রাজমিস্ত্রীর কাজও শিখিয়াছিল। তখন সে দূরে ভিন্ন গাঁয়ের দিকে কলিক আর সূতা হাতে চলিয়া যায়। এমনি আজহার খাঁ নিরীহ। প্রতিবেশীদের কাছে সে সাধু ও সজ্জন নামে ব্যাত। আলী মজহার খাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের একটি যুবক নিজীবতার জন্য নিরীহ এমন অপবাদ দেড়শ' বছর আগে কেহ মুখে উচ্চারণেও সাহস করিত না। কর্মময় জীবনের ক্ষেত্রে, সাংসারিকতার নাগপাশ, দাসত্বের বেড়ি, পলিমাটির অদৃশ্য যোজনা শক্তি, কোথায় কিরূপ এখানে কাজ করিয়াছে কেহ তার ইতিহাস জানে না।

আলী মহজার খাঁর রক্তেও কি এমন ধৰা-দেওয়া নিজীবতার ধারা ছিল?

অতীতের সঙ্গীত-তরঙ্গ কল্পনাস্তুলে। সব সেখানে একাকার হইয়া যায়। বিরাট সমুদ্র-সন্নিত পৃথিবী, স্থাবর-জস্মের গতিশীল যাত্রবনি, শত-মন্দিরের পদক্ষেপ, মানুষ আর মানবীর কীর্তন মিছিল, কালের প্রান্তর-মর্মর। তবুও তবিষ্যৎ দিক্কচূর্ণবালের মতো মানুষের নয়নপটের সম্মুখে আঁকা। তাইত এই পথ চলা— যে-পথের বার্তা অতীত-বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ, ত্রিকালের সমাহারে অপূর্ব সমারোহ-ধ্বনি ভাঙা-গড়ার খঞ্জনীতে বাজায় বাজায়।

আলী আজহার খাঁর সাতবছর বয়সের পুত্র আলী আমজাদ খাঁও হারানো বাছুর খুঁজিতে আসিয়া স্থিমিত বৈকালে তারই হানা-রেশ পাঁজরের গলি-তটে বারবার যেন শুনিতে পায়।

গ্রান্ড ট্রাক্স রোড। এই রাজপথ। শেরশার বিজয় বাহিনীর যাত্রাপথ। পাঠান সম্বাট আর নবাবদের ঐশ্বর্য-দৃষ্টা ধূলি সড়ক। সন্ধ্যার অঙ্ককারে তুমশ আঘাতোপন করিতেছে। পত্রপুঞ্জের আবরণে দিনের আলো বাধাপ্রাণ। অঙ্ককার অবোধ বালকের মুখেও ছায়া ফেলে। দূরে মলিন আকাশ আর দেখা যায় না। শীতের হিমচিন্ন রাত্রির আবাহনী শিরীষের ডালে বাজিয়ে থাকে।

এই রাজপথ বাহিনী সওয়া-শ' বছর আগে আলী মজহার খাঁ পনের জন সহচর, আরো কয়েকটা ঘোড়া লইয়া মহেশভাঙার অঙ্ককারে আঘাতোপন করিয়াছিলেন। চারিদিকে গাঢ়পালার অরণ্য। ইংরেজ শাসকদের অন্ত-বর্ম-সংজ্ঞিত কোন প্রহরী অন্তত কিছুদিন

তাহাদের সক্কান পাইবে না। বিরাট কর্তব্যের অনুশাসন চতুর্দিকে, মজহার খাঁ বগুড়োর শুথ করিয়াছিলেন ঘোড়ার। কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে অশ্বপঢ়ে। শুষ্ক রুটি ও ছেট মশকের পানি মাত্র আহার। বিহারের কাছে কোম্পানীর একদল সিপাহী তাহাদের পঞ্চাং অনুসরণ করিয়াছিল। মজহার খাঁ ভৌরু নন। পাঠানের সন্তান বুজদীল হয় না কোনদিন। অনেক সময় আড়াগোপন নিজেকে বিরাটরূপে বিকাশেরই প্রাথমিক উপায় মাত্র। মজহার খাঁ তাই সেদিন পনের জন অনুচরসহ বহু জনপদ ও দুর্গম পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। বাংলা মুস্তকে হয়ত বছদিন কাটাইতে হইবে। বাংলার মুসলমানের সঙ্গে তাঁর অনেক বুজাপড়া আছে।

অঙ্ককার রাত্রি, শীতের হিম-হাওয়া পথে পথে বাজিয়া যায়। ঘোড়াগুলিকে ঘাস খাইতে দিয়া মহজার খাঁ ও তাঁর সঙ্গীরা রুটি সেঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতি কার্যে অসম্ভব রকম ক্ষিপ্তা। আহার সমাপনাত্তে মজহার খাঁ একবার ঘোড়ার উপর উঠিয়াছিলেন, আবার অবতরণ করিয়াছিলেন তখনই।

মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন, “ভাইয়ো, টেরকে, মাই আতা,” হাঁটু অবধি নাতিদীর্ঘ পাজামা পরিধানে, কোমরে তলোয়ার, বাম বাজুর দিকে গাদা-বন্দুক। মজহার খাঁ মহেশডাঙ্গা অঙ্ককারে একাকী ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

সঙ্গী দু-একজন অনুগমন করিতে চাহিল, তিনি বাধা দিলেন। “আসহাব, মাই খোদ্জানে-ওয়ালা।”

মহেশডাঙ্গা এইসব অঞ্চল তখন জনবিরল। মুসলমান পরিবার নিতান্ত নগণ্য। আলী মজহার খাঁকে অনিচ্যতা বোধ হয়, সোন্দেন দৈব কিছু সাহায্য করিয়াছিল নচেৎ আকস্মিকভাবে তিনি আরিফউদ্দীন মুনশীর বাড়িতে প্রথমে পৌছিয়াছিলেন কিরণপে?

গ্রামে পশ্চিম-দেশীয় ব্যক্তি মাঝে মাঝে আসে। অগাধ রাত্রে মুনশী আরিফউদ্দীন দহলিজে আসিয়া বিস্মিত হইলেন। জনবিরল অঞ্চলে দস্যুর প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। মুনশী সাহেব নবাব দণ্ডের বছদিন কাজ করিয়াছেন। পাশী জবানেই মজহার খাঁর পরিচয় গ্রহণ শুরু হইয়াছিল। এক প্রহরের মধ্যে দুই বিদেশী মুসলমানে অন্তরঙ্গতা আরম্ভ হইয়াছিল। একজন যুবক আর একজন বৃক্ষ। মুনশী সাহেবের যুবক-পুত্র শরিফউদ্দীন পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাত্রির মধ্যে আয়োজন চলিতেছে। কিসের আয়োজন?

মুনশী সাহেবের বলিলেন, মেরা এহি এক ল্যাড়াকা। ওয়াস্তে দীন-কে। খোদাকে রাহ পর।

বহুৎ আচ্ছা, আবাজান।

মজহার খাঁ আরিফ সাহেবকে পিতার মর্যদা দিয়াছিলেন। তিনি পাশী জবানে বলিয়াছিলেন, দেশের সূর্য আজ অস্তমিত। কুফর ইংরেজ আমাদের শাসক। মুসলমান আজ ভিখ-মাঙ্গ। আমাদের ঈমান, আমাদের খোদার বেইজ্জতির শুরু হইয়াছে মাত্র। আজ তাই চাই আপনার মতো পিতা-ওয়ালেদ। কওমের সেবায় যিনি একমাত্র নয়নের মণি ও উৎপাটিত করিয়া দিতে পারেন!

মহজার একটি ঘোড়া লইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; গভীর শীতাত

তথ্যসূচীয়ী রাত্রি ।

মুনশী সাহেব, শরিফউদ্দীন আর মজহার খাঁ আল্লার আকাশের নীচে দণ্ডায়মান। শরিফউদ্দীন মজহার খাঁ প্রদত্ত ইটু-ঢাকা পাজামা আর পিরহান পরিয়াছিলেন। পিতার চোখের দিকে বিদায়-দৃষ্টি নিষ্কেপ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “আবাজান, এজাজাত (আদেশ দিন) ।”

“যাও বেটা, কওম-কে রাহু পর ।”

দুই অশ্বারোহী অঙ্ককারে মিশিয়া গিয়াছিল। মুনশী আরিফউদ্দীন চাহিয়াছিলেন গভীর তিমিরস্পষ্ট পথ আর বনানীর দিকে।

অশ্বখুরধ্বনি দূরে দূরে মিলাইতে লাগিল। মুনশী সাহেবের কর্ণে ভাসিয়া আসিল বজ্রকষ্ঠের আওয়াজ :

ওয়ান্টে দিন-কে লড়না পায়ে তম্যে বেলাদ

শৱ্যমে কঁহতে হেঁ ইসকো জঙ্গে জেহাদ !*

এদেশে তখন ইংরেজের প্রতাপ ও আক্রমণ নানাদিকে প্রচণ্ডতর হইতেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সুদূর কাবুল হইতে বাংলার গ্রাম-অভ্যন্তরে ওহাবী-আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সময়কার কাহিনী। ওহাবী নেতারা বাংলার গ্রামে প্রভাবশালী মুসলমানদের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিতেছিল। মুনশী আরিফউদ্দীন এই বিষয়ে গোপনে সাহায্যরত ছিলেন।

কয়েকদিন পর গভীর রাত্রে আবার তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। শরিফউদ্দীনের সঙ্গে আরো বহু বাঙালি ওহাবী দহলিজে উপস্থিত এইখানে সংবাদ পাওয়া গেল, কোম্পানী তাঁহাদের গতিবিধির গন্ধ পাইয়াছে। মজহার খাঁ জানিতের, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন একটি ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া অঞ্চলে বাহির হওয়ায়েছে।

রাত্রির অক্ষকারে অশ্বারোহী পদাতিক প্রায় চলিশজন মজহার খাঁর নেতৃত্বে আবার চলিয়া গেল।

সেইদিন মহেশডাঙ্গার তিন মাইল উত্তরে হ্যারিংটনের সেনাবাহিনীর সহিত মজহার খাঁর সাক্ষাৎ ঘটিল।

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এখানে সক্ষীর্ণ। দু’পাশে খাদ আর জঙ্গল। অশ্বখুরধ্বনি শোনামাত্র আলী মজহার খাঁ সঙ্কেত দিয়াছিলেন। ঘোড়া হইতে অবতরণের পর তাহারা সকলেই খাদ পার হইয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করিল। ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

মজহার খাঁ কোন আক্রমণ এখন পছন্দ করেন না। সঙ্গীদের তিনি বলিয়াছিলেন, ছোটখাটো দল পাইলে তাহারা আক্রমণ করিবে; কেবল একমোগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে তাহারা আক্রমণ শুরু করিবে। তৎপূর্বে নয়। এখন আক্রমণ অযথা শক্তিশয়।

চলিশজন ওহাবী-সৈন্য ঝোপের ভিতর আত্মগোপন করিয়া রহিল। ঘোড়াগুলি শিক্ষিত। সব চৃপচাপ শায়িত। এই ঝোপেরাড়ে মশকের দংশনে অতিষ্ঠ হইলেও সকলে নিষ্ঠক।

* ওহাবী যোদ্ধাদের সঙ্গীত : ধর্মের জন্য এই সংগ্রাম-দেশ শাসনের জন্য নয়। ধর্মগ্রহে ইহাই জেহাদ নামে কীর্তিত।

আরো অশ্বুরধনি শোনা গেল।

মজহার খী অস্পষ্ট কষ্টে শরিফউদ্দীনকে বলিতেছিলেন, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ওহাবী প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়াছে। তাহারা ফিরিয়া আসিলে তখন আক্রমণমূলক পত্তা আরম্ভ করা সমীচীন হইবে। এইজন্য কতগুলি ভালো ঘোড়া-সওয়ার কাসেদ বা দৃত প্রয়োজন। দলের মধ্যে যাঁরা আবী-পাশী জানেন তাহাদেরই এই ভার দিতে হইবে। নচেৎ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগযোগ রাখা মুশকিল।

আলী মজহার খী আবার উৎকর্ষ হইলেন। খুরধনি যেন আরো নিকটবর্তী। আবার মজহার খী বলিলেন, দলে দলে কাল হইতেই শরিফউদ্দীন যেন উর্দু-পাশীর শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বাঙালি ওহাবী-বন্ধুরা উর্দু বা পাশী জানে না। আলাপ-আলোচনায় বড় অসুবিধা ঘটে। আর ভাষার জন্য মৈত্রীর বক্ষনও ঠিকমতো গড়িয়া ওঠে না।

অশ্বুরধনি নিকটবর্তী হইল। ফিকে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। মাত্র বারোজন গোরা সিপাহী। সম্মুখে একজন সামরিক সজ্জায় সুশোভিত ইঁরেজ। বোধ হয়, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন। আলী মজহার খীর শ্যেনচক্ষু এড়াইয়া কিছুই যায় নাই।

মাত্র বারো জন। প্রত্যেকের নিকট বন্দুক আছে। মজহার খী শরিফউদ্দীনকে বলিলেন, আজ এই সুযোগ তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের বন্দুক হাল-আমলের নয়, সংখ্যায় কম। এই কয়েকজনকে পরাম্পরা করা খুব সহজ। সেইজন্য প্রথম কর্তব্য, শরিফউদ্দীন অন্য কোন পথে মহেশডাঙা পৌছিতে পারে কিনা।

শরিফউদ্দীন সম্পত্তি-সূচক সায় দিয়াছিলেন

মজহার খী বলিলেন, আর একটি পত্তা দিয়াকার। দলের কয়েকজন ইহাদের অনুসরণ করিবে। একদল পূর্ব হইতে মহেশডাঙ্গা এক মাইল দক্ষিণে গাছ কাটিয়া গ্র্যান্ড ট্রান্স রোড অবরোধ করিয়া রাখিবে। কেন্ত যেন কোনরূপ পালাইয়া না যায়। একটি প্রাণী জীবিত থাকিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। পূর্বে একরূপ আক্রমণ খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শরিফউদ্দীনের সঙ্গে একদল সুশিক্ষিত বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার খাদ পার হইয়া গ্রামের মেঠো পথ ধরিয়াছিল। মজহার খী মাত্র তিনজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শরিফউদ্দীনকে তিনি আক্রমণের পূর্বে একটি বংশীনিনাদের সঙ্কেত করিতে বলিয়াছিলেন।

আলী মজহার খী খুব ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত ঘোড়া পরিচালনা করিতেছেন। বিন্দুমাত্র খুরধনি দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

অনুচরবর্গ প্রত্যেকে সুদক্ষ ঘোড়-সওয়ার। তারাও আজ আরো সাবধানী।

সেই গভীর রাত্রে মুনশী আরিফউদ্দীন পুত্রকে কয়েকজন লোক ও কুঠার সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইমারতের ছাদে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও আজ অন্তমিত। বৃক্ষ। দেশের সৌভাগ্য-সূর্য অন্তমিত হইয়াছে। এই বেইজ্জতি তার সম্মুখে অসহনীয় ব্যাপার। তিনিও আজ নওজওয়ানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন। শরীর সামর্থ্যীন। নচেৎ তিনিও আজ জেহাদের মল্লভূমে গিয়া দাঁড়াইতেন।

আরো দুই প্রহর পরে মহেশডাঙ্গার সন্নিকট গ্রান্ট-ট্রাঙ্ক রোডের সড়কের উপর শোনা গেল বন্দুকের দুম্দুম আওয়াজ। নিশাথিনীর পিঞ্জর ভেড় করিয়া অঙ্গের আওয়াজ, আহতের গোঙানি দূরে ভাসিয়া যাইতেছিল। আল্লা-হ-আকবর ধ্বনি শুন্যে ফরিয়াদের মতো বিলীন হইয়া গেল।

মজহার খী ভুল করিয়াছিলেন। শক্র অল্প সংখ্যা দেখিয়া তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন। মহেশডাঙ্গার আশেপাশে বহু গোরা সিপাহী মোতায়েন ছিল, তিনি জানিতেন না। সেদিন প্রবল শক্র আক্রমণের মুখে কাহারো তিষ্ঠানো সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে ওহাবীরা কেহই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই।

বন্দুকের আওয়াজ বহুবার মুনশী আরিফউদ্দীনের কানে গিয়াছিল। তিনি শুধু নিশ্চিহ্নস্ত বজ্রাহত ব্যক্তির মতো দাঁড়াইয়াছিলেন। তখনই সংবাদ আসিবে— হয়তো কোন অমোগ সংবাদ আসিবে— বৃক্ষ বয়সে যা তাঁর সহনশীলতার আয়তের সম্পূর্ণ বাহিরে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে আবার বনভূমি নিষ্ঠক হইয়া গেল। ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন লর্ডের আলোয় চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী রণ-নীতি তার কলা-কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত! এই বিজয়-গর্বে প্রায় চারিশত গোরা সিপাহী পরিবৃত্ত হইয়া হ্যারিংটন বলিল, জখমীদের এখানে ফাঁসি দেওয়া হউক। First lesson for the blackies. Exemplary punishment. কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বদ্দোবন্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।

পরদিন গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিল, পাঁচজন ওহাবী শহীদ হইয়াছেন। পনের জন গাছে ফাঁসি লট্কানো অবস্থায় ঝুলিতেছে।

সকলের আগে এই পথে আসিয়াছিলেন মুনশী আরিফউদ্দীন। সড়কের মুখে পড়িয়াছিল তাঁর পুত্র। মুখের উপর দিয়া শুলি চলিয়া গিয়াছে। আজ তাঁর পুত্র বলিয়া কেহ শনাক্ত করিতে পারিবে না। তিনি শুধু চেনন ওই হাত, ওই মুখ। শরফিউদ্দীনের মাতা পনের বছর আগে এতেকাল করিয়াছিলেন। নিজ হাতে এই নয়নের মণি তিনি লালন করিয়াছিলেন। বুকের উপর কালো দাগেই শরফিউদ্দীনকে চেনা যায়। বৃক্ষ কোন আহাজারী করেন নাই। শুধু ভাবিয়াছিলেন সালেমার কথা। সালেমা তাঁর কন্যা। ষোড়শী, যুবতী, অবিবাহিতা। সে কিন্তু পে আতার এই সংবাদ গ্রহণ করিবে।

সকালে গ্রামবাসীদের সাহায্যে ফাঁসি লট্কানো শহীদদের নীচে নামানো হইল। ইহারা সকালেই সামান্য আঘাত পাইয়াছিল মাত্র। কাহারো পায়ে বুলেটের দাগ। কাহারো হাতে। জীবনের সমস্ত আশাই ইহাদের ছিল। সামান্য চিকিৎসায় ফিরিয়া পাওয়া যাইত। ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই প্রণালীর কথা মুনশী আরিফউদ্দীন জানিতেন না।

একই কবরে পনের জন শহীদকে দাফন করা হইল। সালেমা ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিল না। আরিফউদ্দীন সাহেব কন্যাকে বলিয়াছিলেন, শরক্ফ কাবুলে চলিয়া গিয়াছে। সেইদিন রাত্রে তিনি আবার গ্রান্ট-ট্রাঙ্ক রোড পার হইয়া শহীদগণের কবর-গাহে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অশ্রু তখন কোন বাধা মানে নাই। মৃত্যুত হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়াছিলেন তিনি এই কবর-গাহে। চেতনা পাইয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সালেমা ভাই-জানের খবর জিজ্ঞাসা করিয়া সদৃশুরই পাইয়াছিল পরদিন।

আরো চারদিন পর আসিলেন মজহার খাঁ। তেমনই গভীর রাত্রি।

“আব্রাজান”, ডাক দিয়াছিলেন মজহার খাঁ।

মুনশী আরিফউদ্দীন দহলিজের দুয়ারে পা দেওয়া মাত্র মজহার খাঁ তার পা জড়াইয়া কাঁদিয়াছিলেন: “আব্রাজান, মাফি মাংতে হেঁই। আব্রাজান—।”

পাঠান-যুবকের চোখেও সেই রাত্রি অশুর বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল।

সিপাহী দল গ্রাম তোলপাড় করিয়া গিয়াছে। এই গাঁয়ের কোন লোক এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই। মুনশী সাহেবের পুত্র কেবল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, কোথায়, কেহ জানে না।

আর দহলিজে নয়। মুনশী সাহেবের আলী খাঁকে একদম লইয়া গেলেন অন্দর মহলে। যে-কোন সময় সিপাহী আসিতে পারে। মুনশী সাহেবের অশু-প্লাবিত নেত্র। ধরা-কঠে মজহার খাঁ বলিয়াছিলেন, “আব্রা মাঁই আপক্যা ল্যাড়কা।”

বৃন্দ সেদিন চূমনে চূমনে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এই পাঠান-যুবকের মুখ। শরিফউদ্দীনকেই যেন চূমন করিতেছিলেন তিনি।

মজহার খাঁ এইখানে বহুদিন আস্থাগোপন করিয়া রহিলেন।

আরিফউদ্দীন সহেব দু'মাস পরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “বেটা, খুনকা পেয়াস আওর নেহি।”

“মেরা আস্থাব, কওমকে ভাইয়ুকা খুনকা। বদলা মেরা ভাই শরিফউদ্দীন—”

“নেহি, বেটা। আওর খুনকা পেয়াস নেহি।”

আর রক্ত ত্রঞ্চা নয়? রক্তের পিপাসা কি মিটিয়া গিয়াছে?

ছয় মাস পরে গভীর রাত্রে সালেমার মিটাই হইয়া গিয়াছিল। নওশা আলী মজহার খাঁ। কাজী স্বয়ং আরিফউদ্দীন সাহেব। প্রতিবেশীরা বহুদিন পরে এই বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিল।

আলী মজহার খাঁর বুক ভরিয়াছিল দিগন্তের ত্রঞ্চা। কুফর শাসক-পীড়িত হিন্দুস্থানের মজলুম ভাই আর বোনের মুখ ছিল তাঁহার চলা-পথের দীপালোক। একটি হৃদয়ের আহ্বানে কি সেই ত্রঞ্চা মিটিয়া গেল? একটি নারীর কাঁকনের কন্কন ধৰ্মনির স্নোতে কি জিন্দানের সহস্র কোটি জিঙ্গিরের আওয়াজ স্তুক করিয়া দিল?

নীড়ের বন্ধন স্থীকার করলেও আলী মজহার খাঁর দিগন্তের পিপাসা কোনদিন নিবৃত্ত হয় নাই। সে অন্য কাহিনী। ইংরেজ সিপাহীর সঙ্গে আবার তাঁহার মোকাবিলা ঘটে। শহীদি কবর-গাহেই তাঁর শেষ সমাধি খোদিত হইয়াছিল।

আলী মজহার খাঁর অধ্যন্তন পঞ্চম পুরুষ আলী আমজাদ খাঁ বাচুর খুঁজিতে আসিয়া শহীদি কবর-গাহের সম্মুখে হঠাৎ দাঁড়াইল। আনমনা সে এই পথে চলিয়া আসিয়াছে।

চারিদিকে আগাছা আর খেজুরের জঙ্গল। আলী মজহার খাঁ এইখানে শুইয়া আছেন। তারই পূর্বপুরুষ। রক্তে ছিল যাঁর সিংহের বিক্রম, বুলেটের আঘাতে তাঁর শহীদ রূহ, এইখানে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। আলী আমজাদ খাঁ তা জানে না। আলী মজহার খাঁর রূহ কোনদিন মাগফেরাত প্রার্থী নয়। গিধড় অধ্যন্তন বৎসরদের ধিক্কার ও অভিশাপ দেওয়ার জন্য অস্তত তাঁর মাগফেরাতের কোন প্রয়োজন হইবে না।

প্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

উঠানের উপরে রান্নাঘর। উপরে কোন খড়ের ছাউনি নাই। কয়েকটি বাঁশের খূটি ও কঞ্চির ছায়া-রেখা আগুনের ঝলকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আরো একটি রান্নাঘর আছে উঠানের দক্ষিণে। গ্রীষ্মের দিনে কুঁড়েঘরের ভিতর রান্নার কাজ কষ্ট-কর। আজহার খো তাই দরিয়াবিবির জন্য উঠানের উপর চালহীন রান্নাঘর তৈরি করিয়াছিল। কয়েকদিন আগেকার ঝড়ে তালপাতা উড়িয়া গিয়াছে। শুধু চালার ফ্রেমটি এখন অবশিষ্ট।

দরিয়াবিবি চুলায় জুল দিতেছিল। হাঁড়ির ভিতর চিড়িচিড় শব্দ ওঠে। দমকা বাতাসে আগুনের হল্কা বাহির হইয়া আসে। দরিয়াবিবির মুখ দেখা যায়। কপালের চারিপাশ ঘামিয়া উঠিয়াছে।

আমজাদ মা'র পাশে বসিয়া রান্না দেবিতেছিল। অন্যদিকে খড় কুঁচকাইতেছিল আজহার খো।

আমজাদ।

কি আব্বা?

এক আঁটি খড় বঁটির মুখে রাখিয়া আজহার একবার কপালের ঘাম মুছিবার চেষ্টা করিল।

অনেক দূর খুঁজেছি, আব্বা। তারী বজ্জাত চগাইও তেমনি। বাচুর হারায়।

কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর আজহার কুঁচকাই খড় রাখিতেছিল। প্রায় পূর্ণ ঝুড়িটি দমকা বাতাসে হঠাত আড় হইয়া গেল। কুঁচে খড় হাওয়ায় উড়িতে থাকে। আজহার বঁটি ছাড়িয়া বলে, আমু, ধর বাবা ধর—।

আমজাদের কচি মুষ্টি নাগাল পায় না। দরিয়াবিবি স্বামীর সাহায্যে অগ্সর হয়। তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। দোহারা বাঁধন শরীরের। গোলগাল মুখটি গাঢ়ীর্যে টইটম্বুর।

আমজাদ কুঁচো খড়ের পিছনে এদিক-ওদিক দৌড়ায়।

ঐ দ্যাখো আব্বা, উড়ে যাচ্ছে।

খড়কুটো বাতাসের বেগে উপরে উঠতে থাকে।

দরিয়াবিবি তারী শ্রান্ত হইয়া বলে, কি ছিরি, তোমার কাজের।

দরিয়াবিবি স্বামীর দিকে তাকায়।

আজহার শান্তকষ্টে জবাব দিল: আচমকা হয়ে গেল। আর কোনদিন এমনটা হয়েছে?

বাতাসে দারিয়াবিবির চুল এলোমেলো, হঠাত এক মুঠো খড় হাতে সে ডাকে, আমু, এদিকে আয় ত বাবা, আমার চোখে কি পড়েছে দ্যাখ্।

দরিয়াবিবি ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছে। আমজাদ মা'র কাছে ছুটিয়া যায়।

এই খড়গুলো ঝুড়ির ভিতর রেখে আয়।

আমজাদ এক মিনিটে মা'র আদেশ পালন করিল।

ভারী ক্ৰক্ৰ কৰছে চোখটা ।
দৱিয়াবিবি কাপড়ের খুঁটে মুখের ভাপ দিতে থাকে ।
ভালো হলো, মা?
দাঁড়া, বাবা, খামোখা বকাস্নি ।
আমজাদ ফালি লুঙ্গি পরিয়াছিল । মা'র দেখাদেখি সে-ও লুঙ্গিৰ খোট মুখের ভিতৰ
চুকায় ।

তৱকারিটা বুঝি পুড়ে গেল !
দৱিয়াবিবি এবাৰ লাফ দিয়া চুলার কাছে পৌছাইল ।
আমু, একটু পানি দে, বাবা ।
আমজাদেৰ সাহায্য চাওয়া বাতুলতা ।
দৱিয়াবিবি দৌড়িয়া ঘৰেৱ দিকে ছোটে । কলস ত সেখানেই ।
এক মালসা পানি হাঁড়িৰ মধ্যে ঢালিতে ঢালিতে বলে, বাপবেটায় এক হজুগ নিয়ে
এলো । চোখটা এখনও ক্ৰক্ৰ কৰছে ।

আজহার একটি খড়েৰ বিড়াল উপৱ বসিয়াছিল । হাতে নারকেলী ছঁকা ।
দৱিয়াবিবি, চুলোতে আগুন পড়েছে?
চুলোৰ মুখে বসিয়া দৱিয়াবিবি এলোচুল বিন্যস্ত কৱিতেছিল ।
আগুন পড়বে না? কত সিংদৱে কাঠ জ্বালাচি ।
আজহার দৱিয়াবিবিৰ দিকে তাকায় । তাৰ হস্তাৰ মুখে এখনও শ্রান্তিৰ ছায়া আঁকা ।
স্বামীৰ উৎসাহ নিভিয়া আসে । কলকেটা আজহার খামোখা মাটিৰ উপৱ ঘুৱাইতে থাকে ।
তুমি জানো, পাতাৰ আগুন । এতে অৰোৱা ভালো আগুন পড়ে? কাঠ-পোড়ানো নসীবে
লিখেছে আগ্না?

ঐ আগুন-ই দাও ।
তা দিছি । পাতা খেঁটেনোৱ হাঙামা কত । ও-পাড়াৰ সাকেৱেৰ মা বলে, আমাদেৱ
গাছেৱ পাতা আৱ খেঁটিয়ো না, খাঁয়েৱ বৌ । (পৱে ঈষৎ থামিয়া) খড় সব বেঁচে দিলে?
আজহার ভাৰী তামাক খায় । তাৰ নেশা চটাৰ উপক্ৰম, আৱ ধৈৰ্য্য থাকে না, নিজেই
কলকে হাতে দৱিয়াবিবিৰ সম্মুখে দাঁড়াইল ।

খড় না বেচলে, খাজনা দেওয়া হলো কোথা থেকে?
বেশ, ভালোই কৱেছ । থাকলে গৱৰ-বাচুৱ খেয়ে বাঁচত । পোয়ালটা পুড়ানো চলত ।
যা জ্বালানিৰ কষ্ট ।

স্বামীৰ দিকে চাহিয়া দৱিয়াবিবি ঘোম্টা টানে । এতক্ষণ খেয়াল ছিল না । নিঃশব্দেই
সে আজহারেৱ হাত হইতে কলকে গ্ৰহণ কৱিল ।

বাবা আমু, একটা খাপ্ৰা নিয়ে এসো ।
আজহার জিজ্ঞাসা কৱে, খাপ্ৰা কি হবে?
ভাৰী মোলায়েম কষ্ট এবাৰ দৱিয়াবিবিৰ । — বাতাসে ফিন্কি ছুটলে আৱ রক্ষে
আছে! আগুন লেগে যাবে ।
সাৰধানে কলকেৱ মুখে আগুন দেয়াৱ পৱ দৱিয়াবিবি খাপ্ৰাটা উপৱে চাপ দিয়া

বসাইল।

যা দমকা বাতাস, গাছের পাতাপুতি আর ওসুল হবে না। চুলোর হাঙ্গামা পোয়াতেই
অঙ্গীর।

ফুড়ুক-ফুড়ুক শব্দ হয়। চক্ষু বুজিয়া আজহার ছঁকা টানে।

দরিয়া-বৌ, পুকর-পাড়ে কটা গাছ আছে, কাটালে হয় না? কয়েক মাসের জ্বালানোর
জন্যে আর ভাবতে হয় না।

না, ওসব কাটলে, তারপর? কোন কাজকর্ম নেই আর? ছেলেদের বিয়ে-শাদী নেই?
আমজাদ মা'র পাশে বসিয়াছিল। সে বলে, কার বিয়ে হবে, মা?

আমার। বলিয়া দরিয়াবিবি মৃদু হাসে। গল্পীর মুখ্যবয়বে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলিয়া
যায়।

পরে সে আজহারের দিকে চাহিয়া বলে, ছেলেটা কোন কথা বলতে দেবে না।
ঘরকন্নার কথার সময় কিছু ভালো লাগে না।

তোর আবার বিয়ে হবে, আমু।

আজহার নিঃশব্দে তামাক খায়। কয়েক বিঘা জমি। সে আজ নিজেই হাল করিয়াছে।
দরিয়াবিবির কথা তার কাছে পৌছায় না। তন্দুয় নেশা জমিতেছিল তার তামাকের ধোয়ায়।

সুশ্রোতিতের মতো সে বলে, কার বিয়ে দিছ?

তোমার, আমার, গোটা গাঁয়ের।

দরিয়াবিবি হাসে। আজহার তার মুখের দিক্কে একবার তাকাইল মাত্র। আবার গুড়ুক
টানার শব্দ হয় উঠানে। আজহার থী স্বভাবতই নিরীহ। দৈনন্দিনতার সংগ্রাম ছাড়া আর
কিছু তাকে সহজে স্পর্শ করে না।

দরিয়াবিবি পার্শ্বে উপবিষ্ট পুত্রকে বলে, তোর বাবাকে ডাক। জেগে আছে ত?
বাবাজী!

আজহার জবাব দেয়, কী আমু?

দরিয়াবিবি স্বামীকে অনুরোধ করে, এখনি রান্না শেষ হবে। আমুর সাথে গল্প করো।
মা!

কিরে!

দ্যাখ না গোয়াল ঘরে, বাছুরটা এসেছে ত!

ভারী মনে করি দিলি, বাপধন! ওগো বাছুরটা দেখো না।

আজহার থী বাছুরের জন্য কোন সন্দেহ প্রকাশ করে না।

দেখো, কাল সকালে ঠিক আসবে।

আমজাদ দরিয়াবিবিকে চুপিচুপি বলে, এখন গোয়ালে দেখে আসতে বলো না।

এখন যাও না একবার গোয়াল-ডাঙায়।

থাক আজ।

সাদা বাছুর। আমজাদের ভারী প্রিয়। মার কাছে ফরিয়াদের আর অন্য কোন কারণ
নাই।

মা, বাছুরটাকে যদি শেয়ালে ধরে।

অত বড় বাচ্চুর আবার শেয়ালে ছুতে পারে? আজহার খী আবার সন্দেহ প্রকাশ করে।
আজকালের শেয়াল।

আজকালের শেয়াল ত একবার যাও না। কৃতিম রাগন্ধিৎ হয় দরিয়াবিবি।
আমু, বাচ্চুর খুঁজতে তুমি কতদূর গিয়েছিলে?

মাঠের দিকে গিয়ে কত ডাকলুম। কবরস্থানের কাছে—

দরিয়াবিবি একটি ইঁড়ি নামাইয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। উঠানের পশ্চিম দিকে
দু'খানি খড়ো ঘর। ছিটে-বেড়ার তৈরি। শোয়া-বসা চলে দুই ঘরে। পাশে রান্নাঘর।

হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্র এইখানে থাকে।

রান্নাঘরে হাঁড়ি রাখিয়া দরিয়াবিবি ফিরিয়া আসিল।

তুই গিয়েছিলি পুরানো কবরস্থানের দিকে?

শহীদি কবর-গাহের নাম পুরাতন কবরস্থান। হাল-আমলের অন্য গোরস্থান আছে।
বারবার মানা করব, আমার কথা ত শুনবি নে।

আমার ভয় লাগেনি ত, মা।

নেই লাগুক। দাঁড়া, একটু বড়পীরের পানি-পড়া আনি। দরিয়াবিবি একটি বোতল ও
মাটির পেয়ালা সঙ্গে আনল।

আজহার খী অঙ্ককারে ঝিমাইতেছিল। শরীর খুব ভালো নয় তার। এতক্ষণ সে
মাতাপুত্রের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখে নাই।

কি আনলে, দরিয়া-বৌ। এসব কী?

বড়পীরের পানি-পড়া, একটু ছেলেটাকে খাওয়াব।

আজহার খী তীরবেগে ছুটিয়া আসিল তাহাদের নিকট।

কর কী, দরিয়া-বৌ।

কেন কী হয়েছে?

এসব কী! পানি-পড়া খাওয়াচ্ছ? ওহাবীর ঘরে এসব বেদাং। লোকে কী বলবে?

দরিয়াবিবি বাজখাই গলায় বলে, বসো। তোমার বেদাং (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) তোমার কাছে
থাক।

ভালো কথা নয়, দরিয়া-বৌ।

আজহার শাস্ত বরেই জবাব দিল।

এসব নিয়ে কেন গোলমাল বাধাও? ছেলেদের রোগ-দেউ আছে। আমি খাচ্ছ নাকি?

দরিয়াবিবির হাতের কামাই নাই। পেয়ালার পানিতে এতক্ষণ আমজাদের কষ্ট ভিজিয়া
গেল।

আজহার খী সাধারণত বেশি কথা বলে না। সে গুম হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া
রহিল।

দরিয়াবিবির উপর কোন কথা চলে না।

আজহার আবার হ্রাঁক হাতে নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল।

দরিয়াবিবি অনুভব করে, স্বামী রাগন্ধিৎ। পরিবেশ আবার স্বাভাবিক করা দরকার।
আমজাদকে বলে, তোর আবার কাছে গিয়ে একটু গল্প কর। চুলোর আঁচটা দেখি।

আমজাদ ইতস্তত করে ।

গুড়ক টানার আওয়াজ হইতেছিল । আজহার থাঁ নিষ্ঠক । আমজাদ পিতার নিকট
গিয়া ধূলার উপর বসিল ।

আজহার থাঁ এইবার কথা বলে, ধূলোয় বসলি আয়? আয়, আমার কোলে বস ।

দরিয়াবিবি চূলোর নিকট হইতে জবাব দেয় : আমিও যাব নাকি?

এসো না আস্মা ।

আজহার থাঁ পুত্রকে কোলে বসাইয়া গুড়ক টানে ।

থাক বাবা, আমার গিয়ে দরকার নেই ।

আজহার থাঁ দেখিতে পাইল, দরিয়াবিবি তরকারির নুন চাখিবার জন্য হাতের তালু
পাতিয়াছে । মুখে পুঁজি হাসি রেখায়িত ।

চূলার আগুন নিভিয়া আসিতেছে । রান্না প্রায় শেষ । দরিয়াবিবির মুখ আর চোখে
পড়ে না । কানে তার হাসি ভাসিয়া আসে ।

সারাদিন খেটেপুটে সবাই । চুপচাপ সবাই । দৃঢ় ত চিরকাল । ছেলেটাকে নিয়ে
একটু গল্প করো না ।

আজহার থাঁ মাঝে মাঝে অতীতের বৎশ-কাহিনীর কথকতায় মন্ত হয় । সব দিন নয় ।
আজ সে কোন জবাবই দিল না । নিঃশব্দে তামাক সেবন করিতেছিল, তার কোন ব্যতিক্রম
দেখা গেল না ।

সারা উঠানময় নিষ্ঠকতা । পুত্র পিতার কোলে আসীন । মা হাঁড়ি লইয়া ব্যস্ত ।

চুলা প্রায় নিভিয়া গিয়াছিল । সামান্য রাজি বাকি আছে । দরিয়াবিবি আবার একরাশ
পাতা আনিয়া চূলার মুখে জড়ো করিল

অশ্বের কাঁচা পাতা সহজে ধরেন্না । ধোঁয়ায় উঠান ভরিয়া গেল । বাঁশের চোঙা দিয়া
দরিয়াবিবি ফুঁ দিতে থাকে । একটু পরে চুলা জুলিতে লাগিল । পাছে আবার নিভিয়া যায়,
নিঃশব্দ হওয়ার জন্য দরিয়াবিবি আরো পাতাপুতি ঞেজিয়া দিল । দাউদাউ শিখা আবার
উঠানের চারিদিকে তার আলো ছড়ায় ।

প্রাঙ্গণের উপর একটা অতর্কিত ছায়া পড়িল । ছায়ার কায়া দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত
পর । একটা তিন বছরের উলঙ্গ মেয়ে ধীরে ধীরে অগ্সর হইতেছে । মাথায় ঝাঁকড়া চুল ।
চোখে পিচুটিভো । সে ভালোরপে চোখ মেলিতে পারিতেছে না । অভ্যাসের সাহায্যে চেনা
উঠানের খবরদারী করিতে বাহির হইয়াছে যেন ।

তার উপর প্রথম দৃষ্টি পড়িল আজহার থাঁর ।

আয় মা, আয় । এতক্ষণ কোথায় ছিল?

সকলের নজর পড়ে মেয়েটির উপর ।

আমজাদ চীৎকার করে : ঐ ভূত-বুড়ি এসেছে ।

দরিয়াবিবি পিছন ফিরিয়া হাসিয়া উঠিল : বুড়ি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙল?

আজহার থাঁ ডাকে, নষ্টিমা এদিকে আয় ।

দরিয়াবিবির ছোট মেয়ে নষ্টিমা । সন্ধ্যার সময় কাজের ঝামেলা থাকে । বড় বিরক্ত
করে তখন সে । কান্না জুড়িয়া দেয় রীতিমতো । আজ বিকালে তাকে ঘুম পাড়াইয়াছিল

দরিয়াবিবি নিজে।

নঙ্গমা আজহার থাঁর নিকট গেল না। সোজাসুজি মা'র নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

একটু দাঁড়া, মা।

দরিয়াবিবি একটি হাঁড়ি চুলার উপর হইতে নামাইয়া নঙ্গমাকে কেলে বসাইল, আঁচলের খুঁট দিয়া চোখের পিচুটি মুছাইয়া দিল।

কোন কথা বলে না নঙ্গমা। হাই উঠে তার ঘূম যেন গা-মত হয় নাই।

কি রে, আরো ঘুমোবি, মা?

নঙ্গমা কথা বলে না। মা'র বুকে মুখ গুঁজিয়া সে আরাম পায়।

আর একটু সবুর কর, মা! তারপর তোর আকাকে ভাত দেব, তোর আমু-ভাই থাবে, তুই খাবি।

ভাতের কথায় নঙ্গমা উস্থুস্থু করে মা'র কোলে।

এশার নামাজ তবে পড়ে এসো। আর দেরী করে লাভ নেই, নঙ্গমার চোখে এখনও নিদ রয়েছে।

আজহার থাঁকে লক্ষ্য করিয়া দরিয়াবিবির উচ্চারণ।

স্বামী জবাব দিল, এদিকে আমুরও ঘূম পেয়েছে। আমার কোলে শয়ে বেশ নাক ডাকাচ্ছে।

বিড়ার উপর বসিয়া আমু চুলিতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চোখ ভরিয়া গোটা রাজ্যের ঘূম আসিয়াছে।

দরিয়াবিবি এক বদ্না পানি আনিয়া দিল।

এক কাজ করো না, ওজু করতে একটু ডান ধারে সরে যাও। কতগুলো ছাঁচি কদুর বীজ পুঁতেছিলাম, কড়ে আঙুলটাক গুছ বেরিয়েছে। পানি ত রোজ দিই। আজ একটু ওজুর পানি পড়ুক। আর হজুরের কন্দম-ধোওয়া পানি।

আজহার থা কোন কথা না বলিয়া উঠানের দক্ষিণ দিকে ওজু করিতে বসিল। দরিয়াবিবির এত হাসি তার ভালো লাগে না।

রান্না শেষ। চুলার ভিতর পাতার আগুন। দরিয়াবিবি একটা হাঁড়ি চুলার মুখে বসাইয়া দিল, পাছে বাতাস ঢোকে। রাত্রির মতো দরিয়াবিবির কাজ চুকিয়াছে।

আর এক লোটা পানি আনিল সে। আমু খোঁয়ারে চুলিতেছিল। তার মুখে পানির ছিটা দিয়া দরিয়াবিবি বলিল, একটু হাঁস কর বাবা, আর দেরী নেই। আজ ত একটু পড়তেও বসলি নে।

নঙ্গমা তখনও খুঁতখুঁত করিতেছে।

একটু সবুর কর মা। ঘাট থেকে মুখে-হাতে পানি দিয়ে আসি।

আজহার থাঁর নামাজ-পড়া শেষ হইয়াছিল। নামাজের ছেঁড়া পাটি গুটাইতে লাগিল সে।

অঙ্ককারে নামাজ-পড়া ভালো দেখায় না। দরিয়াবিবি আগেই একটি টিনের ডিপা জ্বালিয়াছিল চুলার নিকট। নামাজের পাটির দুর্দশা আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়।

দরিয়াবিবি বলে, নৃতন নামাজের পাটি আর কেনা হল না? সব কাজেই খোদাকে

ফাঁকি।

হলো কই! মেলায় গেলাম। একটা পাটি দেড় টাকা চায়।

দরিয়াবিবির তর্ক শেষ হইয়া যায়। তবু সহজে সে দমে না।

ছেঁড়া পাটি। সেজদায় যাওয়ার সময় মাথায় ধূলো লাগুক। কপাল ক্ষওয়া দেখলে লোকে বলবে, খুব পরহেজগার (ধার্মিক)!

পাটি গুটানো শেষ করিয়া আজহার খাঁ মুখ খোলে, আল্লাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে আজহার খাঁ নামাজ পড়ে না। আমার পর-দাদা আলী আসজাদ খাঁর নাম সবাই জানে। সেই বৎশের ছেলে আমি।

পর-দাদা লেখা-পড়া জানা মৌলবী মানুষ। আমার আর লেখাপড়ার দরকার আছে? দরিয়াবিবি টিপ্পনী কাটিল।

আজহার খাঁ বৎশের খোঁটা সহ্য করিতে পারে না। নিরীহ ভালো মানুষটি থাকে না তখন আজহার খাঁ। আপাতত চুপ করিয়া গেল সে।

তুমিও ত ঐ পাটিতে নামাজ পড়ো! তোমারও পরহেজগার হওয়ার সখ আছে।

তা আছে বৈকি! তোমাদের পায়ের তলায় আমাদের বেহেশ্ত। তুমি যদি ঐ পাটি ব্যবহার করো, আমার জন্য বুঝি তা খুব দোষের ব্যাপার?

আজহার খাঁ এই মুহূর্তের জন্য অস্ততঃ উশ্মা প্রকাশ করে।

আর কোন জিনিস চেয়ো না। পাটি একটা, যত্নদামই হোক কিনে আনব।

অত রাগের কাজ নেই। নামাজের পাটিতে কেপাল ক্ষয়ে গেল, একটা পাটি কেনার আওকাত (সঙ্গতি) আল্লা দিল কৈ?

আজহার খাঁ চুপ করিয়া থাকে। দরিয়াবিবির কথা তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় তুলে। এমন নাফুর্মান (অবাধ্য) বাস্তু সাজিতেছে সে দিন-দিন। তৌবাস্তাগ্ফের পড়িল আজহার খাঁ তিনবার। তারপর গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেদের দিকে দেখো, আমি ঘাট থেকে আসি।

দরিয়াবিবি চলিয়া গেল। সারাদিনের পর অবকাশ মিলিয়াছে। চৈত্রের বাতাস বহিতেছিল বিরিবিরি। বাস্তর নীচে আগাছা-জঙ্গলে নামহীন কুসুম ফুটিয়াছে কোথাও।

খুব তাড়াতাড়ি দরিয়াবিবি পুরুরঘাট হইতে ফিরিয়া আসিল।

আজহার ছেলেদের লইয়া উঠানে বসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করে সে, এত তাড়াতাড়ি এলে?

দরিয়াবিবির অবয়বে ব্যস্ততার ছাপ।

বক্রীটার বাচ্চা হবে বোধ হয়। ভারী ভ্যাবাচ্ছে, রাত বেশি হয় নি। ঘরে এনে— না, না দেরী আছে।

আশঙ্কিত দরিয়াবিবি বলে, না, থেকে-থেকে ভারী ভ্যাবাচ্ছে। রাত্রে যদি বাচ্চা হয়, যা দুঁদে বাচ্চুর রয়েছে, লাথিয়ে মেরে ফেলবে কঢ়ি বাচ্চা।

বাড়ি-সংলগ্ন ছেট উদ্বাস্তু। তারপর পুরুর আর পুরুর-ঘাট। পশ্চিম-উত্তর কোণে গোয়াল-ঘর। গরু-বাচ্চুর-ছাগল একই জায়গায় রাখা হয়। পাড়ের দু'পাশে বুনো ঘাস। সাপের আড়া। আজহার খাঁর তাই কাজের কোন চাড় ছিল না।

দরিয়াবিবি বাক্যালাপ না করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ব্যাঞ্জনাদি পেয়ালায় পরিবেশনের সময় সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ছাগলের ডাক ঘন ঘন শোনা যাইতেছে।

এবার ছেলেদের নিয়ে এসো।

ডাক দিল দরিয়াবিবি। কর্তৃপক্ষে ক্রোধ চাপা রহিয়াছে।

নইমা নিজের হাতে খায় না। দরিয়াবিবি সকলের খাবার দেওয়ার পর তাকে কোলে তুলিয়া লইল। তার ঘূম যেন সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। মা'র আঙুলের অন্ত সে নিঃশব্দে খাইতে লাগিল।

দরিয়াবিবির কান সদা-সর্বদা খাড়া রহিয়াছে। ছাগলের চীৎকার মুহূর্তে শোনা যায়। অভাব-ছোওয়া সংসারে এই মুক পশুরাই তাহাদের সম্বল। গত বছর গোয়াল-ঘরে ছাগলের বাচ্চা হইয়াছিল। দু'টিই গরম গুঁতোয় মরিয়া যায়। তার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। সেই ছানা দু'টি থাকিলে এই বছর চড়া দামে বিক্রি হইত। ব্যাপারীরা সেদিনও খোঁজ লইয়াছিল।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলেও দরিয়াবিবির অবসর অত সহজে আসে না। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। ভোর রাত্রে যদি বৃষ্টি নামে! উঠনের পশ্চিম কোণে ঘুঁটে মেলা আছে। আজ ভিজিয়া গেলে কাল আর চুলা জুলিবে না! গাছের বরাপাতা লইয়া পাড়ায় মেয়েদের কোন্দল বাঁধে। দরিয়াবিবি ঝোড়ায় ঘুঁটেগুলি তুলিবার জন্য ছুটিয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া আসিয়াছিল, আবার ঘুঁটে ছুইতে হইল। দরিয়াবিবি সহজে পরিশ্রান্ত হয় না। তবু আজ খারাপ লাগে তার।

আমজাদ মা'র কাছে শোয় না। তার আসন অন্য ঘরে। আজহার খৌর দূর সম্পর্কীয় এক বৃড়ি খালা আছে। আসেক্জান। সে ছেষে ভালো দেখে না, শ্রবণ-শক্তিহীন। তার আর কোনো আশ্রয় নাই। এখানেই কেন্দ্রস্থলে মাথা গুঁজিয়া থাকে। সৈদ, মোহররম ও অন্যান্য পর্বের সময় গ্রামের অবস্থাপুরুষস্লমানেরা খয়রাত করে, জাকাত দেয়— তারই আয়ে কোন রকমে দিন চলে। সন্ধ্যার পূর্বেই সে ঘরে ঢুকে আর বাহির হয় না। খাওয়ারও কোনো হঙ্গামা নাই তার। আমজাদ তার পাশে ঘুপ্তি মারিয়া শুইয়া থাকে। বড় পাতলা ঘূম আসেক্জানের। দৃষ্টিশক্তি অল্প বলিয়া আমজাদের খবরদারি সে করিতে পারে না। দরিয়াবিবি তাই অনেক রাত্রে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসে। কামরার সংলগ্ন ছিটে-বেড়ার ঘর। মাঝখানে একটি বাঁশের চোরা-টাঁটি আছে। যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নাই। আমজাদের শোয়া খারাপ। গড়াইতে গড়াইতে হয়ত ধূলোর উপর শুইয়া থাকে। ডিপা হাতে আজও দরিয়াবিবি আমজাদকে দেখিতে আসিল। না, সুবোধের মত সে ঘুমাইতেছে।

পা-তালির শব্দে আসেক্জানের ঘূম ভাঙিয়া গিয়াছিল।

কে, আজহার?

না, আমি দরিয়া, খালা।

এত রাত্রে কেন, বৌ!

এমনি এলাম।

সারাদিন কাজ। যা, ঘুমো গে, বাচ্চা।

আচ্ছা, যাই।

আসেক্জান আবার সাড়া দেয় : বৌ, এলে যখন একটু পানি দাও না, মা। বুড়ো

মানুষ আধারে হাতড়ে মরব ।

আসলে আসেকজ্জনের খুব কষ্ট হয় না অঙ্ককারে । দুই ঘরে ডিপা জালানোর কেরোসিন-ব্যয় এই সংসারের পক্ষে দুঃসাধ্য । আসেকজ্জন পীড়াপীড়ি করে না । সব তার অভ্যাসের কাছে পোষ মানিয়েছে । আধারে আধারে সে পুরু-ঘাট পর্যন্ত যাইতে পারে ।

দরিয়াবিবি কলসের পানি ঢালিয়া দিল ।

বৌমা, কাল একটু ও-পাড়া যাব । কেউ যদি একটা কাপড় দেয় । সেই আর বছর সৈদে কখন মোস্লেম মুনশী একখানা দিয়েছিল । আল্লা তার ভাল করুক ।

দরিয়াবিবি মাঝে মাঝে ভারী কঠিন হয় বুড়ির উপর । এত রাত্রে আর গল্লের সময় নাই । দরিয়াবিবির অন্তর্ধানে আবার ঘরটি অঙ্ককারে ভরিয়া উঠিল । শব্দের ভারসাম্য রাখিতে পারে না আসেকজ্জন, নিজে বধির বলিয়া । সে চেচাইয়া বলিতে থাকে, মড়ার দিন-কাল কী হলো? একটাকা পাঁচসিকের কাপড়ও লোকের সত্ত্বেও ওঠে না । আখেরী জামানা! দজ্জল আসতে আর দেরী নেই । চৌদ্দ সিদির (শতাব্দী) আমল, কিতাবের কথা কি আর ঝুঁট হবে?

অনেকক্ষণ পরে আসেকজ্জন বুঝিতে পারে, ঘরে কেহ নাই । তখন নিজেই স্তুতি হইয়া যায় । সাদা চুলের উকুল বাছিতে বাছিতে আসেকজ্জন দীর্ঘনিঃশ্঵াস ফেলে ।

অখ্যাত পল্লীর নিভৃতে মানুষের আহাজারী-বুকে নৈশ বাতাস একটানা বহিয়া যায় ।

দরিয়াবিবির আশঙ্কা অমূলক নয় । নিষ্ঠতি রাত্রে আবার ছাগলের অবিশ্রান্ত চীৎকার শোনা গেল ।

দরিয়াবিবির পক্ষে বিছানায় পড়িয়া থাকা মুশকিল । যদি সত্যই ছাগলটির বাচ্চা হয় । সে একা সামাল দিতে অপারগ । স্বপ্নেকে জাগাইতে হইল ।

ঐ শোনো । ছাগলটা আকুলি-বিকুলি করছে ।

আজহার খাঁ উঠিয়া পড়িল ।

না, গিয়ে দেখাই যাক । ডিপাটা জালো ।

দরিয়াবিবি স্বামীর আদেশ পালন করিল ।

টাঁটি খুলিয়া আজহার খাঁ দেখিল, আকাশে দ্রুত মেঘ জমিতেছে । দমকা বাতাস হ হ শব্দে বহিতেছে ।

দরিয়া-বৌ, ডিপা নিয়ে যেতে পারবে? খুব বাতাস ।

ঘরের কোণায় একটি ধূচনী ছিল । ডিপাটি তার মধ্যে রাখিয়া স্তৰ জবাব দিল : চলো, আমি বাতাস কাটিয়ে যেতে পারব ।

পুরুরের পাড়ের পথ তত সুবিধার নয় । দু'পাশে ঘন জঙ্গল । সাবধানে পা ফেলিতে হয় । ধূচনীর ভিতর ভিজা আলো তাই স্পষ্টভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে না । ছাগলের চীৎকার আর যেন থামা জানে না ।

জোর বড় উঠিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে । পুরুর পাড়ের গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে । নিষ্ঠতি বনভূমির প্রেতাভ্যা খলখল হাস্যে উন্নাদ নৃত্য-তাণ্ডবে মাতিয়াছে যেন । চারিদিকে গোঙানির শব্দ ওঠে ।

দরিয়াবিবি ভয় পায় না । ডিপা হাতে সাবধানে পা ফেলে সে ।

না, এবার থেকে গো'ল ঘর সরিয়ে আনব ভিটের কাছে।

আজহার খীঁ বলিল। কথার ষেই সে আবার নিজেই অনুসরণ করে : জায়গা পাব কার? তবু রায়েদের ভালো-মানুষ যে, পুকুর-পাড়ে গো'ল করতে দিয়েছে।

দরিয়াবিবি ডিপা সামলাইতে ব্যস্ত। কোন কথা তার কানে যায় না। পাড়ের উপর শেয়াকুলের ঝোপ আড় হইয়া পড়িয়াছিল। আজহার ভাঙা পিঠুলির ডাল দিয়া কোনৰূপে পথ পরিষ্কার করিল। অতি সন্তর্পণে পা-ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না। কাঁটাকুটিতে পথ বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

আরো দমকা বাতাস আসে। গাছপালাণ্ডি যেন মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ে আর কী।

এইখানে পথ বেশ পরিষ্কার। দরিয়াবিবি দ্রুত পা চালায়।

গোয়াল-ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহারা হাঁপ ছাড়ে। ছাগ-মাতার চীৎকারও আর শোনা যায় না।

গোয়ালের টাঁটি খোলা-মাত্র একটা সাদা বাচ্চুর সম্মুখের তালবন হইতে ছুটিয়া আসিল। হতভাগা, কোথা ছিলি সঁজবেলা?

আজহারের গা ঘেঁষিয়া বাচ্চুরটি লেজ দোলায়। মানুষের ভৰ্তসনা বোধ হয় আদরের পূর্বলক্ষণ। দরিয়াবিবি বাচ্চুরের গলায় দড়ি পরাইয়া দিতে লাগিল। নচেৎ সব দুধ শেষ করিয়া ফেলিবে।

প্রথমে গরুর কৃঠৰী ছাগলের কৃঠৰী একটরে এই দিকটা আরো অঙ্ককার। গোয়ালের চালে ঝড় খুব কম লাগে। চারিদিকেই প্রায় স্ফুর চারা তাল গাছের সারি। বাতাস এই দুর্গ সহজে তেড়ে করিতে পারে না।

দরিয়াবিবি ডিপা লইয়া ছাগলের কৃঠৰীতে ঢুকিল। আনন্দে তাহার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অসহায় ছাগ-মাতা দণ্ডিয়মান। সম্মুখে দুইটি কালো ছাগ-শিশি। পশ-মাতা গা লেহন করিতেছে শিশি দুইটির।

এখনও ফুল পড়ে নাই। দরিয়াবিবি তাই বলিল, এক কাজ করা যাক, ফুলটা আমি ফেলে দিই, না হলে বাচ্চাগুলোর কি দশা হবে যদি ফুল খেয়ে বসে থাকে? দুধ কিনে বাচ্চা বাঁচানোর পয়সা আছে আমাদের?

দরিয়াবিবি আর বিলম্ব করে না। ধাত্রীর কাজ সে নীরবেই সম্পন্ন করিল।

চলো, আরো ঝড় উঠতে পারে। তুমি ধাড়িটাকে কোলে নাও। আমি বাচ্চা দুটো আর ডিপা নেই।

আজহার ইতস্তত করিতেছিল। সদ্যপ্রসূত ছাগীর সংস্পর্শ তার ভাল লাগে না।

অত বাবুয়ানী যদি করতে চাও করো। ছেলেদের মানুষ করবে, না নিজের মত গরুর লেজ-মলা শেখাবে?

যাক না রাত্রের মত। খালি বাচ্চা দু'টো নিয়ে যাই।

দরিয়াবিবির কষ্টস্বর ঝংকৃত হয় : নাও তুমি বাচ্চা দু'টো, আমি ধাড়িটা কোলে নিছি।

দরিয়াবিবির অবয়বের বাঁধন ভাল। ছাগলটিকে সে সহজেই বহন করিতে সমর্থ

হইবে। আনন্দে তার কর্ম-ব্যস্ততা আরো বাড়িয়া যায়।

কয়েক কাঠা জমি অগ্সর হওয়ার পর মুশকিল বাধিল ডিপা লইয়া। আজহার খাঁর বুকে ছাগ-শিশ দুইটি। ডিপা আবার ধূচনীর ভিতর সাবধানে না রাখিলে চলে না। একটু হাত কাঁপিলে বাতাসে নিভিয়া যাইবে।

ভ্যানক রাগিয়া উঠিল দরিয়াবিবি। শেয়াকুলের ঝোপ পার হওয়ার পর দমকা বাতাসে ডিপা নিভিয়া গেল।

ঐ কাজ তোমাকে দিয়ে হয়! বাচ্চা দু'টো আমাকে দিতে কি হয়েছিল?

আজহার খা আর জবাব দেয় না। অঙ্ককারে কোন রকমে দুইজন অগ্সর হয়।

কালো মেঘের পঙ্গপাল হৃদুম-দৃদুম গামের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি নামিলে দুরবস্থার আর অন্ত থাকিবে না।

অঙ্ককারে দরিয়াবিবি বারবার আল্লাহর নাম করে। নষ্টিমা এক ঘরে শুইয়া রাহিয়াছে। পচা ছিটে বেড়ার ঘর। দরিয়াবিবির সমস্ত রাগ আজহার খাঁর উপর। চোখে তার জল আসে। এমন অবোধ মানুষকে লইয়া তার সংসার!

দরিয়া-বৌ, আর বেশি দেরী নেই।

বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখা গেল। পুকুর-পাড় শেষ হইয়াছে।

এইবার নামিল ঝয়কুম বৃষ্টি। চেনা সরল পথ। আজহার খা দৌড় দিল। ভারী ছাগ দরিয়াবিবির কোলে, সে বড়-বৃষ্টি মাথায় সন্তর্পণে চাঞ্জিতে লাগিল।

উঠনে আসিয়া দরিয়াবিবি দেখিল, টাটি বাঞ্জেস খুলিয়া গিয়াছে। ইন্তার পাতাপুতি চুকিতেছে ঘরে। নষ্টিমা অঙ্ককারে হাউমাউ জড়িয়াছে। আসেক্জান চেঁচাইতেছে। তার কথার কোন হাদিশ নাই।

ছাগলটিকে মাটির উপর রাখিয়ে দরিয়াবিবি ধূলার উপর উপবেশন করিল। জায়গার বাছ-বিচার নাই তার। বড় শ্রান্ত সে।

আজহার খা ডিপা জালাইয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। তেল-চিটা দাগ-লাগা বালিশের একপাশ হইতে কালো তুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া পড়িল আজহার খা।

ক্লান্ত দরিয়াবিবি করুণ দৃষ্টিতে বারবার স্বামীর মুখ অবলোকন করিতে লাগিল।

২

এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল রাত্রে। আজহার সকালেই লাঞ্জল কাঁধে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। এক মাইল দূরে তার জমি। দুপুরের রৌদ্রে বাড়ি ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়া করা যায়; কিন্তু আবার মাঠে ফিরিয়া আসা পঞ্চম। এই জন্যে আমজাদ দুপুরের ভাত মাঠে লইয়া যায়। দরিয়াবিবি তা পছন্দ করে না। আমজাদের মখ্তব যাওয়া হওয়া না। লেখা-পড়া নষ্ট। অন্য উপায়ও নাই। দরিয়াবিবি গৃহস্থালীর কাজ করিতে পারে। পর্দানশীনা মেয়েদের মাঠে যাওয়া সাজে না।

আমজাদের কিন্তু এই কাজ খুব ভাল লাগে। দহলিজের একটোরে বসিয়া থাকা ভারী

কষ্টকর। মাধা ধরে, হাই ওঠে, তবু মৌলবী সাহেব ছুটির নাম করেন না। এখানে ইচ্ছামত দেদার মাঠে ঘুরিয়া বেড়ানো, তার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে পৃথিবীতে!

ঠিক মাঝামাঝি দুপুরে আমজাদ নিজে খাইতে বসে। ছেলেমানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। কোন কোন দিন দুপুর চলিয়া যায়।

আজহার অবশ্য তার জন্য রাগ করে না। আমজাদ মাঠে পৌছাইলে হাসিমুখেই সে বলে, আমু, এত দেরী কেন, ব্যাটা?

রাঁধতে দেরী। আর আমি জোরে ইঁটতে পারি না।

আজহার গামছায় ঘর্মাঙ্ক কচি মুখ মুছাইয়া বলে, থাক, তার জন্যে কি হয়েছে! আমার ভারী পিয়াস পেয়েছে, একটু পানি আনো তো নদী থেকে।

জমির পাশেই নদী। দরিয়াবিবি আমু-র হাতে একটা ছোট বদ্ন দিতে ভোলে না। অন্য সময় আজহার আঁজলা করিয়া পানি পায়। খাওয়ার সময় এই হাসমা পোষায় না।

আমজাদ পিতার আদেশ পালন করে। দুপুরের চড়া রোদ। সেও কম ক্লান্ত হয় না। মখ্তবের জেলখানা হইতে সে রেহাই পাইয়াছে, এই আনন্দে নিজের শ্রান্তির কথা ভুলিয়া যায়।

কয়েত বেলের গাছের ছায়ায় আজহার খাইতে বসে।

বন্যার সময় দুইটি কয়েত চারা ভাসিয়া আসিয়াছিল পাঁচ বছর আগে। আজহার নিজের হাতেই বান-ভাসি চারা দুইটি রোপণ করিয়াছিল। বাঁকড়া গাছের ছায়ায় অন্যান্য বিশ্রান্ত কিষাণদের শুলজার মজলিস বসে। জাহির আর এক কোণে কলার গাছ। ভাল কলার গাছ রোপণ বৃথা। রাত্রে চুরি যায়। এই জন্যে মাঠে কেউ ভাল কলার গাছ লাগায় না। পূর্বে কলাপাতার ছায়ায় আজহার মন্তব্য করিয়াছিল ভোজন করিত। গাঁয়ের আরো কিষাণ মাঠে আসিয়া বাস করিতেছে। তারা সকলেই বাগ্দী, তিওর শ্রেণীর। আজহারও মাঠে বসবাস করিতে চায়। ফসলের খবরদারী ভাল হয়, ইচ্ছামত প্ররিশ্রম করা যায়। দরিয়াবিবি রাজী হয় না। বেপর্দা জায়গায় ইজ্জত রাখা যায়। তার উপর পুকুরণী নাই। নদীর টত এই দিকে উঁচু। গ্রীষ্মকালে পানি ঢালু তটের দিকে সরিয়া যায়। মুমিনের ঘরের মেয়ে এতটুকু বেপর্দা হইতে পারে না। বাগ্দী তিওরেরা কোন অসুবিধা ভোগ করে না। মা'র সঙ্গে উলঙ্গ কুঁচো ছেলের দল দুপুরের স্বান করিতে যায়। রসিক বাগ্দীর দুইটি ছেলে কয়েক বছর আগে বন্যার সময় ভিটার উপর হইতে স্নোতে পড়িয়া গিয়াছিল। তাদের আর কোন সকান পাওয়া গেল না। ভিটে-ত্যাগের কথা উঠিলে দরিয়াবিবি এই কাহিনী খুব ফলাও করিয়া বলে, আজহার খাঁর উৎসাহ থাকে না আর।

আমজাদ এক বদ্ন পানি পিতার সম্মুখে রাখিয়া বলে, পানি তেতে উঠেছে, কাল থেকে সকালে বদ্ন এনে রেখো।

আজহার খাঁ এক লুক্মা ভাত গালে ভুলিয়াছে, চোয়াল নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল: হোক, ক্ষতি নেই বাপ। আজ ভুক লেগেছে জোর।

এক অঁতি খড়ের উপর বসিয়া আমজাদ বাবার আহার-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে। তরকারি ভাল নয় আজ। সামান্য ভাল আর চুনো মাছের শুরুয়া।

আমজাদ মাঠের চারিদিকে তাকায়। ধু ধু করিতেছে দূরের মাঠগুলি। নদীর দুই

পাশে সবুজ রবি-ফসলের ক্ষেত। সেখানেও রঙ বিবর্ণ। চৈত্রের বাতাস ঝামাল তোলে। বালু ধূলি-কণা অন্য গাঁয়ের দিকে উড়িয়া যায়। পাতলা এক খণ্ড রঞ্জীন ধোঁয়া যেন পাড়ি জমাইতেছে গ্রামাঞ্চলে।

এই বছর আজহারের লাউ ছাড়া অন্য রবি-ফসল নাই। কুমড়ার লম্বা ডগা সাপের মত জড়াজড়ি করিয়া রৌদ্রে ঝুমাইতেছে। মাটির ঢেলার উপর একটি কুমড়া দেখা যায়। সবেমাত্র পাক ধরিয়াছে। হলুদ-ধূসর এক রকমের রং চোখ-ঝল্সানো আলোয় আরো স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমজাদের চোখ বারবার সেই দিকে আকৃষ্ট হয়।

আকুন্ত।

আজহার খাঁ মুখ তোলে। রৌদ্রে মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। তার উপর কালো এক গোছা দাঢ়ি! কয়েকটা ভাত লাগিয়া রহিয়াছে ঠোঁটের এক কোণে। সেদিকে চাহিয়া আমজাদের হাসি আসে।

ঐ কুমড়াটা পেকেছে।

খুব পাকে নি।

তুমি সেবার বললে, ঘরে ভুলে রাখলে পেকে যায়।

আজহার খাঁ মুখে একগাল ভাত তুলিল। একটু থামিয়া সে বলে, পাকবে না কেন? পুত্রের জিজাসার হেতু আজহার খাঁ উপলক্ষ্মি করে।

কুমড়াটা ঘরে নিয়ে যেতে চাও?

হ্যাঁ। খুব লজ্জিত হয় আমজাদ, যেন সে কৃত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে।

না, এখন থাক, বাবা। সামনে হওয়া একশ' কুমড়া গঞ্জে দেওয়ার কথা আছে। কিছু বায়না নিয়েছি।

পুত্রের মুখের দিকে চায় এবার আজহার খাঁ। কচি শিশুর মুখের উজ্জ্বলতা নিভিয়া গিয়াছে।

আরো কয়েক মুঠি ভাত থালায় পড়িয়া রহিল। আজহার খাঁ বিষণ্ণ হইয়া যায়। এক শ' কুমড়া এই সঙ্গাহে জমি হইতে উঠিবে কিনা সন্দেহ, হয়ত অন্য চার্বীর নিকট হইতে কেনা ছাড়া উপায় থাকিবে না। ছেলেদের সামান্য আবদার রক্ষা করাও তার ক্ষমতার বাহিরে। পাইকের আসিয়াছিল গত সঙ্গাহে। অগ্রিম বায়না লইয়াছে সে। ওয়াদা-খেলাফ খাঁ পছন্দ করে না। নচেৎ খুব ক্ষতি হইবে তার। অন্য সময় মাঠে কুমড়া পচিতে থাকিবে, পাইকের ছুইয়া দেখিবে না পর্যন্ত।

আজহার ছেলের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করে না। মুখ নীচু করিয়া বলে, ওদিকের মাঠে তরমুজ হয়েছে খুব। তরমুজ খাবে?

হাসিমুখে আমজাদ পিতার মুখের দিকে চায়। তরমুজের নামে তার ঠোঁটে-মুখে আনন্দ রেখায়িত হয়।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি নদী থেকে। বসো, বাবাজী।

নদীর পাড়ের নীচে আজহার ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। পিতার বলীয়ান ছায়া-মূর্তির দিকে আমজাদ চাহিয়াছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি মেলিয়া দিল। মাঠে বাতাস আছে, তাই দারুণ গ্রীষ্মে কোন রকমে সহ্য করা যায়। গাড়ীদল নির্বিবাদে মাঠে চরিতেছে। দূরে

একটি কুঁড়ের পাশে পাকুড় গাছের তলায় কতগুলি ছেলে খেলা করিতেছিল। তাহাদের হল্লা আমজাদের কানে গেল। আবার চোখ ফেরায় সে। একটু পরে সে শুনিতে পাইল, কে যেন শিস দিতেছে। কোন পাখির ডাক বোধ হয়। আমজাদের চেনা পাখি নয়। অচূত ধরনের শিস। আমজাদ এদিক-ওদিক ইতস্তত দৃষ্টি নিষ্কেপ করে।

হঠাতে শিস থামিয়া গেল।

কাঁদের ছেলে রে?

চমকিয়া ওঠে আমজাদ। কলা গাছের আড়াল হইতে হঠাতে একটা লোক বাহির হইয়াছে। যাক, ভয়ের কিছু নাই। লোকটির মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কালো কুচকুচে গা। হাতে একটি কাস্তে ও নিড়েন-দেওয়া দাউলী।

আবার শিসের জোয়ার ছোটে। এই লোকটি শিস দিতেছিল তা-হলে! ডাগর চোখ তার ঘন-কালো। লম্বা-চওড়া জোয়ান। ভয় করে আমজাদের।

তার দিকে চাহিয়া সে বলে, কাঁদের ছেলে? তরমুজ চুরি করতে বেরিয়েছে, না?

ভয়ে জড়সড় হইয়া যায় আমজাদ। আজহার কাছে নাই। নদীতে বৃথা বিলৰ করিতেছে সে।

চুরি করতে বেরিয়েছে?

না। আমি ভাত এনেছি।

লোকটা অকারণ হাসিয়া উঠিল, আবার শিস দিতে দিতে সে গান গায় :

সর্বে ক্ষেতের আড়াল হল চাঁদ,

চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ

ও উদাসিনী লো—

মাথার বাবরী চুল গায়কের বাত্তস উড়িতেছিল। গান থামিল কয়েক কলি দোহারের পর।

ভাত এনেছো?

আমজাদ ত্রিয়মাণ বালকের মত উন্তর দিল : আবু সব খেয়ে ফেলেছে।

তা হলে আমার জন্যে রাখোনি কিছু। বাহু।

মুখ সামান্য নীচু করিয়া আমজাদের দিকে সে দুষ্টমির হাসি হাসে আর তাকায়। ঠোঁট বাঁকাইয়া সে ঠোঁ ঠোঁ শব্দ করে।

একটুও ভাত রাখলে না বাপ-ব্যাটা মিলে! হি-হি।

সর্বে ক্ষেতের আড়াল হল চাঁদ,

চোখে তার মানুষ-ধরা ফাঁদ

ও উদাসিনী লো—

আমজাদের ভ্যাবাচ্যাকা লাগে। হয়তো লোকটা পাগল। এইবার সে কোমরের উপর বাম হাত রাখিয়া একটু বক্রভাবে দাঁড়াইল। তারপর ঠোঁটের একপাশে অন্য হাত চাপিয়া লোকটা জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল : এই তরমুজ ক্ষেতে কে?

আমজাদ নদীর আশে-পাশে জমির দিকে তাকায়। সেই ছেলেগুলি খেলা করিতেছে।

মাঠে জনপ্রাণীর আভাস নাই। গরুগুলি জাবর কাটিতে ছায়ার আশ্রয় সন্ধান করিতেছে। তবু লোকটা চীৎকার করে। অদৃশ্য উদাসিনীর উদ্দেশ্যে বোধ হয়। একটা চুম্বকড়ি দিয়া সে ছায়ায় বসিয়া পড়িল। একদম আমজাদের পাশে। তাড়ির গন্ধ উঠিতেছে মুখে। আমজাদ একটু সরিয়া বসে।

আরে লক্ষ্মী, সব ভাত খেলে, আর চাচার জন্যে— তারপর সে বৃক্ষাঙ্গুষ্ঠ উঁচু করিল।

আজহারকে নদীর পাড়ের উপর দেখা গেল। হাত-মুখ, থালা ধোওয়া শেষ হইয়াছে।

নৃতন উৎসাহ পায় লোকটা। আরো জোরে গান ধরে সে। কুমড়া ক্ষেত্রে ওপাশে আজহারকে দেখিয়া সে জোরে ডাকে: ও ভাই খীঁ।

নিকটে আসিল আজহার: কে চন্দর?

লোকটা মহেশডাঙ্গার চন্দ্র কোটাল। মাঠেই বসবাস করে সে। ভাঁড়-নাচের দল আছে তার। ভিন-গাঁ হইতে পর্যন্ত ডাক আসে পূজা-পার্বণের সময়। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়াবাঁটি করিয়া কয়েক বছর আগে সে পল্লী পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রতিবেশীর নিঃশ্বাস তার ভাল লাগে না। কিন্তু মাঠে সকলের সঙ্গে তার সঙ্গাব খুব। কয়েক বিঘা জমি দূরে তার কুঁড়ে। স্ত্রী এলোকেশী আর একটি মেয়ে সংসারের সম্মল। বহু ঝড়-আপদ গিয়াছে তার উপর দিয়া। বসন্তে একই মাসে দু'টি মেয়ে মারা গেল পাঁচ বছর পূর্বে। চন্দ্র কোটাল স্ফুর্তিবাজ দিলখোলা লোক। কুঁড়ের পাশে কয়েকটি তাল গাছ। আজহারের জমির প্রাঙ্গণ হইতেও তালসাঁজি-দেখা যায়। বাঁশ আর তাড়ির ভাঁড় সারা বছর এই গাছে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দিনে চন্দ্র কোটালের মরণম পড়ে।

ও খীঁ, শিগগির এসো।

চন্দ্র আমজাদের দিকে ফিরিয়া বলে, সুড়ো দাঢ়িওয়ালা কে?

আমার আকু।

কি করে জানো?

চন্দ্র গৌফে আঙুল চালায় আর মুচকি হাসে।

আমার আকু তো। আমি জানি নে!

দূর হইতে সংলাপ কানে যায় আজহার খীর। নিকটে আসিয়া বলে, চন্দর, আজ কষে হারাম গিলেছ। খুব-যে গান ধরেছিলে। তোবা!

এই তো খীঁ — ভাই, তুমিও গাল দেবে?

আজহার খীকে চন্দ্র সমীহ করে। সজ্জন ব্যক্তি। তা-ছাড়া খীয়েদের প্রাচীন বংশ-মহিমার কাহিনী এই গাঁয়ের সকলের পরিচিত। তার দাম চন্দ্রও দিতে জানে।

মাছ কেমন ধরছ?

চন্দ্রের কুঁড়ের সম্মুখে দুইটি খালের মোহনা। বারো মাস পানি থাকে। বর্ষাকালে চন্দ্র চামের দিকে ভাল মন দেয় না। মাছে খুব রোজগার হয় তখন। কাঠি-বাড় দিয়া খালের মোহনা ফিরিয়া রাখে সে।

না ভাই, দিন-কাল ভাল নয়। একটু তামাক দাও।

আজহার খী বাসন-লোটা নীচে রাখিল। কয়েত বেলের গাছে ঠেস দিয়া সে নারিকেলি ছঁকা রাখিয়াছিল। হাতে তুলিয়া লইল।

আজ্ঞা, তামাক খাওয়াচি, ছেলেটাকে একটা তরমুজ দাও। এ বছর আমার ক্ষেত্রে
নাদারাং।

চন্দ্ৰ কোটাল আমজাদেৱ কঢ়ি থুৰ্ণি হাতেৱ তালুৱ উপৱ রাখিয়া জবাৰ দিল : আৱে
ব্যাটা, এতক্ষণ আমাকে বলিস্নি কেন?

উঠিয়া পড়িল চন্দ্ৰ। বিঘে দুই জমিৰ পাড়ি। আবাৰ শিস দিতে লাগিল সে। আনুষঙ্গিক
গানও রেহাই পায় না।

জমি বেচে দুয়োৱ বেচে
গড়িয়ে দেব গয়না।
ডুমুৱ তলাৱ হলুদ পাড়ি
আমাৱে হায় চায় না।

আজহার খাঁ আমজাদকে বলে, পাগল চন্দ্ৰেু।

পুত্ৰ পিতাৰ মন্তব্যে হাসে।

আমাকে এতক্ষণ বলছিল, সব ভাত শেষ কৱলে, আমাৰ জন্যে রাখলে না?

তুমি কী জবাৰ দিলে?

কিছু না। চুপচাপ বসেছিলাম। ভয়ে পেয়েছিল।

আজহার খাঁ হাসে।

পাগল চন্দ্ৰকে ভয়েৱ কিছু নেই। আজ্ঞা আসুক।

ফিরিয়া আসিল চন্দ্ৰ কোটাল। শিস দিতে দিতে দু'টি বড় তরমুজ মাটিৰ উপৱ
রাখিল। আমজাদেৱ দুই চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

আজহার খাঁ বলে, দু'টো বড় তরমুজ আনলে কেন?

তাতে কী।

আজ বাদ কাল গঞ্জ। এবাৰ চালান দেবে না?

চন্দ্ৰ ঘাম মুছিতেছিল।

না, এবাৰ চোৱে চোৱে শেষ। এই হাট ফাঁক গেল।

দুইটি তরমুজ বেশ বড়। একটিৰ রং ঘন সবুজ। অপৱটি সাদা। মাঝে মাঝে কালো
ডোৱ-টানা, যেন চিতা বাঘেৰ গা।

চন্দ্ৰ কোটাল আঙ্গলেৱ টোকা দিয়া তরমুজ দু'টি পৰীক্ষা কৱিল।

এই সবজে রঞ্জেৱ তরমুজটা খুব পেকেছে। এখনই কাজ চলবে।

চন্দ্ৰ কান্তেৱ নথ তরমুজেৱ উপৱ বসাইতে গিয়া থামিয়া গেল। তোমাৰ নাম কী,
চাচা?

আমজাদ।

রাগ কৱো না। আৱ একটু দাঁড়াও, চাচা।

চন্দ্ৰ আবাৰ উঠিয়া পড়িল। নদী-পথেৱ দিকে তাৱ মুখ। বাধা দিল আজহার। সে
জিজ্ঞাসা কৱে, কি হলো চন্দ্ৰ?

সারাদিন রোদ পেয়েছে, তরমুজ খুব গৱম। ছেলেটাৰ খেয়ে আবাৰ শৰীৰ খারাপ

করবে ।

আজহার ঈষৎ বিরক্ত হয় ।

এখন তবে কী করবে?

নদীর হাঁটু-জলে বালির তলায় পাঁচ মিনিট রাখলেই, ব্যস ।

একদম বরফ । ব-র-ফ ।

আজহার দ্বিরুক্তি করে না । চন্দ্র জমির আল ধরিয়া নদীর দিকে চলিয়া গেল ।

আজহার পুত্রের দিকে তাকায় ।

দেখলে? চন্দ্রটা পাগল ।

এবার পিতার কথায় আমজাদ সায় দিতে পারে না । সে নদীর দিকে চাহিয়া থাকে ।

বড় ভাল লাগে চন্দ্র কোটালকে তার । সাদা ডোর-টানা তরমুজের দিকে সে আর একবার লোভাতুর দৃষ্টি নিষ্কেপ করিল ।

দুই বছর কয়েত বেল ধরে না । রোজগারের এই একটি পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ।
আজহার খীঁ আফশোস করে ।

মাঠে এলে, বাবা দুঁটো বেলও গাছে হয়নি ।

আমজাদ এই কথায় কোন সাড়া দেয় না । সে চন্দ্র কোটালের প্রতীক্ষা করিতেছে ।
সময় যেন আর শেষ হয় না ।

সূর্যের কিরণে দহন-সপ্তার নাই । পড়ত বেলার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে । ঈষৎশীতল
বায়ু কয়েত বেলের বনে মর্মর তোলে । গাভীদল দেন্দুল কোকুদে আবার ঘাসের সঙ্গানে
বাহির হইয়াছে ।

এই, তরমুজ ক্ষেতে কে?

নদীর পাড়ে দণ্ডয়মান চন্দ্র । হাতে নদী-স্নাত তরমুজ । টপ্টপ্ পানি পড়িতেছে ।
আমজাদ আশ্চর্ষ হয় ।

আজহার তামাক সাজিতেছিল । চন্দ্র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল ।

এইবার শুরু করা যাক । ফিকফিক হাসে চন্দ্র ।

অমন হাঁকছিল খামাখা । তোমার ক্ষেতে তো লোক নেই ।

রাত্রেও মাঝে মাঝে হাঁকতে হয় । লোক নেই, চোর জুটতে কতক্ষণ ।

হাঁকার মাথা হইতে কক্ষে লইয়া চন্দ্র এলোপাথাড়ি টান আরম্ভ করিল ।

তুমি তরমুজটা কেটে দাও ছেলেকে ।

আমজাদ বিছানো খড়ের উপর বসিয়াছিল । তার পাশে বসিল চন্দ্র । ভক্তক গন্ধ
বাহির হয় মুখ হইতে । আমজাদ অসোয়ান্তি বোধ করে । একটু সরিয়া বসে ।

চন্দ্র বলে, ভয় পেয়েছ বাবা?

না ।

আজহার অভয় প্রদান করে ।

তয় কি । তোর চন্দ্র কাকা, আমু ।

আমু চাচা, শুরু করো ।

আজহার তরমুজ কাটিয়া দিল । লাল-দানা সাদা শাসের ভিতর দিয়ে উঁকি মারে ।

তরমুজ খুব পাকা।

তুমি একটু নাও, চন্দর।

না, না। আমি একটু রস্টেস গিলেছি। আর না। চন্দ্ৰ ধোয়া ছাড়ে।

আমু চাচা, খেতে পারবে সব?

পারবো, চন্দ্ৰ কাকা।

বেশ কথা বলতে পারে তো।

চন্দ্ৰ আমজাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বড় কষ্ট হয় আজের-ভাই। বড় মায়া দেয় মুখগুলো। কিন্তু খামখা।

আজহার কোটালের কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না। বলে, কি বলছ?

এই ছেলেপুলের কথা। বড় মায়া দেয়। কিন্তু সারা জীবন তো খেতে খেতে বিনি-আহার বিনি-কাপড়ে যাবে আমাদের মত। চাষীর ছেলে!

কেন?

এখনও বুঝালে না, আজের-ভাই! মানুষ করা সাধ্যিতে কুলাবে?

কথাটা আজহারের অনঃপৃত হয় না। পুত্রের জীবন সমক্ষে সে এত নৈরাশ্য পোষণ করে না।

খোদা নসীবে লিখে থাকলে মানুষ হবে!

ফের কপালের কথা তুলেছে। এই দ্যাখো, অম্মার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চক্রোত্তির ছেলেটা ছিল, একদম হাবা, কত কান মুলে দিয়েছি, মানসাংক পারত না, সেটা হাকিম হয়েছে। গায়ে ত আর আসে না। সেটা হলো হাকিম। আর আমি? পাঠশালার সেরা ছেলে মজাই তাড়ি আর নেশা, মাঠে মাথাভুঁড়াম পায়ে—।

শক্তার ছায়া জাগে আজহার খীঁড়া মনে। আমজাদের কানে এই সব কথা যায় না। সে আনন্দে তরমুজ খাইতে ব্যস্ত।

ওর বাবা শহরে ছেলেকে নিয়ে গেল। পেটানো গাধা একদম মানুষ। হাকিম!

চোখের তারা উপরে তুলিয়া কক্ষে হাতে চন্দ্ৰ ভুক্তঙ্গী করে।

তুমি বলো নসীব— কপাল! ছো-ছো। হরি চক্রোত্তি বছৱ বছৱ জমিৰ খাজনা সাধতে আসে। আমার বাবাকে না খাজনা দিতে হত, আমাকে না খাজনা দিতে হয়, আয়-উপায় বাড়ে, দেখি কোন্ দিকের জল কোন্ দিকে গড়ায়। কার কপাল কত চওড়া হয়, দেখা যাক।

আজহার চন্দ্ৰের কথা মন দিয়া শোনে। কোন উন্তর দিতে পারে না। এই ধৰনের কথা বলে দরিয়াবিবি। কারো সঙ্গে আজহারের মিল নেই। এদিকে আমজাদের তরমুজ খাওয়া পুরোদমে চলিতেছে। পুত্রের ভবিষ্যৎ একবার মাত্র উকি দিয়া গেল আজহারের মনে। চকিত ছোঁয়াচ মাত্র। উল্টো-পাল্টা কথা তার ভাল লাগে না। উঠিয়া পড়িল আজহার।

চন্দ্ৰ, এবাৰ কক্ষেটা দাও। এখনও বিষে খানেক জমি মই দিতে বাকী।

দুই বার টান দিয়া কক্ষে ফিরাইয়া দিল আজহার।

কয়েত বেলের গাছের গুড়ির সঙ্গে বাঁধা বলদ দুইটি চোখ বুজিয়া রোমছন করিতেছিল। আজহারের আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কৰ্তব্য সমক্ষে পশু দুটি যেন সৰ্বদা সচেতন।

মই জুড়িয়া আজহার জমির উপর নামিল। জমিতে শকরগঞ্জ আলু দিবে এইবার
আজহার থী।

আমজাদের তরমুজ খাওয়া সমাপ্ত। সে হাত-মুখ গামছায় মুছিয়া ধন্যবাদ জানাইল,
তোমার তরমুজ খুব ভাল, চন্দ্র কাকা।

ওই তরমুজটা নিয়ে যেয়ো তোমার মায়ের জন্য। ভাবী আজ কি রঁধেছিল।

আমজাদের বয়স সাত বছর। সাধারণ দীন ব্যঙ্গন। লোকের কাছে তা প্রকাশ করতে
নাই। বালক-সে-বিষয়ে সচেতন। কোন জবাব দিল না সে।

বেশ, আমায় একদিন নেমন্তন্ত্র করো।

অঙ্গুট 'আচ্ছা' শব্দে জবাব দিল আমজাদ।

আজের-ভাই, ছেলে আমার তরমুজ ক্ষেত্র দেখে আসুক, তোমার তো বাড়ি যেতে
দেরী আছে?

আচ্ছা, যাক। দেরী করো না, আমু।

দেরী করব না, বাবাজী।

চৈত্রের বৈকাল। আকাশে খও মেঘেরা মন্ত্রণারত। সম্প্র প্রান্তর আবার কর্মকলরবে
জাগিয়া উঠিতেছে। ঝড় ন উঠিলে সক্ষ্য পর্যন্ত রবি-ফসলের ক্ষেত্রে কাজের কামাই নাই।
শুক্রা সপ্তমী। চাঁদের আলোয় খরা-ভীত কিষাণেরা বহুক্ষণ মাঠ শুল্জার করিয়া রাখিবে
আজ।

অবাক হইয়া চারিদিকে তাকায় আমজাদ। মাটের নিবিড়ে সে কোনদিন প্রবেশ-পথ
পায় নাই চেনাশোনা সড়ক ছাড়া। আজ চন্দ্র কাকার সঙ্গে জলা-জাঙালে পথ ভাঙিতে
লাগিল সে।

পটল-বাড়ির মাঝখানে তামাকের গাছ উঠিয়াছে। হাত দুই দীর্ঘ। সাদা ফুল ফুটিয়াছে
তামাক গাছে। আমজাদ সেদিক ঢায় না। পটল ক্ষেত্রের ধারে ধারে লক্ষ গাছ অনেক।
একটা গাছের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

এমন লক্ষ সে আগে দেখে নাই। লাল রঙের লক্ষ আকাশের দিকে পা তুলিয়া
দাঢ়াইয়া রহিয়াছে। তারই মত ডিগবাজী দিতেছে যেন। চন্দ্র আগে-আগে ছিল। পেছনে
তাকায় সে।

আরে আমু চাচা, দেখছ কি?

এগুলো কী লক্ষ, চন্দ্র কাকা?

অবাক হয় কোটাল।

চাবীর ছেলে হয়ে এই লক্ষ চেনে না? সুজজু-মুখী লক্ষ। তুলে নাও কতগুলো।
আমজাদ ইত্তস্তঃ করে। পরের জমি।

চন্দ্র নিজেই কতগুলো লক্ষ আমজাদের হাতে তুলিয়া দিল। নীল পাতা ভেদে
করিয়া লাল রঙের ফুটকী সূর্যমুখী ছাড়া আর অমন কী গাছ আছে? অবাক হইবারই
কথা। আমজাদ লক্ষগুলি লুঙ্গির একদিকে বাঁধিয়া রাখিল। কিন্তু ফসলের উপর হইতে
চোখ সে সহজে ফিরাইতে পারে না। পরদিন মাঠে আসিলে সে এই ক্ষেত্রের কথা
বিস্মৃত হইবে না।

ঝিঙে-বাড়ির চারপাশে চাষীরা বাব্লা কাঁটা দিয়াছে। ইতঃক্ষিণ কাঁটারও অভাব
নাই। আমজাদ চন্দ্ৰ কোটালের পেছনে সন্তুষ্ণে হাঁটিতেছিল। চন্দ্ৰ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াও, আমু।

দুই জনের মধ্যে একফালি জমিৰ ব্যবধান। এখানে তামাকেৰ ক্ষেত্ৰ খুব ঘন। আমজাদ
চন্দ্ৰ কাকার সমগ্ৰ অবয়ব দেখিতে পায় না। কোটালেৰ কথা মত সে থামিয়া দাঁড়াইল।

আমজাদেৰ কানে যায়, চন্দ্ৰ বলিতেছে : জমিটা হারান মাইতিৰ, তাই এত কাঁটা,
যেমনি পঁঢ়ালেৰ লোক। দূৰ কৱে দিতে ইচ্ছা কৱে।

এক মুহূৰ্তে চন্দ্ৰকে আমজাদেৰ পাশে দেখা গেল।

বেশ কৱেছো। তোমাকে আৱ হাঁটতে হবে না।

আমজাদকে আৱ কোন কথা বলিতে দিল না চন্দ্ৰ, তাকে কাঁধে তুলিয়া লইল সটান।

আমজাদ প্ৰথমে অসোয়ান্তি বোধ কৱিতেছিল, এখন ভাল লাগে তার। চন্দ্ৰ কাকাকে
ভয় নাই কিছু। কাঁধে চড়িয়া দূৰেৰ গ্ৰাম আৱ কিবাণ পল্লী অপৱেপ দেখায়।

ক্ষেত্ৰ পাৱ হইবাৰ পৱ বুনোঘাসেৰ পথ। ফড়িং উড়িতেছে চাৰিদিকে। চন্দ্ৰ আন্মনে
চলে। নিৰ্বিকাৰ, নিঃশক্ত। শিসেৰ জোয়াৰ আসে আবাৱ।

আমাৰ মাথাটা আঁকড়ে ধৰিস, বাবা। পড়বাৰ ভয় কৱো না

ইহাৰ পৱ কল্পিত একটা বাঁশি দুই হাতে ধৰিয়া চন্দ্ৰ শিস দিতে লাগিল। আমজাদেৰ
ভয় লাগে। টাল সামলানো দায় তার পক্ষে।

দম ভৱিয়া শিস দেয় চন্দ্ৰ। বোধ হয় গান মিলে ছিল না, তাই মেঠো সঙ্গীতেৰ বেশ
ওঠে না কোথাও।

আমজাদ মীচেৰ দিকে চাহিয়া দেখে বুনো ঘাসেৰ সীমানা আৱ শেষ হয় না। তার
প্রতি চন্দ্ৰ কাকার অনুকম্পাৰ কাৱণ প্ৰথম বুৰিতে পাৱে।

আমজাদ তাদেৰ জমিৰ দিকে চাহিয়া দেখিল, আৰু আৱ চোখে পড়ে না। কতগুলি
ভাল গাছেৰ আড়াল হইয়া গিয়াছে সব। ক্ষীয়মাণ সূৰ্যৱশি চিক্ৰিক্ কৱিতেছে তালেৰ
পাতায়।

চন্দ্ৰেৰ শিস এই মাত্ৰ থামে।

চাচা, কাঁধে চড়ে কষ্ট হচ্ছে না তো?

না।

সংক্ষিণ জবাৰ আমজাদেৰ।

চন্দ্ৰ আবাৰ কল্পিত বাঁশি ঠোটে রাখিয়া আঙুল নাচাইতে নাচাইতে হঠাৎ থামিল।

ঠিক চাচা, কাঁধে ভালই লাগে। দুনিয়াৰ বংই ফিৱে যায়। জমিদাৰ সেজে বসে
থাকো, চাচা।

আমজাদ চন্দ্ৰ কাকার হেঁয়ালি বুৰিতে পাৱে না। উঁচু-নীচু মাটিৰ উপৱ গা ফেলিতেছে
কোটাল। তাই তার ঝাঁকড়া চুল আৱো কষিয়া ধৰে আমজাদ।

ঐ যে আমাৰ কুঁড়ে দেখা যায়।

চকিতে চোখ ফিৱাইল আমজাদ। দুই ছোট নদীৰ মোহনা। নদী নয়, একটু বড়
খাল। আৱো কয়েকটা কুঁড়ে পাশাপাশি। সম্মুখে বড় বালিৰ চাতাল। উঁচু চিবিৰ উপৱ

ঘরগুলি। সম্মুখে যোজন-যোজন অভিসারযাত্রী প্রান্তর। ওয়েসিসের মত চোখে পড়ে মাটির সন্তানদের আবাস-ভূমি।

আমজাদের কৌতুহল বাড়ে। চাতালের উপর কতগুলি ছেলেমেয়ে হল্লা করিতেছে, কয়েকজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ঢিবির উপরে। চন্দ্র কাকা শিশ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেদের ভেতর কলৱ আরো বাড়িয়া যায়।

সাদা চতুরের নিকট আসিয়া চন্দ্র জোর গলায় ডাক দিল— এলোকেশী— এলোকেশী!!

ছেলেদের মাঝখানে চন্দ্র কোটাল। বট্কা স্তুর্তা আসে একবার। চন্দ্র হাঁকে, এলোকেশী!

ভিড়ের ভেতর হইতে একটা ছেলে বলিল, চন্দ্র কাকা আজ আবার মাতাল হয়ে এসেছে।

ঢিবির উপর হইতে একটি মাঝ-বয়সী মেয়ে বাহির হইল। চাষী গেরঙ্গ ঘরের মেয়ে। ইষৎ সূল-তনু। রোগ-শোক-দীর্ঘ মুখ। পরনে যয়লা ন' হাতি কাপড়।

চন্দ্র এইবার সঙ্গীত পরিবেশন করে। ক্রীড়া-রত শিশুদের মধ্যে স্তুর্তা আরো বাড়িয়া যায়। কয়েকজন মুচকি হাসে।

এলোকেশী চন্দ্রের ত্রী। নীচে নামিয়া আসিল।

কাঁধে কার ছেলে গো?

আমার। যাও যাও শিগুণি। মুড়ি-টুড়ি আছে!

আমজাদের পা ও ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়া ছোট শিশু দোলানোর মত চন্দ্র এক ভঙ্গী করিল। একটি শিশ, 'সুইৎ' শব্দে থামার সঙ্গেসঙ্গে মাটির উপর বসিয়া পড়িল আমজাদ। ভিড় জমে চারপাশে। নদীর ওপারের ছেলেরা এইখানে খেলা জমায় প্রতিদিন। জোয়ারে হাঁটুজল হয় না, তাই পারাপারের অসুবিধা নাই।

খোকা, এসো আমার কাছে।

এলোকেশী দুই হাত বাড়াইল।

৩

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল নবমীর।

আমজাদ পিতার অনুসরণ করে। বলদ দু'টি তার আগে। লাঞ্জলের আবছায়া পড়ে মাটির উপর।

পৃথিবী ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইতেছে। মাঠে গ্রাম-ছাড়া হতভাগ্য বহু মানুষ বাস করে; কিন্তু তারা এমন মানুষ, আমজাদ কোন দিন জানিত না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মাতাকে মিশিতে দেয় না। রাখাল ছেলেরা অনেক দূর মাঠে মাঠে গো-চারণে যায়। আমজাদের সে সৌভাগ্য হয় না। অবোধ শিশু-মনের অপূর্ব পুলকের সাড়া পড়ে। চাঁদের আলো আরো উজ্জ্বল হইতেছে। দিগন্তে ঝাপ্সা বননীর রেখা, রবি-ফসলের প্রান্তর স্বপ্নের বার্তা বহিয়া আনে। কিসের স্বপ্ন? আমজাদ হদিস করতে পারে না। মার উপর হঠাৎ বিক্ষেপ জাগে তার। পাড়ার ছেলেরা বদ, তাদের সহ্বৎ (সংসর্গ) ভাল

নয়, তাই দূরে-দূরে থাকিতে হয় তাকে। মখ্তবের পর মার কাছে হাজিরি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

আমজাদের মনে পড়িল এলোকেশীর কথা, চন্দ্র কাকার কথা। আর এক জগতের মানুষ তারা। তাদের ঘর-দোর, খাওয়া-পরা, চাল-চলন অনেকখানি সে দেখিয়া আসিয়াছে অল্প সময়ের মধ্যে।

এলোকেশী মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল, খোকা, এমন অদিনে এলে! ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কি আছে, বাবা!

আমজাদ মুড়ি খাইতেছিল। চন্দ্র কাকার মেয়ে ধীরা সমুখে দাওয়ায় দাঁড়াইয়া তার খাওয়া দেখিতেছিল। ধীরার চোখে দুনিয়ার বিস্ময়।

গরীব চাচা, ঘরে কিছু নেই আয়। মার কাছে বদনাম করো না।

চন্দ্র কাকা হাসে আর কথা বলে। চোখ পিটপাট করিয়া পা নাচাইতেছিল সে। লাজুক আমজাদ মাথা নীচু করিয়া মুড়ি ঠোটে তুলিতেছিল।

ঝায়েদের বাড়ির ছেলে না?

এলোকেশীর জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ। আমার বাড়িরই ছেলে বলতে দোষ কী?

দোষ আর কী!

এই বৎশের কত গল্প যে শুনেছি ঠাকুরমার কাছে? কি হলো কলিকালে।

আমজাদ এলোকেশীর চোখের দিকে চায়। শোছে ধরা পড়ে, দৃষ্টি নামিয়া আসে সেই জন্য।

আর নৃতন ঝায়েদের কাহিনী শোনতি?

মহেশডাঙ্গা বর্তমানে দুই জমিদারের অধীন। ছ'আনি আর দশ আনি জমিদার। ছয় আনার মালিক হাতেম বখ্শ ঝা। দশ-আনির অধিকারী রোহিনী চৌধুরী। মালিকেরা সংখ্যায় তিন-চারিটি পরিবার। একটি নৃতন পাড়ার পতন করিয়াছে ইহারা। গ্রামের লোকের কাছে তারা নৃতন-ঝা নামে বিদিত।

আরে দূর ছাই। কিসে আর কিসে। রহিম ঝায়ের বাবাকে কে না জানত? সুদখোর। সুদের পয়সায় জমিদার—।

চন্দ্র কোটাল বাধা দিয়াছিল এই সময়: তোমরা জান না, গরুর গায়ে ঘা হলে ন'টা সুদখোরের নাম লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। পোকা পড়ে যায়। আগে পেরতম নাম লিখত জায়েদ ঝা— রহিমের বাবার। তোমাদের গরু ক'টা ঠিক আছে তো চাচা?

সংলাপের শুঙ্গন ওঠে আমজাদের চারপাশে। চন্দ্র কাকার হাসির মাদকতা বাতাসে ভাসিয়া আসে।

আজকের পথ-চলা বড় আনন্দদায়ক। থাক তরমুজের বোঝা। তবু। বড় তরমুজ আমজাদের পক্ষে বোঝা বিশেষ। বারবার ফেরী করিতেছিল সে। পিতার পদক্ষেপ দ্রুত নয়, এইটুকু যা সুবিধা।

আমজাদ শেষে মাথায় তুলিল তরমুজটি।

একফালি মেঘ পাতলা আবরণে হঠাৎ চাঁদের মুখ ঢাকিয়া দিল। প্রান্তরের উপর ঈষৎ

মনিমা । মাকড়া অঙ্ককার জমিয়া ওঠে সড়কের উপর ।

আজহার খাঁ আজ খুব ক্লান্ত । চন্দ্র কোটাল আমজাদকে সন্ধ্যার আগে পৌছাইয়া দেয় নাই । অপেক্ষা করিয়াছিল কিছুক্ষণ আজহার খাঁ । খামাখা বসিয়া থাকা আর তামাক ধ্বংস করা তার ধাতে পোষায় না । তাই সে আবার কাজে লাগিয়াছিল । জমির টুকিটাকি কাজে অনেকক্ষণ কাটিয়াছে । তারপর আসিল চন্দ্র আর আমজাদ । সুতৰাং আরো বিলম্ব হইয়াছিল । চন্দ্র কোটাল কত কথাই না বলে । নেশা কাটিয়া গিয়াছে তার । সুখ-দুঃখের কথায় রাত্রি বাড়ে । জ্যোৎস্না রাত্রি, আজহার খাঁর কোন তাড়া ছিল না । চন্দ্র আজ আর বাড়ি ফিরিবে না । তরমুজ ক্ষেত পাহারায় তার রাত্রি কাবার হইয়া যাইবে ।

ছেলেটাকে আবার মাঠে এনো, আজহার ভাই ।

শিস্ত দিতে দিতে মাঠে নামিয়াছিল চন্দ্র । তার অপরূপ চলার দুলকি ভঙ্গী আমজাদের সামনে স্পষ্ট । পিতার উপর আবদারের জোরটা এবার বিফলে যাইবে না, কোটাল কাকার মত মুরব্বী রহিয়াছে যখন ।

আবার চাঁদের মুখ দেখা যায় । মেঘেদের নেকাব খুলিয়া গিয়াছে । সড়কের উপর উজ্জ্বল দিনের আলো ঝরে যেন । আমজাদ গ্রামের প্রবেশ-পথে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল । দিগন্তের মেঘলা আলো অঙ্ককার প্রান্তরের বিবাণী সীমানা আঁকিয়া দিতেছে । রবিফসলের ক্ষেতের উপর বহু বাঁশ-ডগালির ছায়া উঠানো । পেচকের দল ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার উপর বসিতেছে । জ্যোৎস্নার আলোয় মেঠো ইঁদুরশিকার দেখা যাইত । আর একটা কৌতুহলের উকি আমজাদের মনে । দিনের আলোয় অক্ষ পেঁচা ইঁদুরের মত চতুর প্রাণী শিকার করিতে পারে, তার বিশ্বাস হয় না । চন্দ্র কাকার কাছে সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে ।

অবোধ বালকের পশ্চাতে প্রান্তরের ইশ্বরা মাথা কুটিতে থাকে । গ্রামের সরু সড়ক । আশেপাশে প্রতিবেশীদের ঘর । জনপদের জীবনে এখনও কোলাহল থামে নাই । প্রথমেই পড়ে নৃতন খায়েদের পাকা দহলিজ । ছেলেরা হল্লা করিয়া পড়িতেছে । জমিদারী সেরেন্টার কারখানায় নায়েব পাইকেরা কোন মন্ত্রণায় মাতিয়াছে । মহবুব মির্ধার মুদিখানায় এখনও খরিদ্দার আছে । টিমটিম আলো জুলিতেছে । মহবুব বসিয়া আছে একটা চৌকির উপর দাঁড়ি-পাল্লা হাতে । সন্ধ্যার পর গ্রামের চাষী-মজুরদের সওদা আরম্ভ হয় । এক পয়সার তেল, আধ পয়সার লঙ্ঘা, সিকি পয়সার নুন । ছোট মুদিখানা, তার খরিদ্দারগণের চাহিদাও অল্প । দিনের বেলা ফুরসৎ থাকে না কারো । অবেলা সন্ধ্যায় সওদা শুরু হয় । মহবুবের মুদিখানায় এখনও আলো জুলিতেছে, তা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ।

আজহার খাঁ লাঙ্গল মাটির উপর নামাইয়া রাখিল ।

ঝিরবির বাতাস দিতেছিল । সে মাটির উপর বসিয়া গামছা দোলাইতে লাগিল । আজহার খাঁ রীতিমত ঘামিতেছে ।

হাউ ।

বলদ দুঁটি অগ্সর হইতেছিল । আজহার খাঁর ডাকে থাম্কিয়া দাঁড়াইল ।

বাবা আমু, তরমুজটা রাখ । একবার দোকানে যা ।

আমজাদ পিতার আদেশমত তরমুজ সাবধানে মাটির উপর রাখিল, হাত ফসকাইলে

চৌচির হইয়া যাইবে ।

এই নে বাবা, দুটো পয়সা । আমি একটু জিরোই । লাঙলটা দিন দিন ভারী হয়ে যাচ্ছে ।

কি আনবো, আবো ।

দুটো পয়সা । দেড় পয়সার বিড়ি আর আধ পয়সার দেশলাই ।

তারপর একটি খালি দেশলাইয়ের খোল আজহার লুঙ্গির ট্যাক হইতে বাহির করিল ।

এই নে খোলটা । গোটা কুড়ি কাঠি দেবে । গুণে নিস্, বাবা । পয়সা হাতে লইয়া আমজাদ ইতস্তত করে ।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

আমি যাব না আবো ।

কেন?

আধ পয়সার দেশলাই, লজ্জা লাগে ।

হঠাতে ক্লান্তি-জনিত বিরক্তি বোধ করে আজহার থাঁ ।

এই জন্য মনে করি আর মখ্তবে পাঠাব না তোকে । গরীবের ছেলে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মিশে মেজাজ এমনি হয়ে যায় ।

আমজাদ দোকানে এক পয়সার লজেঞ্জুস কি কড়ি-বিস্তুট কিনিতে আসে । গেরস্তালির সওদা কোন দিন করে না । প্রথম দিনের কর্তব্য বেঝি ঠেকে তার কাছে ।

যা ।

মোলায়েম নয় কষ্টস্বর আজহার থাঁর । যাইয়েমন পয়সা তেমন কেনে, লজ্জা কিসের?

পিতার শেষ বাক্য আমজাদের কানে প্রবেশ-পথ পায় না, সে দোকানের দিকে অগ্রসর হইল ।

বলদ দুটি সম্মুখে । লেজ দেলাইয়া মশা তাঢ়াইতেছে । আজহার থো আর একবার হাঁকিল, হাউ ।

ফিরিয়া আসিল আমজাদ । কাঁচ-মাচ মুখ ।

আবো, দেশলাই ফুরিয়ে গেছে । মোটে দশটা কাঠি আছে । আর সিকি পয়সার নুন দেবে, দোকানী বললে ।

যা, তাই নিয়ে আয় ।

এইখানে কাঠা-দুই ফাঁকা খামার । চারপাশে পাড়ার গাছপালা । বাতাস আসে না বেশি । আজহার থো প্রতীক্ষা করে ।

এই নাও, আবো ।

আজহার থো কাঠি গণিয়া দেখিল । নুনের প্যাকেট, দেশলাই, বিড়ি গামছার খুঁটে বাঁধিয়া বলিল, চল বাবা ।

তরমুজ যেন ভারী হইয়াছে দশগুণ । আমজাদের মনে বিশ্বাদ জমিয়া উঠে । মাঠে বিচরণের আনন্দ উবিয়া গিয়াছে তার । পিতার দিকে চাহিয়া তার নিঃশ্বাস বক্ষ হইয়া আসে । দুটি বলদের সঙ্গে আর একটি পশু যেন হাঁটিতেছে লাঙল কাঁধে । ঘৃণার সর্পিণীরা তুঙ্কশ্বাস ফেলিতেছে কঢ়ি বুকের ভেতরে ।

মুখ ভার করিয়া পিতার পেছনে পেছনে চলে আমজাদ ।

খায়েদের সড়ক আরো সঙ্কীর্ণ । দু'পাশে বেত আর হেলঝা ঘোপ ঘন । চাঁদের আলো
গাছের ফাঁক দিয়া সন্তর্পণে মাটির উপর নামে । ভালবস্পে সড়ক দেখা যায় না । লাঞ্জের
ফলক পাছে লতায় জড়ইয়া যায়, আজহার খা পদক্ষেপ তাই আরো শুথ করে ।

বাবা, আমু, আমার ঠিক পেছনে আয় ।

আমজাদ বাবার কর্তৃত্ব চেনে । আশঙ্কা স্বেহ-বাংসল্য রসের প্রস্রবণরপে জ্যোৎস্নার
মতই ঝরিতেছে যেন ।

আমজাদ ভয় পায় । পিতার নিকটে আসিয়া সে সোয়ান্তি অনুভব করে । বুক হালকা
হইয়া যায় ।

আমু ।

আবো ।

রাগ করেছিস আমার উপর?

আমজাদ হঠাতে জবাব দিতে পারে না । পিতা কী তার মনের গতিবিধি বোবে?
না, আবো ।

লাঞ্জের ফলা হেলঝা-লতায় জড়ইয়া গিয়াছিল । আজহারকে দাঁড়াইতে হয় ।

এক হাতে লতাটা সরিয়ে দাও, বাবা ।

আমজাদ অতিকষ্টে লতা-মুক্ত করিল ফলাটি । আবো সাবধানে পা ফেলে আজহার
কুণ্ডিত চাঁদের মুখ । বন-রাজ্য ভেদ করিয়া স্পষ্ট আলো এদিকে আসে না ।

আজহার খা বলে, গরীব ব'লে, মন খারাপ করতে নেই । সব আল্পার ইচ্ছা । না হলে
খোদা নারাজ হন ।

আমজাদ কোন জবাব দিল না । সে তখু শোনে ।

বিলীস্বর বিজন গ্রাম-ভূমির উপর প্রহর-কীর্তন করিতেছে । বড় বকুল গাছে চাঁদের
আলোয় হনুমান-দল এখনও জাগিয়া রহিয়াছে । ছানাঙ্গলোর কিচ্কিচ শব্দ শোনা যায় ।
লাকালাফির হট্টরোল উঠে বকুল-ডালে ।

এই পথে একা-একা চলা আমজাদের সাহসে কুলায় না । পীরের মাজার রহিয়াছে
বকুলতলায় । গাঁয়ের শোকেরা প্রতি জুম্বার রাত্রে মানৎ শেখ করিয়া যায় । আজদাহা
সাপের পিঠে আরোহণ করিয়া দরবেশ সাহেব গভীর রাত্রে গ্রাম-ভূমণে বাহির হন । বড়
মেহেরবান পরলোকগত এই দরবেশ, শাহ কেরমান খোরাসানী । সকলের দৃঢ়ব্যের পশরা
তিনি একাকী বহিয়া বেড়ান । সামান্য অসুখ-বিসুখে পীরের মাজার একমাত্র আশ্রয় ।

কুড়িহাত বেড় মোটা বকুলের গুঁড়ির দিকে চোখ পলক মাত্র নিবন্ধ করার সাহস হইল
না আমজাদের ।

গুঁড়ির উপরে মোটা দু'টি ডাল । তার মাঝখানে একটি বিরাট গহ্বর । আজদাহা সাপ
এইখানে বাস করে । মাঝে মাঝে দিনে বাহির হয় । কিন্তু কাউকে কিছু বলে না ।

কিংবদন্তীর অন্ত নাই । কত কাহিনী না দরিয়াবিবির কাছে আমজাদ শুনিয়াছে । গা
ছমছম করে তার ।

জাগ্রত দরবেশ । গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মানত করে এই মাজারে ।

টুপ্টাপ পাকা বকুল ফুল পড়িতেছে। আমজাদ এই শব্দ চেনে। কাল খুব ভোরে বকুল কৃড়াইতে আসিবে সে।

পড়ো ভিটে সম্মুখে। বর্ষাস্নাত ঘরের দেওয়াল এখনও খাড়া রহিয়াছে। আলো-অঙ্কারে বিজন, বেত আর বনতুলসীর বোপে ভয়াবহ, প্রতিবেশীদের আভাসভূমি মহাকালের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আর সামান্য পথ। এই সড়কটুকু শেষ হইলে দহলিজে পৌছাইবার রাস্তা।

আমজাদের মন আনন্দে নাটিয়া উঠে। শাদা-কালো রেখাসমন্বিত তরমুজের দিকে সে বারবার চায়। মা আজ খুব খুশি হইবেন। গুমোট মনের আবহাওয়া এতক্ষণে কাটিয়া যায়।

নবমীর চাঁদ পক্ষিম গগনের সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে দিক মেঘলার দিকে অবতরণ করিতেছে। আকাশের এই কোণটা শাদা মেঘের আলিঙ্গনে দিয়ীর মত মনে হয়।

দহলিজের সড়কে আসিয়া আমজাদ আর পিতার পেছনে পড়িয়া থাকে না। পাশ কটাইয়া অঞ্চলৰ্ত্তা হইল সে। এইসব জায়গা তার মুখস্থ। বন-জুয়ানের ছোট তরুণতা কেখায় ফুটিয়া আছে, তাও সে চোখ বুকিয়া বলিতে পারে।

দহলিজের প্রাঙ্গণে আসিয়া আমজাদের ভয় লাগে। একটা ছায়ামূর্তি যেন সরিয়া গেল তার সম্মুখ হইতে।

বাবার কাছে কোন আভাস দিল না সে। একবার মাত্র থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার পচাসৰ্ত্তা আমজাদ।

আজহার খাঁর দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে। পুত্রের গতিবিধি সে লক্ষ্য করে নাই।

একটু দাঁড়া, আমু। লাঙল আর বলছ-দুটো নিয়ে যা দেখি।

আমজাদ তরমুজ দহলিজের দাঁড়ায় অনিছ্ছা সন্ত্রেও রাখিল। বাবাকে ভয় করে সে। নচেৎ ঘরে ঢুকিয়া মাকে অবাক করিয়া দেওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর বড় তরমুজ কে কবে আনিয়াছে এই সংসারে?

খড়ো দহলিজ। এক পাশে মাচাণে বর্ষার সময় খড় তুলিয়া রাখা হয়। লাঙল, কোদাল, চাষের যত্নপাতি থাকে এক কোণে। কোন মেহমান আসিলে বাকি দুই কোণ দখল করে।

আজহার খী লাঙল কোণে দাঁড় করাইয়া ফিরিতেছে। তাহার মনে হইল কে যেন দহলিজের কোণ হইতে পূর্বদিকে চলিয়া গেল একদম দাওয়ার পাশে।

কে গো!

কোন জবাব আসে না, ছায়া-মূর্তি অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া রাহিল।

কে গো!

আমজাদ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, ভয় পায় সে। জীন আসিয়াছে দহলিজে! মার কাছে জীনের গল্প শুনিয়াছে সে। দহলিজে কোরান শরীফ আছে একখানি। রাত্রে তাহারা নাকি কোরান মজীদ পড়িতে আসে।

আজহার খী ছেলেদের নিকট এই গল্প করিলে খুব চটিয়া যায়। তারও মনে খট্কা লাগিয়াছিল।

জোরেই হাঁকিল সে, কে গো?

দাওয়া হইতে সে প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িল পাঁচন-বাড়ি হাতে ।

ছায়া-মূর্তি এবাব ফেঁপাইয়া কান্দিতেছে ।

আজহার আমজাদকে ডাকে : এখানে আয়, আমু ।

কে গো ?

উলঙ্গ একটা ছোট মেয়ে । আবছা আলোয় আজহার চিনিল, তারই মেয়ে নইমা ।
নমু, তুই এখানে ?

কোন জবাব দিল না সে । তার ফোপানি কান্না বাড়িয়া যায় ।

এত রাত্রে তুই এখানে ?

আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথা ?

দহলিজে আজহার খাঁ সোরগোল তোলে । অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল
দরিয়াবিবি ।

এত গোলমাল কিসের ?

আজহার খাঁ স্তৰীর সম্মুখীন হইয়া বলে, দুধের মেয়েটা এই রাত্রে অঙ্ককারে— কোন
খোঁজ রাখা দরকার মনে করো না ?

খুব দরকার ! মনে করেছে ।

দরিয়াবিবি এবাব নইমার দিকে ঢড় তুলিয়া অগ্রসর হয় ।

দাঁড়া হারামজাদী ।

তিনি বছরের মেয়ের মুখে 'রা' নেই । কলহেন্ট্রু স্তৰীর সম্মুখে দাঁড়াইল আজহার খাঁ ।

কি হয়েছে, খুলেই বল না ।

এত বড় ধাড়ি মেয়ে, ফালি-কাপড়টা হারিয়ে এল ।

আজহার জিজ্ঞাসা করে, কোন ফালি-কাপড়টা ?

সেদিন যেটা গঞ্জ থেকে কিম্বে আনলে ।

ইশ্ল ! আজহার অস্কুট শব্দ করে ।

আর এমন হাবার ঘরের হাবা, কি করে হারাল বলতে পারে না ।

আজহার কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে ।

তার জন্যে খুব মার মেরেছ বুঝি ?

দরিয়াবিবি বাঙ্কার তোলে : আমি জানি, আমার হাত জানে আর জানে ওর পিঠ ।

আজহার নইমাকে কাছে টানিয়া পিঠের উপর হাত বুলাইতে লাগিল ।

করেছ কি ? এত দাগ !

মারবে না । সংসার নিয়ে 'আমি বুঝি অভাবের তাড়না । আর ওরা শুন্দি আমাকে
জুলাবে ।

আজহার খাঁর রাগ বাড়ে প্রতিবেশীদের উপর ।

এমন চোরের পাড়া । হয়ত ছোট মেয়ে সব সময় কাপড় পরে না । কোথাও ফেলেছিল,
ব্যস আর কী-চোর ত সব ।

দরিয়াবিবি যোগ দিল : সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি । কারো মুখে 'না' ছাড়া 'হা' শব্দ
নেই ।

যাক, আর উপায় কি। নঙ্গিমাকে কোলে নাও।
আজহার বাথানে বাঁধিয়া বলদ দুঁটিকে কয়েক আঁটি খড় দিল।
নঙ্গিমা পিতার সঙ্গ ছাড়ে না। দরিয়াবিবি তাকে কোলে তুলিয়া লওয়া মাত্র সে ফোপাইয়া
কান্না জুড়িল। মা মেয়ের মুখে চুম্বন করিয়া বলিল, কে ফালিটা নিল, মা?

নঙ্গিমা কাঁদে শুধু।

ঘরে চলো। আর দাঁড়িয়ে লাভ কি। আমি মুখ-হাত ধূয়ে আসি।

আমজাদ তরমুজ হাতে মা'র সঙ্গে চলে। এতক্ষণ সে ক্যারো চোখে পড়ে নাই, বড়
দুঃখ তার। গর্বের আনন্দ মাঝে মাঠে মারা গেল।

ঘরে চুকিয়া আমজাদ মা'র সম্মুখে তরমুজ রাখিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত ধীরে ধীরে
বলিল, মা তরমুজ।

দরিয়াবিবির চোখেমুখে হাসির ঝিলিক খেলিয়া যায়।

আরে আমু-চাচা, কে দিল রে এত বড় তরমুজ?

উই মাঠের চন্দ্র কাকা।

বেশ পাকা তরমুজ ত। দরিয়াবিবি আমজাদের দিকে চাহিয়া হাসে।

এতক্ষণে ভাল লাগে আমজাদের সব কিছু।

দরিয়াবিবি নঙ্গিমাকে বলিল, ঐ দ্যাখ, কাল তরমুজ খাবি। কয়েকটি টোকা মারিল
দরিয়াবিবি তরমুজের উপর।

খুব খারাপ নয়, বাবা। দু'দিন ঘরে রাখতে হবে।

নঙ্গিমার মুখেও হাসি ফোটে।

মা, আমি খা-আ-বো।

হ্যাঁ, তুমিও খাবে।

পা মেলিয়া দরিয়াবিবি মাদুরের উপর বসিয়া আমজাদকে সে তারই পাশে উপবেশন
করিতে বলিল। আমজাদ মাঠের কাহিনী বর্ণনা করে মা'র নিকট।

কিন্তু মাঠে এত দেরী ভাল নয়। তোমার পড়া হলো না কিছুই। আজ একটু পড়ে
নাও।

দরিয়াবিবি মাটির ডিপা আর করঞ্জ তেল আনিল। কেরোসিন সব সময় কেনার
পয়সা থাকে না। দরিয়াবিবি খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জ ফল কুড়াইয়া আনে। তাই কলুর
ঘানি হইতে তেল হইয়া ফেরে।

পড়ে নাও, বাবা। তোরা সকালে যাস্য খেজুর পাড়তে, বকুল কুড়াতে। চাষ্টি করঞ্জা
কুড়িয়া আনতে পারিস না?

নঙ্গিমা বছ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সে।

আজ মার খেয়ে পেট ভরল। আর রাত্রে খাবে, ওর যা ঘূম।

আমজাদের ভাল লাগে না এত রাত্রে পড়া। মা'র সামনে কোন অভিযোগ চলে না।
চিম্টিয়ে ডিপার আলোয় সে পড়িতে বসিল। দরিয়াবিবি গৃহস্থালির কাজে উঠিয়া গেল।

পাড়ার আরো কয়েকজনের কাপড় চুরি গিয়াছিল। কেবল ছেলেদের কাপড় চুরি
যায়। দরিয়াবিবির বড় লাগিয়াছে আজ। মাত্র বার গুণার পয়সার জিনিস। তার বছ

পরিশ্রমের ফল, উপলক্ষি করে সে ।

দরিয়াবিবি সহজে দাগটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না ।

নৈশ-ভোজনের পর আজহার গুড়ক ফুকিতেছিল দাওয়ায় বসিয়া ।

আমজাদ একপাশে নিজের কলনা লইয়া ব্যস্ত । শিমুল তুলার দানা বাছাই করে দরিয়াবিবি ।

দ্যাখো, এমন সব চোর, খালি ছেলেদের কাপড় চুরি করবে ।

আর কার কাপড় চুরি হয়েছে?

প্রশ্ন-কর্তা আজহার ।

মতির ছেলের ধূতি, সাকেরের মেয়ের ছোট শাড়ি, আরো অনেকের ।

এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িল আজহার খী ।

একদম ছেটলোক ইতরের পাড়া হয়ে যাচ্ছে । খীয়েদের নাম-ইজ্জৎ আর থাকবে না ।

দরিয়াবিবি ইষৎ ঠোঁট বাঁকায় । আজহার তা লক্ষ্য করে না ।

আজহার বলিতে থাকে, হাল-ফিল যারা পয়সাওয়ালা তাদের চাল-চলন আর বনেদী-বৎশের চাল-চলন দ্যাখো ।

দরিয়াবিবি স্বামীকে আজ চটাইতে রাজি নয় । সে পাঁজ করিয়া তুলা একটি কুলোর উপর রাখিতেছিল ।

থাকবে কি করে বৎশের ইজ্জত, গরীব যে স্বাই ।

দরিয়াবিবি হঠাৎ যেন কথাটি ঝুঁড়িয়া ফেলয়াছে এমন ভাব করে মুখের ।

খালি পয়সা থাকলেই বৎশের ইজ্জত থাকে না । মহেশডাঙ্গার খীয়েদের নাম এখনও দশ-বিশ বানা গাঁয়ে পাওয়া যায় ।

তা পাওয়া যায় ।

দরিয়াবিবি সায় দিল ।

কিঞ্চ পয়সা না থাকলে ইজ্জতও আন্তে আন্তে সরে পড়ে ।

এবার চৃপ করে আজহার খী ।

স্বামীর আচমকা নীরবতা দরিয়াবিবি পছন্দ করে না । কথার সূত্র সে অন্য টানা-পোড়েনের মধ্যে রাখে ।

কাপড়-চোর আমার হাতেই ধরা পড়বে, দেখো ।

কত কষ্টে কাপড় কেনা, আর চোর শয়তানেরা এমন দাগাবাজি করবে!

দরিয়াবিবি ডাকিল, আমু ।

কি মা?

দেখো কাপড়-চোপড় হারিয়ো না, বাবা ।

না মা ।

আমজাদ শিমুল-তুলার ছিন অংশ বাতাসে ঝুঁ দিয়া উড়াইতেছিল ।

না মা, আমার কাপড় হারায় না ।

আসেক্জান বেলাবেলি ঘরে ঢোকে । আজ তার ব্যতিক্রম হয় নাই । কানে সে কম

শোনে। মাঝে মাঝে পরের কথা সে এমনভাবে বুঝিতে পারে, মনে হয় না সে বধির। অনেকের কাছে বৃড়ি তাই সেয়ান-কালা নামে পরিচিত।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন তার কানে গিয়াছিল। ভরা সাঁওয়ে বিছানায় আশ্রয় লইলেও বৃড়ির ঘূম হয় না। চোখ বুজিয়া রোম্বনরত গাভীর মত অতীত-জীবনের জট খোলে সে। তোর রাত্রির দিকে আসেক্জান কয়েক দণ্ড ঘূমায় মাত্র।

হঠাতে আসেক্জান বাহিরে আসিল। দাওয়ার উপর খালাকে দেখিয়া আজহার জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো, খালা?

বৃদ্ধা খালার উপর আজহারের মমতা বেশি। শুধু একটা ঘর দখল করিয়া আছে, নচেৎ কি আর এমন খবরদারী করে সে। তারই সংসার অচল হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে।

এই এলাম, বাবা। বলিয়া আসেক্জান দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল।

তারপর কথা পাড়ে আসেক্জান।

তোমাদের সংসার কি ছিল সাবেকী আমলে! না-হলে আমার এত কষ্ট! দরিয়া-বৌ ত সংসার চালাচ্ছে। লক্ষ্মী মেয়ে।

যার উদ্দেশ্যে প্রশংসা বর্ষিত হইতেছিল, সে একবার জুক্ষেপণ করিল না।

তোমাদের কষ্ট আমি নিজের চোখে দেখছি।

দরিয়াবিবি তুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এইবার। স্বামী-স্ত্রী সংসার লইয়া হাজার মন্তব্য করে। কিন্তু অপর কেউ সংসারের বে-আক্রম এলাকা লইয়া আলোচনা করুক, দরিয়াবিবি তা আদৌ পছন্দ করে না।

আসেক্জানের বক্তব্য শেষ হয় নাই। সে পুনরায় বলে : আজকাল দীন-ইমানও ঠিক নেই। দীন-দুঃখীদের দিকে কেউ চায় না।

বৌমা।

দরিয়াবিবির জবাব সংক্ষিপ্ত কী ?

তোমার কাপড়ের টানাটানি। দুটো কাপড় পেয়েছিলাম।

আসেক্জান তারপর আঁচল-চাকা দুটো কাপড় বাহির করিয়া বলিল, দুটো কাপড় তুমই পর। আমার যা আছে চলে যাবে।

দরিয়াবিবির কর্তৃত্ব চাঁচাহোলা : কোথা থেকে পেলে শুনি?

ও পাঢ়ার ইজাদ চৌধুরীর মা ইন্তেকাল করেছিল, কাল মিশকীন খাওয়ালে আর কাপড় জাকাত দিলে।

জাকাত-জাকাত! দরিয়াবিবি হঠাতে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। দাঁত চাপিয়া সে আবার উচ্চারণ করিল, জাকাত!

জাকাত! আমি নেব জাকাতের কাপড়? আমার স্বামী বেঁচে নেই? ছেলে নেই? মুখে তোমার আটকালো না?

লাথি দিয়া এক জোড়া কাপড় দরিয়াবিবি দাওয়ার নীচে ফেলিয়া দিল।

আজহার হঠাতে ব্যাপারটা উপলব্ধি করিতে পারে না। কাপড় দুটো দাওয়ার নীচ হইতে সে কুড়াইয়া আনিল।

খবরদার! এমন কথা মুখে আনবে না। বের করে দেব আমার ঘর থেকে। তোমার

জাকাতের মাথায় সাত পয়ঃজ্বার ।

ধর্মভীরু আজহার থা এমন কটুবাক্য পছন্দ করে না ।

দরিয়া-বৌদি, ক্ষেপে গেলে নাকি! এসব কী বকচো?

চুপ করো । যারা জাকাত নেয় তারা আর মানুষ থাকে না । জানোয়ার হই নি এখনও ।
আম্বা আমার হাত-পা দিয়েছে । মড়ার পেটের জন্যে হাত পাবে না কোনদিন ।

নিরীহ আজহারও বেশ চটিয়া যায় ।

কাল থেকে তা হলে লাঙল ধরো মাঠে ।

দরকার হলে তাও ধরব ।

আজহার থা চুপ করিয়া গেল । দরিয়াবিবি সমস্ত সংসার ঠিক রাখিয়াছে । অনিপুণ
গৃহিণী ঘরে থাকিলে সে সংসার ছাড়িয়া দরবেশ হইয়া যাইত এতদিন ।

তোমাকে তাল মুখে বলছি, খালা এসব কথা কোনদিন মুখে এনো না । আমরাও
গরীব । দুঃমুঠো যা-হোক করে চলে যাচ্ছে ।

তোমার দরকার নেই? জানো না, তোমার জাকাতের চাল আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নিই!

আসেকজান শুন্দ হইয়া গিয়াছে পাষাণ-মূর্তির মত । ধূলা-লাগা কাপড় দুটো বুকে
করিয়া সে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে ঘরে তুকিয়া পড়িল ।

আমজাদের হাই উঠিতেছিল । সে ঘুমাইতে চায় ।

হাতের তুলায় দ্রুত পাঁজ দিয়া দরিয়াবিবি বলিল, ও ঘরে শুতে যাস নি । আমার
কাছে শো ।

আমজাদ আর পা বাড়াইল না । আজহার থা চুপচাপ বসিয়া রহিল । অক্ষমাং দম্কা
বড় বহিয়া গিয়াছে যেন দাওয়ার উপর ।

মাঝরাত্রে দরিয়াবিবির ঘুম আভিয়াছিল । তার পাশে আমজাদ নাই । শয়া শূন্য ।
কোথায় গেল আমজাদ?

ডিপা জালিয়া সে আসেক্জানের ঘরে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল । আমজাদ তার
পরিচিত জায়গায় মাদুরের উপর অঘোরে ঘুমাইতেছে । আর আসেক্জান উরু হইয়া বসিয়া
গিয়াছে । হাঁটুর উপরে অবনত মুখ । শনের মত শাদা চুল সম্মুখে-পেছনে লুটাইয়া পড়িয়াছে ।
ফেঁপানির শব্দ উঠিল । কাঁদিতেছে বৃদ্ধা আসেক্জান? দরিয়াবিবি সেই দিকে চাহিয়া
রহিল । দারিদ্র্যের নারী-প্রতীক যেন ওই গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছে । আদ্বার সবচেয়ে
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জীবন । এই তার পরিণতি! দরিয়াবিবি অসোয়ান্তি অনুভব করে ।
দারিদ্র্যের দাবানলে সংগ্রাম বিক্ষুক জীবনের সমগ্র ঐশ্বর্যসম্পদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ।
লোল-চর্ম কোটরাগত চক্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মানুষের আস্তার দিকে চাহিয়া আছে মাংস লোভী
কুকুরের মত ।

দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দরিয়াবিবির চোখে যেন এই প্রথম ধরা দিল । সে কেন এখানে
আসিয়াছে স্বর্ণপুরী হইতে নির্বাসিত রাজনন্দিনীর মত? সে কেন এখানে আসিয়াছে?
পোড়া ক্ষতের জালা অনুভব করে সে । তার চোখেও অশ্রুর প্লাবন নামে ।

ফুৎকারে ডিপা নিভাইয়া দরিয়াবিবি অঙ্ককারে আসেক্জানের কাছাকাছি আসিয়া
ডাকিল, খালা!

গোধূলি বেলা ।

উঠানে নঙ্গিমা ছাগলছানা লইয়া খেলা করিতেছিল । আজ বেলাবেলি আজহার মাঠ হইতে ফিরিয়াছে । অবসর সময়টুকু এইখানে কাটে তার । বড় নিঃসঙ্গ আজহার । অন্যান্য প্রতিবেশীদের মত তাস-পাশা খেলিয়া সে সময় অপব্যয় করিতে জানে না । সাংসারিক কথাবার্তা হয় দরিয়াবিবির সঙ্গে । যখন কোন কাজ থাকে না, একমনে সে গুড়ুক ফোকে । আমজাদ দহলিজে থাকিলে কথা বলিবার কোন ছুতা পাওয়া যায় না । নঙ্গিমার সঙ্গে বাক্যালাপের কোন বিষয় নাই ।

ফুটফুটে ছাগলছানা । কালো মিশমিশে গায়ের উপর অন্তমিত সূর্যের লালিমা পড়িতেছে । রঙের পিণ্ড যেন সঞ্চরণশীল । ধাঢ়ী ছাগলটি খড়ের উপর শুইয়া রহিয়াছে । নঙ্গিমা তাই ব্যস্ত ।

আরো চঞ্চল ছানা দু'টি । একবার মা'র কাছে ছুটিয়া যায় । দুধের বাঁট টানে কিয়ৎক্ষণ, তারপর ম্যাঁ-ম্যাঁ শব্দে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায় । পচাতে ছোটে নঙ্গিমা । হয়ত সহজে ধরা দিল না । রাগে সে মা'র কাছে অভিযোগ করে । তখন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় । নঙ্গিমা আনন্দে চাহিয়া একটি ছানার উপর জোরে হাত রাখে । ভীত চীৎকার ক্ষণিক । তারপর আদরে গলিয়া যায় ছাগশাবকরা । নঙ্গিমা ছানা বুকে করিয়া গায়ের উপর নরম হাত বুলাইতে থাকে । ছাগ-মাতা ছুটিয়া আসিলে নঙ্গিমা সরিয়া যায় ।

আজহার ঝাঁ মেয়ের লীলা-চপল ভৱণী দেখে । গুড়ুকের ধোঁয়ায় চোখ ফ্যাকাশে । কোন মন্তব্য তার ঠোঁটে আসে না । দরিয়াবিবি গেরহালির অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ।

একটু পরে আসিল আমজাদ-বৰগলে একগাদা তালপাতা । মৃত্বে হইতে এইমাত্র সে ছুটি পাইয়াছে । দিনের আলোক থাকা পর্যন্ত মৌলবী সাহেব ইলেম-দানে কার্পণ্য করেন না । চপল-মতি বালকেরা এই সময় খুব করিয়া নামতা পড়ে ।

অনেকক্ষণ পূর্বে আসিত আমজাদ । ছুটির পর তালপাতা ধোয়া—আর এক কাজ । রোজ রোজ তালপাতা দণ্ডে হারাইলে মা বড় বিরক্ত হয় । কালির দাগ সহজে ছাড়ে না । ডোবার পানি ভাল নয় । এমনি দেরী হইয়া যায় । শুধু ভয়ে আমজাদ কোন প্রতিবাদ করে না । মৃত্বে যারা কাগজে লেখে তাদের সঙ্গে ইদানীং নিজের তুলনা করিতে শিখিয়াছে আমজাদ ।

মন বিষণ্ণ । তাই উঠানে আসিয়া সে চুপিচুপি আজহার ঝাঁর পাশে বসিয়া পড়ে । মা'র সঙ্গে কোন বাক্যালাপ হইল না । কিন্তু নঙ্গিমার খেলা দেখিয়া সে সব ভুলিয়া যায় । নিজেও এই খেলায় সানন্দে যোগ দিল ।

এইবার ছাগ-শিশুরা ভীত । আমজাদের সঙ্গে দৌড়পাল্লায় তারা অক্ষম । ম্যাঁ ম্যাঁ শব্দ করে শুধু । ভাই-বোনে উঠান মাঁ করিয়া রাখে ।

বোধ হয় ফুরসৎ পাইয়াছিল দরিয়াবিবি । সেও বাতাসে আসিয়া বসিল ।

‘আমু !

কি মা ? জবাব দিল আমজাদ ।

বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিস নি, ন্যাটা হয়ে যাবে বাচ্চা দুটো ।

না মা, আমি ত বেশি ছুইনি ।

নষ্টিমা প্রতিবাদ করে : মা, আমি তো খেলা কচছি ।

হ্যাঁ, খেলা করো ।

সঙ্ক্ষে নামিতেছে ধীরে ধীরে । উঠানে অঙ্ককার ঘন হইয়া আসে । দরিয়াবিবি চুল মেলিয়া দিল বাতাসে । সারাদিনের ক্লান্তি ঘামে আর পরিশ্রমে । হাওয়া লাগুক একটু গায়ে ।

উঠানে অঙ্ককার । নষ্টিমা ও আমজাদের মাহেন্দ্রক্ষণ । এখন ইচ্ছামত বক্রী ছানাকে আদর করা চলে । যতই জোরে পিঠে দমক দাও না কেন, মা'র চোখে পড়িবে না কিছুই । কিন্তু ছানাগুলি যা বজ্জাত ! আদরের নামে একটু জোরে কোথাও টিপ দিলে বড় ম্যাং ম্যাং শব্দ করে । মা'র ধর্মক দিতে তখন বিলম্ব হয় না ।

দরিয়াবিবি বলে, আরে বাবা চৌক্ষপুরুষ, একটু আগে ছুটোছুটি কর ।

মা, ভারী ডরুক ছানা দুটো । কাছে গেলেই ম্যাং ম্যাং ।

ছাগলের ডাক অনুসরণ করিতে লাগিল আমজাদ । অঙ্ককারে আজহার থা নীরবে হাসে । তার অস্তিত্ব সবাই বিস্মৃত হইয়াছে ! ঘরের প্রাণিগুলি ডিপা জুলিতেছিল । অস্পষ্ট আলো উঠানে সামান্য পৌছায় । ছায়া-মূর্তির উপনিবেশ । কেউ কারো মুখ দেখিতে পায় না ।

উঠানের নিচে আগাছার বন । খুব স্ফুরনয় । প্রতিবেশীদের কলাগাছের ঝাড় তারপর কয়েক কাঠা জুড়িয়া । আজহার থা স্বামান্য সরুপথ পৈঠার সাহায্যে অতিক্রম করে । এই দিকে বিশেষ কোন কাজ থাকে না । বর্ষার দিকে কতগুলি ডোবায় রাত্রে মাছ ধরিতে যাওয়ার খুব সুবিধা । সেই জন্য পথটুকু ।

ছাগলছানারা শ্রান্ত । যা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে । দরিয়াবিবি চুপচাপ বসিয়াছিল । আজহার থা নিজেই ডিপা হইতে কয়লা ধরাইয়া আনিল । সে ফরমাশ-করা ভুলিয়া গিয়াছে নাকি ? হাসে দরিয়াবিবি অঙ্ককারে ।

পরক্ষণে বড় বিরক্তি লাগে তার ছেলেদের হল্লা ।

এই, চুপ কর তোরা ।

আমজাদের কোলে একটা ছাগলছানা চীৎকার করিতেছিল । ভয়ে সে বাচ্চা মাটির উপর ফেলিয়া দিল । নৃতন প্রাণ পায় ছাগশাবক, মা'র কাছে এক দৌড়ে ছুটিয়া যায় ।

দরিয়াবিবির পাশে ভাই-বোন শান্ত হইয়া বসে । অঙ্ককার থম্থম্ করে ।

মা কোন কথা বলে না, আমজাদ আরো ভয় পায় । ক্ষুণ্ণ শরে সে ডাকে, মা ।
কি?

মা'র কোলে মাথা রাখিয়া সে উঠানে পা ছড়াইয়া দিল । প্রশ্ন করার কিছুই ছিল না, আমজাদ চুপ করিয়া থাকে ।

উঠানে নিঃস্তরতা ।

পাঁচ মিনিট পরে দরিয়াবিবি আমজাদকে প্রশ্ন করে, ঘুম পায় নি ত?

না, মা।

তোর আকৰাকে ডেকে দেখ ত, জেগে আছে?

ফিস্ফিস্ক কষ্টে কথা বলে সে।

আকৰা! আমজাদ হাঁকে।

কি আকৰা?

জেগে আছো তুমি?

হ্যাঁ।

দরিয়াবিবি পিতা-পুত্রের সংলাপ শোনে।

আর একবার জিজ্ঞেস কর, শিমুলে গিয়াছিল বিকেলে?

শিমুলিয়া গ্রামের নাম।

আকৰা, তুমি শিমুলে গিয়েছিলে বিকেল বেলা?

জবাব দিল আজহার খীঁ, না।

এইবার দরিয়াবিবি সোজাসুজি শামীর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল।

বাচ্চা দুটোর যা হয় করো। পাঠা না হয়ে যায়। খুন্কারদের ডেকে এনো।

পাঠা হবে কেন, ভারী তেজী বাচ্চা।

খবরদার, বেচে ফেলো না যেন মাঠ থেকে। দুঃখ ব্যাপারী তোমার খৌজ করছিল।
না।

আজহার খীঁ কষ্টস্বর উভাপহীন। তামাকের নেশায় থিমোয় সে। নষ্টমা ঘুমে চুলিতেছিল,
দরিয়াবিবির লক্ষ্য পড়িল তার উপর ছাঁগলছানা দুঁটি উঠানে দৌড়াদৌড়ি করে।
আমজাদের লোভ হয়, মা'র ভয়ে স্মেচ্চোরা-চাউনি ছোঁড়ে। আর একটু খেলতে পেতাম,
মা, ভারী বজ্জাত। ঠোঁট বাঁকায় আমজাদ।

উঠানের কিনারায় ছানা দুঁটি কয়েকবার থমকে দাঁড়ায়, কেউ লক্ষ্য করে না।

একটু পরে হঠাতে একটি লাল জন্মের ছায়া পড়ে। এই সময় ম্যাং শদে সকলে চমকিত
হইয়া উঠিল।

হতভুর হইয়া আজহার চীৎকার দিতে থাকে, শেয়াল, শেয়াল। আ-তু, আ-তু।

কুকুর ডাকে সে প্রাণপণে। একটি ছানা ধাঢ়ীর কোলে ফিরিয়া আসিল।

পলকে কি ঘটিয়া গেল, দরিয়াবিবি সহজে উপলক্ষ্মি করিতে পারে না। পাড়ার দুঁটি
কুকুর ছুটিয়া আসিল। কয়েকবার মাটি শৌকার পর তারাও উঠানের নিম্নবর্তী জঙ্গলে
উধাও হইয়া গেল।

শেয়ালে নিয়ে গেল ছানাটা? দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করে।

লাঠি দাও, আমি পুকুর পাড় দেখে আসি।

উঠানে বাঁশের টুকরা পড়িয়াছিল। আজহার অক্ষকারে আড়াল হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে কয়েক ফেঁটা রক্তের দাগ মাত্র। ডিপা আলোয় দরিয়াবিবি বারবার দেখিতে
লাগিল। নষ্টমা, আমজাদ তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বড় বিরক্ত হয় দরিয়াবিবি : সরে যা। হাঁ করে কি দেখছিস্ সব?

তারপর মা খেদোক্তি আরম্ভ করে। শিয়ালের বৎশ উদ্ধার হয় গালিগালাজে। ধাড়ীর পাশে যে ছানাটি ফিরিয়া গিয়াছে সেটা কৃশ। আরো আপ্শোস্ করে দরিয়াবিবি। ভাল খাসী ছানাটাই মড়ার শেয়ালের চোখে পড়ল।

আজহার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পাতি পাতি করে খুঁজেছি। ছোট ছানা। মুখে করে দোড় মেরেছে শেয়াল।

এত কষ্টই সার হলো। আর বছর চার-পাঁচ টাকার মাল হতো। খামখা গতরের মেহনত।

নঙ্গিমা কান্না জুড়িয়া দিল।

দরিয়াবিবি তার দিকে আদৌ ফিরিয়া চাহিল না।

ছেলেগুলোই বদ। রোজ বিকেল-বিকেল তুলে দিই। আজ ভাবলাম। ছেলেরা খেলা করছে, থাক এখন।

আরো কাল্পনিক সন্তাবনার কাহিনী আওড়ায় দরিয়াবিবি। শ্রান্ত আজহার ধোয়া সেবনে বসিয়া পড়ল পুনরায়।

ছোট ছাগল-শিশু। তবু কারো মনে আনন্দ নাই এই পরিবারে। মৈশ-আহারে আরো বিলম্ব হইল। দরিয়াবিবির মেজাজ বড় কড়া। আমজাদ পর্যন্ত খাওয়ার কথা উত্থাপন করিতে শয় পাইল। নঙ্গিমার কপালে রাত্রে ভাত জোটে না প্রায়ই। আজও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

ছাগ-মাতা উঠানে চীৎকার শুরু করিয়াছে।

দরিয়াবিবি খড় খাওয়াইতে লাগিল ছাগটিকে। অনেকক্ষণ আনমনা কাটিয়া যায়।

দরিয়াবিবির মুখ গঁটীর। চোখের পাঞ্জায় ঢাকা অবনত চোখ দৃষ্টির অগোচরে।

আমজাদ মা'র কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। বক্তব্য মুখ হইতে বাহির হয় না। সে-সাহস নাই তার। হাই তুলিয়া সে করুণ চোখে মা'র দিকে চাহিয়া রহিল।

তোর ঘূম পেয়েছে? চল, ভাত দিই।

আজহার খা এই সুযোগে সান্ত্বনা দিল: আল্লার কাছে শোকর, দুটো নিয়ে যায় নি।

দরিয়াবিবি ব্যঙ্গ স্বরে বলে, ওই মুখে ফুল-চন্দন দিতে ইচ্ছে করে। দপ্ত করিয়া নিভিয়া গেল আজহার খা। কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

অপর ছানাটির গায়ে দরিয়াবিবি হাত বুলাইতে লাগিল। কল্পনা রঞ্জিন হইয়া উঠিল তার।

এমন আনমনা বসিয়া থাকা দৃঢ় উপশম্যের ভাল পথ। শুধু আমজাদের জন্য দরিয়াবিবি ছাগল ও ছানা লইয়া বান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

রাত্রে ঘূম আসে না দরিয়াবিবি। সারাদিনের ক্রান্তি, তবু চোখে ঘূম নাই একফোটা। আজহার খুব অল্প সময়ে ঘূমাইয়া পড়ল।

শৃগাল-ভুক্ত ছাগলছানার কথা দরিয়াবিবি সহজে ভুলিতে পারে না। হারাম হইয়া গেল তাহার এত মেহনতের ফল! একটা বক্না গরু দু'বছর টানা হইতেছে। তার বাঞ্ছুরের সঙ্গে কোন দেখা নাই। কোনদিন মাঠ হইতে চুরি হইয়া গেলেই বা কি। কোন চারা আছে তার? আরও আশঙ্কার জাল দরিয়াবিবি নিজেই বোনে। লঙ্ঘণ হইয়া যাইত সংসার, সে-

ও ভাল ছিল। দুঃখের অকূল পাথারে নিমজ্জনের আনন্দ দরিয়াবিবি এই মুহূর্তে অনুভব করে। ঘুমের ঘোরে নঙ্গী হাত-পা ছুড়িতেছে। বাম হাতের কনুই মাঘের বুকের উপর পড়ে। অন্যদিন হইলে সাদরে ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া দিত। আজ দরিয়াবিবি জোরে কঢ়ি কনুই ও-পাশ করিয়া দিল। কারো প্রতি কোন দয়া নাই তার। জানোয়ারের মত ঘুমাইতেছে আজহার। স্বামীর বিছানার আর এক প্রাণে সরিয়া আসিয়াছে দরিয়াবিবি। আনমনা সে নঙ্গীর কনুইয়ে আবার হাত বুলাইতে থাকে। মেঘের ঘূম ভাঙে না।

আমজাদ আসেক্জানের কাছে চলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বড় হয় না কেন গরীবের ছেলেরা? সংসারের দুঃখ ঘুটিবে সত্ত্ব। আমজাদের মৃত্যবের পড়া করে যে শেষ হইবে! শেষ হইলেও তাবনার দায় হইতে রেহাই নাই। কাছে কোন স্কুল নাই। চার মাইল হাঁটিয়া এই দূধের বাচ্চারা ইলেম অর্জন করিবে? নঙ্গী বড় বাড়ন-সার। গরীবের মেঘের পক্ষে যা “বিপজ্জনক। বিবাহের বয়সের আগেই আবার বিবাহের হাস্তাম। দরিয়াবিবি বিভীষিকার পুতুল ভাঙে আর গড়ে।

বাইরে আদিগন্ত অঙ্ককারের নৈরাজ্য।

দরিয়াবিবি একবার বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। আমজাদ ঠিকমত ঘুমাইতেছে কী? আলস্য বশ্যতা মানে না। আবার শুইয়া পড়িল দরিয়াবিবি।

শ্মৃতির রোমছন—আর কোন সান্ত্বনার প্রলাপ নাই অঙ্ককারে।

হঠাৎ প্রথম স্বামীর কথা মনে পড়িল দরিয়াবিবির। শুধু কী প্রথম স্বামীর কথা? মোনাদির—মোনাদিরকে সে ভুলিয়া গিয়াছে? মোনাদির হোসেন খা। স্বামীপুত্রের বড় লম্বাচওড়া নাম রাখিয়াছিল। আকিকার সময় দরিয়াবিবি এই নাম পছন্দ করে নাই। তবুও শেষ পর্যন্ত নামটা বড় ভাল লাগিয়াছিল।

দরিয়াবিবির দীর্ঘ চোখে ফেঁটাফেঁটা অশ্র জমিতে থাকে। মোনাদির চাচার আশ্রয়ে এখনও কি সাদরে প্রতিপালিত হইতেছে? নিজের সত্তান, তবু এতটুকু অধিকার রাহিল না তার।

সঙ্গতিপন্থ কৃষকের পুত্রবধূ। তিনখানা লাঙল চলে। লাখেরাজ জমি অল্প ছিল না। ভাতের অভাব পরিবারে উপলক্ষ করা কারো পক্ষে মুশকিল। একান্নবর্তী সংসারে কাজ সব সময় লাগিয়া থাকিত। সারাদিন পরিশ্রমের পর তবু সেখানে বিশ্রামের আনন্দ ছিল। জোওয়ান স্বামীর মুখ অঙ্ককারে জুলজুল করে দরিয়াবিবির সম্মুখে। সংসার রচনার কত কলনাই না জমা হইয়াছিল বুকে। বর্তমানে ভবিষ্যৎ শুধু অঙ্ককার ছাড়া কিছু চেনে না।

তোমার কোন কষ্ট নেই তো, দরিয়া?

না।

চাষিবাসীর সংসারের ঝঝঝট বেশি।

তা থাক।

খোকাটা বড় ঘুমায় ত, দরিয়া।

কাঁদে ভুক পেলে। ঘুমায় ত বাপের মত। মাথা কুটলেও সাড়া থাকে না।

অঙ্ককারে হাসির ঝন্ধনা বাজিয়াছিল সেদিন।

বড় হোক, ছেলেকে আমি শহরে পাঠাব লেখাপড়া শিখতে। মানুষ হোক, আর কিছু

চাই নে। আল্লার কাছে দিন-রাত দোয়া মাগি।

শহরে কত খরচ!

তা হোক। এখানে বাজে-খরচা সব কমিয়ে দেব।

তিনি বছরের শিশুকে লইয়া এত কল্পনা।

ভাবীদের সঙ্গে তোমার বলে না, এই যা মুশ্কিল।

ওর বড় ছোট-মন। সারাদিন কত কাজ করি, তবু মা'র কাছে গিয়ে লাগাবে, তোমার
বট পটের বিবি হয়ে শয়ে থাকে।

বলুক। তা নিয়ে ঝগড়া ভাল নয়।

স্বামীর কঠ অঙ্ককারে এখনও বাজে। সে-ই শেষ রাত্রি। পরদিন সে গঞ্জে গিয়াছিল।
পথে সর্প-দৎশন। বাড়ি পৌছাইবার পূর্বেই গ্রামের হাটতলায় তার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল।
প্রাণবান স্বামীর মৃত্যু কোন বজ্রাঘাত সূচনা করে নাই। মোনাদির বক্ষে ছিল বলিয়া সব
সহ্য করিতে শিখিয়াছিল দরিয়াবিবি। শুশ্রেণী তথনও জীবিত, তাঁর স্নেহ-ময়তার আশিস
ছিল সান্ত্বনার আর এক দিক। বৃদ্ধ জবেদ হোসেন মোনাদিরকে মাটিতে নামাইতে দিতেন
না। মৃতপুত্রের শোকাগ্নি নিবারণের শেষ উপায়। কিন্তু তিনিও এক তুল করিয়া গিয়াছিলেন
জীবনে। তারই প্রায়চিন্ত দরিয়াবিবি এখনও বহন করিতেছে। শাশ্বতী জীবিত ধাকিলে
কোন বিপত্তি দেখা দিত না। দুই মাসের মধ্যে শুশ্রেণী জবেদ হোসেনের পথ অনুসরণ
করিয়াছিলেন! এক বছর প্রের রুক্ষ শক্ত ভূমিতে দুঁড়াইতে হইয়াছিল দরিয়াবিবিকে।
যৌথ সম্পত্তি বন্টন হইতেছে ভাইয়ে ভাইয়ে। কিন্তু এক কানাকড়িরও অধিকার নাই
তার। স্বামী পিতার কোলে ইত্তেকাল করিয়াছেন। শরিয়ৎ মত শুশ্রেণীর সম্পত্তির উপর
তার বা মোনাদিরের কোন অধিকার নাই। স্বামীর অন্যান্য ভাইদের নিকট দরিয়াবিবি শেষ
আবেদন জানাইয়াছিল, মোনাদিরের ভরণপোষণ কিরণে নির্বাহ হইবে। কর্ণপাত করে
নাই তার। দরিয়াবিবি মরহুম শুশ্রেণীর অঙ্গতার উপর হাজার লানৎ বর্ষণ করিয়াছিল।
তিনি জীবিত অবস্থায় এই বন্টন-ব্যবস্থা করিয়া গেলে পথের ভিখারণী হইত না সে।

তার কয়েক দিন পরেই দরিয়াবিবি স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাসীবৃন্তির
জীবন তার জন্য নয়। অন্যান্য ভাস্তুর এবং দেবরের তখন চওলার মত ব্যবহার করিয়াছিল।
মোনাদিরকে তাহারা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। সেদিনের মর্মান্তিক দৃশ্য দরিয়াবিবির
চোখে অগ্নিসহ বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়ায়। সারা দুপুর তুমুল কলহের পর সে এক
বন্তেই পুত্রসহ স্বামীর ভিটা পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিল। পালকীর কোন প্রয়োজন নাই তার।
খাট যার ভাঙিয়াছে, ভূমিশয়্যা ছাড়া তার আর কী গত্যন্তর আছে?

মোনাদিরকে কোলে করিয়া সে পথে নামিয়াছিল।

একজন দেবর এই সময় ছুটিয়া আসে, “ভাবী—ভালো হচ্ছে না। আমাদের বংশের
ইজ্জত নষ্ট করছ তুমি।”

ইজ্জত? যাদের বিচার নেই, তাদের আবার ইজ্জত?

তুমি এখানে থাক, কে তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

এমন করে আমার থাকার দরকার? তোমাদের বিবিজানদের বাঁদী হয়ে থাকবার
কোন দরকার নেই। না খেয়ে দিন কাটবে?

তোমার খাওয়ার অভাব হবে না ।

পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার । রাস্তা ছাড়ো । আমার সম্পত্তি আছে?

কোরান-কেতাবে যা হকুম আছে, সেই মত কাজ করছি, আমাদের দোষ দাও কেন? বাপের কোলে বেটা মরলে তার ওয়ারিসানাদের কোন দাবী-দাওয়া থাকে না ।

ওসব হাদিস কালাম আমার কাছে শোনাতে এসো না । মানুষকে পথের ভিত্তিরী করতে আগ্রা বলে দিয়েছে?

আরো কথা কাটাকাটি ।

তবে, ছেলে দিয়ে যাও ।

তোমাদের চাকরের অভাব আছে বোধ হয় ।

বড় ভাবীর ছেলেপুলে নেই, সে মানুষ করবে ।

অত ছোট ছেলে তো চাকরের কাজে অক্ষম । তা মানুষ করতে হবে বৈকি!

তারই চোখের সামনে মোনাদিরকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল । দরিয়াবিবি আর মুখ পশ্চাতে ফিরায় নাই । অতীতের সমস্ত সম্বন্ধ চুরমার হইয়া যাক । যেন কোন ক্ষেত্র নাই তার ।

বংশের ইজ্জত!

আঙ্গ রমণীর মত দরিয়াবিবি সোদিন গর্জন করিয়াছিল ।

ইহাদের মুখে চুন-কালি দেওয়ার আর কেন্ত্র পথ সে অনাবিকৃত রাখিবে না । পাঁচ মাস পরে বিপন্নীক আজহার খাঁকে নেকাত ক্ষেত্রে দরিয়াবিবি ।

চোখ বুঁজিয়া নিষ্ঠার নাই । দরিয়াবিবির সম্মুখে অতীতের বিষধর ফণা চক্র দোলাইয়া জুকুটি ছড়াইয়া যায় । কত মুখ ভাসিয়া আসে — জবেদ হোসেন-আহাদ হোসেন-মোনাদির ।...মোনাদিরের কপালে একটা কালো দাগ ছিল জন্মাবধি । গৌর চেহারায় জর উপরে গোল দাগ... চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে কী দাগ? এখনও শুশান পাহারায় রত চওলের অট্টহাসের মত অঙ্ককারে ঝন্ধনা বাজিয়া যায় ।

নঙ্গীরার কঢ়ি মুখের উপর দরিয়াবিবি তার অশ্রুসিক্ত ঠোট চাপিয়া ধরিল । জ্বালা ধরে দুই চোখে । নিরবচ্ছিন্ন বিস্মরণ-পিপাসু পীড়িত হৃদয়— কোন মমতাময়ী শিয়রে জাগিয়া দাঢ়াক একবার । দরিয়াবিবি তারই প্রতীক্ষা করে!

৫

কয়েকদিন পরে দরিয়াবিবি আসেক্জানের ঘরে তুকিয়া দেখিল বুড়ি চুপচাপ বসিয়া আছে, জাকাতের পাওয়া কাপড় দু'টি নাড়াচাড়া করিতেছে । নিঃশব্দে আসিয়াছিল দরিয়াবিবি । বুড়ি কিছুই টের পাইল না ।

‘খালা’ ডাক শুনিয়া সে নিজের আঁচলের ভেতর কাপড় দু'টি ত্রস্ত তুলিয়া লইল, যেন চুরি করিতে শিয়া ধরা পড়িয়াছে ।

কোন জবাব দেওয়ার পূর্বেই দরিয়াবিবি বলিল, খালা, রাগ করো না । একটা কাপড়

আমাকে দাও। পরে দাম দিয়ে দেব।

বৃক্ষকে নিছক সন্তুষ্ট করিবার পছা মাত্র। দরিয়াবিবি নিজেও জানে, ছয় মাসের পূর্বে
আর সে দাম চুকাইয়া দিতে সক্ষম হইবে না।

ফোগলা দাঁতে হাসি ফোটে। আসেক্জান শশব্যন্ত কাপড় দু'টি বাহির করিল।

যেটা ভাল, সেটা বেছে নাও, মা। দেখো দিকি, কোন্টার জমিন বেশ ভাল।

মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল দরিয়াবিবি।

খালা, তোমার শরীর ভাল তো?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আসেক্জান।

না, মা। দু'দিন থেকে বড় মাথা ধরেছে। চোখ ধোঁয়া ধোঁয়া।

অনুভূত হয় দরিয়াবিবি। ইহা তারই নিষ্ঠুরতার পরিণতি, তা উপলক্ষ্মি করিয়া বড়
ব্যবিত হয়।

তুমি বাইরে চলো, ঠাণ্ডা পানিতে মাথাটা ধুইয়ে দিই। আজ আর কোথাও বেরিয়ো
না।

ও পাড়ায় দাওয়াৎ ছিল। দুপুরে যাব কষ্ট করে।

কিসের দাওয়াৎ?

জলিল শেখের ওখানে। আজ ওর ছেলের চলিশে কিনা।

দরিয়াবিবি জানে, জলিল শেখের রোজগারী জওয়ান ছেলে কিছুদিন আগে ম্যালেরিয়া
জুরে ভুগিয়া ইন্টেকাল করিয়াছে। তার মুখটি মনে পড়িয়া গেল দরিয়াবিবির। বলিল,
আহা!

অনেক লোক খাওয়াবে। আমজাদকে সঙ্গে নিয়ে যাব?

কে যেন বিছুটি চালায় দরিয়াবিবির সর্বাঙ্গে।

আজ কিন্তু ক্রোধের কোন চিহ্ন নাই তার মুখে।

শান্ত কষ্টেই সে বলে, না খালা, তার গিয়ে কাজ নেই। তুমিও আজ কোথাও যেয়ো
না। এখানেই থাবে।

আসেক্জান প্রায়ই গাঁ হইতে এইরূপ দাওয়াৎ পায়। ধনীদের বাড়িতে চৰ্ব-চোষ্যের
বছ আয়োজন হয়। আসেক্জান শুধু নিজের উদৱপূর্তি করিয়া আসে না। অনেক সময়
নানা খাবার সঙ্গে আনে। অঙ্ককার ঘরে তার অংশ গ্রহণ করে আমজাদ অথবা নঙ্গী।
দরিয়াবিবির চোখে কয়েকবার ধরা পড়িয়াছে তারা। আসেক্জানও তার জন্য তিরক্ষার
তোগ করে।

পরলোকগত ব্যক্তির চলিশার খাবার সঙ্গে করিয়া আনিতে আসেক্জানের কোন দ্বিধা
নাই। দরিয়াবিবি ছেলেদের অমঙ্গল চারিদিকে যেন দেখিতে পায়। খুব সাবধানী সে।
আজ ঝগড়ার কোন সূত্রপাত দেখা গেল না।

দরিয়াবিবি শুধু অনুরোধ করিল মাত্র। আজ কোথাও যেয়ো না, খালা।

জলিল শেখ পাটের ব্যাপারী। নৌকা আছে তিন চারখানা। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর।
সেখানকার আয়োজন কল্পনাই করা চলে। আসেক্জানের লোভ হয় খুব। কিন্তু দরিয়াকে সে
ভয় করে। চুপ করিয়া গেল সহজে। তার কল্পনা-নেত্র কিন্তু তারপর ভ্রিত হইয়া উঠিতেছিল।

কাপড় দু'টি দরিয়াবিবি আধ-অন্ধকারে বারবার তুলনা করিয়া বলিল, এই লাল সরু
পাড়টা নিলাম, খালা।

বেশ, বেশ! আমার কি আর এসব মানায়, মা! শাদা কাফন পরে কবরে যেতে
পারলেই ভাল।

বাজে কথা কেন, মুখে, খালা? এই সকালে আর কোন কথা মুখে আসে না বুঝি।
চলো বাইরে। মাথাটা ধুইয়ে দিই।

দুইজনে দাওয়ায় আসিয়া পৌছিল।

দরিয়াবিবি এক বদ্না পানি লইয়া বৃদ্ধার শনের মত শাদা চুলের উপর ঢালিতে
লাগিল।

চূপচাপ বসো। আরো তিন-চার বদ্না ঢালতে হবে।

বসছি মা। একটু তেল দিয়ে দিস বউ।

দরিয়াবিবি চুলের ভিতর আঙুল চালাইয়া বদ্নার নল দিয়া ধীরে ধীরে পানি চোয়াইতে
ব্যস্ত।

আসেক্জানের শরীর ভারমুক্ত হইতেছে। আহ শব্দে তার আনন্দ ধরা পড়ে। নারিকেল
তেল আনিল দরিয়াবিবি। চুলের গুছির ভেতর বেশ চুক্কুকে করিয়া দিতে লাগিল।

খালা, দশ ঝঞ্চাটে শরীরটা জুলে গেল। মেজাজ ঠিক থাকে? কখন যে কাকে কি
বলি— হদিস থাকে না।

মা, জান্টা আসান হলো। আগ্নার দোয়া লাঙ্গিক তোমার শরীরে।

তেল দেওয়ার অজুহাতে দরিয়াবিবি আঙ্গুক্জানের মাথাও টিপিয়া দিল খানিকক্ষণ।
কোরা কাপড়খানা একটি চটির উপর প্রস্তুয়াছিল, দরিয়াবিবির চোখ সেদিকে বারবার
আকৃষ্ট হইতে ছিল।

রান্না চড়িয়েছ বউ?

সে আর বাকি আছে, মা? আমুর পেট খারাপ। আজ পান্তা খেতে দিইনি। মখ্তব
থেকে এসে একবার ভাত খাবে।

এমন সময় আমজাদের গলা শোনা গেল। ভিটের নিচে হইতে সে চীৎকার করিতেছে
মা— মা—।

দরিয়াবিবি উৎকর্ণ হয়। না, এক পা বাড়ানোর পূর্বেই স্বয়ং আমজাদকে উঠানে দেখা
গেল।

মা।

এক হাত উঁচু করিয়া সে আরার চীৎকার করে, মা!

দরিয়াবিবির চোখে সূর্যের আলো পড়িয়াছিল। পুত্রের সর্বশরীর চোখে পড়ে না।

বাড়িটা যে মাথায় তুলে চেঁচাস। কি—

এই দেখো।

হাত তুলিয়া আমজাদ ধেই ধেই নৃত্য করে।

নিকটে পৌছান মাত্র দরিয়াবিবি দেখিতে পায়, আমজাদের হাতে দশ-বারোটি বড়
চিংড়ি মাছ। দাঁড়াওলি তার মুঠোর মধ্যে। লাল সরু ঘুঁড় রৌদ্রে চকচক করিতেছে।

দরিয়াবিবির ঠোটেও হাসি উপচিয়া পড়ে ।

কোথা পেলে, বাপ?

বলছি । বলিয়া আমজাদ এক লাফে দাওয়ার উপর উঠিল ।

মাঠের চন্দ্র কাকা দিয়েছে । আমাদের মখ্তবে গিয়েছিল । মৌলবী সাহেব তাইতো ছুটি দিলে ।

বেশ বড় চিংড়ি রে!

একটা ডাগর চিংড়ি বাহির করিয়া আমজাদ বলিল, এইটা আমার, যা লাল মগজ আছে শেতরে!

দরিয়াবিবির আর আনন্দ ধরে না । কচি শিশুদের মুখে খুব কম দিনই ভাল ব্যঙ্গন জোটে ।

খালা, আজ তোমারও ভালই হলো । ভাবছিলাম, খাওয়ার কষ্ট হবে ।

আসেক্জান এতক্ষণ নির্বিকার ছিল ।

কি বৌমা?

আমু চিংড়ি এনেছে । দুপুরে খাওয়াটা ভালই হবে । মাঠের কোটালরা দিয়েছে ।

আমজাদ মা'র হাতে মাছগুলি সোপর্দ করিয়া বলে, তাড়াতাড়ি পান আর চুন দাও, কাকা দহলিজে বসে আছে ।

তবে এতক্ষণ বলিসনি?

দরিয়াবিবি তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে ছোটে । অন্যদিকে আসেক্জান আমুর সঙ্গে তখন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে ।

নিয়ে যা, বাবা । তোর কাকা তামাক খায়?

আরে বাবা— তামাক খায় না । তামাক-ক্ষেত খেয়ে ফেলে ।

দরিয়াবিবি আবার তামাক সংগ্রহে ছুট দিল ।

দহলিজে একটি বিড়াল উপর চন্দ্র কোটাল বসিয়াছিল । হাতের কামাই নাই । গোটা পান, চুন, সুপারি দিয়াছিল দরিয়াবিবি, তাহাই সে সাজিয়া লইতেছিল ।

চন্দ্র কোটাল একটি খাটো ধূতি পরিয়াছিল মাত্র । কোমরে কাণ্ঠে গোঁজা রাহিয়াছে । পান-সাজার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ খুলিল ।

তোমার বাপ কোথা, চাচা?

আজ ত কোথাও যায় নি । গাঁয়েই আছে । বোধ হয় পাড়ার দিকে গেছে ।

দেখা করতে এলাম । কথা ছিল ।

একটু বসো না, কাকা ।

চন্দ্র কোটাল চারিদিকে তাকাইল । আরো কয়েকবার সে ঝো-পাড়ায় আসিয়াছে । বর্ষাকালে নদীর ধার হইতেই মাছ বিক্রয় হইয়া যায় । কালে-ভদ্রে পাড়ায় আসিতে হয় ।

নৃতন লোক দেখা যেয়েদের সাধারণ কৌতুহল । দহলিজের খড়কির দিকে ঘোমটার আবছায়া দেখিয়া চন্দ্র ঠিক অনুমান করিয়াছিল, আমজাদের মা আসিয়াছে ।

মুখে পান গুঁজিয়া জোর গলায় বলে, চাচা, তোমার মা দুপুর বেলা খাওয়াবে?

আমজাদ বাড়ির ভিতর চলিয়া যাইতেছিল । দহলিজের পেছনেই দরিয়াবিবি

ଦୋଡ଼ାଇୟାଛିଲ, ହାତ-ଇଶାରାୟ ପୁତ୍ରକେ ଆହ୍ଵାନ କରିଲ ।

ଆମଜାଦ ମା'ର କାହେ ଦୋଡ଼ାଇୟା ଜୋର ଗଲାୟ ବଲେ, ଗରୀବ ମାନୁଷ, ଡାଳ-ଭାତ ଆହେ ।

ଚନ୍ଦ୍ର ହାସେ । ଆରୋ ଜୋର ଗଲାୟ ବଲିଲ, ଆମରା ରୋଜ ଘୋଡ଼ାର ମାଥା ଖାଇ । ଡାଳ-ଭାତ ହଲେ ଚଲବେ ନା । ରୋଜ ରୋଜ ଅଶ୍ଵମେଦ ଜଗ୍ଗି କରେ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟାଲ ।

ତାରପର ପ୍ରାଣ-ମାତାନୋ ହାସି । ମୁଣ୍ଡ ଦହଲିଜ ଗୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ଚାଚା, ଖାଓୟାର ଆଗେ ତୋମାର ମାକେ ତାମାକ ଦିତେ ବଲୋ । ନେଶା ଚଟେ ଗେଲ ।

ପୌଢ ମିନିଟ ପରେ କଙ୍କେ ଆନିଯା ଦିଲ ଆମଜାଦ କାଠକୟଲାୟ ବୋଝାଇ । ଆମଜାଦେର କଚି ହାତେ ଉତ୍ସାପ ଲାଗେ ।

ଶିଗ୍ଗିର ଆମାର ହାତେ ଦାଓ ।

ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ତାଲୁର ମାଧ୍ୟମରେ କଙ୍କେ ଚାପିଯା ତାରପର ଦମ ଦିତେ ଥାକେ । ଦୁଇ ଚକ୍ର ବୁଜିଯା ଆସେ ନେଶାଯ ।

ଆମଜାଦ ବିଶ୍ଵମୟେ ଏହି ଲୋକଟିର ଦିକେ ବାରବାର ତାକାଯ । ଅତି କଟେ ହାସି ଚାପିଯା ରାଖିତେ ହୁଏ ।

ଏକଟୁ ପରେ ଚକ୍ର ଖୁଲିଲ କୋଟାଲ ।

ଦହଲିଜେର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ ଦୁଇଟି ନିମ ଗାଛ ବାତାସେ ଦୁଲିତେଛିଲ । ଏକଟି ଚାରା ତାଲଗାଛ କୋଟାଲେର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଲ । ଛୋଟ ଛୋଟ କଟି ମୋଚା ବାହିର ହଇଯାଇଁ ଗାହୁଟିର ।

କଙ୍କେ ଦାଓୟାର ଉପର ରାଖିଯା ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲ, ଚାଚା ଭାଲଗାଛଟା ତୋମାଦେର?

ଆମଜାଦ ମାଥା ଦୋଲାଯ ।

ଆହ୍ ଖାସା ମୋଚା ବେରିଯେଛେ । ବାଂଶଗାଛ ଭାବେ ତୋମାଦେର?

କତ ଆହେ । ଦୁଟୋ ବାଡ଼େ ପଞ୍ଚଶିଖାର୍ବିରାଶ, ସେଦିନ ବାପ୍ ଗୁଣଛିଲ ।

ତା ହଲେ ବଟେ — ତୋମାର ବାପିବେରସିକ । କି ମିଠେ ତାଡ଼ି ହୁଏ ଏହି ଗାହେର, ଚାଚ । ବାଂଶ ଲାଗିଯେ ଆଗ ଡାଳେ ଉଠେ ଭାଙ୍ଗିବିଧିତେ ଯା ମଜା । କିନ୍ତୁ ତୋମାର ବାପ...ହତାଶ ହଇଯା ଚନ୍ଦ୍ର ମାଥା ଦୋଲାଇଲ ।

ଆମାଦେର ଯେ ତାଡ଼ି ଖେତେ ନେଇ ।

ଗୋପେ ତା ଦିଯା ଚନ୍ଦ୍ର ଠୋଟେ 'ହୋ' ଶବ୍ଦ କରେ ।

ବଢ଼ ହଲେ ଖେତେ ଆହେ, ବାବା । ତୋମାର ବାବା ଏକଟା ଆନ୍ତ— ।

ଆମଜାଦ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲ ନା ।

ଆର ଏକବାର କଙ୍କେ ତୁଲିଯା ଲାଇଲ ଚନ୍ଦ୍ର । ତାରପର ଏଲୋପାଥାଡ଼ି ଟାନ । ଆମଜାଦେର ଚୋଖେ ଧୋଯା ଲାଗେ । ବିରକ୍ତ ହଇଯା ମେ ଚୋଖ ବୁଜିଲ ।

ତୋମାର ବାବା—

ଏଇବାର ଚୋଖ ଖୁଲିଲ ଆମଜାଦ ।

ତୋମାର ବାବା, ଆଜ ଆର ଆସବେ ନା ।

ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା ଆମଜାଦେର ।

ଶିଶୁଲଭ କଟେ ମେ ବଲିଲ, ନା, ବାପ ଏବାର କୋଥାଓ ବିଦେଶେ କାଜେ ଯାବେ ମା । ଗାୟେ ଗେଛେ, ଏଖନଇ ଫିରିବେ ।

ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟାଲ ଶିଶ ଦିତେ ଦିତେ ଶନ୍ତନୁନ ଶବ୍ଦ କରେ । ଏକକାଳେ ଭାଙ୍ଗ-ନାଚେର ଦଲେ ଛିଲ ।

তার প্রহসন-লীলায় হাসির চোটে দর্শকদের নাকি দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইত ।

চন্দ্ৰ গান করে গুণগুণ শব্দে ।

আমজাদের কৌতুহলের অন্ত নাই । এই লোকটিকে তার ভয়ও লাগে । তবু সে নিঃশব্দে চন্দ্ৰ কোটালের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল ।

চাচা!

উচ্চকিত আমজাদ জবাব দিল, কি চাচা?

তোমার বাবা ঘরে আছে ত?

হ্যাঁ । ভিন গাঁয়ে যায় নি বলছি ত বাববাবৰ ।

তবু একটু অপেক্ষা করি । আৱ এক কক্ষে সেজে আনো ।

আমজাদ দ্বিৰুক্তি কৱিল না ।

যথাশীত্র সে ফিরিয়া আসিল ।

উল্লসিত হয় চন্দ্ৰ । আবাৰ পান-সুপারি আনিয়াছে আমজাদ ।

দুইজনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আলাপেৰ বিনিময়ে মশ্শুল ।

এমন সময় আজহার আসিয়া উপস্থিত হইল ।

চন্দ্ৰ তামাক ফুঁকিতেছিল চোখ বুজিয়া । আজহারকে সে দেখিতে পায় নাই ।

আমজাদ আনন্দিত হইয়া ডাকে, ঐ আৰুৱা এলো ।

এসো, এসো, খীঁ সাহেব —

চন্দ্ৰ আজ সম্মান দেখাইতে তৎপৰ । বিড়া ছাড়িয়া সে উঠিয়া পড়িয়াছে । আজহার খীঁ হাসে ।

কি চন্দৰ, হঠাৎ কি মনে কৱে?

কখন থেকে বসে আছি । ডুমুৰ ঘূঢ়লেৰ খৌজ নেই ।

আজহার চন্দ্ৰের নিকট হইতে কক্ষে লইয়া টান দিতে লাগিল ।

ঘৰে বসে থাকলে চলে, ভাই? পেটেৰ ধান্দায় সকাল থেকে ঘৰ-ছাড়া ।

কোথা গিয়েছিলে, তুনি?

খীঁ সাহেব জয়মিদাৰদেৰ বাড়ি । হাতেম বখশ খীঁ একটা কৰৱ তৈৰি কৱাবে নিজেৰ ।

কত ইট-চুন লাগবে— তাই ডেকেছিল ।

ওটা কি মৱবে নাকি শিগ্গিৰ?

কোন জয়মিদাৰেৰ পেছনে এমন অসম্মান-সূচক কথা আজহার পছন্দ কৱে না । একটু বিৱৰণ হয় সে ।

একটু খাতিৰ রেখে কথা বলো । ‘ওটা’ কি বলছ?

যেন কত অনুতঙ্গ, তাৰই ব্যঙ্গ-অনুসূত কষ্টে চন্দ্ৰ বলে, হ্যাঁ, মুৰুৰুৰী লোক, পঞ্চাশ-ষাট বয়স, খাতিৰ কৱাবো বৈকি । সত্যি মৱবে?

ৱাখো তোমার মস্কৰা । সবাই মৱবে । আমি কি মৱব না?

তুমিও তবে আগে থেকে কৰৱ খুড়ে ৱাখো ।

দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আজহার । সে সৌভাগ্য তাৰ নাই ।

বহুত টাকা খৰচ কৱবে, ভাই । তিন দিকে ইট, একদিকে সাদা মাৰ্বেল পাথৰ ।

তা ত করবেই। আমাদের বেঁচে খরচ করতে প্রাণ যায়, ওরা মরেও আমাদের জন্য খরচের রাস্তা তৈরি করে রাখে।

আজহার খাঁর মাথায় এত প্যাচওয়ালা কথা সেঁধোয় না। নির্বোধের মত সে বলে, প্রায় দু'হাজার টাকা খরচ। তারপর আবার বাগান হবে চারিদিকে। সেও আর এক হাজার।

বিশ্বিত হয় চন্দ্ৰ। বিজেৱ মত জবাৰ দিল সে : আমাৰ মণ খানেক কাষ্ঠ দৰকাৰ। ব্যস। আৱ নদীৰ ধাৰে একটা দেশলাইয়েৰ কাঠি খৰচ। যদি অপঘাতে মৰি— তাৱ খৰচ নেই। শৰ্জনদেৱ মেহনত খৰচ হবে খানিকটা।

বাজে কথা রাখো। কেমন মাছ ধৰছ জোয়াৰে?

সেইজন্যে ত এলাম। মাছ ধৰে কি হবে। এবাৰ বৰ্ষায় দেখবে খুব মাছ পড়বে। কিন্তু সব ত নিয়ে যাবে পাইকেৱ। ওদেৱ অবস্থা দেবো। আমৰা মাছ ধৰি, পেটে ভাত জোটে না, ওৱা পাকা দালান তোলে।

কি কৰতে চাও?

জিজ্ঞাসু নয়নে চন্দ্ৰেৰ দিকে তাকায় আজহার।

কিছু পুঁজি দৰকাৰ, ভাই। তা হলে আমি নিজেই রেল ইস্টিশনে গিয়ে মাছ বেচে আসতাম। পাঁচ-সাত সেৱ মাছ নিয়ে খৰচ পোষায় না। আৱো দশটা লোকেৰ মাছ জড়ো কৰলে এক মণ দু'মণ মাছ নিয়ে বেশ লাভ পাওয়া যেত।

আজহারেৰ মুখৰে উপৰ দিয়া কালো রেখা পড়ে।

পুঁজি— পুঁজিৰ কথা বলছ? সেই ত মুশকিলি।

বেশি টাকাৰ দৰকাৰ নেই। পঞ্চাশ হোল্ডেই চলে। তুমিও কিছু দাও, খী ভাই। ভাগে ব্যবসা কৰা যাক।

ভয়ানক উৎসাহিত চন্দ্ৰ।

কয়েক মিনিট চৃপচাপ বসিয়া রাহিল আজহার। কোন জবাৰ নাই তাৰ মুখে।

কি খী ভাই, কিছু বলছ না যে—

একক্রম সন্দেহাত্ত দৃষ্টি ফেলে চন্দ্ৰ।

কি আৱ বলব! পঁচিশ-তিৰিশটা টাকা থাকলে কি চূপ কৰে যাই? আমাদেৱ অবস্থা দেখছ না? হাত জানে ত মুখ জানে না।

এইবাৰ চন্দ্ৰও চূপ হইয়া যায়।

দীৰ্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

আমাৰও ত ঐ দশা।

আজহার কথাৰ সূত্ৰ সংক্ষিপ্ত কৰে হঠাৎ।

তোমাৰ এই ঝোক ধৰল কেন? চাষ কৰে, ফুৱসৎ পেলে মাছ ধৰে বেশ ত দিন কাটছিল।

তা আৱ হবাৰ জো নেই। চাঁদমণি ফিৰি এসেছে।

চন্দ্ৰমণি কোটালেৰ কনিষ্ঠ সহোদৱ।

তোমাৰ এখানেই থাকবে নাকি?

আৱে যা ভাবছ তা নয়। স্বামী মৰে গেছে। তিনটি ছেলে কোলে।

আজহার ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিত না। সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখে কারুণ্য ফুটিয়া ওঠে।

কি হয়েছিল?

জুর ও বিকার।

ও। আজহার ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ তুলিয়া চুপ করিল।

তাই ভাবছি। রোজগারের পথ ত দেখতে হবে। ঘরও একটা বেশি নেই যে, মাথা ওজে থাকব। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখতে পার না? ক'টা টাকা হলে দু'জনেরই ভাগ্যপরীক্ষে হয়।

কে ধার দেবে, তাই ভাবছি। এত টাকা বিশ্বাস করবে কি?

দেখো চেষ্টা করে। আমরা মাছ ধরি, পাইকেরাতা তা শহরে বেচে পয়সাওয়ালা। যত টাকাপয়সা কি শহরে গিয়ে জমেছে?

তাই ত দেখছি!

চন্দ্র মাথা দোলাইল : আমার কাছে একটা ধাঁধা মনে হয়। আমরা ফসল করছি, গতর পুড়িয়ে মাছ ধরব, সব সেরা জিনিস শহরে ছুটছে। আমাদের পয়সাও হয় না ভাল খাবারও জোটে না।

এই প্রশ্নের জবাব হঠাৎ আজহার থাঁর মাথায় থেলে : শহর থেকে যে কাপড় আসে, আরো কত জিনিস আসে তা দেখছ না? গাঁয়ের ফসল স্থায় শহরে। শহরের জিনিস আসে গাঁয়ে।

তা ত বুঝলাম। কিন্তু তারা সুধে থাকে। আর আমাদের এই দশা কেন? আমরা কি মেহনত করি না? না গতর খাটাই না? আমরা যদি চাল না দিই, শহরের ব্যাটারা থাবে কী?

আজহার উন্নেজিত চন্দ্রের দিকে চাহিয়া মন্দু কঢ়ে বলিল, তুমি তা হলে ন্যাংটা থেকো।

ন্যাংটা থাকবো কেন? গাঁয়ে তাঁতীরা কাপড় বুনবে।

সে দিন আর নেই ভায়া। ঐ ত ক'ঘর তাঁতী আছে, তাদের কাপড় কেউ ছোঁয়? অবস্থা দেখছ না তাদের? সব কপালের ফের!

চন্দ্র চুপ করিয়া গেল। তার মাথায় স্টেশনের পাইকার রূপে মাছ বিক্রেতা হওয়ার স্মৃতি তখনও মুছিয়া যায় নাই।

শহরেই ত সব। গাঁয়ের জমিদারের চেয়ে ঐ ব্যবসাদারদেরই টাকা বেশি। তালের চৌধুরী লোহার কারখানা করে দেখছ ফেঁপে যাচ্ছে। হাতেম থাঁকে দশবার কিনতে পারে।

আজহার সায় দিল মাথা দোলাইয়া, কোন মন্তব্য করিল না।

দুইজনে নিষ্ঠক। নীরবতার দুঃসহ শাসন কেউ যেন আর অবহেলা করে না।

আমজাদ এতক্ষণ দুই জনের কথোপকথন শুনতেছিল, সেও কোন কথা বলিতে সাহস করে না।

হঠাৎ উঠিয়া পড়িল চন্দ্র। সে বলে : আমার অনুরোধটা ভেবে দেখো, থা ভাই। বেলা হয়ে গেল, যাই—।

নিরাশাকুর্দ্ধ কঢ়ে চন্দ্র কোটালের। আজহার বছদিন এমন দীনতা দেখে নাই তার।

কোন জবাব দিল না সে ।

আজহার নীরবে দাঁড়াইয়াছিল । চন্দ্ৰ তাহার হাত ধরিয়া টান দিল, একটু এগিয়ে দাও, চাচা ।

গায়ের সরু পথে ডোবার উপর বহু শাপলা ফুটিয়াছিল । চন্দ্ৰ কয়েকটি আমজাদের হাতে তুলিয়া বলিল, এবাব বাড়ি যাও, ভারী রোদুর উঠেছে ।

আমজাদ বাড়ির পথ ধরিল ।

মাঠের সড়কে অগ্রসর হইতেছে চন্দ্ৰ । তার শিসের শব্দে আমজাদ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হেলিয়া-দুলিয়া মষ্টর চালে চন্দ্ৰ হাঁটিতেছে । বোধ হয় ফুর্তিতেই শিস্ দিতেছে । পৃথিবীতে যেন কেৰিন কিছু ঘটে নাই ।

৬

সকালে আজহার প্রতিবেশী সাকেরের খৌজ লইতে গেল ।

পাশের পাড়া । তিটো ছাড়িয়া সামান্য কলাবাগান পার হইতে বেশি সময় লাগে না । আজহার ভাবিতেছিল, সাকেরের কাছে টাকা আছে । সে পেশাদার লাঠিয়াল । খী বৎশের মহিমা বৰং একমাত্ৰ সে বজায় রাখিয়াছে । চোয়াড়ে প্ৰকৃতিৰ চেহারা সাকেরের । লম্বা ঘন গৌপের উপর ভাঁটাৰ মত দুই চক্ষু শিশু আতঙ্কেৰ পক্ষে যথেষ্ট । এই সময় তার কাছে টাকা থাকা সম্ভব । মাত্ৰ দুইদিন আগে রোহিণী চৌধুৱীৰ কোন তালুকে প্ৰজা ঠঞ্জাইতে গিয়াছিল সে । জমিদারদেৱ কল্যাণে তার অৱস্থা অন্যান্য প্রতিবেশী অপেক্ষা ভাল । দাঙার জন্য আৱো তিন গাঁয়ে তার ডাক পড়িত ।

চোয়াড়ে হোক সাকেৰ । কিন্তু আজহার খীৰ সম্মুখে সে ভারী বিনয়ী, খুব মোলায়েম কঠিন কথা বলে । আজহারেৰ ধাৰণা সাকেৰ তাকে শ্ৰদ্ধা কৰে । কোনদিন তার কাছে টাকা হাওলাত কৱিতে যায় নাই । মুখেৰ কথা সে অবহেলা কৱিবে না সহজে । আৱ চন্দ্ৰও যেমন বেয়াড়া ! তার সঙ্গে বন্ধুত্বেৰ জুলুম সহ্য কৱিতে কোন কষ্ট হয় না ।

সাকেৰ ঘৰে ছিল না । তার মা আজহারকে দাওয়ায় মাদুৰ পাতিয়া বলিল, আমাৰ পেটে এমন ডিংৰে ছেলে জন্মাল, বাবা । আৱ পাৰি নে । লাঠিখেলা কেন যে শিখেছিল । এক দণ্ড শান্তি নেই । ও দাঙা কৱতে যাবে, আৱ এদিকে আমাদেৱ শান্ত়ী-বৌয়েৰ পেটে ভাত সেঁপাবে না ।

সাকেৰ কোথা গেছে, চাচি ?

কাল সন্ধ্যায় বেৱিয়েছে আৱ দেখা নেই ।

উদিগু আজহার প্ৰশ্ন কৱে, দাঙায় যায় নি ত ?

না । লাঠিটা ঘৰে রয়েছে । এই বাঁধানো লাঠি ছাড়া সে বেৱোয় না । কিন্তু কোথা যে গেল !

আজহার নীৰব । নিৱাশাৰ আঘাতে বারবাৰ চন্দ্ৰেৰ মুখ তার মনে পড়িতে থাকে । চন্দ্ৰটা এমন—

সাকেৰেৰ মা সংসাৱেৰ কথা জুড়িল ।

ছেলেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে। ভয়েই মরে। চাষবাস করে খেতে বল, নিজের মানুষকে হাত কর। তা না। খালি দিনরাত ছেলের জন্য কান্না। কাঁচা বয়েস। ছেলে হওয়ার সময় কি পার হয়ে গেছে, বাবা?

হঠাতে সুশোথিতের মত আজহার জবাব দিল, না, আমাদের হাসুবৌর আর কত বা বয়েস। কুড়ি পেরোয় নি।

এখনই ছেলের জন্যে হাঁপাইপি। দোয়া তাবিজ আমি কি কম করতে বাকী রেখেছি! তবে মাস দুই হলো নিষ্ঠার। কপালে যদি থাকে—।

সব আল্লার মরজী, চাটী। তোমার আমার মত গোনাগার বান্দা আর কি করতে পারে?

না বাবা, আল্লা মুখ তুলে চেয়েছে। তারপর চাচি জোর গলায় হাসিল।

জানো বাবা, অভগীর বেটি বলে কি—

আজহার জিজ্ঞাসু নয়নে চাচির মুখের দিকে তাকাইল।

বৌমা বলে, ছেলের মুখ না দেখলে ওসব লোক আর সংসারী হবে না। ও জোয়ান হওয়া অন্ধি ভয়ে ভয়ে সারা জনমটা গেল। কি দিন কি রাত, বেঁচে সুখ নেই বাবা।

আজহার চুপ করিয়া শোনে, কোন মন্তব্য করে না। তার দৃষ্টি প্রাঙ্গণের উপর। হঠাতে মুখ অন্ধদিকে ফিরাইতে সে বাধ্য হইল। সাকেরের স্ত্রী ঘাট হতে কলস কাঁথে ফিরিতেছিল। ভাগুকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠানের লাউগাছের জঙ্গ আড়ালে আড়ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিজেকে বিব্রত মনে করে আজহার খাঁসত্যাই বড় কাঁচা বয়স সাকেরের স্তৰ। মুখখানা ভারী করুণ মনে হয়। পূর্ণ যুবতী তবু মুখের আদলে সজীবতা নাই। যৌবনের শ্যামস্পর্শ যেন ক্ষণেক উঁকি দিয়া বিদ্যয় লইয়াছে।

উঠানে লাউগাছের মাচাঙ। সূর্যের আলো সেঁধোয় না, নিচে এমন ঘন লতার পরিবেশ। দুই-একটি লাউ ঝুলিতেছে মাথার উপর। গোড়ার দিকে দশ-বারোটি সর্পিল রেখার আলিঙ্গন মাটির বুকের সহিত। সাকেরের স্তৰের কাপড়ের কোন কোন অংশ দেখা যায়।

আজহার যেন কত বিপদে পড়িয়াছে। বেগানা আওরতের সম্মুখে এমনভাবে বসিয়া থাকা শোভন নয়। সে উঠি-উঠি করিতেছিল। কিন্তু সাকেরের মার কথা আর ফুরায় না।

দোয়া করো, বাবা। বৌমার নিয়েৎ পূরা করুক খোদা।

আল্লার দোয়া। বান্দার কথায় আর কি হয়? মাঠে কাজ আছে, চাচি। আজ আর বসতে পারব না।

উঠিয়া পড়িল আজহার।

আচ্ছা, এসো বাবা। দরিয়াবৌকে এদিকে আসতে বলো। বৌমার মাস দুই হলো, দরিয়াবৌর সাথে কতগুলো কথা আছে।

সাকের বাড়ি ফিরলে আমাকে একবার খবর দিও।

দুইপাশে কষির বেড়া। এই পথে কলাগাছের ছায়াক্ষকার জমিয়া উঠিতেছে। সূর্য উঠিতেছে তেজে। চারিপাশের আলো প্রখরতায় অস্পষ্ট জায়গায় অন্ধকার আরো ঘন মনে হয়। আজহার খাঁর মন নানা সন্দেহে দোলে। সকালটা কোন কাজে আসিল না।

হঠাতে চাচির খন্থনে গলার আওয়াজ শোনা যায়। ঘুলি-পথের উপর উৎকর্ণ আজহার থমকিয়া দাঁড়াইল। হ্যাঁ, চাচিরই গলার আওয়াজ বটে, দূর হইতেও স্পষ্ট বোৰা যায়।

হারামজাদি, ঘৰে টাকা-পয়সা নেই, সে বাড়ি থাকতে বললি নে কেন? মুখের ছাঁদা বুজে গেছে বুঝি?

আরো গালিগালাজের অগৃহপাত। চাচি আদৌ বৌকে দেখিতে পারে না, আজহার জানে। কিন্তু আজ সেজন্য বিশেষ মাথাব্যথা নাই তার। সাকেৱের ঘৰেও টাকা নেই। বুক্টা দমিয়া গেল আজহার খাঁর। চাচিকে শান্ত কৰিতে সে আৱ একবাৰ ফিরিয়া আসিত, সে উৎসাহও ধীৱে ধীৱে নিভিয়া গেল।

গোয়ালঘৰে সামান্য কাজ বাকী ছিল। আজহার খাঁ আজ যন্ত্ৰচালিতেৰ মত তাহা সম্পন্ন কৰিল। চন্দ্ৰ কোটালেৰ কাছে একবাৰ খবৰ দেওয়া দৰকাৰ। সে আশ্য আশ্য থাকিবে। পাড়াৱ আৱ কারো কাছে হাত পাতা মিৰৰ্যক। গফুৰ খাঁৰ গঙ্গেৰ দোকান দিনদিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে। তার পুৱতন ঝণ দুই বছৰে শোধ হয় নাই। সে পথও রুক্ষ। আরো কয়েকজন সঙ্গতিপূৰ্ণ প্ৰতিবেশীৰ কথা মনে পড়িল আজহার খাঁৰ। কিন্তু চারিদিকে খট্কা।

দৱিয়াবিবি পূৰ্বতন শৃঙ্খৰবাড়িৰ দুইটি দুল আনিয়াছিল। গত বৎসৰ আমজাদ ও নদীমাৰ অসুখে তা-ও পোদারেৱ দোকানে বাঁধা পড়িয়াছে।

চন্দ্ৰ হৃশিয়াৰ লোক। ব্যবসায় কপাল-খোলা বিচিৰ নয়। কিন্তু রুক্ষ অদৃষ্টেৰ কপাট খুলিতে সামান্য কুঞ্জিকাৰ কথা, আজহার ভাবিতে পঞ্চে না।

মাঠেৰ পথে চিন্তা-ভাৱাকৃত মনে সে উপায়ে কল্পনা কৰিতে লাগিল। হঠাতে আকাশে মেঘ জমিয়াছে। সূৰ্যৰ আলো পলাতক। ব্ৰহ্মকাল, যে-কোন সময় বৃষ্টি নামিতে পারে। এই মনে কৱিয়া আজ গৰু মাঠে ছড়িয়া দেয় নাই আজহার।

সে কোটালেৰ বাড়িৰ কাছাকাছি আসিয়াছে এমন সময় দম্কা বৃষ্টি নামিল। দুপুৱে গোসল কৰিতে হইবে, তাই বৃষ্টিৰ কোন তোয়াকা রাখে না আজহার। সোজাসুজি সে গাঙ্গেৰ ধাৰে আসিয়া থামিল। চৰ্তুদশীৰ জোয়াৱেৱ সময় চন্দ্ৰ ঘৰে থাকাৰ বান্দা নয়। তা ছাড়া মাছ ধৰা একটা নেশা কোটালেৰ।

খালেৰ দুই ধাৰে বাপ্সা গাছপালা। ঝঘঘৰ্ম বৃষ্টি ঘৰিতেছে। কোন জনপ্ৰাণী চোখে পড়ে না। সকলেই বোধ হয় আশ্রয়ে ঢুকিয়াছে। বামে ডিঙি নড়াৱ ঠক্ঠক শব্দ শোনা গেল। উৎফুল্ল হইয়া ওঠে আজহার। চন্দ্ৰ ছোট্ট পিনিসেৰ উপৰ দাঁড়াইয়া জাল শুটাইতেছে। নৌকাৰ গলুই একটি বাঁশৰ সঙ্গে বাঁধা। স্নোতেৰ টানে বাঁশ ও কাঠেৰ সমবায়ে একৰূপ ঘৰণ-ধৰণি বৃষ্টিৰ আওয়াজকে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

আজহার হাঁকিল, চন্দ্ৰ!

খালেৰ দুই পাড়ে তাৱ প্ৰতিধৰণি ছড়াইয়া পড়ে।

সামান্য বৃষ্টিৰ প্ৰকোপ মন্দীভূত। মেঘ হড়ুম-হড়ুম কৰিতেছে।

বোধ হয় হাঁক চন্দ্ৰ শুনিতে পায় নাই। আজহার নিজেই তাৱ কাছে আগাইয়া আসিল। লম্বা বেড়াজালে জোয়াৱেৱ পূৰ্বে খালেৰ মুখ ঘিৱিয়াছিল চন্দ্ৰ। ভাটা পড়াৱ সঙ্গে সঙ্গে আবাৱ জাল শুটাইতেছে। বড় শান্ত সে। দুই বাহৰ পেশী স্পষ্ট ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাৱ দৃষ্টি শুধু জালেৰ দিকে।

চন্দ্ৰ চোখ না তুলিয়াই বলিল, খাঁ ভাই, একটু দাঁড়াও।

জাল গুটানো সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আফসোস করে, না ভাই, মজুরী পোষাল
না। অনেকক্ষণ খাটছি।

মাত্র সের দুই মাছ পড়িয়াছে। দশ-বারোটি তপসে মাছ কেবল চন্দ্ৰের চোখে আনন্দের
প্রলেপ টানিয়া যায়।

ভাবছিলাম, ‘খিয়ে’ জাল দিয়ে আৱ একটু চেষ্টা কৰা যাক। না, তুমি এসেছ ভালই
হলো।

দুজনেই বাড়ি অভিযুক্তি। চন্দ্ৰ শীতে কাঁপিতেছিল। অনেকক্ষণ সে বৃষ্টিৰ পানিতে
ভিজিয়াছে। কোটাল-পুত্ৰ তাই নিৰ্বাক। মাছভৱা খালুই হাতে দ্রুত হাঁটিতেছিল সে।

পা চালাও, খাঁ। একটান তামাক না টানলে আৱ নয়।

পিছল পথে সাৰধানে পা ফেলে আজহার। বৃষ্টি এখনও সম্পূৰ্ণ থামে নাই। পাখিৰ
পাখনা-বাড়া ধোয়াৰ মত ইলশেঙ্গড়ি আকাশ হইতে ঝৱিতেছে।

উঠানে হাঁকাহাঁকি কৰে চন্দ্ৰ : সাজো, সাজো।

হাসিমুখে এলোকেশী ও চন্দ্ৰমণি বাহিৰ হইয়া আসে।

দাদা যেন যুক্তেৰ হাঁক ছাড়ছে।

এলোকেশী বোৰে, কি সাজিবাৰ হকুম কোটাল রাজাৰ। সে আৱ দাঁড়ায় না, দাওয়ায়
চন্দ্ৰমণিকে একটি আসন আগাইয়া দেওয়াৰ হকুম ছিয়া সে চলিয়া গেল।

এই চন্দ্ৰমণি! আজহার অবাক হইয়া যায়। আঠে আসিয়া সে বহুদিন চন্দ্ৰেৰ এই
সহোদৰাকে দেখিয়াছে। পাঞ্চলা চেহাৱাৰ গঠন, ফৰ্সা রং, বয়সে সে চন্দ্ৰেৰ অনেক ছোট।
অঞ্জই বহু চেষ্টা কৱিয়া তাৱ বিবাহ দিয়াছে। কিন্তু এ কি ছিৱি হইয়াছে তাৱ। পাটকাটি
বা প্যাকাটিৰ মানবিক সংক্ৰণ যেৰ পৰায়ে নাজেল হইয়াছে।

আমাৰ কাপড়চোপড় ভিজে গৈছে মণি, খড়েৰ বিড়েটা আৱ নষ্ট কৰব না। এমনি
বসছি। কিন্তু তুই এমন হয়ে গেছিস্ত কেন?

কপাল ভাঙলে আৱ কাৰ গতৰ ভাল থাকে, দাদা।

আজহার চুপ কৱিয়া গেল। পঁচিশ পাৱ হয় নাই, ওই কচি মেয়েটা আল্লাৱাৰ কাছে কি
গোনাহু কৱিয়াছিল, যাৱ শাস্তি এমন নিৰ্মম : আজহার এদিকে ধৰ্মপ্রাণ বুদ্ধি দিয়া যাৱ
নাগাল পায় না, সেখানে আল্লাৱাৰ মকৱেৰ সন্ধান সে সহজেই লাভ কৱে।

জুৰ হয় তোৱ, মণি?

আজহারও মুমড়াইয়া যায়। আল্লাৱাৰ বান্দাৰ বেশিৰ ভাগ এই একই দশায় উপনীত!
গাঁয়েৰ দশটা ঘৰ বুজিয়া পাওয়া মুশ্কিল, অভাৱ-অন্টন প্ৰসূত কোন বাঞ্ছাট যেখানে
অনুপস্থিতি।

ম্যালেৱিয়া জুৱে দু'মাস ভুগছি। তবে শৱীৰ আগে থেকেই খাৱাপ।

দাওয়াৰ এককোণায় চন্দ্ৰমণি বসিয়া পড়িল। শাদা থান কাপড় পৱনে। তাৱ ফ্যাকাসে
ৱজহীন শৱীৱেৰ সঙ্গে রঞ্জেৰ ভাল সামঞ্জস্য হইয়াছে।

দুইটি উলঙ্ঘ কালো ছেলে চন্দ্ৰমণিৰ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজহার ইহাদেৱ
আগে দেখে নাই।

পিতৃছীন অনাথদের পরিচয় তার অনুমানের কাছে অজ্ঞান নয়। তবু সে জিজ্ঞাসা করে : তোমার ছেলে না, মণি?

হ্যাঁ দাদা। বড় গোপালের বয়স মোটে পাঁচ। যোগীন তিন বছরের। ওদের নিয়েই ত আমি জুলেপুড়ে মরলুম। একটা কানাকড়ি যদি বিধবা হওয়ার সময় রেখে যেতো—

চন্দ্রমণির কোটরাগত নিষ্পত্তি চক্ষু হইতে টস্ টস্ পানি পড়ে। গোপাল ও যোগীন মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

চন্দ্রমণি আচ্ছন্ন চোখেই আবার বলিল, দাদা ছিল বলে মাথা গোজার ঠাই আছে। কিন্তু দাদার অবস্থা ত দেখছ, ছেলেপুলে মরে গেল। তার ওপর আবার আমার বোৰা।

শুকনা গামছা পরিয়া কঙ্কয়ে দম দিতে দিতে চন্দ্র বাহিরে আসিল। তার চোখ পড়ে মণির উপর।

এই আবার প্যানপ্যান শুরু করেছিস। এই মণি, অমন করবি ত যা নিজের জায়াগায়। দেখ না আজহার ভাই, ওর হয়েছে কি। আমি ত মরে যাই নি।

চন্দ্র ধর্মক দিল আবার : যা উঠে, কিছু হয় নি। খেটে খেটে আমাদের জন্য শরীরটা কি হচ্ছে!

ভাগ- ভাগ— আর মুখ খুলিস নি। কি হয়েছে আমার শরীরের?

আজহারের হাতে কঙ্ক দিয়া চন্দ্র হাতের পেশী ফুলায়া বলে, দ্যাখ, মণি দ্যাখ। ঘূষি মেরে কোন্ বাপের ব্যাটা এটা নোয়াক দেখি।

ম'লো যা-যা রান্নাশালে।

গোফে তা দিয়া চন্দ্র ঠোঁট বাঁকাইল।

এলোকেশী চন্দ্রমণির হাত ধরিয়া ঠোঁট দিল। সে বলিল, চলো না ঠাকুরবি। ভাই বোনে আর সতীনের ঝগড়া দরকার নেই।

মনু হাসি এলোকেশীর ঠোঁটে

যা-যা, নিয়ে যা শিগ্গির।

যোগীন মামার কাও দেখিয়া হাসিতে থাকে।

তুমি হাসছ! দেখি পাঞ্জা ধরো ত।

তিন বছরের শিশু। ভয় পায় না সে। কঢ়ি পাঞ্জা বাড়াইয়া দিল যোগীন।

গোপাল বড় নীরিহ। সে ছোট ভাইয়ের খেলা দেখে। ভয়ে গোপাল মামার কাছে ঘেঁষে না।

এইরকম করে লড়তে শেখ, বেটা। বড় হলে ডাকাতি করবি।

আজহার ঠোঁট হইতে কঙ্ক নামায়।

বেশ তালিম দিছ ভাগ্নের্কে।

চন্দ্র লম্বা গোপে তা দিল একবার।

সত্যি, ডাকাত করব ছেলেগুলোকে। লুটেপুটে খাবে, খেটে ত খেতে পাবে না। নিজেও ডাকাতের দলে চুকব।

আজহার ভাবে, চন্দ্রের মাথায় ছিট আছে। তবু চুপ করিয়া যায় না সে।

তুমিও ডাকাতি করবে?

করব না? এত মেহনত করে লাভ কী? ধম্ম-টম্ম-ভগবান ওসব মানি নে। খেটে খেতে না পাওয়ার চেয়ে চুরি করায় পাপ নেই।

আজহারের চোখ কপালে উঠিতেছে যেন।

কি সব বকছ, চন্দর!

সত্যি বলছি, মনমেজাজ বিগড়ে গেছে আমার। তুমি বিশ্বাস করো ভগবান আছে, আল্লা আছে?

তৌবা, তৌবা, তৌবাস্তাগফের।

আজহার মনে মনে দরদ শরিফ পড়িতে লাগিল।

যোগীন মাতুলের সঙ্গে তখনও পাঞ্জা লড়িতেছে।

চন্দ্র কোটালের মুখ বক্ষ থাকে না : আমরা খেটে খেতে পাই না। ওরা বসে-বসে তামাক ফোঁকে, গদীতে শুয়ে খেতে পায়। বলে, ভগ্বানের ইচ্ছে, কপাল! তেমন অবিচারী ভগ্বানে আমার দরকার? লুট করেঙ্গা— খায়েঙ্গা।

গঞ্জে মেড়ো ব্যবসায়ীদের নিকট চন্দ্র হিন্দী জবান শোনে। আজ তার সুযোগ গ্রহণ করিল।

চন্দ্র যোগীনকে তাল দিতে শেখায়। গান করে সঙ্গে সঙ্গে : লুট করেঙ্গা-খায়েঙ্গা।
লুট করেঙ্গা—

আজহার খাঁর মুখাবয়বের উপর চন্দ্রের দৃষ্টি পঞ্জীয়াত্র গান থামিয়া গেল।

গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিয়াছে আজহার ঝী।

হাত বাড়াইয়া দিল চন্দ্র তার দিকে। বজিল, রাগ করছ? আচ্ছা, এখন আসল কথা পাঢ়া যাক।

জিজ্ঞাসা করে আজহার, কি কথা?

কি বলেছিলাম?

সে প্রশ্ন এতক্ষণ আজহার খাঁর মনে কোন চিহ্ন বজায় রাখে নাই। নিতান্ত নির্বোধের মতই সে উন্নত দিল।

কি বলেছিলে?

একচোট হাসিয়া লইল চন্দ্র।

তা আর মনে থাকবে কেন। মাছ-ব্যবসা তোমার সঙ্গে?

আরো অপ্রতিভ হয় আজহার ঝী।

লজ্জায় সে অস্পষ্ট কষ্টেই জ্বাব দিল, জানো তো আমার অবস্থা। টাকাও ধার পাওয়া গেল না।

খামাখা এতক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলে। চোখে চেয়ে দ্যাখো না। পেট চলে না, ব্যবসা করব। তা একটা কানাকড়ি পুঁজি নেই।

তারপর চন্দ্র চুপ করিয় গেল। চন্দ্রমণি নিঃশব্দে আসিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে-ই নীরবতা ভাস্তিল।

—দাদা, মাছের ব্যবসার জন্য যোগীনের বাবারও খুব ঝৌক ছিল।

চন্দ্র ইঁ শব্দে সায় দিল মাত্র।

যোগীনের মামার সঙ্গে খেলা বন্ধ। সে অভিযানীর মত বসিয়া আছে। চন্দ্র তার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল।

এই ছোটমামা, আমাদের যুক্তি আঁটাই রইল। না, আর ব্যবসা করব না। চাষবাস করব না।

আজহার মনে করে চন্দ্র তার উপর বিরক্ত। খট্কা মুছিয়া ফেলিবার জন্য সে সরস কঢ়েই বলিল, আমার উপর রাগ করো না, চন্দর। গেল দু'বছর কি করে যে সংসার চালিয়ে নিয়ে আসছি, আমিই জানি।

চন্দ্র যোগীনের ঘাকে আর এক কক্ষে তামাক আনিবার জন্য আদেশ করিল।

তোমার উপর রাগের কি আছে। রাগ-সব ওই যে তুমি কী বলো—কপাল, কপালের উপর।

আজহার ভিজা কাপড়ে বসিয়াছিল। সে যেন কত অপরাধ করিয়াছে। সহজে চন্দ্রের দাওয়া হইতে উঠিতে পারিতেছিল না।

চন্দ্রমণি গম্ভনে এক কক্ষে আশুন লইয়া হাজির হইল। আজহার নিজীবের মত দু'এক টান দিয়া কক্ষে আবার প্রত্যাপণ করিল।

ঝঁ, চলো, জমির ধানগুলো দেখে আসি। তুমিও বাড়ি যাবে।

দু'জনেই সড়ক ধরিয়া অগ্রসর হয়। চন্দ্রের হাতে দু'টি লালগোফ তপসে মাছ। আজহার আনন্দনা, কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই। কোটালের কোন সাহায্য করিতে পারিল না, এই চিন্তা তার মনে কোথায় যেন বিধিতে থাকে।

চন্দ্র বেপরোয়া। সে তার স্বকীয় পদক্ষেপের ভঙ্গী বিস্মৃত হয় না।

বৃষ্টির পর দিগন্তের আবিলতা মুছিয়া গিয়াছে। শাদা বকের দল বিলের ধারে কোলাহলরত। খালের তীরে নল-খাণ্ডার ঘোপের পাশে একটি মাছরাঙা বাসা হইতে গলা বাড়িয়া আবার সন্তুষ্ণ নীল আকাশে মিশিয়া গেল নিমেষে। চন্দ্র কোটালের চুঁটু চাহনি এক জায়গায় স্থির থাকে না।

আজহার পেছনে-পেছনে ইঁটিতেছিল। হঠাৎ চন্দ্র পাশ ফিরিয়া চাওয়ামাত্র আজহার ধরা গলায় বলে, চন্দর, মনে করিস নে কিছু, ভাই। আমারও বরাত। কপাল ত খুলল না। ব্যবসা করে একবার দেখা যেত।

চন্দ্র কোটাল অবাক।

নিশ্চয় রাগ করব। তপ্সে মাছদুটো যদি ছেলেপুলে নিয়ে ভেজে না খাও, রাগ করব না?

হাসিমুখে চন্দ্র আজহারের হাতে মাছদু'টি গুঁজিয়া দিল।

চন্দ্র কোটালের মনে চন্দ্রমণি, সংসার, যোগীন, গোপাল সকলে এক-একবার উঁকি দিয়া যায়। দুঃখের পশরা যেন হালকা হইয়া গিয়াছে। আজহারের সঙ্গ তার আরো ভাল লাগে।

আজহার ভাই, তোমার সঙ্গে একবার বিদেশে যাবু। রাজমিঞ্চীর কাজ শিখিয়ে দাও সামান্য।

আজহারের নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না। চন্দ্র তার বিষণ্ণ মুখের দিকে

একবার মাত্র চাহিয়া নীরবে হাঁচিতে লাগিল ।

একটা শাদা গাঞ্জিলের তৌক্ক স্বর প্রান্তরে মূর্ছাহত স্পন্দিল আবেশের মত বিলীন হইয়া যায় ।

৭

কয়েক কাঠায় আউশ ধান দিয়াছিল আজহার ।

বর্ষার মাঝামাঝি পাকা রঙ ধরিয়াছে আউশের ধানে । হঠাৎ সে রাজমিস্ত্রীর কাজে কল্পিক ইত্যাদি লইয়া ভিনগাঁয়ে চলিয়া গেল । সমস্ত সংসার রহিল দরিয়াবিবির উপর । পূর্বে বিদেশে যাওয়ার আগে আজহার খী শলাপরামর্শ করিত স্তুর সহিত । এবার কোন কথা সে উচ্চারণ করে নাই । দরিয়াবিবি আজহারকে যত্নপাতি লইতে দেখিয়াছিল । কোন ভিনগাঁয়ে যাইতেছে সে, এমন ধারণা দরিয়াবিবির মনে ঘুণাঘুণের উদিত হয় নাই । পরে আমজাদ আসিয়া খবর দিয়াছিল । পিতার বিদেশ্যাত্ত্বার সংবাদ শুধু সে-ই প্রথমে অবগত হয় ।

তুই ঝুট বলছিস, আমু ।

না মা । আবু বললে, কোথায় নিয়ামতপুর আছে, সেখানে কাজে যাচ্ছে ।

অবেলা সঙ্গীদের সঙ্গে আমজাদ তেপান্তর-জরিপে বাহির হইয়াছিল । আকম্বিক সাক্ষাৎ পিতা-পুত্রে । নিতান্ত দৈবাতের যোগসাজশ মাত্র ।

দরিয়াবিবি কিছুক্ষণ শুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । এমনও লোক সংসারে আছে! বিদেশে যাইতেছে, তা-ও বাড়ির লোকদের একটু খুন্দুমাত্র দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না ।

হই ইস্টিশনের দিকে গেল । মা, আবুকাকে দেখলে একটা পাগল মনে হয় । মুখে কথা নেই । মাথা গুঁজে চলেছে ত চলেছেই । ইঁশঙ্গস নেই ।

দরিয়াবিবির ঠোঁটে এতটুকু দাগ পড়িল না ।

মা, কী হাসি লাগে আবুর ছিরি দেখলে । লুঙ্গিটা পর্যন্ত ভাল করে পরতে জানে না । কোন রকমে কোমরে গুঁজলেই বুঝি কাপড় পরা হয়? তার উপর হেঁড়া পিরহান ।

দপ করিয়া জুলিয়া উঠিল দরিয়াবিবি ।

যা, আর কথার খৈ ফোটাতে হবে না ।

আমজাদ কেঁচো বনিয়া গেল ।

দরিয়াবিবি লক্ষ্য করে, সক্ষ্য নামিয়া আসিতেছে । ঘন কৃষ্ণপক্ষ । আজ আর চাঁদ উঠিবে না সড়কের উপর । ইস্টিশনের পথ অনেক দূর ।

তোকে আর কিছু বলে নি, তোর আবো?

আমজাদের ত্রন্ত-সমুচ্চিত চিবুক ছাইয়া দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল । পিতৃহীন কোন অনাথের চিবুক যেন স্পর্শ করিতেছে দরিয়াবিবি । কষ্ট তার নুইয়া পড়ে ভাবাবেগের আতিশয্যে । হঠাৎ এমন দীনতার প্রলেপ তার মনে ও শরীরে । অসোয়াস্তি অনুভব করে জননী । বালকপুত্রের জবাব আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া যায় ।

খলিল বলিল, আমু, কাজে যাচ্ছি নিয়ামতপুর ।

নিয়ামতপুর কোথা মা?

দরিয়াবিবি কোন উত্তর দিল না। আজ ক্ষেত্র হয় তার। হিংসা-উত্তৃত ক্ষেত্র। সমস্ত সংসারকে এমনই নির্বিকার চিত্তে সে দেখিতে পারিত! রাত পোহাইলে শত কাজ, মনের চারিদিকে আরো সহস্র বেড়ির সর্পিলতা।

আমজাদ সম্মুখে না থাকিলে অবোধ বালিকার মত কাঁদিয়া ফেলিত দরিয়াবিবি। দৃষ্টি নেপথ্যে মিলাইয়া, বালকপুত্রের উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে স্থাণু প্রতিমার মত।

নঙ্গিমা পিতার ন্যাওটা। পাড়ার কোন বালকের মুখে সে বাবার বিদেশ-যাত্রার কথা প্রনিয়াছিল। তার কান্না আর থামে না। রোদন-আতুর কন্যার কষ্টস্বরে চমক ভাঙিল দরিয়াবিবির।

মা, আমাকে আৰুৱা নিয়া গেল না। নঙ্গিমা চীৎকার করে।

চুপ। না হলে শার খাবি।

মা'র ধূমকে নঙ্গিমা শাস্ত হয়।

দরিয়াবিবি বলে, আমু, ও-কে তোমার মখ্তবের বইয়ের ছবি দেখাও।

তখনও সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, দরিয়াবিবির খেয়াল ছিল না। তাই আবার বলিল, আমি ডিপে জ্বেলে দিছি, একটু সবুর কর বাবা।

নাচ-দুয়ারে প্রদীপ দেখাইতে আসিয়া দরিয়াবিবি গুরুগুলির চেহারাও একবার দেখিয়া লইল। যদি বৃষ্টি না হয়, কিছুক্ষণ চরাটের জন্য ছাড়িয়ে দেওয়া হইবে। আমু ছেলেমানুষ। অপরের ফসলে না পড়ে, সে ভয়ও আছে। খোঝাড়ের পয়সা যোগানের ক্ষমতা যাদের আছে তাদের গুরু-বাহুর ছাড়া থাকে ফসলের দিনেও।

নিমগাছের নিচে পোয়াল-খড়ের গাদাটি বড় অডুত ঠেকিল আজ দরিয়াবিবির। নিঃসঙ্গ মনে হয় ভিটের আশ-পাশ। প্রদীপ দেখাইয়া তাই তাড়াতাড়ি সে পুত্র-কন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একজোড়া পেঁচা উড়িয়া গেল। অঙ্গলের আশঙ্কায় দরিয়াবিবির বুক দুরুদুর করে। ছেলেদের কাপড় চুরি গেল কয়েকটি। হাত-ছ্যাচড়ের উপদ্রবে রাত্রির ঘূম ব্যাহত হয়। পুরুষ মানুষ ছিল ঘরে, তবু ভরসা। নিঃসঙ্গতা আর একবার হানা দিয়া গেল। বেলাবেলি গেরহালির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। দরিয়াবিবি আমজাদের পাশে বসিয়া তার পড়া শোনে : একদা দিল্লী নগরীর পথে।

নঙ্গিমা হি হি শব্দে হাসে : দিল্লী-বিল্লী হি-হি।

চুপ করে শোন। গোলমাল করিসনে, নঙ্গিমা। বড় সজাগ আজ দরিয়াবিবির কান।

আমু পড়াশোনা করিতেছে, তার গোলমাল নেহাঁ কম নয়। তবু বেড়ার ধারে কি গৈষ্ঠার কাছে সামান্য শব্দ হইলে দরিয়াবিবি উৎকর্ণ হইয়া পড়ে।

ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তার চারিদিকে শুধু রুক্ষতা; সবুজ রঙের ফিকে আভাস পর্যন্ত নাই। দৃষ্টি মেলিয়া দিলে চাঁচর বালুর অকরূণ হাসিই একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

দরিয়াবিবি কোনদিন বাস্তবের সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িতে শিখে নাই। আজ সামান্য ব্যাপারটুকু কেন্দ্র করিয়া এতকিছু ঘটিয়া গেল।

সগৃহ কবে শেষ হইয়া যায়, আজহার খাঁর কোন খবর নাই। পিয়নকে আমজাদ অনর্থক বিরক্ত করে। দরিয়াবিবিও চিত্তিত হয়। অবশ্য আউশ ধান কাটা বাকী আছে। তার পূর্বে আজহার খাঁ নিশ্চয় বাড়ি ফিরিয়া আসিবে, দরিয়াবিবির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

ধীরে ধীরে আরো দুই সগৃহ কাটিয়া গেল। সাকেরকে ডাকিয়া দরিয়াবিবি বহু খেদোক্তি করিল। জওয়ান মরদ বিদেশে গিয়াছে, তার জন্য এত ভাবনা-চিন্তা ভাল নয়। এই উপদেশ দিয়া সে সরিয়া পড়িল।

দরিয়াবিবি চারিদিকে অঙ্ককার দেখে। হাত-খরচ শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোটছেলে আর মেয়ের মুখে দৈনন্দিন আহার্যটুকু কি শেষে যোগাইতে পারিবে না, ধার-কর্জ করিয়া কতদিনই চলিবে?

দরিয়াবিবি উপায়ের খৌজে অঙ্ককারে হামাগুড়ি দিতে থাকে। ছাগলছানা দু'টি থাকিলে দুর্দিনে কাউকে বিক্রয় করা যাইত। সে পথেও আস্তা বাধ সাধিয়াছেন। পুরুষমানুষ ঘরে থাকলে কোন না কোন পথের হাদিস মিলিত। বর্ষাকাল, পাড়া-প্রতিবেশীরা কোন রকমে দিন গুজরান করে। বীজধান খাইয়া অনেকে শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। এই সময় জন-মুনিশ লোকে কম খাটায়। চারিদিকে বিপদের বেড়াজাল। প্রত্যোকে আঘ-বিব্রত। গরীব কৃষক-পল্লীর ভেতর সহানুভূতি বুক-ফাটা নিঃশ্বাসের রূপ ধরিয়া বাতাসে ধ্বনিত হয়। আর তিন-চার দিনের খোরাক আছে। তারপর?

পরদিন সাকেরের মা'র সঙ্গে দরিয়াবিবি দেখা করিতে গেল। বৃক্ষার গওস্তল আনন্দে স্বচ্ছ হইয়া উঠে। হাসু-বৌর নিয়ৎ আস্তা পুরা করিয়াছে এতদিনে। আনন্দে সাকেরের মা এই বয়সেও অস্থির হয়। দরিয়াবিবি ঠাট্টাছলেই দাওয়াতের কথা পাড়িয়াছিল। বৃক্ষ শুধু রাজি হইয়া গেল না, রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করিল। দরিয়াবিবি আজ সরলচিত্তে নিমগ্নণ গ্রহণ করিতে পারে না। কোথায় যেন্ন মনে ব্যাপারটা বেঁধে। ঘরে ভাত নাই, এমনদিনে দাওয়াত স্বীকার করিলে পাড়া-পল্লীরা হীন চোখে দেখিবে। তবু রাজি হইয়াছিল দরিয়াবিবি। এক বেলার খোরাক অস্তত বাঁচিয়া গেল। আসেকজানও সেইসঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

এতদিন আসেকজানের প্রতি দরিয়াবিবির একরূপ করণ্ণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব ছিল। ইদনীং অন্য চোখে দেখে এই বৃক্ষকে। সংসারে নিজেদের অসহায়তার সঙ্গে আসেকজানের দশা সমান পাল্লায় ওজন করা চলে, দরিয়াবিবি তা গভীরে উপলক্ষ্মি করিতে শিখিয়াছে। পূর্বে তার কোন খৌজ-খবরই সে লইত না। কখন খায়, ঘুমোয় বা অভুক্ত থাকে তার হিসাবের প্রয়োজন ছিল না দরিয়াবিবি। বর্তমানে মনের এই বোঝাবাহী প্রবৃত্তির তাড়না সে নিজেই অনুভব করে।

বর্ষায় আসেকজান বাহির হইয়া যায়। দাপাদাপি বৃষ্টি তোড় চলিতেছে, সে কিন্তু থামে না। হয়ত তার দাওয়াত থাকে অথবা থাকে না—কিন্তু দাওয়াতের বাহানা সে শোল আনা করে।

ঘরে চাল শেষ হইয়া আসিতেছে। আসেকজান সব খবরই রাখে। এই বিষয়ে আমজাদ তার সহায়। রাত্রিবেলা ঘুমাইতে গেলে আসেকজান খুটাইয়া খুটাইয়া সব জিজ্ঞাসা করে।

জালায় আর বেশি চাল নেই, দাদি। মা কত রাগ করছিলেন আব্বার উপর।

আসেক্জান প্রশ্নের জবাবে চুপ করে কিছুক্ষণ, আবার বলে : আজ পেট-পুরে ভাত খেয়েছো ?

হ্যাঁ, দাদি ! মা কিন্তু ভাল করে থায় না ।

আসেক্জান স্তন্ধ হইয়া গেল আবার ।

এমন সংলাপের বিনিময় চলে ।

পরদিন জালার তেতর হঠাতে বেশি চাউল দেখিয়া দরিয়াবিবি আমজাদকে ডাকাইল ।

দরিয়াবিবি : জালায় চাল এলো কোথা থেকে ?

আমজাদ : আমি কি জানি, মা ।

দরিয়াবিবি ব্যাপারটা সহজে আন্দাজ করে । অন্যদিন হইলে এতক্ষণে কুরঙ্ক্ষেত্র বাধিয়া যাইত । সদূক-জাকাতের চালে তার শিশুদের জঠর-সেবা চলিতে পারে না । আজ দরিয়াবিবি নিজেই অন্যদিকে কথার স্ন্যাত ফিরাইল ।

তুই পিয়নকে জিজ্ঞেস করেছিলি, টাকা বা চিঠি কিছু নেই ?

আমি রোজ জিজ্ঞেস করি, মা ।

কাল আর একবার যাস ।

মা'র কঠ এত মোলায়েম হইতে পারে, আমজাদের বিশ্বাস হয় না ।

বড় মিষ্টি মনে হয় মা'র গলা : আয়ু, ধান পেকেছে নাকি দেখে আসবি কাল । মুনিশ করে কাটাতে হবে আর কী ।

আমজাদ মাথা দোলাইয়া সায় দিল ।

রান্নার জন্য মা চাউল মাপতে আসিয়াছিল । হঠাতে আমজাদকে আদর করিতে আরম্ভ করিল দরিয়াবিবি । যেন কত কথা আছে আরো, তা আজ বলিয়া শেষ করা যায় না । তাই মেহের হোঁয়াচে সমাপ্তি-রেখা টানা হইতেছে । মা'র চুম্বনে বিব্রত হয় আমজাদ ।

বাইরে বাঁশবনে মিরির শব্দ শোনা যায় ।

পরদিন দুপুরে আমজাদ স্তুতি হইয়া গেল । সামান্য অন্যায়ে মা এমন শান্তি দিতে পারেন । মখ্তবের বেতন চাহিয়াছিল সে । হয়ত মা'র মেজাজ ভাল নয়, সেইজন্য চাওয়া উচিত হয় নাই; কিন্তু জননী এমন বেদেরেগ হাত চালাইতে পারে, তার জানা ছিল না ।

মার খাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সে নীরবে অশ্রুপাত করিল বহুক্ষণ । নদীমা পাশে, দাঁড়াইয়াছিল । অনুভূত জননীকে যদি একটিবার পাওয়া যায় । দরিয়াবিবি শত 'কান্তাম' জুড়িয়াছিল । আজহার ও তার চৌদ্দপুরুষের চলিশার আয়োজন হইতেছিল দরিয়াবিবির ঠোঁটে । আমজাদ আনমনা অলঙ্কিতে ভিটা হইতে সরিয়া পড়িল ।

মাঠে আসিয়া সে শান্তি পায় । আজহারও এই প্রান্তরের বুকেই দীর্ঘশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারে । রক্তের শৃংখলে বোধ হয় আমজাদ বাঁধা পড়িয়াছিল ।

সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল মাঠে মাঠে । আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিল না । ঘুরিয়া বেড়াইতে কোন বাধা নাই ।

বেলা ঢলিয়া পড়িতে তার ভয়ানক ক্ষুধা লাগিল । বর্ষাকালে ধান ছাড়া অন্য চাষ নাই মাঠে । শ্রীস্মের দিন হইলে তরমুজ-শশা খাইয়া আমজাদ মা'র উপর প্রতিশোধ গ্রহণ

করিত । অদৃশ্য হাতের টানেই সে চন্দ্র কোটালের কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হইল ।

নদীর মোহনার কাছে একটা পিণ্ডলী গাছের তলায় বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল । চন্দ্র কাকার বাড়ি সোজাসুজি যাইতে আজ বাধে । মনের আবহাওয়া অতটুকু খোকাও সহজে মুছিয়া ফেলিতে পারে না । চন্দ্রমণি একবার কলস-কাঁখে খালের ধারে আসিয়াছিল । আমজাদকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে বসে আছ যে—?

আমজাদ জবাব দেয় না । তার মুখ শুষ্ক । চোখের পাতার নিচে কান্নার শুক ছাপ ।
রাগ করে এসেছো বুধি বাড়ি থেকে?

চন্দ্রমণি ঠিকই আন্দাজ করিয়াছিল ।

চলো, তোমার কাকা ঘরে আছে । কি হয়েছে?

আমজাদ শুধু মাথা হেঁট করিয়া থাকে । চন্দ্রমণির অনুরোধ সে রক্ষা করে না ।

এই সময় চন্দ্র কোটালও আসিয়া উপস্থিত হইল ।

কি রে চৌদ্দমণি ।

এই দ্যাখো না, দাদা । তোমার বন্ধুর ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে ।

চন্দ্র আমজাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিল । সে নির্বাক নিশ্চল । তার কঠি সুন্দর দুই চোখও দূরে উধাও ।

হাসিয়া ফেলিল চন্দ্র ।

আরে চাচা, গাছের তলায় শেষে তপ করতে বসেছো নাকি? তোমার বাবা বড় নামাজী-মুসল্লী । তার ছেলে ।

আমজাদ কারো দিকে চায় না ।

কোটালরা দুই ভাইবনে বুব ঝুশিতে থাকে ।

শীস দিয়া চন্দ্র গান ধরিল—

কথা কয় না ।

আমার ময়না ।

তবু আমজাদের ঠোঁটে কোন আভাস নাই । চন্দ্র এইবার একটা শীস দিয়া ‘সু’ শব্দ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমজাদকে পাঁজাকোলা করিয়া একদম কাঁধে তুলিয়া লইল ।

মৌনী বাবা এবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্না শুরু করিল ।

কথা কয় না

আমার ময়না,

হায়, হায় রে ...

চন্দ্র খালের সড়কে হাঁটে ।

চন্দ্রমণি ডাকে, ও দাদা, ছেলেটাকে দুটো মুড়ি খাইয়ে নিয়ে যাও ।

মাথা দোলায় । হ্যাঁ, বড় কথা মনে করেছিস, মণি ।

কোটাল আবার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইল ।

বৃষ্টি ঝরিতেছিল অঝোরে । মাঠের খোলা জায়গায় জমাট টইটমুর পানির উপর আকাশের ছায়া পড়ে । বর্ষা থামিলেই শালিখ-চড়াই আসিবে স্নানের লোভে ছুটিয়া ।

দরিয়াবিবি সদর ছাড়িয়া সড়কের ঘুলি-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল । জীবনে আর কোনদিন সে এতদূর আসে নাই, মাথায় চটের থলি টোকার মত করিয়া দেওয়া । পায়ের তলায় বৃষ্টিশ্রাত বহিয়া যাইতেছে । চটের থলি পানি রোধ করিতে পারেনা । ইতিমধ্যে উপরদিক ভিজিয়া গিয়াছে ।

দরিয়াবিবি নির্বিকার দাঁড়াইয়াছিল । বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে, তবু খেয়াল নাই । কার প্রতীক্ষায় সে দাঁড়াইয়া আছে?

সড়কের একপাশে গাছপালার নৈরাজ্য অল্প, তাই দূরে মাঠ দেখা যায় । অন্যান্য দিকে আকাট লতা আর গাছপালার জঙ্গল । মেঘমেদুর আকাশের আচ্ছাদনে নীরব-নিরিড় পল্লীর এই বিজন কোলটুকু ভয়াবহ, প্রেতায়িত— সামান্য শব্দে চমক লাগে ।

সড়কে দরিয়াবিবি দাঁড়াইয়া থাকে । চপ্পল চোখ বারবার সড়কের দূরতম রেখায় । তার গল্পীর মুখাবয়ব আকাশের বাদল যেন ।

হঠাতে দরিয়াবিবির দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে । দূরে একটি বালকমৃতি দেখা গেল । আমজাদ দ্রুত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে । একটিম্বাত্র লাল গামছা তার মাথায় ।

বৃষ্টির পতন-রেখার ভেতর দিয়া তার বালকমৃতি অপরূপ দেখায় । একটি পুতুল লাফাইয়া চলাফেরা করিতেছে ।

দরিয়াবিবি আকশ্মিক উৎফুল্ল হইয়া উঠে । আমজাদ তার নিকটে পৌছিবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করে, শৈরমীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

বৃষ্টিম্বাত্র তার সমগ্র শরীর । শীতে আমজাদ কাঁপিতেছিল । সহজে জবাব দিতে পারে না ।

মা'র কাছে ঘেঁসিয়া সে হাঁফ ফেলে কিছুক্ষণ, তারপর বিশগ্নমুখেই জবাব দেয় : না গো মা । তবে শৈরমী-ফুফুর 'জা' বললে, সে মাঠ থেকে তোদের বাড়ি যাবে ।

শৈরমী জাতে বাগ্নী । কৈবর্ত-পাড়ার ঠেস ছাড়াইয়া গেলে জনপদের একটেরে বাগ্নীদের বাস । শৈরমীর সংসারে একমাত্র পঙ্কু পুত্র জীবিত । বহুদিন পূর্বে তার স্বামী পরলোকে । গণেশ দীর্ঘকাল রোগে ভুগে পরে হঠাতে আকেজে হইয়া পড়ে । সেজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, এক হাত বাঁকিয়া গিয়াছে । বৃক্ষ বয়সেও শৈরমীকে এই পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে । পাড়ায় সে ঘুঁটে দেয়, মাঠের শাক তুলিয়া বেচে, কারো বাজার-সওদা কিনিয়া আনে । ফাইফরমাশেই তার জীবিকা সংগ্রহ হয় । জওয়ান পুত্রের এই দুরবস্থা । কায়িক পরিশ্রমের চাপেই শৈরমী তা সহ্য করিতে শিখিয়াছিল । দরিয়াবিবির সঙ্গে কয়েক বছরের পরিচয় । শৈরমী এই বাড়ি ঘুঁটে দিয়া যায় । সেই সূত্রেই হন্দ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল । শৈরমী গ্রামেরই খিউড়ী বলিয়া সে দরিয়াবিবিকে ভাবী সমোধন করিত ।

আমজাদ শীতে কাপিতেছিল। সেদিকে দরিয়াবিবির লক্ষ্য নাই। কাদার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে যেন কত ভাল লাগে।

বিষণ্ণ-মুখ পুত্র ও জননী।

বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। গাছে-পাতায় মৃদু নিনাদ অহর্নিশ বাজিতেছে। পাখির ভিজে পাখনা-ঝাড়ার শব্দ এবার শোনা যায়।

যদি না আসে। নীরবতা ভাঙ্গিল দরিয়াবিবি।

না গো মা, আসবে। ঘরে চলো, আমাৰ শীত পেয়েছে।

হঁশ হয় যেন দরিয়াবিবি। আঁচলের একপাশ শুক ছিল, তা দিয়া সে আমজাদের মাথা মুছাইয়া দিল।

এখানে মুছে কি হবে মা, বিষ্টি পড়ছে যে!

গৃহকর্মে নিষুণ দরিয়াবিবির কোন কাজে যেন সুটোল নাই। বৃষ্টি পড়িতেছে, এখন চুল মুছাইয়া দেওয়া বৃথা, এই কথাটুকু সে যেন উপলক্ষ্মি করিতে পারে না।

একটা অশৰ্থ গাছের গোড়ায় অনেক ব্যাঙ লাফাইতেছে। শীতে কাপিতেছে, তবু মজা লাগে বেশ আমজাদের। খপ খপ করিয়া একটি ব্যাঙ সড়কের উপর বসিয়া বাদল পোকা খাইতেছে নীরবে।

আমজাদ জোরে এক 'সুট' দিয়া বলিল, মা, দ্যাখো ফুটবল খেলছি।

ধপাস শব্দে কয়েক হাত দূরে ব্যাঙটি আবার ঝাঁটির উপর পড়িল। চার হাত-পা ছাড়িয়া ফোক-ফোক শব্দ করে ব্যাঙের বাচ্চা।

দরিয়াবিবি এই সময় হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না।

আরে আয়, তোর ছেলেমি আৰ যাস্তুমা।

নিজের কৃতিত্বে আমজাদ গল্পীর হইয়া যায়। মাথা দোলাইয়া সে বলে, ঘরে আমাকে কিন্তু গৱম ভাত খেতে দিতে হবে। এত ভিজেছি, আমাৰ বুঝি কিন্দে লাগে না।

দরিয়াবিবি চুপ করিয়া গেল। তার মুখের হাসি নিভিয়া যায় তখনই।

আরো আকাশে মেষ জমিতেছে। আরো কতদিন বৰ্ষা লাগিয়া থাকিবে বাংলাদেশের আমে?

নইমা কোথাও যায় নাই, আসেক্জানের সঙ্গে সে বাগ-বিতুগা করিতেছিল। দু'জনে মাঝে মাঝে কৃত্রিম বিবাদ চলে। গতকাল আসেক্জান কিছু চাল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল। তারই সদ্গতি হইতেছে।

পান্তাভাত ছিল সকালের। দরিয়াবিবি রান্নার আয়োজন করে নাই। আমজাদ বাঁকিয়া বসিল, সে পান্তাভাত খাইবে না।

মেজাজ খারাপ, তবু দরিয়াবিবি আজ চুপ কলিয়া গেল। অতিমানে আমজাদ কিছুই স্পর্শ করিল না। বিছানায় শইয়া শইয়া ক্ষুধার্ত জঠরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

দরিয়াবিবি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া বসিয়া রহিল। গোয়ালে গুঁগুলি খড় চিবাইতেছে। আজ আৰ কোন হাঙ্গামা নাই। কত নিশ্চিন্ত যেন দরিয়াবিবি। নইমা আসেক্জানের ঘরে খেলা করিতেছিল, তার আওয়াজ কানে পৌছায়।

বৃষ্টির কামাই নাই।

নিন্দিত আমজাদের দিকে চাহিয়া দরিয়াবিবির বুকে শত তরঙ্গের আলোড়ন চলিতেছিল।
বাহিরে তার প্রকাশ নাই। দরিয়াবিবি চুপচাপ বসিয়া। বহুদিনের যেন অবকাশ মিলিয়াছে।
কর্মসূত্র জীবনে খুটিনাটি দিনগুলি তাই স্মরণে গাথা হইতেছে।

সামান্য পাত্তাভাত ছিল। দরিয়াবিবি খাওয়ার কথা সহজেই ভুলিয়া যায়। তারও ঘুমে
চোখ বুজিয়া আসে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া দরিয়াবিবি চুলিতে থাকে।

কোথা গো ভাবী, শব্দে চমকিয়া উঠিল দরিয়াবিবি।

সত্যই শৈরমী আসিয়াছে। ভিজে কাপড়। হাতে একটি ন্যাকড়া কাপড়ে বাঁধা শাকের
পুটুলি।

দাওয়ার উপর বোঝা রাখিয়া শৈরমী বলিল, কেন ডেকেছিলে, ভাবী?

দরিয়াবিবি শৈরমীর কাছে যেন ছুটিয়া আসে। সুম উবিয়া গিয়াছে তার।

এই রাস্তায় যে ছায়া পড়ে না আর দিদির।

শৈরমীর রং কালো। বৃক্ষ বয়সে চামড়া লাল হইয়া গিয়াছে।

রেখা-সংবলিত শরীরে আবার বৃষ্টিপাত শৈত্যের জ্বলুম। কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া
গিয়াছে শৈরমী। বড় কৃৎসৎ দেখায় তার শরীর।

কিন্তু তার কষ্টে হস্তয়ের অপূর্ব আভাস বাজে: কত কাজে থাকতে হয়, তোমার কাছে
কি অজানা ভাবী। বর্ধাকালে ছেলেটাকে নিয়ে কটের সীমা নেই।

এইবার রীতিমত হাঁপায় শৈরমী।

দরিয়াবিবি গণেশকে কোনদিন দেখে নাই। তবু শৈরমীর দুর্দশা তার কাছে বাস্তব।
কোন কল্পনার প্রয়োজন হয় না তার।

নসীব, বোন। তোমার অমন রোজগারী পুত্রের এমন অসুখ দিলে, আল্লা।

শৈরমী বুকে দুই হাত রাখিয়া উত্তৃপ খোঁজে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে চায় না সে।
দরিয়াবিবি সহজে কোন কথা পার্জিতে দিখাগ্রস্ত, কেবল দেরীর বাহানা তার।

পুটুলিতে কী আছে, দিদি?

শৈরমী জবাব দিল, ভাবী, ক'টা শাক আছে। একটু তেল আন, একদম 'চান' করে
ঘরে ঢুকব।

দরিয়াবিবি ঘরের ভেতর হইতে সরিয়ার তেলের ভাঁড় আনিল।

শৈরমী তখন পুটুলি খুলিতেছে। সে একরাশ শাক দাওয়ার উপর রাখিয়া দরিয়াবিবির
মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

আর দেবো, ভাবী?

না, এত মেটে শাক কি খাওয়া যায়! আর কি আছে পুটুলিতে?

কিছু নেই।

কৌতুহলের ছলে দরিয়াবিবি শাকে হাত দেওয়া মাত্র তার নীচে শামুক দেখিতে
পাইল।

বেশিদূরে সে অগ্রসর হইল না। দরিয়াবিবি বুঝিতে পারে, শৈরমী ত খুব সুখে নাই।
হাঁসের জন্য শামুক লইয়া গেলে এমন গোপনের কী আছে। আর বেশি কথা জিজ্ঞাসা
করিল না দরিয়াবিবি।

ভাবী, এবার উঠি।

আর একটু বসো। বুড়ো হাড়ে কী এত শীত চুকেছে?

ক্ষিম কোপনতার সঙ্গে বলে দরিয়াবিবি।

শৈরমী অনুনয় করে : ভাবী, আর এক দিন এসে গল্প করে যাব। যাই, ছেলেটাকে বর্ষায় ঘরে একা রেখে মন মানে না। পাছে কিছু হয়।

দরিয়াবিবি ক্ষিমক্ষণ কোন জবাব দিল না। পিড়ির উপর বসিয়াছিল মাথা নীচু করিয়া, তেমনই বসিয়া রহিল। মুখের উপর কালো ছায়া পাঁচারী করে তার।

হঠাৎ এক দম্কা নিঃশ্বাসে দরিয়াবিবি বলিয়া ফেলিল, দিদি, তোমার গুণধর ভাই তিন হঞ্চা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে মুখ কালা করে। ঘরে বজ্জ টানাটানি। একটা পুরাতন ঘড়া আছে— রেখে যদি কেউ পাঁচটা টাকা দেয়। আমি সুন্দ দেবো মাসে মাসে।

শৈরমী বিশ্বাস করে না। মিছামিছি বলছ, ভাবী।

দরিয়াবিবি হৃদ্যতার জন্মাই শৈরমীকে কোনদিন কোন দুঃখের কথাই বলে নাই, বরং শৈরমীকে এক-আধটা পয়সা দিয়া সাহায্যের চেষ্টা করিয়াছে, আধ পয়সার শাক এক পয়সায় কিনিয়াছে।

হৃদ্যতার এই আর এক সোপান।

আজহারের উপর দরিয়াবিবির ক্রোধের অস্ত থাকে না।

দ্যাখো না, দিদি। ঘর ছেড়ে পালালো। আমিও বায়েস থাকলে কাউকে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এমন লোক ভৃ-ভারতে না জন্মায়। এমন—

শৈরমী ধর্মক দিয়া বলিল, কি-সব অন্যাছিটির কথা মুখে আনছ অবেলায়, ছিছি! তুমিও দিদি, সামান্য বাতাসেই হেলে পঢ়ো?

দরিয়াবিবি স্তুক হইয়া যায় হঠাৎ।

আচ্ছা, ঘড়াটা দাও। অধর সাতের মার কাছে রেখে পাঁচটা টাকা আন্ব। বুড়ি দু'পয়সা সুন্দ চায় মাসে।

তাকেই দিও।

ধীরে কথা বলে দরিয়াবিবি। দুই চোখ ছলছল করে তার।

বাবাজী বিয়ের সময় যৌতুক দিয়েছিল। আগে কপাল ভেঙেছিল। সেখান থেকে অতিকষ্টে ঘড়া আর পেতল-কাসার কটা জিনিস এনেছিলাম।

-সজল ডাগর দুই চক্ষু দরিয়াবিবির বাস্পায়িত। থমথমে আকাশের মত মুখাবয়ব বড় সুন্দর দেখায়। পরিশ্রম-মলিন গৌর রঙ বিদ্যুতের আভাসের মত থেলিয়া গেল।

শৈরমী দুঃখ প্রকাশ করে : দাদার এমন উচিত হয় নি। ভাল ঘরের বউড়ী বাইরে বেরোয় না, সংসার দেখবে কে?

তুমি-ই বলো দেখি, দিদি।

দরিয়াবিবি কয়েক মিনিটের জন্য ঘরে চুকিল। যখন বাহির হইল তার হাতে একটি পুরাতন পিতলের ঘড়া।

মাটির উপর রাখা মাত্র ঠুন শব্দ হয়।

শৈরমী বারবার ঘড়াটি পরীক্ষা করিতে লাগিল।

দেখব ভাৰী, যদি দুএক টাকা বেশি দেয়। যে মজবুত জিনিস।

বৃষ্টি থামিয়াছিল কিয়ৎক্ষণের জন্য।

দৱিয়াবিবি একটি পান শৈৰমীৰ হাতে দিয়া বলিল, দিদি, আঁচলেৰ আড়ালে নিয়ে
যাও। কেউ জিজেস কৱলে যেন বলো না, আমাদেৱ ঘড়াট। দিবি রইল, দিদি।

ভাৰী, এতদিনে আমাকে এমন কাল-কেউটে ঠাওৱালে। অদেউ খাৰাপ না হোলে
ঘৱেৱ লক্ষ্মী পৱেৱ ঘৱে কেউ রেখে আসে?

শৈৰমী উঠিয়া পড়িল। আবাৱ বৃষ্টি শুক হইয়াছে। দৱিয়াবিবি তখনও ঘড়াট নাড়াচাড়া
কৰে। কত অনিচ্ছাৰ প্ৰতিৱোধ মনে, তবু ধীৱে ধীৱে পিতলেৰ সামঞ্জী শৈৰমীৰ হস্তে
তুলিয়া দিতে হইল।

কাউকে বল না কিন্তু, দিদি। আমাৱ মাথাৰ দিবি।

শৈৰমী চলিয়া গেল।

সামান্য চাল আছে, আমজাদেৱ জন্য ভাজা হইবে। রাত্ৰে আৱ কিছুৱ ঝাঙ্গাট নাই
দৱিয়াবিবিৰ।

দূৰে মেঘ-গৰ্জন প্ৰান্তৰ হইয়া ভসিয়া আসে। সবুজেৱ বন্যায় তৰুলতা লুটোপুটি
খায়। অবেলাৱ মৌন আকাশ দৱিয়াবিবিৰ মুখেৰ উপৰ বাৰবাৱ ছায়া ফেলে।

* * * *

এই দুৰ্দিনে চন্দ্ৰ কোটাল অনেক সাহায্য কৱিল। একটা কানাকড়ি সে দেয় নাই। গতৱে
মেহনৎ আৱ সহানুভূতিৰ কোন মূল্য নিৰূপণ কৰা যায় কী? আৱো দুই হণ্ট কাটিয়া
গেল। আজহারেৱ কোন পাণা নাই। বৰ্ষায় শোৱৰ হইয়া যাইত এতদিন পাকা আউশ
ধান। চন্দ্ৰ কোটাল মুনিশ কৱিয়া নিজে সৰু থড় আজহার খাৱে পৌছাইয়া দিয়া গেল।
এবাৱ ভাল ধান ফেলে নাই। তবু বৰ্ষায় পৰি দু'মাস কোন বকমে কাটিয়া যাইবে। দৱিয়াবিবি
দীৰ্ঘনিঃশ্঵াস ফেলিয়া বুক বাঁধে। চন্দ্ৰ কোটালেৰ উপদেশেই সে কোনো দেনা শোধ
কৱিল না। দু'মাসে যদি আজহারেৱ সংবাদ না আসে— যদি আৱ কোন দিনই না আসে।
কুটিল হতাশাৰ চক্ৰেখায় নিশ্চিপ্ত হইতে থাকে দৱিয়াবিবি।

আমজাদ একদিন মথ্তব হইতে ফিৱিয়া বলিল, মা, মৌলবী সাহেব মাইনে চেয়েছে।
দৱিয়াবিবি বিৱৰণ হয়: থাক রোজ রোজ তাগাদা কৱতে হবে না মৌলবী সাহেবকে। কাল
থেকে মথ্তব যাসনে।

আমজাদেৱ মুখ শুকাইয়া যায়।

দৱিয়াবিবি একৱা৶ খুদেৱ কাঁকৰ চয়ন কৱিতেছিল। আমজাদেৱ দিকে চাহিয়া তাৱ
বিৱৰণ ছায়া অদৃশ্য হয়। মুখ গল্পীৰ কৱিয়া দৱিয়াবিবি বলে, মৌলবী সাহেবকে বল,
আমাৱ বাপ এলে সব চুকিয়ে দেব।

আমজাদ তবু নড়িল না। সে জানে, মা ঐ এক বাক্যে বছদিন মৌলবী সাহেবকে
ত্বোক দিয়াছে।

সাহসেৱ উপৰ দিয়া আমজাদ মা'ৱ কথাৰ প্ৰতিবাদ কৱিল, তুমি ত রোজ ঐ কথা
বলো।

দৱিয়াবিবি অবনত মুখে কাঁকৰ বাছিতে থাকে, আমজাদেৱ দিকে আৱ চাহিয়াও

দেখে না ।

আমজাদ শুটিসুটি মারিয়া গতিবিধি লক্ষ্য করে শুধু ।
বহুক্ষণের নিষ্ঠকতা জগন্নল ঠেকে আমজাদের নিকট, উস্খুস্ করে সে ।
দরিয়াবিবি তার পুত্রের অস্তিত্ব যেন বিস্মৃত হইয়াছে ।
মা হঠাতে ডাকিয়া ফেলে আমজাদ । আড়ষ্ট ঠোট হইতে কোনরকমে নিঃস্ত ।
গম্ভীর দুই নেত্র প্রসারিত করিয়া দরিয়াবিবি একবার পুত্রের দিকে চাহিল মাত্র ।
মা ।

আমজাদের সংযোধন আরো বাঢ়িয়া যায় ।

এবার তীক্ষ্ণস্থরে জবাব আসে, কী?

মা ।

না । কাল থেকে আর মুখ্তবে গিয়ে কাজ নেই । তের হয়েছে লেখাপড়া ।

আমজাদ মনে মনে উল্লিখিত হয় । মুখ্তবের ছেলেদের ভাল লাগে । মুখ্তব তার
আদৌ ভাল লাগে না ।

তবে কী করব, মা?

ব্যক্তিস্থরে জবাব দিল দরিয়াবিবি : কী করবি আবার! চাষার ছেলে জাতব্যবসা ধরবি ।
আমজাদ এইবার মাথা হেঁট করে । কৃষির মত কঠোর পরিশ্রমে কোন সম্মান নেই ।
মুখ্তের হাসি অঙ্গান রাখিয়া সে জবাব দিল, আমিওই আট বছর বয়সে লাঙল ঠেলতে
পারব?

তোর ঘাড় পারবে ।

আমজাদ ভয় পায়, মা রীতিমত তুলে

এমন সময় হঠাতে চন্দ্র কোটালের ভাক শোনা গেল দহ্লিজে ।

আমজাদ হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল ।

এমনি আসিয়াছে কোটাল । আজহারের কোন সংবাদ পাওয়া গেল কিনা । নিয়ামতপুরে
ধানব্যবসায়ীরা প্রায়ই যায় । তারা কোন খোঁজ দিতে পারে নাই । অতবড় গঞ্জে আজহার
খার মত নগণ্য মানুষের তালিকা কোথাও লেখা থাকে না ।

আমজাদ কোটালের সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল । একটু পরে দহ্লিজের আড়াল
হইতে দরিয়াবিবি নিজেই কোটালকে ডাকিয়া বলে, কোটাল মশায়, আমজাদের একটা
বন্দোবস্ত করে দিন ।

চন্দ্র অবাক হইয়া যায় । আজ পর্দানশীলা দরিয়াবিবি নিজেই কথা বলিতেছে ।

লজ্জায় চন্দ্র কোটালের কষ্টস্থরে তার স্বাভাবিক গমক থাকে না ।

কেন, কী হলো, তাবী?

গরীবের ছেলে, খামাখা মুখ্তবে মাইনা শব্দে লাভ কী?

চন্দ্রের স্বাভাবিক রসিকতা-পটু কষ্টস্থর শব্দ হইয়া গিয়াছে । কিছুক্ষণ চুপ করিয়া
রহিল সে ।

তা ঠিক । তবে দুই-এক বছর দেখা উচিত । ঐ ত কঠি ছেলে ।

না, যখন বেশিদূর টানতে পারব না । খামাখা টাকা খরচ করে লাভ নেই ।

চন্দ্ৰ আৱ কোন আপত্তি উথাপন কৱিল না ।
ভাৰী, বৰং আমাৰ সঙ্গেই থাকুক । মাছ-ধৰা নৌকা বাওয়া শিখুক ।
দৱিয়াবিবি রাজি হইয়া গেল । এটুকু ছেলে এখনও সাঁতাৰ শেখে নাই! সে নৌকা
বাইবে? চন্দ্ৰেৰ উপৰ সব নিৰ্ভৰ কৱা চলে ।

পান থাইয়া আমজাদকে একটু আদৰ কৱিয়া চন্দ্ৰ কোটাল গাঁয়েৰ অভ্যন্তৰে প্ৰবেশ
কৱিল ।

পৱদিন সকালে আমজাদ অবাক হইয়া গেল । একটি ছেট লগী হাতে মা কোটালেৰ
নিকট পুত্ৰকে প্ৰেৱণ কৱিতেছে । সত্যই নৌকাৰ জীৱন আৱস্থ হইবে নাকি!

মা'ৰ দৃঢ় মুখাবয়ৰ দেখিয়া আৱ কোন আপত্তি কৱিল না আমজাদ । সামান্য মুড়ি
কোঁচড়ে সে নদীৰ পথ ধৱিল ।

দু'বছৰ আগেও দৱিয়াবিবি এমন ঘটনা-স্নোতেৱ কল্পনা কৱে নাই । কত স্বপ্ন ছিল
তাৰ চোখে শিশু-পুত্ৰ লইয়া!

তুমি কি আৱ স্বপ্ন দেখো না, দৱিয়াবিবি?

৯

মৌন মহিমায় বৰ্ষাৰ আকাশে জাগিয়াছিল তাৰা— স্ফুর্তি অন্তৰ লইয়া ।

মফস্বল শহৰেৰ অন্তঃপাতী গঞ্চোম । সড়কেৰ একটোৱে আজহার ও কয়েকজন
ৱাজমিঞ্চি বাসা ভাড়া লইয়াছিল ।

স্টেশনে যাত্ৰী পৌছাইয়া দেওয়াৰ জন্য এ অঞ্জলেৰ শেষ বাস্ বহুক্ষণ সড়কেৰ উপৰ
টায়াৱেৰ দাগ আঁকিয়া গিয়াছে ।

আজহার একমনে তখনও নাৱিকেলী হুঁকা টানিতেছিল । কক্ষেৰ দমেৰ সঙ্গে সঙ্গে
আগন্তৰে ফুলকি ওড়ে বাতাসে । কিযুৎক্ষণেৰ জন্য অঙ্ককাৰ সৱিয়া যায় । বাসাৰ দৱজা
চোখে পড়ে । আজহার চোকাঠেৰ উপৰ ।

বাসাৰ আয়তন সঞ্চীৰ । একদিকে মাত্ৰ জানালা । মাটিৰ দেওয়ালে চুন-বালি ছোপানো
কোথাও রং ধসিয়া গিয়াছে । মেঝেৰ সুস্মতল নয় । তাৱই উপৰ মাদুৰ পাতিয়া আজহারেৰ
সঙ্গী ঘূমাইতেছিল । সারাদিন বৃষ্টিৰ পৰ ভ্যপ্সা গৱমে ঘৱেৱ ভেতৰ আজহারেৰ দম বন্ধ
হইয়া আসিতেছিল । কিছুক্ষণ পূৰ্বেই বিছানা ছাড়িয়া সে চোকাঠে ধোয়াৰ আসৱ জমাইতে
মগ্ন হইয়াছিল ।

সড়কেৰ পাশে একটি ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছিল । এই অঞ্চলে ভয়ানক মশা । খালি
গায শোয়া-বসাৰ উপায় নাই । নিষ্ঠেজ ক্লান্তিৰ ছায়ায় কক্ষে টানিতে টানিতে তাৰ চোখ
বুজিয়া আসে । আশেপাশে মশা ভন্ভন্স কৱে । এক-একবাৰ গামছাৰ ঝটকা মাৱে আজহার,
আবাৰ ধোয়াৰ সঙ্গে মিতালি চলে ।

সড়কেৰ গাছপালায় অঙ্ককাৰ জমিয়া রহিয়াছে । শীতল রাত্ৰিৰ ডাকে জোনকিদেৱ
চোখ নিৰ্দ্বাহীন । পানা-পুকুৱেৰ ধাৰে এই নিৰীহ পতঙ্গেৰ দেয়ালি উৎসবে কোন ছেদ
পড়ে না ।

ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আজহার নীরবে চারিদিক অবলোকন করে। পঙ্কু মন তার নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। চিন্তার এলোমেলো জটাজাল অঙ্ককারে হামাগুড়ি দেওয়া পর্যন্ত বিস্মৃত। কোন কিছু মনে পড়ে না আজহার খাঁর।

নিয়ামতপুরে দু'দিন ছিল সে মাত্র। কাজ জুটিয়াছিল ভাল। কয়েক সপ্তাহ কাজ চলিত স্বচ্ছন্দে। জায়গাটা খুব পছন্দসই নয়। ইতর মাতালদের আজড়া তার ভালো লাগে নাই। এখানের অন্যান্য রাজমিস্তি বড় বদ-চরিত্রের। সামান্য দু'দিনের রোজগার ট্যাকে ঝঁজিয়া আজহার পথে পাড়ি দিয়াছিল। কাজ কোথাও-না-কোথাও জুটিবেই, সে ভরসা ছিল তার। সড়কের পথেই নতুন ইয়ারতের কাঠামো দেখিয়া সে আশাবিত বুকেই এখানে গৃহস্থমীর উমেদার হইয়াছিল। সঙ্গী মিত্রীরা লোক মন্দ নয়। রোজ কম। তবু আজহার কোন প্রতিবাদ করে নাই, সহজেই সে কাজে লাগিয়াছিল।

গ্রামের নাম শাহানপুর। দু'মাইল দূরে স্টেশন। তারই আবহাওয়ায় গ্রাম ও শহরের যৌথ লীলাভূমিরূপে জায়গা মন্দ নয়। আজহারও আকর্ষিত হইয়াছিল।

রেলস্টেশন মাত্র বছর দুই আগে খোলা হয়। এখনও বহু ব্যবসার ভবিষ্যৎ এই গ্রামে উকি মারিতেছে। কয়েকদিন অবস্থানের পর আজহার তাহা নীরবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। যদি কোন পুঁজি জমানো যায়! আজহার তাই কায়ক্রেশে রীতিমত কৃচ্ছসাধন আরম্ভ করিয়াছিল।

সারাদিন খাটুনির পর আজ শরীর ভাল না, তার উপর বাসার ভেতর ভ্যাপ্সা গরম। সব মিলিয়া বড় অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল আজহার। তার কোন স্পষ্ট চেতনা কিন্তু দাগ কাটে না কোথাও। নীরবে তাই হঁকা পানট কোরিতেছিল। কয়েকবার হাই উঠিল।

আজহার খাঁ নিচিষ্টে বসিয়া থাকে। অম্বুক প্রায় নিঃশেষ। অন্যদিকে হঁকার আওয়াজের কামাই নাই।

স্মরণের প্রান্তের নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে কালো অঙ্ককারের প্রলেপ। শিরার দ্রুত কম্পন রাত্রির তরঙ্গশীর্ষে ঈষৎ ঝিলিকের রেখা টানিয়া আবার শান্ত হইয়া আসে।

প্রাণৈতিহাসিক বর্বরের আলস্য-মুখর অঙ্গুত বিরাম আকাঙ্ক্ষা আজহার খাঁর মেরুদণ্ডে ঘা দিয়া গেল।

এইবার জোরে কক্ষে ফোঁকে আজহার। তামাক-না-দারাং। অসম্ভট চিন্তে সে কক্ষে চৌকাঠের কোণে রাখিয়া দিল।

আর এক ছিলিম পাইলে মন্দ হইত না। সে হাই তুলিল। হঠাৎ আজহার তার পাশেই আর একজনের উপস্থিতি অনুভব করে। অঙ্ককারে অপরিচিত মানুষটি।

আজহার মৃদু কষ্টে ডাকে : কে?

আমি, চাচা।

একটি বালকের কষ্টস্বর অঙ্ককারে ঢেউ তোলে।

খলিল, এত রাত্রে বাইরে এসেছো?

জিজ্ঞাসা করে আজহার।

মুম ধরে না, চাচা।

ফোপানির শব্দ আসে আজহার খাঁর কানে।

খোয়ারি ভাঙ্গিয়া যায় তার। কার কষ্টনালী-দুমড়ানো এই শব্দ, প্রথমে আজহার স্থির করিতে পারে না।

নিবিড় অঙ্ককার। চোকাঠের অপরদিকে আজহার হাত বাড়াইয়া দিল। খলিলের নাগাল পায় সে। হাঁটুর ভেতর মাথা উঁজিয়া সে বসিয়া আছে। এতক্ষণ এই অবস্থায় সে ধীরে ধীরে জবাব দিতে ছিল তবে।

আজহারের সঙ্গী মিস্ট্রীর নাম ছিল ওদু। তারই ভাইপো খলিল। বয়স বারো হইবে কিনা সন্দেহ। বালক-বয়সেই চাচার সঙ্গে মিস্ট্রীর কাজ শেখার জন্য এই প্রবাস-জীবনের ঘোনি বহন করিত্বে।

আজহার খলিলের নিকটে সরিয়া আসিল। তার গায়ে ঈষৎ নাড়া দিয়া সরস কঠে আজহার সম্মোধন করে, কি হয়েছে, চাচা?

খলিল মাথা তুলিতে চায় না। হাঁটুর ভেতর মাথা উঁজিয়া যেন বিশ্বের সমস্ত কলঙ্কের নিকট হইতে পরিআশ চায় সে।

কিছু হয় নি ত, চাচা?

আবার আজহার নাড়া দিয়া বলিল, মাথা তুলে কথা বলো না, কি হয়েছে?

খুব মৃদুস্বরেই আলাপ বিনিময় চলিতেছে। ঘরের ভেতর সকলে দিনমজুর। কারো ঘুমের ব্যাধাত না ঘটে।

খলিল নীরব।

আজহারের কৌতৃহল মিটিল না। সে পুনরাবৃত্ত জিজ্ঞাসাবাদ আরঝ করিল।

খলিল এইবার কোন জবাব দিল না। আনন্দ গায়েই সে বসিয়াছিল। আজহারের হাত নিজের পিঠের উপর ধীরে রাখিয়া আবার খলিল ফোঁপাইতে লাগিল।

আজহারের আঙুলের ডগায় যেন পুরুষা দংশন করিয়াছে। সে তড়িৎগতি খলিলের পিঠ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া চীৎকার জিজ্ঞাসা করে : তোমার পিঠে এত দাগ?

খলিল আজহারের মুখে হাত চাপিয়া নিন্দিত ব্যক্তিদের দিকে তাকায়। না, কারো কানে আজহারের চীৎকার পৌছায় নাই।

আজহার খলিলকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

বার বার হাত বুলায় সে খলিলের পিঠে।

কুয়াশানিন্দিত প্রান্তের আবার জাগিয়া উঠিতেছে। মনে পড়িল বৈকি আজহারের, আমজাদের কথা, নষ্টেমার মুখ, মহেশভাঙ্গার জলাজঙ্গাল। আর দরিয়াবিবি? না, আজহারের মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সুষ্ঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না। হয়ত ভাসিয়া উঠিয়াছিল ক্ষণিক আলোর মলিন রেখায়। নিবীর্য একরকমের অস্ত্রিতা আজহারকে ব্যথিত করে বলিয়া সে তখন ছায়ার অন্যান্য জনতায় চিঞ্চার প্রহরীদের অজ্ঞাতবাসে পাঠাইল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আজহার জিজ্ঞাসা করিল, কেউ মেরেছে বুঁধি?

হ্যাঁ চাচা।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল আজহার।

কচি গায়ে কার এমন ‘আজারে’ হাত উঠল?

খলিল কোন জবাব দিল না । নীরবে বসিয়া রহিল ।
কে মেরেছে?
আজহার অঙ্গুরচিঠ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল ।
খলিল অঙ্ককারে চারিদিকে দৃষ্টি মেলে । তারপর আজহারের কানে কানে সে খলিল :
ওদু চাচা চেলাকাঠ দিয়ে—
চোক গিলিয়া খলিল আবার ফোঁপাইতে থাকে ।
এঁয়া, ওদু এমন কড়া-জান?
খলিলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আজহার বলিয়া যায় : কি করেছিলে তুমি যে,
এমন করে হাত চালায়?
গহর মিস্ত্রীর সুর্মী ভেঙে ফেলেছি । ইটের উপর পড়ে গেল কিনা ।
গহর রাজমিস্ত্রী । সে-ও বাসার ভেতর নিদ্রিতের দলে । পাছে তার কানে কোন শব্দ
যায়, ধরা-গলায় খলিল জবাব দিয়া চুপ করিল ।
ছোট একটা সুর্মী ভেঙেছ, তার জন্য এত মার মারলে?
ফোঁপাইয়া কান্না আরম্ভ করিল খলিল ।
আড়ষ্ট উচ্চারণের মধ্যদিয়া বোৰা যায় তার আবেদন : আমি চাচার সঙ্গে বাড়ি যেতে
চেয়েছিলাম কিনা ।
ওদু আজ বাড়ি গেছে?
হ্যাঁ, চাচা !
আজহার সান্ত্বনা দিতে চায় ওই অবোধ্যতালককে ।
ওদু যাক না বাড়ি । আমরা রয়েছি, তোমার কোন ভয় নেই ।
চৌকাঠের একপাশে কখন সরিয়া গিয়াছে খলিল । আবার হাঁটুর মধ্যে তার মাথা
গেঁজা । বিভীষিকাময়ী পৃথিবীর অবলোকনের সাহস তার নাই ।
একটু পরে ঘাড় গুঁজিয়াই খলিল জবাব দিল : আমার মন টেকে না চাচা ।
ব্যাটাছেলে, কাজ-কাম না শিখলে চলবে কেন? বিদেশ ত ব্যাটাছেলেদের জন্যই ।
তা যন অমন এক-আধুনি খারাপ করে ।
নিঃসাড় হইয়া গেল খলিল । কোন জবাব আসে না তার নিকট হইতে ।
তোমার বাপ বেঁচে আছে, চাচা?
জিজ্ঞাসা করিল আজহার ।
খলিল অঙ্ককারে মাথা তোলে না । ক্লান্ত স্বর তার বাইরে আর্তনাদের মত শোনায় : না!
আবার মাথা গুঁজে বসে আছো? ভাবনা কিসের? আমরা ত রয়েছি । ওদু কাল-পরম্প
ফিরে আসবে ।
আজহার খলিলের দিকে হাত প্রসারিত করে । খলিল ধীরে ধীরে ধীরে পাশে সরিয়া
আসিল । ক্লান্ত দুইচোখ তার সড়কের দিকে ।
পরে আজহারের মুখোয়ুখি দৃষ্টিপাত করিয়া সে খলিল : আজ দু'মাস এসেছি, চাচা ।
মা'র জন্যে মন কেমন করে-যে । ওদু-চাচা এইবার নিয়ে চারবার ঘরে গেল ।
বিদেশে থাকতে শেখো । কাজ শিখলে তবে ত বড় মিস্ত্রী হবে । দুঃখ ঘুচবে । এই

দ্যাখ না, আমরা দেশে চামবাস করতাম, শহরে আসিনি। কুকুরের হাল।

কোন আশ্বাস পায় না খলিল।

পেট-ভাতায় ছামাস কাজ শিখলে তবে নাস্তার পয়সা বেরোবে। মাকে এক পয়সাও দিতে পারিনি। নাস্তার পয়সা বেরোলে তা বাঁচিয়েও কিছু পাঠাতে পারতাম।

আজহার খাঁ বিগলিত হৃদয়ে ওই দুঃখ-পোষ্য বালকের দিকে চাহিয়া থাকে। এত অল্প বয়সে পৃথিবীর রং চিনিতে শিখিয়াছে সে। এমন ছেলের উন্নতি আল্লা নিষয় দেবেন। নসীর খুলবে বৈকি।

পুনরায় সরব হয় আজহার: আর কটা মাস, চাচা। তারপর নাস্তার পয়সা বেরোলে তোমার মাকে টাকা পাঠিয়ো। কেন, তোমার মা কিছু করেন না?

ধান কুটে ভাত জোটাতে হয়।

কথা সমাণ করিয়া বড় লজ্জিত হয় খলিল। কুটুনীর ছেলে সে, এমন পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়। আবেগের স্মৃতে ভাসিয়া গিয়াছিল খলিল।

আজহার আর কোন জিজ্ঞাসাবাদে মন্ত হয় না। নিবুম সেও বসিয়া থাকে। এতটুকু ছেলে মা'র দৃঢ়খের সঙ্গী। তিন-চার বছর পরে আমজাদ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে?

মাত্র এক পলকের জন্য আমজাদের মুখ মনে পড়িল আজহারের। চন্দ্র কোটাল তাকে স্বপ্ন দেখিতে শিখাইয়াছে। তার কুয়াশা-আবর্তিত ফেনিল পটে কারো মুখ আর স্থিতি পায় না। স্টেশনের নিকট বর্ধিষ্ঠ এই গ্রামে ব্রিবসা-পন্তনের অশেষ সুযোগ রহিয়াছে। খোদা কি মুখ তুলিয়া চাইবেন না একটিবার গুরুত্বের জন্য!

অজানিত ভাতির ফুর্তিকার আজহারের চিঞ্চ আরো অস্থির-উন্নত করিয়া তোলে। তিনবার বুকে 'কুলহ আল্লা' পড়িয়া ফুঁক দিলসে।

খলিলের ঘন ঘন হাই উঠিতেছিল, আজহারের খেয়াল হয়। তার দিকে ফিরিয়া সে বলে, চাচা, আবার সকালে কাজে বেরোতে হবে। ঘুমিয়ে পড়ো।

তুমি ঘুমোবে না, চাচা?

অবোধ কষ্টের নিনাদ বড় লাগিল আজহারের কানে।

না, চাচা। আর এক ছিলিম খেয়ে শোব।

খলিল বাসার ভেতর প্রবেশ করিল। আজহার নৃতন ছিলিম সাজে।

ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে শেষরাত্রে। খণ্ড মেঘ ছড়াইয়া পড়ে গ্রাম-বনানীর উপর।

আকাশের মুখ কালো হইয়া গেল এক নিমিষে।

আজহার খাঁর সিদ্ধান্ত স্থির ছিল।

সঙ্গা দুই পরে এই বাসার নিকটে বাসস্ট্যান্ডের নিকট সে তিব টাকা দিয়া একটি ছেট চালাঘর ভাড়া লইল। ঘরের বারান্দা দুইহাত মাত্র প্রস্ত্রে। তারই একপাশে সঙ্গী ছুতারের সাহায্যে সে একটি শেল্ফ তৈয়ারি করিল। দোকানের ঘটা ছিল বেশি। অবশ্য মাল খুব পর্যাণ নয়। আজহার কোনরকমে গোটা পঁচিশেক টাকা জমাইয়াছিল। তিন টাকা লইল মিশ্রী। বাকী বাইশ টাকায় সুচ-সুতো, মেয়েদের টিপ, ক্ষুলের

ছেলেদের পেনসিল, লজেঞ্জ— এই জাতীয় ছোটখাট মনিহারী পণ্য-সম্ভাবে সে দোকান
সাজাইল ।

পানের দোকান সঙ্গে রাখিবারও ইচ্ছা ছিল আজহার খাঁর । আরো কয়েকটি পানওয়ালা
প্রবেই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে । তবু লোভ আছে খাঁর । ভবিষ্যতে যদি নসীবে জেলুস
লাগে, আর নতুন পণ্যে দোকানঘর চম্কাইয়া দিবে সে ।

কয়েকদিন ভয়ানক মেহনতে কাটিয়া গেল । স্টেশন হইতে চার মাইল দূরে
গঞ্জের উপর গোলদারী দোকান । একজন মাড়োয়ারী খুব বড় ব্যবসা ফাঁদিয়াছে ।
তার নিকটে এইসব জিনিস পাওয়া যায় । চার-পাঁচ মাইল হাঁটার কসরৎ বাঢ়ে । সঙ্গী
মিত্রীর ধর্ণা দিতে হয় । শত অনুরোধে সে রাত্রি-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া শেলফ তৈয়ারি
করিয়া দিয়াছে ।

গহর মিত্রী ব্যাপারটা সোজাভাবে গ্রহণ করিল না । আজহার চলিয়া যাইতেছে, বাসা
ভাড়া বেশি লাগে । সে নিরঞ্জন করিবার বাগ্যাত্মক নিষ্কেপ করিল শত শত । একটু
হিংসাও হইতেছিল বৈকি তার । গহর জানে না, পঁচিশটি টাকা জমাইতে আজহার কত
নিপীড়ন সহ্য করিয়াছে । বাউঙ্গেলের মত সংসারের কোন বৌজ নাই । তার উপর কায়িক
জুলুম । এত সহ্যের ক্ষমতা কয়জনারই বা আছে?

গহর বলিল, মিত্রী তাহলে শেষে এইখানে দোকান ফাঁদলে । দেখো, যদি পাকা বাড়ি
ওঠে ।

আজহার নিরীহ বেচারা । কোন জবাব দিল~~জো~~ । কিন্তু কথাটা সোজাসুজি তার মর্মে
বিধিতে থাকে ।

কিছু করে-কম্বে খেতে হবে ত ভাঙ্গা তাই মন গেল, একটা দোকান করলাম ।

গহরের রং ফর্সা, দীর্ঘতায় তাঙ্গাছ । কিন্তু ভয়ানক পাঁকা শরীর । অবশ্য বাধন
মজবুত । দাঁতগুলি খুব পরিষ্কার । সে পান খায় না ।

না, তাতে আর কী । আচ্ছা, একটা বিড়ি দাও ।

আজহার সহজে রাগে না । কিন্তু গহরের কথার ঝাল সে-ও আজ অনুভব করিল ।

বিড়ি নেই, ফুরিয়ে গেছে ।

মিথ্যা কথা বলিতে বাধে না আজহারের ।

উঠিয়া পଡ়িল গহর ।

চালাও দোকান, যদি পাকা বাড়ি ওঠে । একসঙ্গে কাজ করেছি বলে একদিন এসে
থাকা যাবে ।

গহরের পদক্ষেপের দিকে চোখ ফেলিয়া স্তুক হইয়া যায় আজহার । মনে মনে বলিল,
আমার মত হাভাতে গরীবকেও হিংসা করার লোক আছে পৃথিবীতে ।

লজেঞ্জসের বোতলের পাশে পিংপড়া উঠিতেছিল, আজহার সেদিকে মনোনিবেশ
করিল ।

একটু পরে আসিল খলিল । ভারী উৎফুল্ল সে ।

চাচা, আপনার দোকানটা বেশ সুন্দর হয়েছে । যখন লোক রাখবে, আমাকে মনে
করো ।

আজহার স্তম্ভিত হাসি হাসে ।

দোয়া করো, বাবা । আল্লার দোয়া লাগতে কতক্ষণ ।

অনেক সামংগী খলিল কোনদিন গাঁয়ে দেখে নাই । সে বিশ্বিত-চোখে চারদিকে তাকায় ।

চাচা, একা লোক আমি । গোসল করতে গেলে দোকান বন্ধ করতে হয় । তুমি মাঝে
মাঝে এসে বসো ।

হ্যাঁ, বসব চাচা । বাড়ি থেকে ঘুরে আসি । ওদু চাচা এবার নিয়ে যাবে বলেছে ।

বেশ, বেশ ।

দাওয়ার একপাশে খলিল উপবেশন করিল ।

পাশাপাশি সাজানো শিশি-বোতলের দিকে সে সাথে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে ।

আনমনা লজেঞ্চুসের বোতল হাতে তুলিয়া খলিল নাড়াচাড়া করে ।

এতে কি আছে, চাচা?

লজেঞ্চুস ।

খেতে কেমন লাগে?

খুব মিষ্টি । একটার দাম দু'পয়সা ।

আজহারের কথা শেষ হওয়া মাত্র খলিল বোতল শেল্ফের কোণে রাখিয়া দিল । তার
হাতে শত রাজ্যের আড়ষ্টতা ।

আজহার তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া স্থান্তিরিল । দোকানদার সে । দোকান
খুলিয়াছে । একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলে, একটু খাও না, চাচা ।

লজ্জিত খলিল জবাব দিল, না ।

আজহার আর বিলম্ব করে না । নিজেই দু'টি মিষ্টান্ন বাহির করিয়া খলিলের হাতে
দিল । আড়ষ্টতা কাটে না খলিলের মধ্যে চাচা, আমি মিষ্টি খাই না । আমার কাছে পয়সা
নেই ।

খাও । খেয়ে ফেলো ব্যাটা ।

তোমার দোকান চলবে কি করে?

এতটুকু ছেলে, সংসারের মার-প্যাচ এত বোঝে । অবাক হইয়া যায় আজহার খীঁ ।

হাসিমুখে মিষ্টি খায় খলিল ।

তুমি একটু বসো, আমি মাগরেবের নামাজ পড়ে আসি ।

খলিল হঠাতে কর্তা বনিয়া যায় । গম্ভীর মুখে সে বসিয়া থাকে । খরিদ্দারের সঙ্গে
আলাপ করে । খুব হাসি পায় তার । এমন একটা দোকান যদি দিতে পারত সে ।

আজহার ফিরিয়া আসিলে সে সড়কের পথ ধরিল ।

ছেট ডিপা জলে দোকানের এক কোণে । দেখা যায় খলিল পথ ইঁটিতেছে । পার্শ্ববর্তী
গাছপালার ছায়ায় ঢাকা সড়ক ।

এতটুকু ছেলে ।

আমজাদ কি অভিযান করিয়া মহেশডাঙ্গায় ফিরিয়া যাইতেছে?

শৈরমী পাড়ায় কলমী শাক বিক্রয় করিয়া দরিয়াবৌর সঙ্গে গল্ল জুড়িয়াছিল। গণেশের শরীর ভাল নয়। কয়েকদিন পূর্বে দাওয়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। পঙ্কু বাম হাত একদম অচল হইয়া গিয়াছে। শৈরমীর সামান্য অবসর পর্যন্ত নাই।

দরিয়াবিবি দরদের সঙ্গেই এই বিধবার করণ প্রাত্যহিকতার কাহিনী শুনিতেছিল। আজকাল বারবার তারও মনে দোলা লাগে, এই জীবনের পরিণতি কোথায় পৌছিবে, কে জানে। আমজাদ ও নঙ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া দরিয়াবৌর মুখ শুকাইয়া যায়। আজহার খী কোন খবর দেয় না, কয়েক মাস হইয়া গেল।

সাত রের মা আসিয়া জুটিল এই সময়। দরিয়াবৌর একটি পিঁড়া আগাইয়া দিল।

বৌ যে আমাদের দিকে পা বাড়াও না, মা।

দরিয়াবিবি এক সশ্রাহ সাকেরের বাড়ি যায় নাই। লজ্জিত হয় সে।

কত কাজ, দেখছেন না, মা। ফুরসৎ নেই, মা।

বৌ নিয়ে হাড়-মাংস পুড়ে ছাই হতে বসেছে।

শৈরমী এই প্রসঙ্গে যোগদান করিল : কি হয়েছে?

দিন মাস পার হয়ে গেল এখনও খালাস হওয়ার নাম নাই। কবরেজ ডাকব, বৌর তাতেও দশ অছিল।

দরিয়াবৌর সন্দেহ প্রকাশ করে : দশ মাস হওয়ে গেছে! না মা, তোমাদের হিসেবে তুল আছে।

সাকেরের মা জোর দিয়া বলিল, না, দশ মাসের বেশি হবে ত কম নয়।

শৈরমী জবাব দিল : ভাবী, আসেকের এগার মাস লেগে যায়।

দরিয়াবিবি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল।

এগার মাস কেন, আঠার মাস লাগে।

সাকেরের মা'র মুখ কালো হইয়া যায়। — কি হাসছো বৌ, আমার পেটে ভাত সেঁধোয় না। ছেলেটা দিনদিন বিগড়ে যাচ্ছে। দাঙ্গা করতে কোথায় চলে যায়। ছেলের মুখ দেখলে হয়ত ঠাণ্ডা হোত।

ও ব্যাটা ছেলেদের দস্তুর। তোমার ভাসুরপোর কোন বৌজ নেই। একদিন ঝুপ করে এসে পড়বে। কি আর উপায় আছে, বলো।

শৈরমী ভরসা দিল : ঘাবড়ে যেও না, সাকেরের মা। ভগবান সুফল দিয়েছে নিশ্চয়।

তোমার মুখে সুবন (সুবর্ণ) বর্ষুক, শৈরমী। আমার ঘূম হয় না চিন্তায়।

দরিয়াবিবি শৈরমীর দেওয়া কলমী শাক বাছিতে বাছিতে কথা বলিয়া যায়।

হাসুবৌকে বিকেলে দেখে আসব।

এসো একবার!

আবার সাকেরের মা বলিল : বৌটার মনের হদিস পাওয়া মুশকিল। ছেলে-ছেলে

করে গেল। আজকাল আর আমাকে ছাড়া কোথাও শোয় না। ছেলেটা এইজন্যেই বুঝি আরো বিগড়েছে। আমিও ভাবি অয়লা-পয়লা বার এবার। পাছে কোন কষ্ট না হয়। বৌটা গোসল পর্যন্ত করে না, পাছে জুব হয়।

হাসুবৌর উদরক্ষীতির আয়তন সম্পর্কে দরিয়াবিবি প্রশ্ন উত্থাপন করিল।

দশ-মেসে পোয়াতির মত, বৌমা। সদাই হাই-ফাই করছে। হাসুবৌ বলে, তার পেটে খুব ব্যথা। তাই হাত পর্যন্ত দিতে দেয় না। একবার দাইকে ডেকে পাঠালাম। পেটে আঙুল পর্যন্ত ছোঁয়াতে দিলে না।

সুফল দিয়েছে, চাচি। তুমি দেখো। হয়-নয় শৈরমী বাগদিনী বলেছিল। গণেশের মা মন্তব্য করে। বৃন্দা বিশেষ আশ্বস্ত হয় না। বরং দরিয়াবিবি যেন একবার পাড়া-ভ্রমণে বাহির হয়, তার অনুরোধ জানাইল সে।

আজ হাতে অনেক কাজ আছে, মা। কাল বিকেলে ঠিক গিয়ে তোমার বৌর রোগ ধরে আসব।

শৈরমী আফশোস করিতে লাগিল : কলিকাল, দরিয়াভাবী মানুষের খারাবীর শেষ নেই।

দরিয়াবিবি মুখ নীচ করিয়া শাক বাছিতে লাগিল। সে নিজের চিনায় মশগুল ছিল।

সাকের ভাই এলে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। তার ভাইয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুক। মনে করিছুচপচাপ বসে থাকব। আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাব না।

এমনও লোক হয় সংসারে! ছেলেপুলের মায়া প্রয়োজন নেই।

শৈরমী তোপড়া গালে হাত রাখিয়া দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া বহিল। এই সহানুভূতি ভাল লাগে না দরিয়াবিবির। মেজাজ তার ক্ষেত্রে হইয়া উঠিতেছে হঠাতে।

একবার এসো, বৌমা।

সাকেরের মা চলিয়া গেল। শৈরমী এইবার ফিস্ফিস কর্তে বলে, ভাবী, আধখান পচা সুপুরী দেবে, আজকাল গা মাটি-মাটি লাগে, ভাত খেয়ে কিছু মুখে দিতে পাই নে।

দরিয়াবিবি ঘরের ভিতর হইতে শুধু সুপুরী নয়, তেলের বোতলও বাহির করিয়া আনিল।

শৈরমী দিদি, মাথায় একটু তেল দিয়ে যাও।

শৈরমী তার রেখাক্ষিত করতালু প্রসারিত করিল।

মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে সে বলিয়া যায় : ভাবী, এই পাড়ায় এলে একটু মন ঠাণ্ডা হয়। কোঠা-বাড়িওয়ালা বামুনদের ওখানে গিয়ে দূর ছিঃ ছাড়া অন্য কথা শুনি নে। কপাল ধরিয়ে এসেছিলাম ভগবানের কাছে। ছেলেটার শুক্র ভগবান হাত-পা ভেঙে ফেলে রাখলে।

দরিয়াবিবি জবাব দিল : সব জেতে (জাতিতে) ঐ এক ব্যাপার। রহিম বখশ জিমদার বলে সেবার তোমার দাদাকে কত অপমান করে গেল শুনেছিলে ত? গরীব হিন্দু আর মুসলমান নিজের জেতের কাছেই হোক আর অপরের জেতের কাছেই হোক, একই রকম মান-মজিদে পায়।

আচ্ছা ভাবী, আমার মাথার কিরে— দাদার কোন খবর পাওনি? তবে চুপচাপ বসে আছো?

আর খবরের কোন দরকার নেই।

ক্ষুক কঠে দরিয়াবিবি জবাব দিতেছিল ।

শৈরমী চূপ করিয়া গেল । আঁচলে আধখানা সুপুরী বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িল ।

জাওলা পাঁকাল মাছ পেলে নিয়ে এসো, শৈরমী দিদি, ছেলেটার পেট গরম রেখেছে ।

শৈরমী এইবার হাসিয়া উঠিল ।

আমাকে পাগলী ঠাওরালে, ভাবী !

দরিয়াবিবি লজ্জায় মুখ নীচু করে । ঘড়া প্রসঙ্গে তার মর্যাদা কোথায় যেন আহত হইয়াছে ।

না । তবে এমনি বলে রাখা ভালো ।

শৈরমী আড়াল হইলে দরিয়াবিবি ঝরঝর কাঁদিয়া ফেলিল । চোখের পানি স্থতই রোধ মানে না । প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল দরিয়াবিবি । আসেক্জান পাড়ায় বাহির হইয়া গিয়াছে । কথা বলার কোন লোক আর নাই । দরিয়াবিবি শাক বাছিতে লাগিল ।

আমজাদের ডাক কানে না গেলে হ্যাত দরিয়াবিবি সারাদিন শাক লইয়া বসিয়া থাকিত । আনমনা ঘোর তার কাটিয়া যায় ।

মা, এই দ্যাখো, আবু চিঠি আর কুড়ি টাকা পাঠিয়েছে ।

আনন্দে যেন নৃত্য করিতে পাইলে আমজাদ সন্তুষ্ট হইত । বগলে মখ্তবের দশ্তর, একহাতে টাকা আর মনির্ভারের কুপনের অংশ । দশ্তদিন মাত্র আমজাদ চন্দ্র কোটালের সহযোগীরূপে কাজ করিয়াছিল । দরিয়াবিবির আদেশেই আমজাদ এখন মখ্তবের পড়ুয়া ।

দরিয়াবিবির দুই চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া যায় ।

সত্যি টাকা পাঠিয়েছে, কে দিল তোকে টাকা ?

পিয়ন এসেছিল । আমার নামে স্বাক্ষর টাকা পাঠিয়েছে । আমার টিপ-সই নিল পিয়ন ।

দরিয়াবিবি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল । নেট দু'টি পুত্রের হাত হইতে লইয়া সে নাড়াচাড়া করে ।

ঠিকানা দিয়েছে ?

হ্যাঁ গো মা, এই ত লেখা রয়েছে ।

আমজাদ জননীকে কুপনের অংশ দেখাইল, যেন মা'র অক্ষরজ্ঞান কত গভীর । দরিয়াবিবি কুপন হাতে লইয়া চক্ষুর দৃষ্টি সহজ করিল । অক্ষর-পরিচয়ের মূল্য তার নিকট এই প্রথম কঠিন সত্যরূপে ধরা দিল ।

নইয়া কখন চুপিসারে দুইজনের কথাবার্তা শুনিতেছিল, সে ফুট কাটিল, “মা, টাকা দিয়েছে, চিঠি দিয়েছে ।”

দরিয়াবিবি নইয়াকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে লাগিল ।

হ্যাঁ । তোমাকে ময়রার দোকান থেকে মিঠাই কিনে দেব ।

আমজাদ মুরুবীর মত মন্তব্য করিল : এই ত ক'মাস পরে মোটে কুড়িটা টাকা । তার চেয়ে গাঁওয়ে থেকে জন খাটলে লাভ । জানো মা, আমাদের জমি ছাড়িয়ে নিতে পারে । আবু এসে চাষ না দিলে লোকে জমি রাখে ?

পুত্রের সংসার-অভিজ্ঞ সিন্ধান্ত দরিয়াবিবির কাছে ভাল লাগে না, যদিও সে মায়ের

কথার প্রতিধ্বনি করিতেছিল ।

তৃমি আর অত ফফর-দালালি করো না । যা করার আমি দেখে নেব ।

আমার মাইনে দু'মাসের বাকী আছে । গল্পীর হইয়া আমজাদ জবাব দিল ।

নৃতন নোটের গন্ধ শুকিতে লাগিল দরিয়াবিবি । বাইরে দুপুরের সূর্য টলমল করিতেছিল ।
বাস্তুর নিচে তেঁতুলের বন অলস সমীরে উন্মসিত ।

নোট আঁচলে বাঁধিয়া দুটি খুচরা পয়সা দরিয়াবিবি আমজাদের হাতে দিয়া বলিল,
দোকান থেকে দু'জনে বিস্কুট কিনে থা ।

নঙ্গিমা মা'র কোল হইতে নামিয়া পড়িল ।

আসেক্জান পাড়া হইতে ফিরিয়া আসিল । চৌধুরী পাড়ার কার যেন ফাতেহা ছিল
আজ । আসেক্জান খালিহাতে ফিরিয়া আসে নাই, তার আঁচলের নিচে অবস্থিত পুঁটুলি
দেখিয়া তা বোঝা যায় ।

বৌমা, তোমাদের রান্নার আগেই এসেছি । ছেলেরা আমার সঙ্গে থাবে । অনেক গোস্ত
আর ভাত আছে ।

না, আমাদের রান্না হবে এখনি ।

খামাখা চাল নষ্ট করবে, মা ।

নঙ্গিমা তখন চীৎকার করে বুড়ির আঁচল ধরিয়া ।

ও দাদি, বাবাজী টাকা পাঠিয়েছে ।

বৃন্দার চোখ আনন্দে সজল হইয়া ওঠে ।

সত্যি বৌমা, খবর পাওয়া গেছে ছেলের

হঁয়া, খালা । টাকাও দিয়েছে ।

আমজাদ বৃন্দাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ঠিকানা পাওয়া গেছে । আমি একদিন যাব
বাপজীর কাছে ।

দরিয়াবিবি কথা-কাটাকাটি পছন্দ করে না, আসেক্জান আনন্দবিহুলতায় বিশৃত
হইয়াছিল ।

বৌমা, ছেলেরা আমার সঙ্গে থাবে দুপুরে ।

না । দোকানে যা আমজাদ । নঙ্গিমা, তুইও সঙ্গে যা ।

বৃন্দা ক্ষণ মনে নিজের ঝুপড়ির দিকে অগ্রসর হইল । মনে মনে রাগিয়াছিল । আজ
টাকার লোক, 'সাদ্কার', খাবারে এত ঘৃণা, ইস । বৌমার রোখ সে জানে । সহজেই নীরব
হইয়া গেল বৃন্দা ।

দরিয়াবিবি আসেক্জানের গমন-পথের দিকে চাহিয়া বার বার জ্ঞানুষ্ঠি নিষ্কেপ করিল ।

কয়েক মাস পূর্বে নঙ্গিমার একটি ফালি কাপড় হারাইয়া গিয়াছিল । দরিয়াবিবি বেদম প্রহার
করিয়াছিল সেদিন নঙ্গিমাকে ।

সেদিন সন্ধিয়া আবার সে একটি কাপড় হারাইয়া বাড়ি ফিরিল । দরিয়াবিবি আজ
কিছুই উচ্চবাচ্য করিল না । একে সংসারে হাজার রকমের টানাটানি, তার উপর এইসব
বামেলা পোহাইতে দরিয়াবিবি হিমসিম খাইয়া যায় । মাঝে মাঝে অগত্যা ললাটলিপির

উপর সমস্ত ক্রেত্ব খারিজ করিতে হয় ।

সাকেরের মার অনুরোধে পরদিন বিকালবেলা দরিয়াবিবি অবসরের ফাঁকে পাড়া
বেড়াইতে গিয়াছিল । সাকের কয়েকদিন হইতে বাড়িতেই আছে । রোহিণী চৌধুরী বোধহয়
প্রজা টিট করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ।

পাড়ার প্রবেশ-পথেই তার সঙ্গে দরিয়াবিবির সাক্ষাৎ হইল ।

এই যে ভাবী সাহেব, হঠাৎ ।

সাকের গৌয়ার ও চোয়াড় বলিয়া খ্যাত । দরিয়াবিবির সঙ্গে তার ব্যবহার ভাবী
মধুর । চোখাচোখি দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া সে কথা বলে না পর্যস্ত । কণ্ঠস্বর তার সম্মুখে
নরম হইয়া আসে । অথচ বিনয় সাকেরের স্বভাব-বিবরণ বিশ্বেষণ ।

দরিয়াবিবি মাথার শুখ ঘোমটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সাকের ভাই । মাথাভাঙা
কাজ নেই বুঝি এখন, তাই দেখা হয়ে গেল ।

আপনিও লজ্জা দেন ভাবী ! লাঠি যখন চালাই, মাথা ভাঙে বৈকি । কিছু করে খেতে
হবে ত । চুপচাপ বসে থাকলে কেউ চালভাল যোগাবে?

তোমার বড় ভাই চুপচাপ বসে নেই । সফরে বেরিয়েছে, দেৰি কত মাল-মাস্তা
নিয়ে ফেরে ।

সাকের বিশ্বিত-উল্লাসে জিজ্ঞাসা করে, বড় ভাইয়ের খবর পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ । কোথা জাহানপুর, সেখানে আছে ।

মাশায়াল্লাহ ! এমন লোক, ডুব দিয়ে এতদিন কাটিয়ে দিলে ।

তার ঘরে চাল-ভাল যোগানো আছে, ভাস্তু ! সে পঁয়াকল মাছ সেজে বসে না থাকলে
আর কে থাকবে ।

সাকের হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল ।

গুণধর ভাইয়ের কাও দেখে হাসিস পায় সকলের ।

, দরিয়াবিবি ঠোঁট দাঁতে চাপিয়া জবাব দিল ।

ভাবী সাহেব, চটে গেলেন । মরদ মানুষদের আপনারা ঐ রকম ভাবেন । চাল-ভাল
জোটাতে তারা কম চেষ্টা করে না । চাল-ভাল না থাকলে ত মুখ বেঁকে নদীর ঢড়া হয়ে
যায় । তাই মাথা ভাঙি, না মাথা পেতে দিই— এসব দেখবার কি সময় আছে । বড়ভাইকে
খামাখা দোষেন ।

দরিয়াবিবি হাসি মুখে বলিয়া যায় : তুমি ভাই বেড়াতে বেড়িয়েছো । যাও । আমি
মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি । বড় ভাইয়ের হয়ে আর ওকালতির দরকার নেই ।

জো হকুম ভাবী সাহেব ! কুর্নিশের ভঙ্গীতে সাকের কিছুক্ষণ পিছু হটিয়া অন্যপথে
আড়াল হইয়া গেল ।

দরিয়াবিবির হাস্যধরনি পাড়ার ঘুলি-পথে শুঁজেরিত হয় । একটু দূরেই সাকেরের উঠান
আর লাউ মাচাঙ্গের প্রাঙ্গণ ।

সাকেরের মা হাসির শব্দ শুনিয়া কৌতুহলবশতঃ এই দিকে অগ্রসর হইয়াছিল ।

দরিয়াবিবিকে দেখিয়া সে আনন্দিত হয় । তুমি, বৌমা ! হঠাৎ রাস্তায় এমন হাসছ?

সাকের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো । সে কোন দোষ গায়ে মাখে না । বড় ভাইয়ের

মতই । আমাকে জবাব দিল, ঘাড় না ভাঙলে কেউ খেতে দেবে? সাধে কী আর লাঠি ধরি!

ওর কথা ছাড়ো, মা । কান ঝালাপালা হয়ে গেল ওই এক কথা শনে-শনে । এসো, মা ।

হাসুবৌ শান্তড়ীর গলা শুনিয়া মাচাঙের নিচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল । বড় শীর্ষ হইয়া গিয়াছে তাহার শরীর। মুখ পাণ্ড। চোখের কোণে রক্তিমতা আছে কিনা সন্দেহ । চোখ দুটি সদ্য আরোগ্য রোগীর মত ভাসা ও বিষণ্ণতা-ক্লিষ্ট ।

শান্তড়ী হাসুবৌকে দেখিয়া জুলিয়া উঠিল ।

ওই যে অভাগীর বেটি, দাঁড়িয়ে আছে । ছেলে কী আর আল্লা দেবে । সাকের না হলে আমাদের এত জ্ঞালাবে কেন?

হাসুবৌ কোন জবাব দিল না । ক্লান্ত দুই চোখ মাটির সমতলে কি যেন খুঁজিতে লাগিল ।

খামাখা রাগ করো কেন, চাচি । এমন কচি বয়স, হেলেমানুষ । পোয়াতিকে এমন ফজিয়ৎ করলে রোগে পড়বে যে ।

রোগটা নেই কোন্খানে?

দরিয়াবিবি হাসুবৌর নিকট অঘসর হইবামাত্র আতঙ্কিত চোখে সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল ।

হাসু । দরিয়াবিবির ডাক ।

জী, বড় বুবু ।

তোমার শরীর ভাল ত আজকাল?

না । সংক্ষিপ্ত নম্ব উন্নত ।

ক'দিনে এমন হয়ে গেছ ।

দরিয়াবিবি পুনরায় প্রশ্ন করিল, তুমি দিনের হিসেব রেখেছিলে?

লজ্জায় হাসুবৌ চোখ নামাইল ।

এগার মাস হোয়ে গেল । পেটে ব্যথা করে খুব নাকি?

জী ।

দেখি একবার ।

জী না, থাক ।

দরিয়াবিবি সাকেরের মা'র দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, চাচি, তুমি পেটে হাত দিয়ে দেখেনি ছেলে নড়ে কিনা? মরা ছেলে পেটে থাকলে, শেষে পোয়াতি নিয়ে ভারী টানাটানি হবে ।

আমাকে ছুঁতে দেয় না, মা ।

হাসুবৌ ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাস হাসু?

পিয়াস লেগেছে, বড় বুবু ।

পানি খেয়ে শিগগির আয় । শান্তড়ী আদেশ দিল । দরিয়াবৌ বিজ্ঞের মত সায় দিতে লাগিল সাকেরের মা'র মন্তব্যের উপর ।

বুড়ো বয়সে সংসারের ঝুন্ঝাট ভাল লাগে না, মা । কোথা নামাজের পাটিতে বসে

আল্লা-আল্লা করব, ওদের জন্য দোওয়া মাঝে; না, তা আর হবে না। এইসব বামেলা এই
বয়সে পোষায়?

দরিয়াবিবির সহানুভূতি প্রকাশ পায় অন্যরূপে।

তা কী করবে চাচি। এইটুকু হাবাগোবা মেয়ে, তুমি না দেখলে সংসার চলে?

হাসুরো ঘৰ হইতে আর বাহির হয় না। বাহিরে দুইজন অপেক্ষা করিতে লাগিল।
অবশ্য তাহাদের সময় অন্য কথাবার্তায় কাটিতে থাকে।

তুমি একটু দেখে যাও, মা। সত্যি পেটে যদি মরা ছেলে থাকে, মুশকিল।

তোমার বৌকে ডাকো, চাচি।

শান্তড়ীর ডাকে হাসুরো আবার মাচাঙ্গের নিচে দাঁড়াইল।

অবেলার অঙ্ককার আসন পাতিয়াছে লাউ-মাচার সরস মাটির উপর। কয়েকটি চড়ই
নীল পাতার বনে কিটিচরিমিচির করিতেছিল।

হাসুরো অবনত মুখে ফৌপাইয়া ফৌপাইয়া কান্দিতেছিল।

দরিয়াবিবি তার শীর্ণ হাত নিজের করতালুর উপর রাখিয়া মৃদু কঠে বলিতে লাগিল,
হাসু, কান্না কিসের! আমিও মেয়েমানুষ, তোর দৃঢ়ৰ বুঝি। শামী বাউলেলে হলে কোন
মেয়েই সুখী হয় না।

সাকেরের মা দরিয়াবিবির সান্ত্বনা প্রহণ করিল না।

মা, বাঁজা মেয়ে, ক'বছর বিয়ে হলো, একটা জেল হলে সাকেরের চালচলন বদলে
যেত।

দরিয়াবিবি হাসুরোর রক্ষণ্য আঞ্জলের সিকে চাহিয়া কহিল, আমারও দুটো ছেলে,
চাচি। কৈ, তোমার ভাসুরপো'র বাউলেগাঁৰ গেল? আর জোয়ান ছেলের এমন কচি বৌ
করেছিলে কেন?

শান্তড়ী কোন জবাব দিল না।

হাসু, তোমার পেট্টা একটু দেখি। যদি কপাল তোর ভাঙে, ছেলেটা পেটেই মরে
থাকে, তাকে বাঁচাতে হবে ত।

আরো জোর কান্নার সঙ্গেই জবাব দিল হাসুরো। “আমাকে মরতে দাও বুবু। আমি
সকলের গলার কঁটা। আমি গোরস্থানে গেলেই ভাল।”

দরিয়াবিবি তার চিবুকে হাত দিয়া বলিল, মুখে যা-তা কথা আনিস্নে। দু'সঁাৰ এক।
দেখি তোর পেট্।

তোমার পায়ে পড়ি, দরিয়া বুবু, তোমার পায়ে পড়ি।

তীব্র ক্রন্দনের উচ্ছাসে হাসুরোর গলা বুজিয়া আসিতেছিল। দুই হাত প্রসারিত করিয়া
সে নিজের কক্ষপট আবৃত করিল, চিলের নখের হইতে যেন বিহঙ্গনী শাবক রক্ষা করিতেছে।

একটুও লাগবে না। একবার দেখব।

হাসুরো আরো পিছাইয়া যাইতেছিল।

দরিয়াবৌ ক্ষিপ্রগতিতে তার জঠরের কাপড় তুলিয়া একটান দিল।

এ কি! একবার বন্ধুখণ্ডের ঢিবি যেন ধসিয়া পড়িতেছে। একটু জোর টানের সঙ্গেই
একগাদা ফালি ছেঁড়া টুকরো কাপড় হাসুরোর স্ফীত জঠরদেশ হইতে নামিয়া আসিল।

নঙ্গীয়ার ফালি লাল গামছা, আরো পাড়ার অপহত অনেক শিশুর কাপড় তার ভেতর।

এক নিমিষে মাচাঙ্গের নিচে মূর্ছিত হইয়া হাসুবৌ পড়িয়া গেল। স্বাভাবিক তার জঠরদেশ—স্ফীতির কোন চিহ্ন নাই সেখানে।

কাপড়ের স্তুপের সম্মুখে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল সাকেরের মা ও দরিয়াবিবি।

১১

আজহার হিসেবী বটে, কিন্তু পরিবেশের কোন উপাদান সে তলাইয়া দেখিতে শেখে নাই কোনদিন। কপাল-ঢোকা গাণিতিক বিদ্যা দোকান করার পূর্বে তার একমাত্র ভরসা ছিল। পদে পদে নিজের ভূল দেখিতে পাইয়াছিল আজহার। সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইসব ব্যাপারে তবু চোখ বুজিয়া বিধাতার দিকেই বার বার চাহিয়া থাকে।

স্টেশন হইতে সড়ক ধরিয়া বহু যাত্রী গ্রামের দিকে হাঁটিয়া যায়। তাহাদের অধিকাংশই শহর-প্রবাসী। মনিহারী দ্রব্য নগরে সন্তা পায় বলিয়া কেউ এইসব অঞ্চলে খরিদ করে না। যারা নিজ গ্রামে থাকে, তারা সামর্যাদী। এক মাস দোকান চালানোর পর আজহার তা নির্মভাবেই উপলক্ষ্মি করিয়াছিল। ভবিষ্যতের অঙ্ককারে মায়াময় হাতছানি লুকাইয়া থাকে; আজহারের মত নামাজী প্ররহেজগার ব্যক্তি এই কুহকের রংকে মনে করিত ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং সর্ব ব্যাপারে নির্বিকার। দোকান খুলিয়া অবসর যাপনই একমাত্র দিন শুজরানের প্রেক্ষণ পছ্ট। আজহারের সামান্য পুঁজি ছিল, ইতিমধ্যে সে বাড়িতে একবার টাকা পাঞ্চাইয়াছে, অবশিষ্ট মূলধন ভাঙাইয়া ভবিষ্যতের দিগন্ত জরিপ ছাড়া আর কোন পথ খোলা আছে?

মাঝে মাঝে হাট-ফেরত পসারিগারা আজহারের দোকানে ভিড় করে। তারা কোনদিন শহর দেখে নাই, শহরের জন্য লোভ বেশি। ক'পয়সার সওদা বা তারা আঁচলে তুলতে পারে? একটা সন্তা স্যালুলয়েডের চিকণী, দু'পয়সার রঙিন ফিতা, সৃঁচ-সৃতা অথবা এক ডিবা আল্টা। কেবল গঞ্জের দিনে এই মহিয়সীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

আজহারের ধ্যান-ধারণা, কল্পনার সৌধ এই দোকানকে কেন্দ্র করিয়া পড়িয়া উঠিতেছিল। দুমানদার লোকের দিন আটকাইয়া থাকে না, আজহার এই মূলমন্ত্রটি সহজে বিস্মৃত হইত না। তাহারও দিন অতিবাহিত হইত বৈকি! কোনদিন রান্নাই হইল না। যয়রার দোকান হইতে দু'পয়সার মুড়ি ও বাতাসায় নৈশভোজ সমাপ্ত হইত। নিজেকে লইয়া আজহার খাঁর কোন লোভ ছিল না বলিয়া সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস এক মুহূর্তও টলিত না।

শুক্ৰবারে দুপুরবেলা সাদা লুঙ্গি পরিয়া কিস্তি টুপী মাথায় সে তিন মাইল দূরে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়িতে যাইত। এই সময় দোকান বক্ষ থাকিত মাত্র। নচেৎ শেষ বাস স্টেশনে যাওয়া পর্যন্ত দেখা যাইত, আজহারের দোকানে চিম্বীওয়ালা ছোট দেওয়ালীর বাতি জুলিতেছে।

দুই মাস কাটিয়া গেল। দোকানে কোন আয় নাই দেখিয়া আজহার আবার মির্তীদের

কাজে জুটিল । গহর মিঞ্চী সেদিন খুব হাসিয়াছিল । আজহার তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছে । এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকস্মাত, আজহার কোনদিন তা ভাবিয়া দেখে নাই । সারাদিন কাজের পর সক্ষ্যায় আবার দোকান খোলা হইত । গঞ্জের দিন কাজে যাইত না আজহার । সেদিন দু'পয়সা বিক্রি হয়, তাই ।

গহর মিঞ্চী একদিন অযাচিতভাবে আলাপ আরম্ভ করিল ।

আজহার ভাই, আমার সঙ্গে কথা বলো না । সাধে আমি রাগ করি? কপালে মুণ্ডুর মেরে এসেছি ভাই, এ জন্মে আর কিছু হবে না ।

আজহার তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । গহর বলিয়া যায় : পয়সা কামাবার হেক্মত আছে, ফিকির আছে, ফন্দি আছে, তা যদি না জানো, দোকান দিলেই কী পয়সা হয়?

গহরের সহানুভূতি আদৌ খাদ মিশ্রিত নয়, আজহার বুঝিতে পারে ।

তুমি ত কথা বলবে না, খাঁ । আমিই বলে যাই, শোন, দোকান খুলে খন্দের ঠকাতে হবে । তার কত ফন্দি । কথায় কথায় হলফ কর, সাতবার মাইরি বল । বল, কেনা দামে বেচছি, হজুর । যদি লাভ নিই ত হারাম শুয়োর থাই । এমনি করে সাতশ শুয়োর খেলে তবে পয়সা হয় । পয়সা হলে হয়ত হাজী সাহেব হোয়ে আসতে পার । মক্কা-মদিনা ঘূরে এলে, ব্যস । সব সাফ ।

গহরের শরীর পাঞ্জা বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার পায়ে চাপ্পল্য খুব বেশি ফুটিয়া উঠে ।

আজহার এইবার মুখ খুলিল, লাভ না নিলে কেরবার চলে, তাই?

তা হলেই মিথ্যে কথা বলতে হবে । আমায়দি সাচ্চা কথাই বল, বেশি লাভ হবে না, হয়ত একদমই হবে না । তাতে সংসার চলে না ।

কথাগুলি আজহারের খুব মনঃপ্রতিপক্ষ ভয়ানক ছোট হইয়া যায় সে । তবু যেন গোলক-ধার্ধা হইতে পরিত্রাণ পাইতে তার অন্ন আকুলি-বিকুলি করে ।

ঈমানদার হলে সংসার করা দায় ।

শুধু দায়, চৌদ্দ পুরুষ জড়িয়ে পড়ে শুক । বলিয়া গহর একটি বিড়ি ধরাইল ।

বাসায় আরো মিঞ্চী কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল । আজহার আজ দোকান খুলিতে যায় নাই । বাসার আজড়া তার ভাল লাগিতেছিল ।

গহর ডাকিল : ওদু । আছিস—

ওদু-মিঞ্চী বাসার এক কোণে শায়িত অবস্থায় গঞ্জের দিকে কান খাড়া রাখিয়াছিল ।

কি রে! সে জবাব দিল ।

তোর মনে আছে, সে-বার, বেলেঘাটার আড়ৎদারের কাজ করি । এক ব্যাটা চামার আমাদের কি ঠকান না ঠকালে!

ওদুর শরীর ঝাল্ট, তাই সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছেল । এইবার উঠিয়া বসিল ।

গহর, সেই আড়ৎদারের নাম-ডাক কত জানিস, দুটো মস্জিদ তৈরি করে দিয়েছে এবার । অর্থে আমাদের খাটোনীর দামটা দিলে না । কত টাকা বাকী ছিল, গহর?

চৌদ্দ টাকা ছ' আনা ।

গহর বিড়ির ছাই টোকা দিয়া ফেলিয়া পুনরায় কহিল, ব্যাটা চৌদ্দ বছর দোজকে

ভুলবে ।

আজহার জবাব দিল, তা কি আর হয় ভাই ! কেরামিন, কাতেবিন আমাদের গোনা
আর নেকির কথা লিখছে। হাশরের ময়দানে যেদিন বিচার হবে, দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে
দেখবে নেকি আর বদীর কোনু পাল্লা ভারী। চৌদ্দ টাকা মেরে মসজিদ দিলে কোন গোনা
থাকে না, নেকীর পাল্লা ভারি হয়ে যায় ।

গহর ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল, আজহার ভাই, তোমার ‘ওয়াজে’র থলিমুখ বক্ষ করো ।
চৌদ্দ টাকায় মসজিদ হয়? কত চৌদ্দজনের কত টাকা মেরেছে তার খবর রাখো?

আজহার সায় দিল : ঠিক বলেছ, ভাই! আমি অন্য কথা ভাবছিলাম কিনা ।

ঐ রকম ভাবলে আর দোকান চলে না। মসজিদওয়ালা আড়ৎদারের মত ভাবো,
জাল-জোচোরি শেখো, কপাল খুলবে ।

তোৰা!

গহর মিঞ্চী খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। মুখ তার বক্ষ থাকে না ।

তবেই তুমি কারবার চালিয়েছ। জুম্মার দিনে দেখি তোমার দোকান সারা দুপুর বক্ষ
পঢ়ে থাকে। খন্দের যা আসে তা ওই সময় আসে। তখন দোকান বক্ষ রাখলে চলে?

আজহার সহস্র উত্তেজিত হয় না। আজ ঝোঁকের মাথায় সে প্রতিবাদ করিয়া বসিল,
এ কি কথা তোমার মুখে, গহর ভাই! এবাদতের চেয়ে পেট এত বড়!

অত ঈমানদার হলে ফকিরী নিতে হবে ।

আবার ব্যঙ্গের হাসি গহরের কষ্টে। একটু দেখ লইয়া সে ডাক দিল, খলিল চাচা,
একটু তামাক সেজে আন ।

বাসার এক কোনায় রান্না চলিতেছিল। খলিল তরকারীর ছাঁড়িতে জ্বাল দিতেছিল।
বয়সে ছোট বলিয়া বাসার সকলের ঘাঁই ফরমাস তাকে শুনিতে হয় ।

দিঙ্গি, চাচা ।

গহর অবশ্য খলিলের চাচা নয়, ওদুর সঙ্গে একত্র কাজ করে বলিয়া সে আঞ্চলিক
গুছাইয়া লইয়াছে ।

ধোঁয়া দে বাবা, ধোঁয়া দে। আর এসব ভাল লাগে না ।

খলিল তামাক সাজিয়া আনিল ।

গহর কল্পে আজহারের হাতে দিয়া বলিল, খাঁয়ের পো, তুমই প্রথমে আরম্ভ করো ।
থাক, তুমি শুরু কর। নরম সুরে জবাব দিল আজহার ।

গহর অত্যন্ত বিনয়ী এখন, কল্পে গ্রহণ করিল না ।

আজহার কল্পেক টান দিয়া ধোঁয়া ছাঁড়িতেছে আরামে চোখ বুজিয়া। তখন গহর
সহাস্যে আবার বলিলে থাকে, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয় দাও, খাঁয়ের পো। বড় কঠিন
ঠাই দুনিয়াটা ।

নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল আজহার। সে চোখ বুজিয়া ধূমপান করিতে লাগিল ।

ওদুও কল্পের প্রত্যাশী, আজহারের মুখের দিকে সে চাহিয়াছিল। খলিল কর্তব্যস্থলে
ফিরিয়া গিয়াছে। চুলায় চেলাকাঠ জ্বলিতেছিল, আগুনের আভায় দেখা যায় তার মুখ
ঘামিয়া উঠিয়াছে ।

গহর কক্ষে হাতে লইয়া কথাবার্তা শুরু করে। জীবনের অভিজ্ঞতা তার অফুরন্ত। ব্যবসা জগতের বহু মানুষ, মিস্ট্রীরপে সে দেখিয়া আসিয়াছে। উপনীত মস্তব্য তার সব জায়গায় এক : ঈমানদারের জায়গা নাই সংসারে।

আজহারের পকেটে তস্বী থাকে। ঠোটের এত তোড়ের মধ্যে সে এক-একটি দানা টিপিয়া লইতেছিল। অবাক হইয়া যায় আজহার, এই বয়সে এত অভিজ্ঞতা সম্পর্য করিয়াছে গহর!

ওদু!

ওদু আবার আড় হইয়া গুইয়াছিল বিছানার উপর। সে নিন্দিত কিনা তারই পরীক্ষা লইল গহর!

কে রে।

ওদু, শোন্ একটা মজার গল্প। সেবার আমি হাওড়ায় থাকি। এক ব্যাটা এসে বলে, মিস্ট্রী, আমার কাছে তোমার পাঁচ-সাত দিনের কাজ হবে, 'ফুরোনে' ঠিক করে নাও। পাঁচ টাকা রফা হল। আমি টাকা চাইতে বলে এই ত, কাছেই আমার বাড়ি। দশ টাকার নেট আছে, খুচরো নেই। তুমি পাঁচটা টাকা দাও, আমি দশ টাকা বাড়ি থেকে দিয়ে দেব। আমার সঙ্গে এসো। যো হুকুম। পাঁচটা টাকা তার হাতে দিলুম। মিনিট দশকে দু'জনে হাঁটার পর সে বললে, এই আমার বাড়ি। তুমি দাঁড়াও বাইরে, আমি টাকা আনি। মুসলমানদের বাইরে চট্টের পর্দা ঝুলছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই রইলাম। একটা আধবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো ডিপা হাতে। কাকে চাও? বাড়িওয়ালাকে, জ্বোব দিলাম। মেয়েটা হেসে বলে, এখানে বাড়িওলি থাকে, বাড়িওয়ালা থাকে না। ভেতরে আসবে নাকি? আমি ত অবাক! একদম বেটেশ্যো পাড়া। গলির ওপাশ দিয়ে রাস্তা আছে, আমার বাড়িওয়ালা সে পথে পেগার পার।

ওদু রস-নিষিক গল্পের মহিমায় বোধ হয় আবার উঠিয়া বসিল। মৃদু হাস্যে সে বলে, তারপর?

তারপর ঘোড়ার ডিম। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকা।

বাড়িওয়ালীর কাছে অপেক্ষা করলে না?

শুধু হাতে আর অপেক্ষা চলে না। শোনো, আরো আছে। বছর সাতকে পরে পোস্তার তেতর দিয়ে যাচ্ছি, দেখি একটা বড়ো কারবারি বসে আছে। আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। সেই লোকটা গদীর উপর, আর কত কর্মচারী চারপাশে।

ওদু তুড়ি মাড়িয়া বলিল, শেষে টাকা আদায় করলে বলো তা হলে।

আদায়! অবিশ্বাসের হাসি গহরের কঢ়ে।

ভয়ে পালিয়ে এলাম। আমার ময়লা চিরকুট কাপড় আর এই চেহারা, সেখানে থু'দিতে পারি?

আজহার তস্বী টিপিলেও গহরের দিকে তার ঘোল আনা খেয়াল ছিল।

লোকটা ঠিক চিনেছিলে?

আলবৎ। কাব্লীদের মত চোখ। অত ভুল হয় না খায়ের পো। ঐ রকম জুচোরী ফন্দী এঁটে 'শেঠ' হয়ে বসেছে এখন। ঈমানের কাল আছে আর?

তাহলে বেঙ্গমান না হলে দুনিয়ায় বেঁচে থাকা যায় না। আর কোন উপায় নেই? আর্তনাদের মত শোনায় আজহারের প্রশ্ন। গহরের মুখের দিকে এমন বিষণ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া সে চাহিয়া রহিল যে, গহর চোখ ফিরাইতে বাধ্য হইল। সেও এবার গল্পীর হইয়া যায়, কঠে তার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছিল।

উপায় যদি জানতুম, তাহলে এই দশা। আমার বিদ্যেতে কুলোয় না।

হতাশার তীব্র ব্যঙ্গনা মানুষের কঠস্বরে এমন করিয়া সহজে বাজে না। রূপকথা শুনিতে তার বাস্তব পদক্ষেপ যেন কাহিনীকার ও শ্রোতার সম্মুখে হঠাতে উপস্থিত হইয়াছে, রূপকথা তাই আর জমিতেছে না; সভায় বোবার মত সকলে দুই চোখ খুলিয়া কেবল চাহিয়া রহিয়াছে— যার কাজল গহনে শধু বিশ্ময়, ভয়, আর ভঙ্গুর মানস বুদ্ধুদের জনতা।

সকলেই চৃপচাপ। ঘরের কোণে জুলন্ত চুলার উপর হাঁড়ির ভেতর চুই চুই শব্দ উঠিতেছিল কেবল।

আজহার যন্ত্রালিতের মত তস্বীর দানা এক এক করিয়া টিপিয়া যাইতেছিল। দ্রুত চলে তার আঙুল। গহর পর্যন্ত কেন নির্বাক হইয়া গিয়াছে? সেও জবাব দিতে পারে না।

খলিল বাহিরে শিয়াছিল ভাতের ফ্যান গড়াইতে। তার অন্তু চীৎকার শোনা গেল। আজহার ঈষৎ তড়িৎ স্প্রেটের মত হঠাতে বলিয়া ওঠে, গহর, বাহিরে কি হল?

স্ব স্ব পৃথিবীতে সবাই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ওদু, গহর, আজহার তাড়াতাড়ি বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

খলিল তখন ফোপাইয়া কাঁদিতেছে। এক পুশে ভাতের হাঁড়ি বসানো।

কি হয়েছে? সকলের মুখে ওই এক কথা।

আমার হাত পুড়ে গেছে। ও, মা গো—

বয়সে ছেটে বলিয়া সকলেই খলিলের মেহনতে নিজেদের বিশ্রামের আরাম খৌজে। গহর এই দিকে বারো আনা গড়িয়স্তী করে। নিজের ভাইপো বলিয়া ওদু একদম নবাব বনিয়া গিয়াছে।

আজহার অতি ব্যক্ততার সহিত বলিল, ঘরের ভেতর চলো। আলোয় দেখা যাক। একটু সাবধান হতে হয়, বাবা।

ওদু ধূমক দিতে আরম্ভ করিল, এত বড় ছেলে, একটু হঁশগুশ নেই। পরের ছেলে নিয়ে এসে মুশকিল!

গহর অন্যান্য দিন নাবালকের উপর ওদুর তম্বী উপভোগ করে। আজ সে পর্যন্ত চটিয়া গেল।

ওদু, যা মুখে আসে তাই বলছিস। ওইটুকু ছেলে, দেড় সের চালের ভাত পসানো চাপ্পিখানি কথা নাকি? নিজে ত ছ'মাসে একবারও হাঁড়ি ছুস্মে।

ওদু গজর গজর করিতে লাগিল। গহরের তুঁড় ভয়ালক ধারালো, ওদু আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

হুকুমজারী কঠেই গহর বলিল, আমরা দেখছি ওকে, হাঁড়িটা নিয়ে যাও ঘরে। না, কুকুরের মেহমানদারী হবে আজ।

ওদু নীরবে আদেশ পালন করিল। কিন্তু সে এমন চটিয়াছিল যে, খলিলের দিক আর

চাইয়াও দেখিল না ।

খলিলের ডান হাতের আঙুলের আগাগুলো ফোস্কায় ভরিয়া উঠিয়াছে । গহর বার বার আপসোস করিতে লাগিল ।

চুলায় জুল দাও, দিয়ো । এসব কাজে আর হাত দিয়ো না, বাবা ।

গহরের মুখে এমন সুমিষ্ট বাণী । খলিলের দক্ষ আঙুলের যন্ত্রণা সামান্য উপশম হয় যেন । তাড়ি শিলে এসেছে নাকি গহর, হঠাতে এমন কথাবার্তা?

আজহার বলিল, আমি আলু বেটে দিচ্ছি । ফোস্কার উপর জুলা বক্ষ হয়ে যাবে ।

চটপট আলু বাটিতে বসিল আজহার । ততক্ষণ গহর ফোস্কার উপর তালের পাখার বাতাস করিতে লাগিল । তরকারী এখনও রান্না হয় নাই । হাঁড়ি লইয়া পড়িয়াছিল ওদু । এদিকে সে নির্বিকার ।

ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুল্টিশ বাঁধিয়া দিল আজহার । হাতের যন্ত্রণা কমিয়া আসিতেছে ধীরে ধীরে ।

আজও কৃতজ্ঞতার সহিত খলিল আজহারের মুখ অবলোকন করিতে লাগিল ।

নিজের মনেই সে প্রশ্ন করিল, চাচা, তোমার দোকানটা বড় হলে আমাকে দোকানদার করবে?

আজহার তার মুখের দিকে চাহিয়া দৈর্ঘ্য হাস্য করিল, কোন জবাব দিল না ।

সম্মতির এই আর এক নৃতন পক্ষতি মনে করিয়া আরো উৎফুল্ল হইয়া উঠিল খলিল ।

আমার এই কাজ ভাল লাগে না ।

ওদু খলিলের দিকে একবার চাহিয়া আন্তর রান্নায় মন দিল । দৃষ্টির তেতর তার কি ছিল দেখা গেল না ।

গহর এখনও হাত হইতে পাখা ফেলে নাই । মাঝে মাঝে খলিলের মুখ হইতে আহ উহ শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল । জুলা থামিলেও কজি পর্যন্ত টেনটন করিতেছিল তার ।

আজহার চাচা, আদ্যা আপনার দোকানটার বাড় দিতো!

আজহার জবাব দিল, তোমার মুখে সুবন (সুবর্ণ) বর্ষুক, চাচা ।

গহর কোন মন্তব্যের দিকে গেল না । পাখা রাখিয়া উঠিয়া পড়িল সে । তার হাত মুখ ধোয়া দরকার । আজহার আবার বাতাস করিতে লাগিল ।

ওদুকে যমের মত ভয় করে খলিল । চাচা ভাইপোয় কদচিং প্রাণ খুলিয়া বাক্যালাপ হয় ।

দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলিয়া তবু বলে, ওদু চাচা, আমার মাকে খবর দিও না, সে বড় কাঁদবে ।

ওদু প্রথমে জবাব দিল না । কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল, না, কাল-পরণ বাড়ি রেখে আসব তোকে । এখানে খামাখা বসে বসে খোরাকী খাওয়া ।

প্রথমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল খলিলের মুখ, চাচার শেষ কথাগুলো তার সারা শরীরে কালি লেপিয়া দিল ।

না চাচা, কাজ না শিখে আর ঘরে যাব না ।

আচ্ছা তাই হবে, আর ডাল হবে, বলিয়া ওদু দুই টোট চাপিয়া তরকারীর হাঁড়ির ঢাকনি খুলিল । শ্ৰী শব্দ উঠিতেছিল, খলিল ক্লান্ত দৃষ্টি সেইদিকে মেলিয়া দিল । গহর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পাখা হাতে লইল । সঞ্চার আজড়া তার মেজাজ খারাপ করিয়া

দিয়াছে, সহজে না কোন বাঁকা কথা, না বাঁকা হাসি তার মুখে নিঃস্ত হইতেছিল।

রান্নার পর খলিলের বাসনে ডাল তরকারী মাখিয়া দিয়াছিল গহর। আজহার নিঃশব্দে এক লুক্মা তার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। দগ্ধদেগে হইয়া উঠিয়াছিল এতক্ষণে খলিলের আঙুলের ফোস্কা।

জুম্মার দিন। আজহার দুপুরের আগেই ভিনগায়ে নামাজ পড়িতে গিয়াছিল। দোকান বন্ধ রাখিতে হয় নাই, খলিল বিপত্তির জন্য কাজে বাহির হইতে অক্ষম। তাই সে-ই দোকান তদারক করিতেছিল। বসিয়া বসিয়া খোরাকী খাওয়া চাচা পছন্দ করে না, তাই আজহারের নিকট সে দুআনা মজুরী চাহিয়াছিল। অবশ্য নানা অনুনয়ের ত্রুটি করে নাই খলিল। গরীব বলিয়া সে এমন নির্লজ্জ প্রস্তাব উথাপন করিয়াছে। একথা সে বার বার বলিয়াছিল। মজুরী লইয়া খলিল বাসায় থাইতে গিয়াছে, আসরের নামাজের সময় সে দোকানে আসিবে। আজহার চূপচাপ বসিয়াছিল। আজ খরিদ্বার বিশেষ নাই। সকাল বৌক যা সামান্য বিক্রয় হইয়াছে। জোরে বাতাস বহিতেছিল। রাস্তার ধুলোয় জিনিসপত্র সাফ রাখা মুশ্কিল। আসবাবপত্র আজহার পরিষ্কার করিয়া আবার বিশ্রামে রত হইল।

দোকানের পক্ষতে ঝাঁকড়া শিরীমের ডালে শন্ শন্ শব্দ উঠিয়াছিল। মেঘের রং ঝৈৰৎ কাজল, হয়ত ঝড় উঠিতে পারে। নিরুদ্ধিট আকাশের যাত্রীদের সঙ্গী হইয়াছিল এক ঝাঁক শীতের পাখি। আজহার তার কোন সংবাদ জাহিল না।

আনমনা বসিয়া থাকিলে নানা রাজ্যের চিঠি আসিয়া ভিড় করে, সোয়ান্তি পায় না আজহার।

বাতাসের স্রোত হঠাত মন্দীভূত হইয়া গেল। একটি কোকিলা কর্কশ শব্দ করিয়া সম্মুখের বাঁশবনের ঘোপে আসিয়া বসিল। এক্ষণ্ট পরে পথের মোড়ে শীসের শব্দ শোনা গেল।

আরো নৃতন পাখি আসিল নাকি? শীসের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

সড়কের দিকে মুখ ফিরাইয়া আজহার অবাক হইয়া গেল।

চন্দ্রের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইবার পূর্বে সে ‘সুইৎ’ শব্দে শীসধনির সমাপ্তি রেখা টানিয়া আজহারের দোকানের সম্মুখস্থ বাঁশের টাটির উপর বসিয়া পড়িল।

কোটাল, তুমি?

কোতুহলে চন্দ্র কোটালের চক্ষুতারকা নাচিতে থাকে। আবার শীস দিয়া সে শুন শুন করিতে লাগিল :

মধুরায় ফিরে এসে
তুলে গেছ বিন্দাবনের কথা।
আমি তোমায় চিনেছি শ্যাম,
থাইনি চোখের মাথা।

আজহার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উন্মুখ। কোটালের গান আর থামে না।

চন্দ্র, একটু থামো ভাই। জোর গলায় ডাকিল আজহার।

আগে বিড়ি দাও।

পা নাচাইতে থাকে চন্দ্র।

বিড়ি পান তামাক সব দিচ্ছি। বাড়ির ছেলেগুলেরা কেমন আছে?
গোফে তা দিয়া কোটাল জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া বিড়ালের হাসি হাসিতে
লাগিল।

অধৈর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল আজহার, সব ভাল আছে?

আবার গোফে লস্ব তা। মাথা দোলাইয়া চন্দ্ৰ জবাব দিল, আমি তার কি জানি?
হাতের তালু প্ৰসাৰিত করিয়া চন্দ্ৰ মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

ছেলেৰা ভাল আছে?

আসৱেৰ নামাজেৰ সময় নিকটেৰ্তী। খলিল দোকানেৰ সমুখে আসিয়া নীৱেৰে
দাঁড়াইল। এই লোকটিকে দেখিয়া সেও হতবাক। মনে মনে তয়ানক হাসি পাইতেছিল
তার।

খলিলেৰ দিকে নজু. পড়িল চন্দ্ৰ কোটালেৰ।

কাৰ ছেলে, আজহার ভাই? ও বাবা, এখানে তাহলে সংসাৰ পেতেছ? নিকে কৱলে
নাকি ছেলেশুক্ষ?

খলিল লজ্জায় মৱিয়া যাইতেছিল। আজহার অসোয়ান্তি প্ৰকাশ কৱিয়া বলিল, চন্দ্ৰ,
থাম একটু। ও দোকান দেখে শোনে মাৰে মাৰে। আমাদেৱ এক মিতিৱিৰ ভাইপো।

তাই ভালো। ঘৰেও সব ভাল। আগে একটা বিড়ি দাও, তবে সব খুলে বলব।

আজহার জবাব দিল, কোটাল, একটু মিষ্টি আমিয়ে দিই, তাৰপৰ বিড়ি খাও।

না, ওসব দৱকার নেই।

অগত্যা আজহার বিড়ি-দেশলাই বাহিৰ কৱিয়া দিল।

চন্দ্ৰ কোটাল নিশ্চিতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, সব ভাল আছে, ভগবানেৰ দিন
ত আটকে থাকে না কাৰো জন্য। তবে কখন কখন দুপায়ে চলে আৱ কখন হামাগুড়ি
দিয়ে, কখন চার হাত পায়ে চালাত্তে হয়।

প্ৰ্যাচ কষা কথা আজহারেৰ সহজে বোধগম্য হয় না, আজ অবশ্য পৱোক্ষ অনুভূতিৰ
সাহায্যে নিৰ্দয়ভাৱে সবকিছু উপলব্ধি কৱিল।

খী এইদিকে চতুৰ। মনেৰ হঠাৎ-জাগা কোন বেদনা সে অন্য কথায় ঢাকিতে চায়।

অনেক দূৰ থেকে এসেছো। চলো, একটু ঠাণ্ডা হয়ে মিষ্টি খাও। আৱ কোন কাজ আছে?

কাজ! চন্দ্ৰ কোটাল জৰুৰি কৱিল। অনেক কাজ। দোকানটাৰ মালপত্ৰ শুটিয়ে এখনই
মহেশডাঙা রওনা হতে হৰে।

আজহার যেন সব ঘূলাইয়া ফেলিতেছে।

শিগ্গিৰ কেন? দোকানটা কিছুদিন দেখব।

চন্দ্ৰ এবাৰ সত্যই গঢ়িৰ হইয়া উঠিল। ভয়ানক তিঙ্ক কষ্টেই সে জবাব দিল, ওসব
ৱাখো। আৱ লাখ টাকা কামাতে হৰে না। ক'মাসে ঘৰেৱ কী দুৰ্দশা হোল দেখে আসবে
চল। জমি ক'বিঘে পৰ্যন্ত রহিম বখশ নিয়ে নিল। কদিন ফেলে রাখবে সে। দৱিয়া-ভাৰী
বলে সংসাৰ চলছে, আৱ কেউ হোলে টি টি কৱে ছাড়ত।

আজহার লজ্জায় মাথা নীচু কৱিল, চোখেৰ কোণ তাৱ সজল হইয়া উঠিয়াছে।

হাঁড়িৰ খবৱ আৱ হাটে ভেঙে লাভ নেই। তোমাৰ চাদৱ দিয়ে এই ত কটা

জিনিসপত্র—বেঁধে নিয়ে, চলো সরে পড়ি।

খলিল বোৰা অবোধ শিশুৰ মতো আগষ্টক ক্ষ্যাপা লোকটিৱ গতিবিধি আড়চোখে
লক্ষ্য কৱিতেছিল।

তেৱে উপায় হয়েছে বিদেশে। চলো মহেশভাঙা। শাকপাতা খেয়ে চোখেৱ উপৰ তবু
সংসাৰটা দেখতে পাৰে।

শিকড়-বশীভৃত সাপেৰ মত আজহার আৱ মাথা তুলিল না।

চন্দ্ৰ সত্যই নাছোড়বান্দা। আজহার মনুভাবে নানা আপন্তি জানাইল, কিন্তু কিছুই
চিকিল না। এক ঘণ্টাৰ মধ্যে চাদৰে মণিহারী পণ্ডগুলি বাঁধা পড়িল। চন্দ্ৰ নিজে সড়কেৰ
ওপাড়ে এক পানওয়ালাৰ নিকট কাঠেৰ শেলংক কটা বিক্ৰয় কৱিয়া দিল। ক্ষতি হইল না
এক পয়সা। সে ত আজহার খা নয়।

কেমন বৰ্বৰ মনে হয় চন্দ্ৰ কোটালকে খলিলেৰ নিকট। দৈৰ্ঘ্য-প্ৰস্থে সুগোল, শুভবিশিষ্ট
কোন দৈত্য নয়, হঠাৎ শাহানপুৱে আসিয়া সব লঙ্ঘণ কৱিয়া দিলো গেল।

আজহার প্ৰদৰ্শ একমুঠো মুড়ি-লজেষুস যা একমাত্ৰ সাজুন্না।

বাসায় তখনও মিঞ্চীৱা ফিৰিয়া আসে নাই। কাৰো সঙ্গে বিশেষ প্ৰয়োজনও ছিল না
আজহার খাৰ। নিজেৰ সূমি কলিকা-পাটা গুহাইয়া লইবাৰ জন্য সে একবাৰ বাসায়
গিয়াছিল। খলিলেৰ মনমৰা ভাৱ দেখিয়া সে সত্যই ব্যথিত হইল।

একবাৰ সময় এলৈ আমাদেৱ গৌয়ে এসো। মহেশভাঙা, গ্যান্ডি ট্ৰাক রোডেৰ ধাৰে।

আচ্ছা, চাচা।

অনেক দূৰ আগাইয়া আসিল খলিল। জন্মাদখানাৰ গহৰে সে একজন সমব্যথী
হারাইল।

চন্দ্ৰ কোটাল দোকানেৰ মালপুঁজি পঠে ঝুলাইয়া লইয়াছিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে বলিল, যিবড়ে যেও না, খা ভাই। সামনে পুন্য মতে পীৱেৰ
মেলায় সব বিক্ৰি হয়ে যাবে।

আজহার ছেট একটি পুঁটলি লইয়া হাঁটিতেছিল, কোন জবাৰ দিল না।

পড়ত দিনেৰ শেষভাগ। ৱোদু মৱিয়া গিয়াছে। গাছপালাৰ ছায়া দীৰ্ঘতৰ হইয়া সড়কেৰ
উজ্জ্বলতা মুছিয়া দিতেছে।

জনপদ ছাড়াইয়া চন্দ্ৰ গান ধৰিল :

মথুৱা ছেড়ে কোটাল যমালয়ে চলে,
মাঠে মাঠে গোপিনীৱা ভাসে চোখেৰ জলে,
ও-ও-ও-ও-ও—।

আজহার হাসিয়া উঠিল। বলিল, চন্দ্ৰ, আবাৰ ভাঁড় নাচেৰ দলটা জমাও। গান বাঁধতে
এখনও বেশ পাৱো।

চন্দ্ৰ মাথা দোলায়, সঙ্গে সঙ্গে পণ্যেৰ বোৰা দুলিতে থাকে।

দেশে মানুৰেৰ দশা ভাল থাকলে চন্দ্ৰকে কি আৱ এত বোৰা বইতে হয়!

ঘাড়েৰ বাম দিকে বোৰা ঝুলিতেছিল, কোটাল ডাহিনে লইয়া একবাৰ ঝাঁকুনি
দিল।

ওয়ো-ওয়ো—শ্যাম, এত দুর্ক দাও রে—
ধিকিধিকি তুবের আগুন মাঠের উদাস বাও রে—

সড়কের সর্পিলতা দূরে নিয়ামতপুরে গিয়া মিশিয়াছে। আরো দশ মাইল দূরে
মহেশডাঙ। দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে বহুক্ষণ আগেই আসের জুড়িয়াছিল। প্রান্তরের হাহাখাস
বাতাসের মূর্ছনায় বিলীন কোন দিনের ইতিহাস যোজনা করিতেছিল। শব্দায়িত বিষণ্ণতা
জলা-জাঙালে।

চন্দ্ৰ শীস দিতে লাগিল, শ—ওয়ো—ওয়ো—ওয়ো—

১২

অস্ত্রান মাসের ভোরবেলা। দরিয়াবিবির ঘুম ভাঙিয়াছিল অনেকক্ষণ। ধান সিন্ধ করিবার
জন্য রাত্রির বিশ্বামটুকু বহু আগেই তাকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

সামান্য শীত পড়িয়াছিল। তরল কুয়াশায় আচ্ছন্ন গাছপালার উপরে নিষ্পত্তি তারকার
দৃষ্টি তখনও মিটিমিটি জুলিতেছিল।

মোটা শাড়ির আঁচলে পুরু করিয়া বুক ঢাকিয়া দরিয়াবিবি সিন্ধ ধান আভিনার একদিকে
চলিয়া রাখিতেছিল। ডাবা হইতে ভিজে ধান হাঁড়ি-ভর্তি করার সময় তয়ানক শীত ধরে।
চুলার নিকটে অবশ্য উত্তাপ পাওয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। বারবার হাই উঠিতেছিল দরিয়াবিবি। আজহার-নঙ্গমা
ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আসেক্জানের কাছে আমজাদ এখনও নিদায় অচেতন। দরমায় মাঝে
মাঝে মোরগ ডাকিতেছিল। বড় কর্কশ মঙ্গে হয় তার শব্দ।

চুলায় জ্বাল দিতে দিতে ঝাঁপ্ত ঝুঁয়া পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। মাস চার পরে নৃতন
সন্তানের জননী শিরোপা মিলিবে, এই চিন্তা বারবার পীড়া দিতেছিল তাকে। শ্রীত জঠর
লইয়া পরিশ্রমের কামাই নাই। দরিদ্রের গৃহে ইহারা কেন ভিড় করিতে আসে? নদীমার
চোখের পিচুটি ভাল হইতেছে না। যদি অক্ষ হইয়া যায় সে। গরীব মেয়ের হয়ত বিবাহই
হইবে না। সদরের দাতব্য হাসপাতাল পাঁচ মাইলের পথ। অতদূর কঢ়ি মেয়ে হাঁটিয়া
যাইতে পারিবে? আমজাদের মৃত্যবে পড়া শেষ হইয়া যাইবে এই বৎসর। তার আগামী
শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। চন্দ্ৰ কোটাল জমিগুলি নিজের নামে বিলি করিয়া লইয়াছিল
বলিয়া তবু চাষাবাদের জীবিকার সম্বল রহিয়াছে—নচেৎ তা-ও ধূলিসাং হইত।

হঠাৎ ফিক্ ব্যথা ধরিয়াছিল দরিয়াবিবির জঠরে। চুলার আগুনে তার ফ্যাকাশে পাষাণ-
স্তুক মুখটি আরো কালো হইয়া গেল। পেটের কাপড় খুলিয়া চুলার উত্তাপ লাগাইতে রত
হইল দরিয়াবিবি। আরো জাঁকিয়া আসে ব্যথা। এখনও দুই হাঁড়ি ধান সিন্ধ করিতে হইবে।
দরিয়াবিবির মুখে কোন আর্তনাদের শব্দ উঠিত হইল না। উঠানে সিন্ধ ধানের স্তুপ,
তখনও উত্তপ্ত ধোয়াটে বাঞ্চ উঠিত হইতেছে। দরিয়াবিবি তাড়াতাড়ি তারই উপর ঈষৎ
জঠর চাপিয়া শুইয়া পড়িল। বারবার আশক্ষিত হইতে লাগিল, এখনই সে অজ্ঞান হইয়া
পড়িবে।

একটু আগে শীতে কাঁপিতেছিল। এখন সর্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিয়াছে। কপালে শেদবিন্দু

চক্চক করিতেছিল ।

দরিয়াবিবি চারিদিকে চোখ ফিরাইল । বাস্তুর নীচে গাছপালা স্তন্ত্রতায় ভোরের আলোক পান করিতেছে । নীল কলাবনের উপরটার শুকতারা অন্য দিনের চেয়ে আজ উজ্জ্বলতর মনে হয় । তবু ধূসর আকাশের চতুরভূমি ।

অকস্মাত স্টান হইয়া ধানের স্তুপ আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া পড়িল দরিয়াবিবি । অসহ্য বেদনায় তার পা কঁপিতে থাকে । একবার শব্দ করিয়া দাঁতে দাঁতে চাপিয়া নিশ্চল পড়িয়া রাখিল উলঙ্গ ইভের প্রতীক বহনকারিণী ভূলপ্রিণ্ঠ জননী ।

সিন্ধুধানের উত্তাপে বেদনার কিঞ্চিং উপশম হইলে আবার চুলার মুখে আসিয়া বসিল দরিয়াবিবি । ধান টিপিয়া দেখিল, এইবার নামাইবার সময় হইয়াছে । দ্রুত হাত চালাইতে লাগিল সে ।

এমন কর্মেন্দু কেন দরিয়াবিবি? সংসারে শুধু মাত্র তারই ক্ষেত্রে জন্য! তার স্বামী নাই, আজহার নাই?

এক হাঁড়ি নামাইবার পর চুলায় জ্বাল দিতে দিতে দরিয়াবিবি পুনরায় চিন্তাস্ত্রোতে মগ্ন হইয়া যায় । জগদ্দল প্রস্তর-শিলার বুকে প্রস্রবণের বৃদ্ধুদ উপল-রেখায় মন্দ তরঙ্গে সমাহিতি চায় ।

চোখ বুজিয়া আসিতেছে ঘুমে, তবু কর্তব্যের বেড়ির নাগপাশ শিথিল করিবার কোন উপায় নাই । ধীরে ধীরে চুলায় জ্বাল দিতে লাগিল দরিয়াবিবি । উবু হইয়া বসার ফলে শিরদাঁড়া টন্টন্ট করিতেছে । একটি পিঁড়া সে টাঙ্গিয়া আনিল ঘরের দাওয়া হইতে ।

দিষ্টলয়ে প্রভাতের আলোর জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র । বনানীর নিঃসঙ্গ রাত্রি চোরা পাথি বিশ্বামের জন্য ঠাঁই খুজিতেছে । প্রত্যুষের মনোহরণ ঝক্কারে জাগিয়া উঠিতেছে পশ্চ-পাথি তরু-লতা কিষাণ-জনপদের অধিবাসীরা । গ্রামান্তর হইতে মুয়াজিনের ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি-মূর্ছনার রেশ রাখিয়া গেল মহেশডাঙ্গার জলা-জাঙালে ।

ঝা-পাড়ার আশে-পাশে স্নানার্থী যুবতী-বধু ছাড়া আর বোধ হয় কেহ জাগে নাই । আরো কত না রাত্রি দরিয়াবিবি একাকী জাগিয়া এমন সাংসারিকতায় নিজের সামান্য বিশ্বামটুকু বিসর্জন দিয়াছে । কোন ক্ষেত্র নাই মনে । নিষ্প্রাণ লৌহকঠিন পাথরের মূর্তির মন ঝঁঝঁ-স্কুল প্রহরে বর্ষণের আঘাত নীরবে সহিয়া যাওয়া শুধু, প্রান্তরের দিকে ভাস্করের দূরপ্রসারী দৃষ্টির ছায়া মেলিয়া দিয়া । আজও তেমনই নীরবতায় নিজেকে আবৃত করিয়াছিল দরিয়াবিবি । অলঙ্কিতে কখন চোখের কোণে অক্ষুণ্ণ জমিয়াছে, তারও খোঁজ রাখে নাই সে । পেশী, স্নায় আর মনের মিতালি অজানিতেই আসিয়াছে ।

গওদেশে তঙ্গ একফোটা অশ্রু-পতনে দরিয়াবিবি সজাগ হইয়া উঠিল । চোখ মুছিয়া চারিদিকে করুণা-বিহুল দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করিতে লাগিল ।

দাওয়ার পাশে রান্নাঘর, তার পাশে টাঁচির বেড়া । গোয়ালঘরে যাওয়ার পথ । ভিটের ধারে গাছপালা আছে বলিয়া এইদিকে এখনও অক্ষকারের ভিড় । চুলার আলোর ঝল্কানি তার ঠোঁটের উপর পড়িয়াছিল । হঠাৎ মানুষের ছায়া দেখিয়া দরিয়াবিবি দৃষ্টি আরো সজাগ করিল । মানুষের শিরোদেশের ভাঙা-ভাঙা ছায়াই ত বটে!

সকালে চোর আসে না, দরিয়াবিবিও ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়; সে উঠিয়া দাঁড়াইল ।

কিন্তু অঞ্চল হওয়ামাত্র ছায়া সরিয়া গিয়াছে। টাঁটি খুলিয়া দরিয়াবিবি চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। না, কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। মনে একটু খটকা লাগিল। আনন্দমনা দরিয়াবিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আসিল।

এইবার চোখকে অবিশ্বাসের কিছু নাই। সেই ছায়া তেমনই অবিকল টাঁচির উপর। কিন্তু অঞ্চল হওয়ামাত্র মিলাইয়া গেল।

ভয়ানক ধাঁধায় পড়িয়াছিল দরিয়াবিবি। জীন-ভূতের ব্যাপার নয় ত। একটু ভীত হইল আজহার-পত্নী। কিন্তু তৃতীয়বার টাঁটি খুলিয়া দেখিল, একটি দশ-বারো বছর বয়সের বালক কাঁঠাল গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে। তোরের আলো তখনও এখানে অপরিচিত, ছেলেটির মুখে উজ্জ্বলতা পড়ে নাই।

এই খোকা। দরিয়াবিবি ডাক দিল। ছেলেটি তোরের আলোকের ছায়ায় পা-পা করিয়া কিছু দূর আগাইয়া গেল।

দাঁড়াও। আশ রমণীর কষ্ট ধ্বনিত হয়। ছেলেটির গমন-নিরস্ত, হঠাতে মুখ ঢাকিয়া সে ফোঁপাইতে লাগিল।

দরিয়াবিবি ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বলিল, কাঁদের ছেলে, খোকা? বাপ মরেছে বুঝি? পালিয়ে এসেছো?

সে কোন জবাব দিল না। ফোঁপাইতেছিল, এখন স্তব্ধ হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তবু ফোঁপানির শব্দ তোরের বাতাসে আলোড়ন তোলে।

কাদের খোকা তুমি? দরিয়াবিবি তাকে তঙ্গবক্ষের পাশে গভীরে টানিতে লাগিল অচেতন ম্বেহে।

দরিয়াবিবির ঠোঁটে হাসি খেলিয়া যাচ্ছে—বেশ ছেলে ত। জবাব দেবে না?

এখনও এখানে অঙ্ককারের ঘোর কাটে নাই। গাছের পাতায় অলস সমীরণের কানাকানি ধ্বনিত হয়।

আবার ফোঁপাইতে শুরু করিয়াছে ছেলেটি। কোন জবাব নাই তার মুখে।

অগত্যা দরিয়াবিবি বলিল, তোমাকে ছেড়ে দিছি নে, চলো আমাদের ঘরে।

মন্ত্র-মোহিতের মত বালকটি দরিয়াবিবির বাহুবেষ্টনে থাকিয়া হাঁটিতে লাগিল।

উঠানে তোরের আকাশ থামিয়া পড়িয়াছে। মানুষের পরিচয় স্বচ্ছ দৃষ্টির কাছে অগোচর থাকে না।

খোকা, তোমার নাম কি।

বালকটি দরিয়াবিবির ডাগর চোখের দিকে নিজের আকর্ণ-বিস্তৃত দুই নয়ন মেলিয়া দিল। গভীর মমতাময়ী আঁথি-পল্লবের অঙ্ককার দূর হইতে না-হইতে দরিয়াবিবির চোখে পড়িল বালকের জ্বর উপরে কালো দাগ।

বিস্মৃতির তিমির কে যেন এক নিমেষে মুছিয়া দিল।

মোনাদির, আমার মুনি— অশ্রুসিঙ্ক কষ্টে কয়েকটি কথা আধুন্পষ্ট শুভ্ররিত শুধু হয় নাই। সেইখানে বালকটিকে গভীরে বুকে বাঁধিয়া অক্ষমাং বসিয়া পড়িল দরিয়াবিবি। তারপর শুরু হইল অবোর আঁথির উৎস-মুখের প্রস্তর-বিদারণ।

ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল মোনাদির মা'র কোলে মাথা গঁজিয়া। বাইরের প্রভাত

স্লিপ্স আলো আর বাযুতে আজ আর এতটুকু মমতাও ছড়ানো নাই ।

একটু বসো, বাপ আমার ।

সিন্ধুধান একটু আঁচ ধরিয়াছিল, পোড়া গঙ্ক উঠিতেছে । দরিয়াবিবি মোনাদিরকে বসাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামাইল ।

ধান ঢালা হইল যথাশৈষ্ট । মোনাদির মাঝে মাঝে ফোপাইয়া কাঁদিতেছে । অপরিচিত পরিবেশে তার চোখ কৌতুহলের কোন নেশায় ডুবিয়া যায় না । সে মা'র মুখের দিকে বারবার চাহিয়া থাকে ।

কাজ শেষ হইয়া গেল, সে মোনাদিরের কঢ়ি মুখ তুলিয়া তার ডাগর চোখের দিকে চাহিয়া রহিল ।

গরীব দাসী মাকে এতদিনে মনে পড়ল? ধরা-গলায় কথা শেষ করিয়া দরিয়াবিবি কঢ়ি ঠোঁটে-মুখ বারবার চুম্বন করিতে লাগিল । মাঝে মাঝে সে-ও উর্ধ্ব-নিবন্ধ নয়নে নীলিমার প্রশান্তি চয়ন করিবার উদ্দেশ্যে বোধহয় আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল ।

বেশ ভাল ছিলে, মুনি?

মুনি সলজ্জ কঞ্চে জবাব দিল, হ্যাঁ, মা ।

দরিয়াবিবি তাহাকে কোলে তুলিয়া ধূটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ।

একটু পরে আসিল আজহার । ফজরের নামাজ শেষ করিয়া সে দহলিজ হইতে ফিরিতেছিল । দরিয়াবিবি কোলে একটি অপরিচিত স্বল্পক দেখিয়া সে বিস্মিত ।

কার ছেলে কোলে?

মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোম্টা টানিয়া দিয়া দরিয়াবিবি ন্যৰ কঞ্চে জবাব দিল, আমার ছেলে এসেছে ।

বা, বেশ সুন্দর ছেলে ত । কি স্বল্পর চোখ দুটো ।

দরিয়াবিবির মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল ।

বাপ মুনি, তোমার আবাকাকে সালাম করো ।

যন্ত্রচালিতের মত মোনাদির আজহারের পায়ে কদমবুঁি শোষে আবার মা'র কোলে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিল ।

তোমাকে যেতে দেব না ।

আজহার চিবুক ধরিয়া তার মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগিল ।

তুমি আমার বাবাজী আজ থেকে । আমি তোমার ছেলে ।

নিজের রসিকতায় আজহার হাসিতে থাকে । তার স্বভাবের বীতিমত ব্যতিক্রম ।

তোমার নাম বলো ।

মোনাদির লজ্জায় মাথা নীচু করিল । জবাব দিল দরিয়াবিবি, মোনাদির হোসেন খা । আমি মুনি ডাকতাম ।

বেশ, বেশ । আমার মুনি বাবাজী ।

হঠাৎ আজহার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, আমু-নষ্টিমা-আমু—

তারা বিছানা ছাড়িয়া সকলে ছুটিয়া আসিল কয়েক মুহূর্তে । তোরের বেলা বিছানায় জ. গয়া কল্পনা করিতে আম্জাদের খুব ভাল লাগে ।

দেখে যা আয়-নষ্টিয়া, তোদের বড়ভাইকে দেখে যা ।

তারা বিস্মিত নয়নে শিশু-সুলভ বিহ্বলতায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ।

আজহারের উচ্ছাস দেখিয়া দরিয়াবিবি মনে মনে আনন্দিত হয় । তার কোলে মোনাদির উপবিষ্ট বলিয়া নষ্টিয়া আমজাদ দূরে দাঁড়াইয়াছিল ।

আয়, কাছে আয়, তোদের বড় ভাই ।

মোনাদির কোন কথা বলিল না । আমজাদের হাত নাড়াচাড়া করিতে লাগিল । তার সঙ্গে দৃষ্টি নষ্টিয়ার উপর পড়িলেও পিচুটি-ভরা চোখের জন্য কেমন যেন লাগিতেছিল তা-কে ।

দরিয়াবিবি নৈরাশ্য-ক্লান্তি নিয়ে কখন ভুলিয়া গিয়াছে । ফল্লধারার মত আনন্দের অঙ্গস্নোত তার পাঁজরে নৃতন মেঘের মত খেলিয়া যায় ।

তুমি ছেলেদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও । একটা কলার কাঁদিতে রং ধরেছে দেখে এসেছিলাম কাল, আজ পেকে গেছে নিশ্চয় । সকাল বেলাটা ছেলেদের ভাল নাট্তা হবে ।

দরিয়াবিবি দ্রুতগতি চলিয়া গেল । মোনাদির মা'র গমন পথের দিকে চাহিয়া থাকে ।

আজহার বলিল, তোমরা খেলা করো, আমি হঁকেটা ধরিয়ে আনি আমজাদ, তোর আজ মৃত্যবে গিয়ে কাজ নেই ।

আনন্দে সে উঠানময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল ।

১৩

হঠাতে নৃতন কর্মেদ্যম ফিরিয়া আসিয়াছে দরিয়াবিবির । আজহার অবাক হইয়া যায় । স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সংসার-যাপনের যুগ্মবৈকল্য থাকিলেও, এতদিন বড় ফাঁকা ঠেকিত সবকিছু । দরিয়াবিবি পাষাণই ত বুঝে আজকাল হৃদয়তার নব মুকুল প্রস্ফুটিত হইতেছে কিষাণ-দম্পত্তিকে ঘিরিয়া । স্বেহযন্ত্রের আতিশয়ের কোন কূল-কিনারা করিতে পারে না আজহার ।

মোনাদির কয়েক দিনেই অপরিচয়ের বেড়াগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে । আজহার আমজাদ অপেক্ষা মোনাদিরকেই যেন বেশি স্বেহ করে । কোন ফাই-ফরমাস তাকে খাটিতে হয় না । গাঁ হইতে এক মাইল দূরে মাইনর স্কুলে আজহার তাকে ভর্তি করিয়া দিয়াছে । মাইনাপত্র যোগাইবার সাহস আছে তার । দরিয়াবিবির উৎসাহ কম নয় । পুরাতন দিনগুলির স্মৃতি কিছুটা উত্তাপ অবশ্য হ্রাস করিয়া ফেলে । আমজাদের মৃত্যবের পড়া আর দু'মাস পরে শেষ হইয়া গেলে দু'ভাইয়ে এক সঙ্গে স্কুল যাইবে । এখনও দু'মাস । একা একা মোনাদির স্কুলে যায়, দরিয়াবিবি তার জন্য খুব উত্তলা হইয়া পড়ে । নদীর ধারে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে একদিন তার বাড়ি ফিরিতে প্রায় সকা঳ হইয়া গিয়াছিল, সেদিন সকলের চাওয়া-দাওয়া সারিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল । বিকালে দরিয়াবিবি রান্না ঢ়ায় নাই ।

মোনাদির আসেক্জানকে দু'চোখে দেখিতে পারে না । তার নোংরামির নানা কীর্তন করে সে মায়ের কাছে । আমজাদ অবশ্য কোন বিপন্নি তোলে নাই । ঘর মাত্র দু'খানা । মোনাদির আসেক্জানের কাছে ঘুমাইতে নারাজ ।

বুড়ির মাথায় যা উকুন। অগত্যা দরিয়াবিবি নিজের ঘরেই তাকে স্থান দেয়। এখানেও উসখুস করে মোনাদির। তার সহজে ঘূম হয় না, সে উপলক্ষি করিয়াছিল। এই জন্য আর একটি চালা তৈরির বায়না ধরিয়াছিল দরিয়াবিবি। ঘরে চালের সঙ্গে চাল বাড়াইয়া একটি ছেট ছেট বেড়ার কামড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল আজহার। চন্দ্র কোটাল শুধু তার গতরের মেহনত নয়, খড়ও দিয়াছিল দশ গণ। এই ঘরে মোনাদির আর আমজাদ লেখাপড়া করে, বইপত্র রাখে। পাশে উদাস্ত এলাকা, গাছপালায় ভরা। জ্যোৎস্না রাত্রে আমজাদ মোনাদির দুইজনে প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে করিতে ঘূমাইয়া পড়ে। আসেক্জান এই জন্য আফশোস করে নাই। আমজাদ তার কাছ হইতে সরিয়া গিয়াছে। কোন কোন রাত্রে বুড়ি হামাগুড়ি দিয়া তাদের কামরায় প্রবেশ করে। হয়ত এতক্ষণ গল্প চলিতেছিল, বুড়ির আগমনে চুপ হইয়া যায় দুই ভাই। মোনাদিরকে বুড়িও খুব ভাল চোখে দেখে না। ‘বুড়ো পাৰি কী পোষ মানে বৌমা, চাল-ছোলা খাওয়ানোই সার।’ দরিয়াবিবির ধমকে আসেক্জান আর এমন কথা কোনদিন মুখে তোলে নাই। সে মনে মনে তুষের আগুন ধোয়াইয়া রাখিয়াছিল। আমজাদকে একা পাইলে বুড়ি নানা মন্ত্রণা দিয়া মনের বাল মেটায়। আমজাদও সহজে আসেক্জানের ছায়া মাড়ায় না। ‘তোমার ব্যাটা, দারিয়াবৌ, মন্দ হয়ে গেছে, আর আমার কাছে শোবে কেন?’ ক্ষোভ মিশিয়া থাকে কথাটায়।

তবু মোনাদির এই সংসারে এক ব্যাপারে অনাবীয়। দারিদ্র্যের কোন ছায়া তার চোখে পড়ুক, দরিয়াবিবি তা পছন্দ করে না। স্বামী-স্ত্রী ফিল্ডফিল্স করিয়া দেনা-পাওনার কথা বলে। ঘরে চাল বাড়ত হইলে দরিয়াবিবি পূর্বের ঝোত আর হৈ-চৈ করে না স্বামীর সঙ্গে। পাছে কথাটা মোনাদিরের কানে পড়ে। হয়ত তার ফলে একদিন আবার চলিয়া যাইবে সে। পরাশ্রিত, তবু নিষ্ঠ্য এমন গরীব হাজে সেখানে মোনাদির দিন কাটায় নাই। আজহার খাঁর লুঙ্গ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। নামাজ ওঞ্চ (সহীহ) হয় কিনা সন্দেহ। সিজ্দার সময় হাঁটু বাহির হইয়া পড়ে। সে নিজে লুঙ্গ না কিনিয়া মোনাদিরের হাফপ্যান্ট ও শার্ট কিনিয়া দিল। বালক হইলেও মোনাদির সংসারের শ্রী সম্পর্কে সচেতন। মা’র অনাবীয়ভাব সে কোনদিন তলাইয়া দেখে নাই। মা’র সঙ্গই ত আশীর্বাদের সমান। অন্য কিছু নিষ্প্রয়োজন।

মোনাদিরের সবচেয়ে ভাব হাসুবৌর সঙ্গে। মাত্র কয়েকদিনে এমন আপন করিয়া লইয়াছে সে দরিয়াবিবির এই সন্তানটিকে। যেদিন স্কুল থাকে না, সারাদুপুর কাটো সাকেরের বাড়িতে। আমজাদ আর মোনাদির বইয়ের গল্প পড়িয়া শোনায়। অসহায় এই বধূটি নৃতন করিয়া প্রাণপ্রাচুর্যের সন্ধান পায়। সাকেরের সঙ্গে মোনাদিরের মাখামাখি আরো বেশি। আমজাদ পূর্বে সাকেরকে এড়াইয়া চলিত। সে-ও আজকাল মোনাদিরের দেখাদেখি সাকের চাচার সঙ্গে সব্য পাতাইয়াছে। মোনাদিরকে সে লাঠিখেলা শেখায়। দরিয়াবিবি তা পছন্দ করে নাই। তার সুন্দর কিশোর পুত্র চোয়াড় না হইয়া যায়।

জলা-জাঙ্গল, গোঠ-মাঠ নৃতন ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছে। আমজাদও ফাই-ফরমাস শুনিতে চায় না, কেবল মোনাদিরের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। আজহার বর্তমানে পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে সংসারে একজন প্রাণী বাড়িয়াছে বলিয়া। আমজাদকে এই সময় তার বেশি দরকার। সে ক্ষিণ ধরা-ছোয়া দেয় না।

চন্দ্র কোটালের সঙ্গে আজহার খাঁ শকরগঞ্জ আলুর চাষ করিয়াছিল। কঢ়ি লতায়

নদীর চর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। গোড়ায় আলু ধরে নাই তখনও। মোনাদির আমজাদের সঙ্গে এই কচি গাছ তুলিয়া মূলের মিট্টি আবাদ করিতে খুব ভালবাসে।

একদিন চন্দ্ৰ কোটাল দুইজনকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিল।

সব আলুমূল খাওয়া হচ্ছে।

এক বাবলা বনের আড়ালে তাঢ়ি গিলিয়া শুইয়াছিল কোটাল। কিশোর কষ্টের আওয়াজে ঘূম ভাসিয়া গেলে তার চোখে পড়িল এই অপচয় দৃশ্য। চোখ আরো বড় করিয়া গোফ ফুলাইয়া সে গশ্চির কষ্টে বলিল, আলুমূল খাওয়া হচ্ছে, চৌকিদার-চৌকিদার—

এমন চীৎকার করিতে লাগিল, যেন গ্রাম জুড়িয়া ডাকাত পড়িয়াছে।

আমজাদ ভয় পাইয়াছিল। মোনাদির পূর্বে এই সোকটিকে দেখিলেও এমন মৃত্তি আর দেখে নাই।

না কোটাল চাচা, তুলে দেখছিলাম আলু হয়েছে নাকি।

আলু হয়েছে নাকি আসুক চৌকিদার। পালিয়ো না, খবরদার।

আমজাদ ওকালতি করিতে আসিল, ও আমার বড়ভাই।

তুমিও চোর। চৌকিদার দুজনকেই ধরবে।

মোনাদির ভয়ে এতুকু হইয়া গেল, তার চোখে প্রায় পানি আসিয়া পড়িয়াছে।

চারিদিকে মাঠের প্রসারণ নীল-সবুজ রঙের মোহনা রচনা করিয়া চলিয়াছে। অবেলার মেঘে বর্ণকেলির সমারোহ নৃতনতর মনে হয়।

কোটাল চারিদিকে চাহিয়া একবার হাই তালিল।

চৌকিদার আসছে না, তাহলে আমাকেই বিয়ে যেতে হবে। দুই চোর। চলো আমার সঙ্গে—

আমজাদ থ' বনিয়া গেল। তাৰুপা আর নড়ে না।

আমি নাহোড়বাদা। গোফে তা দিতে লাগিল কোটাল।

তোমরা পায়ে হেঁটে যাবে না। ও, বুঝেছি। তারপর চন্দ্ৰ উৰু হইয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল, আচ্ছা, দুই চোর আমার কাঁধে ওঠো।

মোনাদির অগত্যা কী বা করিতে পারে। সুশীল-সুবোধ ছেলের মত দুইজনে চন্দ্ৰ কোটালের কাঁধে চড়িল। ভয় হয় তাহাদের, পাছে পড়িয়া যায়। দুইজনে কোটালের বাবরি চুল কথিয়া ধরিল।

ওরে বাবা, সব পাঠানের বাচ্চা, একদম ঘোড়া-চড়া করেছে— লিয়া চন্দ্ৰ হাঁটিতে লাগিল। আরোহীদের ভয়ের অন্ত নাই। আমজাদের চোখে পানি গড়াইতেছে। মোনাদির চুপচাপ।

কোটালের বপুর দোলনে আরোহীরা আনন্দ পায় না।

হঠাৎ হি হি শব্দে হাসিয়া উঠিল চন্দ্ৰ কোটাল।

—এই চোর চাচারা, চল সব চাচীর ধানায়। এলোকেশী ঘরে আছে নাকি কে জানে?

মোনাদির ও আমজাদ মাথার উপর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুইজনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্ৰ কোটাল গান ধরিল। দুজনের ঠোটে হাসি আর ধরে না।

প্রাণ যদি দিলে তুমি
প্রাণ-চোর শেষে—
কোকিল কেন রেখে গেলে
এমন পোড়া দেশে !

মেঠো বাউলের সুরে প্রান্তরের বুক ভরিয়া উঠিতে থাকে । আমজাদ ও মোনাদির দূরে-দূরে
দৃষ্টি ছড়াইয়া অবেলা উপভোগ করিতে লাগিল ।

মোনাদির বলিল, চন্দ্ৰ চাচা, আমাদের নামিয়ে দাও ।
না, সেটি হবে না । তোমার চাচীর থানায় চলো । লাল আলু আছে সারারাত আলু
থাওয়াবে ।

আমজাদ সব চিনিতে পারে । খালের সেঁতো পার হইয়া তাল গাছের সারি, শেষে চন্দ্ৰ
চাচাৰ টিবি । সেইদিকেই কোটাল অঞ্চল অঞ্চল হইতেছে । ধীর-সমীৰে খড়িবনে শন শন শন
উথিত হয় । কোটালেৰ কোন দিকে জন্মেপ নাই । বিৱহণী কোকিলেৰ ডাকে জজৱিত
হৃদয়, তাৰই বিলাপোকি কঢ়ে বাজিতে থাকে শুধু ।

তিবিৰ উপৰ এলোকেশী চন্দ্ৰমণিৰ উকুন বাছিতেছিল । উঠানে খেলাব্যস্ত যোগীন ও
গোপাল । তাৰা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া খুন ।

চন্দ্ৰমণি ভাকিল, ও দাদা, পায়ে পড়ি, নামিয়ে দাও । পৰেৱ ছেলে পড়ে গেলে—
জোৱে হাঁকিল চন্দ্ৰ, পড়ে গেলে পতিত হয়ে যাব্বি ।

মোনাদিৰ এইবাবা খিলখিল কৱিয়া কাঁধেৰ উপৰ হাসিতে লাগিল ।

ও বাবা—থানার কাছে এসে চোৱেদেৱ আবাৰ হাসি দ্যাখো । চলো, চাচিৰ থানায়,
থাওয়াবে লাল আলু ।

আমজাদও হাসিতে থাকে ।

চন্দ্ৰমণি বলিল, দাদা, ভিটেৱ উপৰ কাঁধে নিয়ে চড়ো না, তোমার ঘাড়টা ভাঙবে—
খামাখা ভাঙবে । অবিশ্বাসেৰ হাসি হাসিয়া দুই-তিন লাফে চন্দ্ৰ একদম তিবিৰ শীৰ্ষে
পৌছিল ।

কোটালেৰ কাঁধ হইতে নামিয়া মোনাদিৰ বড় লজ্জিত হয় । এই মাঠে সে আৱ
কোনদিন আসে নাই । অপৰিচিত জায়গা বলিয়া সে বিৰুত, নচেৎ অন্য কোন খটকা তাৰ
মনে নাই ।

চোখ নামাইয়া গান কৱিতে লাগিল কোটাল । এলোকেশী চন্দ্ৰমণিৰ উপৰ কৃত্রিম
ক্রোধ প্ৰকাশ কৱিয়া বলিল, ঠাকুৰবি, তোমার মাথায় রাজ্যেৰ উকুন ।

“দাদাৰ মগজে আৱ বোনেৱ মাথায় ।”

গান থামাইল চন্দ্ৰ ।

আমাৰ মগজে? কই, বেছে দাও না । তখন এলোকেশীৰ হাসি থামে না ।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মগজ দেখা যাবে কেন?

একটি মূণ্ডুৰ পড়িয়াছিল উঠানে । সেটি নিৰ্দেশ কৱিয়া চন্দ্ৰ কপট-কোপন জবাৰ দিল ।

ঐটা দিয়ে দাও এক ঘা । মগজ বেৱিয়ে যাক ।

চন্দ্ৰমণি ভাৱী রগিয়া যায় ।

দাদা, তোমার মুখে যা আসে তাই বলো, ভারী অনাছিটি।
নে, আবার নাকিকান্না। লাল আলু থাকে ত ছেলেগুলিকে খাওয়া।
আমজাদ যোগীন-গোপালকে চেনে, সে দৌড়ানৌড়ি শুরু করিয়া দিল বাস্তর উপর।
হুঁকা-কঙ্কের সঘবেহার করিতে লাগিল চন্দ্ৰ।
লাল আলু মোনাদির-আমজাদকে খাইতে অনুরোধ করিল।
বড় লাজুক মোনাদির এইসব ব্যাপারে। তবু ধীরে ধীরে ঠোট সঞ্চালন বন্ধ থাকে না।
কোটালের চোখের তারা বারবার নাচে।

মিষ্টি আলু খাও যত পারো, আর গাছের কাছে যেও না। এবার ঠিক খোয়াড়ে দিয়ে আসব।
গোপাল মামার কথার প্রতিবাদ করিল, লোককে আবার খোয়াড়ে দেয়, মামা!
দেয় বাবা, দেয়। আমজাদের দিকে ফিরিয়া কোটাল বলিল, তোমার বাবাকে খোয়াড়ে
রেখে আসব। ভারী ঘর ছেড়ে পালায়।

ধেঁ।

আমজাদ মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ঠোট বাঁকাইল। মোনাদির মুচকি হাসিল শুধু।
বেলা-শেষ ধরিত্বীর বুকে সন্ধ্যার পূর্বরাগ শব্দে-বর্ণে-কুহর-কৃজনে। ভিটার উপর হইতে
দূরান্তের আবছা গ্রামগুলি এমন দেখা যায়, মোনাদির কোনদিন কল্পনা করে নাই। লাল
আলু মুখে দিতে দিতে সে আন্মনা হইয়া যায়। তার সুন্দর ডাগর চোখের চাহনি নিকটস্থ
কোন বস্তুর উপর ক্ষণেকের জন্য আলোক তরঞ্চ ছড়ায় না। ছবির মত শুরু তালগাছের
সারি, নিচে শাদা গেঁয়ো পথ, হয়ত দু'একটি পথিক, পথ-শ্রান্ত শাদা বাচুর, যেষ আর
পথির ঘোঁক, তার বালক মনের পর্দায় বিচ্ছার ইশারা রাখিয়া যায়।

চন্দ্ৰ সকলের সঙ্গে তৃতী দিয়া জৰাইতেছিল। আন্মনা কেবল মোনাদির।
মুনিভাই, সঁাৰ হয়ে এলো, চলো, বাড়ি যাই। আমজাদ তার চমক ভাঙাইল।
আর একটু বস্ না। চাঁদনী রাত আছে, না-হলে চন্দ্ৰ চাচা পোছে দিয়ে আসবে।
অসম্মতি জানাইল চন্দ্ৰ। না চাচা, আমার অনেক কাজ। গুৰু-বাচুর, তোলা হয়নি।
এই শীতে মুগ্বৰী-পাংগুলো রাখতে হবে। জোয়ার আসতে বেশি দেৱী নেই।

আমজাদ কহিল, মরা গাঙে মাছ পড়ে?

চন্দ্ৰ : না চাচা, রান্নাটা চলে যায়।

মোনাদিরের গায়ে শার্ট ছিল। বাতাসে শীতের আমেজ তাকে তেমন কাবু করে না।
আমজাদের জন্যই অগত্যা উঠিতে হইল। অঙ্ককার হইয়া গিয়াছে দূর গ্রাম-সীমানা।
গৃহবাসীর মেহের প্রতীক্ষায় গোঠে বাঁধা গাই হাসা বৰে আবেদন জানাইতেছিল।

দুই কিশোর হষ্টমনে গায়ের পথ ধরিল। মোনাদির যেন বোৰা হইয়া গিয়াছে। মাঠের
এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ত সে কোনদিন আসে নাই।

হঠাৎ সে মুখ খুলল, চন্দ্ৰ চাচা একটা পাগল।

আৰোও ওই কথা বলে।

কিশোর মনের সিদ্ধান্ত এত সুনিশ্চিত যে, প্ৰৌঢ়জনও হার শীকার কৰিবে—এই
সাফল্যের গৌৱবে যেন দুই ভাই খিলখিল শব্দে হাসিতে লাগিল।

আমজাদ বলিল, মুনিভাই, তুমি গান জানো না?

গান আমি গাইতে পারি, লজ্জা করে।

একটা গান গাও, মুনিভাই।

মোনাদির চাচার আশ্রয়েও কারো তোয়াক্তা রাখিত না। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া গেলে, সে গঞ্জের যাত্রাশালে সারারাত্রি কাটাইয়া দিত। তমৰী চলিত পরদিন।

মোনাদির রামপ্রসাদী বাড়ি ঢংয়ের গান আরম্ভ করিয়াছিল। তার অর্থ সে আদৌ বোঝে না। কঠের ছিষ্টাত্য কেবল মৃহূর্ণা অপূর্ব পুলকাবেশ সৃষ্টি করে কিষাণ পল্লীর প্রেয়সীদের বুকে। আমজাদ জানিত না মোনাদিরের কঠ এত ছিষ্ট।

মুনিভাইয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া যায়।

গান শেষ হইলে সে বলিল, মুনিভাই, তুমি চন্দ্ৰ চাচার কাছে গান শেখো না কেন? গান জানে চন্দ্ৰ চাচা?

ভাঙ্ড়-নাচের দল ছিল, আর গান জানে না? শুনলে না, কেমন গায়?

বেশ, ভাল লাগে। আমি বলব আর একদিন।

আবু কিন্তু গান পছন্দ করে না। বলে, ওসব শিখলে মানুষ আরাপ হয়ে যায়।

দূৰ-ৱ-ৱ! আমি কিন্তু গান শিখব।

আমজাদ মাথা দোলাইয়া অঙ্ককারে সায় দিল।

পরদিন পড়স্ত দুপুরে হাসুবৌর ঘরে আড়ো জমিয়াছিল।

মোনাদিরের মতে, চন্দ্ৰ কোটাল নামে এই গ্রামে একটি পাগল আছে। তার কাহিনী ফলাও করিয়া সে বৰ্ণনা করিতেছিল। আমজাদও এই বিষয়ে একমত। হাসুবৌ ত অন্য কোন মতই দিতে পারে না।

সাকেরেৰ মা ঘৰে চুকিতে গল্পস্তোত মন্দীভূত হইয়া গেল।

মোনাদিরকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, বেশ ছেলে বৌমা। থাকো ভাই-মা'র কাছে। পৰ কী কখন আপন হয়?

মোনাদির এই কাহিনী শুনিতে প্রস্তুত ছিল না।

সাকেরেৰ মা বকিয়া যায়, জানো বৌমা, একেই বলে খুনেৰ টান। চাচা সোনা-দানা দিয়ে মানুষ কৰত, শেষে একটা পেঁচ ভেঙে ফেলেছিল তা সইল না। তোমাৰ চাচা কী কৰে, ভাই?

মোনাদির স্তৰ হইয়া যায়।

থাকো, মায়েৰ কাছে থাকো। পাঁচ-সাত বছৰ মায়েৰ কাছ-ছাড়া বলে কী আৱ মা পৰ হয়ে যায়?

তয়ানক বিৱৰণ হয় মোনাদির মনে মনে। হাসুবৌ শাশুড়ীকে দজ্জাল আখ্যা মনে মনেই দিতে থাকে। কাঠ-কুড়োনী বুড়ি বলিলে তবে আমজাদেৱ গায়েৰ রাগ যায়।

সাকেরেৰ মা কোন সাড়া না পাইয়া বকৰ বকৰ কৰিতে কৰিতে চলিয়া গেল।

আবাৰ ভাঙ্গা আসৱ নৃতন করিয়া জমিয়া উঠিল।

সাকেরেৰ ঘৰে আসবাবপত্ৰ বিশেষ নাই। তৈজসপত্ৰই বেশি। এক কোণে একটা বড়

তত্ত্বোশ পাতা। তারই উপর একদিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হাসুবৌ উপবিষ্ট। বই হাতে মোনাদির। বালিশের আড় হইয়া শ্রোতারূপে আমজাদ।

আলীবাবা ও চলিশ দস্যুর কাহিনী পাঠ করিতেছিল মোনাদির। কাসেম রত্ন-গুহার মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে আসিবার মন্ত্র সে ভুলিয়া গিয়াছে। ‘সিসেম খোল’ এইটুকু শব্দ মোনাদিরের মুখে— আবার তাকে পাঠ থামাইতে হইল। সাকের চাচা ঘরে চুকিয়াছে।

কি গো চাচারা, গল্প পড়া হচ্ছে?

জী।

হাসুবৌ মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। গৃহে প্রবেশকর্তার দিকে তার চোখ সজাগ। মোনাদির জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে চাচা?

দাঙ্গার খবর আছে, লাঠি নিতে এসেছি। কোণে তার তৈল-চিক্কণ লাঠির উপর সকলের নজর গেল।

হাসুবৌ মেঝের উপর দাঁড়াইয়া অনুরোধ করিল, না, কোথাও যেতে হবে না।
না, আগাম টাকা নিয়েছি। গাঁটীর কষ্ট সাকেরে।

মোনাদিরও চাচীর পক্ষ গ্রহণ করিল।

না চাচা, সন্ধ্যায় আমাদের খেলা শেখাবে। আজ কোথাও যেও না।

আমজাদ ওকালতীর প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিল। লাঠি-হাতে সাকের কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। হাসুবৌর শান্ত-গাঁটীর মুখ তার চোখে পড়িয়াছিল বৈকি। কিশোর বালকগুলির জিদ বোধহয় জীবনে তাকে প্রথম জিদ-ছাড়া করিল।

বেশ, তোমরা গল্প করো। বলিয়া সাকের চলিয়া গেল।

গল্প আর পড়া হইল না। হাসুবৌ বিজেই গল্প করিতে লাগিল। মোনাদিরকে কত স্বেচ্ছ-মতায় ডুরাইয়া রাখিতে চায়—

বেশ খোকা, বলিয়া হঠাৎ বিছানার উপর শায়িত মোনাদিরকে বুকে জড়াইয়া বার বার চুম্বন করিতে লাগিল। মাত্রমেই যেন নৃতন আধার পাইয়াছে।

মোনাদির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। তার ডাগর চোখ, সুন্দর গৌর কচি-ঠোঁটে যুবতীর ওষ্ঠ বিশ্বাদ আনে এক রকমের।

বাড়ি ফিরিবার পথে মোনাদির আমজাদকে জিজ্ঞাসা করিল, এই, হাসুবৌ চুমু খায়, না কামড়ায় রে?

কেন? অবোধ বালকের মতই প্রশ্ন করিল আমজাদ।

এই দ্যাখ না, আমার গালে কত দাঁতের দাগ।

১৪

এই গ্রাম মোনাদিরের খুব ভাল লাগে। শূন্য ভিটা, ছোটখাটো তরুণতার জঙ্গল, বনানীর নিচে কোথাও কোথাও সরু পথ— তার মন আকর্ষণ করে। লুকোচুরি খেলার এমন জায়গা তাদের গ্রামে ছিল না। এই পার্থক্যটুকু তার মনোহরণ করে।

আমজাদও আজকাল ঘর-প্লাটক। দুইজনে বাউলের মত গ্রাম তন্ম করিয়া

বেড়াইতে লাগিল। আমজাদও ধীরে ধীরে দৃঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ির ফাই-ফরমাস পূর্বের মত সম্পন্ন হয় না। দরিয়াবিবি মাঝে মাঝে খুব চটিয়া যায়। কিন্তু মোনাদির সম্বক্ষে সে খুব সচেতন। পাছে এতটুকু অনাদর-অবহেলার জন্য তাকে হারাইতে হয়। মোনাদিরের স্বভাব এমনিই বেপরোয়া, মাথার উপর তরী করিবার লোক নাই, এই সুযোগে সে আরো বেপরোয়া হইয়া উঠিল।

গোরস্থানের জঙ্গলের পশ্চিম দিকে খেজুর গাছের সংখ্যা অনেক। নীল থোকা-থোকা কাঁচা খেজুর পাক ধরিতে এখনও দুইমাস। অত ধৈর্য বালকদের নাই। আমজাদের সহিত যুক্তি করিয়া মোনাদির একদিন এক কাঁদি কাঁচা খেজুর কাটিয়া আনিল। তার জন্য অসীম দৃঃসাহসের দরকার। বেত-বনের ঘন ঘোপে বিশাঙ্ক সাপ থাকা বিচ্ছিন্ন। তা ছাড়া বুনো লতায় গা-হাত এমন কুটোয় যে অনেকেই খেজুর পাকিলেও এদিকে পা বাড়াইতে সাহস করে না।

মোনাদির পথ-প্রদর্শক। লতাগুল্য ফাঁক করিয়া সে অগ্রসর হইয়াছিল। বুনো লতার স্পর্শ সে প্রথমে সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমজাদের গা কুটাইতেছিল ভয়ানক। জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। মোনাদির অগ্রজের মতই তাকে শান্ত করিল। কিন্তু ঘরে দরিয়াবিবি ক্ষেত্রে আশঙ্কায় শুরু হইয়া গেল।

দু'জনে আমার মাথা খেয়ে ছাড়বি কোনদিন। পয়পয় করে মানা করেছি, কবরস্থানের দিকে যাস নে বাবা— বাবারা কান কুলো করে বসে থাকবে।

দুই ভাই কোন জবাব দিল না। দরিয়াবিবি গুরুতর পানিতে গামছা ভিজাইয়া পুত্রদের গা মুছাইয়া দিল।

মুনিভাই বললে, কাঁচা খেজুর খেতে খুব মজা।

আমজাদ মাকে বলিতেছিল।

মোনাদির প্রতিবাদ করিল : আমি খুঁঠি বলেছি মজা। খুব কষা।

আড়চোখে মোনাদিরের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া আমজাদের গা মুছাইতে লাগিল পুনরায় দরিয়াবিবি। মোনাদির তখন ঘোন। দরিয়াবিবি ইহা লক্ষ্য করিয়া আবার মোনাদিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

আয় মুনি, তোর গা-টা আবার মুছে দিই।

অভিমান-স্কুর্ক কষ্ট মোনাদিরের : না থাক, আমার গা আর কুটোয় না।

দরিয়াবিবি কোন প্রতিবাদ কানে তুলল না।

দ্যাখ দিকি বাবা, গায়ে কাল কাল দাগ পড়ে গেছে। অত ঘন জঙ্গলে আর যেয়ো না।
বড় বড় সাপ আছে।

কি সাপ আছে, মা? আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল।

খুব বিষ সাপের, জাতসাপ আছে।

মোনাদির হাসিয়া উঠল —হ্যাঁ, সাপ আছে না হাতি। কই, আমরা একটা সাপের লেজও দেখিনি।

আমজাদ হাসিতে যোগ দিল। —মা, বড়ভাই সাপের লেজ দেখেনি। সাপ কাটলে লেজ খসে যায়। না, মা?

হ্যাঁ।

মোনাদির বিশ্বাস করে না এই প্রসঙ্গ।

হ্যাঁ, কাটলে লেজ খসে না ঘোড়ার ডিম। আমার চাচার একটা বেড়ে কুকুর ছিল, সে এত লোককে কেটেছে, তার লেজ একদম থাকত না তা হলে।

দরিয়াবিবি এতক্ষণ গল্পীর হইয়াছিল, সে-ও উচ্ছবাস্যে পুত্রদের আসরে যোগদান করিল।

আরে আমার বোবা ময়না, কুকুরের আবার লেজ খসে!

মোনাদির গা চুল্কাইতে চুল্কাইতে বলিল, তবে যে আমু বলে।

তোর গা কুটোচে? জিজ্ঞাসা করিল দরিয়াবিবি।

না, মা।

তবু— আমার কাছে লুকোবে?

মোনাদির সঙ্গে হঠাতে মা'র কোমর জড়াইয়া আমজাদের দিকে আঙুল বাড়াইল।

ঐ ত আমাকে নিয়ে গেল।

কৃত্রিম কোপন দৃষ্টি প্রতিভাত হয় দরিয়াবিবির।

আমজাদ অভিমান করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আর যদি কোথাও যাই, মুনিভাই—

পরদিন আমজাদ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। স্কুলের ছুটির পর দুইজনেই গ্রাম-পথে ঘূরিয়া বেড়াইল। অন্যান্য ছেলেরা স্কুলের গ্রাউন্ডে ফুটবল খেলে, মোনাদির সেখানে থাকতে চায় না। ভয়ানক ছোট হইয়া যায় সে অন্যান্য পড়ুয়াদের নিকট। তাহাদের বেশভূষা স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে চিক্যতা থাকে। মোনাদির আমজাদের সঙ্গ-মাধুর্যে তাই পরিত্বিষ্ণুর আৰাদ পাইয়াছিল।

আজও স্কুলের ছুটির পর দুইজনে মাঠের দিকে চলিয়া গেল। চন্দ্ৰ কোটাল বাড়ি নাই, ফসল লইয়া গঞ্জে গিয়াছে— সেখানে ভাল জমিল না। আমজাদ মজা খালের একটি ধারে কতকগুলি টিলের পালক কুড়াইয়া মোনাদিরকে উপহার দিল। ভাল কলমের কাজ চলিবে।

সঙ্ক্ষ্যার পূর্বে লুকোচুরি খেলার সময় মোনাদির আমজাদের সঙ্গচ্যুত হইল। দুইজনে খেলার মাতামাতিতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আমজাদের সঙ্গে দেখা না হইলেও মোনাদির বেশি বেগ পায় নাই। একটি বাঁক ফিরিতেই পরিচিত পথ দেখিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল। ওই শীর্ণ রাস্তাটি সাদা ফিতের দাগের মত আঁকবাঁক সমন্বয়ে পাড়ার ওদিকে মিশিয়া গিয়াছে। দুইপাশে শুধু নানা রকমের গাছ। সঙ্ক্ষ্যার আসন্ন। ভয়াতুর মস্ত অক্কার জমিয়া উঠিতেছে খানা-খোদলে, পত্র-পুঁজের অনাবৃত বুকে। শাদা ঘাস ধূসরিমায় শিহরিয়া উঠিতেছে। পথের কিনারায় কেঁচো-মাটির দাগ, পায়ের আঙুলে অস্তিত্বের প্রমাণ জানায়! কত ক্ষুদ্র টিলা! মোনাদিরের দৃষ্টি মিশিয়া যায় চারিদিকে। বোবার মত বিস্ময়ে সে চাহিয়া থাকে। একটু আগাইতেই পাল্তু মাদারের ঘন বেড়া চোখে পড়িল। নিচে কেবল লতার উলঙ্গ মূল, উপরে পাতার নীল আভরণ। পাশে একটি পানাছাওয়া ডোবা, জলের আলোড়ন-ধৰনি শোনা গেল। কৌতুহলে মোনাদির উবু হইয়া দেখিতে লাগিল সূর্যের লালিমা ডোবার উপর। রঙ্গিন ঘাটের পৈঠায় একটি পিতলের কলস, গ্রাম্য কোন বধূ স্নান

করিতেছে। তার গৌর মুখ দেখা যায়। অঙ্ককার হইয়া আসিতেছে, এই ভয়ে মোনাদির পদক্ষেপ দ্রুত করিল। পুরাতন বড়ো আমের গাছ পড়িয়াছিল, গুঁড়িসহ একটি মোটা ডাল পথের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। মালিকেরা সামান্য ডালপালা কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, ধড়টি এখনও বর্তমান। ফ্যাকড়া ডালের উপর বসিয়া মোনাদিরের দুলিতে ইচ্ছা করে। সময় নাই। আরো অঙ্ককার হইয়া গেলে ঘরে ফেরা দায় হইবে। কয়েক পা আগে একটি শূন্য ভিটে, পথ এখানে সামান্য উৎরায়ের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ভিটার তিনদিকে আমগাছের পাহারা; ফাঁক দিয়া দূরে সক্ষ্যাকাশের ছান অঙ্গনে হলুদ রঙের মত মেঘ! মোনাদির দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তার চেখে শূন্যতার এই আকার জ্ঞান-রাজ্যের কোন বার্তা বহিয়া আনে না; তবু অসোয়ান্তি অনুভব করে সে। আবার ঢালু-পথ সমান্তরাল কয়েক বিঘা মাত্র। এইটুকু শেষ হইয়া গেলে সে পাড়ার অন্দরে চুকিয়া পড়িবে। এইখানে সে হাঁটিয়াছে আরো কয়েক দিন, কৌতুহলের নেশা আর এমন কোনদিন চাপিয়া বসে নাই। অঙ্ককার প্রলেপ টানিতেছে ধরিত্রীর উপর। মেঘের আলোয় সাদা পথের রেখা মুছিয়া যায় না। পানা-তরা একটি স্কুদ্র পুকুরগীর পাড়ে বাঁশবনে নীড়-প্রত্যাগত বকের দল গুলতান করিতেছে। শাবকগুলির কঁক কঁক শব্দে উৎফুল্প হয় মোনাদির। পুকুরের পাড়ের কোণে জীর্ণ কয়েকটি সুপারি গাছ। পাশে গোয়ালঘর। একটি বাচুর হাস্মারব ছাড়িতেছে। সড়কের পাশে, ইহার পর তালপাতার বেড়ার রেখা। ওদিকে গেরস্থদের সায়ং-জীবন শুরু হইয়াছে। জমাট ধোয়া উঠিতেছে গাছপালার ভিতর দিয়া। দ্রুত হাঁটিতেছিল মোনাদির। বেড়ার উপর শুক কলাপাতার দোদুল রেখামূর্তি, বাতাসে দুলিতেছে। হঠাৎ পথের পাশে খরখর শব্দ হইল। ভয় পাইয়াছিল প্রথমে, পরে সে কৌতুহলবশতঃ থম্কিয়া দাঁড়াইল। সাপ-খোপ নয় ত! এইখানে একটি শুক কাঁঠালপাছ বেড়ার খুঁটিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার শব্দ হইল। মোনাদির দৌড় মারিবার জন্য পা তুলিয়াছে!

এমন সময় বালিকার কঢ়ের সাবধান-বাণী শোনা গেল : এই খোকা—

মোনাদির ভাবিল কোন বৰ্যায়সী বোধহয় তার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। দৌড় বন্ধ করিয়া সে বেড়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

এই খোকা—

কোন বৰ্যায়সী নয়, একটি কচি মুখ কলাপাতার আড়াল ফাঁক করিয়া মৃদু ঠোঁট সঞ্চালন করিতেছে।

বালিকার মুখের একাংশ মাত্র দেখা যায়। মরা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে আড়াল হইতে কেবল মুখটি বাহির করিয়া দিয়াছিল। আকাশের আলোয় মুখাবয়বের ডান দিক শুধু আলোকিত।

কোন জবাব যোগাইতেছিল না মোনাদিরের মুখে। এমন অবস্থায় বালিকা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল।

কোন পাড়ার ছেলে?

আমতা আমতা করিয়া জবাব দিল মোনাদির : এই পাড়ার। অঙুলি নির্দেশ করিতে সে বিস্মৃতি হইল না।

ঐ পাড়ার।

ফিক্ফিক্ করিয়া মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। — এ পাড়ার নাম নেই?

তোমার নাম আছে?

বড় মুখরা ত মেয়েটা। মোনাদির রাগিয়া উঠিয়াছিল মনে মনে।

আমার নাম নেই, তোর নাম আছে? 'তোর' শব্দটাতে বেশ জোর দিয়াছিল সে।

আমার নাম আছে, তোমার নামও আছে।

মোনাদির জিভ ভাসাইয়া শব্দ করিল : আমা র ..না..ম আছেই— তারপর জিভ যদুর সম্ভব বাহিরে প্রসারিত করিয়া বলিল : তোর নাম আছে?

তারী বজ্জাত ছেলে ত। কাদের ছেলে রে?

মোনাদির আবার ব্যঙ্গ করিল। বেড়ায় আড়াল ফাঁক করিয়া গুঁড়ির উপর সে সশরীরে বাহিরে আসিল। মোনাদির দেখিল ফালি পরা একটি সুড়েল তনু, বছর নয় কী দশের বালিকা। চুলগুলি এলোমেলো পিঠের উপর দোল থাইতেছে। মুখটি গোলাকার, গৌর রঙের উজ্জ্বলতা-উচ্ছল। টানা চক্ষুতারকা চড়ুই পাখির মত জ্বর নিচে চতুর্ভুলতায় অস্ত্রিত।

কাদের ছেলে রে? মেয়েটি ভেংচি দিতে বিলম্ব করিল না। মোনাদির এবার রীতিমত রাগিয়াছিল। পথের উপর ঢেলা ইত্যাদি কিছু না পাইয়া আক্রোশে সে ফুলিতেছিল।

দেবো পা ধরে নিচে ফেলে চিৎ পটাং।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া ভেংচি কাটিয়া বলিল, আমার পায়ে সালাম করবি নাকি?

মোনাদির হাতের তালুর ভিতর অন্য হাতের মুষ্টি কচ্ছাইতে লাগিল।

দেবো পা ধরে ফেলে—

দাঁড়া ত রে বজ্জাত, বলিয়া মেয়েটি গাছের গুঁড়ি হইতে বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তার পদক্ষেপ শোনা যায়। পাইল মোনাদির। সে ছুট দিল এইবার সড়কের সোজাসুজি।

পশ্চাতে বালিকা কঢ়ের ডাক শুন্ত হয় : এই খোকা, শুনে যাও— কিছু বলব না তোমাকে—

মোনাদির আবেদনে কোন সাড়া দিল না। ভীত-ত্রস্ত সে। কিছুর গিয়া গাছের কোলজোড়া অঙ্ককারে থামিয়া একবার পশ্চাতে চাহিল। অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি আলুলায়িত-কুন্তলা চকিত-দেখা কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিল। হ্যাঁ, সে-ই ত। তুল হয় নি কিছু।

কেমন যেন মনমরা হইয়া বাড়ি ফিরিল মোনাদির।

১৫

পরদিন দুপুরে আহার সমাপ্তির পর মোনাদির কৌতুহলবশত পাড়ার পথে বাহির হইল গত সন্ধ্যায় আবছা-দেখা সড়কের জগৎ। আজ দুপুরে চারিদিকে আন্মনা দৃষ্টি ছড়াইতে তার কাছে নৃতন ঠেকিল সবকিছু। হারানো পথ রেখা নৃতন করিয়া সঙ্কান করিতে লাগিল সে।

দু'পাশে তালপাতার বেড়া। মাঝখানে শুক্র কঠাল গাছের ঘুঁড়ি। জায়গাটা চিনিতে
বেশি বিলম্ব হইল না। অবাক হইয়া মোনাদির অবলোকন করিতে লাগিল চারিদিক।
কীট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র জীবনলীলা। শুক্র কাঠের সেতু বাহিয়া একদল পিপীলিকা আহার
মুখে অগ্রসর হইতেছে। ক্ষুদে লাল পিংপড়ের সারি ছোঁড়া ঘুড়ির সৃতার মত যেন
বাতাসে কাঁপিতেছে। আঁকাৰ্বাঁকা গতি একটি তালপাতার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া
গিয়াছে।

মোনাদির একবার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইল। জোড়া সুপারি গাছের ওধারে গেরহু
বাড়ি। ডিগডিগি শব্দে একটি ক্ষুদে পাথি তেতুল বনে পতঙ্গ সঞ্চান করিতেছিল।

এই, কাদের বোকা ছেলে রে। বালিকা কঠের ডাক। হঠাৎ ভয় পাইয়া মোনাদির
পেছনে ফিরিবে কী, আর একটি কোমল হস্তে সে বন্দী। গত সন্ধ্যায় দেখা সেই বালিকাই।
তার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। মোনাদির প্রস্তুত ছিল না। মেয়েটি হাত ধরিয়া তাকে টানিতে
টানিতে গেরহু বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। মাকড়শার জালে যেন প্রতিবাদ করিবার
অবসর নাই, দু'মিনিটের ভিতর ভোজভাজির মত কি যেন ঘটিয়া গেল। আর একটি
গেরহুর আঙিনায় সে এতক্ষণে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

ওমশা, শিগ্গির বেরোও, দেখো কা'দের ছেলে।

খিলখিল শব্দে হসিতেছিল মেয়েটি।

কি রে আঘিয়া।

আঞ্জিনার সম্মুখে একটা খোড়ো চালের ঘর, ত্রৈর দাওয়া হইতে একজন মেয়ে জবাব
দিল। সে ঘরের দেওয়ালের মাটির ছোপ দিতেছিল।

আঘিয়া আর একবার সমস্ত হাসি মিশ্বশেষ করিয়া দিল।

কি চুরি করবে বলে আজ বেলামেলি বেরিয়েছে, মা।

মেয়েটি কর্মব্যস্ত। সে একবার এইদিকে চাহিয়া কাজ বন্ধ করিল।

আঘিয়া, কা'দের এমন সুন্দর ছেলে?

হাসির স্নোতে ভাটা নাই।

সুপুরিগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল, ধরে এনেছি।

লাল মাটি মাখা ন্যাকড়া হাতে মেয়েটি দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। আঘিয়ার
মা'র নাম আঘিরন।

খোকা, কোথায় থাকো?

এমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাইবে মোনাদিরের মত চট্টপটে ছেলে, বিশ্বাস করা যায়
না। আজ তার কঠে বাক্য হোচ্ট খাইতেছিল।

আ-মি-ঝি-পাড়ায় থাকি।

আঘিরন বদ্নার পানি লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিল।

ঝি-পাড়ার কার ছেলে?

মোনাদির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল মাটির সঙ্গে। আর যা-ই হোক, আজহার ঝি
তার পিতা নয়।

আমার মা দরিয়াবিবি।

আমিরন দরিয়াবিবির চেয়ে বয়সে বড়। প্রৌঢ়ত্বের ছাপ মুখ্যবয়বে স্পষ্ট। রোগা
শরীর। গাল দুটি সুষমায় উজ্জ্বল হইলেও, বয়সের দাগ পড়িয়াছে। একরকমের কৃত্রিম
গাঢ়ীর্ঘে তার মুখখানি ছাওয়া।

অভ্যর্থনার হাসি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে।

দরিয়াবুর ছেলে, দরিয়াবুর ছেলে, বলিতে বলিতে আমিরন আগাইয়া আসিল।
আমিয়া তখনও হাসিতেছিল।

কৃত্রিম ক্রোধে তার দিকে ফিরিয়া আমিরন বলিল, হতচাড়ি, হিড়হিড় করে কাঁকে
ধরে আনলি। মাফ চা।

আঞ্চীয়তার যোগসূত্র আছে এই কিশোরের সঙ্গে, আমিয়া তা কল্পনা করে নাই।

তুমি এসেছো শুনেছি, বাবা। গরীব মানুষ, কাজকর্মে সারাদিন যায়। খেটে খেটে
আর পারি না। আজ ক'দিন যে খাঁ-পাড়ার দিকে যাই নি।

আমিয়া কৌতুহল-দৃষ্টি দিয়া মা ও আগন্তুক কিশোরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।
হঠাতে নথে মাটি ঝুঁটিতে লাগিল সে।

আমিরন হাঁক দিল : এই হতচাড়ি— একদম ভিজে বেড়াল-ছানা বনে গেলি যে,
দাওয়ায় একটা বসবার জ্যাগা দে। চলো, বাবা।

আমিয়া মা'র আদেশ নীরবে পালন করিল। মোড়ার উপর যন্ত্র চালিতের মত বসিয়া
পড়িল মোনাদির। তার পাশে বসিয়া আমিরন সংসারের কাহিনী-জাল বুনিতে থাকে।

মোনাদির এতক্ষণ মুখ খোলে নাই।

আমিরন বিবি বলিল, বাবা, একদম বেত্তার ব্যাটা। কথা বলো।

আজকে আসি, চাচী।

না, একটু বসো। কিছু খাও।

আমি ভাত খেয়ে এসেছি।

কোন প্রতিবাদ শুনিল না আমিরন। ডোলে করিয়া সামান্য মুড়ি তাহার সম্মুখে
পরিবেশন করিল।

গরীব চাচী। কিছু কি ঘরে আছে, চাঁদ। তোমার চাচা আজ দু'বছর হোল ইঞ্জেকাল
করেছে। ঐ হতভাগীকে নিয়ে জুলেপুড়ে মরছি। কথা শুনবে না, খালি গাছতলায় ঘুরে
ঘুরে বেড়াবে।

জননী-কন্যার দৃষ্টি বিনিময় হইল। ভারী গাঢ়ীর হইয়া গিয়াছে আমিয়া।

তুমি কদিন এসেছো?

অনেকদিন হোয়ে গেল। মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে জবাব দিল মোনাদির।

ফুরসৎ নেই, বাবা। সকাল থেকে কত কাজ, গাই-গরু আছে একটা। মুরগী-হাঁস
ছাগল-পাগল আর গ্রি (আমিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ) পাগলী— আমার সংসারে এক
ফোঁটা দয় ফেলার উপায় নেই। খাঁ-পাড়ার মুখ দেখিনি ক'মাস।

মোনাদির অনুভব করিল, তার নৃতন চাচী অনৰ্গল বকিতে অপটু নন। মাথা দোলাইয়া
আমিরন নিজের কথায় সায় দেয় : বেশ সুন্দোর ছেলে। আমার দরিয়াবুরু কেমন? তার
ছেলে রাজপুত্রের মত দেখতে হবে না?

ଲଙ୍ଘାୟ ରାଙ୍ଗ ହଇତେ ଥାକେ ମୋନାଦିରେର କିଶୋର ଦୁଇ କପୋଳ ।

କୋନ ରକମେ ବେଂଚେ ଆଛି, ଖୋକା । କପାଳେ ମେହନ୍ତ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁ ଲେଖନ ଦିଯେ ଆସି ନି । ତୋମାର ଚାଚା ଭାଲ ଲୋକ ଛିଲେନ । ତୋମାର ଏହି ବାପେର ମତ ଦଶ ଢରେ ମୁଁ ଖୁଲତ ନା । ତାର ଫଳ ଆଜି ଭୋଗ କରାଛି । ଦୁଇତିନ ବିଷେ ଜମି ଛିଲ, ସବ ପରେର ଗବ୍ବବେ ।

ତାରପର ଫିସଫିସ ଶବ୍ଦେ କଥା ବଲାତେ ବଲାତେ ଆଜୁଲ ବାଡ଼ାଇୟା ଆମିରନ ଆଞ୍ଜିନାର ଓପାରେ କଥେକଟି ଖଡ଼ୋ ଚାଲ ଦେଖାଇଲ ।

ଓହି ଯେ ଆମ୍ବିଆର ମେଜ ଚାଚା । ଏକଦମ ଖାନ୍ତାସ । ବେଓୟା ମାନୁଷ, ତାର ଦୁଇଧା ମେରେ ନିଲୋ । ଫସଲ ଦିତ ନା, ଶେମେ ଲୁକିଯେ ରେଜେସ୍ଟୋର କରେ ନିଜେର ଜମିର ସାଥେ ଚାଲିଯେ ଦିଲେ । ନିକ୍ତ ହତଭାଗାରା, ଆଜ୍ଞା ତାର ଇନ୍ସାଫ କରବେ । କତ କତ ଜିନିସ ଆନେ ବାବା । ଏତିମ ମେଯେଟାର ହାତେ ଯଦି ଏକଟୁ ଛୋଯାଇ । ସ୍ଵତ୍ୟେ ଆହେ କୀ?

ମୋନାଦିର ତ୍ର୍ୟିମାଣ ଶିତ୍ର ମତଇ କାହିଁନୀ କାନ ପାତିଯା ଶୁନିତେଛିଲ । ଆମ୍ବିଆଓ ତାର ମତ ଏତିମ । ମନେର କୋନାଯ କୋନାଯ ମୃଦୁ ନିଃଶାସ ରକ୍ତ ଆବେଗେର ଝଟିକା ଫୁଁକାର ରଚନା କରେ । ତବୁଓ ବିଦାୟେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସ୍ଖୁସ କରିତେଛିଲ ମୋନାଦିର ।

ଗେଲେ ବଛର ବର୍ଧାୟ ଘରେ ଏକମୁଠୀ ଚାଲ ନେଇ । ଧାର କରତେ ଗେଲାମ । ଏକ କୁଣ୍କେ ଚାଲ ଦିଲ ନା ବେଚି । ଏକଦିନ ଉପୋସ କରେ ମରି । ଆମାର ଜମି ନିଲେ, ଆମାର ପେଟେ ଦାନା ନେଇ ।

ଆମିରନେର ଚୋଥେର କୋନାଯ ପାନି ଜମିଯା ଉଠିତେଛିଲ, ଆଁଚଲେର ଖୁଟ ଦିଯା ମୁହିତେ ଲାଗିଲ ।

ମୋନାଦିର ‘ଆସି ଚାଚି’ ବଲିଯା ଉଠିଯା ପଞ୍ଜି । ଆର କେଉ ହୋକ କରଣ କାହିଁନୀର ଶ୍ରୋତା । କିଛୁଇ ଭାଲୋ ଲାଗେ ନା ତାର ।

ଆନମନା ସଡ଼କେର ମୟୁଖେ ଆସିଯା ହେଲି ପିଛନେ ତାକାଇଲ ଏକବାର । କଥନ ଅଜାନିତେ ପିଛୁ ପିଛୁ ଆସିଯାଇଲ ଆମ୍ବିଆ, ସେ ବର୍ଜଟ କରେ ନାହିଁ । ଏକବାର ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହଇଲ ମୋନାଦିର । ହ୍ୟା, କାନ୍ନାରଇ ଆଓୟାଜ । ଆମିରନ ଚାଚିଶ୍ରୀତ ଶାମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବିସର୍ଜନ ଦିତେଛିଲ ।

୧୬

ଆମଜାଦ ଏକଦିନ ଥିବା ଆନିଲ, ଶୈରମୀର ପୁତ୍ର ମାରା ଗିଯାଇଛେ । ତାର ପତ୍ନୀ ଜୀବନେର ଅବସାନେ ଜନନୀ ଅନ୍ତତ ସୋଯାଣ୍ଟି ପାଇବେ । ଦରିଯାବିବି ପୁତ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ସେଇସୂତ୍ରେ ନିଜେଦେର ବହୁ କାହିଁନୀ ଟାନିଯା ଆନିଲ । ବେଚାରା ଶୈରମୀ ।

ଦରିଯାବିବି ବଲିଯାଇଲ, ଶୈରମୀକେ ଏକବାର ଡେକେ ଆନବି । ମୋନାଦିର ଓ ଆମଜାଦ ବାଗନ୍ଦୀ ପାଡ଼ା ହଇତେ ପରଦିନ ଫିରିଯା ଆସିଲ । ଶୈରମୀଓ ଶୟାଶ୍ୟାମୀ । ପ୍ରତିବେଶୀରା ଏତଦିନେ ତାର ପ୍ରତି କୃପାପରବଶ । ଶୈରମୀର ଦୂରାୟୀଯା ଏକ ବିଧିବା ନନ୍ଦ ତାର ସେବା-ଶ୍ରୀମାର ଭାର ଲାଇଯାଇଛେ ।

ଆରୋ ଦୁଇଦିନ କାଟିଯା ଗେଲ । ଆମଜାଦ ରୋଜଇ ତାର ଥିବା ଲାଇଯା ଆସେ ।

ଆଜ ଅପରାହ୍ନେ ଆସିଯା ସେ ବଲିଲ, ମା, ଶୈରମୀ ପିସି ଆର ବାଁଚବେ ନା ।

ବାଁଚବେ ନା! ଦରିଯାବିବି ତ୍ର୍ୟିମାଣ ମୁଖେ ପୁତ୍ରେର ଦିକେ ଚାହିୟା ରହିଲ ।

ନା ଗୋ, ମା । ଏକେ ପାଂଲା ଚେହାରା, ରୋଗେ-ଶୋକେ ବୁଡ଼ିକେ ଚେନା ଯାଯା ନା ।

ଦରିଯାବିବି ଏହି ବାଗନ୍ଦୀ ରମଣୀର ସର୍ବିତ୍ତେର ବହୁ ଶ୍ରୀତ ଶ୍ରମ ପଥେ ଟାନିଯା ଆନିଲ । ବନ୍ଦକ

ঘড়াটি আর ছাড়ানো হয় নাই। মাসে সংসারের খরচ বাড়িতেছে। আয়ের সংস্থান কোথায়? চন্দ্ৰ কোটাল মৃতন কোন ব্যবসা ফোদিবার আয়োজন করিতেছে। মূলধনহীন কোন ব্যবসা আৱণ্ট কৰা যায় কিনা। কয়েক মাসে শুধু যুক্তি-পৰামৰ্শই সার হইয়াছে। দৱিয়াবিবি ভাবিল, সক্ষ্যায় একবাৰ দেখা যাক, ঘড়া ছাড়ানোৰ টাকাটা যদি কোথাও থেকে যোগাড় কৰে আনতে পাৰি। প্ৰাচীন সামগ্ৰী ঘৰছাড়া হইবে। কিন্তু শৈৱমী কাৰ কাছে বন্ধক রাখিয়া আসিয়াছে, সে জানে না।

দৱিয়াবিবি আবাৰ জিজ্ঞাসা কৰিল, বাঁচবে না?

আমজাদ মাথা দোলাইল, না গো, মা।

মোনাদিৰ তাৰ সঙ্গে গিয়াছিল, সেও মন্তব্য সমৰ্থন কৰিল।

ঘড়া চুলোয় যাক, একবাৰ শৈৱমীৰ সঙ্গে কি দেখাও হইবে না! এই চিন্তা দৱিয়াবিবিকে বেশি পীড়িত কৰিতেছিল। বাগ্নীপাড়া দূৰ নয়। পনৰ মিনিটেৰ পথ। গা ঢাকা অঙ্ককাৰে অকৃত ও পৰ্দা বাঁচাইয়া সে সহজেই শৈৱমীকে দেখিয়া আসিতে পাৰে। কিন্তু আজহার রাজি হইবে কী? এই একটি বিষয়ে দৱিয়াবিবি আজহারকে ভয় কৰে। চাৰী বাসীৰ সংসারে পৰ্দাৰ অত ঝামেলা নাই। পাড়া পড়শীদেৱ সঙ্গে দৱিয়াবিবি স্বচন্দে দেখা কৰিতে যায়। কিন্তু ভিন পাড়াৰ, বিশেষ কৰিয়া বাগ্নীপাড়াৰ ব্যাপারটা প্ৰকাশ হইয়া পড়িলে মুসলমান পাড়ায় আৱ তাদেৱ কোন ইজ্জত থাকিবে না।

হৃদয়েৰ ঐশ্বৰ্য জাতি ধৰ্মেৰ বালাই লুকাইয়া রাখে। শৈৱমীৰ সৱল প্ৰাণেৰ পৱিত্ৰ্যপত্ৰ যতই দৱিয়াবিবিৰ নিকট গাঁথা স্মৃতিৰ সড়ক বাছিয়া উড়িয়া আসিতে লাগিল, সে ততই অস্থিৰ হইয়া উঠিল। আমজাদেৱ ছোট ব্ৰেন্থ একবাৰ খুব ম্যালেৰিয়া হয়। জীবনেৰ কোন আশা ছিল না। শৈৱমী প্ৰতিদিন ভাকে দেখিতে আসিত। একদিন সে কয়েকটি বাতাসা আনিয়া দৱিয়াবিবিৰ হাতে দিয়াছিল।

কি হবে, শৱাদি?

খোকাকে খাইয়ে দাও একটা।

কিসেৱ বাতাসা?

শৈৱমী মিথ্যা কথা বলে নাই। গ্ৰামেৰ বারোয়াৱীতলায় শিবালয়ে সে হৱিৱ লুট দিয়া আসিয়াছে আমজাদেৱ নামে। তাৰই বাতাসা। ধৰ্মে বাধেই ত। দৱিয়াবিবিৰ মনেও ঘট্কা লাগিয়াছিল। মৰণাপন্ন পুত্ৰেৰ শিয়াৰে দৱিয়াবিবি কাৰো প্ৰাণে আঘাত দিতে রাজি ছিল না। যদি বাছার গায়ে 'বদদোয়া' লাগে। শৈৱমীৰ সম্মুখেই সে আমজাদকে বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। আল্লা কি মানুষেৰ মন দেখেন না, যিনি সব দেখেন? অখ্যাত পল্লীৰ জননী হৃদয়েও সেদিন এই প্ৰশ্নাই বাৰবাৰ জাগিয়াছিল।

প্ৰত্যহ শৈৱমীৰ জীবনেৰ বহু অধ্যায় কল্পনায় পাঠ কৰিতে লাগিল দৱিয়াবিবি। দুঃখেৰ দিনে প্ৰতিবেশীদেৱ কাছে যে লজ্জা বিৱাট দীনতাৰ প্ৰকাশ, দোসৰ পাইলে তাৰ চিহ্ন মাত্ৰ অবশিষ্ট থাকে না। শৈৱমীৰ মত দোসৰ দৱিয়াবিবিৰ দৈনন্দিতায় আকস্মিক আসিয়া জুটিয়াছিল।

তোৱ পিসি কথা বলতে পাৰে, আমজাদ?

বড় ক্ষীণ গলাৰ আওয়াজ।

একবার তাকে দেখতে যেতে ইচ্ছে করে ।

আমজাদও মুরুরি চালে বলিল, তুমি বাগদীপাড়া যাবে?

যেতে দোষ কী? তারা মানুষ নয়?

মোনাদির বলিল, মা, তুমি অতদূর যেতে পারবে না, তোমার এই শরীর?

দরিয়াবিবি নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইল। তার স্ফীত জঠর পুত্রের চোখেও ধরা পড়িয়াছে। আর এক সমস্যা। পূর্ণ গর্ভবতী একটি মেয়ে নিশাচর সাজিয়া বাগদীপাড়া গিয়াছে শুনিলে আজহার তাকে খুন করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপারে স্থামী কেউটে সাপের চেয়েও বিপজ্জনক। অথচ কত নিরীহ আজহার। এই নিরীহ লোকটি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখিলে কেন এইরূপ রক্ষণাত্ম হইয়া যায়, দরিয়াবিবি ভাবিতে লাগিল।

পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল তিনজনের মধ্যে। আজহার ঘুমাইয়া পড়িলে আমজাদ, মোনাদির ও দরিয়াবিবি শৈরমীকে দেখিতে যাইবে। শুধু-হাতে ঝুঁগি সর্বীর নিকট যাওয়া অশোভন। অত্তত দু'আনা পয়সা দরকার। যা হাত টান। সে ভার গ্রহণ করিল আমজাদ। আশেক্জানের নিকট হইতে সে দু'আনা পয়সা আদায় করিয়া আনিবে।

সুযোগ আসিল সহজে। সারাদিনের খাটুনির পর আজহার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেদিন। তিনজনে গ্রামের অঙ্ককার পথে পাড়ি দিল।

ফিস্ফিস্ক কষ্টে পথ চলার সময় দরিয়াবিবি জিঞ্জুসা করিল, আমজাদ, পথ চিনিস? শুব। রোজ এই রাস্তা চমে ফেললাম।

মোনাদির পথটির সহিত বিশেষভাবে পর্যাপ্ত নয়, সে চুপ করিয়া রহিল।

সরু সড়কের পাশে ঘন ঝোপ জঙ্গল সোতাস বহিতেছিল। পিঞ্জরাবদ্ব পাখির আকাশ বিহারের মত নেশা লাগে দরিয়াবিবির মুখ্যে। ঘরের আনাচ, কানাচ, বড়জোর প্রতিবেশীদের সীমানা ছাড়াইয়া পৃথিবীকে দেখিবার শুব বেশি সুযোগ ঘটে নাই তার।

প্রহর দুই রাত্রি অতীত। চার্ষাদের সদরে পিন্দিম জুলিতেছে এখনও। তাসের আড়ডা চলিয়াছে বোধহয়। পথে লোকজন নাই। দরিয়াবিবি নিঃসঙ্কোচেই হাঁটিতেছিল। অঙ্ককারেও সরু পথের শুভ দাগ চক্ক করিতেছে।

শৈরমীর ঘরে চুকিয়া দরিয়াবিবি শিহরিয়া উঠিল। শুণ্পড়ি ঘর। পুরাতন হাঁড়িকুঢ়িপূর্ণ। ময়লা মাদুরের উপর আরো ময়লা একটি বালিশ মাথায় শৈরমী শুইয়াছিল। ঘরের চারিদিকে কোন জানালা নাই। বড়ের উপদ্বব জীর্ণ কুটিরের পাঁজরে সহ্য হইবে না, তাই এই ব্যবস্থা সহজে মানিয়া লয় গরীব কৃষকেরা। দম আটকাইয়া যাইতেছিল দরিয়াবিবির। তবু মমতার বিজয়ী আহ্বান সব অসোয়াস্তির চিহ্ন মুছিয়া ফেলে। শৈরমী চোখ খুলিয়া বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

দরিয়াবিবি ডাক দিল, সই!

শৈরমী জবাব দিল না। হাত-ইশারায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। দরিয়াবিবি দ্বিক্ষি করিল না। শৈরমীর আঙীয়া শিয়রে বসিয়া পাখা দোলাইতেছিল।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন আছে?

কোথায় ভালো, মা।

আঞ্চীয়া মেয়েটি গ্রিয়মাণ কষ্টে জবাব দিল ।

আবার ডাক দিল দরিয়াবিবি : সই । কেমন আছো?

গলায় কফ জমিয়াছিল শৈরমীর । ঘড়ঘড় শব্দ হয় শ্বাসনালীর ভিতর । সে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করিল ।

নারীকষ্টের ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল : ভালো-ভালো ।

আবার হাঁপাইতে লাগিল শৈরমী । বিধবা মেয়েটি আদিখ্যেতা শুরু করিল : কপাল দেখো, মা । গরীব আমরা, দেহটা যদি ভাল থাকে । শোকের ওপর আবার এই রোগ । ভগবানের কী ফুটো চোখও একটা আছে?

দরিয়াবিবির দিকে অস্তুত ক্লান্ত স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া শৈরমী চাহিয়াছিল, চোখের পাতা আর পড়ে না । দরিয়াবিবিরও চক্ষু ফিরাইবার সামর্থ্য ছিল না যেন ।

শৈরমী এবার গলা পরিষ্কার করিল কয়েকবার ঘক-ঘক কাশিয়া ।

সই, ভালো হই, যাব ।

দরিয়াবিবি তার রেখাক্ষিত ময়লা হাতটি স্পর্শ করিয়া দেখিল । জুর নাই বোধ হয় । শীতল, ঠাণ্ডা হাত ।

হ্যা, এসো আবার ।

মাথা দোলাইল শৈরমী ।

সই ।

সই ।

তোমার ঘড়াটা, জয়া দাও ত । কথা বলিতে বীরিমত কষ্ট হইতেছিল শৈরমীর, ঘরের হাঁড়িকুঁড়ির জঙ্গলের দিকে সে হাত বাড়াইল ।

আবার মৃদু ঠোঁট সঞ্চারিত হইল—আমি—আমি ছাড়িয়ে এনে রেখেছিলাম, টাকাটা আমার হাতে দিও ।

শৈরমীর চোখের কোণ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল । জয়া একটি পিতলের ঘড়া দরিয়াবিবির সম্মুখে রাখিল । সে-ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যজনরত হইল ।

শৈরমীর চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হয়, বহু-কথন প্রয়াসী সে । কিন্তু চুপ করিয়া রহিয়াছে । শ্বাসনালীর শব্দ আরো দ্রুত হইতেছে । বসিয়া রহিল দরিয়াবিবি নির্মম পাথরের মত । দারিদ্র্যের হিংস্র রূপ তার কাছে অপরিচিত নয় । কিন্তু এত বিভীষিকাময় তার অষ্টহাস্য, দরিয়াবিবি আর কোনদিন শোনে নাই, শিহরিয়া উঠিতেছিল সে বারবার ।

চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল । ছেলে দু'টি নির্বোধ দর্শকের মত বসিয়াছিল । তাহাদের চোখের পাতায় ঘূম । দরিয়াবিবি আর বিলম্ব করিল না । জয়ার হাতে দুয়ানিটি গুঁজিয়া দিয়া বিদায় লইল । তবু একজন সম্বয়ী পাইয়াছে শৈরমী । মেয়েটি ভিটার নিচে আগাইয়া আসিল ।

কপাল মা । তবু ভিন পাড়া থেকে এসে দেখে গেলে । কেউ চোখও দেয় না । রাতটা কাটবে না । আর দেরী করব না । কফটা আবার এলো কিনা ।

দ্রুত চলিয়া গেল জয়া ।

ঘড়াটি মোনাদিরের বগলদাবা । আকাশে মেঘ জমিয়াছিল । চাঁদ আরো ঘনীভূত

অক্ষকারে হারাইয়া গিয়াছে। জর্ঠরের সন্তানের প্রতি যমতাবশতই বোধহয় দরিয়াবিবি
সন্তর্পণে পা ফেলিতেছিল, নচেৎ চল্ছ-শক্তি তার রাহিত হইয়াছে।

ঘন বাঁশবনে বাতাসের আর্তনাদ মাথা কুটিতেছিল। হঠাৎ শৈরমীর ভিটা হইতে
আকস্মিক রোদন নিনাদ শোনা গেল।

একবার থাম্, আমু।

দরিয়াবিবি ক্রমশঃ নিরস্ত হইয়া উৎকর্ণ হইল। জয়ার বুক ফাটা চীৎকার।

হ্যাঁ, চীৎকার।

আমু বলিল, ঘরে গেল গো পিসি।

দরিয়াবিবি দাঁড়াইয়া রহিল জড়পদার্থের মত। রক্তমাংসের নিচে মানুষে মানুষে সঙ্গীভূত
হওয়ার যে পরিপ্রাবী উৎসধারা যুগ যুগান্তের শিকড় উৎপাটন করিয়া নব নব সভ্যতার
বীজ ছড়াইয়া যায়— তারই সর্ব স্বীকারহীন চম্পল আর্তনাদ তরঙ্গের মত দরিয়াবিবির বুকে
আছড়াইয়া পড়িতেছিল। তারই আহ্বান ত এত নিশ্চীথ রাত্রে ঘর ছাড়া করিয়া আনিয়াছে
তার মত গর্ভবতী জননীকে।

দরিয়াবিবি শৈরমীর ভিটার দিকে মুখ ফিরাইল।

আমজাদ বলিল, কোথা যাও, মা। হিন্দুদের মড়া, হিন্দুদের ঘর, সেখানে গিয়ে তুমি
কী করবে?

উচ্ছিসিত কান্নায় বুক চাপিয়া পথের উপর বসিয়া পড়িল দরিয়াবিবি।

সকালে শৈরমীর মৃত্যু সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। দরিয়াবিবির কেমন মায়া বসিয়াছিল
বাগদী এই রমণীর উপর। সাংসারিকতার ভিত্তিতে সেদিন মন হাল্কা করিতে পারিল না
আজহার পদ্ধী।

মোনাদিরের জিদেই বিকালে আমিরনের বাড়ি গেল দরিয়াবিবি।

অবেলায় মুর্গী হাঁস লইয়া ব্যস্ত ছিল আমিরন। বহুদিন পরে দরিয়াবিবির আগমনে
সে উৎকুল হইয়া উঠিল। আমিয়া মোনাদিরকে দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

দুই পদ্ধী রমণী সংসারের খেদোঙ্গি জুড়িয়া দিল। মোনাদির-আমজাদ চুপ করিয়া
বসিয়া থাকার পাত্র নয়। আমিয়ার সঙ্গে প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া তাহারা সড়কের ধারে আসিয়া
দাঁড়াইল।

পদ্ধীর এই অংশে গাছপালা থাকিলেও ঘন জঙ্গল মনে হয় না। আমজাদের এইজন্য
এলাকাটা খুব পছন্দ। মার্বেল খেলিবার এমন সুপ্রশঞ্চ চতুর অন্যদিকে নাই।

দুই ভাই খেলা করিতে লাগিল। আমিয়া দর্শক মাত্র।

গাবুর ভেতর মার্বেল 'পিল' করিতে মোনাদির বলিল, আমিয়া, তুই মখ্তবে যাস?

মখ্তবে যাব না কেন? বুড়ো হোতে বসেছি, লেখাপড়া শিখব না?

বড় পাকা কথা। কথার চেয়ে ঝাঁঝ আরো বেশি। — আরে আমার দাদী সাহেব।
কৈ চল, কী পড়িস দেখব।

মোনাদির মার্বেল খেলা ছাড়িয়া দিল।

চলো। আমিয়া হাত ধরিয়া সেদিনের মতই তাহাকে টানিতে টানিতে অঙ্গনে প্রবেশ

করিল। সে পড়ার বই বাহির না করিয়া একটি ছড়ার বই বাহির করিল মোনাদিরের সম্মুখে। শিশু-পাঠ্য, সুন্দর প্রচলনপট, একটি পুস্তক। ছড়া ও ছবি-পূর্ণ। মোনাদির এমন পুস্তক পূর্বে দেখে নাই। বেশ মজা পাইতেছিল সে।

তুই, এই বই পড়তে পারিস?

ঠোঁট উচ্চাইয়া আশিয়া জবাব দিল, পারব না কেন?

একটি ছড়া মিহি কষ্টে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল।

বেশ ত। এই বই পেলি কোথায়?

মথ্তবে রহিম বক্ষ চৌধুরীর মেয়ে পড়ে। তারই কোন আঞ্চীয় পুস্তকটা উপহার পাঠাইয়াছে।

মন্তব্যে মোনাদিরও পশ্চাত্পদ নয়।

তুই বেশ কাজের বুড়ি। পাকা বুড়ি।

মুখ ভেংচাইয়া উঠিল আশিয়া : বুড়ি বলবার কে তুমি? মোটে সাত বছর বয়েস।

আমজাদ সশঙ্কে হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চলিল ছড়া পাঠ। অবেলার বাতাসে শিশু কষ্টের গুঞ্জন।

তুমি এসো আর একদিন, অন্য বই আনব।

আমজাদ মোনাদিরের কাছে নিষ্পত্ত হইয়া যায়। আগন্তক বালকের উপর তার হিংসা হয়, কিন্তু তা নির্বিত্তির একটা সহজ উপায়ও সে এই ক্ষয়েক মাসে আয়ত্ত করিয়াছে। মা'র উপর তার দরদ দ্রুমশ হ্রাস পাইতেছে। দর্শকের অত আমজাদ ছড়া পাঠের সভায় যোগ দিয়াছিল।

আশিরিন চাচী হাঁক দিল এই হতাঙ্গাড়ি, এই বই নিয়ে হল্লা কেন এত? কদিন বা তোকে মথ্তবে পাঠাতে পারব।

দরিয়াবিবি ধর্মক দিল : খামোঢ়া তুমি মেয়েকে ধরকাও। বেশ লক্ষ্মী মেয়ে। চালাক, পড়াশুনায় ঝোক আছে।

চালাক। পাঁচ বছর বাদ বুকে পাথর হয়ে বসবে ঐ মেয়ে। বেওয়া মায়ের আবার স্নেহ যত্ন শান্তি।

খোদার দিন খোদা চালায়। ভেবে ভেবে আমারও পাঁজরা ঝাঁঝরা হোয়ে গেল। ভাবি, দূর ছাই, আর চিন্তা করব না, তবু সব গোল পাকিয়ে আসে।

মোনাদির তখন একটি ছড়া আবৃত্তি করিতেছিল। শেষ হইলে আশিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, আর একটা পড়ো না মানু ভাই। তোমার মুখে বেশ মানায়।

প্রশংসায় মোনাদিরের বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। তবু ধর্মক দিয়া বলিল, হ্যাঁ, আর ফাজলেমি করতে হবে না। বদ্ধাইস।

মোনাদির আর একটি ছড়া আবৃত্তি করিল। জননীদের মধ্যে তখন দুঃখ দারিদ্র্যের কথোপকথন চলিতেছিল। আশিরিন চাচীর পাড়ার আঞ্চীয়রা মোটেই সদয় নয়। ভিটেমাটি ছাড়া হইলে, এই কয়েকটি গাছপালা ও পুকুর পুকুরিণীর উপর দৌরাত্ম করিতে পারিলে তারা সন্তুষ্ট হইবে।

দরিয়াবিবি অতীত আঞ্চীয়দের ব্যবহারের শৃঙ্খি বয়ান করিত লাগিল।

বহুদিন এইদিকে দরিয়াবিবি আসে নাই। বড় পরিচ্ছন্ন আমিরনবিবি। দীনতার ভিতর এমন সৌন্দর্যের ত্বক্ষা বাঁচিয়া রহিয়াছে। উঠান, ঘাটের পথ, দাওয়া বক্খকে; গৃহলক্ষ্মীর স্বর্গ রহিয়াছে মাচাঙ, সজী ও গাছপালার উপর।

সন্ধ্যা নামিতেছে। আর দেরী চলে না, ছড়ার আসরও ভাঙিতে হইল। মোনাদির এখানে পরিচিত মনের সকান পাইয়াছে। কয়েকদিন আগেকার অসোয়ান্তি ভুলিয়া গেল। আবিয়া ও আমিরন সড়ক পর্যন্ত আগাইয়া আসিল।

সড়কে আবার ভারী হইতে থাকে দরিয়াবিবির মন। এতক্ষণ বেশ ছিল সে। শৈরমী শাকের বোঝা মাথায় অবসন্ন সন্ধ্যায় সড়কে হাঁটিতেছে যেন, তারই সম্মুখে।

১৭

শকরগঞ্জ আলুর চাষে অনেক লোকসান গিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল হাসিমুখেই বলিল, খী সাহেব, আমাদের কপালটা পাথর চাপা।

আজহার নিরুন্তুর ছিল। সংসারে পোষ্য সংখ্যা বাড়িতেছে। আয়ের অঙ্ক যদি নড়চড় না হয়, বাঁচার আর কোন আস্থাদ থাকে না।

চিন্তায় আজহারের ঘূম হয় না ঠিকমত। তার মন্তিকের কলকজা এমনিই চালু নয়। মনের অঙ্ককাবে হামাগুড়ি দেওয়ার মধ্যেই সে শান্তিপ্রায়।

চন্দ্র কোটাল অলস নয়। রোজগারের পেষ্টা সে সহজে আবিক্ষার করে। আজহার অবাক হইয়া গেল। চন্দ্র কোটাল শান্তির চিবির পাশেই আর এক চালাঘর তুলিয়াছে। তার ভিতর একটি ভাণ্ডা হারমোনিয়াম, পুরাতন বেহালা, পরচুলা আর বাইজী সাজার পোশাক। চন্দ্র ভিতরে বসিয়া একজন যুবকের সঙ্গে কথাবাত্তা বলিতেছিল।

এ কি, চন্দ্র? আজহার জিজ্ঞাসা করিল।

এসো, মাদুরের উপরে বসো। সব বলছি। একটা ভাঁড়-নাচের দল করলাম আবার।

আজহার মাদুরের উপর বসিয়া তামাক ফুঁকিতে লাগিল।

ছ্যা ছ্যা। শেষে আবার বুড়ো বয়সে এইসব কাজে হাত দিলে!

জঠরের উপর হাত বুলাইয়া চন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

বুড়ো বয়স। কিন্তু এই জায়গাটা বুড়ো হোতে জানে না।

আজাহার বলিল, তোমাদের মহড়া চলছে?

চন্দ্র। খুব জোরে সোরে চলছে। এবার 'বস্ত্রহরণ পালা' করব।

আজহার। ওটা তুমি ভালই করতে। এত সাজগোজ। টাকা পেলে কোথা?

চন্দ্র পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের পিঠে হাত থাপ্ডাইয়া জবাব দিল, এই যে আমার রাজেন্দ্র ভায়া আছে। ও বহুত দিন শহরে ছিল। শহরের ছাঁটকাট এনেছে কিন্তু পয়সা আনতে পারে নি।

রাজেন্দ্র এই গ্রামের কৃষক পল্লীর সন্তান। সত্যই তার ছাঁটকাট শহরে। পরনে ধূতি, গায়ে হাফ শার্ট। চুল দশ-আনা ছ'আনা।

রাজেন্দ্র লজিত হইয়া বলিল, আর কেন ওসব চন্দ্রদা। এতেও যে পয়সা আসবে, মনে হয় না। তবে ফুর্তি করে দিনটা কাটানো যায়।

চন্দ্ৰ। দাও না ভাই একটা গান শুনিয়ে।

তৌৰা বলিয়া আজহার মুখ কাঁচুমাচু কৱিল। রাজেন্দ্ৰের গান-গাওয়াৰ তেমন উৎসাহ ছিল না, গুণগুণ কৱিতে লাগিল। চন্দ্ৰ একটু অপ্রস্তুত হইল বৈকি।

চন্দ্ৰ। দেখো খীঁ ভাই, এবাৰ যখন রাজেন্দ্ৰকে পেয়েছি, দল ঠিক চল্বে। ওৱ হাত গলা দুই সমান চলে। বেহালাৰ ছড়ি ধৰতে ওৱ জুড়ি নেই। যাত্রাৰ দল সব ‘ফেল’ মাৰবে। দেখো।

আজহারেৰ এই আবহাওয়া ভাল লাগে না। কয়েকটি পুৱাতন শাড়ি ঝুলিতেছিল আলনায়। জিজ্ঞাসা কৱিল, ওগুলো কী নাচেৰ সাজ?

জবাৰ দিল চন্দ্ৰ, হ্যাঁ। রাজেন্দ্ৰ এনেছে সঙ্গে কৱে। আজহার সহজেই সবকিছু গ্ৰহণ কৱিতে পাৱিল না। রাজেন্দ্ৰেৰ বদনাম অনেক। বাউৱী পাড়াৰ একটি বিবাহিতা যেয়ে লইয়া সে উধাও হইয়াছিল দেশ হইতে সাত বছৰ পূৰ্বে। বাউৱী মেয়েটিৰ স্বামী ও দেৱৰ গত বৎসৰ মারা গিয়াছে। নচেৎ রাজেন্দ্ৰ দেশে ফিরিতে সাহস কৱিত না। তাৰ প্ৰবাস জীবনেৰ কত কাহিনী গুজবেৰ আকাৱে পল্লীঘামে আসিয়া পৌছিয়াছে। বাউৱী মেয়েটি এখন নিষিদ্ধ পল্লীতে আশ্রিত। রাজেন্দ্ৰ তাৰ উপাৰ্জনে আশ্রিত। থিয়েটাৱেৰ এক বাইজী রাজেন্দ্ৰেৰ প্ৰেমে পড়িয়াছিল। তাৰ পঢ়াতে সে খোঘাৰ হইয়া বৰ্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কৱিয়াছে। বহু টাকাৰ মালিক রাজেন্দ্ৰ দাস, অধৰ দোসেৰ পুত্ৰ। হাতেম বৎস খীৱ সন্তানেৱা শহৰে তাৰ কল্যাণে ময়ুৰ উড়াইয়া বেড়াইতোছে কাৰ্তিকেৱ মত। গুজবেৰ শেষ নাই।

এইজন্য আজহার পৱিচয় পাইয়া বেড় বিগড়াইয়া গিয়াছিল মনে মনে। রাজেন্দ্ৰকে চেনা দায়। রংঠি ফৰ্মা। শহৰেৰ ছান্নায় আৱো জৌলুস খুলিয়াছে; সংলাপে কৃষক পল্লীৰ কোন খুঁৎ পড়ে না। যেন কতদিন সৈ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কৱিয়াছে।

এমন লোকেৰ সঙ্গে চন্দ্ৰ জন্যন্য ব্যবসা ফাঁদিতে গেল! কোটাল নেশা কৱে, সূতৰাং অচিরেই সে গোল্লায় যাইবে। মুখ ফুটিয়া আজহার কোন কথা বলিতে সাহস কৱিল না।

চন্দ্ৰ কোটালেৰ উৎসাহেৰ অন্ত নাই। সুদীৰ্ঘ গোঁফে সে ঘন ঘন তা দিতে লাগিল।

দেখো আজহার ভাই, এবাৰ ফসল যদি ভাল হয়, আমাদেৰ বায়নার অভাৱ হবে না।

ফসল আল্লাৰ মেহেৰবাণী। নিষ্ঠেজ কঠে জবাৰ দিল আজহার।

রাজেন্দ্ৰ হাৰমেনিয়াম টানিয়া রীড় টিপিতে লাগিল। পড়ত দুপুৰ। চন্দ্ৰ কোটাল মাদুৱেৰ উপৰ তাল দিতে ব্যস্ত। আজহারেৰ মুখে কোন কথা নাই।

আজহার ভাই— চন্দ্ৰ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া উঠিল।

আজহার কিছু বুঝিতে পাৱে না। নৃতন রোজগারেৰ পত্তা জুটিয়াছে। মৰীচিকাৰ স্বপ্নে চন্দ্ৰ কোটালেৰ মুখে আনন্দেৰ বন্যা আসিয়াছিল। নিষ্ঠিয় আজহারকে সে ডাক দিল, কিন্তু তাৰ মধ্যে বিজ্ঞপ্তিৰ ভাব প্ৰচন্দ। আজহার ইহাৰ বিন্দু-বিসৰ্গ উপলক্ষি কৱিতে পাৱিল না।

তোমাৰ সঙ্গে আমাৰ আৱো কথা আছে, চলো, আজহার ভাই। রাজেন্দ্ৰেৰ দিকে কোটাল দৃষ্টি বিনিময়েৰ সাহায্যে তাকে অপেক্ষা কৱিতে বলিল।

খীঁ সাহেব, তুমিও আমাদেৰ দলে ঢুকে পড়ো।

আজহার চন্দ্রের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিষ্কেপ করিল।

কোটালের দাওয়ায় বসিয়া আজহার আরো বিস্মিত হইল। শ্রী লাগিয়াছে তার ঘরে। বাঁশের নড়বড়ে খুঁটি বদলাইয়া একটি কাঠের খুঁটি লাগাইয়াছে সে। আলু চাষে নিচয় কোটাল তাকে ফাঁকি দিয়াছে। চন্দ্রমণির অসুখ সারিয়া গিয়াছে। সাদা পরিকার থান কাপড় পরনে। খানিক আগে পান খাইয়াছিল। রাঙা ঠোটে তাকে বেশ মানায়, দুই সন্তানের জননী বলিলে ভুল করা হইবে। আজহার কোটাল সম্বন্ধে কোন নীচতা মনে প্রশ্ন দিতে পারে না। ফাঁকি দেওয়ার লোক সে নয়। নৃতন দলের জন্য রাজেন্দ্র বোধহয় খরচ করিতেছে। তার সম্বন্ধে এত উজ্জব, তবে তিস্তিহিন নয়।

আজহারের অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় না কোথাও। কোটাল বলিল, আজহার ভাই, সত্যি, বুঝো বয়সে কোমর নাচান আর ভাল লাগে না। রাজেন্দ্র ছেঁড়াটা ধরে বসল। দেখি কপাল ছুকে—যা আছে ভাগ্যে।

চন্দ্র কোটাল পূর্বে ভাড়া-নাচের দলে কাজ করিত। দশ-বিশ মাইল দূরে গঞ্জে গঞ্জে তাহাদের ডাক পড়িত। এমন প্রবাস জীবনের সময় এলোকেশীকে সে এক মাহিষ্য বাড়িতে সঙ্গীরূপে পাইয়াছিল। এলোকেশী তার বিবাহিতা শ্রী নয়। রাজেন্দ্রের কীর্তিকলাপের খৌটা দিয়া চন্দ্রের নিকট আজহার কোন অভিযোগ করিতে সাহস করিল না।

স্তুমিত স্বর আজহারের : চেষ্টা করে দেখো। আমার সঙ্গে আর একটা চাষ বাস করো।

নিচয় নিচয়। জাত ব্যবসা আমি ছাড়ব না। ভেটা ত বাড়তি কাজ। বায়না পাব, কি না পাব কে জানে।

সংসারে আর ভাল লাগে না।

আমারও ওই দশা।

চন্দ্রমণি বেশ ফুটফুটে প্রজাপতির মত। স্বাস্থ্যের জৌলুসের সঙ্গে তাকে আরো সুন্দরী মনে হয়। ছেলে দুইটি উঠানে লাফালাফি করিতেছে। আজহার কল্পনায় এমনই সাংসারিক চিত্র অঁকিতে লাগিল। তার সংসারে কী স্বাচ্ছন্দ্যের এমন হাওয়া লাগিবে না?

তামাক নিঃশেষ করিয়া আজহার উঠিয়া পড়িল। বলিল, ভেবে দেখো, চন্দ্র র যদি পুঁজি পাও।

আচ্ছা, আচ্ছা।

কোটালের কষ্টস্বরে আনন্দের উচ্ছাস। হিংসা হয় আজহারের মুহূর্তের জন্য।

মাঠের নিঃসঙ্গ পথে উদাসীন্যের বোৰা আজহারের বুকে জগন্দলের মত চাপিয়া বসিতেছে যেন। হারমোনিয়ামের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। জুড়ি গান ধরিয়াছে রাজেন্দ্র ও চন্দ্র কোটাল।

১৮

আত্মরঘরে আর কোন দিন এত দীর্ঘকালব্যাপী দরিয়াবিবিকে পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। সূর্যাম স্বাস্থ্য তার। পাঁচ দিন পার হইলেই সে আবার সংসার গুছাইয়া লইত। আসেকজ্ঞান

এই কয়দিন তাকে সাহায্য করিত। বর্তমানে তার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত। অকেজো বুড়ি সংসারের কোন কাজে লাগিল না। আমিরন চাটীর শরণাপন্ন হইল আজহার খীঁ। সেও বিধবা মানুষ। সংসারের আগল পাগল লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু আমিরন-চাটী সহজে রাজি হইয়া গেল। তার সিদ্ধান্ত সত্ত্বর সংসার-শৃঙ্খলার ছবি আঁকিয়া লইল। গরু দুটি এই কয়েকদিন আর মাঠে ছাড়া হইবে না। গোয়ালে শুইয়া শুইয়া খড় খাক। মুরগি হাঁস আঘিয়ার তদারকে। নিশ্চিন্ত আমিরন চাটী।

দরিয়াবিবি কৃতজ্ঞতায় ভূবিয়া গেল।

আসেক্জানের ঘরটি বর্তমানে আঁতুরঘর। অঙ্ককার। দিনের আলো সেঁধোয় না। কোণে কোণে পুরাতন ঝুল জমিয়া রাখিয়াছে। অশ্঵াস্থ্যকর গন্ধে দম বক্ষ হইয়া আসে। ইহার ভিতর দরিয়াবিবি শুইয়াছিল। পাশে সদ্যোজাত শিশু মেয়েটি। অর্ধ পরিষ্কৃত ন্যাকড়ায় প্রস্তুত কাঁথার উপর যেন পদ্মফুল ফুটিয়া রাখিয়াছে। মা'র আদল নবজাতকের চোখে-মুখে।

দরিয়াবিবি শিশুর দিকে চাহিয়া বলিল, আমি বুবু, তোমার দয়ায় এ যাত্রা হয়ত বেঁচে যাব।

ছি ছি, বুবু। তোমাকে শক্ত মেয়ে মনে করতাম। তুমি এত কাতর হোয়ে পড়ছ?

আর কোন দিন এমন হয় নি। শরীর খুব ভাল ঠেকছে না।

দাওয়ায় আস্তানা পাতিয়াছিল আসেক্জান। তার কানে কথাটা সহজে প্রবেশ করে। সে খেদেক্ষি আরঞ্জ করিল: আমারও নসীব, বৌ। চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি। আগে তবু ফাই-ফরমাস এই অকালে শুনতে পারতাম।

দরিয়াবিবির জুর হইতেছিল অল্প অল্প। কুবিরাজ আসিয়াছিল একদিন। ডিস্ট্রিট বোর্ডের ডিস্পেসারি হইতে বর্তমানে শৈবধূ জোনা হয়। কুবিরাজের ঔষধে কিছুই ফল হইল না। কিন্তু ডিস্পেসারি প্রায় তিনি মাইল দূরে। আমজাদ ও মোনাদিরের মুখ রোদ্দের তাপে শুকাইয়া যায়। আজহার খীঁ জাহির কাজ ও টাকা ঝণের উপায় লইয়া ব্যস্ত। সংসার লঙ্ঘণও। সময় মত সকলের খাওয়া হয় না। নদীমার দুই চোখে এমন পিচুটি জমে যে, দুপুরের আগে সে চোখ খুলিতে পারে না। দাওয়ায় বসিয়া আসেক্জানের নিকট সে নাকি কান্না কান্দিতে থাকে। শুইয়া শুইয়া দরিয়াবিবি তিরস্কার করে। তখন মুহূর্তের জন্য সে থামে। আবার শুরু হয় ক্রম্বন।

আমিরন চাটীকে কোন দোষ দেওয়া চলে না। গৃহিণীপনায় সে কম নয়। পরের সংসার অনভ্যাসের ফলেই শুছাইতে এত বিলম্ব।

মোনাদির স্তন্ত্র হইয়া গিয়াছে। মা'র পাশে গিয়া আর বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। দরিয়াবিবির আহ্বানে সাড়া দিলেও, কোন উৎসাহ পায় না সে। এই আবহাওয়া সে যেন বরদান্ত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বোনটির দিকে চাহিয়া সে এক রকমের লজ্জা অনুভব করে। কোন সচেতন কারণ অবশ্য তার উপলক্ষ্মির বাহির। সৌন্দর্যের পুত্রলি। মোনাদিরের দুই চক্ষু কোন আনন্দের উপকরণ খুঁজিয়া পায় না। এইজন্য মোনাদির পাড়ার গাছ-গাছালির তলায় বেশিক্ষণ থাকিতে ভালবাসে। সঙ্গে আঘিয়া বা আমজাদ। অথচ মা'র ফাই-ফরমাসের জন্য এই সময় তাদের ঘরে থাকা উচিত।

খোলা টাটির ফাঁক দিয়া বাহিরের জগৎ যা দরিয়াবিবির চোখে পড়ে। কর্মনিষ্ঠ, চঞ্চল তার মনও স্থিতি পায় না এই অঙ্ককারে। শুইয়া শুইয়া খবরদারী গ্রহণে তার

কার্পণ্য নাই। মুনি খেয়েছে কিনা, আমু কোথা, নঙ্গমার চোখ কি রকম। হাজার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। জেলা বোর্ডের ডিস্পেসারির ডাক্তার বিছানায় শুইয়া থাকিতে আদেশ দিয়াছিল। প্রসূতি কতটুকু বা তা পালন করিতে পারে? উঠিতে হয় বৈকি দরিয়াবিবিকে। আমিরন চাচী এই জন্য বড় বিব্রত। প্রস্তাব পায়খানা ফেলিবার ভারটুকু সে অতি কষ্টে দরিয়াবিবির নিকট হইতে ধ্রহণ করিল।

তুমি ভাল হোয়ে নাও তারপর শোধ দিও।

শোধ! বলিয়া মুখ কৃপ্তিত করিল দরিয়াবিবি। নবজাতক হাত পা নাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে সে তাকে বুকের কাছে টুনিয়া লইল। পুরাতন সূত্রের আবার খেই চলে: শোধ এ-জন্মে নয়। আমার মোনাদিরটা বড় হোক।

চুপ করিয়া গেল দরিয়াবিবি। মাথার যন্ত্রণা হইতেছে।

আমিরন বিবি জিজ্ঞাসা করিল, একটু মাথা টিপে দিই?

না। তুমি রান্না সেরে ফেল।

হ্যাঁ, সেরে ফেলি। এক দৌড়ে বাঢ়ি যেতে হবে। ডাবায় পানি দিতে বলেছিলাম গরু দুটোকেও কী ছোট বাল্পিত করে পানি তুলেছে কিনা কে জানে। সারদিন শুকিয়ে মরবে।

তা যেয়ো। তুমি যা দিলে বোন, শোধ-শোধ আর ইহজন্মে কেউ করতে পারে না।

এত কাঙলাপনা কেন? অথচ দরিয়াবিবির প্রশাস্ত মনের সম্মুখে বাড়-ঝাঙ্গা কত তুচ্ছ। কাতুরে কিশোরীর মত দরিয়াবিবি।

কিছু ভেবো না। সব দুঃখ আল্লাই তরাবেন্দন-

আল্লা-আল্লা।

বিদ্রূপের জ্ঞানুটি খুলিয়া গেল দরিয়াবিবির মুখের উপর।

আল্লাই যদি সব করেন, তবে আমাদের এত দুঃখ দিয়ে কী পান তিনি? আমার ঈমান নেই, নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে বুবু।

ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই।

থাক আল্লা। রোগ হোলে ওয়ুধ খেলে ভাল হয়।

এই ভাল হওয়ার রাস্তাটা ত মানুষকে খুঁজে বের করতে হোয়েছে। ওটা ত আল্লা মগজে চুকিয়ে দেননি। তবে আর আল্লার কথা কেন মুখে। দুনিয়ার দুঃখকষ্ট রোগবালাই সবকিছুর পিতিকার আমাদেরই করতে হবে। আল্লা থাকে থাক, না থাকে না থাক। দু'তিন বছরে আমার ঈমান গেছে।

স্তুপ্তি আমিরন চাচী!

কি বলছো রোগের মৌকে! ওসব আমি বুঝি নে।

দরিয়াবিবি ক্লিষ্ট বেদনায় চোখ বন্ধ করিল। তার জগতের উপর কাল ছায়া নামিয়াছে।

আবার উল্লীলিত পক্ষ দৃষ্টি আমিরনের সর্বাঙ্গ কৃতজ্ঞতায় লেহন করিতে থাকে।

রাগ করো না, বুবু। তুমি নামাজ পড়ো। আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি। মন বসে না। খামাখা যাতে মন নেই, তা করে কোন লাভ নেই।

আমিরন চাচী দরিয়াবিবির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, এখন চুপ করো। তোমার মাথা ঠিক নেই।

হঁ!

পায়ের গাঁটে অসহ্য যন্ত্রণা, স্টোন পা লম্বা করিতে লাগিল দরিয়াবিবি।

ঘুমোও তুমি। আমি কাজ সেরে আসবো।

খোকাদের একটু ডেকে দাও।

আছা, বলিয়া আমিরিন বিবি রান্নাঘরের দিকে নিষ্কান্ত হইল।

খোকারা কেউ এই তল্লাটে ছিল না। হাসুবৌ মাঝে মাঝে খোঁজ-থবর লইয়া যায়। দরিয়াবিবির শারীরিক পরিচর্যা সে ফুরসৎ মত সম্পন্ন করে। বেশিক্ষণ বাহিরে থাকার যো নাই তার। শাঙ্গড়ী এই নির্বাধ রূপ বধূটিকে চোখে চোখে রাখিতে চায়। জীন-ভূতের পান্নায় সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে তার। সংসারে বংশধর না আসিলে পুত্র আর ঘরমুখো হইবে না। বধূর উপর খর মেজাজ ফলাইলেও সাকেরের মা আসলে করুণা-পরবশ। ছেলেগুলিকে কয়েকদিন নিজের কাছে রাখিতে চাহিয়াছিল হাসুবৌ। দরিয়াবিবি রাজি হয় নাই। তাহাদের সংসারও খুব সচল নয়। আঞ্চলিক দৌরাত্ম্যে মনের সাধারণ মিলটুকু পাছে হারাইতে হয়, দরিয়াবিবি সে আশংকা করিয়াছিল। কিন্তু তার পুত্রবধূ গাছ-গাছালির উৎসস্নে আদর না পাইলে হাসুবৌর কাছেই ছুটিয়া যায়, সেখানে আহারাদি করে না। মোনাদির মা'র কড়া হৃকুম পালন করিত। হাজার সাধাসাধির পরও সে হাসুবৌর বাড়িতে কোন খাবার হাতে লইত না।

কাঁচা দুপুরে তারই অভিনয় চলিতেছিল। হাসুবৌর জাতে কয়েকটি সন্দেশ। তঙ্গপোশে আমজাদ, আম্বিয়া ও মোনাদির।

হাসুবৌ। লক্ষ্মী ছেলেদের মত খেয়ে যেতো। 'হাম্ হাম্' শব্দ করিল হাসুবৌ।

না, আমি খাব না। মা বকবে।

মা দেখতে আসছে নাকি?

এরা বলে দেবে।

ওরাও যে খাবে।

মোনাদিরের আর কোন ভয় নাই। হাত পাতিয়া সে সন্দেশ গ্রহণ করিল। তারপর যৌথ 'হাম্-হামে'র পালা। হাসুবৌ হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

সাকেরের মা ঘরে ঢুকিয়া একচোট হাসিয়া লইল।

বৌমা রান্নাবান্না দেখো। অভাগীর বেটী কপাল এনেছিস্ কী, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করবি।

হাসুবৌ পাথর হইয়া যায়। আমজাদ ইত্যাদিরা সন্দেশে কামড় দিয়া বসিয়া থাকে, আর মুখ নড়ে না।

আপন মনেই বকিতে লাগিল বুড়ি: যত-সব অভাগীর কপাল। একটা ছেলের হা-পিতেশ্য মিট্টল না। সাকেরটা গেছে কোথা লাঠি নিয়ে! কোন্দিন কী কপালে আছে আল্লা জানে।

বাহির হইয়া গেল বুড়ি। বুড়ি ত নয়, আপদ! ঘরে আবার হাসির হৱৱা।

মোনাদির একটি গঞ্জের বই পড়া শুরু করিল। সকলে মন দিয়া শোনে। হাসুবৌ মোনাদিরের নিকটে। তার চাল-চলন, পঠন-ভঙ্গী বড় সুন্দর দেখায়।

অনেকক্ষণ কাটিয়া পেল। মোনাদির পজ্জ শেষ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। দুপুর
চলিয়া পড়িতেছে। না, আমাৰ কসা ঘায় না। কৃত্ত্বা লাগিয়াছে তাৰ।

আমিয়াকে সে বলিল, তলা না, বাঢ়ি ঘাবি না?

চলো না, শুনি তাই।

হাসুবো বিৱৰিতপূৰ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিয়া বলিল, আমি, তুই যেতে চাস, ঘা। আবাৰ
অকে কেন্দ্ৰ টাৰাটানি!

আমি ওৱ সকে ঘাৰ। কাঁচমাচু খাইয়া আমিয়া জৰাব দিল।
না, আমিও ঘাৰ।

মোনাদিৰ তত্ত্বগোপ হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। হাসুবো আক্রোশ বিকল দেবিয়া অনুকূল
কঠে বলিল, মুনি, দৱিয়াবুবুকে দেখে আসব।

তবে চলো।

বুৰ উত্তুল্ল নষ্ট মোনাদিৰ। স্বাভাৱিক শালীনতা যেন সে এই বয়সে আহুত কৱিয়াছে।
হাসুবো জৰাব দিল: আমি তোমাকে হেঁটে যেতে জিছিলে, আমাৰ কোলে চড়া দেখি, সোনা।
বাবা দিল মোনাদিৰ: আমি কি ঝোঁড়া, না আমাৰ পায়ে মেঘদী দিয়েছি?

কোল বাধা হাসুবো স্থীকাৰ কৱিল না। মোনাদিৰকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

আমজান 'ফুট' কাটিল: খেড়ে হেলে কোলে উঠেছে।

শাসাইয়া জৰাব দিল হাসুবো, তোৱ কী রে! দুক্কি-এগাৰ বছৰ বয়সে যদি খেড়ে,
তুই কী?

মোনাদিৰ কোলে চড়িয়াছিল, কিন্তু আয়াম নাই তাৰ বুকে। পাড়াৰ লোকে হাসিবে
বৈকি!

গৰম উদ্দেশ্যে পা বাঢ়াইয়া হাসুবো মোনাদিৰকে বলিল, লক্ষ্মী, আমাৰ গলাটা জড়িয়ে
থোৱো, না হলে আছাড় বেঞ্চে পড়ে থাবে।

যতে আদৌ মন টেকে না মোনাদিৰেৰ। হাসুবো দৱিয়াবিবিৰ যাবা তিপিয়া দিতেছিল।
মোনাদিৰ কঠেক মিলিট মা'ৰ সকে বাক্যালাপ কৱিয়া উঠিয়া পেল। আমিৰিন চাচী সকলেৰ
ঘাৰৰ দিতেছিল। আজহাৰেৰ ভাত রান্নায়েৰ চাপা থাকে। যাঁটোৱ কাজ ছাড়া চন্দ্ৰ কোটালেৰ
সকে সে কোথায় কী কৱিতেছে তাৰ কেউ হণ্ডিস জানে না।

বাওয়া শেষ হওৱাৰ পৰি মোনাদিৰ একতিৰাব মা'ৰ ঘৱে উকি দিয়া পাঢ়াৰ উধাও
হইয়া পেল। আমিয়া দুপুৰকেলো ঘৱে পিয়াছে, সেদিকেই বেলা ভাল জমিবে।

হাসুবো ডাক দিয়া কেন্দ্ৰ সাড়া পাইল না। দৱিয়াবিবি বিষ্ণু মুখে বলিল, আমি
বিছুবাজু পড়া-অৰ্দি ওৱ যে কী হয়েছে।

হাসুবো জৰাব দিল, এই কদিন আমাৰ কাছে না হয় থাকত। তুমি আবাৰ বাজি হও না।

না বৌ, সে হয় না। একে অনেক কঠে ও ফিরে এসেছে। আমাৰ চোখে চোখে থাক।
বুৰ ত তোমাৰ চোখে চোখে আছে!

হাসুবো বালিক পত্ৰে চলিয়া পেল।

সেদিন সকায়া কিন্তু এলোহেলো সাম্মারিক জটাজাল কুঙ্গলী পাকাইয়া পেল।

তর সন্ধ্যা। তবু একটি ছেলে ঘরে ফেরে নাই। আসেক্জান আজকাল রাত্রি কাটাইবার সুযোগ অন্য কোথাও পাইলে এখানে থাকে না। কী বা সাহায্যে লাগে সে। নঙ্গমা দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে জানে শুধু। সন্ধার পর সে-ও ভাল দেখিতে পায় না। হাসপাতালের ডাক্তার চোখ দেখিয়া পথের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। অত পয়সা খা-পরিবারে কারো নাই যে, আহার্য রোগের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইবে। আমিরন চাচী মুরগি-হাঁস তুলিতে কিছুক্ষণের জন্য বাঢ়ি গিয়াছে।

দরিয়াবিবি করুণ স্বরে ডাকিতেছিল, একটু পানি দিয়ে যা—। কষ্টস্বর তার রোগে-শোকে ক্ষীণ। অনেকক্ষণ কারো জবাব না পাইয়া সে প্রাণপণে একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, তোরা কী মরে গেছিস সব?

নঙ্গমা জবাব দিয়াছিল। অক্ষমের আর কোন চারা নাই। এই সময় আজহার খা ফিরিয়া আসিল। তখনও তার কাঁধে লাঞ্জল। দরিয়াবিবির আর্তনাদ শুনিয়া আজহার আর গোয়ালঘরে লাঞ্জল রাখিতেও যায় নাই।

কি হলো, দরিয়াবৌ?

একটু পানি।

উঠানেই লাঞ্জল রাখিয়া কলস হইতে পানি গড়াইল আজহার। দরিয়াবিবি নিচিস্তে পান সমাধা করিয়া গ্লাস স্বামীর হাতে দিয়াছে, দেৰা গেল উঠানের উপর আমজাদ একটি কঞ্চি হাতে অঘসর হইতেছে, পচাতে মোনাদির।

গ্লাস মাটিতে নামাইয়া আজহার খা তীরবেগে ছুটিয়া আসিল, কোথায় ছিল হারামজাদা? দাঁড়া—বলিয়া সে আমজাদের কান ধরিয়া চপ্পেটাঘাত ও পরে আছাড় দিয়া উঠানে ফেলিয়া দিল। ইহার পর শুরু হইল মোনাদিরের উপর ঐ প্রচণ্ড শাস্তি। হাতের কঞ্চি লইয়া আজহার খা দুইজনকে একই সঙ্গে প্রহার শুরু করিল: যত সব পর-খেগো হারামীর বাচ্চা। খেয়ে টইটই ঘুরে বেড়াবে। শুয়োরের বাচ্চা, মরো নি তোমরা—।

নঙ্গমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। তার পরিবেশে কী ঘটিতেছে সে না দেখিলেও নির্মভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। তারই ফলে ক্রন্দন ও চীৎকার।

আজহার খা ছুটিয়া আসিয়া তাকেও দুঁঘা চাৰ্কাইল।

উঠানে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গিয়াছে। নিরীহ আজহার খা, সে হঠাৎ এমন পাষণ্ড হইতে পারে, কল্পনার বাহিরে।

দরিয়াবিবি বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। সেও চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে: দাঁড়াও, তোর মরদের শুষ্টিতুষ্টি করেছে। এত বড় বুকের পাটা, আমার ছেলেদের গায়ে হাত—।

ছুটিয়া আসিল দরিয়াবিবি উঠানের উপর। দাওয়ার উপর হইতে পীড়িত শরীরে কিরূপে অবতরণ করিল, সেই মুহূর্তেই তার জবাব দিতে পারে।

আজহার রণে ভঙ্গ দিয়া লাঞ্জল কাঁধে দহলিজের দিকে চলিয়া গেল।

উঠানের উপর ধূলি-লুপ্তি অবস্থায় মোনাদির ও আমজাদ। কয়েক জায়গা ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে শরীর হইতে।

দরিয়াবিবি আগাইয়া আসিবার পূর্বে স-চীৎকার মূর্ছিত হইয়া পড়িল মাটির উপর।

একটু পরে আসিল লষ্টন-হাতে সাকের, হাসুবৌ ও তার শাশুড়ী।

আমিরন চাচীর সেবার অপূর্ব দক্ষতায় এই যাত্রা সত্যই বাঁচিয়া গেল দরিয়াবিবি। গরীবের সৎসারে বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথে শুধু মনের জোরেই নিজকে চাঙ্গা করিয়া তুলিল খা-পত্তী। এই তিন সঙ্গাহে সে আরো একটি দোসর পাইয়াছে জীবনে—আমিরন ও আমিয়া। রোগ-শয্যায় শৈরমীর দীন-মৃত্যুছবি দরিয়াবিবির মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। হয়ত তেমন মৃত্যু হইবে তার। আমিরন চাচী ধীরে ধীরে তার মানসিক স্বাস্থ্যও ফিরাইয়া আনিয়াছে। নৃতন কঢ়ি মেয়েটির দিকে চাহিয়া দরিয়াবিবি ক্ষুক মনে মনে। এই রূপরাশি দরিদ্রের কুটিরে তামা হইয়া যাইবে। আমজাদ ও মোনাদিরকে লক্ষ্য করিয়া দরিয়াবিবি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

এই কয়েকদিনে পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত দরিয়াবিবি। মোনাদির তাকে দাগা দিয়া গিয়াছে। তার কোন খোঁজ নাই। মার খাইয়া সে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। পরদিন ভোরবেলা হইতে সে নিরন্দেশ। সাকের দরিয়াবিবির আগেকার বাড়িতে সন্ধান লইয়াছিল। মোনাদির সেখানে যায় নাই।

কান্নাকাটির কসুর করিল না দরিয়াবিবি। আজহারের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দৈনন্দিনতার চাকায় মিশিয়া গিয়াছিল দরিয়াবিবি। স্ত্রীর সমস্ত কর্তব্য সে সম্পন্ন করে। কিন্তু নির্বাক। তার নির্মম মুখের দিকে চাহিয়া আজহার কথা বলিতে সাহস করে না। সৎসারে দুই জন জীব একসঙ্গে বসবাস করিতেছে মাত্র। পশ্চর মত একে অপরের ভাষা বোঝে না, সেইজন বাক্যালাপেরও জ্ঞেন প্রয়োজন নাই।

চন্দ্ৰ কোটাল ভাঁড়-নাচ লইয়া খুব শৰীজয়াছিল। কয়েকটি মণ্ডে ইতিমধ্যে সে আসৱ জমাইয়া আসিয়াছে। দরিয়াবিবির অসুখের সময় এলোকেশী চন্দ্ৰমণি কয়েকদিন আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিল। মোনাদির আজহারের তিরক্ষারে এই ঘর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাও জানিত চন্দ্ৰ কোটাল। কিন্তু তা লইয়া আমী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃশব্দের পাহাড় মাথা তুলিয়াছে, এই সংবাদ তার জানা ছিল না।

আজহার একদিন সমস্ত বৃত্তান্ত কোটালকে বলিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

তোমারও রাগ আছে তা হলে?

হাসিতে লাগিল চন্দ্ৰ। মেনি বিড়ালেরা মাঝে মাঝে রঁই মাছের মুড়া গিলিয়া ফেলে। আজহার রাগিতে পারে, আশ্চর্যের বিষয় নয়।

হঠাৎ, অমন মারা উঠিছ হয়নি।

ভাবীর পায়ে ধরেছো?

গোপে তা দিতে লাগিল চন্দ্ৰ।

তৌবা। তুমি একবার গিয়ে বলো, এমন করে সৎসার চলে?

চলুক। বেশ ত, দশ বছৰ কথা বলেছ, এখন কথা না বললে চলবে না?

দূৰ পাগল।

এইবাবৰ ভাল ফসল হইয়াছিল । আজহার খুব সংসার-বিত্রন নয় । কল্পনায় ছবি আঁকিতে
মে-ও তালবাসে ।

চন্দ্ৰ কোটাল সেইদিন দৱিয়াবিবিৰে হাস্য-কৌতুকে ব্যতিৰেক কৱিয়া তুলিল ।

ভাৰী, আমাৰ ভাঁড়-নাচ তোমাকে দেখাতে পাৰলায় না । যা ধৰ্মৰ কভুকভি তোমাদেৱ ।

একদিন দেখে আসৰ তোমাৰ বড়ি শিয়ে । টাটিৰ আভাল হইতে দৱিয়াবিবি জৰাব
দিল ।

আমাৰ সঙ্গে কথা বলছ । আৱ খাঁড়েৰ সঙ্গে কেন কথা নেই?

চুপ কৱিয়া গেল দৱিয়াবিবি । একটু পত্ৰ আসিল উভৰ, আমাৰ ছেলেকে যদি কেউ
তাড়িয়ে দেয়—

সেটা নিষ্ঠাৰ অপৰাধ । আমি যদি যুনি ঝুঁড়োকে এনে দিই ।

আপে এনে ঘাও ।

নিষ্ঠাৰ এনে দেৱ । নিষ্ঠাৰ ।

আমজনসকে যাৱল, আমি আপ কৱিলি । কিন্তু একটা হতভাস্য এখানে ঠাই নিয়োছিল,
তাৰ উপৰ হাত চলালৈ । আমাৰ দিকে একবাৰ দেখলে না ।

সেটা ভাৰী অন্যায় কৰেছে ।

চন্দ্ৰ কোটালেৰ বাবু সমাজ হওয়াৰ আসে দৱিয়াবিবি বলিতে গাপিল, বড় দুঃখী
আমাৰ যুনি, তাৰ পায়ে হাত দিলে—হাঁট কৌন্দন্তু দেলিল দৱিয়াবিবি । চন্দ্ৰ কোটাল তা
উপলক্ষি কৰিতে পাৰে । হাস্যগ্ৰহণ তাৰ হত শাস্ত্ৰাচৰ্চি আৱ কথা বলিতে সাহস কৱিল না ।
দহলিজে কৱিয়া আজহার বাঁকে মেঘুৰ ধৰক দিল ।

সত্যি বী ভাই, ভাৰী অন্যায় কৰেছো । বোৰা না ছেলেৰ যায়া?

আজহার শুভুক হুঁকিতেছিল । বিলদেৱ যত নিষ্ঠেজ দুই চন্দ্ৰ কুঁজিয়া সে জৰাব দিল, হঁ ।

চন্দ্ৰ কোটাল আজ হৱিয়া পিণ্ডাছে । সে চুপ কৱিয়া রহিল ।

বৌজ কৰে দেয়ো না, চন্দ্ৰ ।

আমি লোক লাপাছি । আমাৰ বায়না আছে শ্যামলজ্জে । দেৱা যাক ।

চন্দ্ৰ কোটাল আজ বিশেষ ভণিতা না কৱিয়া উঠিয়া পড়িল ।

আজহার শুভুক হুঁকিয়া যায় । নিষ্ঠুৰ হইয়া উঠিতেছে সে সৰ বিষয়ে ।

বিষে দুই জমিৰ ভাল ফসল পাইয়াছিল । এই বছৰ সংসাৱে যাস তিন টানাটানি
চলিতে পাৰে । টাকা পাইয়া আজহার দৱিয়াবিবিৰ জন্ম একটি তাঁতেৰ শাদা শাঢ়ি কিনিয়া
আলিল । কথাৰাৰ্ত্তা নাই দম্পত্তিৰ তেতৰ । ততপোশে শাঢ়ি কৱিয়া দৱিয়াবিবিৰ উহেন্দো
মে কত্ৰেকটি কথা বলিয়াছিল যাত্র ।

কহেকদিন পৱে আৱো ফসল আসিল ঘৱে । আজহার দেখিল তাৰ দেওয়া কাপড়
পৱিয়া রহিয়াছে আসেক্জাল । চাহিয়া রহিল সেই দিকে ক্ষিয়ৎক্ষণ । নিৰীহ মানুষটিৰ
বুকেও শত প্ৰশ্ৰেৰ কলোল উঠিয়াছে ।

সেইদিন বৈকালে আজহার বী সুতা-কলিক সুৰ্মি হাতে তিন পাঁতেৰ পথ ধৰিল ।

পৱদিন আমজনস একবাৰ পিতাৰ প্ৰসূক তুলিয়াছিল । তাহাকে ধৰকে সৰ্জ কৱিয়া
দিল দৱিয়াবিবি ।

আলু-পেঁয়াজের গন্ত করিতে ইয়াকুব গঞ্জে আসিয়াছিল। সেদিন ভাল বেপারী জোটে নাই। বেশি মাল কেনা হইল না। পাঁচ ক্রোশ বাড়ি ফিরিয়া আবার গঞ্জে আসা মহা হাঙ্গামা। আজহারের বাড়ি নিকটে, পুরাতন আঙ্গীয়তা ঝালাই করা হবে তবু। তাই ভাবিয়া সে বহু বছর পরে গরীব মামাতো ভাইয়ের অঙ্গনে পা বাঢ়াইয়াছিল।

দরিয়াবিবি ইয়াকুবকে সহজে চিনিতে পারে নাই। কয়েক বছরে তাহার চেহারা বেশ বদলাইয়া গিয়াছে।

আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমার সেই দেবর— যে বড় বেশি বিরক্ত করত। এসো, এসো।

দরিয়াবিবির সন্তানগে স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

ভাবী, গঞ্জে এসে মুশকিলে পড়েছিলাম। মাল কেনা হয়নি।

তাই বুৰি গৰীবের কুঁড়েঘরে হাতি—

ইয়াকুব কথা লুকিয়া লইল, হাতি নয়, বরং চামচিকে বলুন, তা-ও সহ্য হবে।

বহুদিন আগে ইয়াকুব এই বাড়ি আসিয়াছিল। তবে বেশভূষার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে লঘা-কোঁচা ধূতি পরিয়াছিল। নাকের সোজাসুজি টেরি, চুলগুলি চেউ খেলানো, পায়ে কালো পাম-সু, গায়ে বুলা-পাঞ্জাবী। পানের দাগ দেখিতের গোড়ায়। হাসির ভিতর বাঁকা মনের পরিচয় ফুটিয়া উঠে।

ইয়াকুব সম্পর্কে আজহারের ফুপাতোভাই। জোত-জমি আছে শ'বিঘা। তার ধান,— তা ছাড়া মওসুমে আলু, পটল, পেঁয়াজ-শাট ইত্যাদি লইয়া সে ব্যবসা করে। গত কয়েক বছরে সে বেশ পয়সা রোজগার কৰিয়াছে, এ সংবাদ দরিয়াবিবি জানিত। তার আরো প্রমাণ, বর্তমানে তার সংসারে দুই স্ত্রী বর্তমান। কয়েক মাস আগে আর একটি বিবাহের যোগাড় করিয়াছিল। প্রতিবেশী ও দ্বিতীয় স্ত্রীর আঙ্গীয়দের জুলুমে ইয়াকুব সে সদিচ্ছা পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল।

আজহার ভাই কোথা? একটি মাদুরের উপর বসিয়া ইয়াকুব জিজ্ঞাসা করিল।

দরিয়াবিবি আগে এক গ্লাস পানি দিয়াছিল। এখন ইয়াকুবের জন্য পান সাজিতেছিল। সে পান-ই সাজিতে লাগিল, কোন জবাব দিল না।

ইয়াকুব আবার প্রশ্ন করিল, ভাই কোথা?

আমি কী জানি? আজ পনের দিন বেরিয়েছে। একটা খবর পজ্জন্ত দেয়নি।

আচ্ছা মজার লোক। খালি দোকান-দোকান আর ব্যবসার ঘোঁক। ওসব ভাল মানুষ দিয়ে ব্যবসা হয় না।

ইয়াকুবের হাতে পানের খিলি দিয়া দরিয়াবিবি জবাব দিল, কে বোঝাবে বলো। মাঝে মাঝে খেয়াল চাপে।

আজহার ভাই ওই রকম। কত জায়গায় কত রকমের ব্যবসা ফেঁদেছে। শেষ পর্যন্ত

টিকে থাকতে পারে না । সেটা ওর মহাদোষ ।

অবেলো । দিনের আলো ক্রমশঃ নিভিয়া আসিতেছিল । ইয়াকুব হাসির ঢেউ তুলিয়া পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিল ।

ভাবী, কিছু মনে করবেন না । আমি রাত্রে খিচড়ি খাব । ঘি আর ভাল চাল কিনে আনাও । মুরগি পাড়ায় পাওয়া যায়?

পাড়ায় পাওয়া যায় না, তবে আমার ঘরে আছে ।

বহুত আচ্ছা ।

দরিয়াবিবি নোট গ্রহণ করতে রাজি হইল না । এমন মেহমান না আসাই ভাল । অপমানিত হওয়ার ক্ষিটো তার বুকে গিয়া বিধিল । ইয়াকুব নাছোড়বান্দা । আমজাদ ও নঙ্গী পাশে দাঁড়াইয়া পিতার ফুপাতো ভাইয়ের কাও দেখিতেছিল ।

ইয়াকুব দুই জনের হাতে দুটি পাঁচ টাকার নোট উঁজিয়া দিল ।

খোকা-খুকী, তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো ।

দরিয়াবিবি আরো প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু ইয়াকুব কর্ণপাত করিল না ।

এমন ব্যাপার করলে আমার বাড়ি এসো না, ভাই । আমরা গরীব ।

অভিমান-স্কুল ইয়াকুব কহিল, আমার ভাইপো ভাইয়িয়া আমার পর? বেশ, তুমি যা খুশি বলো । আজহার ভাই আসুক না ।

আবার আগ খুলিয়া হাসিতে লাগিল ইয়াকুব, সে ঘেম কত রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছে ।

দরিয়াবিবিকে অগত্যা উঠিতে হইল । খাতির্দারীর সরঙ্গাম অল্প নয় ।

আমজাদ নিজের নোটটি স্বত্তে ভাঁজ কুরিয়া মা'র হাতে দিল । তার ফুরসৎ নাই । ঘিরের জন্য কৈবর্তপাড়ায় যাইতে হইবে এবং এমন মজুরী পাইলে সে কাজে অবহেলা করিতে রাজি নয় । একটি বোতল হাতে সে চালিয়া গেল ।

মুরগি জবাই করা হইল তখনই দরিয়াবিবি একটি বড় মোরগ ছিল, সেটি এখনও বাড়ি ফেরে নাই । কত দেরী হইবে কে জানে । বকাড়ির মুরগি নষ্ট করিলে আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায় । ডিম আর বাচ্চা রোগীর জন্য অনেকে দুর্য করে ।

রান্নাঘরে দরিয়াবিবি খুব ব্যস্ত । ছোট খুকীটা ভয়ানক কান্না জুড়িয়াছিল ।

ইয়াকুব অভয় দিল, ভাবী, রান্না করো । আমি খুকীকে কোলে নিই ।

খুকীর কান্না থামিয়া গেল । তাকে কোলে লইয়াই ইয়াকুব রান্নাঘরে প্রবেশ করিল । দরিয়াবিবি বসন সংযত করিতে সময় পায় না ।

অপ্রস্তুত হইয়া ইয়াকুব বাহিরে ফিরিয়া বলিল, ভাবী, তোমার খুকীটা বেশ ।

হ্যা, ভাই । বেশ সুন্দর হয়েছে মেয়ে ।

ইয়াকুব আবার খুকীকে দোলাইতে দোলাইতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল ।

হাসিয়া সে বলিল, তা হবে না, মা কেমন?

লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া ওঠে দরিয়াবিবির মুখ । গোস্তের হাঁড়িতে মশলা দিতেছিল সে । ধনে-ভাজা নাই । একটি 'তাওয়া' চড়াইয়া দিল দরিয়াবিবি । ইয়াকুবের উপর্যুক্তি একটু অসোয়াস্তিকর ।

দরিয়াবিবি ডাকিল, ইয়াকুব ভাই ।

জী ।

বাইরে যাও না । তুমি কী রান্না শিখবে?

কে শেখায়, ভাবী ।

থাক, আর শিখে কাজ নেই । দুই বাঁদীর ঘর—তার রান্না শিখতে হয় না ।

হয় বৈকি ।

তুমি খুকীকে বাতাসে নিয়ে যাও । যা ধোয়া এখানে ।

দরিয়াবিবি নিজ মনে রান্না করিতে লাগিল ।

ইয়াকুবের কথা শেষ হয় না । সে আবার আসিল খুকীকে কোলে করিয়া ।

ভাবী, আজহার ভাই পনের দিন গেছে, খবর দেয় নি?

না ।

তুমি বলে তার সংসার করো । এমন লোক খবর দেবে না তা বলে ।

আমরা ত তার কেউ নই ।

দরিয়াবিবি চুলায় ফুঁক দিতেছিল বাঁশের চোঙার সাহায্যে । ধোয়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল সারা রান্নাশাল ।

আহা । এমন সুন্দর খুকী, তার মায়া তাকে বেঁধে রাখতে পারে না ।

বড় বিরক্তি বোধ করিতেছিল দরিয়াবিবি ।

টাকার মায়া সবচেয়ে বড় । আবার কোথাও কিছু ফেঁদে বসেছে, লাখ টাকা কামাবে । সেবার চদ্র কোটাল ওর খৌজ পেয়ে তবে ফিরিয়ে আনে ।

দেখা যাক, আমিও চেষ্টা করব ।

অত দয়ার কাজ নেই । নেই আসুকুসে ।

ইয়াকুব দরিয়াবিবির চোখের দিকে চাহিল, জলে ভরিয়া উঠিয়াছে । হয়ত ধোয়ায়, হয়ত সাংসারিক তাড়নার আঘাতে ইয়াকুব তা উপলক্ষ্মির চেষ্টা করিল ।

দরিয়াবিবি কোন সহানুভূতি চায় না । ইয়াকুব উঠিয়া গেলে সে সন্তুষ্ট হয় । আড়চোখে তার দিকে দরিয়াবিবি ধূমায়িত চুলায় আরো ধোয়া করিতে লাগিল, তারপর বলিল, উঠে যাও না, ভাই । খুকিদের বড় চোখের দোষ হয় ধোয়া লেগে ।

ইয়াকুব অনিচ্ছা সন্ত্রে উঠিয়া গেল ।

গেরস্থালির কাজ, মেহমানের জন্য বিশেষ রান্না । বছ দেরী হইয়া গেল । দু'টি মাত্র ঘর, ইয়াকুবের শোয়ার জায়গা আর এক সমস্যা । আজ আমজাদকে দাওয়ায় শুইতে হইল ।

গঞ্জের কাজ সারিয়া আরো তিন দিন ইয়াকুব এইখানে রহিয়া গেল । আজহারের তল্লাসী করিতেছে সে । কৃতজ্ঞতায় গলিয়া দরিয়াবিবি, খাতিরদারীর দ্রষ্টি না হয়, সেদিক বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিল । দুহাতে খরচ করিতেছিল ইয়াকুব । সন্দেশের স্বাদ এই বাড়ির ছেলেরা মৌলুদ শরীফ বা পাড়ার কোন বিশেষ উপলক্ষে চাখিতে পায় । ইয়াকুব নানা রকমের মিষ্টি কিনিয়া আনিয়াছিল । ময়দা, ঘি, পরটা, আরো চর্বি-চুম্বের ব্যবস্থা সে বীতিমত করিতেছিল ।

বাড়িতে ধূম লাগিয়াছে উৎসবের । আসেক্জানকে পর্যন্ত ইয়াকুব বাহির হইতে দেয় নাই । সেও অতিথি এই বাড়ির ।

দরিয়াবিবি চক্রুলজ্জার জন্য কোন কথা ইয়াকুবকে বলে নাই। নচেৎ সে-ও এই
মহসিনীপনা শুব ভাল চোখে দেখিতেছিল না।

আরো দুই দিন থাকিয়া বিদায় লইল ইয়াকুব। আমজাদ অনেক দূর তার সঙ্গে
আসিল।

২১

হাসুবৌ আমজাদকে দুপুরবেলা ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ি যায় নাই সে। পাড়ার এক
টেরে গাছের ছায়ায় একটি গুঁড়ির উপর দুই জনে বসিল।

কেন ডেকে আনলে, আমজাদ জিজাসা করিল।

লক্ষ্মী ছেলে, বসো না—সন্দেশ কিনে দেব।

না, জল্দি বলো।

হাসুবৌ ইত্ততঃ করিতেছিল।

মুনি, আর আসবে না?

আমি কি জানি। মা কত কাঁদে। আবার সঙ্গে কথা বলে না।

হাসুবৌ বলিল, তোর আকৰা চলে গেল। মুনি ছেলেটা তারী বদ। আমজাদ সায় দিল
না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখচোরা ভাব কাটিয়া যাইত্তেছে।

বদ! তুমি ভারী ভালো?

হাসুবৌ আমজাদকে আদর করিতে লাগিল। না, সে বেশ ভাল। আমজাদ একটু দূরে
সরিয়া গিয়া ব্যক্তি করিল, আমাকে আদুর করতে হবে না। মুনিভাই নেই, তাই।

হাসুবৌ অবাক হইয়া যায়। একটুকু ছেলে, তারও মনে ঈর্ষার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।

হাসুবৌ তার নিকটে সরিয়া আসিল। আবার তার ছলের উপর হাত বুলাইয়া আদর
করিতে লাগিল। না, তুমি বেশ ভাল ছেলে।

আমজাদ জবাব দিল, না।

হাসুবৌ পুনরায় বলিল, যদি তুমি একটা কাজ করো, তোমাকে বেশি আদর করব।
কি, শুনি।

একবার মুনির খবর দিতে পারো?

আমি কি করে নেব।

হাসুবৌ আন্মনা, গাছপালার ফাঁক অতিক্রান্ত দূরের আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।
খোয়াব কাটাইয়া সে আবার বলিল, তুমি তাদের গাঁয়ে যাও না।

আমজাদ অক্ষমতা জানাইল।

শুব বেশি দূর নয়। আমি গরুর গাড়ির পয়সা দেব।

মা যে বকবে।

না, ক্ষুলে যাওয়ার নাম করে চলে যাবে।

হাসুবৌ ঔচলের গিট খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিল।

এই নাও, তোমার কাছে রেখে দাও, কতক্ষণ আর লাগবে।

যা যদি শোনে! শক্তি দৃষ্টি আমজনদের চোখে।
না, কেউ কলবে না।
যহেশ্বরাঙ্গন পাহণালা এত ঘন। এই জাগুগাটি আগো নীরব। বাতাসের মৃদু নিবাদ।
বোপেরাতে একমন ঝুনো পারি কেৰার অদৃশ্য থাকিয়া হঠাত থাকিয়া উঠিল।

ভূমি যাবে?

হ্যা। যাবা দেলাইল আমজন।

বেশ, নক্ষী হেলে।

হাসুরো সুকুমারযতি বালকের চোখের দিকে চাহিয়া আনন্দনা আলিঙ্গনে জড়াইল
আমজনদেক। বেশ নক্ষী হেলে ভূমি। মৃদুত্বে বন-ক্ষেত্ৰের নীরবতা হঠাত চমক বাইতে
থাকে।

বেশ নক্ষী হেল ভূমি।

আমাকে ছেড়ে দাও।

না।

মুনিলাইয়ের যত আমার পালে কামড়ে দিওৱা না বেন, হাসুচাচী।

হাসুরো স্তুত হইয়া আলিঙ্গন মুখ করিয়া দিল, দূৰে সৱিয়া পেল সে।

আমজন হাসিতে থাকে। হসু চাচী, মুনিলাই একটা ব্যাপা। প্ৰজাপতি ধৰে বলে,
তুম কুল পাত্ৰের জায়া বাঞ্ছাৰ।

নিৰুত্তৰ হাসুরো।

আজু চাচী, অজাপতিৰ কুলে জায়া কুল কুৰা যাব?

হ্যা। আৰি তোমাৰ জায়া কুল কুৰে দেব। ভূমি একবাৰ মুনিৰ বৰৰ এনে দাও।
দেবো না, তোমাৰ যা কুল কুন্দে।

শা'ৰ নামে আমজনদের কুল্যা হয়। দৃঢ়কঠে সে জৰাব দিল, নিচয় যাব। চার আনা
পুৰু পাড়িৰ অভা। আৰি চার আনাৰ মুড়ি কিনৰ।

বেশ।

হাসুরো হ্যাত বাজুইল আমজনদের দিকে। সে তৰুন এক দৌড়ে অদৃশ্য হইয়া পিয়াছে।

২২

দৱিয়াবিবি জ্বেট যেজোটিৰ নাম রাখিয়াছিল শ্ৰীকৃষ্ণ। ভাকন্মায শৰী। শ্ৰেণীৰ শৃঙ্খলি একবাৰ
তাৰ সনে জৰিয়াছিল বৈকি। সেই দীন-জীবনেৰ কৰুণ অবসান-মৃহূর্ত! ভাক নামে শ্ৰেণীৰ
শৃঙ্খলি বাঁচিয়া থাক। দেশেৰ বিশাল যানচিহ্নেৰ এক কোণে নামহীন গ্ৰাম্য জননীৰ দীন
প্ৰচষ্টা— জাতি-ধৰ্ম ধেৰাবে যানবতৰ উপৰ জৈৱাজ্ঞেৰ কোন ফণা মেলিতে পাৱে না।

কিন্তু প্ৰায়ে হিন্দু-সন্মুদ্ৰাবে দাঙা বাধিবাৰ উপকৰ্ম হইয়াছিল।

গ্ৰেহী চৌধুৰী ও হাতেৰ বাঁৰ মধ্যে গত ক্ৰমেক বছৰ একটি বিদ্যা-পঞ্জাশেৰ জলাশয়
নইয়া মন-কৰ্মকৰি চলিতেছিল। এতদিন জলাশয় চৌধুৰীদেৱ দৰলে ছিল। দলিলে হাতেম
বাঁৰ শাশ্য হইলেও সে ইহাৰ কাছে ঘৰিতে পাৱে নাই। জলাশয় জমা নইয়াছিল কয়েকজন

মুসলমান জেলে। ইহাদের অন্দৰবংশীয় মুসলমানেরা আত্মাফ বলে। বিলের আয় মন্দ নয়। হাতেম খৌ কয়েকজন আত্মাফকে হাত করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্ররোচনা দিল। তাহারা সেইমত খাজনা বন্ধ করিয়াছে। রোহিণী চৌধুরী এই শলাপরামর্শ ভালুকেপে আঁচ করিয়াছিল। তিলি-বাগ্নী-ডোম শ্রেণীর কৃষক হিন্দু হাত করিয়া গ্রামে তিনি দাঙ্গার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন।

হাতেম বক্ষ ইদানিং ঘোরতর মুসলমান সাজিয়াছেন। তাঁর পুত্রেরা অন্দরমহলেই শরাব পান করেন। তিনি কোন কথা বলেন না। নিজেও নামাজ-রোজার ধার ধারেন না। বর্তমানে জুম্বার নামাজের সময় হাতেম বখ্শকে মস্জিদে দেখা যায়। তাঁর কালোশাদা দাঢ়ি শ্বেত-খোজাফে আরো শুভ রং ধারণ করিয়াছে। শাদা পিরহান হাঁটু পর্যন্ত ঝুলাইয়া একটি ‘আসা’ (ছড়ি) হাতে গ্রামের অক্কারে দারোয়ান সঙ্গে শুরিয়া বেড়ান। বৈঠক, শলাপরামর্শ আর মুক্তির বহর। নামাজের সময় না হইলেও তিনি এগুলো দেন। নামাজ ‘কাজা’ করা শক্ত গোনাহ। হাদিস-কোরানের সম্পত্তি এজেন্সী লইয়াইছেন তিনি। গ্রামের মুখ্তবগুলির জীর্ণ-দশা। এক পয়সা তিনি খরচ করেন নাই। বর্তমানে তিনি একটি ‘তা’মদারী’ করিয়া গ্রামের মুসলমানদের পোলাও-কোর্মা খাওয়াইলেন। কাফের হিন্দু জমিদার মুসলমানদের সর্বস্বাস্ত করিয়া ছাড়িবে, এই কথা পাকে প্রকারে প্রচারণার খোলসে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

নিষ্টেজ মহেশ্বডাঙ্গার জীবনে তবু চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। হিন্দুপাড়ায় রোহিণী চৌধুরীর কার্পণ্য নাই। প্রচারণা শক্তি তাঁরও কম নয়।

সাকেরকে হাতেম বখ্শ এতদিন আমল দিত্তমা। তার লাঠির জোর দশ গাঁ জানে। হাতেম বখ্শ দাওয়াৎ খাওয়াইয়া, টাকা-পয়সার ঘূমে তাহাকে ক্রয় করিয়া ফেলিল। সেও হালফিল ভয়ানক মুসলমান হইয়া উঠিয়াছে। ইয়ামের পেছনে ‘ইয়ামের যা নিয়ৎ আমারও তাই’ বলিয়া সৈদ ও বকর সৈদে থেকেছে দুইবার মাত্র নামাজ পড়িত, সেও নামাজ শিখিতেছে। বাংলা নামাজ-শিক্ষা গঞ্জ হইতে কিনিয়া আনিয়াছে ঠিকমত আরবী উচ্চারণ হয় না, তা লইয়া হাসাহাসি করিতে গিয়া হাসুবো ভয়ানক তাড়া খাইল। নৃতন কাক নাকি বিষ্টা খাওয়ার যম, এমন মন্তব্য করিয়াছিল নিরীহ বৌটি। ‘সুপারী খাওয়া ছাড়ো, তোমার জিভ সরল হোক।’

চন্দ্ৰ কোটাল পালের গোদা সাজিয়াছে। শেখপাড়ার একজন মুসলমানের সঙ্গে জমির আল লইয়া গত বৎসর তার বচসা হইয়াছিল। রোহিণী চৌধুরীর মোসাহেবেরা সেই উপলক্ষ যথারীতি কাজে লাগাইল। পাড়ায় পাড়ায় চন্দ্ৰ কোটাল বলিয়া বেড়াইতেছে, মুসলমানেরা যদি টু-শব্দ করে, উড়িয়ে দাও তৃতী দিয়ে।

জলাশয়ের পাশে একদিন দুই প্রজাদলে ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। কয়েকজন জখম হইয়াছিল। আদালতে মামলা দায়ের হইল। আহতদের পয়সা নাই। চৌধুরী ও হাতেম বখ্শের যথন পয়সা আছে, তথন কিছুর অভাব হইবে না।

গ্রাম থমথম করিতেছে।

এমনই আসন্ন অপরাহ্নে আজহার খৌ ফিরিয়া আসিল। কাঁধে ঘোলানো থলে, তার ভিতর মনিহারী দ্রব্য। লাটিম, আলতার ডিবা, ছোট মেয়েদের হাতের চূড়ি ইত্যাদি।

নঙ্গী ও আমজাদ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে উপহার পাইয়াছে। আমজাদের

জন্য থাতা-পেসিল, লাল রবার। লাট্টু-লেস্তি জোর করিয়া সে আদায় করিল। নষ্টমার
সওগাত কানফুল, কয়েকটি রেশমী চূড়ি।

দরিয়াবিবির শুক্রতা ভাঙিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানের সেতু তেমনই যোগ-ছিন্ন।
তিরিষটা টাকা আনিয়াছিল আজহার খাঁ। চার মাস সে বেকার বসিয়া থাকে নাই। তবে
দোকান সে করিয়াছিল গত একমাস। দোকানদারী পোষাইল না।

দরিয়াবিবির হাতেও টাকা ছিল। ইয়াকুব দেদার খরচ করিয়া যায় এইখানে। গঞ্জের
দিনে সে প্রায়ই আসে। আজহার ফিরিয়া না আসিলে, তার কোন হাত-টান হইত না।
আমজাদের কুলের বেতন পর্যন্ত ইয়াকুব মাস-মাস দিবে বলিয়া শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি
দেয় নাই, তিন মাসের টাকা অগ্রিম দিয়া গিয়াছে।

গ্রামের কথা শুনিয়া আজহার থ হইয়া গেল। আমজাদ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিতে
লাগিল পিতার নিকট। সাকের চাচা নাকি বলিয়াছে, রোজগারের ঘরশুম এসেছে। সে দুই
জমিদারের নিকট টাকা লুটিতেছে। রোহিণী চৌধুরীকে সে আশ্বাস দিয়াছে, দাঙ্গার দিন
লাঠি ধরব না, কসম করছি—বাস দেখব হাতেম বখশ কত লেঠেল আনে। হাতেম
বখশকে সাকের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, পাঠানের বাচা শেষ লাঠিখেলা দেখিয়ে যাব।

আজহার খাঁ বিলম্ব করিল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া একদম মাঠের দিকে
গেল। বাজে ঝঁঝাটের চেয়ে মাঠের অবস্থা তার প্রথমে জানা দরকার। মাঠ, ফসল,
তার কামধেনু। ওই বছর ফসল পাইয়াছিল বলিয়া স্মৃতিসারেও শ্রী বজায় আছে। সকলে
রবিফসলের চাষ দিতেছে। গরু-বাচ্চুরের জুলমেঝে জন্মে কয়েকজন চামী বাখারীর বেড়া
প্রস্তুত করিতেছে। পটল দিবে সকলে এবার ^{অবার} তৰমুজ গত বছর ভাল ফলে নাই। কুমড়া
আর মুলোর চাষ চলিতেছে।

দেরী হইয়া গিয়াছে তার। তাহাকে। 'নাবি' ফসল হইবে। সেজন্য আজহার বেশি
অনুত্তাপ করিল না।

চন্দ্র কোটালের সঙ্গে দেখা করা দরকার, চন্দ্র! মনে মনে হাসিয়া উঠিল আজহার।
সক্ষ্যার পদক্ষেপে শূন্য মাঠের আইল বিচিত্র বর্ণে অদৃশ্য হইতেছে।

চন্দ্র দাওয়ায় বসিয়াছিল, আজহারকে সে অভিভাবণ জানাইল না, বসিতে পর্যন্ত
বলিল না।

চন্দ্র।

সে নিরুন্তুর।

এলোকেশী একটি পিড়া বাহির করিয়া আজহারকে বসিতে দিল। চন্দ্রমণি আসিল
পিছু পিছু। আজহার ডাকিল, চন্দ্র!

কোন জবাব দিতেছে না সে। এলোকেশীর দিকে ফিরিয়া আজহার বলিল, কি, আজ
চন্দ্র নেশা করে বসে আছে?

এলোকেশী ভয়ানক রাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : ও কী, বসে আছে যেন সং।
লোক এলো, কথা বলো। গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া ত ভাইয়ের সঙ্গে কী। যতসব
অপসিষ্টি, হতচাড়া লোক।

এলোকেশী বলিতে লাগিল, জমিদারে জমিদারে ঝগড়া। বড়লোকে বড়লোকে

দলাদলি তোদের কী? তোদের জমিদারী নিয়ে যাবে—ওই বে বসে আছে, ব্রহ্মীবাৰু
জলাশয়টা ওকে দিয়ে যাবে। তাই নিয়ে দিন-বাত টইটই হিন্দুগাঢ়ায় ঘূৰছে।

যার উদ্দেশে বাক্যবাণ বৰ্ষিত হইতেছিল, সে নিজীৰ সৃতিৰ ফত কৰিয়া গৱিল।
বোকা-চোখ মিট্মিট কৰিয়া সে আজহারের দিকে চাহিয়া আবাৰ চোখ কৰিয়াইয়া লাগিল।

কলে সাজিয়া আনিল চন্দ্ৰশিপি। আজহার নীৱেৰে টাপিতে লাগিল। ঘোঁষা জাহাজ
অবকাশে সে আবাৰ ডাকিল, চন্দ্ৰ।

আজহার ত্রিভিত হইয়া আসিতেছে। বড় শুণুকষ্ট তাৰ : চন্দ্ৰ! আমি এতদিন দেশজাহাজ ;
জানি চন্দ্ৰ আছে। বড়লোকে বড়লোকে দলাদলি, আমৰা পৰীৱেৰা কেন শুভ মহো?

এলোকেশী আবাৰ এক পশ্চা বৰ্ষণ কৰিয়া গোল : দাগুৱাত একটা মাদুৱে আড়
হইয়া চন্দ্ৰ হঁকা পান কৱিতে লাগিল ; ভীমেৰ শৱশ্যায় আৱৰ্ত্ত হইল ; এলোকেশীৰ বাণ তা
হইলে ব্যৰ্থ নাই, কিন্তু ভীমদেৱ শৱে কাতৰ কল, কষ্টপৰে কাতৰ হণ্ডার কোন লক্ষণ
দেখা গোল না। একবাৰ সে হাই তুলিল।

সক্ষ্যায় গ্রাম ছাইয়া! সিয়াছে।

উঠানে নীৱেৰতা। দূৰে মার্ছ বাচ্চুৱ ডাকিতেছিল।

আজহার উঠিবাৰ পূৰ্বে বলিল, ঘোঁষীনেৰ মা, আবাৰ কাল আসব, আজ শুভ মেজাজ
ঠিক নেই।

তিচাৰ উপৰ হইতে নাহিয়া পড়িল আজহার অস্তিকাৰ প্রলেপিত ঘাৰ্ট ; তাৰ মনেৰ
মতই শূন্য। সে বাতাসেৰ পদ-সফলল-ধনি জৰিতে লাগিল।

একবাৰ উৎকৰ্ষ হইল আজহার। চন্দ্ৰ কোটাল গাল পাড়িতেছে : না, আমাৰ দু'চোখ
নেই আৱ মুসলমানদেৱ দেখি— দু'চোখ নেই।

এলোকেশীৰ কষ্টপৰ তাৰ সঙ্গে তা থাকবে কেন? তাড়ি পিলে পিলে চোখেৰ মাথাও
যে গিলেছে।

আবাৰ ভৰ্মনাৰ শৱজাল : চুপ, শালী।

এলোকেশীৰ জবাব : আমাৰ বোনেৰ সঙ্গে অত কেন। নিজেৰ বোনকে দিয়ে এসো
না ব্ৰহ্মীবাৰুকে। এখনো ত বহুস রহেছে— পীঁতিতি কৱবে।

আজহার হাটিতে লাগিল। এই একটিমোহৰ আশ্বাতোলা মানুষকে চিনিয়াছিল, সে তাৰ
কত নিকট। এতটুকু দৰদেৱ জায়গা আৱ নাই তাৰ পৃষ্ঠিবীতে।

পেছনে ফিরিয়া আজহার অব্যুক্ত বেদনাহৰ কোটালেৰ ভিত্তিৰ দিকে আবাৰ চাহিল।
দুই চোখ তাৰ জলে ভৱিয়া উঠিল। দৱিয়াবিবি কি মহিয়া সিয়াছে?

পৰদিন বিকালে আজহার বৰি-ফসলেৰ জন্য জমি তৈয়াৱি কৱিতেছিল। বহুদিন মূলা
চাষ কৱে নাই সে। এইবাৰ মূলা ও ততমুজ দেওয়া হইবে এইবাবে। জমিত কিমাৰায়
শকৰগঞ্জ আলু। আমজাদও সঙ্গে আসিয়াছিল। আজকাল আজহারকে সে বুব এড়াইয়া
চলে। কিন্তু পিতাৰ নিতকু গাষ্টিৰ্মেৰ সমূহে সে তক্ষণক তীকু। ঘাৰ্টে কাজ কৱা তাৰ ভাল
লাগে না। স্কুলেৰ পড়ুয়া, সে কেন সাধাৰণ চাকীৰ ফত এই বয়সে জমিৰ বৰকতাবীৰ কৱিবে?

পিতাৰ আদেশ নীৱেৰে পালন কৱে। কয়েকটি বাল কাটিয়া আনিয়াছিল আজহার।
আমজাদ তাৰ বাখাৰী তুলিতেছিল। পক-বাচ্চুৱেৰ যা জুলুম, কেড়া না দিলে ফসল আদাৰ

হইবে না।

আরেক কৃষক দূরে কর্মব্যস্ত। এক মাসে এইখানে সমীর চক্ষল ধান-বন রং রেখায় মাঠগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এখন শূন্য ক্ষেত! খামারে গাদা উঠিয়াছে। অবেলার শূন্যতার মধ্যেও তেমনি জুকুটির ছোয়া নাই। গ্রীষ্মকালে সমস্ত প্রান্তের যেন গ্রাস করিতে আসে।

আজহার সমগ্র মাঠের দিকে তাকায় না। আমজাদ নীরবে কাজ করিতেছিল।

শীস-ধৰ্মনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয় চন্দ্র কাকা আসছে, কয়েক বিঘা দূরেই তার জমি। খালের ঢালু পাড় হইতে চন্দ্র কোটালের অবয়ব ক্রমশঃ দৃশ্যমান হইতে লাগিল।

আমজাদের কাজে মন নাই। এখনি চন্দ্র কাকা আসিয়া পড়িবে। তখন হয়ত তাকে কোন কাজই করিতে হইবে না। তার মৃদু হাস্যে কপোল রাখিয়া উঠিতেছিল।

চন্দ্র কোটাল সোজা এই জমির দিকে আসিল না। একটি কলাগাছের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু বৃতৎসূর্ত শীস বহু আগে নিভিয়া গিয়াছে।

আমজাদই প্রথম সম্ভাষণ জানাইল, ও চন্দ্র কাকা—। চোখাচোবি দুইজন। হাস্য সংবরণ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল কোটাল।

ও, কাকা!

কাকা কোন জবাব দিল না।

আজহার কোদাল চালাইয়া জমি পরিপাটি করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া আবার চক্ষু অবনত করিল।

আমজাদ হাসিমুখে অগ্রসর হইতে গেল। আজহার ধৰ্মক দিল, কাজ ক্ৰ., আমু।

চন্দ্র কোটাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তার দৃষ্টি অন্যদিকে। আজহার নীরব, নত মুখে কাজ করিতে লাগিল। দু'জনে যেন কোন পরিচয় নাই। আমজাদ মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতেছিল। গায়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। তারই কী ফল এই।

চন্দ্র কোটাল জমির পাশ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইত লাগিল, ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল গাছপালার আড়ালে, সক্যার বেশি দেরী নাই।

আমজাদ জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্র কাকা কথা বলল না যে?

না।

পিতার জবাবের ধীর দেখিয়া আমজাদ আর অন্য প্রশ্ন করিল না।

শীসের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। নিশ্চয় চন্দ্র কাকা। আমজাদ স্বয়ং বিষণ্ণ, মাঠের দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

২৩

চন্দ্রমণির সঙ্গে আজহারের পথে হঠাত দেখা হইয়াছিল। মাঝে মাঝে চন্দ্রমণি গ্রামের ভিতরে আসে। চন্দ্রই কেবল গ্রাম-ছাড়া, তার অন্যান্য আত্মীয়েরা এখনও পূর্ব পুরুষের ভিটায় বাস করিতেছে।

আজহার অন্যমনক্ষ পথ হাঁটিতেছিল। ‘ও দাদা’ শব্দে সে চমকিত হইয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে তাকাইল। না, চন্দ্রমণিকে সহজে চেনা যায় না। তার খোলস-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বেশ পরিষ্কার কাপড় পরনে, পানের কষে ঠেঁট দু'টি রাঙা। বিধবা বলিয়া চন্দ্রমণির যেন কোন পরিচয় নাই। আজহার চন্দ্রমণিকে কোন যুবতী পরস্তী মনে করিয়া হঠাতে অপস্তুত বোধ করিতেছিল।

ও দাদা, আমি চন্দ্রমণি।

আজহার সেদিন বৈকালে চন্দ্রমণির এই রূপ দেখে নাই। অবাক হইয়া গেল সে। চন্দ্ৰ কোটালের আয়-উপার্জন নিশ্চয় বাঢ়িয়াছে। রাজেন্দ্রের সঙ্গে ভাঁড়-নাচের দল গড়িয়া সে ভালই করিয়াছে।

ও মণি, তুই! আমি ত ভাবছিলাম আর কেউ।

চন্দ্রমণি কিশোরীর মত হাসিতে লাগিল। বছর আগে ম্যালেরিয়া জুরে কি ‘ছিরি’ না হইয়াছিল তার।

তুমি আর যাও না যে দাদা!

আজহার লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

কি করে যাই! চন্দ্ৰ একদম কথা পর্যন্ত বলে না।

ও নিয়ে বৌদিৰ সঙ্গে রোজ ঝগড়া বাধে।

চন্দ্রমণি এলোকেশীৰ প্ৰসঙ্গ উথাপন কৱিল।

চন্দ্ৰকে সেদিন দেখলাম। ওৱ শৰীৱটা খাৰপে।

রাখালেৱা একপাল গৰু তাড়াইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রমণি ও আজহার পথেৱ এক পাশ হইয়া কথাবাৰ্তা আৱৰ্ত্ত কৱিল।

শৰীৱ খাৰাপ হবে না। কত আড়িগেলে। আৱ আজকাল দাদা কি যেন হয়ে গেছে।
কি হয়েছে?

সে মন-মেজাজ আৱ নেই। আমাকে দেখতে পাৱে না। কথায় কথায় গালিগালাজ।
খামাখা?

হ্যাঁ, দাদা।

আজহার চন্দ্ৰ কোটালেৱ এই অধঃপতনে কোন দুঃখ প্ৰকাশ কৱিল না। গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আৱো একপাল গৰু আসিতেছে। আজহার সেইদিকে চক্ষু ফিৱাইয়া
বলিল, চন্দ্ৰ আসলে ভালমানুষ। ও কেন এমন হয়ে গেল।

কি জানি।

রাজেন্দ্ৰেৰ পাল্লায় পড়েছে?

চন্দ্রমণি হঠাতে কোন জবাৰ দিল না, চুপ কৱিয়া গেল।

আজহার প্ৰসঙ্গ-স্নোত বক্ষ কৱিল না : রাজেন্দ্ৰ ছোঁড়াটা তেমন ভাল নয়। ওৱ সঙ্গে
বশি তাড়ি গেলে বোধহয়।

না দাদা!

চন্দ্রমণি অসোয়ান্তি বোধ কৱিতেছিল, কৰ্ষন্তৰ তাৱ প্ৰমাণ।

গাঁয়েৱ বড় লোকদেৱ ঝগড়া থেকে দাদাৱ মেজাজ আৱো বিগড়ে গেছে।

সত্যি, মণি। আমিও রাগে সেদিন চন্দ্রের সঙ্গে কথা বললাম না। ও মাঠে এসেছিল।
আমারও মেজাজের ঠিক নেই।

চন্দ্রমণি আবার হাসিতে লাগিল। আমার দুই দাদাই পাগল।

আজহারকে রসিকতা স্পর্শও করিল না।

পূরাতন খেই টানিতে ব্যস্ত সে : আজকাল রোজগার কেমন করছে।

তা, মা লঞ্চীর কৃপায় বেশ। নাচের দলে দু'পয়সা হয়।

আজহার হঠাৎ হিংসুকের মত বেদনা অনুভব করে। বেশ আছে চন্দ্র কোটাল।

আমি যাই দাদা, আর একদিন আসবেন।

চন্দ্রমণি আর সেখানে দাঁড়াইল না।

২৪

দুই জমিদারে মামলা বাধিয়াছে। গ্রামে আর কোন গোলমাল নাই। সাময়িক উত্তেজনা নিভিয়া গিয়াছিল। চন্দ্র কোটাল আজহারকে এড়াইয়া ঢলে। দুই পরিবারে পূর্বের মত সন্তার নাই। এলোকেশী কোনদিন ঝগড়া-কলহ পছন্দ করে না। কোটালের সঙ্গে তার মতবিরোধ প্রায় দেখা যায়। আজহার বহুদিন চন্দ্রের বাড়ির ভিটার পাশে গিয়াও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সাহসে কুলাইয়া উঠিতে পারে নাছে। সাকের আবার রোহিণী চৌধুরীর সঙ্গে খাতির পাতাইয়াছে। কিষাণেরা রবি-ফসল লাইয়া ব্যস্ত। জমিদারের কোন্দলে কারো কোন উৎসাহ নাই।

এলোকেশী একদিন স্বেচ্ছায় দরিয়াবিবির সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। আজহার বাড়ি ছিল না, আলু-বীজ ক্রয় করিবেন্তে ভিন-গাঁয়ে গিয়াছিল।

দরিয়াবিবি রোদ্রে বসিয়া পাঞ্জা খাইতেছিল তখন।

এলোকেশী হাসিয়া বলিল, ঠিক সময় এসেছি।

এসো দিদি।

শশব্যস্ত দরিয়াবিবি একটা পিঁড়া আগাইয়া দিল।

কিন্তু এলোকেশী আরো ব্যস্ততা দেখাইতেছিল।

তুমি খেয়ে নাও, আমি এখনি উঠব।

এত তাড়া কেন? ও, আমার সঙ্গে ঝগড়া আছে নাকি?

এলোকেশী হাসিতে লাগিল।

কেন, বলো দিদি। সব জায়গায় খালি কোন্দল। গাঁয়ে, আমার ঘরে।

কোটালের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

দরিয়াবিবি যথা দ্রুত আহার সম্পন্ন করিল। এলোকেশী তারপর দশটা টাকা বাহির করিয়া বলিল, দিদি, এই টাকা কটা রেখে দিও। জমা রাখলাম।

আমার কাছে কেন?

রেখে দাও।

পরে কানে কানে ফিস্ফিস্ করিয়া সে বলিল, রেখে গেলাম। ঘরে কী রাখার জো আছে?

আজকাল নাচে বেশ পয়সা আসছে।

তা আসছে। রাজেন্দ্র ছোড়াটা বেশ কাজের। এখন বলে যাত্রার দল করব।

আরো সাংসারিক কথা হইতেছিল। উঠানে হঠাৎ আগম্ভকের ছায়া পড়িল। এলোকেশী লোকটিকে কখনও এখানে দেখে নাই। সে তাড়াতাড়ি ঘোম্টা টানিল।

দরিয়াবিবি উঠানের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

এসো ভাই। দরিয়াবিবির ঠোঁটে কৌতুক-মাখা হাসি। আগম্ভক ইয়াকুব। দরিয়াবিবি এলোকেশীর কানে কানে বলিল, আমার দেওর।

ইয়াকুব দাওয়ায় একটি মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল। হাতে একটি পুঁচুলি ছিল। সে খবরদারীর ভার দরিয়াবিবির উপর।

সব ভালো? দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল। এলোকেশী লজ্জায় কলাবৌ সাজিয়া বসিয়া ছিল। ধমকের সুরে দরিয়াবিবি বলিল, ঘোম্টা খোল না বৌ। ও আমাদের দেওর।

এলোকেশী ঘোম্টা খুলিয়া ইয়াকুবকে তালোরপে দেখিয়া লইল।

শরীর ভালো নয়, ভাবী। আজ চার দিন জুর। তোমার এখানে এসে পড়লাম।

বাড়ি থেকে দু'দিন-তাহলে জুর গায়েই বেরিয়েছ?

হ্যাঁ।

এলোকেশী বিদায় হইল।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসাবাদে কসুর করে না। জুর গায়ে বেরিয়েছ?

হ্যাঁ।

এ কি? আর কেউ ছিল না ব্যক্তির জন্য। এতক্ষণ ইয়াকুব কোন অস্ত্রিতা দেখায় নাই। হঠাৎ সে চাপিয়া বলিল, ভাবী, একটু ঘুমোবার জায়গা করে দাও।

দিছি। কিন্তু আমার বোনেরা কেমন-ধারা মেয়ে! তোমার জুর, অথচ গঞ্জে আসতে দিল।

চুপ করিয়া রহিল ইয়াকুব। রৌদ্রের উভাপ তার শরীরে মনোরম লাগিতেছিল। সে বাহিরে মাথা বাড়াইয়া দিল। ছেলেদের পড়ার ঘরে দরিয়াবিবি শয়া রচনা করিয়া ফিরিয়া আসিল। তার মুখের কামাই নাই; ভাবী খারাপ কথা। তোমার জুর। অথচ ছেড়ে দিল। কেউ খোঁজ নেয়নি বোধহয়।

নিষ্ঠকৃতা যেন ইয়াকুবের জবাব। তবু সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, না। খোঁজ নিয়েছিলে বৈকি। আমার মাথাটায় হাত দিয়ে দ্যাখো।

দরিয়াবিবি কপালের উষ্ণতা পরীক্ষা করিল। ভাবী গরম। তোমার মুখ দেখে অসুখ হয়েছে বলে মনে হয় না। উঠে গিয়ে শয়ে পড়।

দরিয়াবিবি আবার বলিল, বাড়ির লোকগুলো কী! এত জুর, ছেড়ে দিল?

ইয়াকুব জবাব দিল, আমি গঞ্জ থেকে আসছি।

আসলে ইয়াকুবের মত মিথ্যাবাদী সংসারে অল্প। দাম্পত্য-জীবনে তার সুখ নাই। প্রায়ই দুই স্ত্রী কোন্দল বাধাইয়া থাকে। তা ছাড়া তার মত পেশাদার লম্পটের কীর্তিকাহিনী

স্তৰীদেৱ কানেও প্ৰবেশ কৰে বৈকি ।

স্তৰীৰ সহিত ঝগড়া কৱিয়া সে ঘৰ ছাড়িয়া আসিয়াছিল । দৱিয়াবিবি ইহার বিস্মৃতি বিস্মৰ্গ জানে না । গ্ৰামেৰ সঙ্গতিপন্ন মানুষদেৱ মধ্যে ইয়াকুবেৱ প্ৰতিপত্তি খুব বেশি । কাৰণ সে তাদেৱ সমগ্ৰোত । ধান-আলু-পেঁয়াজেৱ কাৰবাৰে ইয়াকুব কত উপাৰ্জন কৰে, তা দৱিয়াবিবিৰ অবগতিৰ বাহিৰে ।

গত কয়েক মাস ইয়াকুব যাতায়াত কৱিতেছে । তাৰ খোলা মন স্বতঃই সমীহ আকৰ্ষণ কৰে । কোন কৃটি রহিল না দৱিয়াবিবিৰ সেবায় । মাথায় উত্তাপ উঠিয়াছিল । ঠাণ্ডা পানি দিয়া তাহা সে ধূইয়া দিল । মোটা কাঁথা বিছাইয়া দিল তজ্জপোশে । অবশ্য তা ইয়াকুবেৱ টাকায় কেলা । গায়ে একটি তাঁতেৱ চাদৰ দিল দৱিয়াবিবি ।

আসেক্জন নিজে ঘৰ হইতে বাহিৰ হয় না । সে আমজাদেৱ নিকট খবৰ সংগ্ৰহ কৱিত । একটি পুৱাতন শাল ছিল তাৰ সিন্দুকে । কোন মৃত ব্যক্তিৰ সম্পত্তি, আঞ্চীয়ৱা দান কৱিয়াছিল । দৱিয়াবিবি চাদৰেৱ জায়গায় শালেৱ আবৰণ ঢ়াইল । বড় নিৰ্বঝোট গৃহসুখ অনুভব কৱিতেছিল ইয়াকুব, আমজাদ নিজে মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল । নঙ্গমা পিচুটি ভৱা চোখ লইয়া কৌতুহলে সবকিছু দেখিতেছিল ।

আজও ইয়াকুব কুটুম্বপনার কোন খুঁত রাখে নাই । ছেলেদেৱ জন্য মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবাৰ অনিয়াছিল । পুটুলি নয়, ছেলেদেৱ রত্ন-ভাণ্ডাৰ । ছোট খুকীৰ কথা পৰ্যন্ত ইয়াকুব ভোলে নাই । তাৰ জন্য পাৰ্থা জামা অনিয়াছিল ।

দৱিয়াবিবি পথ্য তৈয়াৱ কৱিয়া আনিল । ইয়াকুব নিষ্ঠেজ চোখে চাৰিদিকে দৃষ্টিপাত কৰে । বড় আৱাম তাৰ ।

দৱিয়াবিবি বলিল, ভাঙ্গাৰ ডাকাই, ভাঙ্গই ।

ঘোৱ আপত্তি জানাইল ইয়াকুবসা, এমনি সেৱে যাবে । ওষুধ গেলা আমাৰ ভাল লাগে না ।

একটি নোট বাহিৰ কৱিল সে, কথা ও সাগৰ শেষ কৱিয়া ।

দৱিয়াবিবি কোন আপত্তি জানাইল না । কাৰণ এই ক্ষেত্ৰে অনিচ্ছা বৃথা । ইয়াকুবেৱ হাত হইতে নিষ্ঠাৰ নাই । হাজাৰ কথা বলিতে শুৱ কৱিবে ।

দুপুৰে ইয়াকুব জুৱেৱ ঘোৱে উঁ-উঁ শব্দ কৱিতেছিল । ঘৱে আৱ কেউ ছিল না । হঠাৎ খুট শব্দে সে জাগিয়া উঠিল । দৱিয়াবিবি তাৰ সম্মুখে ।

খাঁ-পন্থী জিজ্ঞাসা কৱিল, শৱীৰ ভাল?

না, ভাৰী ।

তাৱপৰ ইয়াকুব কাতৰোক্তি আৱো বাঢ়াইয়া কহিল, মাথা ভেঙে পড়ছে । একটু টিপে দিলে ভাল লাগে ।

দৱিয়াবিবি কয়েকবাৰ আমজাদকে ডাকিল, কোন জবাৰ নাই । ইয়াকুব ইঙ্গিত কৱিল বিছানাৰ উপৰ বসিতে ।

আচ্ছা, আমি টিপে দিচ্ছি । ছেলেগুলো বজ্জাঁ । বলিয়া দৱিয়াবিবি ইয়াকুবেৱ মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল ।

ইয়াকুব নিৰুত্তৰ । সে নীৱবে একবাৰ চক্ষুৰ পাতা খুলিতেছিল, পৰ মুহূৰ্তে বক্ষ

করিতেছিল ।

ভাবী, তোমার কাছে বেশি ঝণ কচ্ছি ।

ধাৰ । আমি বৱৰঃ—

ইয়াকুব হঠাৎ হাত তুলিয়া তার মুখে চাপা দিতে গেল । দৱিয়াবিবি মুখ তার নাগালের বাহিৱে রাখিয়া বলিল, ঝণ আমৱাই কৰছি ।

ইয়াকুব আবাৰ একটি নোট বাহিৱ কৱিল । তবে আৱ একটু ঝণ বাঢ়াও ভাবী । না হলে আমি মৱে যাব । আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ জুৱ ।

এমন মানুষ । জুৱেৱ বিকাৰ নয় ত? দৱিয়াবিবি নোটটা নাড়াচাড়া কৱিয়া ইয়াকুবেৱ ব্যাগেই রাখিয়া দিল । নিঃশব্দে লক্ষ্য কৱিল ইয়াকুব, আৱ কোন কথা বলিল না ।

ডাঙুৱ ডাকি । কি বলো ভাই?

না । যদি ডাঙুৱ ডাকো, আমি জুৱ গায়েই বাঢ়ি ফিৱব ।

দৱিয়াবিবি নিৰপায় । বড় একৰোখা ইয়াকুব, সামান্য কয়েক মাসেৱ পৱিচয়ে সে উপলক্ষ্মি কৱিয়াছিল । চৃপ কৱিয়া গেল সে ।

ঘূমাইয়া পড়িল ইয়াকুব কয়েক মিনিটে । দৱিয়াবিবি মাথা টেপা বক্ষ কৱিল । আজজাদেৱ গলার আওয়াজ পাইয়া সে বিছানার পাশ ছাড়িয়া বাহিৱে আসিল । বেশি বেলা নাই । সংসাৱেৱ হাজাৰ কাজ অপেক্ষা কৱিতেছে ।

সন্ধ্যাৰ একটু পূৰ্বে বস্তা মাথায় ফিৱিয়া আসিল আজহাৰ । পটল বীজ পায় নাই । পটল ‘আলৈ’ দাম বেশি । তাৰ প্ৰায় শুক্ষ ।

ইয়াকুব এখানে জুৱে ভুগিতেছে । সে-সন্ধ্যাদ তার কানে গেল । তাৰ সঙ্গে সাক্ষাতেৱ তেমন কোন উৎসাহ দেখাইল না আজহাৰ ।

হাত-মুখ ধূইয়া, কিছু আহাৱেৱ পৰ সে দাওয়ায় তামাক নিঃশেষ কৱিতে লাগিল ।

দৱিয়াবিবি বলিল, একবাৰ দেখে এসো । তোমাৰ কী একটু মেন্সত্বে (মনুষ্যত্ব) নেই । কি মনে কৱবে ।

আজহাৰ এই ধমকে সন্তুষ্ট হয় । সংসাৱেৱ কাজে দৱিয়াবিবি আবাৰ পৱামৰ্শ কৱিতেছে তাৰ সহিত । সহযোগিতাৰ দৱদই ত সে প্ৰত্যাশা কৱে । ইয়াকুবেৱ সহিত অনেক কথা হইল । সংসাৱ, চাষ-বাস, ছেলেদেৱ লেখাপড়া, নদীমাৰ চোখেৱ অসুখ ইত্যাদি । পটল-আলৈৰ কথাও বলিল আজহাৰ ।

ইয়াকুব পকেট হইতে কুড়িটি টাকা আজহাৱেৱ হাতে দিয়া বলিল, বড় ভাই, আপনি কত জায়গায় ঘুৱছেন । আমাৰ সঙ্গে ব্যবসা কৱন । কোন কিছু আটকাবে না ।

আজহাৰ নোট লইয়া বসিয়া রহিল । দিধা-দন্দে সে গ্ৰহণ কৱিল এই দান ।

জৰাব দিন ।

হ্যা । কত কষ্ট কৱছি । তোমাৰ সঙ্গে ব্যবসা কৱব, সে ত ভাল কথা ।

আজহাৰ আৱো গল্প ছাড়িল ।

কয়েক প্ৰহৰ রাত্ৰি অতিবাহিত । দৱিয়াবিবিৰ ধমকে আজহাৰ গল্প সমাপ্ত কৱিল ।

ভাত পৱিবেশনেৱ সময় দৱিয়াবিবি হাসিয়া বলিল, ওৱ সঙ্গে দেখা কৱছিলেন না, এখন যে আঠাৰ মত জড়িয়ে গিয়েছ?

বৈশাখের এক ঝঁঝঁা-উত্তোল রাত্রে আসেক্জান মরিয়া গেল। কেহ খোজও রাখে নাই। আমজাদ অন্য ঘরে ঘুমাইত আজকাল। পরদিন অনেক বেলা হইয়া গেলে, আসেক্জান উঠিল না। খোজ লইতে গেল দরিয়াবিবি। বৃক্ষার ঠাণ্ডা মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করিল দরিয়াবিবি। আমজাদ, নঙ্গী, আজহার বোবার মত চাহিয়া রহিল অনেকক্ষণ। বুড়ির আঁচ্ছায়-স্বজন কেহই ছিল না। প্রতিবেশীদের সহায়তায় দাফন-কাফন শেষ করিল আজহার।

আসেক্জানের একটি পেঁটুরা খোলা হইল। দশ-বারোটি খুচরো টাকা ও কয়েকখানি কাপড় পাওয়া গেল। বিশেষ লাভ হয় নাই দরিয়াবিবি। কাফনেই দশ টাকা গিয়াছে।

এই অসহায় বৃক্ষার কথা বারবার মনে পড়ে দরিয়াবিবি। তার জীবনের পরিসমাপ্তি কিরূপে ঘটিবে, সে কি জানে? হয়ত এমন অপমৃত্যু তারও কপালে লেখা আছে। কতদিন হইল শৈরমী মরিয়া গিয়াছে। কত দিন!

এক সঙ্গাহে আসেক্জানের নাম মিটিয়া গেল এই বাড়ি হইতে। চতুর্থ দিনে পাড়ার দুইজন ভিস্কুকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া দরিয়াবিবি 'চাহরাম' সমাপ্ত করিল।

আমজাদ কিন্তু ভয়ে একা ঘুমাইতে পারিল না কুয়েকদিন। মোনাদির নাই কাছে। নিজের ছোট কুঠৰীতে শুইতে তার বড় ভয় লাগে।

দরিয়াবিবি ধূমক দিয়া বলিল, ভয় কি, ব্যাজি। তোমার দাদি আম্মা তার ভেন্ট নসীব করেছে। ভয় কী?

আমজাদের তবু ভয় কাটিল না।

কয়েকদিন দরিয়াবিবি শরীফনকে লইয়া আমজাদের ঘরে আন্তর্বান পাতিল।

স্কুলে পঞ্জিতের মুখে আমজাদ ভূতের কাহিনী শুনিয়াছিল। মন হইতে তা সহজে মুছিয়া যায় না।

মাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, মা, মরে গেলে ভূত হয় মানুষ?

যারা খারাপ লোক, তারা ভূত হয়।

আসেক্ দাদি কি হোয়েছে?

ছিঃ ভয় কি, আমু। সে ভাল মানুষ। আল্লা তার ভেন্ট নসীব করেছে।

ভাল মানুষ আবার পরের বাড়ি খায়।

গরীব ছিল যে। গরীব।

দরিয়াবিবি ঈষৎ বিচলিত হয় মনে মনে। জবাব যেন ছেলের মন মত হয় নাই।

আমার ভয় করে। দাদি রাত্রে পাশে ঘুমায়।

থুথু-কুঁড়ি ছড়াইল দরিয়াবিবি পুত্রের গায়ে।

তার পাশে শয়ে এত বড় হোলে কিনা, তাই মনে হয়।

আমার ভয় করে কেন, মা?

বেটাছেলে । তোর বুকের পাটা নেই ।

ইস ।

আমজাদ তবু রাত্রে দরিয়াবিবির কোল ঘেঁষিয়া শুমাইত । বাহিরে কাঁঠাল গাছের বনে বনে দম্কা বাতাস লাগিলে সে মাকে জড়াইয়া ধরিত । গোরঙ্গান হইতে আসেক্জান দাদি লাঠি হাতে কারো চালিশা খাইতে যাইতেছে ।

ব্যাপারটা আজহারের কানে গেলে সে একদিন আমজাদকে মখ্তবের মৌলবী সাহেবের কাছে লইয়া গেল । তিনি ফুঁক দিয়া দিলেন । সঙ্গে এক গ্লাস পানি-পড়া । গোটা একটি টাকা বাহির হইয়া গেল দুই ফুঁকের ঠিলায় ।

মৌলবী সাহেব জুম্বাবারে আর একবার আমজাদকে আসিতে বলিল, আজহার তা শুনিল মাত্র । আবার এক টাকার বন্দোবস্ত আর কি । আজহার মনে মনে যোগ করিল ।

আমজাদের ভয় সহজে কাটিল না । আজকাল সন্ধ্যায় একা একা সে দাওয়ায় বসিয়া থাকিতে পারে না । কিন্তু 'মা'র কাছে সে সব চাপিয়া গেল । বাগাড়ৰে তার বুকের পাটা কয়েক মাইল চওড়া ।

আমজাদের ভয় গেল অন্য এক ঘটনার ধাক্কায় ।

আজহারের হাতে ইয়াকুবের দেওয়া টাকা ছাড়া আরো কিছু টাকা জমিয়াছে । আসেক্জানের একটি ছোট বাঞ্চি তার কাছে গচ্ছিত ছিল । দরিয়াবিবি তাহা জানিত না । ভিতরে আরো গোটা কুড়ি টাকা ছিল । এই ব্যাপার শুণাক্ষরে দরিয়াবিবির কানে উঠে নাই ।

গোটা পঞ্চাশকে টাকা । মাছের ব্যবসা অঙ্গীয়া অন্য কোন ব্যবসা করা চলে । ইয়াকুবকে সে পছন্দ করে না । তার টেরি ও রঙ্গীল লুঙ্গী অথবা কোঁচা-চিল ধূতি আজহারের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে । সে তা কাটাইয়ে উঠিতে সক্ষম নয় । তার সঙ্গে ব্যবসাও সম্ভব নয় । সে বয়সে ছোট, তার ইশারায় চলুন, আজহার সমীচীন মনে করে না । ব্যবসায় পুঁজি তার! সূতরাঙ অঙ্গুলি হেলনে ওঠা-বসা ছাড়া উপায় নাই ।

চন্দ্রকে পাওয়া যাইত! চন্দ্র কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে মন টানাটানি লইয়া আর এদিক মাড়ায় না । এলোকেশী সেদিনও আসিয়াছিল । কি বুদ্ধিমতী মেয়ে । দাদা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, আমরা উলুখড় । তাতে মাথা ভাঙতে যাই কেন? এলোকেশী ঠিক বলে । চন্দ্রের কাহিনী স্বতন্ত্র । তার আশা আজহার খাঁ ছাড়িয়া দিয়াছিল ।

এই গ্রামে দুই মতাবলম্বী বাস করে— হানাফী ও লা-মজহাবী । লা-মজহাবীরা সংখ্যায় অধিক । হাতেম বখশ খাঁ হানাফী । তারই ইদানিং উৎসাহে গ্রামে বিরাট 'ওয়াজের' বন্দোবস্ত হইল । দুই সম্প্রদায়ের মুসলমানের সায় ছিল তার পেছনে । এই উপলক্ষে তিন-চার জন মৌলানা নিম্নিত্ব হইয়াছিল ।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভাব স্তুমিত হইয়াছিল । জল-কর লইয়া কিছুটা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে । হাতেম বখশ তবু সন্তুষ্ট নয় । সব কাফের হইয়া যাইতে বসিয়াছে । কয়েকজন মুসলমান এখনও রোহিণী চৌধুরীর পক্ষে । আরো ধর্মভাব উদ্বীপিত করা দরকার । মুসলমানেরা সংঘবন্ধ হইতেছে না, হাতেম বখশ খাঁর বড় আফশোস । ইসলামের অবনতি দেখিয়া তার বুকে কত শত ফাটল দেখা দিয়াছে ।

গ্রামের ঈদগাহে ওয়াজের মজলিস বসিয়াছিল। বিরাট সামিয়ানা পাতা হইয়াছে। মৌলানাদের আসনের জন্য তক্ষপোষ পাতা। নীচে মাদুর সতরঞ্জও বিছানো। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু মুসলমান আসিয়াছে।

ওয়াজ শুরু হইল। এখন মৌলানা বক্তৃতা শুরু করিলেন।

ভাইগণ—

ভাইগণ সকলে উৎকর্ণ হইল। ইসলামের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া মৌলানা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রু আপুত কঠেই ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, ইসলাম বিপন্ন। শুধু হাতেম বখশের মত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জীবিত আছেন বলিয়া ইসলাম জেন্দা রহিয়াছে। হয়ত তার গোরস্থান-গমনে ইসলাম না গোরস্থানে চলিয়া যায়। সব মুসলমান কাফের হইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য ফেরেশতারা পর্যন্ত কাঁদিয়া আহাজারী করিতেছে। তবু মুসলমানের খেয়াল নাই। আল্লার না-ফরমান (অবাধ্য) বান্দারা আল্লার বুকে শূলের মত বিধিতেছে। হায়, আল্লা।

তিনি আর এক দফা অশ্রুপাত করিলেন। সম্মুখে সতরঘনের উপর বসিয়াছিলেন হাতেম বখশ খা, তিনি ঘন ঘন কুমালে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

শ্রোতাদের চক্ষু না সিক্ত হইলেও হৃদয় ভিজিয়া গেল।

পেয়ারা ভাইগণ, আমার আল্লা আলেমুল গায়েব কোরানে ফরমাচ্ছেন, তোমরা এক হও। এক রশী পাকড়ে ধরো। করে মজবুত।

মৌলানা দৃঢ় মুষ্টি ধরিলেন।

মজবুত করে ধরো। হাতেম বখশ সাহেব যেমন মজবুত করে ধরেছেন।

বারবার হাতেম বখশের নাম উচ্চারিত হওয়ার ফলে কয়েকজন সম্মান মুসলমান অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। ঈর্ষা অবশ্য মূল কারণ।

আবার শুরু হইল: পেয়ারা ভাইগণ, আল্লার হৃকুম যদি না পালন করেন, দোখখের আগনে সব জুলে পুড়ে খাক হোয়ে যাবেন। আবেরাতে আপনারা রসূলের সুপারিশ পাবেন না— হরগিজ না।

হরগিজ না, হরগিজ না—।

সভায় সকলের মাথা নড়িয়া উঠিল। মৌলনা দম লইয়া বলিলেন, আপনারা দরদ শরীফ পড়ুন।

‘বালাগোল উলা বেকামালেহি’-র ব সভায় অনেকক্ষণ শোনা গেল।

দোজখের আগন কোনোদিন নেতে না।

শক্ত গুণাগার বন্দাদের জন্য শক্ত সাজা— এত আগন— গর্মি এত তার সেদ্বাতে (উষ্ণতা)।

মৌলানা দোজখের বর্ণনা দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, বোধহয় আগনের উত্তাপে। তিনি এক গ্রাস পানি গলাধ্যকরণ করিলেন। একটি ঢেকুর তুলিয়া তিনি পুনরায় দোজখের আগন দেখাইতে লাগিলেন। গরমের দিন। সভা আরো গরম হইয়া উঠিল।

একজন শ্রোতা গোলাব ছিটাইয়া দিলেন ইতিমধ্যে। বাতাসে গঞ্জের আমেজ। সভা

বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার পর দ্বিতীয় মৌলানা উঠিলেন। তিনি লা-মজহাবী মুসলমান কর্তৃক দাওয়াৎ পাইয়া ছিলেন।

তিনিও প্রথমে কিছুক্ষণ ইসলামের দুর্দশার বর্ণনা করিলেন।

তাঁর মুখে গ্রামের অন্যান্য মাতৃবর মুসলমানদের নাম শোনা গেল। তাঁরাই একমাত্র আদর্শ মুসলমান রূপে গণ্য। হাতেম বখশ্শের নাম ঐ লিস্টে নাই। তিনি মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করিতেছিলেন।

ইহার পর মৌলানা আলম ইসলামের আখ্যায়িকা শুরু করিলেন। হজরত আলীর মত মুসলমান আর জনগ্রহণ করে না। তিনি ছিলেন সৌম্য-শান্ত দীর্ঘকায় পুরুষ, নাড়ি পর্যন্ত তাঁর শুশ্রাঙ্গ লম্বিত।

অন্য একজন মৌলানা প্রতিবাদ করিলেন। না, হজরৎ আলী দীর্ঘকায় ছিলেন না। তাঁর দাড়ি অত লম্বা নয়।

চুপ করুন।

ধর্মক দিলেন প্রথম মৌলানা।

কেন, চুপ করব?

চুপ করুন, হজরতের নাম নিয়ে এমন বেয়াদবী করবেন না।

বেয়াদবী। ইমাম আবু হানিফা ভুল বলেছেন?

আবু হানিফা কে?

ইমামের কথা ঠিক নয়।

লা-মজহাবীরা খুব সন্তুষ্ট। সভায় তাদের দলে আনন্দের গুঞ্জন শুরু হয়। কিন্তু হানাফিরা মৌলানার উপর চটিয়া উঠিতেছিল।

প্রথম মৌলানা আবার বলেন মশু করুন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি চুপ করার বাদ্দা নন।

কোন দলিলে এমন আজ্ঞবি কথা পেয়েছো? তিরমিজী শরীফে আছে, হজরৎ আলীর দাড়ি নাড়ি পর্যন্ত নয়।

বুঁট তোমার তিরমিজী।

হানাফিরা তাহাদের মৌলানার সমর্থক। তাহারা আর চুপ থাকে না। সভায় ফিস্ফাস্ শব্দ শুরু হয়।

চুপ করুন।

না, আমি চুপ করব না।

বেয়াদব।

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলিল। তুমুল বাক-যুক্ত।

প্রথম মৌলানার ধৈর্য আর টেকে না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, তুমি বেয়াদবের বাচ্চা।

তবে রে হারামজাদা।

দ্বিতীয় মৌলানা অতর্কিত উঠিয়া প্রথম মৌলানা শাহ ফখরুন্দিনের গালে এক চড় মারিলেন।

দ্বিতীয় মৌলানা হেফজুল্লা সাহেব প্রাথমিক তাল সামলাইয়া ধরিলেন ফখরুন্দিনের

দাঢ়ি। তারপর ঠাস এক চড়।

শেষে দুইজনে পরম্পরার দাঢ়ি ধরিয়া চুলাচুলি শুরু করিল। সভায় হট্টগোল। দুই দল সমর্থক ছুটিয়া আসিল। মৌলানাদের দ্বন্দ্ব মুরীদানদের মধ্যেও হাতহাতির সুযোগ খুলিয়া দিল।

মারো শালা— লা-মজ্হাবীদের-মারো শালা— হানাফিদের— ওয়াজের মজ্লিশে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাতারা হঠাতে খিত্তী বয়ান শুরু করিলেন।

হাতেম বখশ এতক্ষণে সক্রিয়। প্রথম মৌলানার সমর্থনে তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। হাতহাতি থামিল না দেখিয়া তিনি অঙ্ককারে গা আড়াল দিলেন। ইঞ্জৎ বাঁচাইলেন চতুরজনের মত।

আজহার খাও এই ওয়াজের মজ্লিশে আসিয়াছিল। সে নিরীহ ব্যক্তি কিন্তু এই ব্যাপারে সে পাকা মুসলমান। এমন বর্বর হইয়া উঠিতে পারে সে হাত আজহার কম চালায় নাই। মজ্লিশের বাতি নিভিয়া গিয়াছিল। মনের সুখে সে হাতের সাধ মিটাইল। গলা-ফাটা চীৎকার করে সে: শালা হানাফিদের খতম করে দাও। কে বলিবে, আজহার নিতান্ত বেচারা মানুষ। পাকা মুসলমান। ধর্মের অপমান সে সহ্য করিতে পারে না।

দাঢ়ি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল। সভা শেষে অনেকে আন্ত দাঢ়ি লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল না, কয়েকজন জখম হইল। শুধু তাই নয়, দুই গ্রাম দুই শিবিরে পরিণত হইল।

পরদিন লা-মজ্হাবী পাড়ার লোক হানাফিদের সুযোগ পাইয়া মার দিল। হানাফিরা তার পাল্টা প্রতিশোধ লইল। মৌলানাগণ সেন্টাপ্রতিকৃপে এই গ্রাম-বৃক্ষ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফিল্ড-মার্শালদের ফিল্ডে ফেস্টু গেল না। তাহারা সদর-অন্দরে অবস্থান করিয়া কঢ়ি মুরগির আস্বাদ লইতেছিলেন, সঙ্গে পোলাও পরোটা বাদ পড়ে নাই।

এক সন্তান গ্রামে এই অবস্থা দিয়ারো কতদিন কাটিত, কে জানে। সাকের এই সময় সকলের একটি উপকার করিল। প্রথম দিন সেও হজুরে মাতিয়াছিল। পরে মৌলানাদের কীর্তি সে বুবিতে পারে। ইহারাই এত গোলমালের ঝুঁটি। ভয়ানক চটিয়া গেল সে।

লাঠি হাতে সে প্রথমে হানাফি পাড়ায় উপস্থিত হইল। সে পাড়ায় প্রবেশের আগেই চীৎকার করিতে লাগিল: আমি মারামারি করতে আসিনি, যদিও আমার হাতে লাঠি আছে।

অন্যান্য প্রতিবেশী মজা দেখিতে দাঁড়াইল। এই গোয়ার লোকের সঙ্গে লাঠিবাজি করিতে কেহ সক্ষম হইবে না।

দহলিজ হইতে সে এক মৌলানাকে কান ধরিয়া টানিয়া আনিল। তারপর দুই চড় ও এক লাঠির ঘা দিয়া বলিল: নিকালো হিয়াসে। কাইজ্যা বাধাতে এসেছো, শালারা। চশমখোর শালারা নিজের রাগ সামলাতে পারে না। কুকুর-কুকুর। আবার মুরীদ করতে এসেছে।

মৌলানার মুরীদগণ স্তুক। হজুরের দুর্দশার মুখে কেহ ছুটিয়া আসিল না।

সাকের নিজে ওহাবী। নিজের পাড়ায় এক মৌলানাকে ভয়ানক চাবুক বাজির পর হাঁকাইয়া দিল।

গ্রাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। প্রথমে কয়েকজন সাকেরের উপর অসম্ভট হইয়াছিল, পরে দুই হাত তুলিয়া শোকর। মেয়েমহলের অনেকে সাকেরের জন্য আল্লাহর দরগায় দোয়া

প্রার্থনা করিল। ছেলেপুলে লইয়া এতদিন শান্তি ছিল না। কখন কে জথম হয়। অনেক মেয়ের বুকের ধূকধূকানি ভাব এতদিনে গেল।

গ্রাম দুই দিনে স্বাভাবিক।

আজহার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে পুনরায়। এই কয়দিন দরিয়াবিবি পর্যন্ত তার চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইত। ধর্মের নামে সে যেন জানোয়ার বনিয়া যায়, অথচ আর কখনও তার এই তেজ চোখে পড়ে না।

সুযোগ বুঝিয়া দরিয়াবিবি একদিন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, যখন কেউ বিনা দোষে তোমার উপর জুলুম করে, তখন ত ভিজে বিড়াল সেজে বসে রইলে।

হ্রঁ।

দরিয়াবিবি ব্যঙ্গ-শব্দ করিল, হ্রঁ।

তারপর সে সাকেরের পৌরুষের প্রশংসা আরম্ভ মাত্র আজহার নিঃশব্দে মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

আমজাদ বহু পূর্বে মাঠে গিয়াছে। স্কুলের ছুটি। তার লজ্জা লাগে মাঠের কাজে। কিন্তু বাড়ির দুর্দশা দেখিয়া পিতাকে সাহায্য করিতে বেশ আনন্দ পায়। যদিও পিতার উপর তার শ্রদ্ধা দিনদিন কমিয়া যাইতেছে। তার আকৰ্ষণ কি রকম!

জমির এক কোণে লক্ষাচারা রোপণের জন্য মাটি তৈয়ারি হইতেছিল। লাঞ্চ হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু পরিপাটি বাকী।

বেড়া দিতে হইবে মজবুত করিয়া। গরু ছাপলের উৎপাত লক্ষ গাছের উপর বেশি। সারি বন্দী চারা পুঁতিবার জন্য 'আইল' সোজা করিতে হইবে।

আমজাদ এইসব কাজ খুব ভালবাস্তে। ছেট কোদাল লইয়া সে সোজা রেখাকার মাটি সাজাইতেছিল। এই সময় পশ্চাত্য বৃষ্টি হইয়া গেল, পানি-বওয়ার মেহনত দরকার হইল না।

হঠাৎ আজহারকে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হয় না।

অমনি বলে, আকৰা।

আকৰা, তুমি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছো, দেখছি।

হ্যাঁ আকৰা।

বেশ।

এবার লক্ষা হোলে হাতে নিয়ে যাব না। আমাদের সারাবছর কিনতে হয়।

কিন্তু তখন হাত টান থাকলে তুমি কি তা মনে রাখবে?

লজ্জিত হয় আজহার মন্তব্যে। সত্যি তার খেয়াল থাকে না তখন। অথচ ক্ষেত্রের ফসল বেচিয়া দিয়া সারা বছর মুদীর দোকানের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

না, এবার আর বেচব না আল্লা চায়-ত।

থামিয়া গেল আজহার। হাতে টাকা আছে, তবু খটকা তার মনে। আল্লার করণা মুছিয়া যাইতে কতঙ্গণ।

দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছে। মাঠের রূপ বদলাইয়া যায়। পিতা-পুত্রে রবি ফসলের টুকিটাকি কাজ করে।

হঠাতে গানের আওয়াজ শোনা গেল ।

পিতা-পুত্র উৎকর্ণ । গানের কলি দোহৃরাইয়া গায়ক গাহিতেছে :

ভগবান, তোমার মাথায় বাঁটা,
ও তোমার মাথায় বাঁটা ।
যে চেয়েছে তোমার দিকে
তারই চোখে লঙ্ঘা-বাটা ।
ও ছড়িয়ে দিলে, ছড়িয়ে দিলে
মারলে তারে তিলে তিলে
ও আমার বৃথা ফসল কাটা
ও তোমার মাথায় বাঁটা ।

কষ্টস্বর পরিচিত ।

আজহার আবার নিজমনে কাজ করিতে লাগিল ।

চন্দ্ৰকাকা, না আৰু ?

আজহার কোন জবাৰ দিল না । আমজাদ মাঠের দিকে চাহিয়াছিল । গায়কের অবয়ব
তখনও দৃষ্টির বাহিরে ।

আনমনা আমজাদ । আজহার লক্ষ করে । কাজের গাফিলতি সে পছন্দ করে না ।

কাজ কৰু, আমু ।

চন্দ্ৰকাকা, না ?

হঁ, তা কি করতে চাও ?

পিতার কষ্টস্বর উষ্ণ । আমজাদ মাথা হেঁট করিয়া ক্ষেতে লঙ্ঘাচারা বসায় । আড়চোখে
মাঠের দিকে চাহিয়া থাকে ।

যে চেয়েছে তোমার দিকে
তারই চোখে লঙ্ঘা বাটা ।

গান পুনৰায় শুরু হইয়াছে ।

আমজাদ হাসিয়া বলে, আৰু, চন্দ্ৰ কাকা পাগল । ভগবান মানে আঢ়া, না আৰু ?

কাজ কৰু ।

ধূমক দিয়া উঠিল আজহার ।

কলাবনের আড়াল হইতে মেঠোপথে চন্দ্ৰ বাহির হইল । কষ্টস্বর নিকটবর্তী হইতেছে ।
আমজাদ মনে মনে খুশি হয় । কিন্তু আনন্দ আৱ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না । চন্দ্ৰ কাকা আৱ
এদিকে আসিবে না । হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া । নিকুঠি কৰি ঝগড়াৰ, কি-সব বাজে কথা ।
আমজাদ ভিতরে তাতিয়া উঠে ।

আজহার আবার আনমনা আমজাদকে কাজে মনোযোগ দিতে বলিল ।

গায়ক এইদিকে আসিতেছে । আড়চোখে আমজাদ দেখিল, আজ চন্দ্ৰ কোটাল জমিৰ
বেড়াৰ ওপারে থমকিয়া দাঁড়ায় নাই । সে তাহাদেৱ দিকেই ত্ৰুমশঃ অংহসৱ হইতেছে ।

আরো নিকটে, ঠিক তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্র কোটাল ।

আজহার চূপচাপ কাজ করিয়া যাইতেছে । কোটালের উপস্থিতি যেন সে অবহেলা করিতে চায় । পিতার ভয়ে আমজাদ তাহার দিকে তাকায় না ।

তিনজনে নিস্তর । এমন অসোয়াস্তির মুহূর্ত কারো জীবনে যেন আসে নাই । কোটাল হঠাতে বোকার মত হাসিয়া উঠিল । আমজাদ তার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া মাটি ঝুঁড়িতে লাগিল । হাসি পায় তার । শুধু পিতার ভয়ে চুপ করিয়া আছে ।

—আজহার ভাই, ও খাসাহেব । বলিয়া চন্দ্র থামিয়া গেল । অপরপক্ষ তখনও নীরব ।

এই চাচা, তোমার বাবা এবার বোবা হোয়ে গেছে নাকি?

বোবা বাবা । ও-কার আর আ-কার ।

চন্দ্র আমজাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল ।

আজহার বিদ্যুমাত্র নড়িল না । তার হাতের কাজ অবশ্য স্তর । তারপর খিলখিল হাসিয়া চন্দ্র হঠাতে দণ্ডয়মান আজহারের ঠিক পায়ের সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া তার চোখের দিকে তাকাইল । চোখে চোখ পড়ে । কোটালের হাসি সংক্রামক । আজহার না হাসিয়া পারে না ।

চন্দ্র তখন তুঁড়ি দিয়া এক লাফে উঠিয়া আমজাদকে কাঁধে তুলিয়া লইল । আমজাদ আজকাল বড় হইয়াছে । কাঁধে উঠিতে তার লজ্জা লাগে । কিন্তু বারণের অবসর কোথায় । এতক্ষণে সে শূন্যে ।

চন্দ্র নাচিতে নাচিতে বলে, ধম্ম-টম্ম আমি মানি নে । যতসব বেজন্মাদের কীর্তি । গান ধরিল সে,

তগবান, তোমার মাথায় ঝাঁটা,

তোমার মাথায় ঝাঁটা ।

তারপরই সে বলে, আজহার ভাই, আমি ভাবতাম আমাদের সাতরকম জাত আছে । তোমাদেরও তাই । ঠিক করেছে সাকের । আমাদের শালা পুরুত ঠাউর (ঠাকুর) আর তোমাদের ওই— ।

কথা শেষ করিতে পারে না সে । খিলখিল হাসির শব্দে বেলাশেষের মাঠ ভরিয়া ওঠে ।

‘সুইৎ’ শব্দে আমজাদকে কাঁধ হইতে নামাইয়া সে বলিল, তামাক দাও ।

অন্য কারো কথা বলার অবসর নাই ।

চন্দ্র আবার কহিল, আমাদের পুরুত এলে আমিও দাঢ়ি ছিঁড়ে লেঙ্গা । ধর্মের নিকুঁচি । যতসব চালবাজি শালাদের ঝাগড়া লাগানোর ।

আজহার এতক্ষণে মুখ ঝুলিল, এই পাগল চন্দ্র ।

ঝাঁকড়া-চুল মাথা নাড়িয়া চন্দ্র পদবী গ্রহণ করিল । তারপর আমজাদের দিকে চাহিয়া সে বলিল, চাচা, তোমার বাবার দাঢ়ি ছিঁড়ে লেঙ্গা ।

তিনজনে দম ভরিয়া হাসিতে থাকে এইবার ।

আজহার জিজাসা করিল, চন্দ্র, তোমার হয়েছিল কি এতদিন?

ভূতে ধরেছিল ।

একদম মাঘ্ন্দো ভৃত ।

হ্যাঁ, খী ভাই ! আমার চোখ খুলে গেছে কাল ।

কাল !

হ্যাঁ ।

হঠাৎ শুন্ধ হইয়া যায় চন্দ্ৰ । তার মুখ্যবয়বে থৰথৰ কম্পন দেখা যায় । অশ্বসজল চোখ ।

আজহার ভাবে, কি হইল চন্দ্ৰেৱ । এ আবাৰ কোন্ৰ রকম পাগলামি ! এতক্ষণ ত সে হাসিতেছিল ।

চন্দ্ৰ পাথৰ । তার চোখ দিয়া অশ্বৰ ফোটা ঝিৱিতেছে ।

কি হোল, চন্দ্ৰ ?

আজহার নিকটে আসিয়া সম্বয়থা মাখা দুই হাত বাড়াইল ।

কি হোয়েছে ?

শালতরু যেন শিলীভূত ।

কি হয়েছে ?

শিবু, ইসমাইল সদৱেৱ হাসপাতালে মারা গেছে ।

মারা গেছে ।

আজহারেৱ মুখে আৱ কোন কথা নাই । সেও বজ্জাহত, শুন্ধ হইয়া গেল ।

জলকৰ লইয়া দাঙ্গাৰ সময় শিবু ও ইসমাইল বেশঞ্জখম হইয়াছিল । সদৱ হাসপাতালে ছিল তাৱ এতদিন । দুইজনে খুব পৰিচিত বন্ধু ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকে তিনজন সন্ধ্যার কালিমালেপন শুন্ধ হইয়াছে দিক-দিগন্তৰে ।

ফোপাইয়া উঠিল চন্দ্ৰ, ওদেৱ বাঢ়িতে কি কান্না । শিবুৰ বৌ ছেলেপুলে নিয়ে হয়ত না খেয়ে মৱবে । ৱোহিণী আৱ হাতিম শালাৰ কি আসে যায় । আমাৰ চোখ খুলে গেছে কাল সদৱেৱ হাসপাতালে ।

ফোপাইতে থাকে চন্দ্ৰ, কথা শোষ হয় না ।

আজহার নিৰ্বাক । চন্দ্ৰ আৱ কোন কথা বলিল না, নিৰ্জীবেৱ মত বসিয়া বহিল ।

সন্ধ্যাৰ অন্ধকাৱে আৱ কাহারও মুখ দেখা যায় না । নিষ্ঠকৰ্তা প্ৰথম ভাঙ্গিয়া আজহার বলিল, চলো চন্দ্ৰ, বাড়ি চলো ।

চন্দ্ৰ কোন জবাৰ না দিয়া উঠিয়া পড়িল । আৱ কোন বাক্যালাপ কৱিল না মাত্ৰ । সে মাঠেৱ পথ ধৱিয়াছে ।

পিতা-পুত্ৰ হতবাক । তাহাৱা গ্ৰামেৱ পথে অগ্ৰসৱ হইল । আমজাদেৱ অবোয়াস্তি, বহুদিন পৱে চন্দ্ৰ কাকাৰ সঙ্গে দেখা । কিন্তু সন্ধ্যাটি আজ মাঠেই মারা গেল ।

কাঠা দশেক জমি পাৱ হইয়া আমজাদ শুনিতে পায় চন্দ্ৰ কোটাল যেন গান ধৱিয়াছে আজহার বলে, সত্যি পাগল চন্দ্ৰ । তাড়ি গিলেছে বোধহয় ।

না, আৰু । মুখে গন্ধ নেই একদম ।

সায়ং-আচন্ন মাঠেৱ প্ৰান্তৰে মেঠো সুৱ বাতাসেৱ আলিঙ্গনে ভাসিয়া যায় । আমজাদেৱ শ্ৰতিভ্রম মাত্ৰ ।

ভগবান, তোমার মাথায় ঝাঁটা,
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা
যে চেয়েছে তোমার দিকে
তাই চোখে লঙ্ঘা বাটা।
ও তোমার মাথায় ঝাঁটা॥

আমজাদের কান সুরের অব্বেষণে চলে ।

হঠাৎ সে জিজাসা করিল, আবৰা, ভগবান মানে আল্লা, না?
আজহার ঠাণ্ডা কঢ়ে জবাব দিল, হ্যাঁ ।

২৬

হাসুবৌ আজকাল প্রায়ই দরিয়াবিবির খৌজ লইতে আসে । শাতভীর কড়া তাগিদের তাড়া
না আসিলে এই বাড়ি হইতে যাওয়ার নাম করে না সে ।

আমজাদ মোনাদিরের খবর লইয়াছিল । সে তার আগেকার বাড়িতে যায় নাই ।
দরিয়াবিবি এ খবর জানে না । হাসুবৌ আমজাদকে তাহা বলিতে বারণ করিয়াছিল । পাছে
তার মা আরো ব্যাকুল হইয়া পড়ে । আমজাদ তাই ফির্খ্যা কথা বলিয়াছিল । সে ওই গাঁয়ে
আছে, মা ।

হাসুবৌ গোপনে আমজাদের উপর ভার দিয়াছে, মুনির খবর আনা চাই-ই কিন্তু ।
হাসু চাটী, আমি আরো কয়েকজনকে তাগিদ দিয়েছি । এই ষড়যন্ত্রের কোন খৌজ দরিয়াবিবি
রাখে না । সে চলিয়া গিয়াছে, তা যাকুন কোন উপায় ত আর নাই । তবু আজ্ঞায়দের সঙ্গে
আছে, দরিয়াবিবির বুকে যেন বাঁধি থাকে সে ।

হাসুবৌ জিজাসা করিল, আমুর মা বুবু, তোমার নৃতন মেয়েটি কিন্তু বেশ । আমাকে
দিয়ে দাও, আমার ত ছেলেমেয়ে নেই ।

তা কি দেওয়া যায়, পাগলী ।

আমার কত সাধ একটা ছেলে— কানা খৌড়াও যদি একটা ছেলে কি মেয়ে পেতাম ।

দরিয়াবিবি এই বক্ষ্যা-নারীর ব্যথা অনুভব করে ।

আল্লা দিলে হবে । তোর বয়স ত চলে যায় নি ।

দীর্ঘ নিঃশ্঵াস ফেলিল হাসুবৌ নীরবে ।

এমন সময় আসিল আমিরন চাটী । সঙ্গে আমিয়া ।

দরিয়াবিবি খুব খৃশি হয়, এসো বুবু ।

কৈফিয়ৎ দিতে থাকে আমিরন চাটী, “এতদিন পরে আজ একটু ফুরসৎ পেয়েছি
‘জান্’-বালাপালা কাজে কাজে ।”

আসলে আমাদের মনে নেই ।

দরিয়াবিবি কৃত্রিম ও কুটিল হাসির ছায়ায় চাহিয়া থাকে ।

তুমি ত বলবেই দরিয়াবুবু! সত্য নান ঝঝাট ।

পেটে আর ভাত সেঁধোয় না ।

কেন?

তারপর আমিরন চাচী তার দেবরের কাহিনী বলে। জমিগুলি হস্তগত করিতে সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তিন-চার বছর পরে আমিয়াকে বিদায় করিতে এই জমিগুলি কাজে লাগিত। হয়ত জমি দেখাইয়া কোন ঘর-জামাই পাওয়া যাইত। ওই ত এক রন্ধি মেয়ে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভিটায় বাস অসম্ভব।

দরিয়াবিবির সহানুভূতি আজও হাস হয় না ।

আমিয়ার জন্য অত মাথা ঘামিয়ো না। আল্লার মাল আল্লার হাতে সঁপে দেবে। কিন্তু তোমার দেবরটা এত ছোটলোক!

আর ঘরে বসে থাবে কী? পরের দিকে চেয়ে আছে শুকুনের মত।

আমিয়া মা'র পাশে ছিল না। আমজাদের সহিত সে দাওয়ার বাহিরে কাঁঠাল তলায় নানা কথায় ব্যস্ত।

মুনি আর এলো না?

আমজাদ বির্মৰ্ষ কষ্টে জবাব দিল, সে চলে গেছে কি-না। মা এখনও তার জন্য কত কাঁদে।

কবে যে আবার আসবে। তোর মুনিভাই কিন্তু বেশ।

বেশ, না?

হ্যাঁ।

মুনিভাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে না।

খোঁজ করে নিয়ে আয় না তাকে।

খোঁজ নিয়েছি।

আসল কথা প্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। হাসুবৌর উপদেশ স্মরণ হয় অক্ষম্মাণ।

কথা ঘুরাইয়া আমজাদ বলে, খোঁজ নিয়েছি। আসবে ইচ্ছামত।

আমিয়া জবাবে সন্তুষ্ট হয় না।

তুমি বড় মিছে কথা বলো। খোঁজ নিলে আর আসে না?

সে আসতে চায় না।

তার মুখে পড়া বেশ মানায়।

মোনাদির সকল প্রশ্ন ও জবাবের কেন্দ্র। আর যেন কোন কথা নাই প্রথিবীতে।

আমিরন চাচী, হাসুবৌ, দরিয়াবিবি গৃহস্থালির নানা গল্প করে। দুঃখ-লাঘবিনী শক্তি আছে কথার। একের বেদনা-কাহিনী অপরের দুঃখাগ্নির মুখে ছাই চাপা দিতে পারে। সহানুভূতির হেতু আরো আটুট হয় তার জোরে।

হাসুবৌকে আমিরন চাচী বলে, হতভাগি, ছেলেমেয়ে চাস, এই দ্যাখ, আমরা পুড়ে মরছি।

এমন পুড়ে মরতেই বা জায়গা পাই কোথায়?

দরিয়াবিবির মন কয়েকদিন ভাল ছিল। নিত্যনৃতন অভাব-বিজড়িত সংসারে যেন

সামান্য সচ্ছলতার হাওয়া দুকিয়াছে । গঞ্জে গঞ্জে সময় কাটিয়া যায় । আবিয়া এই বাড়ি
আসিলে আর যাইতে চায় না । ।

প্রায় সন্ধ্যা । এবার বাড়ি ফিরিতে হয় । মা'র ডাক আবিয়ার কানে যায় না ।

তুমি যাও না, মা ।

তুই এই বাড়িতে থাক তবে, বুবুর বৌ হয়ে ।

দরিয়াবিবি কিছুক্ষণ আগে তার গোপন-মনে এমনই কল্পনার দুর্গ রচনা করিয়াছিল ।
মোনাদির আর চার বছরে শোলয় পড়িবে । তখন—

আমিরন চাচীর কথা শুনিয়া দরিয়াবিবি হাসিয়া উঠিল ।

বেশ, রেখে যাও ।

আমার গায়ে হাওয়া লাগে । খাইয়ে-পরিয়ে এখন মানুষ ত করো ।

হাসুরো কথা গায়ে মাথিয়া লইল ।

আমাকে দাও, আমি খাওয়াব-পরাব ।

বেশ, নিয়ে যা ।

আয়, আবিয়া আয় না, মা ।

সাকেরের মা'র চড়া আওয়াজ দূর হইতে শোনা যায় । হাসুরো চলিয়া গেল ।

আমজাদ চাচীদের আগাইয়া দিতে আসিল । মা'র বারণ সে শোনে না । তার আর
ভূতের ভয় করে না । চন্দ্র কাকার গানের ঢেউয়ে সরুকেথায় ভাসিয়া গিয়াছে । হোক না
সন্ধ্যা ।

অস্পষ্ট বনের সড়কে মা-মেয়ে সন্তর্পণে ভুঁসে রহ হয় । আমজাদ কিছুদূর গিয়া থমকিয়া
দাঁড়াইল ।

সন্ধ্যার আঁধার-বন্দী বাতাস বেত্তগাছে শিরশির বহিয়া যায় । সেদিনও সন্ধ্যা ছিল ।
সেদিন মুনিভাই সঙ্গে ছিল । হঠাৎ তার দুই চোখ ছাপাইয়া পানি আসে । মুনিভাইকে সে
সত্য ভালবাসিয়াছিল ।

২৭

চন্দ্র কোটালের অবসর নাই ।

এই বছর ভাল ফসল হইয়াছিল । গ্রামে গ্রামে ভাঁড়-নাচের আসর বসে । অনেক
বায়না কোটালের । রাজেন্দ্র সাজ-পোশাক আনিয়াছিল । বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে তার
দল জমিয়া উঠিয়াছে । এই জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ডাক আসে ।

আজহার নৃত্ন ব্যবসা-পন্থনের সঙ্গী পায় না । কোটালও তাকে কিছুদিন সবুর করিতে
বলিল । মনঃক্ষণ হয় আজহার । হয়ত পরে তার হাতে টাকা থাকিবে না । সে নিজেই কোন
সুরাহা করিবে ।

গঞ্জের দিনে ইয়াকুব আসিয়াছিল । সেও প্রসঙ্গ উথাপন করিল । আজহার তার কথায়
সায় দেয় না । ইয়াকুব একা আসে না ত । সঙ্গে হাট-বাজার । মুরগি, ঘী এমনকি সরু চাল
পর্যন্ত সে লইয়া আসে । আজহার এসব পছন্দ করে না । তার আঘাসম্মানে ঘা লাগে ।

এইজন্য ইয়াকুবের সঙ্গে কোন অংশীদারী কাজ তার ভাল লাগে না।

দরিয়াবিবি আজকাল ইয়াকুবের চাল-চলন সহজে ঘুণ করে। তার আত্মসম্মান সহজে তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে না। আপনজন আঢ়ায়, সে কিছু সঙ্গে আনিলে, অত সংবেদনশীল হইলে চলিবে কেন?

আজহার চৃপচাপ থাকে। মেহমানদারীর কাজে দরিয়াবিবির বেশ উৎসাহ দেখা যায়। বহুদিন পরে এই বাড়িতে পলান্নের সৌরভ পাওয়া গেল। আরো দু'তিন রকমের তরকারী হইল। ইয়াকুব লুটি তৈয়ারী করিতে বলিয়াছিল। দরিয়াবিবির সম্মতি ছিল না। কাল সকালে নাস্ত্রার সময় তৈয়ারী হইবে। বাড়ির ছেলেরা ইয়াকুবের নামে উৎফুল্পন্ত হইয়া ওঠে। ইয়াকুব চাচা নামে মধু ঝরে না শুধু, নষ্টিমার জিহ্বায় রীতিমত লালা ঝরে।

আমজাদের স্কুলের বেতন সে নিয়মিত দিয়া আসিতেছে।

কয়েক বছর পূর্বে দরিয়াবিবি সামান্য দান-ঘৃণে আসেক্জানের সহিত বিবাদ করিত। সেই তেজ অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বামীর মানসিকতা সে চেনে। আজহারের উপর তার ক্ষেত্রে হ্রাস পায় না। আঢ়ায়-স্বজনের সহিত অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম চলে না।

রাত্রে আহারের সময় আজহার ডাল ও দৈনন্দিন বরাদ একটি আলুর তরকারী দিয়া ভোজ সমাধা করিল। মাঞ্চুর মাছ আনিয়াছিল ইয়াকুব। সে তা স্পর্শ করিল না।

দরিয়াবিবি শুধায়, গোশ্চত খাবে না?

না, আমার পেটের গোলমাল আছে।

আসলে আজহার মনের কথা চাপিয়া গেল। ইয়াকুবের কয়েকটি টাকা সে লইয়াছে তাহা যেন তার গায়ে হল ফুটাইতেছে। টাকা ফেরত দেওয়ার উপায় নাই। তার স্বপ্নরাজ্য যে ধূলিসাঁৎ হইয়া যায় টাকাগুলির অভাবে এই বাধ্য-বাধকতার ছায়ায় আজহার নিরূপায়। নচেৎ সে ইয়াকুবের মুখোমুখি এই স্বত্ত্বব্যগিরি বন্ধ করিবার হকুম দিত।

দরিয়াবিবি কোথায় ঘা দিতেইয়, ভালুকপেই জানে।

রাত্রে স্বামীকে বলিল, আমুর ইস্কুলের মাইনে মাসে মাসে দিতে হয়েরান। সামনে বছর ফসল যদি না হয়, কিভাবে যে দিন কাটবে।

আজহার কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল।

জবাব দাও, এসব কথা মনে আছে! খালি ব্যবসা-ব্যবসা। কতবারই কত টাকা উড়িয়ে দিলে।

আল্লার মরজী হলে কতক্ষণ।

বিরক্ত হয় দরিয়াবিবি, আল্লার মরজী মরজী করে ত দশ বছর কেটে গেল। এখন তোমার মরজী হলে বাঁচা যায়।

আজহার জবাব দিতে গিয়া থামিয়া গেল।

ইয়াকুব ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করো না। দেখো না, আল্লার মরজী কোন্ দিকে যায়। ওর সঙ্গে ব্যবসা পোষাবে না।

তা পোষাবে কেন?

দরিয়াবিবি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজহারের নিরুদ্ধিতার শত রকম ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু অপর পক্ষ নীরব। আনমনা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে জানে না।

পরদিন সকালে আবার নাস্তাৰ বহুৱ। ইয়াকুব দৱিয়াবিবিকে তাৰ বাংসৱিক মুনাফাৰ বয়ান দিল। তিন হাজাৰ টাকা পাইয়াছে পাটে, গোলদারীৰ দোকানে দু'হাজাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাস্তা খাওয়াৰ সময় আজহারকে পাওয়া গেল না। সে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। গোয়াল-ঘৰে গৱৰ্ম-ছাগল কিছু নাই। দৱিয়াবিবিৰ অনুমান মিথ্যা নয়।

ইয়াকুব বলিল, ভাৰী সাহেব, কেমন যেন আমাদেৱ ভাই সাহেব। আমাৰ সঙ্গে কাজকৰ্ম কৱত, আল্লা মুখ তুলে চাইতেন।

মাথায় ছিট আছে। কে পাৰবে বলো ওৱ সঙ্গে।

আপনাৰ মত আকেল থাকলে আমি এতদিনে লাখপতি হয়ে যেতাম।

প্ৰশংসায় সন্তুষ্ট হয় দৱিয়াবিবি। দেবৰকে সে পান সাজিয়া দিতেছিল। বাটায় সুপারি নাই। একবাৰ উঠিল দৱিয়াবিবি— সিকায় সুপারি আছে। ঘৰে প্ৰবেশেৰ সময় সে একবাৰ পিছন ফেৰে। ইয়াকুব তাৰ গমনপথ অথবা নিতম্বেৰ দিকে চাহিয়া আছে, বোৰা যায় না। কিন্তু তাৰ দৃষ্টি খুব শোভন মনে হয় না।

পানেৰ বাটাৰ নিকট ফিরিয়া আসিল দৱিয়াবিবি সংকুচিত।

চোখাচোখি ইয়াকুবেৰ দিকে সে তাকায়। না, তাৰ দৃষ্টিভ্ৰম। আসলে ইয়াকুবেৰ দৃষ্টি যেন এইরূপ।

অবসৱ সময়ে তাৰ মনে আন্দোলন জাগে। ঝিসলে লোকটা খারাপ নয়। তবে আমাৰ্জিত রঞ্জিৎ। এই জাতীয় দ্বন্দ্বেৰ ভিতৰ দৱিয়াবিবিৰ সমস্যাৰ সমাধান যোজে। ব্যবসাদাৰ লম্পট সম্বন্ধে দৱিয়াবিবিৰ কোন জ্ঞান ছিল নাহি। আজহার তাৰ গুণগ্ৰামেৰ হদিস জানিত বলিয়া দূৰে দূৰে থাকিত।

সেদিন সকালেই ইয়াকুব চলিয়া গেল। দুপুৱেলা বিছানা পৰিষ্কাৰ কৱিতে গিয়া বালিশেৰ নীচে একটি দশ টাকাৰ সোটি পাইল, দাঢ়াইয়া রহিল দৱিয়াবিবি কিছুক্ষণ শৰ্ক। শৰ্কিৰ মধ্যে নোট আজানিতেই সে দুমড়াইতে থাকে। সচেতন হইলে সে সংকুচিত নোটটি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিল।

মাঠেৰ সামান্য কাজ কৱিয়া আজহার চন্দ্ৰ কোটালেৰ বাড়ি গিয়াছিল। সে বিকালে গানেৰ বায়নায় যাইবে। সাজেগোজ হইতেছে সকা঳ে।

চন্দ্ৰ আজহারকে বসিতে দিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। শিবুৰ বৌ আগে আসিয়াছিল। একটি বছৱ চার বয়সেৰ ছেলে মা'ৰ অঙ্গসংলগ্ন হইয়া আঙ্গুল চুষিতেছে। কাঁখে আৱ একটি মেয়ে।

আজহারেৰ চোখে পড়িতে শিবুৰ বৌ ঘোমটা বাড়াইয়া দিল।

কেমন আছো, বৌ।

বৌ অশুসজল কঢ়েই জবাৰ দিল, তগবান মেৰেছেন। আমাদেৱ আৱ থাকাথাকি, চাচা।

শিবু আজহারকে চাচা বলিয়া ডাকিত। সেই সুন্দে এই আঘীয়তা।

আজহার সমবেদনাৰ কোন কথা যেন খুঁজিয়া পায় না। দীৰ্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। শিবুৰ বৌৰ কানে তা পৌছায়।

চন্দ্ৰ এমন সময় কলিকা হাতে আজহারের পাশে আসিয়া বসিল।

দেখেছ ত খী সাহেব। এই তোমার-আমার ধৰ্ম।

তা দেখছি।

দেখছ। ঘোড়াৰ ডিম দেখছ। ধৰ্ম না কচু। হাতেম বখশ যদি মুসলমান হয়, কি
ৱেহিণী হিন্দু হয় তবে চণ্ঠাল কে?

দেখছি সব।

তুমি কিছু দেখতে পাও না, খী। টাকার নামে শালারা ধাৰ্মিক। খামাখা দুটো গৱীবের
প্রাণ গেল।

শিবুৰ বৌকে সমোধন কৱিয়া বলিল, তুমি গিয়েছিলে মা, ৱোহিণী চৌধুৱীৰ কাছে?
গিয়েছিলাম, পাঁচটা টাকা দিয়েছিল।

বড় শ্ৰিয়মান কষ্ট শিবুৰ বৌৰ।

শোনো, খী। পাঁচ টাকা। অমন টাকায় মুতে দাও। একটা লোকেৰ দাম পাঁচ টাকা।
আজহার ভাই, গৱীবে গৱীবে যদিন বেঁচে আছি, আৱ ধৰ্মেৰ কথা কানে আনছি না।
আমিও ৱোহিণীৰ ফাঁদে পড়েছিলাম। শালা ৱোহিণী।

গালাগাল দিয়ো না খামাখা।

গালাগাল দেব না। তুমি শিবুৰ বৌকে খাওয়াতে পারবে? ধৰো, খাওয়াতে পারলে,
কিন্তু ওৱা স্বামীকে জ্যান্ত কৰে দিতে পারবে? গালাগাল দোব না—?

ৰক্ষচক্ষু কোটাল হুকা টানিতে লাগিল।

শিবুৰ ছেলেটা দুইজনেৰ দিকে অবোধ নিয়ে চাহিয়া থাকে।

গালাগাল দোব না। ইসমাইলেৰ বৌ ছেলেপুলে নিয়ে বাবাৰ বাড়ি চলে গেল। তাৱাও
গৱীব। তুমি ত চেন দশহাটাৰ মণ্ডিকেন্দোৰ।

হঁ চিনি।

শিবুৰ বৌৰ কেউ নেই। তাৱ চালে খড় নেই দু'আঁটি। বলছি, বৌ এখানে এসে
থাক। আমি আৱ একটা কুঁড়ে তুলব। গায়েৰ বাসেদ, পাঁড়, গণেশ সবাই গায়ে-গতৱে
খেটে দেবে বলেছে।

আজহার বলিল, যখন যা দৱকাৱ আমাকে ডেকো।

তা আলবৎ ডাকব। হাতেম বখশেৰ গুষ্টিশুন্দু শহৱে মদ টানে, সে মুসলমান, তুমিও
তাৱ কথায় উঠো বসো, না?

তুমিও ত ৱোহিণীৰ কথায় নেচেছিলে?

লজ্জিত কোটাল জবাব দিল, তা ঠিক। কিন্তু আৱ নয়। শালাদেৱ ধৰ্মেৰ নিকুঠি। আৱ
আজহার ভাই, তোমার মিন্মিনে স্বভাৱ আমার ভাল লাগে না। জোৱ গলায় বুক ঠুকে
ওদেৱ কাছে কথা বলতে হবে।

ওৱা বড়লোক। পুলিশ-দারোগা—।

কথা তাৱ মুখ হইতে চন্দ্ৰ যেন লুফিয়া লইল, আইন নেই? আমৱা ত দু'চাৰজন
নই। গায়েৰ হাজাৰ হাজাৰ গৱীব। পুলিশ যদি আইনমত না চলে, ওদেৱ কথায় ওঠে-
বসে; আমাদেৱ লাঠি নেই, বল নেই—?

ভাঁটার মত দুই চক্ষু ঘোরে কোটালের ।
হঠাতে থামিয়া সে বলে, কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল, অনেক গোছগাছ বাকী । পরে
এসো তুমি । শিরু বৌমা, এখানে খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি যেয়ো—
দুইজনে আসর ভাঙ্গিয়া দিল ।

আজহার গ্রামের পথে শিরুর বৌর কথা ভাবে । ভবিষ্যতের সংস্থান তারও নাই ।
একমাত্র আশ্রয় পথ । না, সে আবার ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইবে । টাকার জন্য এত
হীনতা যখন স্বীকার করিয়াছে, ঘরে পড়িয়া থাকা ভাল নয় । কপাল ফিরিবে না তার?
খোদার মরজী হইলে কতক্ষণ !

২৮

সকাল-সকাল দরিয়াবিবি গৃহস্থালির কাজ সারিয়া বসিয়াছিল । কোলে ছোট খুকী শরী ।
ঈৎৎ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল । আমজাদ নিজের ঘরে জোরে জোরে পাঠাভ্যাস
করিতেছে । আজহার দাওয়ায় বসিয়া ছাঁকা লইয়া মশগুল । শুড়ে শুড়ে উঠিতেছে ।

মুনির মা!

আজহার ডাক দিল । মোনাদির আসিবার পর দরিয়াবিবির নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছিল
সে । কালেভদ্রে আমুর মা বলিয়া ডাক দিত ।

কেন?

আজ ওদিকের গায়ে গিয়েছিলাম ।

কেন?

বীজ ধান কেনা দরকার ।

উত্পন্ন কষ্ট দরিয়াবিবির, তা আমাকে শোনানোর কোন দরকার আছে?

না । এমনি— ।

আজহার চুপ করিয়া গেল । কিন্তু তার কথার খেই শেষ হয় নাই, কর্ত্তে তার পরিচয় ।
কিছুক্ষণ স্তুক থাকিয়া হঠাতে সে বলে, ও গায়ে গিয়েছিলাম, শুনলাম মুনি নাকি— ।
দরিয়াবিবি উৎকর্ণ হয় এইবার ।

আজহার বলিতে থাকে : মুনি, ওগায়ে নেই ।

নেই!

শ্রুতি-ভ্রমের উপর এখনও বিশ্বাস আছে দরিয়াবিবির ।

পুনরুক্তি করিল, কে নেই?

মুনি ।

মুনি ও-গায়ে নেই?

না ।

কতদিন নেই!

এখান থেকে যাওয়ার পর আর নাকি ওধানে যায় নি ।

আমজাদের ডাক পড়িল । সে পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল ।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করে, আমু, তোর মুনিভাই তবে যে তার চাচার বাড়িতে আছে,
আগে বলেছিলি?

আমি ত তাদের বাড়ি যাইনি। শুনে এসেছিলাম।

দরিয়াবিবি ক্ষোভে আগুন হইয়া উঠে, শুনে এসেছিলি—।

তারপর পুত্রের দিকে কট্টমট্ চোখে তাকায়।

আমজাদ প্রায় কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম। নিজের সাফাই সে দক্ষ আসামীর মত
গাহিয়া গেল। আজহারের আফশোস বড় কম নয়। নিজের উপর বারবার ধিক্কার দিতে
লাগিল।

আমার চগাল মেজাজে সেদিন আগুন ধরেছিল। এই হাতে ‘আজার’ হোক।

দরিয়াবিবি আর কোন কথা বলিল না। কারো বাক্যালাপ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ
করিতেছিল কি-না সন্দেহের ব্যাপার।

সমগ্র দাওয়া স্তুর এক নিমেষে।

আমজাদ পা টিপিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তার পাঠ্যাভ্যাস নিভিয়া গিয়াছে।
কঠিন্যর শোনা যায় না। আজহার ইঁটুর ভিতর মুখ উঁজিয়া বসিয়া রহিল। দরিয়াবিবি কখন
শরীরকে লইয়া উঠিয়া গিয়াছে, তার খোঁজও সে রাখিল না। সেই অবস্থায় সে ঘূমাইয়া
পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙার পর তার অচেনা ঠেকে সব জায়গা। দাওয়ায় পিদিম নাই। উঠানে
অঙ্ককার আর অঙ্ককার। একরাশ ঝি ঝি উর্ধ্বশাসে জাকিতেছে। আজহারের মন্তিকে তার
অনুকরণ চলে। সন্ত্রিপ্তে সে ঘরের দুয়ারে করাষ্ট্যান্ত করিল। না, সব বন্ধ। আমজাদের
ঘরও খোলা নাই। অভুক্ত সকলে ঘূমাইয়া পড়িয়াছে। সেও ঘূমাইয়া পড়িল দাওয়ায় মাদুর
পাতিয়া।

পরদিন খুব ভোরে আজহার মাটে চলিয়া গেল।

দরিয়াবিবির ডাকে আমিরন চাটী হাজির হইল পরদিন। মুনির খোঁজ গ্রহণের সে
প্রতিশ্রুতি দিল।

বিকালে আমিরন চাটী হতাশ। সংবাদ দিয়া গেল মুনি চাচার বাড়ি যায় নাই। ভয়ানক
কান্না জুড়িল দরিয়াবিবি। কারো স্তোক বাক্যে তা থামে না। হাসুবৌ আসিয়াছিল। তারও
চোখের পানি সহজে থামে না।

ও যদি একদম আর এ বাড়ি না আসত আমার দুঃখ ছিল না। কিন্তু এলো, আমি
তাড়িয়ে দিলাম—।

দরিয়াবিবি ফৌপাইতে থাকে।

বেটাছেলে, কোথাও গেছে। আমি আরো খোঁজ নিছি। আশ্বাস দিল আমিরন চাটী।

আর সে ফিরে আসবে! কোথা গেল, অতটুকু কঢ়ি ছেলে।

আমি গণৎকারের কাছে শুনিয়ে আসব। কোন্ দিকে গেছে, কবে ফিরে আসবে ঠিক
বলে দেবে, সেবার আমার বোনের দেবর এমনি—।

আমিরন চাটী নিরুদ্ধিষ্ঠি ব্যক্তির প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বলিল।

দরিয়াবিবি আশ্বস্ত হয় না, তবু অনুরোধ করিল, আমি পাঁচ পয়সা দেব, বোন।
পাঁচ পয়সা আর একটা সুপারি লাগে।

আমিরন চাটী জবাব দিল ।

তুমি এখনই নিয়ে যাও ।

আমিয়া বাড়িতে আছে, আমিরন চাটী আর দেরী করিতে পারে না । সক্ষ্য হইয়া গিয়াছিল । বেশ অঙ্ককার চারিদিক । বন-বাদাড় ভাঙিয়া যাইতে হইবে ।

পয়সা, সুপুরি আমি দেব । মুনি আমার ছেলে নয় নাকি? চাটীর সহানৃতি অক্ষিম । হাসুরো ও আমিরন চাটী বিদায় লইল ।

আজহার মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল । আমজাদ শুধু সে সংবাদ জানে । থমথমে আবহাওয়ার জন্য পিতাকে একবার দেখিয়া সে নিজের ঘরে ডিপার আলোয় চুপিচুপি পড়িতেছিল । কিন্তু পড়ায় তার কোন মন ছিল না ।

দরিয়াবিবি সকলে চলিয়া গেলে আমজাদের ঘরে আসিল ।

আমু ।

মা ।

কাল ও গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবি । আর একবার গঞ্জের দিকে যাস ।

আচ্ছা, মা । মুনিভাইয়ের জন্য আমারও মন ক্ষেমন করে ।

সত্যি সজল হইয়া উঠে আমজাদের চক্ষু ।

তোর আবৰা মাঠ থেকে আসে নি?

এসেছিল ত । খানিক আগে দেখেছি ।

ডিপা হাতে দরিয়াবিবি ঘরে প্রবেশ করিল । সাঁচের আলনায় আজহারের লুঙ্গি-পিরহান কিছু নাই । কাটা দেওয়ালের গায়ে একটি ক্লিন্সুসী ছিল । আজহারের সূতা-কন্ধি-পাটা উষ্মা ও যাবতীয় রাজমিট্রীর সরঞ্জাম থাক্কিত । সব শূন্য ।

দরিয়াবিবি চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইল এবং সবকিছু নিমেষে উপলক্ষ্য করিল ।

২৯

তোমার বাবা আবার রক্ষি-পোনা ধরতে গেছে । চুনো চানা খেয়ে কি খীসাহেবের দিন কাটে? জানো, চাচা?

চন্দ্র ও আমজাদের মধ্যে বাক্যালাপ হইতেছিল । হাসিয়া হাসিয়া কোটাল কথাগুলি উচ্চারণ করিল । দরিয়াবিবি দহলিজের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে, চন্দ্রের তা খেয়াল ছিল না । তার মুখের হাসি তখনই নিভিয়া গেল ।

দরিয়াবিবি চন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়াছিল । আমজাদ জানে, বিপদে আপদে মা প্রথমে চন্দ্র কাকার কথাই মনে করে । পুত্রের মারফৎ এতক্ষণ অনেক কথাই দরিয়াবিবি তাহাকে শোনাইয়াছে ।

তাই ।

হাসি চাপা দিতে চন্দ্র কোটাল আবার উচ্চারণ করিল, তাই ত ভাবী সাহেব । এমন মানুষ আমি আর একটা দেখিনি । মাঝে মাঝে কি যেন ঝোক চাপে! দুঃহঙ্গা গেল । মানুষ একটা খবর ত দেয় । তা-ও না ।

দরিয়াবিবির দীর্ঘশাস কোটালের কানে যায়। চন্দ্র সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। আবহাওয়া হালকা করিতে সে উত্তুদ। কিন্তু সেও কেমন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

আমজাদ বলিল, জানো কাকা, আবো আমাদের দেখতে পারে না। তাই বাড়ি ছেড়ে পালায়।

চন্দ্র প্রতিবাদ জানাইল, তা না, চাচ। খেয়ালী মানুষ। সংসার নিয়ে কষ্ট পায়। তাই মাঝে মাঝে ঐ সব করে। ভাবে দুঃখ যাবে। কিন্তু দুঃখ কি সহজে যায়? বিটিশ রাজত্ব। আগে বিটিশ যাক, রোহিণী-হাতেম বখশ ঐ শালারা যাক, তবে না দুঃখ যাবে।

আমজাদ এত কথা বোঝে না।

সে সায় দিতে রাজি নয়। পিতার প্রতি তার আক্রোশ আছে।

কিন্তু ব্যাপার কি জানো, তোমার বাবা—। চন্দ্র কোটালের বাক্য আড়াল হইতে পূর্ণ করিল দরিয়াবিবি, ‘চুপ শয়তান’।

চন্দ্র এবার হাসিল। সে যেন আস্থ হইয়াছে। ঠিক বলেছেন ভাবী। আমার মনে যা হয়, মুখে তা বলে ফেলি। কিন্তু খী ভাই? উহ জান গেলেও বেশি কথা বলে না। যদি কারও হাজার টাকায় ‘চুপ শয়তান’ দরকার হোত, আমি তোমার বাবাকে বেচে দিতাম বাবা। চন্দ্র হা হা শব্দে হাসিতে লাগিল। আমজাদ সঙ্গে যোগ দিল।

এমন সময় ভিতর হইতে ধমকের সুরে দরিয়াবিবি ডাকিল, আমু, তোর কাকাকে জমির কথা জিজেস করু।

দুই জনের হাসি হঠাৎ বন্ধ হইল। আমজাদ নেয়, জবাব দিল কোটাল।

ভাবী সাহেব, তার জন্য আপনি ঘাবড়ান্তেন না। ধান আমি নিজে কেটে দেব। এবার খড়ের দাম খুব বেশি। মানুষ ঘরদোর ছাঁওয়াচ্ছে। পনর-ঘোল টাকা কাহন। আমি ভাবছি, খড় কিছু রেখে বাকী বেচে দেব।

কাহন খানেক রেখে দেবেন মৃদুকষ্টে দরিয়াবিবি জবাব দিল।

চন্দ্র আবার বলিল, শুধু ধান কাটা নয়, তরমুজ আর কুমড়া বিষে খানেক জমিতে দেব ভাবছি। কিন্তু আমার আসর গানের বায়না আছে। আমজাদ চাচ আছে, দেখি কি বন্দোবস্ত করা যায়।

দরিয়াবিবি এবার আমজাদকে ডাকিয়া বলে, আমু, তোর চাচকে পান তামাক এনে দে।

ঘোর আপত্তি জানাইল চন্দ্র। না, এখন কিছু দরকার নেই। আমি আজ উঠিং, ভাবী সাহেব। আমার ক্ষেতে অনেক কাজ পড়ে আছে। সত্যই চন্দ্র কোটাল উঠিয়া পড়িল। আমজাদ তার অনুসরণে গেল। মহেশ্বরাঙ্গার জলাজঙ্গল ভরা পথে পথে চন্দ্র কাকার সহিত বেড়াইতে পাইলে সে আর কিছু চায় না। কত হাসির গান, মশকরা আর প্রাণ ঢালা আদর না পাওয়া যায় চন্দ্রকাকার কাছ হইতে!

ভাবী সাহেব, ঘাবড়াবেন না— চন্দ্রের স্তোকবাক্যে দরিয়াবিবি জোর পায়, কিন্তু আসোয়াস্তি যায় না। গত বিশ বছর এমন কতবার ঘটিয়াছে। বার-ফাট্টা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যদি আর না আসে। দৈহিক শক্তি এতদিন দরিয়াবিবির সহায় ছিল। আজও স্বাস্থ্য তার আটুট। কিন্তু মন বড় নিষ্ঠেজ ও নিঃসঙ্গ।

আত্ম-চিত্তায় মশুগুল দরিয়াবিবি। উঠানে একটি ছাগলকে কঁঠাল পাতা থাওয়াইতেছিল। শরী দাওয়ায় চুপচাপ একা ঘূমাইয়া। সে বড় লঙ্ঘী মেয়ে, কেবল ক্ষুধার সময় কাঁদে। পেটভরা থাকিলে শুধু ঘূমায়। দরিয়াবিবি তাই বড় নিশ্চিন্ত, নির্বিশ্বে সাংসারিক কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। ছাগলগুলি দরিয়াবিবির বড় প্রিয়। প্রতি বছর বছর বাচ্চা হয়। ঈদ ইত্যাদি পর্ব উপলক্ষে লোকে ছাগল কেনে। তখন ছাগল বেচায় একটা আনন্দ আছে। দাম বেশি পাওয়া যায়, তা ছাড়া টানাটানির দিন একটু সহজ হয়।

এই প্রাণীদের লইয়া দরিয়াবিবি ব্যস্ত। আমিরন চাচী কখন ধীরে ধীরে উঠানে ঢুকিয়াছে তা সে লক্ষ করে নাই। পাতা খাওয়ানো ত একটা দৈনন্দিন কাজ। দরিয়াবিবি ছাগলগুলির দিকে ভালুকপে তাকায় নাই। কঁঠালের ডালপালা শুধু আগাইয়া দিতেছিল। মনে নানা হিসাব নিকাশের ঝড়।

আমিরন চাচী দরিয়াবিবির থম্থমে মুখের দিকে চাহিয়া রাহিল। পরে হঠাৎ মৃদুকষ্টে ডাক দিল, বুবু।

দরিয়াবিবির ঠোটে অভ্যর্থনামুখের হাসি।

কখন এলে?

তারও খৌজ নেই? কর্তবিরাগী, গিন্নীর মন এমন উদাস না হলে চলে— বলিয়া আমিরন চাচী হাসিয়া উঠিলেন।

দরিয়াবিবির মুখ আবার থম্থমে। আমিরন ছাটু^১ অপ্রস্তুত হইয়া যায়। দরিয়াবিবি সেদিকে চোখপড়া মাত্র সে ছাগলগুলিকে হাঁকাইয়ে দিয়া চাচীর কোমর জড়াইয়া বলিল, ঘরের ভিতর চলো বুবু। কি আমার কর্তা^২ তার জন্য আবার চিন্তা!

আমিরন চাচী সহানুভূতির সুরে জুবাই দিল, এমন লোক—।

কিন্তু যেন বাপ্টা দিয়া দরিয়াবিবি তার মুখের কথা নিভাইয়া দিল। চলো, পান খাই, দুটো কথা বলি।

নদীর ধারে বাস
দুক্ষ বারো মাস

রাখো বাজে কথা।

আমিরন চাচী দরিয়াবিবির সুখের কৃত্রিমতা কিছুই ধরিতে পারে না।

দুইজনে সত্যই কিছুক্ষণ আজেবাজে আলাপ করিল। গ্রামের কথা, পাড়া-পড়শীদের কথা। সাকের কোথায় দাঙ্গা করিতে গিয়াছে, হাসুবৌ শান্তড়ীর গঞ্জনা আজকাল অনেক বেশি শোনে, ইত্যাদি।

আমিরন চাচী কাজের লোক। গরু-বাছুর-হাঁস-মুরগী লইয়া সে এক রাজ্যের অধিশ্বরী। বেশিক্ষণ কথা-ফোড়নের সময় কোথায়? একটি খবর দিতে আসিয়া সে একক্ষণ সুযোগ খুঁজিতেছিল। হঠাৎ চাচী বলিয়া ফেলিল, দরিয়াবুবু, একটা খবর আছে।

কত সংবাদের জন্যই দরিয়াবিবি হা-প্রত্যাশায় নিমজ্জিত, তখনই উৎকর্ণ উন্মুখ ব্যগ্রতায় চাচীর দিকে তাকাইল।

আমাদের মুনি চাচার খবর পেয়েছি।

দরিয়াবিবি অন্য কোন সংবাদ পাইলে যেন সন্তুষ্ট হইত । বেশি উৎসাহ না দেখাইয়া
সহজ গলায় বলিল, কি খবর?

মুনি চাচা ও বাড়ি থেকে চলে গেছে । আরো পাঁচ ক্রোশ দূরে কি স্কুল আছে, সেখানেই
পড়ে । চাচাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আর নেই । আমিরন চাচী খুব তরল গলায় পরিবেশন করিল ।

যেখানেই থাক, ভাল থাক । আমার ছেলে ত নয়, আমার কি জোর আছে! ভয়ানক
নির্ণিষ্ঠ শোনায় দরিয়াবিবির কঠ ।

প্রতিবাদ জানাইল আমিরন চাচী, তোমার ছেলে নয় কে বললে? দেখো রক্তের টান,
চাচা আবার তোমার কোলেই ফিরে আসবে ।

আসুক বা না আসুক, যেখানে থাক বেঁচে থাক । তুমি কোথা থেকে খবর পেলে?

আমি খবর পেয়েছি । আমার এক মামাতো ভাই আছে মুনিদের গাঁয়ের পাশে । তাকে
খৌজ নিতে বলেছিলাম ।...তোমার যেহেরবানী বুবু ।

তারপর আমিরন চাচী কর্তব্যের ডাকেই উঠিয়া পড়িল । আমিয়া একা বাড়িতে আছে ।
দেবৰ বিধবার সম্পত্তি হরণের নানা পাঁয়তারা কষিতেছে । আর বেশিক্ষণ এখানে কটানো
চলে না । আমিরন চাচী কিন্তু অবাক হয় । আজ তার বুবু পুত্র প্রসঙ্গ আর উথাপন করিল
না । অথচ অন্য সময় ঘট্টোর পর ঘট্টো এই এক কথাই বড় হইয়া দেখা দেয় ।

দরিয়াবিবি আমিরন চাচীকে দহলিজ পর্যন্ত আগাইয়া দিল ও আবার আসার জন্য
অনুরোধ করিল । কিন্তু উঠানের দিকে অগ্সর হাঁজেভার পা যেন আর চলে না । ধীরে
ধীরে ছোট্ট শরীর বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল ও তার ঘুমস্ত মুখের দিকে
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল । তখন দরিয়াবিবি ঝীঝীভিতেছিল, শুধু সেই তার খবর রাখে ।

৩০

গঞ্জের পথে ইয়াকুব আসিয়াছিল খৌজ-খবর লইতে । সে খালি হাতে আসে না ।
ছেলেদের জন্য মিষ্টি, তা ছাড়া এত জিনিসপত্র আনে যার প্রাচুর্যই যে কোন সংসারের
পক্ষে তিন-চার দিনের জন্য লোভনীয় । দরিয়াবিবি প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি জানাইত ।
এখন নিজেই ইয়াকুব আনীত মায়া পেটিকা নিজের হাতে খোলে । অবশ্য উৎসাহ
দেখায় না বিশেষ ।

এবার ইয়াকুব বড় বড় কই ও বড় বড় চিংড়ি মাছ পর্যন্ত আনিয়াছিল । আজহার ঘরে
থাকিলে মাঝে মাঝে মাছ ধরিতে যায় । তখন এমন মাছ এই বাড়ির হাঁড়িতে উঠে । নচেৎ
এত দামে এমন আমিষ আহারের সামর্থ্য কোথায়?

ইয়াকুব ফোড়ন দিয়া বলিল, ভাবী, এবার মটরশুটি পাওয়া গেল না । বড় চিংড়ি আর
মটরশুটি আমার খুব পছন্দ ।

তোমার ক্ষেতে হয় না? দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল ।

না । অসময়ে সব সময় কি আর এই ফসল তোলা যায়?

ছেলেরা ইয়াকুব চাচাকে ঘিরিয়া থাকে । নঙ্গমা কাছ ছাড়া হয় না; বরং অন্য সময়
মাকে জিজ্ঞাসা করে, চাচা কবে আসবে মা? কারণ চাচা একা আসে না । আমজাদ কাছ

ঘৰিয়া বসে। সে লাজুক, তাই সে কম কথা বলে। কিন্তু ঘটাৰ পৱ ঘটা ইয়াকুবেৰ সঙ্গ ত্যাগ কৱে না।

লৌকিকতাৰ রেশ আৱ নাই। মেহমান হইলেও ইয়াকুব আহাৱেৱ ফিরিণ্টি নিজেই দিয়া থাকে। কাৰণ যোগাড় সে বহন কৱিয়া আনে।

দৱিয়াবিবি বিকালে লুচি ভাজিতেছিল। পাশে কোন ছেলেপুলে নাই। নষ্টমা একবাৱ আসিয়াছিল শিশুসূলভ প্ৰত্যাশায়। কিন্তু মা বসিতে দেয় নাই, ধৰক দিয়া তাহাদেৱ ভাগাইয়াছে। আৱো বকুনি খাইয়াছে আমজাদ। এত বড় ছেলে স্কুলে পড়িস। এমন হাঁ খেয়ে কেন? কোনদিন লুচি দেখিসনি চোখে? ইহাৰ চোটে দুৱস্ত পেটুকও ছুটিয়া পলাইত।

আজহাৱেৱ কথা এই বাড়িতে ছেলেৱা কেহ মুখে আনে না। ইয়াকুব তাৱ কথা জিজ্ঞাসা কৱে সাৱাদিন। কৃশল জিজ্ঞাসাৰ রীতিটুকু পৰ্যন্ত সে পালন কৱে নাই। অথচ আঘৰীয়।

কড়ায় গৱম তেলে ফেলা লুচিৰ ছাঁক ছাঁক শব্দ হইতেছিল। দৱিয়াবিবি আনমনা কাজ কৱিয়া যায়। সে নিজেৰ চিত্তায় বুঁদ, তা-ও মুখাবয়বে প্ৰমাণ। দৱিয়াবিবিৰ সুডোল গৌৰ মুখ চুলাৰ আঁচে ঘামিতেছিল।

ভাৰী, ভাৰী— আপনাৰ রান্না কত দূৰ। ভাক দিতে দিতে ইয়াকুব চুলাশালে প্ৰবেশ কৱিল।

বেগুন ভাজা হয়ে গেছে, এখন লুচি ভাজছি। ইয়াকুবেৱ দিকে না তাকাইয়া চুলাৰ ভিতৰ এক খও লাকড়ি ঠেলিতে ঠেলিতে দৱিয়াবিবি জিবাৰ দিল।

এখানেই দিন, গৱম গৱম লুচি খাওয়া যাক।

বেশ। কিন্তু বসাৰ জায়গা কোথায়?

বসাৰ জায়গা কি হবে? এই আমি বসে দেখিয়ে দিছি— বলিয়া ইয়াকুব উবু বসিয়া পড়িল।

তোমাৰ কাপড়-চোপড় ময়লা হবে। ইয়াকুবেৱ পৱনে সিঙ্গেৱ লুঙি। গায়ে শাদা শাৰ্ট। দৱিয়াবিবি মিথ্যা বলে নাই।

না, আমি ত আৱ ছেলেমানুষ নই। যেন কত রসিকতা কৱা হইল। ইয়াকুব বেদম হাসিয়া উঠিল।

বেশ, বসো। আমি থালা বাটি নামিয়ে আনি।

দৱিয়াবিবি মাচাং হইতে লোয়াজিয়া কয়েকটি নামাইয়া আনিল এবং বেগুনভাজা ও লুচি পৱিবেশন কৱিতে লাগিল।

থালায় হাত নামাইয়া ইয়াকুব বলিল, ভাৰী, ছেলেদেৱ ভাকেন।

ওৱা খেয়েছে। সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত জিবাৰ। ইয়াকুব চাহিয়া দেখিল দৱিয়াবিবি তখন লুচি-বেলায় মগ্ন। উন্তু কড়াৰ দিকে তাৱ আড়চোখেৰ দৃষ্টি। সেখানে টগবগ শব্দে তেল ফুটিতেছে।

সত্যি ওৱা খেয়েছে?

হ্যা। দৱিয়াবিবিৰ কৰ্ত ঈষৎ তীক্ষ্ণ শোনায়।

দৱিয়াবিবি গৱম লুচি ছাঁকিয়া পাতে দিতে লাগিল। ইয়াকুব ধীৱে ধীৱে খাওয়া শুৰু কৱে।

ভাৰী, একটু পানি।

দরিয়াবিবি ঘট্পট ছকুম তামিল করিল। আর কোন বাক্যালাপ যেন এগোয় না। ইয়াকুব দরিয়াবিবিকে রীতিমত ভয় করে। তার চোখের দিকে সহজে তাকাইতে পারে না। থমথমে মুখ যেন শাসনভঙ্গীর আদল। ইয়াকুব অসোয়ান্তি বোধ করে। তবে সে দুই স্তুর পতিদেব। মনের গোপনে একটা আত্মবিশ্বাস আছে তার। কিন্তু এখানে যেন সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দরিয়াবিবি কত শান্ত। অথচ ইয়াকুব অসোয়ান্তি অনুভব করে।

নিজের মনেই সে বলিয়া যায়, আপনার বাড়ি এলে যা শান্তি পাওয়া যায়, আর কোথাও তা মেলে না।

আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কেন?

কেন? যত্নআত্মি কে করে?

যত্নআত্মি! দরিয়াবিবি হাসিয়া উঠিল। ইয়াকুব কান খাড়া করিল। কথাটা বিদ্রূপের মত শোনাইতেছে না ত? কিন্তু কিছু উপলক্ষ করিতে পারি না। দরিয়াবিবি কোন সুযোগ না দিয়া বলিল, তুমি যত্ন-আত্মি কোথায় দেখলে?

কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা দোকানদারী ভাব।

ইয়াকুব মনে মনে ক্ষুঁ হয়। তবু আবহাওয়া আরো সন্নিকট করিতে বলিল, না, ভাবী, এসব কপালের কথা। এমন শান্তি আমি ঘরেও পাই না।

তোমার ত খোদার মরজী দু'বিবি আছে?

বিবি! বিবি কোথায় দেখলেন ভাবী?

ঘরের সে দুটো তবে কি?

গোশ্তের ঢিবি।

দরিয়াবিবি এবার হাসিয়া ইয়াকুবের দিকে তাকাইল। তখনই চোখ নামাইয়া বলিল, আমি বিবিসাবদের দেখিনি। মোটা হলে যদি গোশ্তের ঢিবি হয়, আমি ত গোশ্তের পাহাড়। না ভাবী। আপনি সংসারের লক্ষ্মী।

দরিয়াবিবি এই প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়। সেও হাসিতে থাকে এবং বলে, নৃতন কথা শোনালে ভাই।

ইয়াকুব এই নৈকট্যের প্রসাদই ত চায়। সে খুশি হইয়া বলিল, বাচ্চাদের ডাকেন, আমাকে আর দুটো লুটি দিন।

সহজ গলায় দরিয়াবিবি জবাব দিল, বাচ্চারা পরে খাবে। তুমি এখন খাও।

ইয়াকুব খাওয়া শেষ করিয়া বলিল, ভাবী, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনাদের গাঁ খানা বড় জংলাটে। টাকা পক্রেটে করে ঘোরা যায় না। আমার ব্যাগটা রাখেন।

আমার কাছে কেন?

ইয়াকুব টাকার ব্যাগ হাতে বলিল, চুরি হওয়ার ভয় আছে।

কত টাকা আছে?

পাঁচশ'

না ভাই। এত টাকা— হঠাৎ রাত্রে চোর এসে নিয়ে গেলে—।

* আপনার কাছে চোর টাকা চুরি করতে আসবে না। ইয়াকুব মৃদু হাসি ছিটাইয়া বলিল।

তবে কেন আসবে?

কথা ঘুরাইয়া ইয়াকুব জবাব দিল, চোরের ভয় নেই? আপনার যা সাহস। আমার গোশ্তের চিবিরা এমন জংলা জায়গায় থাকলে দশটা দারওয়ান রাখতে হোত।

দরিয়াবিবি হাত পাতিয়া দিল। ইয়াকুব মানিব্যাগ দিতে বিলম্ব করিল না। বাহিরে তখন গোধুলি। ইয়াকুব বাহির হইয়া আসিল। দরিয়াবিবি আঁচলে ব্যাগ বাঁধিয়া আবার কাজে মনোযোগ দিল।

পরদিন দুপুরে ইয়াকুব গঞ্জের নৌকা ধরিবে। যাইবার সময় সে বলিল, ভাবী, আমার ব্যাগটা দিন।

দরিয়াবিবি আমানত ফিরাইয়া দেওয়ার সময় বলিল, ভাই, তোমার কাছে একটা আরজ আছে।

ভয়ানক অধীরতা প্রকাশ করিল ইয়াকুব। সে ভাবিয়াছিল, ব্যাগে আরো টাকা আছে, হ্যত দরিয়াবিবি খণ্ডের আবেদন জানাইবে।

আপনার আরজ কি? হৃকুম বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন।

একটা খোজ-খবর নিও।

তা আর নেব না। আমি মনে করেন আপনাদের পর, ভাবী? ইয়াকুব দরিয়াবিবির মুখের দিকে তাকায়। সে কিন্তু নতমুখী। দৃষ্টি মাটির উপর কি যেন খুঁজিতেছে।

খুব মৃদু কঢ়েই দরিয়াবিবি জবাব দিল, আমাদের খোজ নয়।

ইয়াকুব হতাশ। আবার প্রশ্ন করিল, তবে কুর?

তোমার ভাইয়ের খবরটা।

ওহ, আজহার ভাইয়ের! তিনি ত কেঁয়েলী লোক, আসবেন একদিন। ইয়াকুব জবাব দিল অত্যন্ত নির্ণিষ্ঠ কঢ়ে।

তার জন্য আপনি এত উত্তোল্লাস কেন? বিশ্ময় প্রকাশ করিল ইয়াকুব।

স্বামীর জন্য এত মাথাব্যথা কেন, তুমি তা-ই জিজ্ঞেস করছ? দরিয়াবিবি সোজাসুজি ইয়াকুবের দিকে তাকাইল।

না-না, তা নয়। আমি ভাবছি, একটু বিরাগী ধরনের মানুষ তার জন্যে ভেবে লাভ কী। ইয়াকুব তখনই দৃষ্টি নামাইয়া অপরাধী সুলভ কঢ়ে জানাইল।

তবু ভাবতে হয়। শহরে মালপত্র কিনতে তোমার লোক যায়, তাই খবর নিতে বলছি।

নিশ্চয়, খবর নেব বৈকি। আমি তার কোন ক্রটি রাখব না।

নিও ভাই। আল্লা তোমার ভাল করবে। দরিয়াবিবির কর্তৃত্বের কোন খাদ ছিল না।

গঞ্জের বেলা হয়ে গেল। আপনাকে খবর দেব, আপনি নিশ্চিত থাকেন।

ইয়াকুব আর দেরী করিল না। দরিয়াবিবির ঘরে ফিরিয়া আসিল।

৩১

দরিয়াবিবি আগে আশ পাশের দু'একটি ভিটা ভাড়া আর কারো বাড়ি যাইত না। তার নিজেরও লজ্জা করিত। তা'ছাড়া ছিল আজহারের ভয়। এমনি শাস্ত মানুষ, কিন্তু বেশরিয়তী

দেখিলে আর রক্ষা ছিল না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সাংসারিক প্রয়োজনে দরিয়াবিবিকে অন্য পাড়ায় যাইতে হয়।

আমিরন চাটীর বাড়ি পাড়ার এক টেরে। পথে এত বোপ-জঙল। আর এই সড়ক প্রায় নির্জন থাকে। কারণ লোক-চলাচল কম। দরিয়াবিবির পর্যন্ত ভয় হয়। তাই সঙ্গে আমজাদকে লইত। নঙ্গী মা ছাড়া ঘরে থাকে না। সেও প্রায় সঙ্গে যায়। আমজাদের এই পথে হাঁটিতে খুব আরাম লাগে। সে এইজন্যে মাঝে মাঝে ‘আমিরন চাটীর বাড়ি চলো’ বলিয়া দরিয়াবিবির কাছে বায়না ধরে।

চাটীর বাড়ির আরো আকর্ষণ ছিল। আমিরন চাটী ঘরে ছেলেদের জন্য মোয়া, নাড়ু কিছু-না-কিছু সব সময় মজুদ রাখে। আর আঘিয়া মেয়েটি বড় প্রাণবন্ত। সেখানে গেলে মেয়েদের গঞ্জের অবসরে বেশ কিছুক্ষণ খেলা করা যায়।

আমজাদ সেদিন জিদ ধরিয়া দরিয়াবিবিকে চাটীর বাড়ি লইয়া গেল। হাতে বিশেষ কাজ নাই। দরিয়াবিবির কোন আপত্তি ছিল না। সেখানে গেলে মন কিছু হালকা হয়।

আমিরন চাটী গরুকে এই মাত্র জাব দিয়া হাত ধুইতেছিল। হঠাৎ দরিয়াবিবি ও ছেলেদের দেখিয়া স্মিতহাসে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল, এসো বুবু এসো। আরে, আজ আমজাদ চাচা, নঙ্গী খালা শুন্দ এসেছ। ও আঘিয়া, বেরিয়ে আয়।

ডাক দেওয়ার আগেই মেয়ে হাজির।

আঘিয়া আর একটু ডাগর হইয়াছে। চাপ্পল্য আঁকৌ করে নাই। সে আমজাদের দুই হাত ধরিয়া বলিল, আমু ভাই, চলো যুমুর বাসা দেখে আসি। তালগাছের পাশে একটা করঞ্জ গাছের কোটেরে বাসা বানিয়াছে।

চল।

আর কার তোয়াক্কা। আঘিয়ার পিছু পিছু আমজাদও দৌড়াইতে লাগিল। পিছন হইতে আমিরন চাটী চীৎকার দিয়া ডাকিল, তোরা বেশি বোপের ভিতর যাসনি, বড় সাপের জুলুম বেড়েছে। কিন্তু তার কথা কে শোনে?

আমিরন চাটী পান সাজিয়া দিল। দরিয়াবিবির সাধারণত পান খাওয়ার অভ্যাস নাই। তবে চাটীর দান প্রত্যাখ্যান করে না।

আমিরন চাটী জিজাসা করিল, আজ কি রান্না হলো?

রান্না সেরে এসেছি।

আমিরন চাটী যেন প্রশ্নের জবাব পাইয়াছে। তাই অন্য প্রসঙ্গ উঠাপন করিল।

আমার দেওরটা আসলে লোক খারাপ ছিল না।

আমিরন চাটীর কথার মধ্যে দরিয়াবিবি জিজাসা করিল, আবার জুলুম ধরেছে নাকি?

অভ্যেস আর সহজে যায়। সেদিন খামাখা আমার ঝাড়ের দু'খানা বাঁশ কেটে নিল। নিক, ওর ছেলের কবরে লাগবে। আমিরন চাটীর গলা হইতে যেন এক ঝলক আগুন বাহির হইল।

দরিয়াবিবিও ঘৃণা প্রকাশ করল, বেওয়া মানুষ, তাকে দু'গাছি এনে দেওয়া দূরে থাক, তারই চুরি, এসব সইবে না।

ওদের সয়। পরের মেরে মেরে বড় হচ্ছে। এদিকে লেফাফা ঠিক আছে। আজকাল

আবার মসজিদের মুঘাজ্জিনগিরি করে।

নষ্টমার চোখ দিয়া পানি পড়ে। সে দৌড়াদৌড়ি আর ভালবাসে না। চাচী দুঁটি মোয়া দিয়াছিল। সে তা চিবাইতে ব্যস্ত। বোধহয় গলায় বাঁধিয়াছিল, তাই চাচীর নিকট পানি চাহিল।

কথায় ছেদ পড়িল। দরিয়াবিবি তখন চাচীর উঠানের চারিদিকে চাহিয়া থাকে। এখানে আসিলে সত্তি, বুকে জোর পাওয়া যায়। বিধবা মানুষ। অথচ সংসার বেশ চালাইয়া যাইতেছে। উঠানটি নিখুঁত পরিষ্কার থাকে। আশেপাশে সজি আনাজের গাছ। গত বছর চাচী একটি লেৰু গাছ লাগাইয়াছিল। তা-ও পত্র-সম্ভারে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সংসার বড় নয়, এইজন্যই আমিরন সামাল দিতে পারে। দরিয়াবিবি ভাবিতে লাগিল।

আমিরন চাচী পানির গ্লাস নষ্টমার হাতে দিল।

ওর জন্য আবার গ্লাস দিয়েছে, এখনই ভাঙবে। দরিয়াবিবি সাবধান করিল।

আমিরন চাচী আপনি জানাইল, আমি ধরে আছি। ঘরে কিইবা আছে বুবু। এই গ্লাসটা, তোমার ভাই তখন বেঁচে। হরিশপুরের মেলা থেকে এনেছিল।

আমার ঘরেও সব ভেঙেছে। পুরাতন কাঁচের দুঁচারটে জিনিস আছে, তুলে রেখেছি। কেউ মানুষ জন এলে বের করতে হয়। দরিয়াবিবি সায় দিল।

আমিরন চাচীর সময় কম। বিকালে গরু বাচুরের খবরদারীতে বহু সময় যায়। শাকসজীর গাছ আছে আশে-পাশে; পানি না দিলে চলে না। চাচী তাই দ্রুত কথা বলিতেছিল। আজ মোনাদির কি আজহারের প্রস্তুতি আমিরন চাচী মুখ দিয়া বাহির করিল না, পাছে দরিয়াবিবি কষ্ট পায় বা হঠাৎ কেঁচে ধুঁড়িতে সাপ বাহির হয়।

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এই সাপই ছোবল ভুলিল।

আমিরন চাচী বলিতেছিল, বুবু! একা মানুষ হলে আমি কি ভয় পেতাম। তেমন ডরানেওয়ালী মায়ে পয়দা করে নিয়ে কিন্তু এই যে-এক গলার কাঁটা রয়েছে।

দরিয়াবিবি কথাটা ঠাহর করিতে পারিল না সহজে। গলার কাঁটা। বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া সে চাচীর মুখের দিকে তাকাইল।

আমিরন চাচী হাসিয়া উঠিল। তুমি আমার গলার কাঁটা দেখোনি? বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল। দরিয়াবিবি খামাখা হাসে, আর সত্ত্বাই চাচীর কষ্টনালীর দিকে তাকায়।

আমিরন চাচী হাসে আর বলে, তুমি ডাক্তার হেকিম হলে আমার কাঁটা দেখতে পেতে।

আমাকে আগে বলো নি, বুবু! দরিয়াবিবির বিশ্বয়ের অবধি নাই। আমিরন চাচী আরো হাসিতে থাকে। আর বিশেষ বেলা নাই। তাই বলিল, দাঁড়াও বুবু, গলার কাঁটা দেখাচ্ছি। অ আমিয়া, অ আমিয়া। শেষের দিকে চাচী চীৎকার জুড়িল।

নিকটেই ছিল, আমজাদ ও আমিয়া আসিয়া উপস্থিত। ঐ আমার গলার কাঁটা, চাচী আমিয়ার দিকে আঙুল বাঢ়াইল।

কি মা? আমিয়া খেলা ছাড়িয়া আসিয়াছে। এখানে দাঁড়াইতে রাজি নয়।

যা, খেল গে।

ছেলেমেয়ে দুটি আবার দৌড়াইয়া পলাইল। তখন দরিয়াবিবি হাসিতে হাসিতে বলে, তুমি লোককে এমন বোকা বানাতে পারো।

গলার কাঁটা নয়? একা হলে ঝাড়া হাত পা যা খুশি করতাম। যেমন ইচ্ছে থাকতাম। বুবু, এখন কত কথা ভাবতে হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবনায় নিদ ধরে না। চাটীর মুখের উপর দিয়া ছায়া খেলিয়া গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দরিয়াবিবি বলিল, বুবু, আমার কতগুলো দ্যাখো। সব ত বেঁচে নেই। এইগুলো ত আমার পায়ের বেড়ি। ক'বছরে কি যেন হয়ে গেলাম।

তবু ওদের ছাড়া ঘর মানায় না। হাসুবৌটার দশা দ্যাখো। সোয়ামীর চোখের বালি, শাউড়ীর কাঁটা। একটা ছেলেপুলে নেই।

ও বেশ আছে। যার নেই, তার এক ধান্দা। যার আছে তার শতেক ধান্দা।

হক্ক কথা বুবু।

আমার মুনিটা এখানে থাকলে, আমি কোন কিছুতেই তয় পেতাম না।

আমিরন চাটী এই প্রসঙ্গ এড়াইতে চায়। কিন্তু দরিয়াবিবি রেহাই দিল না।

মুনি থাকলে, আমি আধিয়াকে ঘরে নিয়ে যেতাম। কি তোমার কাছেই থাকত। তোমার আর কেউ নেই— একটা ছেলে সংসারে বাঢ়ত।

আমিরন চাটী যেন চাঁদের স্বপ্নে বিভোর। বলিল, বুবু, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আহ, আমার কি সে কপাল হবে। তুমি রাজি হোলেও ক'ভাই? তোমরা উঁচু খী বংশ।

তালপুরুর ঘটি ডোবে না। বেশ ব্যঙ্গসুরে দরিয়াবিবি বলিল, আমার ছেলের বিয়ে দিলে কে কী বলবে? সে ত আর মোনাদিরের ঘোপ নয়।

আমিরন চাটী বড় খুশি হয়। কিন্তু যিন্ম্যা কল্পনা, তা উপলব্ধি করেও।

কিন্তু ছেলেটা চলে গেল—

দরিয়াবিবি বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। আমিরন চাটী তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডাকিয়া নাড় খাওয়াইল। সেই হট্টগোলে সহজ আবহাওয়া ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যা হইতে আর দেরি নাই। দরিয়াবিবি কাজের মর্যাদা জানে। চাটীকে সে ছুটি দিল।

পৃথিবী কত বড়। পাঞ্জী-জানালার ফাঁক দিয়া কতটুকু আর দেখা যায়। বোপে-বোপে এই সড়ক পথে হাঁটিবার সময় আমজাদের মত দরিয়াবিবি অস্তুত আস্থাদ পায়।

গা-ঢাকা সন্ধ্যা উভীর্ণ। জঙ্গলে জঙ্গলে তখন জোনাকিরা প্রদীপ কাড়াকাড়ি শুরু করিয়াছিল।

৩২

চন্দ্ৰ একরাশ তাড়ি গিলিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। ভিটার কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল, তার ঘাড়ে একটি আধপোড়া চেলা কাঠ। শুশান হইতে চন্দ্ৰ তুলিয়া লইয়াছিল, তা আর বুঝিতে দেরী হয় না।

দুপুর বেলা মাঠে কেউ থাকে না। এতক্ষণ আপনমনে চন্দ্ৰ গান করিতেছিল। কিন্তু বাড়ির কাছে হঠাৎ গান বন্ধ হইয়া গেল। গায়ক পর মুহূর্তে যোদ্ধা সাজিয়াছে। কোটাল

পোড়া চেলা কাঠখানি বাঁই-বাঁই শব্দে ঘুরাইতেছে আর মুখে ‘হট-যাও, হট-যাও’ রব।

চন্দ্রমণি, তার ছেলেরা আর কোটালের স্ত্রী হঠাৎ হিন্দী চীৎকার শুনিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর সকলে তামাসা দেখিতে লাগিল। চন্দ্রমনির দুই ছেলে মামার কাও দেখিয়া হাসিয়া খুন। কোটালের স্ত্রী কিন্তু খুব চটিয়াছিল। তাড়ি ত চন্দ্র কোটালের কাছে জল। আপত্তি সেখানে নেয়। এই অবেলায় মড়াকাঠ কাঁধের উপর! এমন অলঙ্কুণে কাও কোটাল-স্ত্রীর সহ্যের বাহিরে।

সেও চীৎকার করিয়া বলিল, তুমি এসো ঘরে, তোমার ‘হট-যাও’ আমি বের করব। চন্দ্রমণির চোখ ভাত্তজায়ার দিকে। ছি ছি, দাদার যত বয়স বাঢ়ছে, তত ঢিটেমি বাঢ়ছে।

তুমি এ কাঠ নিয়ে ভিটের উপর একবার ওঠো দেখি। কোটাল-গিন্নী শাসাইতে লাগিল।

চন্দ্র হঠাৎ চেলাকাঠ ঘুরানো থামাইল, তারপর চীৎকার করিয়া শুধাইল, কিয়া হ্যায়।

কিয়া হ্যায়? তোমার হৃক্ষাহ্যা বের করব, একবার ওঠো দেখি। কোটাল আবার যোদ্ধার হৃক্ষারে চেলাকাঠ ঘুরাইতে লাগিল। কিন্তু ভিটার নিকটে কয়েকটা চারা করঞ্জা গাছের কাছে আসিয়া থামিল। যোগীন তখন মামার উদ্দেশে ডাক দিল, মামা, উপুরে এসো না, মামী মারবে।

চূপ বেটা। আমি জমিদার হ্যায়, হ্যাম্কো কোন্ রোকেগা। কাঁধে গদা লইয়া ভীমের মত চন্দ্র সটান খাড়া হইল। বাবুরী চুল বাতাসে এলোমেলো। চক্ষু দুটো নেশার ছলকে গোল ভাঁটার মত। যোগীনের ছেট ভাই ত রীতিমত ভয় প্রক্ষিপ্ত মার আঁচলে আশ্রয় লইল।

ভিটার উপরে কোটাল-পত্নী কোমরে কাপড় জড়াইয়া ছংকার ছাঁড়িল, মড়াকাঠ ফেলে ভাল মানুষের মত আবার নদীতে শ্বান করে এসো। না হলে— স্ত্রীর বন্ধমুষ্টি, চন্দ্র ভালকৃপে ঠাহর করিল।

হট যাও, হাম জমিদার হ্যায়। তরুপরে কোটাল সমস্ত মাঠের দিকে আঙ্গুল অর্ধবৃত্তাকারে বাড়াইয়া বলিল, হট যাও, সমস্ত জাম আমার হ্যায়। ইয়ার্কি পায়া হ্যায়— রোক্দেগা।

একবার ভিটের উপর উঠে দ্যাখো। কোটাল পত্নী ভ্যাংচাইয়া বলিল।

কোটাল জবাব না দিয়া চেলাকাঠখানির সাহায্যে ধাঁই ধাঁই চারা গাছগুলি পিটাইতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার— এইসব আমার প্রজা আছে-বাত নেই শোন্তা? কিছুক্ষণ এই তরুপ্রজা ঠ্যাঙ্গানো চলিল। ভিটার উপরে সকলে তখন বেদম হাসিতে শুরু করিয়াছে। কোটালের বীরোচিত শৌর্যের উৎসাহ আরো বাড়িয়া যায়।

গিন্নী চীৎকার দিল, এই পাগল— পাগল।

পাগল! যোদ্ধা মুগুর উঁচাইয়া থামিল। প্রথমে ব্যঙ্গের হাসি, পরে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে হৃক্ষার ছাঁড়িল, পাগল! জমিদার শালা পাগল? .

পাগল, পাগল।

ছেলেরা চীৎকার দিয়া হাসিল, পাগল, পাগল!

সব মার ডালেগা— বলিয়া মুগুর-বিশারদ আবার কল্পিত প্রজাদের শায়েস্তা করিতে লাগিল। নেশা বেজায় ঢিয়াছিল।

প্রতিপক্ষ তখন হাসিয়া লুটাইবার উপক্রম। সুযোগ বুঝিয়া চন্দ্র ভিটার দিকে এক পা অগ্রসর হইল। তখন গিন্নী একটা চেলাকাঠ লইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্ৰ চীৎকাৰ দিয়া বলিল, পাগল না হোলে মানুষ ঠ্যাঙ্গায়? সব মার ডালো।
আবাৰ মুগ্ধৱাঞ্জি চলিল।

খিলখিল নাৱি হাস্যে তখন অবেলাৰ রং আৱো ঘন হয়।

কতক্ষণ এমন চলিত কে জনে? এই সময় আমজাদ ভিটার পথে উপস্থিত হইল।
দৰিয়াবিবিৰ জৰুৰী আদেশেই সে এই দিকে আসিয়াছিল। সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল।
কাকাৰ নৃতন কীৰ্তি। কিন্তু সে রংগদেহি মৃতি দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়াছিল। মা'র আদেশ
হাতে কৱিয়াই ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল। হঠাৎ যোদ্ধাৰ নজৰ সেদিকে গেল।

প্ৰজাৱা নিষ্ঠাৰ পাইল। মুগ্ধ উচাইয়া মহাবীৰ আমজাদেৰ দিকে ধীৱে ধীৱে অগ্ৰসৱ
হইতে লাগিল। আমজাদেৰ ভয়ে মুখ তকাইয়া যায়। সে সাহসেৰ উপৰ ভৱ দিয়া বলিয়া
ফেলিল, কাকা আপনাকে মা ডাকছে। খুব দৰকাৰ।

যোদ্ধাৰ কানে যেন কথাটা গেল না। গজেন্দ্ৰ-গমন ও ক্ষম-শোভিত গদা অবিচল
থাকে।

কিন্তু চন্দ্ৰ ভয়েৰ ফুৰসৎ দিল না। হঠাৎ গদা ফেলিয়া সে আমজাদকে কাঁধে তুলিয়া
লইল। ছেলেবেলা বেশ মজা লাগিত। এখন আমজাদ কিশোৱ, তাৰ বড় লজ্জা কৰে।
কাকা, আমাকে নাখিয়ে দাও। সে মিনতি জানাইল। কিন্তু মেশাখোৱ নিজেৰ খেয়ালে
বিভোৱ। কবিগানেৰ সৰ্দাৰ তখন গান ও নৃত্য ঝুড়িয়া দিয়াছে।

চাচা এল অবেলাৰঁ।

এখন কোথায় কি পাই?

বেতে কেওয়া দায়।

হাস দৰিয়েছে পুকুৱ পাঢ়ে

মুকুটি আৱ ডিম না পাঢ়ে

শৈৰাপে-ৰাঢ়ে বন-বাদাঢ়ে

শেয়ালছানাও নাই॥

চন্দ্ৰ হঠাৎ মাথা ঝাকুনি দিয়া বলিল উঠিল, তওবা, মুসলমানেৰ ছেলে। তাৱপৱ ওয়াক-
শদে থুথু ফেলিল। গানেৰ নৃতন কলি শৱ হয়।

ভাইপো তুমি কৱ না ভাবনা

আমি ওসব কিছুই খাব না।

ঘৱে আছে মুটকী চাচী

তাৱে কৱ না জৰাই॥

আহা চাচা, আক্কেল বটে

বলিহাৱি, বলিহাৱি যাই॥

চন্দ্ৰ ঝা-পাঢ়াৰ দিকে অহসৱ হইতে লাগিল। ভিটার উপৰ হাসিৰ মওজ ছুটিল। পড়ন্ত
বেলা। দিকে দিকে রং লাগিয়াছে। ঝাকুনি ঝাওয়া গান মাঠে মাঠে রেশ রাখিয়া যায়।

ঘৱে আছে মুটকী চাচী

তাৱে কৱ না জৰাই॥

সলজ্জ, তবু আমজাদ কাঁধেৰ উপৰ হাসিতে লাগিল।

বছর ঘুরিয়া গেল।

সূর্য-প্রদক্ষিণ শুধু স্থাবর-জঙ্গমের সহগামী নয়। সংসারের বিচিত্র প্রক্ষেপও সঙ্গে সঙ্গে অঘসর হয়। সচ্ছলতা-অনটন, হাসি-কানু বিচিত্র ছবি তার দাগ রাখিয়া যায়।

এই আবর্ত দরিয়াবিবিকে টানিয়া লইয়া গেল ক্রমশঃঃ দিশাহারা পথে। এক ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল স্বামী আর নিরুন্দিষ্ট প্রবাসী নয়। আজহার ফিরিয়া আসিয়াছিল মাত্র তিন সন্তাহের মেয়াদ লইয়া। এক বছরে কত কি-না করিয়াছে। রাজমিত্রী তার আদিম পেশা, ইটের পাঁজার সর্দারী, মসজিদের সহকারী আর মনোহরীর দোকান—তার আর এক মরীচিকা-মাখা সব। নৃতন মোড় ফেরার শ্বপ্নে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাড়ি ফেরার আগে সে একটি দোকান পাতিয়াছিল। তার নিরীহ শান্ত মনেও তখন অস্থিরতার ছোয়াচ। নিজের দিকে সে নিজে চাহিতে শিখিয়াছিল। নামাজে মন থাকে না। জায়নামাজের পাটির উপর কখনও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে সেজ্দা দিতে গিয়া। কেন এমন হয়? কোটাল চন্দ ত বিধর্মী। তার চেয়েও দুঃখী। কিন্তু সে আনন্দের অধিকারী। জীবনের ঝাপ্টা তার পাখনাকে পঙ্ক করিতে পারে নাই। অথচ-সে! বুকের ভিতর বাঁচা ও সংসার গোছানোর হাজার তৃষ্ণা লইয়া কলে-পড়া মুষিকের মত পরিত্রাণের আশায় দিঘিদিক ছুটাচুটি করিতেছে। সকলের রঞ্জি-দেন্তেওয়ালা আল্লার উপর তার বিশ্বাস কতটুকু? আজহার ক্লান্ত অবসর সময়ে নিজেরে কাছে এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজিত। শেষদিনে হঠাৎ দাম লইয়া এক খরিদারের সঙ্গে ঝগড়াই করিয়া বসিল। পরদিন দোকান বিক্রয় হইয়া গেল। আবার গ্রামেই সে ফিরিয়া যাইবে। চন্দ্রের কাছে জিজ্ঞাসা করিবে, বাঁচার আনন্দ সে কোথা হইতে পায়? রহিম বৰ্খশ, হাতেম খাদের চন্দ ঘৃণা করে। এই ঘৃণার মধ্যে কী আনন্দ আছে? ঘৃণা ত হিংসা। এমন পাঁকের মধ্যে পদ্মফুল ফোটে? আর যা-ই করুক, চন্দ্রের সঙ্গে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সে মিলাইয়া দিবে। সে তাড়ি খাক, নাচুক বা গান করুক, তা দেখার আবশ্যক নাই আজহারের। আজহার বুকে নৃতন জোর পাইয়াছিল। মাঠের মাটির সঙ্গে সে কেন প্রবৃষ্ণনা করিবে না আর। জীবনের বোঝাপড়া হোক আবার। চন্দ্রের সঙ্গ আজহারকে উতোল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু গ্রামে সে ত একা আসিল না। জেলা-জেলান্তর ঘোরার ফলে বাঁকুড়ার দূরস্থ ম্যালেরিয়া আগেই দেহে বাসা বাঁধিয়াছিল। মাঝে মাঝে ভুগিতে হইত। পথেই নৃতন প্রতিক্রিয়া শুরু। শেষ অঙ্ক মহেশডাঙ্গায় অভিনীত হইল মাত্র।

নিরীহ ঈমানদার মানুষ— এইজন্য সমশ্বেরীর বক্সুদের নিকট হইতে এই কয়েকদিন আজহার সহানুভূতি কর পায় নাই। চন্দ কোটাল প্রায়ই বসিয়া থাকিত ঘটার পর ঘটা। বাক্যালাপ হইত নামাত্র। তবু তার উপস্থিতির কামাই ছিল না। রোগ ক্রমশঃঃ বাড়িতে থাকিলে এক মন্দিরের ঠাকুরের কাছ হইতে চন্দ গাছের শিকড় আনিয়া আজহারের হাতে বাঁধিয়া দিল। অন্য সময় কত আপন্তি করিত, হয়ত দুইজনের মধ্যে চটাচটি হইয়া যাইত।

কিন্তু মৃত্যু-পথ্যাত্মি আজহার আর এক মানুষ। চন্দ্রের নিকট নিজেকে সঁপিয়া দিতেই ত সে গ্রামে আসিয়াছিল। এই বাড়িতে আসিলে চন্দ্রের ছোঁয়াচ হাসি কাহাকে না স্পর্শ করিত। কিন্তু চন্দ্রও আজকাল ভয়ানক গল্পীর। একদিন দম-ভর তাড়ি খাইয়া আসিয়াও সে চুপচাপ বসিয়াছিল। কারো প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নাই। তারপর আপন মনেই বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছিল। এই সংসারের ভবিষ্যৎ যেন এখনই তার সম্মুখে জিজাসা-চিহ্নের মত থাঢ়া। সহানুভূতি, এমন কি ইয়াকুবের কাছেও, সীমাতীত ভাবে পাওয়া গেল। সে পাঁচ মাইল দূর হইতে পাঞ্জি করিয়া পাস-করা ডাঙ্কার আনিল। তখন শেষ অবস্থা। ডাঙ্কার কোন আশা দিতে পারিল না।

দরিয়াবিবি একদা-তেজ যেন উবিয়া গিয়াছিল। অবশ্য গৃহস্থালীর কাজ ও সেবার কোন ক্রটি ছিল না। সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোগীর বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আজহার নির্বিকার। নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার কোন সচেতনতা ছিল না। দরিয়াবিবি দিকে একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিত না সে। পাষাণের মত নিঃসাড় খোলা দুই চোখ আর দেখার কাজে লাগে না যেন-এখন তা চিরস্তন হাতিয়ার। দরিয়াবিবি কোন কিছু জিজাসা করিলে হাঁ-না-রবে তার পরিসমাপ্তি হইত মাত্র। এই নীরবতা দরিয়াবিবিকে ভয়ানক চঙ্গল করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীর কাছে নষ্টমা বা আমজাদকে ঘন ঘন পাঠাইত। কথা হইত শধু নষ্টমার সঙ্গে। সে-ই যেন শধু তার সব কথা বুঝিতে পারে। দরিয়াবিবি পিতা ও কন্যার ক্ষেত্রে পক্ষনকালে উপস্থিত হইত। আজহার তখন নীরব। দরিয়াবিবি পাশে বসিয়া উঠিয়া আসিত ও অলঙ্ক্ষ্যে চোখের পানি মুছিত। কত দায়িত্ব পিছনে পড়িয়া থাকিল, এই চিন্তা কি একবারও তোমার মনে জাগে না? দরিয়াবিবি ভাবিত, সে জিজাসা করিয়া দেখিবে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিত না।

আজহারের গলায় কেমন ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছিল। আজকাল সারারাত্রি পিদিম জুলে। দরিয়াবিবি উঠিয়া তখন জিজাসা করিল, কষ্ট হচ্ছে?

না। তারপর আজহার দরিয়াবিবির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমুর মা, আমি—। কথা থামিয়া গেল।

দরিয়াবিবি তখন জিজাসা করিল, তুমি আমাকে কিছু বলবে?

মাথা নাড়িয়া আজহার সম্মতি জানাইল ও পলকহীন চোখে স্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল।

অধীর দরিয়াবিবি সঙ্গে মাথায় হাত বুলাইতে শুধাইল, কিছু বলবে?

আজহার কোনো কথা বলিল না। শীর্ণ হাতখানি দরিয়াবিবির হাতের দিকে বাড়ানোর পথে আবার মুষ্টিবন্ধ করিয়া লইল। চোখ তেমনই পলকহীন। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এই নীরবতার মুখোমুখি। এখনি ঐ ঠোঁট হইতে কথা বলিবে। দরিয়াবিবি আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। কিন্তু আর কোন কথা বলা হইল না। জীবন-যৌন পথ্যবীর কাছ হইতে ইত্যবসরে ছাঢ়গত পাইয়াছিল। শধু চোখ দৃঢ়ি তখনও সজীব। দরিয়াবিবি তাহা বুঝিতে পারে নাই। মৃত স্বামীর চোখের দিকে দৃষ্টি পাতিয়া সে চাহিয়া রহিল, চাহিয়া রহিল।

আমিরন চাটী যুক্তি দিয়াছিল, আরো হাঁস-মূরগি, বক্রী-খাসী পোষো। বুবু। কোন রকমে দিন চলবেই। তোমার ভাই মারা যেতে আমিও চোখে আঙ্কার দেখেছিলাম। এখন বুক বাঁধতে হবে, ভাবনা করলে ত দিন যাবে না।

দরিয়াবিবি কথায় সায় দিয়াছিল। কিন্তু তার পক্ষে বাধা অনেক। সে পর্দানশীনা। কাছে মাঠ নাই। আমজাদ লেখাপড়া আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। গরু-বাচ্চুর মাঠে লইয়া যাইতে নিমরাজী। ইলেমের এমনই প্রভাব। আজহারকে সে খুব ভয় করিত, তাই মুখের উপর কোন জবাব দেওয়ার সাহস পাইত না। এখন সে বে-পরোয়া। চাষাবাদ তার ভাল লাগে না। চন্দ্র কাকার সঙ্গে প্রথম বছর চাষাবাদে গায়ে-গতরে খাটিয়াছিল। কিন্তু ধান বেশি হইল না। মাটির জন্য দরদ ছিল না। নিড়েন ঠিকমত দেওয়া হয় নাই। পর বৎসর চন্দ্র কোটাল তাই তিন বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বলিল। গ্রহীতা ইয়াকুব। দেড় বিঘা জমি ছিল, আমজাদের জন্য তাহাও বিক্রয় হইয়া গেল। চন্দ্র কাকার সংস্পর্শ তার ভাল লাগে না। এত যেহেনত আমজাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দরিয়াবিবি রাগ করলেও পুত্রের উপর ক্ষেত্র ছিল না। তের বছর বয়সের পক্ষে চাষাবাদ যেন ঠাট্টার ব্যাপার।

আমিরন চাটীর সংসার ছেট। কিন্তু দরিয়াবিবির সংসারে এতগুলি পেট চালানো সহজ নয়। প্রথম দিকে সহানুভূতি কারো কম ছিল না। কিন্তু তারও সীমা আছে। বেচারা চন্দ্র নিজেই অস্থির। সে চাষ করে, মাছ ধরে, গান করে। কিন্তু সব সময় রোজগার হয় না। তবু তার আন্তরিকতা অক্তিম। নিজে না আসিলেও বোনকে পাঠাইয়া খোঁজ-খবর লয়। এলোকেশ্বী খালি হাতে আসে-আস। কোন দিন মাছ, মাঠের ফসল, অস্ততঃ একফালি কুমড়া হাতে সে লৌকিকতা রক্ষা করে।

চারিদিকে ভাঙ্গন। নইমার চোখে আজকাল খুব পিচুটি জমে। চোখে তাল দেখে না হয়ত অন্ধ হইয়া যাইবে।

ইয়াকুব মাঝে মাঝে চিরাচরিত আড়ম্বরে আসে। মাঝে মাঝে টাকাও সাহায্য করে। দরিয়াবিবি কর্জ চাহিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু এইভাবে দিন কতদূর গড়াইতে পারে। আগে ঘরে দুধ ছিল। এখন গাইটা অল্প দুধ দেয়, তা-ও বিক্রয় করিতে হয়। শরী-র মুখে দুধ ওঠে না। তিন বছরের মেয়ে ভাত ধরিয়াছে বড়দের মত। তার মাঝে মাঝে পেটের অসুখ করে, সহজে সারে না। শুধু শরীরের কাঠামোর জোরে টিকিয়া আছে।

দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ করিবার জন্য এমনই দুর্দিনে মোনাদিরের পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে:

মা, আমার সালাম জানিবেন। বহুদিন বহু জায়গায় চুরিয়া আমি এখন স্কুলে পড়িতেছি। পাঁচটা টাকা যদি মাস-মাস আমার জন্য পাঠান, কোন রকমে আমার দিন চলিতে

পারে । আপনাদের অসুবিধা হইলে পাঠাইবেন না । আমার দিন এক রকমে চলিয়া যাইবে । আমু, নঙ্গাদের জন্য আমার ম্লেহ ।

আপনার ম্লেহের
মুনি

একটি ইন্ডেলাপের পত্র আসিয়াছিল । আমজাদ পড়িয়া শোনাইল । দরিয়াবিবি যুগপৎ আনন্দ ও নিরাশায় খামখানি হাতের মুঠায় ধরিয়া তাবিতে লাগিল । তিন-চার বৎসর অতিবাহিত । কত বড় হইয়াছে মুনি ! একটি দীর্ঘশাসে দরিয়াবিবি এই চিঞ্চ সমাহিত করিল । পাঁচটি টাকা সাত রাজার ধন নয় । তবু সে-কথাই আগে শ্বাবিতে হয় ।

আমজাদ পাশে বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, মা, মুনি ভাইকে টাকা পাঠাবে না ?
পাঠাব । পাঠাতে পারবি ?

তা আর পারব না ! তুমি টাকা দিও, মনি অর্ডার করে আসব । পোস্টাপিস আছে পাশের গাঁয়ে ।

দরিয়াবিবির ঠোটে কৃত্রিম হাসি দেখা দিল । আমজাদ এখনও কত অবোধ ।

কিছুক্ষণ আগে আমজাদ সংবাদ আনিয়াছিল, এবার জমির ধান ইয়াকুব নৌকায় বোঝাই দিয়া লইয়া গিয়াছে । এতদিন জমি বিক্রয় হইয়াছিল । কিন্তু ধান, বর্গা পরিশেষাধের পর অর্ধেক পাওয়া যাইত । ইয়াকুবের করুণা ! এবার তা-ও বক্ষ । জমি কিনিয়াছে, ফসল লইয়া যাইবে—বৈচিত্র্য কিছু নাই । তবু দরিয়াবিবি ক্ষেত্রে স্তুত হইয়া গিয়াছিল । পুত্রের কাছে সংবাদ পাইয়া আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা দের প্রয়োজন সে মনে করে নাই ।

মুনির পত্র হাতে ইয়াকুবের কথাই প্রথমে স্মরণ হইল ও হঠাতে অস্পষ্ট কর্তৃ উচ্চারণ করিল, “পাঁচটা টাকা” । আমজাদ তাহার মুনিতে পাইল না ।

দু'দিন পর ইয়াকুব এখানে পৌছিলে, দরিয়াবিবি তার শরণাপন্ন হইল ।

ভাই, আমার একটা আরজ আজ তোমাকে রাখতে হবে ।

আপনার আরজ । বলুন-বলুন । ইয়াকুব ভয়ানক আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, আপনি এত চুপচাপ থাকেন ।

ভাই, চুপচাপ কি সাধে থাকি । দেখছ না, কত সুখে আছি ।

আপনার দৃঢ় কি । আপনার মুখের হাসির দাম লাখ টাকা ।

অন্য সময় এমন গায়ে-পড়া প্রশংসা দরিয়াবিবি বেয়াদবীর সামিল মনে করিত । আজ তা গায়ে মাখিয়া লইল । ইয়াকুব কিন্তু কথাটা বলিয়াই দরিয়াবিবির দিকে আড়চোখে তাকাইল ।

লাখ টাকা নয়, পাঁচ টাকার আরজ ।

মোটে । ইয়াকুব ঠোট কুঁচকাইল ।

হ্যা ।

মোটে ?

হ্যা, কিন্তু মাস-মাস দিতে হবে ।

কাউকে দেবেন ?

হ্যাঁ।

কা'কে?

তা কোনোদিন জানতে চেয়ো না।

আপনার যা হকুম। ইয়াকুব হাসিয়া ঘাড় নোয়াইল ও কহিল, আপনি বলেন, আর কি দরকার। আপনি একদম পাথরের মত কি-না, মুখে কিছু বলেন না। আজ ধান নিয়ে গেলাম। কই, কিছু ত বললেন না?

তোমার জমির ধান তুমি নিয়ে গেছ। কি আবার বলতে হবে? দরিয়াবিবির কষ্টে মোলায়েম ব্যঙ্গের সূর।

কেন বলবেন না? আপনারা আমার আপনজন। জমি কিনেছি বলে ধানও নিয়ে যাব? নিশ্চয় নিয়ে যাবে।

আপনজনেরা এমন নিষ্ঠুর হয় না।

নিষ্ঠুর আবার কি?

নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করতে ত পারতেন, কেন ধান নিয়ে গেলাম। থাক সে কথা। এখন আমাকেই বলতে হয়। ঘরে আমার দৃঢ়ি পোস্তের তিবি আছে। ইয়াকুব একগাল হাসি মুখ হইতে খালাস করিয়া বলিল, তাদের চোখ টাটায়। জমি কিনেছি অথচ ঘরে ধান যায় না। এবার তাই নিয়ে গেলাম। এই নিন ধানের টাকা।

ইয়াকুব পকেট হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিল।

এখন বাজার-দর আড়াই টাকা! দশ মণ ধান হয়েছিল। দরিয়াবিবি ইয়াকুবের দিকে তাকাইল। কৃতজ্ঞতার এমন দৃষ্টি কেহ কোনজিন দরিয়াবিবির চোখে দেখে নাই।

ইয়াকুব মানিব্যাগ হইতে আবার পঁচিশটাকার একটি নোট বাহির করিল।

এই নিন। আমি মাসে মাসে এক্ষুটাকাটা ও দেব।

দরিয়াবিবি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

ভাবী, আমাকে আপনজন মনে করবেন।

দরিয়াবিবি তার কোন জবাব দিল না। ইয়াকুবের দিকে সোজাসুজি তাকাইল মাত্র। সে তয়ে চোখ নামাইয়া লাইল।

ইয়াকুবের হালচাল রাত্রে শুইয়া দরিয়াবিবি তোলপাড় করিতে লাগিল। বালিশের নীচে নোটখানি এখনও চাপা। অঙ্ককারে হাতড়াইয়া দরিয়াবিবি নোটখানি নিজের চেখের উপর চাপিয়া ধরিল। ভয়ানক কান্না পাইয়াছিল তার।

চোখের পানি শুষিয়া লাইতে এমন কাগজেরই যেন দরিয়াবিবির প্রয়োজন বেশি।

৩৫

পোস্টাপিস হইতে আমজাদ একটি খাম কিনিয়া আনিয়াছিল।

দরিয়াবিবি বলিল, একটা চিঠি লিখে দে, আমু। তোর মুনি তাই যেন তাড়াতাড়ি আসে। আমজাদ পত্র লিখিতে বসিল। এমন সময় হাসুবৌ হাজির হইল।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করে, হাসুবৌ, আর যে এদিকে এলে না? দশ-বারো দিন হোলো।

সন্তর্পিত হাসুবৌ চারিদিকে চাহিয়া লইল, যেন তার আওয়াজ বেশিদূর না পৌছায়;
অথবা কেউ আছে কি-না। পরে ফিস্ফাস্ শব্দে বলিল, শাউড়ীর মেজাজ জানো না, বুবু? এদিকে এলেই চটে। আর ছেলে হয় নি। আর খোঁটা ধরে ওরু করবে হাজার কাল্পাম।

কখন আসি, বুবু।

সাকের ভাই কোথায়?

তার ভাবনাতেও অস্তির ছিলাম। আবার কোন জমিদারের জমি দখলে গিয়েছিল!

মানা করতে পারো না?

মানা শোনে কৈ? এবার পায়ে ঢোট লেগেছে। চুন-হলুদ করে দিলাম কাল। আজ
ভালো আছে। সাত আট দিন গিয়েছিল। এই জন্যেও তেবে অস্তির। ছাই, মন ভাল
না থাকলে কি কোথাও বেরলতে ইচ্ছে করে?

হাসুবৌ দরিয়াবিবির দিকে জিজসু নেঞ্চে তাকাইল।

সহভানুভূতি জানাইল দরিয়াবিবি, তা ঠিক। মন ভাল না থাকলে খাট-পালক্ষে ওয়েও
সুখ নেই। অতঃপর আমজাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমু, আর অন্য কোন কথা
লিখিস নে। ওধু আমার কথা লেখ। আর আমরা ভাল আছি।

আমজাদ পেঙ্গিল চালাইতে চালাইতে জবাব দিল, আচ্ছা মা।

হাসুবৌ জিজসাম করিল, কাকে চিঠি দিচ্ছ বুবু?

আমার মুনিকে।

মুনির খবর পেয়েছে?

হ্যাঁ।

সোব্বান আল্লা। আমু চাচা, আমার দোয়া লিখে দিও। হাসুবৌ বড় উৎফুল হইয়া
উঠিল। পরে বলিল, কি সুন্দর ছেলে। অমন না হোলে মায়ের কোল জুড়ায়!

আমার বুক জুলতেই রইল, হাসুবৌ। দরিয়াবিবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল।

বুবু, তোমার ধন তোমার বুকেই ফিরে আসবে। দেবো, আমার কথা নিশ্চয় সত্যি
হবে। আমার মন বলছে।

সোনা-কপালী, তোমার মুখে কাটা যাই। তা যদি হয়, আমি এই অকূলেও কূল পাই।

ঠিক তোমার হক্কের ধন ফিরে আসবে।

পনের বছর বয়স। এখন কত বড় হয়েছে। আজ ক'বছর চোখের দেখা দেখতে
পাই নি।

দরিয়াবিবির কাতরদৃষ্টি হাসুবৌকে স্পর্শ করিল। দুইজনে একে অপরের দিকে তাকায়।

আমাজাদের লেখা শেষ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

তবে আবার কি লিখিবি?

লিখে দেব— আবৰা ইন্তেকাল করেছে।

ধমক দিয়া উঠিল দরিয়াবিবি, না, ওসব লিখতে হবে না।

আচ্ছা।

শান্ত আমজাদ যেন ঠাণ্ডা হইয়া গেছে, এমন উচ্চারণের ভঙ্গী।

হাসুবৌ উঠিয়া বলিল, এখন যাই বুবু। আমু চাচা, আমাকে একটু এগিয়ে দাও।
আমজাদ খুব রাজী। সে হাসুবৌর অনুসরণ করিল।
ভিটার নীচে সড়কের উপর দুই জনে দাঁড়াইল। গোধূলির ছায়ায় চারিদিক বিষণ্ণ।
হাসুবৌর গা এমন ঝোপে-ঝাড়ে সত্ত্ব হ্রস্ব করে। মহেশ্বরাঙ্গ জঙ্গল বলিলেই চলে।
নীচের পথের সাদা-সাদা রেখা আব্ধা। দু'পাশে কী কি ভাকা অনেকক্ষণ শুরু হইয়াছে।
আমজাদের পিছনে হাসুবৌ।

কিয়দূর অহসর হইলে বৌ আমজাদের হাত ধরিয়া বলিল, চাচা, আমার দোয়া লিখে
দিয়েছো?

দিয়েছি, হাসু চাচী।

সত্ত্ব? কিরা দিছি আমার গা-ছুঁয়ে বল।

আমজাদ হাসুবৌর কাঁধ ছুইয়া বলিল, দিয়েছি, দিয়েছি, দিয়েছি, তিনি সত্ত্ব।

হাসুবৌ খুব খুশি হইয়া বলিল, কাল এসো চাচা, তোমার জন্য ক্ষীর বানিয়ে
রাখব।

আচ্ছা, আসব।

আর মুনির চিঠি এলে খবর দিও, দেরী করো না চাস।

হাসুবৌর অনুরোধ ভঙ্গী বড় অস্তুত দেখায়।

এবার তুমি যাও। এখন আমি বাড়ি যেতে পারবো পথে সাপ দেখে যাস, বাপ।

আমজাদের নিজেরই ভয় লাগিতেছে এবার। জবাব দেওয়ার জন্য সে আর বিলম্ব
করিল না। তার সবচেয়ে বেশি ভয় সাপের

৩৬

তিনি-চার মাস পরে মোনাদিরের আর একটি পত্র আসিল। সে ঠিকানা বদল করিয়াছে।
এত বাড়িতে জায়গীর ছিল। কোন কারণে তাহারা আর ছাত্র রাখিতে পারে না। তাই
অন্যত্র গিয়াছে মোনাদির। সেখানে মাসিক পনের টাকার কম খরচ পড়ে না। এখন সে কি
করিবে, তাহাই ভাবনার ব্যাপার।

দরিয়াবিবির মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। পনের টাকায় তাহাদের সমষ্টি মাস
নির্বিঘ্নে চলিতে পারে। ধান যে কয় মণ পাওয়া যায়, তাহা দিয়া চার মাসের মাত্র
খোরাক হয়। বাকী দিন আল্পাই চালান। কখনও আমজাদ চন্দ্রের সঙ্গে মুনিশ খাটিতে
যায়। এত ছেট ছেলে লোকে লইতে চায় না। শুধু চন্দ্রের খাতিরে তিনি আনা চার আনা
দেয় মাত্র। গরু, বাচ্চুর, মূরগি-হাঁস ডিম বিক্রি ইত্যাদির উপর দিয়া কোন রকমে দিন
গুজরান। ইহার উপর মুনির এই অনুরোধ। দরিয়াবিবি ভাবিতে লাগিল। উপায় একটা
স্থির করিতে হইবে। আবার ইয়াকুবের ধর্ণা! না তা সম্ভব নয়। তবু একই কেন্দ্রে সমষ্টি
চিন্তা স্নোতায়িত হইতে লাগিল। শেষে দরিয়াবিবি স্থির করিল, ইয়াকুবকে বলিয়া দেখিতে
হইবে।

ইয়াকুব প্রস্তাৱ শুনিয়া হাসিয়া বলিল, ভাবী, আপনার যা দৰকার, আমাকে বলেন

না কেন?

ভাই, তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছ। আমার বলতেও লজ্জা লাগে।

কোন লজ্জা করবেন না। আপনার মুখের হাসি আমি দেখতে চাই।

হাসি কি সহজে আসে!

মন নরম থাকলে আসে বৈকি।

ইয়াকুব দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া আবার মনু হাসিল। বৈধব্যের পর দরিয়াবিবির শরীরের তেমন পরিবর্তন ঘটে নাই। চেহারায় আর একটু রুক্ষতার ছাপ লাগিয়াছে মাত্র। তার ফলে আরো আগুরমণীর মত দেখায় দরিয়াবিবিকে। হঠাৎ কারো চোখে পড়িলে মনে হইবে, যেন কত দেমাকী। কিন্তু দরিয়াবিবি নিজের দিকে চাহিয়া আর কিছু দিশা করিতে পারে না। সে যেন আসেক্জানের মত হইয়া যাইতেছে। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যায় তখন দরিয়াবিবি।

না ভাই। বাইরে থেকে আমি দেখতে অমন। খুব মোলায়েম সুরে দরিয়াবিবি জবাব দিল।

আপনি কষ্ট পান খায়াখা। আমাকে বললেই হয়। পনের টাকা আমি মাস-মাস দেব। আপনি যাওয়ার সময় তিনি মাসের আগাম চেয়ে নেবেন।

আল্লা তোমার মঙ্গল করুক, ভাই। ধনে-দৌলতে তিনি তোমাকে আরো বাড়ান।

প্রায় গদগদভাবে দরিয়াবিবি উচ্চারণ করিল।

আপনার দোয়া। তারপর ইয়াকুব আবার নিজেজ্জর মত তাকাইয়া বলিল, আপনার হাসির দাম লাখ টাকা।

খায়াখা লজ্জা দাও, ভাই। আমরা গরীব-দুঃখী, আমাদের আবার হাসি— তার আবার দাম। ব্যক্তের হাসি হাসিয়া দরিয়াবিবিরাক সমাঞ্চ করিল।

ইয়াকুব হাসি ছাড়িয়া বোধ হয় আর কিছু মূল্য যাচাইয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দরিয়াবিবি তার সুযোগ দিল না। ওদিকে হাঁড়ি ঢাকিয়ে এসেছি, এঁচে গেল, গঙ্গ উঠেছে— বলিয়া দরিয়াবিবি রান্নাঘরের দিকে ছুটিল।

ইয়াকুব দরিয়াবিবির ছন্দময় দেহাবয়বের দিকে পশ্চাত হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ও মনু মনু হাসিতে লাগিল।

উপবাস এই সংসারে দরিয়াবিবির জন্য অচেনা কিছু নয়। মাঝে মাঝে কোনদিন ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েরা হাঁড়িতে ভাত থাকা পর্যন্ত আর ক্ষান্ত হয় না। দরিয়াবিবি তখন পরিবেশন করিয়াই খুশি। এই চালাকি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তখন আমজাদ লজ্জিত হয়। নঙ্গীমা, শরীফা কি-বা বোঝে। আমিরন চাটীর কাছে ধরা পড়িলে দরিয়াবিবি খুব বকুনি খায়। একদিন ত চাটী অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আমরা ত আঞ্চল্য-স্বজন নই, আমাদের কাছে কেন কিছু বলবেন, বুরু। দু'মুঠো চাল কি তরকারী আমজাদকে দিয়ে আনালে কি আমি অসুবিধায় পড়তাম?

কিন্তু দরিয়াবিবি আরো অভিমানী। কোন কিছু যাহার বেলা সে যেন মর্মে মর্মে মরিয়া থাকে। নিজের অতীতের দিকে চাহিয়া সে নিজেকেই আর বিশ্বাস করে না। আঞ্চলিকাস ক্রমশঃ অভর্তিত হইয়াছে। পূর্বে অনন্হীন দিন এমন বিষণ্ণ বোঝা মনে হইত না।

সেদিন রাত্রে আমজাদ ও নঙ্গীর জন্য দরিয়াবিবির ঠোটে আর ভাত উঠে নাই। সকালে শরীর বড় ঝিমখিম করিতেছিল। ইয়াকুব আসিল সেই সময়। রাজগীর কমতি নাই তার। ভাল চাল, মাছ শাক-সবজি, ঘী কিছু বাদ পড়ে নাই তার আড়ম্বর-লীলায়।

দরিয়াবিবি অগত্যা রান্নায় বসিল। তারপর সকলের শেষ খাওয়া। দরিয়াবিবি অভুক্ত শরীরে সেদিন আহার করিল। রীতিমত আহার। পূর্বে অপরের দেওয়া অন্ন সমূখে, সে আসেক্ষণের চলিশার খাওয়ার কথা স্মরণ করিত। আজ অতৃপ্তির কোন বালাই ছিল না। ক্ষুধার্ত জঠর বাকীটুকু পরিবেশন করিল।

দুপুরের পর আমজাদ চন্দ্রকাকার কাছে কাজের তল্লাশে গেল। নঙ্গী শরীরে কোলে করিয়া হাসুবৌর বাড়ি পৌছিল। আগের দিন বৌ তাহাদের দাওয়াৎ করিয়া গিয়াছিল। নৃতন ছাঁচিলাউ কাটা হইয়াছে, ক্ষীর রান্না হইবে আজ।

হাতে বহু কাজ। ইঁড়িপাতিল মাজা হয় নাই, গৃহপালিত আগল-পাগল্দের খবরদারী বাকী আছে। তবু ভরা খাটে খোয়ারী ধরিয়াছিল। একটু গড়াইয়া উঠিয়া পড়িবে, এই আশায় শোয়ামাত্র কিন্তু দরিয়াবিবির বেশ ঘূম পাইল। অভুক্ত শরীর মাঝে মাঝে যদি ছুটি চায়, তা বিচির কিছু নয়।

বাইরে বৈশাখের উক্ষণ দিন। এখানে খোপ-জঙ্গল ভেদ করিয়া গরম ঝামাল আসে না। তাই ঘরের ভেতর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হয়। জানালার পাশে কাঠাল গাছে ঘুম ডাকিতেছিল। একটোনা স্বরে। আজ কোন উদ্বেগ দরিয়াবিবির-ক্লান্তির শরীরে হানা দিতে পারে না। বেশ ঘূম ধরিয়া গেল।

কিন্তু ঘূম তাহার আবার আচমকাই ভাঙ্গে। দরিয়াবিবি হঠাৎ অনুভব করে, কার যেন গভীর আলিঙ্গনে সে একদম নিষ্পিষ্ট। ছেঁয়ে খুলিয়া দেখিল, ইয়াকুব। দরিয়াবিবি প্রথমে ঘরের খোলা টাটির দিকে চাহিল। ঘুমের দরজা খোলা ছিল, এখন বক। দরিয়াবিবির মনে হয় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে তার সমস্ত শরীর। আর একজনের উক্ষণ নিঃশ্বাস শুধু নাকে লাগিতেছে। একবার উঠিতে গেল সে। কিন্তু দুর্দান্ত দৃঢ়তায় আর একজন তাহাকে সাপটিয়া বাঁধিতেছিল। নিষ্ঠেজ নিধরতায় দরিয়াবিবি চূপ করিয়া রাহিল। আর চোখ খুলিল না। সে যেন অক্ষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট নিরবচ্ছিন্ন অঙ্ককারে আবৃত।

বাহিরে পুত্র-হারা ঘুম জননী এক মনে শুধু ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতে লাগিল।

৩৭

সন্ধ্যায় আহারের সময় আমজাদ বলিল, মা, ইয়াকুব চাচা হঠাৎ চলে গেল। কাল ত যাবার কথা।

দরিয়াবিবি প্রথমে জবাব দিল না। পরে হঠাৎ আগুন হইয়া বলিল, খাচিস, খা। তোর আবার এত কথা কেন? আমজাদ মাঁর দিকে একবার চাহিয়া আবার আহারে মনেনিবেশ করিল।

সকালে সে আবার বকুনি খাইল। বাড়ির পাদারে সকালে উঠিয়া আমজাদ দেখে,

ରାନ୍ନା ତରକାରୀ ନୟ, ଶୁଦ୍ଧ-କ୍ଳାଚ ଶାକ-ସଜ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଯା ରହିଯାଛେ । କାଲ ଇଯାକୁବ ଚାଚା ଏହିସବ ଆନିଯାଛିଲ, ମେ ଜାନେ । ତାଇ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ମା'ର କାହେ ଉର୍ଧ୍ଵଶାସେ ଦୌଡ଼ିଯା ଆସିଲ ।

ମା, ଆନ୍ତାକୁଡେ କତ ତରକାରୀ କେ ଫେଲେ ଦିଯେଛେ ତୁମି ଦେଖବେ ଏମୋ ।

ଦରିଯାବିବି ହାସ-ମୂରଗିଦେର ଏକମନେ ଖୁଦ-କୁଡ଼ା ଖାଓଯାଇତେଛିଲ, ମେ ଯେଣ ପୁତ୍ରେର କଥା ପୁନିଯା ଶୁଣିଲ ନା ।

ପୁତ୍ର ଆବାର ଏତେଲା ଦିଲ ।

ଦରିଯାବିବି ତଥନ ଧମକ ଦିଯା ବଲିଲ, ହାତେ କାଜ ଆହେ ଦେଖିସ ନେ? ଚୋଖ କି ଫୁଟୋ ହେଁ ଗେହେ ତୋର?

ଆମଜାଦ ମା'ର ଥମ୍‌ଥମ୍ମେ ଚେହାରାର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଯା ହିଂସାକୁ ପୌଛିଲ, ଏଥାନେ ଆର ବେଶିକ୍ଷଣ ଥାକା ସମୀଚିନ ନୟ ।

ତିନ ଚାର ଦିନ ଆମଜାଦ ନିରୀହ ଛେଲେର ମତ ଘରେ ରହିଲ । ମା'ର ଏମନ ମୂର୍ତ୍ତି ମେ ଆର ପୂର୍ବେ ଦେଖେ ନାଇ । ଏମନଭାବେ କତ ଦିନ କାଟିତ କେ ଜାନେ, ଆବାର ଇଯାକୁବ ଚାଚାର ଆଗମନେ ସବ ଶାସ୍ତ ହଇଲ । ଏବାର ମେ ଏକା ଆସେ ନାଇ । ସଙ୍ଗେ ପୁତ୍ର ଓ ରସଦସମ୍ପାଦନ ଆନିଯାଛିଲ । ତାର ଛେଲେର ବସନ୍ତ ନୟ କି ଦଶ । ଆମଜାଦେର ପ୍ରାୟ ସମବସ୍ତ୍ରୀ । ହଠାଏ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ କେନ? ଦରିଯାବିବି ଅଚେଳା ଛେଲେର ସମ୍ମୁଖେ ସ୍ଥାଭାବିକଭାବେ ଅରସର ହଇଲ, ଇଯାକୁବକେ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ କରିଲ । ଦେବରେର ଚାଲ ବୋକାର ସାଧିୟ ଦରିଯାବିବିର ନାଇ ।

ମୋନାଦିର ଆବାର ପ୍ରତି ଲିଖିଯାଛିଲ । ତାଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବାଢ଼ି ଫେରାର ଆଗେ ଦରିଯାବିବି ଇଯାକୁବେର ନିକଟ ହଇତେ ପନେରଟି ଟାକା ଚାହିଁ ଦାଖିଲ ।

ଆମଜାଦ ବୁଝିତେ ପାରେ, ମା'ର ମେଜାଜ ଟିକ ହୟ ନାଇ । ଆଜକାଲ ମେ ବକୁଳି ଖାଯ, ନଈମା— ଏମନକି ଶରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦାକାଟି କାରିଲେ ପ୍ରହାର ଭୋଗ କରେ । ମା ଏମନ ଛିଲେନ ନା । ଏକଦିନ ମେ ଆମିରନ ଚାଟିର କାହେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗିଯା ଅଭିଯୋଗ କରିଯା ଆସିଲ ।

କାଜେର ଚାପେ କାମିନ ଆମିରନ ଚାଟି ଏହି ବାଢ଼ି ଆସିତେ ପାରେ ନାଇ ।

ଏକଦିନ ଆସିଯା ଜେରା ଶୁକ୍ର କରିଲ, ବୁବୁ, ତୁମି ନାକି ଛେଲେଦେର ବଡ଼ ମାରଧୋର କର?

ପୋଡ଼ାଜାନେ ଯଦି ମାରଧୋର କରି, କି ଅନ୍ୟାଯଟା କରି? ଏଗୁଲୋ ମରଲେ ଆମାର ହାଡ୍ ଜୁଡ୍ଗୋଯ ।

ଆମିରନ ଚାଟି ବାଧା ଦିଲ, ଛି ଛି ବୁବୁ, ଏମନ ଅପଯା କଥା ମୁସ୍ତେ ଆନେ! ଆମାର ଏକଟା । ମେଓ କମ ଜ୍ଞାଲାଯ ନା ।

ଏକଟା ଆର ଦୁଟୋ । ଏରା ଜ୍ଞାଲାତେଇ ଆସେ । ଏକଜନ ତ ମୁସ୍ତେ ଆର ଦେଖାଯ ନା । ତାର ଜନ୍ୟ ଜୁଲାହି । ଆର ମେ ଯେ କଟା ଆହେ, ତାରାଓ କମ ଜ୍ଞାଲାଛେ ନା । ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଲୋ ତୁଲେ ନିତେ ପାରେ ନା?

ଦରିଯାବିବି ଖୁବ ଅପ୍ରକତିତ୍ତୁ । ଆମିରନ ଚାଟି କାଜେର ବାହାନାୟ ମେଦିନ ଆର ବେଶିକ୍ଷଣ ବାକ୍ୟାଲାପ କରିଲ ନା । ଚଲିଯା ଗେଲ ।

ଦୁପୁରେ କୁଡ଼ା ପାଯ ନାଇ, ଉଠାନେ ତାଇ କତଞ୍ଚିଲି ମୂରଗି କଟକଟ ଶବ୍ଦେ କାନ ଝାଲାପାଲା କରିତେଛିଲ । ଦରିଯାବିବି କ୍ରୋଧେ ହାତେର ନାଗାଲେ ପାଓଯା ଏକଟି ମୂରଗି ଧରିଯା ଏକ ଆଛାଡ଼ ଦିଲ । ଆହତ ପ୍ରାଣି ବଟପଟ କରିତେ ଲାଗିଲ ।

ନଈମା ଚୋଥେ ଭାଲ ଦେଖେ ନା, ଦାଓଯାୟ ବସିଯାଛିଲ । ମେ ମେଥାନେ ହଇତେ ବଲିଲ, ମା, ମୂରଗି

জবাই করছ? দরিয়াবিবি চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়া হারামজাদী, তোকে জবাই করব।

আমজাদ এই সময় খেলা সারিয়া ফিরিতেছিল। সে মা'র হৃক্ষার শুনিয়া ধীরে ধীরে দহলিজের দিকে চলিয়া গেল। হাওয়া ফিরিলে, সে-ও ফিরিয়া আসিবে।

৩৮

শাপদেরা ওঁৎ পাতায় সুদক্ষ। ইয়াকুবের কৌশলের অন্ত ছিল না। রঙের আশাদ পাওয়া শিকারী প্রাণীর মত সে এই বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল। অস্তর্ক ও অসহায় মুহূর্তের সুযোগের সে কোন অসম্ভবহার করিত না। সজ্ঞতির ভেলা ভাসাইয়া ক্রিপে নদী পারাপার করিতে হয়, তা-ও সে জানিত বৈকি।

* * * *

বাড়ির আবহাওয়া আমজাদের কাছে অসহ্য দাগে। মা সব সময় কি যেন চিন্তায় বুঁদ। পান হইতে চুন খসিলে শৌসানি-বকুনি। আর কোন দিন সে এমন আসোয়াস্তির সম্মুখীন হয় নাই।

আমজাদই একদিন আসিয়া খবর দিল, মা, মুনিভাই পত্র দিয়েছে। লিখেছে, কাল আসবে।

কাল?

হ্যাঁ।

বেশ। আমজাদ মা'র মুখের দিকে চাহিল, কোন ফুল্লতার আভাস নাই। যেন দৈনন্দিন ঘটনার মত কোন সংবাদ আনিয়াছে সে-

মা! আমজাদ ডাক দিল।

কি?

আমি লিখেছিলাম, আক্রা মারা গেছেন। সংসারে বড় টানাটানি। তুমি একবার এসো, মুনিভাই।

তোকে এসব কে লিখতে বলেছিল? দরিয়াবিবি পুত্রের দিকে রুক্ষ চোখে তাকাইল। আমজাদ সোজাসুজি তাকাইতে পারে না, কিন্তু নরম গলায় জবাব দিল, মা, আক্রা মেরেছিল, তাই মুনিভাই আসতে চায় না। আমি তোমাকে না জানিয়ে এই জন্য খবর দিয়েছিলাম।

বেশ। তারপর দরিয়াবিবি অন্য কাজে চলিয়া গেল।

পরদিন আমজাদ নিজেই গ্রামের মেঠো পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। রেল স্টেশন অনেক দূরে। মুনি ভাই ক্লান্ত হাঁচিয়া আসিবে, এতটুকু অভ্যর্থনা না করিলে সে সোয়াস্তি পাইবে না।

সত্যই মোনাদির আসিয়াছিল। দুই ভাইয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিলে নইমা চীৎকার শুরু করিল, দাদা এসেছে মা, দাদা এসেছে।

দরিয়াবিবি তখন রান্নাশালায়। পাঁচ মিনিট তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মোনাদির অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মা কোথায়, নমু? নইমাকে আদর করিতে করিতে মোনাদির জিঞ্চাসা করিল।

ରାନ୍ଧାଘରେ ।

ଆୟ ଚଲ, ଆମି ଯାଛି । ସେ ରାନ୍ଧାଘରେ ଚୁକିଯା ପଡ଼ିଲ । ଚଲା ଜୁଲିତେହେ । ଅଗ୍ନିଶିଖାର ହିସ୍‌ହିସ ଶବ୍ଦ ହଇତେହେ ଯାତ୍ର । ଦରିଯାବିବି ଚଲାଯ ଜ୍ଞାଲ ଦିତେ ଦିତେ ଏକଟା ବାଂଶେର ଖୁଟିର ଗାୟେ ଠେସ ରାଖିଯା ଘୁମାଇତେହେ ।

ବିଶ୍ଵିତ ଦୁଇ ଭାତା । ଆମଜାଦ ଡାକିଲ, ମା ମା, ଦ୍ୟାଖୋ, କେ ଏସେହେ ।

ଦରିଯାବିବି ହଠାଂ ଚୋଥ ଖୁଲିଯା ବଜ୍ଞାହତେର ମତ ଚାହିଯା ରହିଲ । କୋନ ଆକୁଳ ବ୍ୟଗ୍ରତାଯ ଉଠିଯା ହଞ୍ଚ ପ୍ରସାରିତ କରିଲ ନା ।

ମୋନାଦିରେ ଶରୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଛେ । ପନେର ବଚର ବସ । ବେଶ ଲୟା-ଚଓଡ଼ା । ଗୌଫେର ରେଖାଯ ତାର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠେର ଶୋଭା ଢାକା ପଡ଼ିଯାଛେ । ଦରିଯାବିବି ଯେନ ତାଇ ଦେଖିତେଛି ।

ଆମଜାଦ ବଲିଲ, ଚିନତେ ପାରଛ ନା ମା, ମୁନିଭାଇ । ଦ୍ୟାଖୋ କତ ବଡ଼ ହେଁଯେଛେ ।

ଦରିଯାବିବିର ଚୋଥେର ପାତା ବକ୍ଷ ହ୍ୟ ନା । ପକ୍ଷାଘାତହଞ୍ଚ ବୋଗୀ ବସିଯା ଆଛେ ।

ମୋନାଦିର ଡାକିଲ, ମା ।

ଅଗରପକ୍ଷ କୋନ ସାଡା ଦିଲ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଚୋଥେର ପଲକ ଫେଲିଯା ଦରିଯାବିବି ଆବାର ତାକାଇଯା ରହିଲ ।

ବିଶ୍ଵିତ ଆମଜାଦ । ନଈମା ପିଛନ ପିଛନ ଆସିଯା ଦାଢ଼ାଇଲ ।

ଏତକ୍ଷଣ ମନେ ଛିଲ ନା । ମୋନାଦିର କଦମ୍ବୁସି କରିବୁ ବସିଯା ପଡ଼ିଯା ମା'ର ପାଯେର ଦିକେ ହାତ ବାଡ଼ାଇଲ । ତଥନଇ ଦରିଯାବିବି ହାଟ ମାଟ ଶବ୍ଦେ ପ୍ରତିକେ ଜଡ଼ାଇଯା ଧରିଯା ଡୁକରିଯା କାନ୍ଦିଯା ଉଠିଲ ।

ମୋନାଦିର ମା'ର ଉତ୍ତଣ ନିଃଶାସ ଓ ଉତ୍ତଳିତ ବକ୍ଷେର ସ୍ପନ୍ଦନ ସାରାଶରୀରେ ଅନୁଭବ କରେ । ସେ-ଓ ନିଃଶବ୍ଦେ କାନ୍ଦିତେ ଲାଗିଲ ।

୩୯

ବୁବୁ ଦ୍ୟାଖୋ ଦ୍ୟାଖୋ, ମୁନି ଚାଚା ବଡ଼ ହ୍ୟ କେମନ ଦେଖାଛେ । ଆମିରନ ଚାଚି ଦରିଯାବିବିକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଯା ବଲିଲ ।

ତିନ-ଚାର ବଚର— କିଛୁଟା ବେଡ଼େହେ ।

କିଛୁଟା ନଯ । ମୁଖ୍ୟାନା ଦ୍ୟାଖୋ । ବଡ଼ ହଲେ ତୁମି ଦେଖୋ ବୁବୁ, ଆଟ-ପିଠ ଆମାର ମତ ହବେ । ତୋମାର ପାଯେର ନଥେର ଯୁଗ୍ମ ହୋୟେ ବେଚେ ଥାକ ।

ଆମାର ଯତ ଚୁଲ, ଚାଚାର ତତ ବଚର ପରମାୟ (ପରମାୟ) ହୋକ— ଆମି ଦୋଯା କରାଇ ।

ଆମିରନ ଚାଚିର ଦାଓଯାୟ ରୀତିମତ ଭିଡ଼ । ଦୁପୁରେର ପରେଇ ଦରିଯାବିବିର ଛେଲେଦେର ଲଇଯା ଆସିଯାଛେ । ହାସୁବୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଖାନେ ଆସାର ଜିନ ଧରିଯାଛେ । ଭିଟାର ଗଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟେ ବଚରେର ପର ବଚର ଆର କାହାତକ ଭାଲ ଲାଗେ । ସେ-ଓ ଆଜ ଶାଙ୍କୁଭୀର ତୋଯାଙ୍କା ନା କରିଯା ଆସିଯାଛେ ।

ମୋନାଦିର ରୀତିମତ ଘାମିତେ ଥାକେ । ସେ ବେଶ ଟଟପଟେ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ଏମନ ଆଗ୍ରହିକ ପରିବେଶେ ସେ ବଡ଼ ମ୍ଲାନ ହଇଯା ଯାଯ । ଆସିଯା ହାଁ କରିଯା ମୋନାଦିରେ ଦିକେ ତାକାଯ । ପାଂଚ ବଚର ଆଗେ ସେ ଗୋଧୁଲି ଲାଗା ସଡ଼କେ ମୋନାଦିରକେ କେମନ ବୋକା ବାନାଇଯାଇଲ, ଆଜ ମନେ

পড়িয়া যায়। আবিয়ার সারা শরীর লজ্জায় ছাওয়া।

আমিরন চাটী মেয়েকে ধর্মক দিয়া বলিল, দেখছিস কি হতভাগী, তোর মুনিভাই। যা, তোরা সব খেলা কর গে। কিন্তু আবিয়া আশ্রয়ার্থী, সে ধীরে ধীরে দরিয়াবিবির পাশে আসিয়া বসিল আর নড়িতে চাহিল না। হাসুবৌর কাছে ত মোনাদির আর মুখ খুলিতে পারে না। হাঁ-না দিয়া জবাব দায়সারা করে। হাসুবৌ মোনাদিরের উদ্বারে আসিল, চাচা, কথা বলো, তুমি কেমন হয়ে গেছ।

মোনাদির মাথা হেঁট করিল। মা'র আদেশে সে আসিয়া চাটীকে সালাম করিয়াছিল আর মুখ খুলিতে পারে নাই।

এমন লাজুক কেন, চাচা। আমিরন চাটী মোনাদিরের দিকে চাহিল।

পুত্রের বদলে জবাব দিল মা, বড় হয়েছে— এখন সব বোঝে ত। মুরুবীদের সামনে কি বেশি কথা বলে? বেয়াদবী হয় যে!

তোমরা খেলা কর গে। যা, যা আবিয়া, যা। আমিরন চাটী মেয়েকে এক ঠেলা দিল।

আমজাদ মুনিভাইয়ের সঙ্গ পাইলে আর কিছু চায় না। সে বলিল, চলো দাদা।

এতক্ষণে মনোমত প্রস্তাব আসিয়াছে। মোনাদির সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। আবিয়া তখন সলজ্জ ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে এক দৌড়ে আমজাদ ও মোনাদিরের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। হাসুবৌ কহিল, চাটীকে মেয়ে একখানা। বড়া ভাজা। দেখলে, কীভাবে দৌড় যাবল।

যাক যাক। ও একটা জ্বালানি।

মেয়ের প্রশংসা মা সহ্য করিতে পারল না।

বুবু, ছেলে এবাব তোমার হেল না? আমিও ত বলেছি, না এসে পারে?

আমার কোন ভরসা নেই।

এমন অলস্কুণে কথা মুখে এনো না।

দরিয়াবিবি কোন জবাব দিল না, শুধু দীর্ঘনিঃখাস ফেলিল। চাটী আবার জিজ্ঞাসা করিল, ক'দিন থাকবে?

কুলের ছুটি আছে চারদিন। পরশু আবার চলে যাবে।

ও, বলিয়া আমিরন চাটী একটু চিন্তাপূর্ব হইল।

তোমরা খুব বুঝিয়ে বলো, বোন। আবাব যদি চলে যায়, আমি আর বাঁচব না।

হাসুবৌ ও আমিরন চাটী এক জোটে সায় দিল, নিশ্চয় বলব।

আবিয়া হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল। তার দিকে সকলের লক্ষ্য।

এই পোড়াযুবী, হাসছিস কেন?

আবিয়া মা'র মধুর সমোধনে হাসি ক্ষ্যাতি দিল। পরে বলিল, মুনিভাই গাছে চড়ে গান ধরেছিল। হঠাৎ একটা বাঁদর দেখে নামতে নামতে কাঠপিপড়ে কামড়েছে। তাই হাসি।

আবাব কোথা থেকে মড়ার বাঁদর এসেছে। গাছপালা রাখা দায়। সেদিন আমার শিমগাছ খেয়ে গেছে। আমিরন চাটী উঠানের গাছপালার দিকে তাকাইল।

কথায় কথায় বেলা শেষ। মোনাদির ফিরিয়া আসিলে আজ চাচী নানা উপদেশ দিলেন। আমিয়ার জড়তা কাটিয়াছে। সে সকলের সঙ্গে খুব চাকুম চাকুম শব্দে মুড়ি ও নাড়ু থাইল।

দরিয়াবিবি বলিল, অবেলাটা বড় সূখে কাটল আমিরন বোন।

আবার এসো মুনি চাচ। তুমি পরণ দিন সকালে যাবে, তখন আমি থাকব এই হতভাগীকে সঙ্গে নিয়ে। চাচী সহায়ে মেয়ের দিকে আঙুল বাঢ়াইল।

হাসুবৌ শুধু বড় শ্রিয়মাণ। তার আবার শাশ্বতীর ভয় জাগিয়াছে।

আজ আমিরন চাচী সকলের সঙ্গে সড়কের অনেক দূর পর্যন্ত আগাইয়া আসিল কথা বলিতে বলিতে। কথা আর ফুরায় না।

৪০

চন্দ্ৰ কোটালের প্রস্তাৱ মোনাদিরের খুব ভাল লাগিয়াছিল। মুনি চাচ লেখাপড়া জানে, আমাদের গানের দলের অধিকারী হবে, আর সমস্ত গান লিখে রাখবে। আজকাল গেঁয়ো, সোজা গান বাবুৰা পছন্দ করে না। চাচ ভাস্ম ঠিক করে দেবে?

কিন্তু যথাসময়ে মোনাদির চলিয়া গেল। এই বাড়িতে কেন যেন মন টেকে না। মাঝে মাঝে মায়ের হৃদয়ের উভাপহীনতা সে উপলক্ষি করিয়ে শিখিয়াছিল। এই তিনদিনেই সে বুঝিয়াছিল, মা আগের মত তার জন্য আকুলি বিকুলি করে না। দরিয়াবিবির আকস্মিক ব্যবহারে আমজাদ দুঃখ পাইত, মোনাদির যিস্যুত হইয়াছিল। কিন্তু কিশোরের মনে তার কোন বিশেষ দাগ পড়িল না। যাওয়ার দিন দরিয়াবিবি বারবার অনুরোধ করিল, সে যেন ছুটি পাইলেই চলিয়া আসে।

হাসুবৌ ইদানীঁ এই বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করে। কাছে সহানৃতিশীল আর কোন প্রতিবেশী নাই। বন্ধ্যা জীবনে জুলুম সহ্য করিতে হয়। এইখানে তবু মনের ভার হাল্কা করা যায়। দরিয়াবিবি এই নিরীহ সরল বধূটির প্রতি বড় মেহশীল। সাকেরের মা তাই লইয়া মনে মনে গজ গজ করিত, অবশ্য মুখে কিছু বলিত না। কারণ সাকের দরিয়াবিবির কথা সহজে অবহেলা করে না। দরিয়াবিবির খাতিরে সে তার মা'র সঙ্গে বিবাদ জুড়িতেও প্রস্তুত।

মোনাদির চলিয়া যাওয়ার দিন খুব সকাল সকাল হাসুবৌ এখানে আসিয়াছিল। অনেক বেলা হইয়া গেল, তবু বাড়ি যাওয়ার নাম নাই। দরিয়াবিবির সহিত এ-কথা সে-কথা ও গৃহস্থালীর ছোটখাটো কাজ করিয়া দিল।

বুবু, মন খারাপ করো না, এমন সোনার চাঁদ ছেলে। ও তোমার ছাড়া কাব? এমন বছ সান্ত্বনা-বাক্য হাসুবৌর মুখে আজ যেন লাগিয়াই ছিল।

দরিয়াবিবি বড় বিষণ্ণ। কাজকর্ম করিতেছিল, কিন্তু সহজ কথোপকথনে তার মন ছিল না।

বাঁশের একটি চৃপ্তি ভাঙিয়া গিয়াছিল। হাসুবৌর সহযোগিতায় দরিয়াবিবি তা মেরামত করতে বশিল।

বুবু, আল্টার মরজী, তোমার শরীর বেশ আছে। তুমি বেশ মোটা হচ্ছ।

দরিয়াবিবি কোথায় কাগড় অসমৃত এই আশঙ্কায় নিজের দিকে চাহিয়া লইয়া জবাব দিল, লোকে বলে, আছে ভালো, কিন্তু ওদিকে শালুক খেয়ে যে দাঁত কালো তার খবর কেউ রাখে না।

হাসুবৌ চুপ করিয়া গেল। দরিয়াবিবির কষ্টে সৌহার্দের লেশ ছিল না। যেন ঝগড়ার মুখে আর একজনের সঙ্গে সে কথা কাটাকাটি করিতেছে।

শাশুভ্রীর চীৎকার শোনা গেল। হাসুবৌ ইঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দরিয়াবিবির যেন তার উপর কত খাপ্পা। হাসুবৌ তাই ভয় পাইয়া মৃদুকষ্টে বলিল, এখন যাই, বুবু।

দরিয়াবিবি নিজের মনে একটি কঞ্চি ফাড়িতে লাগিল, কোন জবাব দিল না-হয়ত শুনিতে পায় নাই। সে নিজের কাজে মগ্ন। হাসুবৌ অপরাধীর মত বিদায় লইল।

সেদিন বিকালে ইয়াকুব আসিল। সঙ্গে পুত্র। তাহাকে দরিয়াবিবির কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল। আবার দু'দিন পরে আসিবে সে।

সমগ্র পরিবারের রসদ দিয়া গিয়াছে, দরিয়াবিবির কোন অসুবিধা ছিল না। নিজের ছেলে আজই প্রবাসী, আবার পরের সন্তান ঘাড়ে। কিন্তু দরিয়াবিবি কোন অবহেলা দেখাইল না। ছেলেটার নাম ওয়ায়েস। বেশ ফুটফুটে কথা বলে। আর বড় সুন্দর জবাব দিতে পারে। দরিয়াবিবি মানসিক ভার কাটাইবার উদ্দেশ্যে ছেলেটিকে ইয়াকুবের অন্দর মহলের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল।

তোমার দুই মা, না?

হ্যা, চাচী। ছোটমা আর বড়মা। আমি কুড় মায়ের ছেলে। আমরা দু'ভাই।

তোমার ছোটমা কেমন?

খুব ঝগড়া করে মায়ের সঙ্গে ব্যর্থপর সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে?

হ্যা। আজ ঝগড়া হোয়েছে। তাই আমাকে বাপ নিয়ে এলো।

ঝগড়া হোলো?

রোজ ঝগড়া হয়। আজকাল বাপ ঘরে থাকে না।

কোথায় থাকে?

দহুলিজে ঘুমায়। আর বাপের অসুখ আছে। শরীর খারাপ।

দরিয়াবিবি চুপ করিয়া যায়। ছেলেটিকে নিজের পাশে শোয়াইয়া আরো তথ্য সংগ্রহ করিল। ইয়াকুবের অন্দর মহল একটি দোজখ। মোটামুটি ধ্রাম্য জীবনের সচ্ছলতা আছে, তাই বাড়ির মেয়েরা রান্না-খাওয়া ছাড়া বেকার। টাকার গরম, শাড়ির গরম দেখাইতে পরস্পরে হিংসা, ঝগড়া। এইটুকু ছেলেও কেমন কৃটচক্রের ইতিহাস জানে।

দু'দিন পর ইয়াকুব ছেলেটিকে লইয়া যাইবার সময় বলিল, দরিয়াভাবী (আর ভাবী সাহেব বলে না) ছেলেটাকে এনে রেখে দেব। ওখানে থাকলে আর মানুষ হবে না।

কথার জবাব দিতে হয়, আমজাদ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। দরিয়াবিবি বলিল, তোমার পাকা বাড়ি, এখানে বাঁশের ঘরে কেন?

সেখানে ছেলেগুলা মা'র জন্য খারাপ হবে। খালি কিচামিচি ঝগড়া-ঝাঁটি।

দরিয়াবিবি আর কোন জবাব দিল না ।

ইয়াকুব পুত্রকে লইয়া পথাতিমুখী হইল । আমজাদের সঙ্গে ওয়ায়েসের খুব খাতির জমিয়াছে । সে-ও পিছন পিছন গেল ।

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মা, তোমাকে পনের টাকা দিয়েছে । ভুলে গিয়েছিল । ওয়ায়েসের বাপ বললে ।

মুনি মাত্র দুটাকা সঙ্গে নিয়ে গেছে । কালই টাকা পাঠিয়ে দিতে হয় । মনে মনে দরিয়াবিবি সাত-পাঁচ ভাবিতে লাগিল ।

৪১

অচল দিনকে প্রাণপথে ঠেলিতে হয় । সমস্ত উদগ্র শিরা-উপশিরা বিদ্রোহী, তবু বিশ্রাম কি শৈথিল্য দেওয়া চলে না । উত্তরাইয়ের বাঁকে বোঝা অনড় হইয়া সংগ্রামশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ব্যক্ত করে । উপত্যকায় তখন আবার ঝড় দেখা দিলে, অসহায়তা-নৈরাশ্য মেঘ গর্জনের সঙ্গেই বিকট প্রতিধ্বনির ধাক্কার বেগে ছুটিয়া আসে ।

দরিয়াবিবি উত্তরাইয়ের মুখে আসিয়া পৌছিয়াছিল । চারিদিকে খাপদ-সংকুল খাদ ভরা অরণ্যানী । পানি আর তৃষ্ণা মেটায় না, বাতাস আর শ্রান্তি হরণ করে না ।

মা ।

দরিয়াবিবি চাউলের কাঁকর বাছিতেছিল । উঞ্জনের দিকে পিঠ । সুতরাং আগন্তকের সংবাদ সে জানিতে পারে নাই । চকিতে ছোট্ট ফিরাইয়া দরিয়াবিবি অবাক হইয়া গেল । মোনাদির আসিয়াছে । পিঠের উপর একটা বোঝা-সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে । পথ-চলার ক্লান্তি পথিকের নিঃখাসের স্তুততায় ধরা পড়ে ।

হঠাৎ এলি নাকি, বাবা?

গরমের ছুটি হোতে এখনও তিন মাস বাকী । ক্ষুলে পরীক্ষা হচ্ছে, এক হণ্টা ছুটি । তাই চলে এলাম ।

বেশ করেছো ।

দরিয়াবিবি তাড়াতাড়ি নিজের হাতে মোনাদিরের জামা খুলিয়া ঘাম মুছিয়া দিল । হাঁকড়াকে আমজাদ আসিয়া হাজির । সে একটা মোড়া আগাইয়া দিল ।

দরিয়াবিবি বড় খুশি । তাড়াতাড়ি ভাত চাপাইয়া দিল । দুপুরের হাঁড়ি শূন্য । কিছুক্ষণ আগে তাহারা আহার সমাধান করিয়াছে । আমজাদ মাঝে মাঝে হাত-খরচের লোডে মুরগি-হাঁসের ডিম লুকাইয়া রাখে । সে একটি ডিম আনিয়া দিল ।

দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসা করিল, আগো কোথা পেলি?

আমাদের লাল মুরগিটা যেখানে-সেখানে ডিম পাড়ে । কাল গোয়ালঘরের মাচাঙ্গে ছিল । তোমাকে বলতে ভুলে গেছি ।

পুত্রের অবিকার-দক্ষতায় দরিয়াবিবি খুব উৎফুল্ল হয় । সে আলুভাজা আর ডাল করিতে চাহিয়াছিল । এখন ডিম পাওয়া গেল । আহারের ঘোলকলা পূর্ণ ।

মোনাদির পুকুরে গোসল করিয়া আসিল । অজানা পরিত্বক্তি তার মনে । তাই ভাই-

বোনদের সঙ্গে নানা গল্প ছাড়িল। খোলা হইতে কয়েকটি মাটির পুতুল সে নষ্টিমা ও শরীরকে দিল। তাহাদের খুশির অন্ত নাই। একজোড়া ভাল লাটিম বাহির করিল মোনাদির আমজাদের জন্য। দুই ভাইয়ে কাল নদীর ধারে গাছতলায় খেলব, এই প্রস্তাবে আমজাদ লাফাইয়া উঠিল।

দরিয়াবিবির কাছে সমস্ত বৈকাল যেন সুবের মত বাজিতে থাকে। ছেলেপুলেদের লইয়া সে বহুদিন এমন আনন্দ পায় নাই। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সে রাত্রির রাত্নায় বসিল। আমিরন চাটীর গাছ হইতে একটি লাউ চাহিতে গিয়াছিল আমজাদ। সে লাউয়ের সঙ্গে একটা মুরগিছানা দিয়াছে। কদু-গোস্তের তরকারী রাঁধিতে দরিয়াবিবি সমস্ত নেপুণ্য ঢালিয়া দিল।

আহার শেষে দাওয়ায় অনেকক্ষণ গল্প-গুজব শুরু হইল। মোনাদিরের কাছে পরিবেশ আর অচেনা নয়। সে বেশ সহজ। দরিয়াবিবিও প্রাণ খুলিয়া ছেলেদের হল্লায় যোগ দিল।

পরদিন আমজাদ ও মোনাদির টৌ টৌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। চন্দ্র কোটালের ভিটায়, নদীর ধারে, মাঠে মাঠে, সড়কের আশপাশে ঝোপে-জঙ্গলে দুইজনের গতিবিধি। আমজাদ ত এমন স্বাধীনতাই প্রতিদিন কামনা করে। একা একা সে আবার বড় ভীরু ও লাজুক। শুধু মুনি ভাই সঙ্গে থাকিলেই সে সব কাটাইয়া উঠিতে পারে।

মা'র মেজাজ বড় হাল্কা আজকাল। আমজাদ তাই আরো খুশি।

মোনাদিরই প্রথম অনুজকে জিজ্ঞাসা করিল, আমু' মা বড় মোটা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ। মুনি ভাই, আমার মনে হয় অসুখ।

না। মা'র শরীর আমার মত কিনা।

তা ঠিক মুনি ভাই। বড় হোলে তুমি চন্দ্র কাকার মত জোওয়ান হবে।

তাই ত বেঁচে আছি। স্কুলের বেঙ্গলিয়ে যা খাওয়ায়, এতদিন আমারও অসুখ করত।

ভাত্বিক্রমে আমজাদ গৌরবান্বিত। সে প্রস্তাব করিল, তুমি সাকের চাচার কাছে লাঠি খেলা শিখবে?

গ্রামে এসে থাকলে নিশ্চয় শিখব। আমি খুব ভাল লাঠিখেলা শিখতে পারব। মোনাদির হাতের পেশী দেখাইল।

নদীর ধারে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া দুইজনের কথাবার্তা চলিতেছিল। চৈত্র মাস। তাই নদী শুক্ষ। দুই পাশে চরে খাগড়া বন। মাছরাঙার বাসা ঝুঁজিয়া অনেকক্ষণ দুইজনে কাটাইয়াছে। কোন লাভ হয় নাই। একটি বড় চালতা গাছের গুঁড়ির উপর দুইজনে ঠেস দিয়া দূরে দূরে চাহিতেছিল। আকাশ একদম মেঘহীন। রৌদ্রের তরল ঝরণায় সমস্ত মাঠ ঝমঝম বাজিতেছে। নিঃসঙ্গ তালগাছ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে প্রত্যঙ্গের থরথরানি মিশাইয়া দিয়াছে। গ্রাম্য দুই বালক কথার ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর বিশালতা অনুভব করে।

শুধু ক্ষুধার তাড়না এই অবসর উপভোগে ছেদ টানিল। মোনাদির বাড়ি ফিরিয়া দেখিল ইয়াকুব আসিয়াছে। মা বলে নাই, তবে আমজাদ বলিয়াছে, এই লোকটি গত তিন-চার বৎসর তাহাদের বহু উপকার করিয়াছে। মোনাদির অচেনা লোকের সম্মুখে বড় লাজুক। শুধু সে আর নিজে কোন আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারে না।

রাত্রে ছেলেরা আহারে বসিল। দরিয়াবিবি শ্রিয়মাণ দাসীর মত কর্তব্য সম্পাদন

করিতে লাগিল। আমজাদ আসর জমাইত চায়। কি একটা মুনি-সম্পর্কিত রসিকতা করিতে গিয়া সে ধর্মক থাইল। তখন আহারই একমাত্র তপস্যা হইয়া দাঁড়াইল সকলের পক্ষে।

দুইটি মাত্র কক্ষ। আমজাদ ও ইয়াকুব এক কামরায়, অন্য কামরায় মা'র কাছে নষ্টিমা ও শরী-র সহিত মোনাদিরের শয়ন ব্যবস্থা হইল।

আজ মা'র সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হইল না। সারাদিন কত খাটে, এই ভাবিয়া মোনাদির ঘূমাইয়া পড়িল।

দরিয়াবিবি বিনিদ্র বহুক্ষণ পড়িয়া রহিল। গরমের দিন। তবু একটি কাঁধায় তার হাঁটু পর্যন্ত চাপা। গরম, তার উপর দৈনন্দিন চিঞ্চার টানাপোড়েন। বাহিরে জানালা দিয়া দেখা যায় আকাশ ভরিয়া কত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

ঘূম আসিতেছিল না। দরিয়াবিবি সকলকে ঘূমত দেখিয়া ধীরে ধীরে টাটি খুলিয়া উঠানে দাঁড়াইল। জানালার কাছে কঠাল গাছের পাতার ফাঁকে জোচ্ছনা পড়িয়াছে মাটির উপর। দরিয়াবিবি আনন্দনা গিয়া দাঁড়াইল। আকাশে নিষ্পত্ত কয়েকটি তারা জুলিতেছে মাত্র। সমস্ত আকাশ ত গাছের তলা হইতে দেখা যায় না। দরিয়াবিবি দাঁড়াইয়া রহিল বেশ কিছুক্ষণ। সুপু গ্রামের নীরবতা কৃটিৎ পাখির ডাকে, দূরাগত কুকুরের চীৎকারে চিঢ় খায় মাত্র।

হয়ত অনন্তকাল এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে দরিয়াবিবি আনন্দিত হইত, কিন্তু হঠাৎ মানুষের ছায়া পড়িল জোচ্ছনায়। শিহরিয়া, তাড়াতাড়ি উঠানের দিকে যাইবে, সে দেখিল ইয়াকুব তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিষ্মেহিতের মত দরিয়াবিবি নিজের জায়গায় স্থাপু।

কয়েক মুহূর্ত পরে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল্লো দরিয়াবিবি ফিসফিস্ কর্তৃ বলিল, এখানে কেন?

কেন, তুমি জানো না, দরিয়াবিবি ইয়াকুব তার হাত ধরিয়াছে ততক্ষণে।

হয়ত হাত টানাটানি শুন হইত, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মোনাদির ডাকিল, মা, এত রাতে তুমি একা বাহিরে গেছ, আমাকে ডাকলে না কেন?

আসছি বাপ। তুমি ঘুমোছিলে, তাই আর জাগাই নি।

ইয়াকুব চোরের মত আড়াল অঙ্ককারে লীন হইতে গেল, কিন্তু তার লম্বা ছায়া জোচ্ছনার হাত এড়াইতে পারিল না।

দরিয়াবিবি কম্পিত বুকে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। মোনাদির তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া। মাকে, বলিল, মা চোরটোর হবে। একটা লোকের ছায়া পড়ল কঠাল গাছের পাশে।

না। অঙ্ককারে দরিয়াবিবি আবার বলিল, তুমি এসো, শুয়ে পড়।

যাই। মা, তুমি একলা এমন রাত্রে বেরিয়ো না।

কি আছে আমাদের, চোর আসবে?

মোনাদির কয়েক মিনিট জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া নিজের বিছানায় ফিরিয়া আসিল।

সারাদিনের ক্লান্তি, উদ্বেগজনিত নিন্দাহীনতা— ভোরের দিকে দরিয়াবিবির চোখে ভয়ানক ঘূম নামিয়াছিল। কাক ডাকা সকাল তার জীবনে প্রথম দেখে নাই।

আরো কতক্ষণ ঘূমাইত কে জানে, হঠাৎ আমজাদ আসিয়া ডাক দিল, মা, মা।

ଖୋଯାରି ଚୋଖେ ଦରିଆବିବି ଧମକ ଦିଲ, କି, ଏତ ଡାକଛିସ କେନ?

ମୁନି ଭାଇୟେର-କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼ କୋଥା?

ବାଶେର ଆଲନାୟ ଆହେ ।

କଇ ନେଇ ତ?

ଦରିଆବିବି ଚୋଖ ଖୁଲିଯା ଚାହିଲ ।

ତୋର ଘରେ ନେଇ?

ନା । ଇଯାକୁବ ଚାଚା ସକାଳେଇ ଚଲେ ଗେଛେ ।

ଦରିଆବିବି କାଥା ଜଡ଼ାଇୟା ଉଠିଯା ପଡ଼ିଲ । ବାରବାର ଚୋଖ କଚଳାଇଲ । ମୋନାଦିରେର ବୋଲା, କାପଡ଼-ଚୋପଡ଼ ଆଲନାୟ ନାଇ ।

ବାହିରେ ଆସିଯା ଦାଢ଼ାଇଲ ଦରିଆବିବି । ତାର ଶରୀର ଥରଥର କାପିତେଛେ ।

ଦିଦୀର ପାଡ଼େ ଗିଯେ ଦେଖ ତୁଇ, ସେଦିକେ ଗେଛେ ବୋଧହ୍ୟ ।

ଆମଜାଦ ଚଲିଯା ଗେଲେ ଦରିଆବିବି ପାଶେର ଘରେ ତୁକିଯା ଦେଖିଲ, ମୋନାଦିରେର ବଈ-ପତ୍ର ନାଇ ।

ଦରିଆବିବି ହୟତ ମୂରିତ ହଇୟା ପଡ଼ିଯା ଯାଇତ । କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ବୁକେ ଜୋର ସଞ୍ଚୟ କରେ ସେ । ନା, ମୂର୍ଛା ଯାଓୟା ତାର ସାଜେ ନା ।

ତାଲ ସାମାଲ ଦେଓୟାର ଜନ୍ୟ ବିମ ଧରା ମାଥା ଦୁଇ ହାତେ ଶକ୍ତ କରିଯା ଧରିଯା ଦାଓୟାର ଉପର ଦରିଆବିବି ବସିଯା ପଡ଼ିଲ । ଏକଟୁ ହାଁଫ ଫେଲା ମୁଣ୍ଡକାର ତୁଥୁ ।

୪୨

ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଏକ ରାତ୍ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରାମ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଛିଲ । ଚନ୍ଦ୍ର କୋଟାଲ ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ଆର ଗ୍ରାମେର ଭିତର ଆସେ ନାଇ । ଆମଜାଦ ନିଜେଇ ଯାଇତ ହୋଜ-ଖବର ଲାଇତେ । ଚନ୍ଦ୍ର ଯେନ ଆର ଏକ ରକମ ହଇୟା ଗିଯାଛେ । ତାଡ଼ି ସେ ଥାଯ । କିନ୍ତୁ ନିଃଶବ୍ଦେ ଥାଯ । ଆର ହଲ୍ଲା କରେ ନା, ଗାନ କରେ ନା । ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ଛେଲେ ଦୁଟି ମାମାର କାହେଇ ଆହେ ।

ଦରିଆବିବି ଏହି ସଂବାଦ ଶୁନିଯାଛିଲ ହାସୁବୌର ମୁଖେ, ଆମିରନ ଚାଟିର ମୁଖେ । କିନ୍ତୁ କୋନ ମନ୍ତ୍ବ୍ୟ କରେ ନାଇ । ବିପଦେ-ଆପଦେ କୋଟାଲେର କାହେ ଆମଜାଦକେ ପାଠାନୋ ବୃଥା । ଯେ-ଯାର ମାଥାର ଘାୟେଇ ପାଗଲ । ଏଇଜନ୍ୟ ଦରିଆବିବି କୋଟାଲେର ଜନ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ । ଆହା, ଏମନ ମାନୁଷେର କପାଲ ବଟେ! କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କୋଥାଯ? ଦାଦାର ଗଲଗାହ ଜୀବନେର ଚେଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଆର କାରୋ ଆଶ୍ରଯେ ଗିଯାଛେ । ସଂସାରେର କତୃତ୍କ କ୍ଷତି ତାତେ? ହୟତ ଦରିଆବିବିର ମନେ ଏଇସବ କଥା ଉଁକି ଦିଯାଛିଲ ।

ଦରିଆବିବି ଏକଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ କୋଟାଲେର ବାଡ଼ି ଯାଓୟାର ଇଚ୍ଛା ଛିଲ । ଆମଜାଦ ଖୁବ ରାଜି । କିନ୍ତୁ ଆର ଯେନ ସେଦିକେ ପା ବାଡ଼ାନୋର ଉଂସାହ ନାଇ । ଖ୍ୟାପା କୋଟାଲେର ସଂସାର ଦେଖାର ଇଚ୍ଛା କାର ନା ହୟ? ଆଜହାରେର ମତ ଧର୍ମକ୍ଷମ ଧର୍ମଭୀରୁଙ୍ଗ ଲୋକଟି ଚନ୍ଦ୍ରକେ ଚିନିଯାଛିଲ । କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବିତ ଥାକିତେ ଦରିଆବିବି ଏମନ ପ୍ରତାବ ଉଥାପନ କରେ ନାଇ । ଆର ଯାଓୟା ହୋଲୋ ନା ଦରିଆବିବି ସେଦିନ ମନେ ମନେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲ । ହାମ୍ୟ ଜୀବନେ ଏକଜନେର ଅପବାଦ ସମସ୍ତ ବାଡ଼ିର ଉପର ଭର କରିଯା ଥାକେ ।

এক মাস পরে আমজাদ মা'র কাছে আসিয়া জানাইল, মা, আজ মুনি ভাইয়ের টাকা ফেরত এলো। এই নাও টাকা। আমজাদ পনেরটি টাকা গণিয়া দিল।

টাকা ফেরত এলো কেন?

পিয়ন বললে মুনিভাই সেখান থেকে চলে গেছে।

অঙ্কুট কঠে দরিয়াবিবি একবার উচ্চারণ করিল, চলে গেছে! তারপর পূত্রের সহিত আর কোন বাক্যালাপ করিল না। অবিচল মৃত্তির মত টাকা কয়তি হাতে দরিয়াবিবি বসিয়া রহিল। দুঃচারিণী জননীর দান সৎ সন্তান কেন গ্রহণ করিবে? মুনি—

আমজাদ হাসুবৌকে তখনই খবর দিয়া আসিয়াছিল। পিয়ন তাহাদের বাড়ির পাশেই দাঁড়ায়। হাসুবৌ আসিল। দরিয়াবিবির অশ্রুসজল মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে পাশে বসিয়া পড়িল।

দরিয়াবিবির মুখ্যবয়ব ক্রমশ থমথমে, গৌরসুড়োল গওদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। হাসুবৌ আমজাদকে বলিল, বাবা, একটু পানি এনে দে।

আমজাদ বিলম্ব করিল না আদেশ-পালনে।

হাসুবৌ দরিয়াবিবির চোখের পানি মুছাইতে মুছাইতে বলিল, বুবু একটু বারফাটা ছেলে। আবার আসবে। বেটাছেলের জন্য এত চিন্তা কেন?

দরিয়াবিবি কোন জবাব দিল না। হাসুবৌ আবহাওয়া সহজ করিতে ছুঁতানাতা খোঁজে। বলিল, বুবু, সক্ষ্য হয়, এখন কত কাজ তোমার, উঠৈশ্পড়।

উঠানে একপাল মুরগি-হাঁস কোলাহল তৈরিয়াছিল। ইহাদের সাক্ষ্য-ভোজন বাকি। হাসুবৌ আরো জিদ ধরিল, বুবু, তুমি না উঠলে আমি বাড়ি যেতে পারব না। তোমার ছেলে তোমারই আছে।

দরিয়াবিবির চোখে আর পানি নাই। কিন্তু বড় চিন্তাবিত সে। হাঁটুর উপর থুঞ্চী রাখিয়া অবিচলতার নারী-প্রতীক ঝাপে বসিয়া রহিল।

ওঠো বুবু। হাসুবৌ হাত ধরিয়া বলিল, ওঠো। তোমার নিজের শরীরও ভাল নয়। কেমন ফোলা-দেখাচ্ছে। এমন করলে শরীর টেকে?

তুমি যাও। আমি উঠছি। দরিয়াবিবি মৃদু কঠে বলিল।

তুমি ওঠো।

উঠছি। তুমি যাও।

বেশ, আমি উঠানের পৈঠা পর্যন্ত গিয়ে দেখব, না উঠলে আবার আসছি।

হাসুবৌর যা কথা তাই কাজ। কিন্তু দরিয়াবিবি সত্যই তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাঁস-মুরগির খবরদারীতে মনোযোগ দিল।

৪৩

সাকের নঙ্গিমাকে সদরের হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। চোখের দৃষ্টি তার ক্রমশ নিষ্পত্ত হইয়া আসিতেছে। এত বেশি পিচুটি পড়ে, সকালে সে চোখই খুলিতে পারে না। তাই দরিয়াবিবি সাকেরের শরণাপন্ন হয়। চন্দ্র কোটাল বছদিন এদিকে মাড়ায় নাই।

হাসপাতালের ডাক্তার উষ্ণধ দিয়াছে। কিন্তু প্রতিকার অনিচ্ছিত। ডাক্তারের অভিমত দরিয়াবিবি শুনিয়াছিল। কিন্তু সে ব্যাপারটা আর শুরুতর মনে করে না। অঙ্গের কি দিন বন্ধ থাকে?

গত দুই মাসে দরিয়াবিবি বড় স্থির ও শান্ত হইয়া আসিল। কাজের গাফিলতি হয় না কিন্তু সব কাজ ধীরে ধীরে। মন যেন আর কোথাও উধাও, তারই পটভূমিকায় দৈনন্দিনতার কর্তব্য-সাধন মাত্র। ছেলেদের উপর রাগও নাই। শরীর কত বিরক্ত করে, দরিয়াবিবি মোটেই তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। আমজাদ একদিন মা'র কোপন-স্বত্বাবের জন্য যেমন ভীত হইয়াছিল, আজ আবার বর্তমান অবস্থার জন্য তেমনই ভয় পাইল। তার ছেঁড়া লুঙ্গি ও শার্ট সেদিন পাওয়া গেল না। নালিশ জানাইলে মা জবাব দিল, গেছে যাক। আর কোন ধর্মক নয়। দরিয়াবিবি যেন ধর্মক দিতে ভুলিয়া দিয়াছে। আমজাদ তাই অস্বাভাবিকতার আবহাওয়া স্বতঃই টের পায়। আমিরন চাটী আসিলে দরিয়াবিবির চাক্ষল্য সামান্য বাঢ়ে। হাসুরো কোন পাত্র পায় না। তাহার সহিত দু-একটি কথা হয় মাত্র। চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সে চলিয়া যায়। দরিয়াবিবি কোনদিন মুখরা ছিল না। কিন্তু এখন তার সমস্ত কথা যেন শেষ হইয়া গিয়াছে।

একদিন সকালেই রাজকীয় উপহারে সজ্জিত ইয়াকুব আসিল। ছেলেদের সম্মুখে দরিয়াবিবি কোন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘৃণা করে। সহজেই সে জিনিসপত্র শুছাইয়া রাখিল।

ইয়াকুব তাড়াতাড়ি আমজাদের বিছানায় ঝুঁক্যা পড়িল। তার চোখমুখ কোটরাগত ও শীর্ণ। দরিয়াবিবি জিজ্ঞাসাবাদ কিছুই রুক্ষে না। কখন এলে? বা এই জাতীয় মামূলী প্রশ্ন মাত্র।

একটু পরে আমজাদের কক্ষে দরিয়াবিবি প্রবেশ করিল।

যুমুচ্ছা? ইয়াকুবের নিকট তার প্রথম প্রশ্ন। ইয়াকুব মুখে চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়াছিল। দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সে যেন ভয় পায়।

ইয়াকুব মুখের আবরণ খুলিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি দরিয়াবিবির তরফে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কিছু বলছ?

দরিয়াবিবি প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ইয়াকুবের মুখের উপর পনেরটি রূপার টাকা বাংবান শব্দে রাখিয়া বলিল, মাস-মাস তোমাকে এই টাকা আর দিতে হবে না।

কেন? ইয়াকুবের মুখ বিবর্ণ। জুরে তার হাড় সিঙ্গ হইতেছিল, এমনই দেহে কোন জোলুস ছিল না।

দরিয়াবিবি কক্ষ-ত্যাগের জন্য পা বাড়াইলে প্রায় আসন্ন-মৃত্যু গোগীর চেরা-কঠে ইয়াকুব ডাকিল, শোনো।

দরিয়াবিবি গমন-পথের দিকে চাহিয়া পেছন ফিরিয়া বলিল, বলো।

আমার বড় জুর, আজ এক সঙ্গাহ। আমি তোমাদের এখানে একটু শান্তি পেতে এসেছি।

আমরা কি তোমার কাপড়ে আগুন লাগাচ্ছি? বড় নির্মমের মত দরিয়াবিবি জবাব দিল।

তা কেন? এমন দুঃখের দিনে তোমরা আমাকে জায়গা দিয়েছ, তা কি কম উপকার?

আমার ঘরে শান্তি নেই, দেহ ভাল নয়। এই টাকাগুলো নিয়ে গেলে আমার মনে কোন কষ্ট থাকবে না।

ও টাকাগুলোর আর দরকার নেই।

নেই?

না। দরিয়াবিবি তখনই আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সাঙ্গ খাবে?

হ্যাঁ। কাতর কষ্টের আর্তনাদের মত শোনায় ইয়াকুবের জবাব।

দরিয়াবিবি রোগীর অন্য প্রয়োজন জানার অপেক্ষায় রহিল না। দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

আমজাদ আজ মা'র উৎসাহ দেখিয়া অবাক। মাছ ছিল কয়েক রকমের। ইয়াকুব সের দুই খাসীর গোস্ত ও অন্যান্য শাক-সজিসহ যি আনিয়াছিল। দরিয়াবিবি পরম আগ্রহে রফন-বিদ্যা উজাড়ে মনোযোগ দিল। শক্র কোথাও যেন ধরাশায়ী। তাই যেন বিজয়ী বীরের উল্লাস। খাওয়ার সময় উৎসাহে আদৌ ভাঁটা পড়িল না। মা'র এমন আগ্রহাবিত আহার আমজাদ জীবনে দেখে নাই। রান্না হইয়াছিল চমৎকার।

ভূরিভোজনের বিশ্বামের পর সাঙ্গ হাতে চুকিয়া দরিয়াবিবি দেখিল, ইয়াকুব ঘুমাইতেছে। ভাঙা তঙ্গপোষের একদিকে বাটী বসাইয়া সে চাহিয়া দেখিল। তার মুখের এমন পূর্ণ আদল সে আগে দেখে নাই। মলিন লতার মত সারা চেহারায় বিশীর্ণতা। কত দুঃখ-ভারাক্রান্ত এই শায়িত ব্যক্তি, তা তার চোখের কালিঝীখা কোণগুলিতে স্পষ্ট।

দাঢ়াইয়া দাঢ়াইয়া দরিয়াবিবি ঐ মুখ পুজেনুন্মুক্ত অবলোকন করিল। বেচারা বড় দুঃখী! ঘরে সাতদিন জুরে ভুগিয়াছে, আজও জুর-জুর-দেহে গৃহত্যাগী। খুব জুর, হয়ত এই শেষ শয়্য। আজহারের শেষ ক্রমসূচি দিন দরিয়াবিবির চোখে নিমেষে খেলিয়া গেল।

নিঃশব্দে ইয়াকুব ঘুমাইতেছিল অথবা চোখ বুজিয়া ছিল কে জানে। দরিয়াবিবির কেমন মায়া হয়। হঠাতে তার বুকে করুণা উত্থলিয়া উঠে। নৌকায় সারা পথ আসিয়াছে, এক মাইল হাঁটিয়াছে, এখনও অভুক্ত। এখনও অভুক্ত! দরিয়াবিবি আর স্থির থাকিতে পারে! তার ইচ্ছা হইলঃ একবার ঘূম ভাঙাই সাগুটুকু খেয়ে নিক্। কিন্তু ডাকিতে গিয়া, থামিয়া গেল। কে যেন গলা চিপিয়া ধরিল অক্ষম্যাত।

দুঃখী মানুষ দুয়ারে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত ঘৃণা দরিয়াবিবির মন হইতে মুছিয়া যায়। ইয়াকুবের দিকে সে তাকাইল। গায়ে ঠিকমত চাদর নাই। পাঁজরের প্রান্ত খোলা। পায়ের দিকে হাঁটুর পরে আর চাদর নাই। খোলা গায়ে জুর আরো বাড়িতে পারে।

দরিয়াবিবি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। জুরের উত্তাপ না ছুইয়া বোবা যাইবে। অতি সন্তর্পণে সে তাপ দেখিল। জুর যে খুব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই ধীরে ধীরে গাখানি চাদরে ঢাকিয়া দিল। তখনও হাত তোলা সম্পূর্ণ হয় নাই, ইয়াকুব চোখ মেলিয়া তাকাইল। বান মাছের গর্ত খুঁজিতে গিয়া যেন হঠাতে সাপ ঠেকিয়াছে হাতে— দরিয়াবিবি এমনই আতঙ্কিত শিহরণে তাড়াতাড়ি পিছাইয়া দ্রুত কক্ষ হইতে নিক্রমণের পথ ধরিল ও তাড়াতাড়ি বলিল, “তঙ্গপোষের উপর সাঙ্গ রইল, উঠে খেয়ো।”

ইয়াকুব চোখ সুজিল, হয়ত পুনর্বার ঘুমাইতে।

অসুখ কমিল না ।

ইয়াকুবের বাড়ি হইতে লোক আসিয়াছিল খোঁজ লইতে । এখানে ডাক্তার দশ মাইল দ্রে থাকে । চিকিৎসার দিকে ইয়াকুবের কোন শেয়াল ছিল না । বাড়ির লোক ফিরিয়া গেল ।

কিন্তু তিন দিন পরে নদীর ঘাট হতে খবর আসিল, আরো লোক আসিয়াছে । ইয়াকুবের এখানে থাকা হইবে না । দুই নৌকা বোঝাই ইয়াকুবের দুই পত্নীই হাজির হইল । গৃহে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর উপায় নাই । তা-ই হইল । ইয়াকুবের অগন্ত্য যাত্রা । ইয়াকুব অসুখে মরে নাই । কিন্তু আর ফিরিল না । মহেশডাঙ্গার পথ সে চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল ।

দরিয়াবিবির চতুর্দিকে অঙ্ককারের নৈরাজ্য । অঙ্ককারই অঙ্ককারের পরিসমাপ্তি ঘটায় । নচেৎ অভ্যন্ত জীবনে মানুষ আনন্দ পাইত কি করিয়া? এই ক্ষেত্রে সেই পথও চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল ।

দুই-তিন মাস পরেই তিলে তিলে অনটন-উপবাস, উদ্বেগের সড়ক বহিয়া সেই রাত্রি আসিল— অঙ্ককার যার লীলাভূমি । দরিয়াবিবির এই তমসার যেন প্রয়োজন ছিল । সে সত্যই হাত তুলিয়া আল্লার শোক্রিয়া আদায় করিল । ও যদি দিবালোকে আসিত? এত মানুষের সম্মুখে, পুত্র-কন্যার সম্মুখে! তোমার কত মরজী আল্লা । তোমার এই রহমতটুকুর জন্য তোমার কাছে হাজার শোক্রিয়া, হাজার মোন্টাজাত!

গভীর রাত্রের কালো ডানা মহেশডাঙ্গার উপর প্রসারিত । সুন্তির শাসন দিকে দিকে । নৈশ পাখির দল হয়ত জাগিয়া আছে । অরুণজাগিয়াছিল দরিয়াবিবি ।

ধীর মদু বাতাস বহিতেছিল । দরিয়াবিবির হস্তস্থিত প্রদীপের শিখা তাই কম্পমান । দরিয়াবিবি জাগিয়া ছিল, জাগিয়া ডাঁষ্টল । দাওয়ার উপর ডিপা হাতে দণ্ডয়ামান । বাহির হইতে টাটির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে সে কিছুক্ষণ আগে । আমজাদ, শরী, প্রায়ক নষ্টমা— সকলে ঘুমাইতেছে । কান পাতিয়া সে শুনিল শিশু-কিশোরদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ । এইভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয় ।

দরিয়াবিবি নিঃশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিল ও ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল । মজবুত বাঁধা কি না, তাও একবার টানিয়া দেখিল । তারপর কম্পিত হাতে ডিপা এক জায়গায় নামাইয়া একটি মাদুর পাতিল ।

বহুদিন পোপন ছিল । কিন্তু বিকাশের ধারা কোথাও বন্ধ হয় না । সময় শুধু এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে অপেক্ষা করে ।

দরিয়াবিবির সমস্ত শরীর নাড়া দিতেছে, তবু এতক্ষণ সে মুখে যন্ত্রণার সামান্য কুঠ্বন পর্যন্ত ফেলে নাই । সমস্ত কাজের ভার তার নিজেরই উপর । তার ত কেউ সাহায্যে আসিবে না ।

মাদুর পাতিয়া দরিয়াবিবি গায়ের ছেঁড়া কৃত্তিখালি খোলা মাত্র আরো কাপড় বাহির হইল । শরীর ব্যাপিয়া তখন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হইয়াছে । তাড়াতাড়ি কোমরের কাপড়

পর্যন্ত আলগা করিয়া দিল। তখন একরাশ কাপড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, নঙ্গমার ফালি, আমজাদের ছেঁড়া শার্ট— এক স্তুপ বাহির হইল। আসন্নপ্রসবা জননীর স্ফীত উদরখনি প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয় না। আরো অক্ষকারে রহিয়াছে বিশ্বের বিশ্যয়তম মানবশিশুর নীড়খনি। দরিয়াবিবির পেটের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। হঠাৎ তার মনে পড়িল আমিরন চাচীর কথা, ‘বুরুর শরীর যেন পেটে পড়েছে’। আহ, সত্যি যদি ফাটিয়া যাইত-কি সুখই না পাওয়া যাইত। দরিয়াবিবি জোরে একবার প্রশান্তির নিঃশ্বাস লইল। আরো কাজ আছে। উদর অঙ্ককারে মুমুক্ষু মানব শিশু যতই আর্তনাদ করকু বাহিরে আসর আকুলতায়, কর্তব্যের ডাকে দরিয়াবিবি সারাজীবন অনড়। আজ তার কোন নড়চড় হইবে না। ঘুঁটের যাচা হইতে ছোট ছোট বহু কাঁথা দরিয়াবিবি মাদুরের এককোণে রাখিল।

তারপর উবুড় হইয়া সে সমস্ত মাদুর চাপিয়া ধরিল। আহ, এখন শুধু একটু চীৎকারের স্বাধীনতা পাওয়া যাইত। ছেলেরা না জাগিয়া ওঠে। তাই সারাদিন কাহাকেও ঘুমাইতে দেয় নাই। অসহ্য বেদনায় দরিয়াবিবি এই প্রথম মুখ কুপ্পন করিল। মাদুরে হাত পিছলাইয়া যায়, তাই একটু আগাইয়া সে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিল। মাটির কল্যা জননীর আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তাকৎ পাইবে?

দরিয়াবিবি অসহ্য ঝঞ্জায় দিশাহারা হয় না। আগন্তক অতিথির অসম্মান সে কিরূপে সহ্য করিবে? এত হাত দিয়া পেছনে দেখিতে হয়, সে না হঠাৎ মাটির উপর আছাড় খায়।

দরিয়াবিবির চোখে আর কোন প্রশ্ন নাই। ভুবন্তি হোক, হে আদিম শিশু তোমার আগমন। এত যন্ত্রণার মধ্যে জননী তোমার প্রত্যই ত চেয়ে থাকে। কত লজ্জা, কত অপমান ধিক্কার বাহিরের জগতে প্রতীক্ষমাণ! আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষমাণ। আশু রমণী মাঝে মাঝে মনের সঙ্গে যোৰাযুজির ক্ষেত্ৰে কৃতবার পরাত্ম। আজ বিজয়নীর মত দরিয়াবিবি ধাত্রী ও প্রসূতি হইয়া যায় একত্রে। নিজে নিজের শরীরের উপর অসম্ভব ঝাকুনি প্রয়োগ করে সে। গৃহস্থের দুলালীর মত সে ত বহুক্ষণ এই ঘরে পড়িয়া থাকিতে চায় না। প্রসূতি এবং সে আবার ধাত্রী একাধারে। আরো কাজ আছে। কাজ...

দেড় ঘণ্টা কেমন করিয়া কাটিল, বিধাতা হয়ত জানেন।

প্রথম শিশুর অসহায় চীৎকারে ছেটো রান্নাঘৰটি একবার সচকিত হইল।

মাটির গামলা ও পানি পূর্বৈই রাখা ছিল।

দরিয়াবিবি প্রথমে শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল। হয়ত তাকে বুকে চাপিয়াই বসিয়া থাকিত। শিশুর চীৎকারে খেয়াল হয়। এই সাবধানবাণীর জন্য দরিয়াবিবি বড় কৃতজ্ঞ-সজ্জল চোখে শিশুর দিকে তাকাইল; তারপর গামলায় গোসলের সব খুটিনাটি সম্পন্ন করিল। অতঃপর শয্যার ব্যবস্থা। কয়েকটি রঙ্গীন কাঁথা দরিয়াবিবি বিছাইল ও দুইটি কাঁথা মড়িয়া নবজাতককে শোয়াইয়া দিল। সে নিজে তখনও দিঃসন্মা। তাড়াতাড়ি নিজে পরিষ্কার হইয়া তার নবতম অতিথিকে মাই খুলিয়া দিল। কি সুন্দর চুকচুক শব্দ হয়। কি মোটা তাজা গৌর রং শিশু! দরিয়াবিবি উম দিতে থাকে। শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কয়েকবিন্দু অশ্রু পড়িল অলক্ষিতে।

বাহিরে শৃঙ্গাল প্রহর ডাকিল। দুই পেচক কলহ করিয়া আবার জুড়িকষ্ট মিশাইল।

দরিয়াবিবি বসিয়া রহিল।

নব প্রসূতির দেহে কোথাও কি যন্ত্রণা আছে, দুর্বলতার আক্রমণ আছে? হয়ত নাই। তাই নির্বিকার দরিয়াবিবি বসিয়া রহিল। উম পাইয়া শিশু ঘুমাইতে লাগিল। সেও কেমন নির্বিকার। বাহিরের পৃথিবী সুষ্ঠ। এখানে গ্রাম্য রান্নাঘরের বুকে কি গভীর প্রশান্তি। পুত্র ও জননী পরস্পরের সান্নিধ্যে পৃথিবীকে ভুলিয়া গিয়াছে।

শানুমের পক্ষে বিস্মরণ কি এত সহজ? দর্মায় মোরগ বাক দিল। ভোর হইয়া আসিয়াছে। দরিয়াবিবি মনে মনে শুধু ভাবিল, ভোর হয়ে এসেছে। ভাল কথা একটু পরে সকাল হবে।

আবার মোরগ ডাকিল। সাকেরদের পাড়া হইতেও মোরগের আওয়াজ আসিতেছে। আরো ভোর হইল।

শিশুকে শোয়াতে গেলে সে হাত পা নাড়িয়া একটু শিহরিয়া উঠিল, তার কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত। আবার সে শান্ত হইয়া গেল।

দরিয়াবিবি নবজাতকের দিকে অপলক চাহিয়া, বার কয়েক চুম্বন করিল।

তারপর উঠিয়া পড়িল। শুখ গতি নয়, দ্রুত। দরিয়াবিবি কর্তব্যে ঢিলা, কে এমন অপবাদ দিবে?

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস চুকিতেছিল চালের বাতার কাছাকাছি ফাঁক দিয়া। তখনও বাহিরে অঙ্ককার।

গরুর দড়িগাছি দরিয়াবিবি নিজেই মাচাঙে দাঁড়াইয়া চালে টানাইল। শুধু প্রসূতি, ধাত্রী নয়। আর এক কর্তব্য সম্পাদনা বাকী আছে। দরিয়াবিবি যে জন্মাদ।

শিশুর বিছানায় গিয়া সে দেখিল, পুত্র ঘুমাইতেছে। পুত্র! বেটা ছেলে! কয়েকবার মন্দু চুম্বন দিয়া দরিয়াবিবি উঠিয়া দাঁড়াইল। কুকুরের কি অসীম স্বেহ ও প্রভু ভক্তি। নিজের হাতে ইহাদের দরিয়াবিবি কত খুঁড়ুড়া খাওয়ায় প্রতিদিন। কৃতজ্ঞ প্রাণী— ভোরের সানাই বাজাইল।

আর দেরী করা চলে না। দরিয়াবিবি নিজের মনে উচ্চারণ করিল। হঠাৎ আসেক্জানের কথা মনে পড়িল তার: বুড়ি চলিশা খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে, হাতে খাবারের পুঁটলি, লাঠির উপর ভর দিয়া বৃদ্ধা হাঁটিতেছে।...

দড়ির ফাঁসের দিকে দরিয়াবিবি তাকাইল। সারাজীবনে কত উদ্দেগ, কত সংগ্রামজনিত ক্লান্তি ওইখানে ঝুলাইয়া রাখিয়া আজ সে নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

তার আগে দরিয়াবিবি ডিপা নিভাইয়া ঘর অঙ্ককার করিয়া দিল।

৮৫

রৌদ্র উঠিয়াছিল গাছপালায়, আকাশ ভরিয়া।

মার তাড়া নাই। আমজাদ নঙ্গমা শরী খুব ঘুমাইয়াছিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া আর কেউ বাহিরে আসিতে পারে না। অগত্যা চেঁচামেচি। সাকেরের মা হাসুবৌকে খবর লইতে পাঠাইয়াছিল। সে টাঁটি খুলিয়া দিল।

আবার রান্নাঘরের টাঁটি বাহির হইতে তাহাকেই কৌশলে খুলিতে হইল। হাসুবৌর

প্রথম চোখ পড়িল রঙীন কাঁথার অরণ্যে । সদ্যোজাত ঘূমন্ত শিশু ।

তারপর উপরের দিকে চাহিয়া সে টৌকারে করিয়া উঠিল । আতঙ্কিত পরিবেশের মধ্যে সে কাঁথাসহ শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লাইল আর নামাইল না ।

কিছুক্ষণের মধ্যে জনবিরল গ্রামের এই অখ্যাত অঙ্গনটি স্কুদ্র জনতায় ভরিয়া উঠিল । আসিল রহিম বখশ, রোহিণী চৌধুরী, চৌদিকার, সাকের, আমিরন চাচী অনেকে । রহিম বখশ, রোহিণী চৌধুরী— যাহাদের পা'র ধূলা কোনদিন দীন আজহারের অঙ্গনে পড়ে নাই, তাহারাও আসিয়াছিল । সংসারে প্রতিদিন মৃত্যুর তোরণ যারা সাজাইয়া রাখে, মৃত্যুর প্রতি তাহাদের কৌতুহল বেশি । কৌতুহল মিটাইতে হইবে বৈকি! তাঁহারা আসিয়াছিলেন ।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সাটিফিকেটেই সব কাজ হইল । থানা পর্যন্ত আর দাঁড়াইল না ।

হাসুবৌ শিশুটিকে বুকে করিয়া নিজের ঘরে লাইয়া গেল । সাকের প্রথমে আপনি করিয়াছিল । কিন্তু হাসুবৌ মরিয়া । তার সুগ অদম্য তেজের মুখে, নিষ্পাপ শিশুর নিরপরাধিতার সাফাই কীর্তনের মুখে সকলের জবরদস্তি উভিয়া গেল ।

আমিরন চাচী শরী, আমজাদ ও নজিমাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিল ।

আরো দুই তিন মাস পরে আসিল মোনাদির । চটকলে কাজ লাইয়াছে সে । আরো জওয়ান । জঙ্গিভাব চেহারায় স্পষ্ট ।

আমিরন চাচী তাহার হাত ধরিয়া হাউমাউ কুরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল । মোনাদির রাজি হইয়াছে : শহরে তার কর্মস্থল, কিন্তু তার আবাসভূমি চিরদিনের জন্য মহেশ্বডাঙ্গায় ।

আমজাদকে লাইয়া মোনাদির চন্দ্ৰ কোটালের ওখানে গেল । সাত দিনের ছুটি লাইয়া আসিয়াছিল । কিন্তু মন আর গ্রাম ছাড়িতে চায় না ।

কোটালের কাছে মোনাদির প্রস্তাৱ কৰিল, “গানের দল কৰা যায় কি না ।”

কোটাল বলিল, “চুচা, লোকে আৱ গান ওন্তে চায় না । গান গেয়ে পেটেৱ ভাত জোটানো দায় ।”

মোনাদির বড় নিরাশ হইল । কোটাল নিজেই জানাইল, গ্রামে নিয়মিত কোন কাজই আৱ মেলে না ।

মোনাদির তাই বলিল, “কাকা, আপনি শহরে চলেন । আপনাৱ যা মেহনত কৰাব স্মৰ্তা, চটকলে আপনাকে লুফে নেবে ।”

“সত্যি ।”

“হ্যাঁ কাকা, আমি ‘মেট’কে বলে আপনাৱ কাজ জুটিয়ে দেব ।”

“বেশ । তুমি কৰে যাবে?”

“পৰত । আমজাদকেও কাজে লাগিয়ে দেব ।”

“বেশ আমিও যাব ।”

অচেনা জীবনের জন্য কোটালের পৰম উৎসাহ । তবু কোটাল একবাৱ স্তুক হইয়া গেল, দিগন্ত বিসাৱী বিৱল তালগাছ ক্ষত মাঠের বুকেৱ দিকে চাহিয়া ।

অবেলাৱ আকাশে নীড় সন্ধানী পাখিৱা দল বাঁধিয়া অক্কারেৱ দিকে অঞ্চল হইতেছে ।

মেঠো আমেজে কোটাল তন্ময়, কেমন যেন বিষণ্ণতা বুকে ।

তবু সে বলিল, “চাচা, পরঙ্গ কখন বেরহবে? রেল স্টেশনে তিন জনে যাব ।”

আমজাদ মুনিভা’য়ের সঙ্গে সে দুনিয়ার অপর পিঠে যাইতে প্রস্তুত ।

* * * *

গোধূলি নামিয়াছিল ।

আবছা অঙ্ককারের প্রলেপ এখনই দিকে দিকে ছড়ানো । অস্তাচলের লালিমা নিভিয়া যাইতেছে ।

দরিয়াবিবির কবরের পাশে তিনটি ছায়ামূর্তি দণ্ডায়মান । ইহাদের চেনা যায় । মোনাদির, আমজাদ ও কোটাল ।

মাথা নীচু করিয়া মোনাদির দাঁড়াইয়া থাকে । দুই চোখ ভরিয়া অশ্রুর প্লাবন । মোনাদির এখন শহরের নাগরিক । গত ছ’মাসে চটকলে এমন সব মানুষের সঙ্কান পাইয়াছে, তাদের ছেঁয়ায় সে চোখে নৃতন অঙ্গন পরিয়াছে । এই পৃথিবীর বহু হিন্দিস সে জানে । তবু চক্ষুর পানি আর রোধ করিতে পারে না । তার বুকে চাড়া দিয়া ওঠে বেদনার রাগ রাঙিণীর তোড় মুখর ঝাঙ্কার । অস্ফুট কষ্টে সে বলে, “মা গো, তোমার বুকে একটু ঠাই দিও ।”

মোনাদির হঠাৎ ঢুক্রাইয়া উঠিল, আবেগ আর রোধ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য ।

কোটাল আগাইয়া আসিয়া বলিল, “চাচা, বেটাছেলে, মার জন্য কি এত কাঁদে? আমারও ত মা নেই । চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে ।”

কিন্তু চন্দ্র অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল ।

অশ্রুরুদ্ধ কষ্টে সে নিজেও বলিয়া ফেলিল, “দরিয়াবিবি, সেলাম...সেলাম... ।”

দুই বাহুর মধ্যে দুই ভাইকে জড়াইয়া চন্দ্র কোটাল অগ্রসর হইল ।

তারা তিন জনে অগ্রসর হইল । চেন-অচেনা সড়কের দিকে ।

ক্রীতদাসের হাসি



‘ক্রীতদাসের হাসি’ পুস্তকের পাশ্চালিপি আবিষ্কার এক দৈবী ব্যাপার।

মৌলানা জালাল, মাসুদ সহ, আমরা তিনজনে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছিলাম। নেহায়েৎ নিরূপদেশের পাড়ি। কিন্তু নানা দুর্বিপাকে এসে পৌছলাম এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে, আমারই এক সহপাঠিমীর বাড়িতে, নাম রউফন নেসা। খুব ভাল ছাত্রী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের আর এক সেরা ছাত্র তাকে দাগা দিয়ে গিয়েছিল, তার খুঁটিনাটি হদিস আমার জানা আছে। ডিপ্রীর উচ্চতা দিয়ে কত মেয়ে যে প্রতারিত হয়, তার উদাহরণ রফুন। ছাত্রী পরে এক ঠিকাদারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল আট আনা রাজত্ব সহ।

দশ বছর আর রউফনের কোন খৌজ রাখি নি। হঠাৎ অকৃত্তলে পৌছে জানা গেল, সে গ্রামে এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে, সে-ই প্রধান শিক্ষিয়ত্বী। সংসারে একমাত্র অবলম্বন পিতামহ শাহ ফরিদউদ্দীন জৌনপুরী। নব্বই বছর বয়স। এখন আর চোখে দেখেন না। কানে ঠিকমত শোনেন না। কানের কাছে মুখ নিয়ে অথবা খুব জোরে কথা বলতে হয়। প্রথম জীবনে তিনি লেখাপড়ার কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। বর্মাযুক্তের সময় লুসাই অঞ্চলে লড়ায়ে যান। পরে গৃহত্যাগ করে যান বিহার-যুক্ত প্রদেশ এলাকায়। ফিরে আসেন আর্বী-ফার্সির বিরাট মৌলানা-রূপে। বৃহু সাগরেদ আছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু গত তিরিশ বছর তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখেন না। তাঁর সংগৃহীত পাশ্চালিপিশালা যে-কোন প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিরাট সম্পদ।

একদিনের প্রবাস জীবন।

পরদিন সকালে বিদায়। অতিথি আশ্পায়ায়নের ঘটা ছিল বেশী। তাই মৌলানা জালাল রসিকতা করে বলেছিলেন, “রউফন, তুমি কী আমাদের সেই ‘সহস্র ও এক রজনী’ বা ‘আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা’র পেটোরোগী বানাতে চাও যে গৃহকর্তা রুটি আনতে গেলে তরকারী খেয়ে বসত আর তরকারী আনতে গেলে রুটি খেয়ে ফেলত।”

তারপর সকলে বেশ তুমুল হাসি হাসছিলাম।

দাদু, শাহ সাহেব, কানে শোনেন না। কিন্তু অত হঠাগোলে সচেতন! রউফনকে হাত ইশারায় ডেকেছিলেন।

ফরিদউদ্দীন জৌনপুরীর কানের কাছে রউফন মুখ নিয়ে বলেছিল, “দাদু, ওরা ‘আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা’র গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে।”

দাদু হেসে-হেসে বলেছিলেন, “বক্সগণ, ওটা আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও এক রাত্রি) নয়। ও কেতাবের পুরা নাম ‘আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে। সহস্র দুই রাত্রি।’

“দাদু, আমি ইংরেজীর ছাত্রে। আমি ত শুনেছি ‘thousand and on night’ সহস্র ও এক রাত্রি।” জবাব মাসুদের।

“ভুল শুনেছ।”

“ভুল?” মাসুদের কষ্টস্বরে ইষৎ চ্যালেঞ্জের ছোয়াচ।

“হ্যা, হ্যা। ভুল। তোমরা ত পড়ো বেস্টম্যান ইংরেজের কেতাব। যাদের গোলাম ছিলে দেড়শ” বছর। আসল বই ত দ্যাখো নি।”

দাদুর কষ্টস্বর তঙ্গ। তিনি জিজের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। চোখে না দেখলেও, উঠান-ঘর সব তাঁর মুখস্থ। আলমারী খুলে ঠিক তৃতীয় সেলফের মাঝখান থেকে একটা জেল্দ-করা কেতাব বের করলেন।

তারপর একটু অবজ্ঞা-জড়িত সুরেই কেতাবখানা আমাদের টেবিলে ফেলে দিয়ে বল্লেন, “দোস্তেরা, একবার চোখে দেখে নাও।”

আমরা তিনজনে হৃদ্ধি খেয়ে পড়ি। মৌলানা জালাল আরবী জানেন। কিন্তু আমরা ত পড়তে পারি।

বিরাট পাণ্ডুলিপি। ছাপা কেতাব নয়। মলাট খোলার পর দেখা গেল কেতাবের নাম: আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে।

আমরা ত অবাক।

জিজেস করল মাসুদ, “দাদু, এ পাণ্ডুলিপি আপনি কোথায় পেলেন?”

দশ মিনিট ধরে তিনি ইতিহাস বল্লেন। হালাকু খানের বগ্দাদ ধর্ষণের সময় এই পাণ্ডুলিপি আসে হিন্দুস্থানে। নানা হাত-ফেরীর পর পৌছায় শাহ সুজার কাছে। তিনি আরাকানে পলায়নের সময় পাণ্ডুলিপি মুর্শিদাবাদে এক ওমরাহের কাছে রেখে চলে যান। সেখান থেকে জৌনপুর। ফরিদ উদ্দীন সাহেব জৌনপুর থেকে এটা উদ্ধার করেন।

তিনি বল্লেন, “নাস্তালিখ অক্ষরে লেখা। অনেকে এটা ঠিকমত পড়তে পারে না পর্যন্ত।”

জিজেস করলাম, “এটাই তা-হোলে আসল আলেফ লায়লা?

“হ্যা, ভাই।”

আমরা উন্টে-পান্টে দেখতে লাগলাম। মাসুদ বল্লে, “দ্যাখেন ত শেষ গল্পটা কি? অর্থাৎ হাজার এক রাত্তির গল্পটা।”

“শাহজাদা হাবিবের কাহিনী।”

“তা-হোলে ঠিক আছে। তারপরের কাহিনীর নাম কি?”

মৌলানা জালাল পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে জবাব দিলেন, “জাহাকুল আব্দ অর্থাৎ গোলামের হাসি।”

আমরা বিস্মিত। কিন্তু মৌলানা জালাল আর্বী জানেন, সহজে মেনে নেবেন কেন? তিনি পাতা উন্টে জিজেস করলেন, “হজুর, আলেফ লায়লায় প্রত্যেক গল্প দুনিয়াজাদীর অনুরোধে শাহরেজাদী বলা শুরু করে। এখানে ত তা দেখছি না।”

“ওই কটা পাতা নেই। সংখ্যা দেখো।”

মৌলানা তা যিলিয়ে নিয়ে খুবই অবাক! আমাদের দিকে তাকালেন।

বিশ্বের বিস্ময় এই পাণ্ডুলিপি। আমি প্রস্তাব দিলাম, “দাদু, এটা আমরা কপি করিয়ে নিতে চাই আমাদের লাইব্রেরীর জন্য। তারপর আপনার কপি পাঠিয়ে দেব।”

ইষৎ কাঠখড় পোড়ানোর পর দাদু রাজী হোয়ে গেলেন। রাউফনের মুখে শুনেছিলাম,

সাধারণত তিনি এসব কাছ-ছাড়া করেন না। সেদিন আমাদের জন্য তাঁর স্বেহের ঢল নেমেছিল বোধ যায়।

শুকরিয়া, ধন্যবাদ মৌলানা জালাল, তুমি এখানে আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছিলে! এই আবিক্ষার আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

আরো দু-দিন হয়ত থাকা যেত, কারণ চতুর্থ দিনে কলেজ খুলছে। কিন্তু আর না। এই রজ্ঞুগুহা থেকে আবিক্ষৃত একটি রত্ন পৃথিবীকে না দেখানো পর্যন্ত আমার আর স্বত্ত্ব ছিল না।

সেদিনই বিদায় নিলাম দুপুরের পর। রউফনের মিনতির কোন দাম দিতে পারলাম না, দুঃখ।

শা' সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। তাঁকে ধরে-ধরে আনা হোলো দহলিজ পর্যন্ত।

সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে এল রউফন। জীবনের কাছে পরাজয় না-মানা বীরেরই পৌত্রী। সে কিন্তু তাঁর সজল চোখ আজ লুকাতে পারল না। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সেই সেরা ছাত্রিটির কাছে প্রত্যাখ্যাত হোয়ে রউফন এমনি চোখেই আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। জীবনকে কিন্তু সে খোয়ার হোতে দেয় নি। বীরের পৌত্রী আশ-মানবী।

গাড়িতে উঠে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত তুল্লাম। শুন্দা স্বেহ মমতা— সব কিছুর পতাকা যেন আমার করতালু।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল।

মাথা নীচু করে রউফন সড়ক থেকে বাড়ি স্মারকমুখে এগোতে লাগল :

শহর ফিরেই মৌলানা জালালের সহায়তায় আলেফ লায়লা ওয়া লায়লানে'র শেষ কাহিনীটা বাংলায় তরজমা করে ফেল্লাম।

বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মমতার জন্যেই ত পৃথিবীতে বাঁচা।

জাহানুল আবদ

:

জীতদাসের হাসি

১

খলিফা হারুনর রশীদের প্রাসাদের এক অংশে সহধর্মী বেগম জুবায়দা ও বাঁদী মেহেরজান কথোপকথন-রত।

বেগম : মেহের।

মেহেরজান : বেগম সাহেবা।

বেগম : যা, এবার যা।

মেহের : আগে ওরা তদ্দায় ঝিমোক। মহলের প্রহরীরা এখনও জেগে আছে।

বেগম : আর তাতারী জেগে আছে তোর জেন্য।

- মেহের : কিন্তু বেগম সাহেবা, ধরা পড়লে খলিফা আমাকে কতল করে ছাড়বেন।
 বেগম : সে আমি দেখে নেব। আর এই নে। যদি বিপদে পড়িস্ আমার অঙ্গীরী
 রেখে দে। পাহারাদারদের দেখালে ছেড়ে দেবে।
- মেহের : তবু ভয় লাগে, বেগম সাহেবা।
 বেগম : আজ হঠাৎ ভয় লাগছে কেন?
- মেহের : এম্বি। খলিফা ত আমাকে দেখেন নি। দেখলে মেহেরবানী করতেন।
 প্রহরীদের হাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা থাকবে না!
- বেগম : যা। এই সুম্মান রাত। এখন জওয়ানের বুকের মধ্যে বাঁধা পড়তে কি যে
 সুখ—

মেহের : আপনি আমাকে দৈর্ঘ্য করছেন, বেগম সাহেবা?

“মেহেরজান” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেগম সাহেবা বললেন, “দুই সীনা একত্র দেখলে
 আমার কি যে খুশী লাগে!”

“বেগম সাহেবা”, মেহেরজান জবাব দিলে, “এইজন্যে আমি কেয়ামত তক আপনার
 কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার বাঁদী ত আছি-ই। বেহেশ্টেও যেন আল্লা আমাকে আপনার
 বাঁদী বানিয়ে রাখেন।”

—“তুই যা। বড় বাজে কথা বলিস্। যা, আর দেরী করিস্ না। একটু দাঁড়া—
 তোর চোখের সুর্মা কোণের দিকে একটু মুছে গেছেন।”

বেগম সাহেবা নিজেই আয়নার সামনে মেহেরজানকে দাঁড় করানোর পর সুর্মার রেখা
 স্থান-শোভায় ভরিয়ে তুললেন।

—আহ, তোকে যা মানিয়েছে। এক ঘাঘুরা সদ্বিয়া, ওড়না নেকাব। ফেরেঙ্গুরা
 তোকে না তুলে নিয়ে যায়।

—বড় লজ্জা দেন, বেগম সাহেবা।

—যা, তাতারী না পাগল হোয়ে যায় আজ তোকে দেখে।

—বেয়াদবী মাফ করবেন, বেগম সাহেবা। সে ত পাগল আছেই। বুকে জড়িয়ে না
 ছাতু করে ফেলে।

—সে ত ভালই। তুই তার বদনে বদনে লেপ্টে যাবি, আর কাছছাড়া হোতে হবে না।

—কি যে বলেন, বেগম সাহেবা। ঘোড়ার সহিস, শুধু আপনার মেহেরবানীতে—

—ওকে দেখে ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে ভাল মানাবে। হাব্সী গোলাম। কিন্তু সুন্দর
 সুষ্ঠাম দেহ নওজোয়ান।

—মানুষ হিসেবে ও আরো সুন্দর।

—যা, যা। বড় কথা বাড়াস্। আঙুর নিয়েছিস্ ত?

মেহেরজান ওড়নার আড়াল থেকে বেগম সাহেবাকে এক গোছা আঙুর দেখাল।

—তুই নিজেই আজ আঙুর। এর চেয়ে আর বড় মেওয়া তাতারীর কাছে কিছুই
 হোতে পারে না। (বুকে টোকা দিয়া) এখানেও ত বেঁটায় ভাল ফল ধরেছে।

বেগম সাহেবা হাস্তে লাগলেন। সরমে মেহেরজান মুখ নীচ করে আর কুঁচকানো
 গালের পাশ দিয়ে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে বেগম সাহেবাকে দেখে।

—এবার যা ।

—আর থোড়া— একটা কথা, বেগম সাহেবা । আপনি কেন আমাকে এত পেয়ার
করেন?

—তুই এলি । তাই আমি খুশি । তুই আছিস্ম, তাই এই প্রাসাদে আমার আনন্দ
আছে । নচেৎ এই বিরাট মহলে কে কার? বেগম, বাঁদী ত শত শত । কিন্তু কাছের মানুষ
মেলা দায় ।

—খলিফা ত আপনাকেই...

—সে কথা রাখ ।

—আমার আজ যেতে ইচ্ছে করছে না । আমিরূপ মুমেনীন ত আজ আপনার মহলে
আস্বেন না । কাছে থাকতে দিন ।

—না । আর এ-কি বলাছিস্ম, মেহেরজান? যা, যা । আর একজনের বুক খাঁ খাঁ করছে ।
গোনাগার হোতে পারব না । ভোর হওয়ার আগে ঠিক ফিরে আসিস্ম ।

—আমি ত ভয় পাই! দু-জনে কখন ঘুমিয়ে পড়ি জানি না । যদি রাত্রে ঘুম আর না
ভাঙ্গে...

—না, এ ভুল কোনদিন করিস্ম নে । যদিও খলিফা আমার কথা রাখেন— কিন্তু
কখন কি হয়, কে জানে । মরজী যেখানে ইন্সাফ সেখানে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস
রাখতে নেই ।

—আপনি ভয় পান, আর আমি ভয় পাব না, বেগম সাহেবা?

—না । তবু সাবধান থাকা ভাল ।

—তবে খলিফা আমাকে কখনও দেখেন নি । সেই যা ভরসা । হঠাতে পথে ধরা
পড়লে বলব, বেগম সাহেবা বাগানে ভুল আন্তে পাঠিয়েছিলেন ।

—খলিফা দেখেন নি । সে ভাল-ই । কখন কি ঘটে এই মহলে, কেউ বলতে পারে না ।

—আমার তাই ত রোজ যেতে ইচ্ছে করে না, বেগম সাহেবা ।

—না, যা । তাতারী জেগে আছে মহলের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ।

—আচ্ছা, বেগম সাহেবা ।

—খোদা হাফেজ । ফি আমানীগ্লাহ ।

নীচে তরঙ্গতা শোভিত প্রাঙ্গণ চতুর । তারপর বাগানের সীমানা শুরু । বাতাবী লেবুর
সারি, দ্রাক্ষাকুঞ্জ— অন্যান্য গাছের ঘন সন্ধিবেশে রাত্রি অঙ্ককার-জয়টি । পথের হিসিস
পাওয়া কঠিকর । বেগম জুবায়দা অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন । বাঁদী মেহেরজান কি কালো
অঙ্ককার, না হাবসী গোলামের কালো বুকে এতক্ষণে হারিয়ে গেল?

আখ্রোট-খুবানী ভাল বুলে আছে ওইখানে পূব দরওয়াজার দু'পাশের দেওয়ালের
পাথর ঘিরে । তারই নীচে তো তাতারী প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে । ভালের ঝোপ ছেড়ে
মেহেরজান কখন তার হাতে হাতে দিয়ে নীচে বাঁপিয়ে পড়বে ।

হাবসী গোলাম আজ অপেক্ষা করবে ত? দাঁড়িয়ে থাকবে না স্পন্দিত বুকে, সারাদিনের
কঠোর ক্লান্তির পর?

বেগম জুবায়দার মনে সেই প্রশ্ন, মেহেরজানের মনে সেই প্রশ্ন ।

প্রাসাদ-কক্ষে হারুনর রশীদ পায়চারী-রত। মুখে আবেগ-চাঞ্চল্যের ছাপ। বারান্দায় পদ্ধতির শব্দে উৎকর্ণ বগদাদ-অধিপতি হেঁকে উঠলেন, “কে?”

জবাব আসে “জাহাপনা, বান্দা-নেওয়াজ, আমি মশ্রুর।”

- হারুন : এসো, এসো মশ্রুর। আজ আমি বড় একা। হাঁ, একা।
- মশ্রুর : জাহাপনা, আর্মেনিয়া থেকে একশ’ মুজ্রানী— নর্তকী আনিয়েছি। ওদের ডাক দেব, হ্রস্ব দিন।
- হারুন : বড় একা, মশ্রুর। মুজ্রানী দিয়ে শুন্যতার সেই বোধ দূর হবে না।
- মশ্রুর : হ্রস্ব, আপনার যা খায়েশ, শুধু বলুন। আস্তমায়ো তায়াতান। (শ্রবণ অর্থ পালন)।
- হারুন : না, কিছু না। বড় একা লাগছে। আজ জাফর বার্মেকী নেই, আবাসা নেই।
- মশ্রুর : জনাবে আ'লা, সেদিনও আপনার ফরমাবরদার গোলাম কোন কিছু অমান্য করে নি।
- হারুন : হ্যা, মশ্রুর। তোমার আবলুস কালো দেওয়ের মত কদ, তোমার পাহাড়ের মত বাজ— সব সময় আমার আর ভল্লওয়ারের ইঞ্জৎ রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু আমার বুকের পায়াণ-ভার নায়াতে পারে না? তুমিই একমাত্র পুরাতন বস্তু রয়ে গেছে। আর সবাই গুপ্তারে।
- মশ্রুর : আলস্পানা— আলস্পানা—
- হারুন : দহসৎ— ভয় পেয়েসো। আমি এখন আমিরুল মুমেনীন হারুনর রশীদ নই। আমি দরবারে নেই— হারেমে আছি। আমি তোমার বস্তু, মশ্রুর।
- মশ্রুর : জাহাপনা, আপনি যেদিন রাত্রে উজীরে আজম জাফর বার্মেকীর কতল পারোয়ানা লিখলেন, তখন বার বার ফিরে এসেছি তার দরওয়াজা থেকে। আপনার কাছে নাফরমান সাজতে পারব না— আবার ছুটে গিয়েছি। আপনি সবুর করলেন না।
- হারুন : মশ্রুর, আজো নিজের বিচার মানুষ নিজে করতে শেখেনি। সে খোদুকসী (আস্ত্রহত্যা) করতে পারে, যেমন সে রোজ গোস্তের জন্য দুষ্মা কি গাইকসী করে, কিন্তু নিজের বিচার করে না। সে-কথা আর উথাপন করো না কোনদিন।
- মশ্রুর : জাহাপনা, গোস্তাখি মাফ করবেন। মা'জী মা'জী— অতীত অতীত। তা আর কবর খুড়ে তুলবেন না।
- হারুন : মশ্রুর, মানুষের লাশ কি কবরে পড়ে থাকে আর পচে?
- মশ্রুর : আলেমরা সেই রায় দেয়।
- হারুন : না, না— মশ্রুর। দিওয়ানে এতক্ষণ বসেছিলাম। এখন পায়চারী করছি।

- কেন জানো? লাশ কবরে শয়ে থাকে না। লাশ কথা বলে। তার ধাক্কা আরো
শক্ত আরো কঠিন। জেন্দা মানুষের কষ্ট সেখানে ক্ষীণ ফিসফিসানি, ভাঁড়ার
ঘরে নেংটি হুঁদুরের পায়ের আওয়াজ মাত্র। বসে থাকতে পারলাম না।
- মশ্রুর হারুন** : জাহাপনা, মন থেকে সব মুছে ফেলুন।
হারুন : সবে মুছে দিতে পারি। কিন্তু শৃতি, মশ্রুর? শৃতি লাশ জেন্দা করে
তোলে।
মশ্রুর : শৃতি সমস্ত কওম-কে জেন্দা করে তুলতে পারে, জনাব। কিন্তু আলস্পানা,
সকলের শৃতিশক্তি থাকে না। হাবা বোবারা যেমন। তবে অতীতের কথা
অনেকে বলে। সে ত এগোতে না পেরে, দুঃসহ বর্তমান থেকে পালানোর
কুস্তি-পঁচাচ মাত্র। ও এক রকমের ভেঙ্গি, জীবনী-শঙ্কির লক্ষণ নয়। বলিষ্ঠ
মানুষেরই শৃতিশক্তির প্রয়োজন হয় সামনে পা ফেলার জন্য।
- হারুন** : আহ মশ্রুর, তুমি ত শুধু জল্লাদ নও, তুমি আলেমুল আলেম। পণ্ডিতের
পণ্ডিত। তাই ত আমার বক্ষ। কিন্তু শৃতি আমাকে ঘুমাতে দেয় না।
মশ্রুর হারুন : চলুন, কিছুদিন বগ্দাদের ঝামেলা ছেড়ে আর কোথাও যাই।
হারুন : কিন্তু আবাসা আমার সঙ্গ ছাড়বে? না-না। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত, কবরে
দাফন হোলো তার। সোজা কথায়, পুঁতে ফেল্লাম। কতটুকু তার অপরাধ?
জাফরের প্রতি মহৱৎ— কিন্তু আমি কি?

খলিফা হারুনর রশীদ হা-হা-রবে প্রায় উন্মাদের অত হেসে উঠলেন। পায়চারী করতে
লাগলেন। হাব্সী মশ্রুর মাথা-নীচু, তহবীতা বীধার ভঙ্গী বুকে দুই হাত, পাথর-মূর্তির
মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হারুনর রশীদ পায়চারী হঠাতে থামিয়ে ঘনোযোগ আকর্ষণের
জন্য মশ্রুরের বুকে মৃদু তজনী অংশাত করলেন। আবার হা-হা হাসি। তারপরই
পায়চারী-রত অবস্থায় বলে উঠলেন, কতটুকু তার অপরাধ? জাফরের সঙ্গে কি রকম
শাদী দিলাম? ‘আকদ’ হলো অথচ রসুমৎ হবে না কোনদিন। শক্ত শর্ত। কঠিন কারার।
মশ্রুর”—

- মশ্রুর** : আলস্পানা।
হারুন : আবাসা বাকী কাজ নিজে তামাম করলে। রসুমৎ-ব্যবস্থার ভার নিজের
হাতে নিলে যা বেরাদর নিলেন না। শর্ত ভঙ্গের কঠোর শান্তিও দিলাম।
আবাসী কওমের খুন বার্মেকী কওমের সঙ্গে মিশে নাপাক হবে— না, তা
হতে দিতাম না মশ্রুর—

- মশ্রুর** : আলস্পানা।
হারুন : আবাসা আমার সগ্গা সহোদর বোন। হা-হাঃ।
মশ্রুর : জাহাপনা—।

হারুনর রশীদ মশ্রুরের মুখোযুথি এসে দাঁড়ালেন, হাব্সী জল্লাদ চক্ষু তোলার সাহস পায়
না। পায়চারী-সচল মৃহূর্ত পথিবীর মতই শূর্ণমান। কিন্তু সমান তাল ও রেখায় নয়।
আমিরুল মুমেনীন আবার হঠাতে থেমে মৃদু কষ্টে বল্লেন, “মশ্রুর, আমি শৃতি উপ্ডে
ফেলতে চাই, সমস্ত শৃতি।”

- মশ্রুর : চলুন, বাগানে যাই। নারঙ্গী বনে ফুল ফুটেছে। কোথাও জামুরায় পাক ধরছে। বাগানে অরোর গন্ধ। খোশবু মনের বোৰা হাল্কা করে আলস্পানা!
- হারুন : তা-ই চলো। হারেমের এই কামরা আমার কাছে দোজখ। স্মৃতির ‘হাবিয়া’ নৱক আমার খুন শুকিয়ে দিয়েছে। গুম-খুন আমার ঘূম। এখানে আর না। মশ্রুর ঠিকই বলেছিল। ফল আর ফুলের খোশবুর সঙ্গে জুটেছিল ঠাণ্ডা হাওয়ার হাল্কা স্পর্শ। থোকা থোকা অঙ্ককার কোথাও জমাট, কোথাও ঈস্বৎ ফিকে। তাই এখনকার বহু-মাত্রিক দুনিয়া বহু-মাত্রিক মনের নাগাল পায় বৈকি। পায়ের নিংচে ঘাসের কোমলতা অন্যান্য অঙ্গের সান্নিধ্য খৌজে। মিটিমিটি নক্ষত্র বর্তিকা বাঁদীর কর্তব্য-সমাপনে নেমে আসে।
- পায়চারী করতে করতে খলিফা বল্লেম, “মশ্রুর, তোমার কথামত ঠিক জায়গায় এসেছি। আমি মনে শান্তি পাচ্ছি। আগুনের জ্বালা আর পোড়ায় না। আঁচ, আঁচ ত থাকবেই।”
- মশ্রুর : শুক্ৰিয়া, জাঁহাপনা।
- হারুন : মশ্রুর, তোমার মনে পড়ে, আমরা চারজনে কতদিন বগ্দাদের সড়কে, কতো বেগানার কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি?
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, মওতের আগে তক্ক বান্দা তা ভুলতে পারবে না।
- হারুন : মনে পড়ে ... মণিকার মান্জারের মহলে সেই রাত্রির কথা? অঙ্গুত সেই আওরত— শাদীর সময় যার শুক্রে শুক্রের ব্যভিচারী হোলে, দু'শ' কোড়া দুই পৌজরে খেতে হুন্দু। দুই চক্র উপড়ে তুলে দিতে হবে। ... মনে পড়ে?
- মশ্রুর : কেয়ামৎ তক্ক মনে থাকবে, বান্দা নওয়াজ, ভৃত্যপালনকারী।
- হারুন : মনে পড়ে, সিন্দবাদ নবিকের কথা? তার হগুম সফরের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী?
- মশ্রুর : বান্দার স্মৃতিশক্তির পরিচয় ত আপনার জানা আছে, জিলুল্লাহ।
- হারুন : সব মনে আছে। জাফর আর আবুসামা কবরে শয়েও ভুলে যায় নি। কিন্তু আমি ভুলে যেতে চাই।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, সে-সব কথা আর তুলবেন না। চমৎকার রাত্রি। আপনি যদি মধ্যের করেন, কবি ইস্হাককে ডেকে আনি। তার গজল শোনা যাক।
- হারুন : না, মশ্রুর। নির্জনতাই আমার পছন্দ। এখানে রাত্রির হাওয়া পাঁজরের দাহ নিভিয়ে দিতে পারে। কবির জায়গা আর কোথাও। ওরা বুকের কল্লোল আরো বাড়িয়ে তোলে।
- মশ্রুর : বান্দা-নওয়াজ, ভৃত্য-পালক, তবে চলুন— শহরের সড়কে হাঁটি। বগ্দাদ শহর ত ঘূম জানে না। কোথাও না কোথাও কিছু পাওয়া যাবে, মনের বাতাস ফেরাতে।
- হারুন : না মশ্রুর। এই লেবাসে অসম্ভব। আর দু'জনে ত বহুদিন বেরোই নি। উম্মায়েদ খুনীদের গোয়েন্দা, গুগা— কোথায় কিভাবে ওঁৎ পেতে আছে,

কে জানে ।

- মশ্রুর : জাহাপনা, উম্মায়েদরা কর্দোবা শহরে পালিয়েছে। ওরা আর এদিকে চোখ ফেরাবে না ।
- হারুন : মশ্রুর, খেলাফৎ ত পাও নি। বুঝবে না রাজত্বের লোভ কত। ওই লোভের আগুনের কাছে হিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব—সব পুড়ে যায় সেই আগুনে। উমাইয়ারা আমার বংশ প্রতিষ্ঠাতা আবুল আকবাসকে গাল দেয় সাফ্ফাহ—রক্ষণপাসু বলে—আর ওরা? জাব দরিয়ার তীরে যদি আবুল আকবাস হেরে যেত? জয় বা পরাজয়ের ঘূণি মেটাতে পরাজিতদের গাল দেওয়া একটা রেওয়াজ হোয়ে দাঢ়িয়েছে। উমাইয়াদের পাশা যদি ঠিক পড়ত—তখন? মীতি এখানে বড় কথা নয়। বল—লোক-বল, অস্ত্র-বল, অর্থ-বল সব মীতির মাপকাঠি। তাই দু'জনের বগদাদ শহরে এই অবস্থায় পায়চারী করা যুক্তিযুক্ত হবে না ।
- মশ্রুর : জাহাপনা, উমাইয়াদের ঘাড় অত তাকৎ রাখে না ।
- হারুন : না রাখুক। হিয়ারী ভাল, হিয়ারী ভাল, মশ্রুর ।
- মশ্রুর : জিল্লাহ, আপনার মহল এই “কাওসুল আক্দারের” বাগানে কতদিনের পুরাতন গাছ রয়েছে ।
- হারুন : বহুদিনের। আবোজান মরহুম মেহেদী বল্তেন—‘দুইশ’ বছর আগে এখানে—কিন্তু ও কি, মশ্রুর?
- মশ্রুর : কি, জাহাপনা?
- হারুন : (উৎকর্ণ) ওই—
- মশ্রুর : কি, আমিরুল মুমেনীন?
- হারুন : তৃমি শুন্তে পাচ্ছে না?
- মশ্রুর : না, আলম্পানা ।
- হারুন : হাসি, হাসি—কে যেন হাস্ছে ।
- মশ্রুর : হ্যা, শুন্তে পাচ্ছি ।
- হারুন : আমার মহলের গায়ে কে হাস্ছে এত রাত্রে—এই হাসি—একটু চুপ করো ।

খলিফা হারুনর রশীদ ঠোঁটে তজনী রেখে ইঙ্গিত করলেন, একদম নিঃস্তর দাঁড়াও।
সত্যি, চতুর্দিকের সুম্মান বিয়াবান যেন হাসির মওজে দোলা খাচ্ছে। খুব জোর হাসি নয়। অস্পষ্ট। তবু তার রঘন উৎসমুখের খবর পাঠায়। উৎকর্ণ কিছুক্ষণ শোনার পর, হারুনর রশীদ স্তুতি ভেঙ্গে উচ্চারণ করলেন, “মশ্রুর। শুনেছো এমন হাসি? কে হাস্ছে আমার মহলের দেওয়ালের ওদিকে? এ হাসি ঠোঁট থেকে উৎসারিত হয় না। এই উৎস সুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভত প্রদেশ। ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎসঙ্গ- দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপলবিনূর্ণী পাশে ঠেলে ঠেলে— বিজন পথ-স্রষ্ট তৃষ্ণার্ত পথিককে সঙ্গীতে আমন্ত্রণ দিতে— এই হাসি তেমনই বক্ষঝর্ণা-উৎসারিত। কিন্তু কে এই সুখীজন—

আমার হিংসা হয়, মশ্রুর। আমি বগদাদ-অধীশ্বর সুখ-ভিক্ষুক। সে ত আমার তুলনায় বগদাদের ভিক্ষুক, তবু সুখের অধীশ্বর! কে, সে?

মশ্রুর জবাব দিলে, “আলস্পানা, ওদিকে ত হাব্সী গোলামেরা থাকে।”

হারুন : হাব্সী গোলাম?

মশ্রুর : হ্যা, বাদশা-নামদার।

হারুন : গোলামেরা এমন হাসি হাসতে পারে?

মশ্রুর : পারে, আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আশাদ পায়। ওরা হাসে।

হারুন : মনে হয় কোন জীন-পরীর হাসি। কিন্তু কান দিয়ে শোন ত। মিহি-মোটা দু-রকম হাসি যেন একত্রে মিশে বাতাসের লাগাম ধরে আসছে।

মশ্রুর : তা-ই মনে হয়।

হারুন : কিন্তু কারা হাসছে? কোন মানব-মানবী? কোন মানব-মানবী একত্রে?

মশ্রুর : গোলামের হাসি, জাহাপনা।

হারুন : ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।

মশ্রুর : হাসি থেমে গেল, জিল্লাহাত।

হারুন : হ্যা। তা-ই মশ্রুর। কিন্তু ওর রেশ আমার কানে এখনও বাজছে।

মশ্রুর : সত্যি, অঙ্গুত হাসি।

হারুন : মশ্রুর, চেয়ে দেখো ওই দিক্কে ওই খুবানির গাছের ডাল যেখানে দেওয়ালের লাগালাগি মিশেছে কে যেন সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল।

মশ্রুর : না, জাহাপনা। এখানে কে আসবে? কার এত সাহস?

হারুন : একটু এগোও। দেখো, ঝাপ দিয়ে পড়লে ডাল যেমন কাঁপে, খুবানির শাখা তেমনই কাঁপছে।

মশ্রুর : আমিরুল মুমেনীন, কোন নিশাচর পাখি বসেছিল, হয়ত এখনই উড়ে গেল। তার ডানার ঝাপটের শব্দে এমন মনে হয়।

হারুন : হয়ত তা-ই। এখন কত রাত্রি?

মশ্রুর : আলস্পানা, ঐ ত দজ্জলা নদীর উপরে আদম-সুরত হেঁটে হেঁটে দূরে নাম্ছে! আর বেশী প্রহর বাকী নেই শুকতারা ওঠার।

হারুন : চলো, এখন মহলে ফিরে যাই। এই রাত্রির কথা যেন কেউ টের না পায়, মশ্রুর। আহ, ঐ হাসি আমি হাসতে পারতাম! কাল আবার আমাদের তালাসী নিতে হবে— এমনই রাত্রি।

মশ্রুর : আস্সামায়ো তায়তান— শ্রবণ অর্থ পালন।

হারুন : মশ্রুর।

মশ্রুর : জাহাপনা।

হারুন : আজ আমি ঘূমাব, অনেক— অনেক ঘূম। কাল দরবার হবে না, ওম্বাদের বলে দিও। আমি শুধু হাসি শুন্ছি। আমি এমনই হাসি হাসতে চাই। চলে। ...

৩

হারুনর রশীদের কওসুল-আক্দার বা সবুজ প্রাসাদ রাত্রির নৈংশব্দ্য-মোড়কে কৃষ্ণবর্ণ। মহলের কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে, কিন্তু উদ্যান আগেকার মতই সুন্তি-মগ্ন, অক্ষকার। খোজা প্রহরীরা কোথাও কোথাও নিজের জ্যায়গায় মোতায়েন আছে। তাদের দেখা যায় না। জুতার আওয়াজ নিষ্ঠকতা ছাপিয়ে ওঠে নি এখন-ও। বাতাসের গতায়তি হয়ত শব্দ তোলে, কিন্তু তার ছোঁফাচ নির্জনতা ভেদ করতে পারে না। সুন্তির বর্ম এখানে বড় কঠিন।

“মশুরুর, ধীরে”, আবার কাফ্তান গোলাপ ডালের কাঁটায় বিধে শিয়েছিল, তা ছাড়াতে ছাড়াতে খলিফা হারুনর রশীদ বল্লেন।

“জাঁহাপনা, আজ কেউ আর হাস্দে না।” মশুরুর জবাব দিলে।

দু'জনে হাঁটছিলেন উদ্যানের সাধারণ রক্তিম পথ ছেড়ে, ঘাসের উপর, গাছের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে। নির্জনতার প্রান্তরে অজ্ঞাতবাস বিক্ষিত হৃদয়ের প্রলেপ। হয়ত সেই জন্যে অথবা অন্য কারণে আমিরুল মুমেনীন হাঁটছিলেন। আজ তাঁর দেহাবয়বে চাপ্টল্য প্রায় অনুপস্থিত। হাঁটছেন, দু'একটা কথা বল্ছেন। আবার কান খাড়া করছেন। ছায়ার মত সঙ্গী মশুরুর অক্ষকারে যেন নিঃশ্বাসের বাতাস।

—মশুরুর।

—জাঁহাপনা।

—কিছু শুন্তে পাচ্ছো?

—হ্যা, জিল্লাহ। সেই হাসি।

—দাঁড়াও, চুপ করে শোনো।

—আজ আরো স্পষ্ট, আরো উঁচু।

—মানব-মানবীর মিলিত হাসি।

—গোলামেরা এত রাত জেগে থাকে?

—থাকে, জাঁহাপনা! বিশ্রাম অর্থ ত শুধু ঘুম নয়।

—এগোও, দেখা যাক কোন্ দিক থেকে এই হাসির শব্দ আসে।

তাঁরা দু'জনে এগোতে লাগলেন। কাওসুল আক্দারের বিস্তৃত দেওয়ালের ওপার থেকে বিচ্ছুরিত হাসির অনুরণন ছুটে আসে। আর কিছু বোঝা যায় না। দু'জন শুন্দি দাঁড়িয়ে শোনেন, খোলা আকাশের মীচে। সৃষ্টি এই হাসির পরিমাপ শুধু শব্দে করা চলে না। কর্ণপটে আশাবরী রাগ তারা গ্রামে পৌছে যে-সুরের যিকিমিকি রচনা করে এই হাসি প্রায় তারই তুলনা। কিন্তু মানুষ এই হাসি হাস্তে পারে— বিশেষ করে গোলামেরা? আমিরুল মুমেনীন প্রশ্ন তুল্লেন কিস কিস কঠে।

জবাব দিলে মশুরুর, “জাঁহাপনা, চলুন। প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে এর তল্লাশ শেষ করি।

হারুন : না, মশুরুর, এত হস্তগোলে হয়ত সব পও হয়ে যাবে। বুলবুলের ডাক

- বনের আড়ালে বসে শুন্তে হয়।
- মশ্রুর : আমি কিন্তু বুলবুল দেখার পক্ষপাতী, আলম্পানা।
- হারুন : আমি কিন্তু কম পক্ষপাতী? কিন্তু এত তাড়াহড়ায় হয়ত কোন খৌজ পাওয়া যাবে না। বুলবুল উড়ে পালাবে।
- মশ্রুর : তার চেয়ে আমাকে দুই রাত্রি সময় দিন, আমি সব হন্দিস বের করব।
- হারুন : বেশ। দু'দিন বহু কাজ আছে। শুনেছি রোমের সুলতান সেই হতভাগ্য নিসিফোরাসের বহু সমর্থক গুপ্তবাতক সেজেছে। আমিরদের আমিরী চালে নানা গলদ তুচেছে। তাই নানা কাজ, আমি দু'দিন ব্যস্তই থাকব। তুমি বের কর হাসির হন্দিস।
- মশ্রুর : আস্সাময়ো তায়তান।
- হারুন : কিন্তু মনে রেখো, মশ্রুর। দু'দিন সময়। তার বেশী নয়।
- মশ্রুর : বান্দার গর্দান জিম্মা রইল, জাঁহাপনা।
- হারুন : বেশ। এবারকার যুদ্ধে রোমের বহু গোলাম বন্দী হয়েছে। বাজারে গোলামের দাম খুব সস্তা। ওরা তবু হাসে? আর এই হাসি অসম্ভব মনে হয়।
- মশ্রুর : দু'দিন আমিরুল মুমেনীন। সবই জানা যাবে।
- হারুন : বেশ।

হারুনর রশীদ আবার উৎকর্ণ। শুন্লেন সেই মানবিমানবীরা হাস্ছে। রংমুকুমু নিনাদ তরুলতার ক্রোড়ে, বাতাসের পাখ্নায়, পাথ পাখালিদের স্থির পালকের আবেশে, যখন—
বসুক্রা হাস্যমগ্ন।

8

তৃতীয় রাত্রি।

হান, কাওসুল আক্দারের উদ্যান। এই রঙমঞ্চে দুইজন পরিচিত অভিনেতাই উপস্থিত, আরো দুই রাত্রি যাদের সঙ্গে দেখা।

—জাঁহাপনা।

—মশ্রুর, তোমার হন্দিস বাতাও।

- মশ্রুর : জাঁহাপনা, জায়গা বিশেষে কানের চেয়ে চোখের কিমৎ বেশী। আমি আজ হন্দিস মুখে বল্ব না, আপনাকে শোনাব না। আপনার যেহেরবান দুই আঁথিপটে সব ছবি পড়বে, আপনি দেখবেন। এখন আমাকে অনুসরণ করুন।
- হারুন : কোন্ দিকে মশ্রুর?
- মশ্রুর : সেই দেওয়ালের কাছেই। কিন্তু একটু দূরে। একটা বাদাম গাছের ডালের কাছে।
- হারুন : তা-ই চলো।
- মশ্রুর : বান্দার গোত্থিমাফ করবেন, জাঁহাপনা। আর একটা আরজ। আপনাকে

- তক্লীফ করে সামান্য উঁচুতে গাছের ডালে চড়তে হবে।
- হারুন : তক্লীফ কি? তুমি জানো না, ছেলেবেলায় আমি পিতার চোখে ধূলো দিয়ে কতদিন এইসব গাছে চড়েছি। আমার কোন কষ্ট নেই।
- মশ্রুর : তা আমি শুনেছি নাম্বার।
- দুই জনে অঙ্ককারে লেবাস পর্যন্ত গোপন করে এগোতে লাগলেন। গাছের পাকা পাতা ঘরে। আমিরুল মুমেনীন কান খাড়া করেন।
- হাঁটতে হাঁটতে তিনি প্রশ্ন করলেন, “মশ্রুর, আজ এত রাত্রি, সেই হাসির রণন ত পাচ্ছি না।”
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, বান্দাকে এই বিষয়ে আর কোন সওয়াল করবেন না। আপনার সতর্ক, নেঘাবান চোখের কাছে সব হাজির হবে।
- হারুন : মশ্রুর, তুমি ধাঁধায় ফেললে। হঠাৎ প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলে?
- মশ্রুর : না, ওরা আজ এদিকে আসবে না। আমি মানা করে দিয়েছি।
- হারুন : তা বুঝেছি। মশ্রুর কোন কাঁচা কাজ করে না।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, এই সেই বাদামের দারাখৎ (বৃক্ষ), এই গাছের ডালে আমাদের চড়তে হবে।
- হারুন : আচ্ছা, জুতা খোলার প্রয়োজন হবে না। আমার আ'বা শুধু খুলে এক পাশে রেখে দিই।
- মশ্রুর : আলস্মানা, আমি খুলে নিছি।
প্রায় পনর হাত উর্ধ্বে খাড়ি ডালে মশ্রুর ও আমিরুল মুমেনীন উঠে বস্তেন।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, একবার রাত্রির বগ্নাদ— আপনার গড়া বগ্নাদকে এই উচ্চ থেকে দেখে নিন। চমৎকার। কত আলো চারদিকে। এই রাত্রি তবু মানুষের স্পন্দন, হৎস্পন্দনের মতই ধূকধূক করছে। দজ্জলা নদীর বুকে গুফার উপর আলোর বিকিমিকি দেখুন। গুফাদারেরা গজল গাইছে, দাঢ় টানছে। আমিরুল মুমেনীনের গড়া বগ্নাদ, এক-কথায় অপূর্ব।
- হারুন : মশ্রুর, মহলের মিনার থেকে কত রাত বগ্নাদকে দেখেছি। কিন্তু আজকের দেখা কোনদিন ভুলতে পারব না। গাছপালার মধ্যে বসে যেন আদিম দুনিয়া থেকে দেখেছি মানুষের গড়া জিনিসকে। ইন্সান-ও স্টো। আর ইন্সানের তৈরী চিজ বিধাতার চিঁজের চেয়ে কিছু নগণ্য নয়। আমার বগ্নাদের এই ইয়ারৎ, সব কিছু হয়ত আজরাইলের থাবায় লয় পেয়ে যাবে, কিন্তু বগ্নাদ অমর উপকথায় পরিণত হবে। আজরাইল সেখানে পৌছতে পারবে না।
- মশ্রুর : আলহামদোলিল্লাহ, জাঁহাপনা।
- হারুন : বগ্নাদ দুনিয়ার দুর্ভেদ্য অঙ্ককারে বোশনাই হোয়ে থাকবে, মশ্রুর।
- মশ্রুর : আলহামদোলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লার।
- হারুন : কিন্তু মশ্রুর, সেই হাসির ত কোন আলামৎ-চিহ্ন-পাওয়া যাচ্ছে না।

- মশ্রুর : জাহাপনা, আমার হাত থেকে এই কাঁচখানা গ্রহণ করুন, কিমিয়ার কাছ থেকে আন।
- হারুন : কেন?
- মশ্রুর : এটা চোখে দিলে গাঢ় অঙ্ককারেও আব্রহা কিছু দেখতে পাবেন। আর ওই দিকে তাকান। ওই যে খুবানীর ডাল ঝুলে রয়েছে— সেদিন যে-জায়গাটা আপনার নেঘাবান চোখে পড়েছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকুন, আলস্পানা।
- হারুন : বেশ। কিন্তু কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না।
- মশ্রুর : দেখতে পাবেন, মুরম্মাহ। আর খুব আন্তে কথা বলবেন। আশেপাশে দেখুন। আমার কাছে-ও একটা কাঁচ আছে। চোখে লাগাই।
- হারুন : কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সব অঙ্ককার।
- মশ্রুর : অমিরুল মুমেনীন, এই ঝুলন্ত ডালের সোজাসুজি দেওয়ালের ওপাশে অর্ধাৎ বাগানের দিকে দেখুন।
- হারুন : হ্যা, দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য বাল্মী। একজন আওরৎ, হ্যা, আওরৎ-ই আসছে। ওড়না, সদরীয়া, নেকাব— সবই আছে। আমার মহলের আওরৎ কোন বেগম, কোন বাঁদী, মশ্রুর?
- মশ্রুর : বান্দাকে নাচার করবেন না, জাহাপনা। শুধু আপনার মেহেরবান চোখে দেখুন।
- হারুন : কিন্তু আমার চোখ মেহেরবান নয়। আমার মহলের বেগম না— বাঁদী? একি মশ্রুর, ডাল ধরে ঝুঁকে ও-যে দেওয়ালের উপর চড়ল, তারপর ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল— ইশারায় কী যেন বললে। নিচে কি কেউ দাঁড়িয়ে আছে? ও কি মহলের বেগম, না বাঁদী?
- মশ্রুর : জাহাপনা, আমি কোন জবাব দেব না। একটু সবুর করুন। বান্দাকে আর গোস্তাখির গোনায় গোনাগার করবেন না।
- হারুন : সবুর। মশ্রুর, গোস্বায় আমার খুন টগুবগু ফুটছে।
- মশ্রুর : আলস্পানা, সবুৎ (প্রমাণ) বা একটা কাজের সব না দেখে আপনি গোস্বা হোতে পারেন না।
- হারুন : তা সহী (ঠিক)।
- মশ্রুর : আলস্পানা, এবার ডাইনে বিশ-তিরিশ হাত দূরে একটু কোনাকোনি আপনার নেঘাবান চোখ সরান। ওটা গোলামদের বক্তী। এ এক ঝরোকায় আলো জুলছে যিটিমিটি। ওদিকে তাকান। চোখে কাঁচ লাগাতে ভুলবেন না।
- হারুন : ওখানে কেন?
- মশ্রুর : দেখুন, আলি-শান।
- হারুন : মশ্রুর, তুমি শুধু তেলেস্মাতি ধাঁধা সৃষ্টি করছ।
- মশ্রুর : এবার দেখুন।
- হারুন : ও ত গোলাম বসতের ঘর। কিছু মাটি উঁচু করে ফেলে দিওয়ানের মত বানিয়েছে। উপরে বিছানা পাতা। বেশ রঙ্গিনই মনে হয়। গোলামের ঘরে—

এই তাকিয়া? আর ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মশ্কুর : জাহাপনা, আপনি শুধু দেখে যান।

হারুন : আমি ত দেখছি-ই।

পাশাপাশি উপবিষ্ট মশ্কুর ও হারুনর রশীদ। কত রাত্রি কে জানে? গাছের কয়েকটা ডাল এক জায়গা থেকে বেরিয়েছে। এমন খাড়ি। বেশ হেলান দিয়ে এখানে বসা যায়। কিন্তু কৌতুহলী মানুষ ত আরামের স্বাদ-প্রার্থী নয়। আমিরূল মুমেনীন ও মশ্কুর শিরদাঁড়া-স্টান মনোনিবেশে দৃশ্য দেখতে লাগলেন। শোনার ক্ষেত্র নেই, বলা বাহ্য্য।

গোলাম-বসতের সাধারণ মাটির ঘর যেমন হয়, এই ঘরের মশাপা তার চেয়ে অন্য কিছু নয়। কিন্তু তবু পরিপাটি আছে। মাটির দিওয়ান জানালার পাশে। মরুভূমির লু'হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত ঘরেরই জানালা উঁচুতে। যেন সোজাসুজি বাতাস মুখে না লাগে। গাছের পাতার তৈরি দুই পাল্লা। কখনও বক্স, কখনও খোলা থাকে। নিচের রাস্তা থেকে কিছু দেখা যায় না। অনেক উপর থেকে ঘরের মেঝে চোখে পড়ে।

হঠাৎ মেটে দিওয়ানের উপর এক হাব্সী নওজোয়ান এসে দয়ে পড়ল, ঠোটে মিটিমিটি হাসি। তার পেছনেই এলো আরমেনী এক তরুণী। সে বসে পড়ল এক পাশে। হাতে একগোছা আঙুর। শুচ সমেত সে হাব্সী নওজোয়ানের ঠোটের উপর ধরে ও নাড়াতে থাকে। হাব্সী আঙুরের লোভে ঠোট বাড়ায়। তরুণী তখন দ্রাক্ষাশুচ উপরে তুলে নেয় আর মিটিমিটি হাসে। হাব্সী জোয়ান এবার বালিঙ্গথেকে আরো উর্ধ্বে মুখ তোলে, কিন্তু আঙুর শুচ তেমনই আরো উপরে সরে যায়।

কথা শোনা যায় না, তবু কেউ কাজে থাকলে শুন্তে পেত বৈকি।

তরুণী : তুমি বড় লোভী, তাত্ত্বারী? তোমার সবুর সয় না।

যুবক : মেহেরজান, সবুর কিনা যায় না। তাল মেওয়া দেখলে জিভে পানি এম্বি আসে।

তরুণী : এসো, আর একবার চেষ্টা করো, তোমার ঠোটের কাছে আঙুর ঝুলিয়ে ধরি।

যুবক : তোমার ঠোটে আরো বেশী মেওয়া আছে।

তরুণী : বেশ, তাই থাও। কিন্তু আঙুর পাবে না।

যুবক : আঙুরে আমার প্রয়োজন নেই। ও আমার আমাদের নসীবে জুটে না। বেগম জুবায়দার মেহেরবানী, আঙুর-ও জুট্টে।

তরুণী : শুধু আঙুর? আর কিছু না?

যুবক : সেই মেওয়া—

উভয়ের হাস্যধনি আর কামরার ভেতরে আবক্ষ থাকে না। এই প্রাণদ হাসি শুধু এই মুহূর্তে পাওয়া যায়— হৃদয় যেখানে হৃদয়ের বার্তা উপলক্ষ করে, সান্নিধ্যের ব্যগ্রতায় নিজের অস্তিত্ব আর আলাদা রাখতে নারাজ। বাতাস হয়ত লোভেই ছুটে আসে তার তরঙ্গে নতুন সুর জুড়ে দিতে। বাতাসকে এখানে আমন্ত্রণ দিতে হয় না।

যুবক : মেহেরজান, আগে এই মেওয়া দাও। তারপর তোমার মেওয়া দিও।

- তরুণী : আবার চেষ্টা করো।
- যুবক : না। আমি এই মুখ স্টুজে শয়ে পড়লাম।
- তরুণী : আহা, রাগ করো না। আজ আমিও সবুর করতে পারব না। ভয় হয়। খলিফার কানে গেলে—
- যুবক : তেবে লাভ নেই, মেহেরজান। বেগম সাহেবা যখন আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আমি আর ডরাই না।
- তরুণী : এসো, আঙুর খাও। আমি ত তোমার জন্যে আনি। বেগম সাহেবা আমাকে রোজ অনেক কিছু খাওয়ান।
- যুবক : মেহেরজান, তুমি ভারী সুন্দর, তোমার কথার মতই সুন্দর। বিধাতা তোমাকে ঝুটো করেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।
- তরুণী : ঝুটো?
- যুবক : বিধাতা ত সব জানেন। তোমার ভৃত-ভিবষ্যৎ। এই আঠারো বছরে তুমি কি দাঁড়াবে তা ত তিনি জানতেন। সেই কল্পনার মূর্তিতে তিনি কি তোমার ঠোঁট আস্ত রেখেছেন, মেহেরজান?
- তরুণী : তিনি কি করেছেন জানি না, তুমি ত—
- আবার সেই উত্তরোল হাসি ওঠে এই জীর্ণগহের মধ্যে ফিরদৌস (বেহেশ্তের নাম) ত দূরে নয়। বুকের কপাট খুল্লে যে হাওয়া বেরেন্ত, তারই স্নিফ্ফতা আর শীতলতা দিয়েই বেহেশ্ত তৈরী। আজকের হাসি সহজে থামা জানে না। লয়ান্তরের মত তারি মধ্যে তরুণী মুখের কথা ছড়িয়ে যায়।
- তরুণী : বিধাতার উপর খালি চুম্বনের অপবাদ কেন? রসিক কী সেখানেই শুধু থেমে থাকতে পারে?
- যুবক : আহ মেহেরজান—
- যুবক আর দিওয়ানে শয়ে থাকে না। ধড়মড় উঠে পড়েই সে তরুণীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে। তারপর বিধাতার উপর যে অপবাদ দিয়েছিল সে তারই অভিনয় শুরু করে। চারি-চক্ষুর মিলন, বহু শতাদীর প্রবাদ। ঠোঁটের কথা কেন কেউ কোনদিন উল্লেখ করে নি?
- যুবক : (ফিস্ফিস কর্ত্তে) তোমার বুকের মেওয়া কি কম মধুময়, মেহেরজান।
- তরুণী : তুমি যে কতদিনের দুর্ভিক্ষে উপবাসী। খালি খাওয়া ছাড়া আর কোন কথাই নেই মুখে।
- যুবক : উপবাসী, অনাহারী। নিশ্চয়ই তোমার মত ইফ্তারীর জন্য আমি সারা জন্ম উপবাসী থাকতে রাজি। কিন্তু আর কথা বলব না।
- তরুণী : তুমি আমার সদ্বিয়া, কাঁচলী খুলছ কেন? তোমার দুষ্ট হাত আমি ভেঙে দেব। খাওয়া ছেড়ে এবার চাওয়া ধরেছ।
- যুবক : মেহেরজান, তুমি সত্যি, সত্যি মেহেরজান। প্রাণে করণা ঢেলে দিতে পারো।
- তরুণী : আমার খোলা সীনায় তোমার ঠোঁট তাতারী। আগে আমার ঠোঁটে ছিল তোমার ঠোঁট। তোমার অধঃপতন ঘটছে, ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছো। দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় গিয়ে যে থাম্বে— যাও—।

কৃতিম ক্রোধ ও হাসির যুগল-ডানায় সওয়ার মেহেরজান। বাহপাশ ছাড়িয়ে, দিওয়ানের পাশে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীর নগ্ন। পরনে শুধু ঘাগ্রা।

তাতারীও সামনে এসে দাঁড়িয়ে তরুণীর চোখের দিকে তাকায়। নিষ্ঠক মুহূর্ত। তারপর মেহেরজানের ঘাড়ে হাত দিয়ে সে-ও হাসতে থাকে। দুইজনে হাসে। যেন স্মৃতির রোমছন্ন-লীলায় দু'জন ভেসে যাচ্ছে। এই সুখ-সমুদ্রের প্রবাহ অনন্তকালের রেখায় হয়ত মিশে গেছে। কবে? তারা কেউ জানে না।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে যেন উভয়ের সমিত ফিরে আসে। হাবসী যুবক মেহেরজানকে বুকে জড়িয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে এসে আল্তোভাবে দিওয়ানে রাখলে। তারপর বাতি নিভিয়ে দিল।

অঙ্ককারে দুই জনে অনেকক্ষণ হাস্তে থাকে। কেন? সে তারা-ই ভাল জানে, আর জানে বিধাতা।

প্রেমিক-প্রেমিকার কুহর শুনেছো কোন দিন? না শুনে থাকো, লেখক তোমাকে আর কিছু বোঝাতে পারবে না।

৫

- মশ্রুর : জাঁহাপনা।
হারুন : কি মশ্রুর?
মশ্রুর : কি দেখছেন?
হারুন : দেখছি না, শুনছি?
মশ্রুর : কি, আলস্পানা?
হারুন : হাসি শুনছি। হাসি থেমে গেছে, তবু শুনছি। কিন্তু আমার মহল থেকে নৈশ অভিসার! কে— কে এরা, কে?
মশ্রুর : জাঁহাপনা।
হারুন : মশ্রুর, আমি জান্তে চাই, মহলের কোন বেগম না বাঁদী?
মশ্রুর : মহলের কেউ নিশ্চয়। আর তা কিছু জানার প্রয়োজন নেই আলস্পানা।
হারুন : আছে। আমার ইঞ্জৎ কি কিছু নয়?
মশ্রুর : তৌবান্তাগফেরগুলা।
হারুন : তবে কে ওরা?
মশ্রুর : আর জানার চেষ্টা করবেন না, জিল্লাহাত।
হারুন : না, আমাকে জান্তেই হবে, আর তা জানাবে তুমি।
মশ্রুর : বাদশা নামদার, বাদশাকে গোনাগার করবেন না।
হারুন : বলো তুমি কি জানো?
মশ্রুর : জাঁহাপনা, মাফ করুন বাদশাকে।
হারুন : না, মশ্রুর। পুরাতন বস্তুদের মধ্যে শুধু তুমি আছ। তোমার প্রতি বেদীল

- হওয়ার অপরাধে আমাকে অপরাধী করো না ।
- মশ্রুর : জাহাপনা, আমি মাফ চাইছি দু'হাত জোড় করে । আমার কম্পিত কষ্টস্বর
শব্দে কি বুঝতে পারছেন না, আলস্পানা, কেন— কেন— আমার মুখ
বক্ষ হয়ে আসছে ।
- হারুন : কিন্তু মশ্রুর, তুমি কি নিজের গর্দানের কোন দামও দাও না?
- মশ্রুর : জাহাপনা, অনেক গর্দান নিয়েছি এই হাতে, আর কত দামী দামী গর্দান—
মহামান্য জাফর বার্মেকী, যিনি দুনিয়াকে কামিজের গলায় কফ্তান
লাগানো শিখিয়ে গেছেন— সেই গর্দান । আমার এই হলকুমের
(গ্রীবাদেশ) দাম তো তুচ্ছ তার কাছে । আপনার মেহেরবানী হয়, দানা-
পানি নিঃশ্বাসের জন্য এই হলকুম রাখবেন— না হয় কলম-তরাস—
কর্তন করবেন ।
- হারুন : এত অভিমান করো না । তুমি জানো, তার দাম আমার কাছে কিছু নয় ।
সোজা বলো, আসল রহস্য কী? বড় ভুল করেছি— কবি ইস্মাককে সঙ্গে
না নিয়ে । ঐ প্রেমের দৃশ্য দেখে হয়ত উম্দা গজল লিখে বস্ত, না হয়
তোমার বেয়াদবির সাক্ষী থাকত ।
- মশ্রুর : জাহাপনা, এই সুমসাম রাত্রি । এই রাইল তলওয়ার । আপনি নিজের হাতে
আমাকে কতল করুন, কেউ দেখবেন্নো, কেউ শুনবে না । কিন্তু মশ্রুর
বেয়াদবির কলঙ্ক বোৰা মাথায় সেইতে পারবে না । নচেৎ হৃকুম দিন,
আপনার বহু নেমক-পানি দে হলকুমের পথে গেছে, তা আপনার সামনে
এই তলওয়ার খিচে দু'ক্ষেক করে আপনাকে উপহার দিয়ে যাই ।
- হারুন : মাথা তোলো, মশ্রুর! আমার ইঞ্জে তুমি দেখছ না । কোন ব্যভিচারিণী
বেগম থাকলে তোমার কি উচিং নয়, হৃশিয়ার হওয়ার জন্য খবর দেওয়া?
তুমি বস্তুর কাজ করছ না ।
- মশ্রুর : জাহাপনা, আমি এইটুকু বল্তে পারি, মজকুর আওরৎ মহলের কোন
বেগম নয় ।
- হারুন : বেশ । তাহোলে তুমি আসল ভেদ খোলাসা করছ না কেন? তোমার বাধা
কোথায়? আর মনে রেখো, মহলের ভেতর ব্যভিচারিণী বাঁদী পর্যন্ত আমি
রাখতে পারি না ।
- মশ্রুর : ও ব্যভিচারিণী নয়, জাহাপনা । তাও আপনাকে জানিয়ে দিলুম ।
- হারুন : তুমি ধীধা আরও বাড়িয়ে তুলছ, মশ্রুর ।
- মশ্রুর : আমাকে গোনাগার করবেন না । তার চেয়ে তলওয়ার নিজের হাতে গ্রহণ
করুন । মশ্রুর প্রাণের জন্য এতটুকু লালায়িত নয় । অবাধ্য বান্দা হিসেবে
তার বাঁচার কোন অধিকার নেই, বাঁচতে চায় না সে ।
- হারুন : আমি জানতে চাই ।
- মশ্রুর : আমি জানতে পারি না, আমি অক্ষম, আলস্পানা ।
- হারুন : কেন পারো না?

- মশ্রুর : আরো মানুষ এর সঙ্গে জড়িত।
- হারুন : বেশ। আচ্ছা নাদান তুমি, এতক্ষণ তা বলো নি কেন?
- মশ্রুর হারুন : জাঁহাপনা, বান্দার আক্লেল কম, তা আপনি জানেন।
- শোনো মশ্রুর, আমি পাক্ কোরান-ছোয়া কসম করে বলছি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন ক্ষতি করব না। আর তার গোস্তাখি যদি অমাজনীয় হয়— হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নামে কসম, তবু আমি তার বা তাদের কোন ক্ষতি করব না।
- মশ্রুর : আলস্পানা, তাহোলে শুনুন। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। মজ্বুর আওরৎ আমেনী বাঁদী, নাম মেহেরজান। বেগম জুবায়দা ওকে খুবই পেয়ার করেন। তাই হাব্সী গোলামের সঙ্গে গোপনে ওর শাদী দিয়েছেন।
- হারুন : হাত্ হা, মশ্রুর। এ-ই কথাটুকু বলতে তোমার এত সঙ্কোচ। তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে। তুমি সাফ পানি ঘোলা করতে ওস্তাদ। বেগম জুবায়দা এমন কিছু কসুর করেন নি, যার জন্য তুমি এত ঘোরপাক খেলে।
- মশ্রুর হারুন : তবু জাঁহাপনা, আমি যে তাঁর কাছে কড়ল করেছিলাম—
- সে আমি দেখব। মশ্রুর, সত্যি হাসি পাচ্ছে। একটা ছোট ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ যদি কিছু করে বস্তাম, আমার আফসোসের সীমা থাকত না। কিন্তু মশ্রুর, আমি এমন বাঁদী জীবনে দেখি নি।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, মেহেরজান সত্যি খুবসুন্দৰ। মুসলে এক সিপাহসালারের ‘মাল-এ গনীমৎ’ (যুদ্ধের বাখরায় প্রাপ্ত দ্রব্য) ছিল। বেগম সাহেবা ওকে মহলে আনান। বড় বিশাসী আভ্রসুন্দৰ। তাই বেগম সাহেবা ওকে ভালবাসেন।
- হারুন : মশ্রুর, কিন্তু কাল স্মার রাত্রে দেখা হবে। আমার অন্য এরাদা আছে। বেগম সাহেবা যেন্তে এইসব রাত্রির খৌজ না পান।
- মশ্রুর : বহুৎ আচ্ছা, জনাব। বান্দার গর্দান জিম্মা।
- হারুন : হ্যাঁ, শোনো মশ্রুর। তুমি কবি ইস্হাককে খবর দিও, সে যেন রূবাব সঙ্গে নিয়ে কাল রাত্রে হাজির হয়।
- মশ্রুর : আস্সামায়ো তায়তান ইয়া আমিরুল মুমেনীন।

৬

রূবাবের কান্না এই মাত্র থেমে গেল। তারপর চাপা হাসির আওয়াজ শোনা যায়। চাপা কিন্তু প্রাণদ। অন্যান্য দিনের মত এই রাত্রিও স্তন্ধ শীতলতার ভাণ্ডার, বাতাসের কারাগার। বাগিচায় হারুনের রশীদ, আবু ইস্হাক, মশ্রুর কথোপকথন-রত।

হারুন : আবু ইস্হাক, তোমার সঙ্গ এইজন্যে ছাড়তে পারি নে। বহুদিন পর তুমি হাসালে, সত্যি হাসালে। আবার আবৃত্তি করো।

ইস্হাক : আলস্পানা, আবু ইস্হাকও কোনদিন আমিরুল মুমেনীনকে ত্যাগ করে যেতে পারবে না। তবে শুনুন :

ইরানী মেয়ের সীনা ভাল,
মিশরী মেয়ের উরু
আরবী মেয়ের নাভীর নীচে
স্বর্গ ঠারে ভুরুং।

- হারুন : হাতু হা, শোনো মশ্ৰুর। কিন্তু মিশরী মেয়েরা তোমাকে কতল করে ছাড়বে কবি।
- ইস্হাক : আলস্পানা, আবু ইস্হাক এমন বহুবার কতল হয়ে গেছে, সুতরাং ডর নিষ্ঠ।
- হারুন : ইরানী মেয়েরা তোমাকে খুন করবে, কবি।
- ইস্হাক : ওদের দুই সীনার উপত্যকার মাঝখানে আমার কবর হয়ে গেছে, জাঁহাপনা! লাশকে কি কেউ খুন করে?
- হারুন : শোনো, মশ্ৰুর। বিষণ্ণ রাত্রে কবি ইস্হাকের সঙ্গ পেলে আর কোন চিন্তা থাকে না। কিন্তু কবি কখন কোন পান্শালায় হারিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া মুশ্কিল।
- ইস্হাক : আপনার বান্দা মশ্ৰুর তা জানে। শুধু মশ্ৰুর কেন, দুনিয়ার সবাই জানে, মশ্ৰুরের তলওয়ারের ঝিলিক আর ইস্হাকের কথার ঝিলিকের কাছে বিদ্যুৎ তুচ্ছ।
- হারুন : কিন্তু কবি, তুমি আৱমেনী মেয়েকে কোন কুবায়ী লিখ্বে না?
- ইস্হাক : জাঁহাপনা, আজ প্রথম দেখলাম আৱমেনী মেয়ে, তাও দূৰ থেকে গাছে সওয়ার হয়ে। তাই ওৱা পৌরিজ আছে।
- হারুন : কিন্তু কি দেখলে?
- ইস্হাক : দেখলাম মশ্ৰুরের তলওয়ারের ঝিলিক হার মেনে গেল।
- হারুন : আৱ কি দেখলে?
- ইস্হাক : দেখলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না— দেহের প্রতীক ছন্দ, না ছন্দের প্রতীক দেহ।
- হারুন : আৱ কি শুনলে?
- ইস্হাক : শুনলাম, আদমকে তৈৱীৰ পৱ বিধাতা হয়ত যে-হাসি হেসেছিল তাৱই অনুৱণন।
- হারুন : আবু ইস্হাক, তুমি সত্য সুৱের কবি। মশ্ৰুর, কাল খাজাঞ্চীখানা থেকে কবিকে চার হাজাৰ আশৱফী দেওয়াৰ বন্দোবস্ত কৱবে। আমাৰ ফৰমান।
- মশ্ৰুর : আস্সামায়ো তাঁহিতান।
- হারুন : কবি, তোমাকে আৱ একটা কথা জিজ্ঞেস কৱতে চাই।
- ইস্হাক : বলুন, আলস্পানা।
- হারুন : ঝুটো চিজ কি খাওয়া যায়?
- ইস্হাক : চিজ?
- হারুন : হ্যাঁ।

- ইস্হাক : খাওয়া যায়, আবার যায় না ।
- হারুন : সে কেমন?
- ইস্হাক : অনেক জিনিস ঝুটো হয়, তা খাওয়া চলে না । হেকিমী ইলেমের বিরোধী ।
আবার অনেক চিজ যা কখনই ঝুটো হয় না, উচ্ছিষ্ট হয় না । সেখানে
হেকিম ইলেম ‘থ’ অসহায় ।
- হারুন : এমন চিজ আছে?
- ইস্হাক : কিন্তু হঠাৎ এমন অদ্ভুত সওয়াল, জাঁহাপনা?
- হারুন : এমনি জিজেস করছি । হ্যাঁ, কোন্ চিজ কোনদিন ঝুটা হয় না?
- ইস্হাক : জীবন এবং যৌবন, জাঁহাপনা । নদী কি কেউ কোনদিন উচ্ছিষ্ট করতে
পারে?
- হারুন : না, পারে না ।
- ইস্হাক : জীবন যৌবন বহতা নদীর মত । কত তৃষ্ণার্ত আকর্ষ পান করে যাবে, তবু
ঝুটা হবে না । কিন্তু জীবন যৌবন ছাড়া আর সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় ।
যা বহতা নয়, তা-ই উচ্ছিষ্ট ।
- হারুন : কবি আবু ইস্হাক, তুমি শুধু বাদক নও, সত্যিকার কবি— বিরাট কবি ।
মশ্রুর, ইস্হাককে আরো পাঁচ হাজার আশরফী সওগাত দিলাম । কাল
বন্দোবস্ত করো ।
- মশ্রুর : আস্সামায়ো তায়তান ।
- ইস্হাক : আমিরূল মুমেনীন, আপনি সন্দা-নওয়াজ তা জানি, কিন্তু গরীবের উপর
এত মেহেরবান হবেন না ।
- হারুন : আবু ইস্হাক, তোমার শর্যাদা হারুনর রশীদের খাজাঞ্চিখানা দিতে পারে
না । তা জানি, তবু
- ইস্হাক : জাঁহাপনা, শুক্ৰিয়া— হাজার— লাখ শুক্ৰিয়া ।
- হারুন : মশ্রুর!
- মশ্রুর : আমিরূল মুমেনীন ।
- হারুন : আজকের নৈশ অভিযান এখানে শেষ হোক । আমার যুম পাচ্ছে । কাল
তুমি শহর কোতোয়ালকে বলে রাখবে, আমার দশ-পনর জন কোতোয়াল
দরকার হবে ।
- মশ্রুর : যো হকুম, আলস্পানা ।
- হারুন : হ্যাঁ, কাল আবার আমাদের এখানে দেখা হচ্ছে । মজ্জিলিশ ভাঙ্গার আগে,
আবু ইস্হাক, তোমার কুবাবে আবার আনন্দের মওজ তোলো ।
[কুবাব বেজে চলে]
- কাওসুল আকদারের বাগ-বাগিচায় সুরের হিল্লোল ।
- বগ্দাদের সড়কে অবাধ রাত্রি ।
- গোলাম-বন্তি নিখনুম ।

পরদিন রাত্রি।

গোলাম-বন্তী নিখুম।

তারা দু'জনে ঘুমিয়ে ছিল, মৃত্যু-রূপা ঘুম— একে অপরের অঙ্গের পাকে পাকে একাকার।

হঠাতে দরজায় করাঘাতের শব্দ হোলো। অথবে ধীরে, মৃদু শব্দ। তারপর জোরে, দ্রুত।

—তাতারী, শুনছো?

—কে... কি ...

মেহেরজান : শুনছো?

তাতারী : কি মেহেরজান?

মেহেরজান : দূয়ারে কে ঘা দিচ্ছে।

তাতারী : আমার ঘোড়াটা হয়ত দড়ি ছিঁড়ে আমার খোঁজে এসেছে।

মেহেরজান : না, না— এ তোমার পেয়ারা ঘোড়া নয়। মানুষ।

তাতারী : শয়ে থাকো, কোন সাড়া দিও না।

মেহেরজান : আরো জোরে ঘা দিচ্ছে, দরজা ভেঙ্গে পড়বে। আমি হলফ করে বলতে পারি ঘোড়া নয়। তুমি সাড়া দিও।

তাতারী : কে?

নেপথ্য : দরজা খোল্।

তাতারী : কেন?

নেপথ্য : দরকার আছে।

তাতারী : কে?

নেপথ্য : এই গোলাম, দরজা খোল্। নচেৎ লাথি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলব।

তাতারী : কে আপনি, জনাব?

নেপথ্য : আমি মশ্কুর।

তাতারী : জাহাপনা, এখনই খুলছি। (ফিস্ফিস্ কর্ত্তে) মেহেরজান, সর্বনাশ! তুমি তাড়াতাড়ি বোরখা পরে নাও।

মেহেরজান : (ফিস্ফিস্ শব্দে) তাতারী, আল্লা যেন সহায়, নেঘাবান হন। কোথাও লুকানোর জায়গা নেই?

তাতারী : এই ছোট খুপরী, লুকাবে কোথায়?

মেহেরজান : তবে আল্লা যা নসীবে রেখেছেন, আমি বোরখা পরে নিই, তুমি দরজা খুলে দাও।

নেপথ্য : এই জলদি কর, দরজা খোল্।

- তাতারী : দিছি জনাব। বোরখা পরেছ?
- মেহেরজান : পরেছি।
- তাতারী : আসুন, জনাব। (নতজানু) আহ্লান ওয়া সাহ্লান্ ইয়া মওলানা। এ কি! সবং আমিরুল মুমেনীন। লা-হাওলা ওলা কুয়াতা, আলম্পানা, বান্দার গোস্তাখি মাফ করবেন। এই শির ঝুকালাম। গোস্তাখির জন্য আমার কঠোর সাজা দিন, জাঁহাপনা।
- হারুন : তুই ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়েছিস, আরো আলো— আরো রোশ্নাই চাই।
- তাতারী : জাঁহাপনা গরীবের আর তো কিছু নেই। তবে পাশের প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনি।
- হারুন : মশ্রুর, কোতোয়ালদের একটা আলো আন্তে বলো, শিগ্গির।
- মশ্রুর : যো হকুম, জাঁহাপনা।
- তাতারী : আলম্পানা, গোস্তাখি মাফ করবেন বান্দার সওয়ালে। এই সুম্মান রাত্রে আপনার পয়জার এই গোলামদের বক্তীতে জিন্দগুহ্য আবির্ভাব? কিছু বুঝতে পারছি নে।
- হারুন : আবু ইস্হাক।
- ইস্হাক : জাঁহাপনা।
- হারুন : আমার বদলে তুমি জবাব দাও।
- ইস্হাক : এই গোলাম, জাঁহাপনা তোর হাসি শনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তোর জন্যে ইনাম নিয়ে এসেছেন।
- তাতারী : ইনাম?
- ইস্হাক : হ্যা, ইনাম।
- তাতারী : কিন্তু জাঁহাপনা, বান্দার কোন শুণ নেই, আর বান্দা এমন কোন কাজ করে নি, যার জন্যে সে ইনাম প্রত্যাশী হতে পারে।
- ইস্হাক : গোলাম, তোর হাসি বড় মধুর। তাই আমিরুল মুমেনীন সেই হাসির রেশ ধরে এখানে এসে পৌছেছেন।
- তাতারী : জনাব, বান্দাকে আর গোনাগার করবেন না। গোলাম, তার আবার হাসি!
- হারুন : না, সত্যি। ইস্হাক আমার কথাই বলছে। আমি সেই জন্যেই এসেছি।
- তাতারী : আমিরুল মুমেনীন, আল্লা আপনার শান শওকত আরো বৃদ্ধি করুন, আপনার দবদ্বা দিকেদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আপনি দুনিয়ার আমীর হন। গরীবের এই জুপড়িতে কি করে যে আপনারে জায়গা দিই।
- মশ্রুর : চুপ কর, গোলাম।
- হারুন : এই যে কোতোয়ালেরা আলো এনেছে। এখন চারিদিক বেশ চোখে পড়ে। এই গোলাম, ওটা কী?
- তাতারী : কি জাঁহাপনা?
- হারুন : ওই যে দেওয়ালের সাথে কালো বোরখা লেগে রয়েছে।
- তাতারী : জাঁহাপনা—

- হারুন : কি?
- তাতারী : জাঁহাপনা—
- মশ্রুর : জবাব দে, নফর।
- তাতারী : জাঁহাপনা, বান্দাকে কতল করুন। বান্দা এই জবাব দিতে অক্ষম।
- হারুন : জবাব দে, নচেৎ—
- তাতারী : জাঁহাপনা।
- হারুন : মশ্রুর, এই বান্দরের জিভ ছিঁড়ে নাও, এখনও জবাব দিচ্ছে না।
- মশ্রুর : আবু ইস্হাক, দ্যাখো দ্যাখো, গোলামটা ধূলোয় লুটিয়ে কাঁদছে, তবু জবাব দিচ্ছে না।
- ইস্হাক : আমি দেখি, মশ্রুর। এই, আমিরুল মুমেনীনের সওয়ালের জবাব দে।
- হারুন : মশ্রুর, যা ভেবেছিলাম তা নয়, না-ফরমান গোলাম। একে কতল করো। এক্ষণি।
- মেহেরজান : (বোরখা খুলিতে খুলিতে) না, না আমিরুল মুমেনীন। দেওয়ালের গায়ে শুধু বোরখা নেই, আমি আছি তার ভেতরে। ওকে মাফ করুন।
- হারুন : আবু ইস্হাক, মশ্রুর— দ্যাখো। বোরখার অঙ্ককার ছিঁড়ে এই মাহতাব (চাঁদ) কোথা থেকে উদয় হোলো? থামো মশ্রুর। জবাব পাওয়া গেছে। এই, তুই কে?
- মেহেরজান : (নতজানু) জাঁহাপনা, মজকুর জামিনা আপনার বাঁদী।
- হারুন : বাঁদী।
- মেহেরজান : হ্যাঁ, জাঁহাপনা।
- হারুন : কোন্ দেশী বাঁদী এমনি?
- মেহেরজান : আরমেনী বাঁদী, আমিরুল মুমেনীন।
- হারুন : এই গোলাম, উঠে দাঢ়া। একটা জবাব দিবি, তবু এত ভয়। এ তোর কে?
- তাতারী : আমার বিবি আলস্পানা।
- হারুন : তোর বিবি?
- তাতারী : হ্যাঁ, জাঁহাপনা।
- হারুন : তুই শাদী করেছিস, অথচ খবর দিস্তি? গোলামের আস্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে। আলেপ্পো শহরে কতকগুলো গোলামের তাই মাথা খেঁঁলে দিতে হোলো।
- তাতারী : জাঁহাপনা, গোস্তাখি মাফ করবেন। আপনার পায়ের খাক এই গোলাম। তার আবার শাদী। তার আবার দাওয়াৎ।
- হারুন : তোর কি জানা নেই, আপন মাওলার (প্রভু) হৃকুম ছাড়া কোন গোলাম শাদী করতে পারে না বা নিজের বেটির শাদী দিতে পারে না?
- তাতারী : জানি, জাঁহাপনা।
- হারুন : তবে—
- তাতারী : তার সাজা নিতে আমি প্রস্তুত আছি। অবাধ্য, নাফরমান বান্দার যা' শাস্তি

- হয়, তাই আমার প্রাপ্য।
- হারুন : হ্যাঁ, তোর গর্দান যাওয়া-ই উচিত। এই বাঁদী, তুই কোথা থাকিস্?
- মেহেরজান : আপনার মহলের বাঁদী, জাহাপনা।
- হারুন : আমার মহলের বাঁদী শাদী করেছে গোলাম, অথচ আমাকে কেউ জানায় নি। তাজব ব্যাপার। তোকে কোনদিন দেখি নি?
- মেহেরজান : না, আলস্পানা।
- হারুন : অমন নতজানু করজোড়ে তোর থাকার দরকার নেই। উঠে দাঢ়া।
- মেহেরজান : জাহাপনা। বান্দীকে আর গোনাগার করবেন না।
- হারুন : আমি যা বলি, তা শোন্। এখানে মশ্রুর খাড়া আছে তা ভুলে যাস্ নি। উঠে দাঢ়া।
- মশ্রুর : জাহাপনা—
- হারুন : গোলাম, তোর আস্পর্ধা আস্মান ছাড়িয়ে গেছে। কুকুরের মত তোদের জিভ ছিঁড়ে নিলে তবে গায়ের বাল মেটে।
- তাতারী : জাহাপনা, বান্দা গোনাগার। আপনার যা মরজী, তা-ই করুন। বান্দার কোন দুঃখ নেই।
- হারুন : আবু ইস্হাক, এ গোলাম ত চমৎকার কথা বলে। ঠিক তোমার মত।
- ইস্হাক : হ্যাঁ, আলস্পানা। যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাস্তে-ও-পারে।
- হারুন : কেন, আবু ইস্হাক?
- ইস্হাক : আলস্পানা, সাধারণ কথা নয়, ভাল কথার মূল কি? ভাল কথা হচ্ছে রহের (আত্মার) প্রতিষ্ঠান— সেখানেই জমে থাকে, তারপর ঝর্নার মত বেরোয়। অনাবিল হাসি হচ্ছে ভাল কথারই শারীরিক রূপ। তাই জিলুল্লাহ, যারা ভাল কথা বলতে পারে, তারা ভাল হাস্তেও পারে। হাসি আর কথার মূল উৎস এক জায়গায়।
- হারুন : ও আবু ইস্হাক, তুমি ফল্সাফা-দর্শন শুরু করে দিলে। এত বোঝার মত ধৈর্য এখন আমার নেই। এই বাঁদী— তোর কিছু বলার আছে?
- তাতারী : না, জাহাপনা। গোনাগার, নাফরমান— আমাদের কতল করুন।
- হারুন : মশ্রুর, তৈরি হও। আমার ফরমান যোতাবেক এদের শাস্তি দেবে। এক চুল না এদিক-ওদিক হয়।
- মশ্রুর : যো হকুম আলস্পানা।
- হারুন : হাজেরান (সমবেত), মজলিস— মশ্রুর, কবি আবু ইস্হাক এবং কোতোয়ালগণ, এই দুই বান্দা এবং বান্দী কানুনের খেলাপ যে কাজ করেছে, তার জন্য এদের শাস্তি কী? তলওয়ারে গর্দান প্রহণ করা যায়, অঙ্গচ্ছেদ করা চলে, একদিকের পাঁজর নামিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু তলওয়ারের আরো শক্তি আছে। তলওয়ারে লোহার জিঙ্গির ছিন্ন করতে পারে। আমি এই মজলিসে ঘোষণা করছি— আজ থেকে এই দুই বান্দা-

বান্দীর গোলামীর জিজির ছিল হোক। এ দুই জনে মুক্ত—আজাদ, আমার রাজত্বের দুই জন স্বাধীন নাগরিক।

[সকলে : মারহাবা। মারহাবা।]

তাতারী : হে আমিরুল মুমেনীন, আপনার মেহেরবানী সীমাইন, আপনার হৃদয় বিশাল, আমরা উভয়ে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। হে জিলুল্লাহ্, আপনার দুই বাহতে আরো শক্তি সংবিত হোক যেন সিকান্দার শা'র মত আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর হন। আমিরুল মুমেনীন জিন্দাবাদ।

[সকলে : মারহাবা। মারহাবা।]

হারুন : আমি আরো ঘোষণা করছি, এই মুহূর্ত থেকে হাবসী তাতারী— কয়েক মুহূর্ত আগে যে গোলাম ছিল, বগ্নাদ শহরে পচিমে আমার যে বাগিচা আছে সেই বাগিচা এবং তার যাবতীয় গোলাম বান্দী, মালমাতা, আসবাব সব কিছুর সে মালিক। তার সমস্ত লেবাস ও দিনগুজরানের খরচ আজ থেকে খাজাপ্পীখানা বহন করবে।

[সকলে : মারহাবা। মারহাবা।]

তাতারী : ঝাঁহাপনা, আপনার করণার ঝণ আমরা কোনদিন শোধ দিতে পারব না।
হারুন : যাও, কোতোয়াল— এখন ই হাব্সী তাতারীকে আমার বাগিচায় নিয়ে যাও। লেবাস সেখানে প্রচুর আছে। এই বেশে যেন কোনদিন ওকে আমি না দেখি।

সকলে : সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

হারুন : একটু সবুর করো, কোতোয়াল। তোমাদের হাসির জন্য আমি এই ইনাম দিলাম। দাঁড়াও দুইজনে। আর একবার সেই হাসি হাসো।

তাতারী : ঝাঁহাপনা, বান্দাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। তার বোঝায় বান্দার ঘাড় ক্লান্ত। আজ হাসি আসতে পারে না, ঝাঁহাপনা।

হারুন : বেশ। কিন্তু মনে রেখো, হাসি তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই হাসি ই আমি শুন্তে চাই। হ্যাঁ, আমি শুন্তে চাই। আমার বুক যখন ভারাক্রান্ত থাকবে, তখনই তোমার হাসি আমি কামনা করব। যাও, এখন নাই-বা হাস্লে। কোতোয়াল, একে নিয়ে যা। বাঁদী, তুমি মহলে ফিরে যাও।

ইস্হাক : ঝাঁহাপনা, গোলাম ত চলে গেল। এখন আবু ইস্হাকের কথা শুনুন। এই আরমেনী বাঁদী, তৌবা— এই আরমেনী আওরতের জন্য কি ইনাম দিবেন? কান শোনার জন্য পাগল।

হারুন : সে আরো বড় ইনাম। চলো মেহেরজান। আমাদের সঙ্গে চলো। তুমি বেগম জুবায়দার কাছে ফিরে যাও। তবে তুমি আর বাঁদী নও।

মেহেরজান : ঝাঁহাপনা, আপনি অশেষ মেহেরবান। আপনার মরজীই আমার মরজী।

হারুন : মেহেরজান, তুমিও এত মিষ্টি কথা বলতে পারো। আজব দুনিয়া। রাত্রি প্রায় শেষ। চলো মশ্কুর। আবু ইস্হাক, তোমার গজল-শোনা রাত্রি আবার আসবে। নিরাশ হয়ো না, কবি।

ইস্হাক : আলস্পানা, আবু ইস্হাক আশা মানে না— নিরাশা জানে না। আবু ইস্হাক
বিশ্বের মুসাফির। সে যা দেখে, তারই গান করে। চলুন, জাহাপনা!...

৮

অন্দর মহল। আবু ইস্হাক ও হারুনৰ রশীদ।

—আবু ইস্হাক।

—জাহাপনা।

হারুন : হাব্সী গোলামের থবর জানো?

ইস্হাক : না, আমিরুল মুমেনীন।

হারুন : অমিও তিন দিন খোঁজ নিতে পারি নি, তাই বাগিচার মোহাফেজকে ডাকতে
পাঠিয়েছি।

ইস্হাক : মোহাফেজ ডাকার দরকার নেই, আলস্পানা। গোলাম যা পেয়েছে, তার
তুলনা নেই। এই বদান্যতা শুধু জিম্মুত্বাহ খলিফা হারুনৰ রশীদ-বিন-
মেহ্নীর পক্ষেই সম্ভব।

হারুন : তবু খোঁজ নিতে হয়। কারণ ওর হাসি শোনার প্রয়োজন আমার আছে। এই
ত মশুরৰ মোহাফেজ-কে নিয়ে হাজির। আহ্ আর কুর্ণিশের প্রয়োজন
নেই। এসো, মশুরৰ।

মশুরৰ : জাহাপনা, মোহাফেজ হাজির।

হারুন : মোহাফেজ, হাব্সী তাত্ত্বিক কোন তক্লীফ হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ : জাহাপনা, আপনার তত্ত্বিক খেয়ে বহুদিন এই বাগিচার মোহাফেজ-পদে
নিযুক্ত আছি। বহু কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এমন কাহিনী কখনও শুনি নি,
জাহাপনা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে যে ভিন্নুক ছিল, তৃতীয় প্রহরে সে আমীর।
এ শুধু বগ্নাদেই সম্ভব।

হারুন : গোলাম লেবাস পরেছে ত?

মোহাফেজ : আমিরুল মুমেনীন, কালো চেহুরা, লেবাস পরার পর ওকে আরো সুন্দর
দেখাচ্ছে।

হারুন : বহুৎ আচ্ছা। ওর কোন কষ্ট হচ্ছে না ত?

মোহাফেজ : আলস্পানা, যেটুকু তক্লিফ, সে-শুধু অনভ্যাসের কষ্ট। বিছানা, গালিচা,
গোলাম, বাঁদী; মুজ্রানী— এর মধ্যে হঠাতে একটু অঙ্গোয়াস্তি বোধ করা
কী বিচ্ছিন্ন?

হারুন : কোন অঙ্গোয়াস্তি দেখলে নাকি?

মোহাফেজ : হ্যাঁ জনাব। এই গোলাম কাউকে হকুম দেয় না।

হারুন : রঙ হোক, তখন দেবে।

মোহাফেজ : নিচে গালিচার উপর শয়ে থাকে।

হারুন : ও-সব ঠিক হয়ে যাবে। আহেস্তা-আহেস্তা।

- মোহাফেজ : আমিরুল মুমেনীন, মুজ্জ্বানীরা ত বিরক্ত হয়ে গেছে।
- হারুন : কেন?
- মোহাফেজ : ওরা বলে, এখানে বেকার হয়ে যাচ্ছি। আজ তিনদিন খানাপিলা নাচ-গান কিছু-ই হচ্ছে না।
- হারুন : হচ্ছে না?
- মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা, হবে কি করে? আমি একদিন পাঁচজন মুজ্জ্বানীকে জনাব তাতারীর কাছে পাঠালাম। সবাই নওজওয়ান। সকলকে ফেরৎ পাঠালে। বললে, যাও।
- হারুন : আচ্ছা—।
- মোহাফেজ : জাঁহাপনা, তা ছাড়া— আপনি এত কিছু দিয়েছেন— অন্য মানুষ হলে আনন্দে পাগল হয়ে যেত। এর সে-সব কিছু নেই। সব সময় গঞ্জীর।
- হারুন : সব সময়?
- মোহাফেজ : হ্যা, জাঁহাপনা। বাবুটিখানা ঠিক রাখে। একবার খেতে যায় মাত্র।
- হারুন : একবার?
- মোহাফেজ : হ্যা, আলস্পানা। রাতে কিছু খায় না। অলিন্দে বসে আকাশের তারা দেখে আর চুপচাপ বসে থাকে।
- হারুন : কোন গোলাম বেয়াদাবি করছে না তাঁর সঙ্গে?
- মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা। আপনার হৃকুম—~~কোন~~ শয়তানের বাচ্চা বরখেলাপ করবে?
- হারুন : এই গোলাম হাসে না?
- মোহাফেজ : জাঁহাপনা, জোরে হাসি তে দূরের কথা— গোস্তাখি মাফ করবেন, আমরা কেউ ওর দাঁতই দেখানাম না।
- হারুন : হাসে না?
- মোহাফেজ : না, জিলুঘাহ।
- হারুন : হাসে না?
- মোহাফেজ : না, জিলুঘাহ।
- হারুন : হাসে না?
- মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা।
- হারুন : একবার-ও না?
- মোহাফেজ : না, জাঁহাপনা। আমি ‘গীবৎ’ পরনিন্দা করছি না। আপনি এই দোষে আমার গর্দান নিতে পারেন।
- হারুন : আশ্চর্য। যাও, মোহাফেজ। তুমি খুব তরীবতের সঙ্গে ওকে রাখবে। যদি কোন ক্রটি কানে আসে, আমি সমস্ত গোলামদের সঙ্গে তোমাকেও কতল করব।
- মোহাফেজ : আস্সামায়ো তায়তান। আস্সালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মুমেনীন।
- হারুন : মশ্রুর, মোহাফেজ যা বলে গেল, তোমার বিশ্বাস হয়?
- মশ্রুর : বিশ্বাস হয় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়, কারণ মোহাফেজ সাহেব ঈমানদার

কর্মচারী ।

- হারুন : আবু ইস্হাক, তোমার বিশ্বাস হয়?
- ইস্হাক : হয়, জাহাপনা!
- হারুন : কেন?
- ইস্হাক : হেকিমী দাওয়াই তৈরি করতে অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। হাসি একটা জিনিস। কিন্তু হাসি তৈরি হয় নানা জিনিস দিয়ে; খাওয়া লাগে, পরা লাগে, আরাম লাগে, শিক্ষা লাগে, আরো বহু কিছু।
- হারুন : নানা চিজ?
- ইস্হাক : হ্যাঁ, খলিফ্যান্স নামাদার। তার একটা উপাদানের যদি অভাব ঘটে, আর হাসি তৈরী হবে না। ধরুন, সব আছে— নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরি হবে না।
- হারুন : হবে না?
- ইস্হাক : না, জাহাপনা। আমার মনে হয়, অনেক উপাদান হয়ত আছে, কিন্তু কোন একটা উপাদানের অভাব ঘটেছে।
- হারুন : তোমার কি ধারণা?
- ইস্হাক : বেয়াদবি মাফ করবেন ত, জাহাপনা?
- হারুন : বেয়াদবি? এই কামরায় আমি আমিস্ট্রেল মুমেনীন নই, তোমাদের বক্তৃ। বেয়াদবির কোন প্রশ্ন ওঠে না।
- ইস্হাক : মেহেরজান কোথায়, আলস্মাদা?
- হারুন : সে আর কারো ‘জানে’ মেহেরজান (করুণা) ঢালতে গেছে।
- ইস্হাক : তা ত উচিত নয়। মেহেরজান বিবাহিত স্ত্রী। আর কারো জন্যে সে হারাম।
- হারুন : তোমার মতে হারাম। কিন্তু আরো-কারো মতে হারাম নয়।
- ইস্হাক : হারাম নয়?
- হারুন : না।
- ইস্হাক : এমন ফতোয়া কেউ দিতে পারে?
- হারুন : আলেম পারে। এই দ্যাখো, আলেম আবদুল কুদুসের ফতোয়া। তিনি লিখছেন, মেহেরজান কেন বাঁদী। মালিকের ছক্কম ছাড়া তার কোন শাদী হতে পারে না। যদি হয়, তা না-জায়েজ (শাস্ত্রসিদ্ধ নয়)। মজকুর বাঁদী মেহেরজান ও গোলাম হাব্সী তাতারীর শাদী না-জায়েজ। সই দেখেছ?
- ইস্হাক : দেখলাম, জাহাপনা। কিন্তু জনাব আবদুল কুদুস এই ফতোয়া দিলেন?
- হারুন : দেবেন না কেন?
- ইস্হাক : জাহাপনা, শাস্ত্রকে চোখ ঠারা যায়, কিন্তু বিবেককে চোখ ঠারা অত সহজ নয়।
- হারুন : তুমি কি বলতে চাও?
- ইস্হাক : আবদুল কুদুস আল্লার কালাম বিক্রি করেছেন।
- হারুন : দুনিয়া ত কেনা-বেচার জায়গা। আর তিনি তোমার মত আহমদ নন।

- ইস্হাক** : কেন জাঁহাপনা?
- হারুন** : এই বগদাদ শহরে তিন् তিন্ধানা আলীশান্ মাকান, ইমারৎ, বাগ-বাগিচা-আর বছর বছর পাঁচ হাজার ‘দীরহাম’ যায় খাজাঞ্চীখানা থেকে। তিনি এসব খোয়াতে যাবেন নাকি তোমার মত আক্লেন দেখাতে গিয়ে? আমি কি দিই, তা-ও তিনি যেমন জানেন, আমি কি চাই তা-ও তিনি তেমন বোবেন। দোকানদার-খরিদ্দারে এ-রকম সম্পর্ক না থাকলে কি দুনিয়া চলে?
- ইস্হাক** : কিন্তু, জাঁহাপনা—
- হারুন** : আহ, ইস্হাক, তুমি বড় বঙ্গ্যা ভজ্জতে এগোও। খোওয়াব-চারী কবি, কিছুই বোঝ না। তুমি জানো, দীরহামের মোজেজা (অলৌকিক) শক্তি আছে। দীরহাম অফটন-ঘটন-পটীয়সী।
- ইস্হাক** : না, আলস্পানা।
- হারুন** : দীরহামের তাকৎ অসম্ভব, অশেষ। তোমাকে বুবিয়ে বলা যাক। তুমি কালো আঙুর পছন্দ করো, না সবুজ আঙুর?
- ইস্হাক** : সবুজ আঙুর।
- হারুন** : বেশ। সবুজ আঙুর না পেলে—
- ইস্হাক** : কালো আঙুর খাই।
- হারুন** : ধরো, বাজারে সবুজ আঙুর আছে কিন্তু দাম খুব চড়া। অত পয়সা তোমার নেই। তখন?
- ইস্হাক** : তখন কালো আঙুর কিনিবে?
- হারুন** : কিন্তু মনে রেখো, তোমার কাছে নয়, শুধু এমনিতেও কালো আঙুর সবুজ আঙুর এক নয়। দুয়ের আস্বাদ আলাদা। কিন্তু তোমার দীরহামের পরিমাপে দুই-ই এক। দীরহামের কত কুণ্ড, কত শক্তি বুব্বতে পারছো।
- ইস্হাক** : পাছিছ, জাঁহাপনা।
- হারুন** : খোয়াব নিয়ে থাকো, তুমি সহজে এ-সব বুব্ববে না। যাক সে ব্যাপার। কথায় কথায় আমরা অনেক তফাং চলে এসেছি। গোলামের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে কেন?
- ইস্হাক** : জাঁহাপনা, ও হয়ত আর হাসবেই না।
- হারুন** : আবু ইস্হাক, তোমার জন্যেই আমার পাগলা-গারদ বানাতে হবে। গোলাম আবার হাস্বে না? দেখে নিও, দীরহাম কি করতে পারে। মশ্রুর, তুমি সাক্ষী।
- ইস্হাক** : জাঁহাপনা, যদি উপাদানের অভাব হয়?
- হারুন** : তোমার ওসব বুট দর্শন, ইস্হাক। পরও আমরা তিনজনে গোলামের হাসি শুন্তে যাব, কাল খবর পাঠাব। তোমার দাওয়াৎ রইল, আবু ইস্হাক। মনে থাকে যেন, পরও আমরা তিনজনে হাস্সী তাতারীর মেহমান।
- ইস্হাক** : বহুৎ খুব, জাঁহাপনা।

হাকুন	: মশ্কুর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ইস্থাক আক্তলের তেজ হারিয়ে ফেলছে।
মশ্কুর	: ঝঁঁহাপনা, আমার তলওয়ারের তেজ কিন্তু বাড়ছে।
হাকুন	: চলো, এখন ওঠা যাক্।
মশ্কুর	: যো-হকুম, আলস্পানা।

৯

কাল রাত্রি। বাগিচার কক্ষ। মোহাফেজ ও তাতারী।

—মোহাফেজ।

—জনাব।

—তুমি জানো চারদিন আগে আমি কি ছিলাম?

—জনাব, তা জানি বৈকি।

—কিন্তু তুমি কি ছিলে, তা জানো না। জানো?

—আপনি কি বলতে চান, জনাব?

—তোমার মত অনেকেই জানে না যে তারা কী। আমি গোলাম ছিলাম, খুব নীচুদরের গোলাম। কিন্তু তুমি-ও গোলাম, আমিরূল মুমেনীনের গোলাম। অবশ্যি উচুদরের গোলাম।

—তা সত্যি, জনাব।

—আজ চাকা ঘুরে গেছে। তুমি আমার চেষ্টে অনেক নীচুদরের গোলাম। আমার-ও গোলাম।

—আলবৎ।

—কিন্তু আমি ভুলে যাই নি, আমি গোলাম ছিলাম।

—জনাব, তাতারী। আপনি বড় হক কথা বলেন।

—শোনো, মোহাফেজ। এসো হাতে হাত মেলাও। মনে রেখো, তুমি-ও যা, আমি-ও তা-ই।

—শুক্রিয়া, জনাব।

—কিন্তু বড় গোলামেরা ছোট গোলামদের মনে রাখে না। ছোট গোলাম বড় গোলাম হলে তার-ও সেই অবস্থা ঘটে। গোলামখানার এ এক মহা দস্তর।

—আপনার কথা শুনতে বড় মিষ্টি লাগে।

—এখন শোনো, মোহাফেজ। বাইরে আমাদের যে-সমস্ক আছে তা থাক। কিন্তু ডেতরে আমরা পরস্পরের মোহাফেজ— রক্ষক।

—শুক্রিয়া, জনাব।

—জেনে রেখো, আমি গোলাম গোলাম-ই আছি।

—না, না, জনাব।

—সত্যি। সত্যি বলছি। তুমি কি মনে করো, এই বাঁদী গোলাম মুজ্বানী ইমারৎ গালিচার মধ্যে খুব শ্বেয়ান্তিতে আছি?

—কোন তক্লীফ হচ্ছে, বলুন। নচেৎ আমিরূল মুমেনীন আমার গর্দান নিয়ে নেবেন।

—না, তোমার দোষ নয়। আমরা অর্থাৎ গোলামেরা নিজের যোগ্যতা আর মেহনৎ দিয়ে কোন জিনিস অর্জন না করলে, শোয়াস্তি পাই না। যোগ্যতা, মেহনতের বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু যদি আমাদের উপর ঝরে পড়ে, তাতে সুখ কোথায়? মগজ আর তাগদের জোরে কোন জিনিস না পেলে আমরা মজা পাই না। এই বাগাবাগিচা আমার মেহনতের ফল নয়।

—সত্যি হজুর?

—হ্যা, সত্যি। মনে রেখো, যোগ্যতা থেকে কোন চিজ না পেলে তা ঢিলে লেবাসের মত বেখাঙ্গা-ই দেখায়। আর যোগ্যতা-মেহনৎ ব্যতিরেকে যারা পুরুষার প্রার্থী— তারাই হচ্ছে দুনিয়ার আসল গোলাম।

—জাঁহাপনা, আপনি উজীর মরহুম জাফর বারমেকীর মত আক্লমন্দ কথা বলেন।

—চৃপ। জাফরের নাম তোমার মুখে শুনলে খলিফা জিভ ছিঁড়ে ফেলবে।

—হজুর আপনি, তাই বলছি।

—আমাকে জনাব-হজুর সমৌধনে ডাক দিও না। আমরা বদ্ধ।

—আপনি যখন অভয় দিলেন—

—শোনো, তোমাকে আমার একটা খবর দিতে হবে।

—খবর?

—হ্যা, খবর। তুমি কি বগ্দাদের সড়কে, কাফিখানায় ফরসুৎ-মত ঘোরাঘুরি কর না?

—তা করি বৈকি।

—তুমি তাহলে খবর যোগাড় করতে পারতো।

—কি খবর বলুন?

—কিন্তু, এ-খবর খোদ আমিরুল সুয়েনীনের কাওসুল আক্দার প্রাসাদের খবর।

—জনাব, পাথরে, দেওয়ালে খবর আটকা থাকে না। যারা মহলে থাকে, তারা-ও মানুষ। চোখে দেখলে বা কানে শুনলে মুখে না বলে পারে না। চোখের, কানের, মুখের একটা যোগসাজশ আছে।

—আছে?

—আছে বৈকি। বেগম খৈজুরান যে নিজের বড় ছেলে হাদীকে দাসী দিয়ে গলা টিপিয়ে মেরেছিল, তা কি করে জানাজানি হলো? খলিফা হাদী মারা গেলেন, তাই না হারুনর রশীদ খলিফা হলেন!

—তা-ই নাকি?

—আপনি জানেন না? বগ্দাদের সবাই জানে, আর আপনি জানেন না? যাকে জিজেস করেন, সে-ই ঐ জবাব দেবে, কিছু জানে না। বড় মজার ব্যাপার।

—শোনো মোহাফেজ, যদিও মহলের খবর, কিন্তু খবর একটা তুচ্ছ ব্যক্তির।

—কে সে?

—বলছি। তুচ্ছ ব্যক্তি সে। বেগম জুবায়দার খাস-বাঁদী মেহেরজান। তারই খবর চাই।

—শাহী সড়কের এক কাফিখানায় আমি কাল সন্ধ্যায় বসেছিলাম। সেখানে খবর শনলাম।

—কি খবর।

—আমার ত তেমন শোনার গা ছিল না। একজন আর একজনকে বলছে, মহলে নাকি এক রূপের তুফান এসেছে— এক আরমেনী বাঁদী। খলিফা নাকি তাকে শাদীও করতে পারে।

—আর কি শুনলে?

—হজুর, আমার কান তো বেশি ওদিকে যায় না, বয়স পঞ্চাশের উপর।

জওয়ান হলে এসব রসালো কথার দিকে মন যায়। কানও যায়।

—আজ তুমি বেড়াতে বেরিয়ে দ্যাখো যদি কোন খবর আন্তে পারো।

—আচ্ছা, জনাব।

—আবার জনাব কেন? এসো, হাতে হাত মেলাও।

১০

বগুদাদের সড়কে রাত্রি।

শহরের উপকর্ত্তে নির্জনতার রাজগী অনেক আগে শুরু হয়েছে। কিন্তু সরাইখানার আলো তখনও নেভে নি। আনন্দ-তালাসী পথিকজনের আনাগোনা কৃটিৎ কানে আসে।

আবৃষ্ট অঙ্ককারে দুই ব্যক্তি হাঁটছিল। হঠাৎ একজন হেসে উঠল। অপর ব্যক্তি আর চুপ থাকতে পারে না। সেও সঙ্গীর পথ অনুসরণ করে।

—আবু নওয়াস।

—কি আবুল আতাহিয়া।

আতাহিয়া : তুমি হাস্ছো?

নওয়াস : হ্যাঁ, হাস্ছি।

আতাহিয়া : অবিশ্যি তোমার কবিতা পড়ে মনে হয়, তুমি সত্য মনে মনে হাসতে পারো। আমাকে দিয়ে তা হয় না।

নওয়াস : তা আমি জানি, তুমি দুনিয়ায় শুধু কেয়ামৎ দ্যাখো।

আতাহিয়া : আর তুমি?

নওয়াস : বেহেশ্ত। এই দুনিয়াই আমার বেহেশ্ত।

আতাহিয়া : শরাব আর সাকী থাকতে, তোমাকে আর আল্লা হেদায়েৎ করবেন না।

নওয়াস : তোমাকে শয়তান পথ দেখায়।

আতাহিয়া : কেন?

নওয়াস : শয়তানের পথ মৃত্যুর পথ। জীবনের সড়ক আলাদা। তুমি শুধু মৃত্যুর কথাই বলো।

আতাহিয়া : তুমি ত মরুভূমির মধ্যে জীবনকে খুঁজেছো।

নওয়াস : মোটেই না। আমার সেই কবিতা পড়ো নি, আতাহিয়া?

আতাহিয়া : কোন্ কবিতা নওয়াস?

নওয়াস : বল্ছি, শোন।

বেদুইনদের মাঝখানে বৃথা কর আনন্দ-সন্ধান !
 কিবা ভোগ করে তারা, যারা ক্ষুধা-ত্বকাতুর লোক?
 থাক ওরা ওইখানে, বসে খুব উন্নিশ্চ থাক;
 যারা কতু শ্বেষিক সূক্ষ্ম গ্রাণ-উপভোগ !

আতাহিয়া : একে বুঝি বলে মরমৃত্যিতে জীবন-সন্ধান?

নওয়াস : তুমি আজকাল আবী ভুলে যাচ্ছ, আতাহিয়া। না, আমার কবিতা বুঝতে তোমার কষ্ট হয়?

আতাহিয়া : তার চেয়ে বলো না কেন আমি আমার ওয়ালেদের (বাপ) নাম ভুলে যাচ্ছি।

নওয়াস : তবে ভুল তুমি করো। বুদ্ধি আর বোধি— আকেল আর উপভোগ, দুই-ই জীবনে দরকার। কারণ, ইন্দ্রিয়ের পথ আবার বোধির-ও পথ। যে-মুহূর্তে তুমি একটা বক্ষ করবে, অন্যটা-ও থেমে যাবে। তখন তুমি আর গোটা ইনসান— পূর্ণ মানব নও।
 সাকী, পানপাত্র ভরে দাও মদিরা ধারায
 অঙ্ককারে কেন? এসো আলোর সভায় ॥
 বিনা পানে নিরানন্দ শুক্ষ অভিশপ্ত ক্ষণ /
 মাতালের মত টলি— সেই ত অমর জীবন ॥

আর আতাহিয়া, সেই জায়গায় তুমি কি লিখছো?
 ‘জাম’ ঘিরে বসিয়াছে যত্নসব মওজী ইন্সান,
 দুনিয়ার হাত থেকে করে তারা মৃত্যু-মদ্য পান ॥

ছোঃ— এটা কি কবির কথা?

আতাহিয়া : শোন, নওয়াস। কবিতা তোমার চেয়ে খারাপ না লিখলেও কথায় পারব না।

নওয়াস : ও কথা ছাড়ো। তুমি মেহদীর বাঁদী উৎবা-র প্রেমে পড়েছিলে?

আতাহিয়া : পড়েছিলাম।

নওয়াস : কেন?

আতাহিয়া : তা জানি নে।

নওয়াস : তখন তুমি জীবনকে খুঁজেছিলে। প্রেমের পথ, ভোগের পথ, উপভোগের পথ, জীবনের পথ, সব এক জায়গায় বহু সর্পিমিথুনের জড়াজড়ির মত। ওকে আলাদা করতে যেয়ো না, বক্ষ।

আতাহিয়া : আজ অনেক খামর (শরাব) টেনেছো মনে হচ্ছে।

নওয়াস : তা ত বটেই। শোনো, তোমাতে আমাতে তফাঁৎ কি জানো?

আতাহিয়া : কি তফাঁৎ?

নওয়াস : আমি আঙুর ফল খাই। আর তুমি? তুমি দ্রাক্ষালতা চিবোও। আর মনে মনে বলো, আঙুর যখন এমন যিষ্ঠি, দেখা যাক ওর আসল মাদ্দা বা

- উৎসটা কেমন? একটু চিবোই।
- আতাহিয়া : নওয়াস, তুমি আজ বিলকুল শরাবী।
- নওয়াস : আতাহিয়া, একটা গল্প শোনো।
- আতাহিয়া : বলো।
- নওয়াস : তখন আমি কৃষ্ণ শহরে। এক বাঁদীর আশ্রমায়ের জালে ধরা পড়ে গেলাম।
- আতাহিয়া : তোমার মত পাকা মৎস্য?
- নওয়াস : কথায় বাধা দিও না। প্রেমে আর খাদে বেশি তফাং নেই, পড়ে গেলাম।
 সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই। যাক অনেক ঘোরাফেরা কান্নাকাটি
 আরজী মিনতি অগ্যারহের পর আমার মহুবা (দয়িত) ওলিদা-কে পেলাম।
 শোনো, ওর সদরিয়া (জামা বিশেষ) খুলে আমি ত বেহেঁশ হওয়ার উপক্রম।
 এমন সুগঠিত তীক্ষ্ণ বেঁটা স্তন আমি, খোদার কসম আর জীবনে দেখি
 নি। ছেলেরা কেতাব পড়ে তিন্কা দিয়ে অঙ্করের কাতার ঠিক রাখার
 জন্যে। এ ঠিক সেই তিন্কার মত। ভাবলাম, এটা হাতে থাকলে আমি
 আর জীবনে কাতারভষ্ট হব না অর্বাং গোনার পথে অসৎ পথে পড়ব না।
 আল্লার মেহেরবানী, এমন তিন্কা জুটিয়ে দিয়েছেন, জীবনের কেতাব
 পড়তে আমার আর ভুল হবে না। আরো শোনো। সেই অবস্থায় আমি
 কোথায় তিন্কা হাতে গ্রহণ করব, তাম্বা, আমার মাথা ঝুঁকে গেল। আমি
 সীনার ঠিক নীচে নরম ত্বকের উপর ঠোঁট রাখলাম। লোকে পা চুমে,
 কদম-বুসী করে, আমি করে বেস্লাম স্তন-বুসী, সীনা-বুসী,— যা বলো।
- আতাহিয়া : হাহ হা, আবু নওয়াস! শীরহাবা! ইয়া আবু নওয়াস। আহ্লান সাহ্লান,
 ইয়া নওয়াস। মাইমোক্তেলা আজিহিল কালাম ইল্লা আবু নওয়াস— আবু
 নওয়াস ছাড়া কে আর এমন কথা বলতে পারবে? হাহ হা হাহ হা...
- নওয়াস : আহ, আমার পিঠে এতো থাপ্ডাচ্ছা কেন, আতাহিয়া? তোমার হাসি
 থামাও, নচেৎ এখনই তোমার আঁতঁড়ী বেরিয়ে পড়বে। আর এতো হেসো,
 না, এখনই আমিরূল মুমেনীন তা কিনে নেবেন।
- আতাহিয়া : আহ, আবু নওয়াস। আর একটু হেসে নিতে দাও। পেটে কুলুপ লেগে
 গেল।... আমিরূল মুমেনীন আজকাল হাসির সওদাগরি করেন না কি?
- নওয়াস : তুমি জানো না?
- আতাহিয়া : না।
- নওয়াস : হাসির অনেক দাম। লাখ দীরহামের-ও বেশি।
- আতাহিয়া : সত্যি?
- নওয়াস : কাল তিনি তোমাকে আমার মারফৎ দাওয়াৎ দিয়েছেন। গোলামের হাসি
 শুন্তে যাবো। আবু ইস্হাক থাক্বে। খানাপিনা গান বাজ্না সব আছে।
- আতাহিয়া : আলহাম্দোলিল্লাহ।
- নওয়াস : চলো, অনেক রাত হয়ে গেছে। সরাইধানা বক্ষ। সড়কে লোকজন কম।
 তার উপর অঙ্ককার।

আতাহিয়া : তোমার ভয় কী? তোমার ত তিন্কা আছে।
 দুই কবি হেসে উঠল জনশূন্য সড়কের উপর। প্রতিধ্বনি দূরে দূরে সহজে অস্তিত্ব হারায় না।
 নিদ্রিত মহানগরী বগুদাদ।
 তার দুই কবি শুধু জেগে ছিল।
 জীবনের নিঃশ্঵াস-প্রশ্বাস কবিতা কি কখনও বিশ্রাম নিতে পারে?

১১

বেগম জুবায়দা, আপনার পাঁজর কি রিঝ? নৈশ হাহাখাসের মুখে দজ্লার উপরের দিকে
 চেয়ে, প্রতীক্ষার দুর্ভেদ্য অরণ্যে পদধ্বনি শুনে কোন লাভ নেই। বক্ষে বক্ষ, সীমা-ব-
 সীমার সাধনা সন্মাসিনী জানে না। তাই তারা কৃচ্ছ আর আভিনিষ্ঠারের জোয়ালে প্রতারিত
 যৌবনের আরশীতে বিবেকের প্রতিফলন দেখতে চায়। বিকৃত ইচ্ছা তাদের কাছেই আনন্দের
 মরীচিকা। গতিহীনতার দুর্গন্ধ, স্বর্গীয় সৌরভ মনে হয় নাসিকার নিঃসাড় সড়কে। মেহেরজান
 আপনার কাছে ফিরে আসবে না হাদয়ে উত্তাপ দিতে। না-ই আসুক। আপনার ত্রঞ্চার্ত দুই
 চোখ আঘাত সোপান গঁড়ে তুলুক কল্পনায়। কল্পনা ত মিথ্যা হয়ে যায় না। মহাকাল
 তাকেই বরণ করে। নির্জনতা-বিহারী মেহেরজান, নাই বা এলো কোলাহলের জোয়ারের
 মত। বিশাল আকাশ। তাই ত নক্ষত্রে নিঃসঙ্গ। আপনার প্রাণের অসীমতায় শুধু দুটি
 শুক্তারা জেগে থাক।

আদাব, বেগম সাহেবা।

১২

তাতারীর বাগিচা।

কাপেট-শোভিত কক্ষ। বিশেষভাবে আজ আলোকসজ্জার পরিপাটী দেখা যায়। চার
 কোণে চারটি সামাদান জুলচ্ছে। উপরে ঝাড়-বাতি। তাকিয়া, গের্দা চারিদিকে সাজানো।
 কক্ষের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন একটি বারান্দা। এখানে তাতারী কক্ষের ভেতরের দিকে
 চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরিধানে পাজামা পিরহান।

বাগান থেকে ফুলের খোশবু এই কামরা পর্যন্ত ধাওয়া করে। তবু মাঝে মাঝে দ্রাক্ষারস-
 সৌরভের কাছে পেছিয়ে যেতে হয়। তিন-চারজন সাকী জাম ও পেয়ালা হাতে প্রতীক্ষ্মান।

হারুন : তাতারী!

তাতারী : আলস্পানা।

হারুন : ওখানে কেন? আজ আমরা তোমার মেহ্মান। এই দ্যাখো, কত শরীফ
 মানুষ এসেছে তোমার বাগিচায়। আবু নওয়াস, আবুল আতাহিয়া, আবু
 ইস্হাক। এদের যেমন দরবারে তেমনি নিজের মাকানে পাওয়া নসীবের
 কথা। তুমি ভুলে যাও না কেন তুমি আর গোলাম নও। এসো, এসো।

তাতারী : জাহাপনা...

- হারুন : থানাপিনা যথেষ্ট হয়েছে। আবু নওয়াস আর মাটিতে পা ফেলবে না। কি বলো, আতাহিয়া?
- আতাহিয়া : জাহাপনা, আবু নওয়াস সব সময় মাথায় হাঁটে। ও আর কখনই বা পা ব্যবহার করে?
- হারুন : কিন্তু আজ কদম টলটলমান।
- আতাহিয়া : জাহাপনা, ওর খোয়ারী এসে গেছে। এই নওয়াস!
- নওয়াস : জী।
- আতাহিয়া : ঘুমোচ্ছ কেন? হাসি শুন্বে না?
- নওয়াস : আতাহিয়া, তুমি আমার লেজ ছাড়া আর কিছু নও। কিন্তু দুধার লেজ বেজায় ভারী।
- আতাহিয়া : আমিরূল মুমেনীন, আপনি সাক্ষী থাকুন। নিজের মুখে স্বীকার করেছে, আবু নওয়াস একটা দুধা।
- নওয়াস : আতাহিয়া, হজুরের সাম্মনে বেয়াদবি করো না। তুমি তা হলে মেনে নিচ্ছো, তুমি একটা লেজ।
- আতাহিয়া : তুমি দুধা হলে, আমার লেজ হতে আপত্তি নেই।
- নওয়াস : দু...ম...বা... লেজ। দুম্বা লেজ।
- আতাহিয়া : আবু নওয়াস, তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছ।
- হারুন : থামো দুই জনে। তোমাদের করিদের সঙ্গ মাঝে মাঝে আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করে তোলে। খালি কৃত্য আর কথা। তাতারী, এরা এসেছে তোমার হাসি শুন্তে। একবার সেই হাসি— বিশ্বজয়ী হাসি— শুনিয়ে দাও ত। এই নওয়াস...
- নওয়াস : জাহাপনা।
- হারুন : চোখ খোলো।
- নওয়াস : আস্সামোয়ো তায়তান।
- হারুন : হ্যা, তাতারী, তোমার হাসি শুনিয়ে দাও। কী...? এখানে লজ্জা পাচ্ছো। ঐ বারান্দায় গিয়েই হাসি শুনিয়ে দাও।
- তাতারী : জাহাপনা।
- হারুন : কী বলো।
- তাতারী : হাস্তে পারছি না, আমিরূল মুমেনীন।
- হারুন : তুমি কি আবু নওয়াসের মত পানিতে ডুবে আছো?
- তাতারী : না, জাহাপনা। আপনি দেখেছেন, ও পানি আমি স্পর্শ করি না।
- হারুন : তবে হাস্বে নাযে।
- তাতারী : আলস্পানা, হাসি আস্ছে না।
- হারুন : আবু ইস্হাক, একে হাসির দাওয়াই দাও।
- ইস্হাক : জাহাপনা, ও এখনি হাস্বে। এ-ই হাসো ত হে।
- তাতারী : হাস্তে পারছি না, জনাব আবু ইস্হাক।

- হারুন : আমি খোদ আমিরুল মুমেনীন হকুম দিচ্ছি, তুমি হাসো। তোমার হাসি আমরা শুন্তে চাই। হাসি শোনার জন্যে এদের ডেকে এনেছি। বেইজ্জৎ হব?
- সময়ের ভারের কাছে হিমালয় পরাজয় স্থীকার করে। এখানে মহাজাল স্বয়ং অনড়। সকলের নিঃশ্঵াস ভারী। কামরায় সকলে নিষ্ঠুর। সকলের দৃষ্টি একজনের দুই ঠোটের উপর নিষ্ঠু। কাল হয়তো এখানেই থেমে থাকত, যদি না হারুনের রশীদ হঠাৎ গর্জে উঠতেন।
- হারুন : হাসো।... কি এখনও হাস্চ্ছো না?
- তাতারী : জাঁহাপনা।
- হারুন : আমাকে বহু মানুষ জাঁহাপনা বলে, তোমার কাছ থেকে ও ডাক শুন্তে চাই না। আমি শুন্তে চাই হাসি।
- তাতারী : জাঁহাপনা...
- হারুন : বুঝেছি। তুমি হাসবে না। তুমি আমাকে বন্ধুদের সামনে বেইজ্জৎ করতে চাও। মশ্রুর...
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, এই নাফরমান বান্দার গর্দান এখনই দু-টুকরা করি।
- আতাহিয়া : জাঁহাপনা...
- হারুন : কি আবুল আতাহিয়া, তুমি আবার কি বলতে চাও।
- আতাহিয়া : জিল্লাহাত্ এখনই ওর সাজা দেবেন বলু।
- হারুন : কেন?
- আতাহিয়া : আলস্পানা, কারণ— এত হাসাপিনা আর গান-বাজনা আর হাসির পর, একদা-গোলামের হাসি মাঝেন্দেও চলবে।
- হারুন : আতাহিয়া, তুমি চুপ করো। মশ্রুর—
- মশ্রুর : জাঁহাপনা—
- হারুন : তল্লওয়ার খোলো। দেরী করছ কেন?
- নওয়াস : আলস্পানা, আলস্পানা... আমি কবি আপনি জানেন। নাফরমানের গর্দান নেওয়া উচিত। কিন্তু এর অপরাধ কতটুকু বিচার করে দেখা হোক। ও হাস্চ্ছে না। কিন্তু হাসির জন্য ওয়াক্ত লাগে, যেমন নামাজের জন্য প্রয়োজন হয়।
- হারুন : আবু নওয়াস, তোমার কবিত্তের খোর্মা এখন গাছে ঝুলিয়ে রাখো। ওয়াক্ত লাগে? সময় লাগে?
- আতাহিয়া : হঁ, জাঁহাপনা। সব সময় হাসি আসে না।
- নওয়াস : আমি ত আপনাকে, বুরুল্লাহ্ আগেই বলেছি, উপাদান লাগে।
- হারুন : আবু নওয়াস, তুমি হিঁশে আছো তা হলে।
- নওয়াস : আলস্পানা, হিঁশে থাকার জন্যই আমি বেহঁশ হই। আল্ খামারো লী কামারান্। সুরা আমার কাছে আকাশের চাঁদ।
- হারুন : কি বলতে চাও তুমি, আবু নওয়াস? সাফ্-সাফ্ বলো।
- নওয়াস : আস্সামায়ো তায়তান। হজুর দুনিয়ায় কত দাঙ্গাহঙ্গামা, খুন-খারাবি, ঝগড়া-

- কোন্দাল, লোভ মোহ মাত্সর্য। এ সব কি দেখা যায় চোখে? বেহঁশ থাকাই লাভ। আমার শুই হঁশ আছে বলেই আমি বেহঁশ থাকতে চাই। আর যাদের সে হঁশ নেই অর্থাৎ যারা বেহঁশ— তারা হঁশে থাকে, আর যারা হঁশে থাকে তারা বেহঁশ। দুনিয়ার তাৎক্ষণ্য লড়াইবাজ দাঙ্গাবাজ ফেরেবাজ আওরতবাজ ঘোড়াবাজ মরদবাজ নিজেদের ভয়ানক হঁশিয়ার মনে করে।
- হারুন : নওয়াস, তুমি যে কী বলছ, আমার ও বোঝার সাধ্য নেই। মরদবাজ আবার কি? আরগুলো থোড়াবহুৎ বুঝি।
- নওয়াস : আলস্পানা, সেই লুৎ-আলয়হেস্ত সালামের জমানায়—
 [সকলে : হা-হ হা-হ হা। হা হ হা হ হ]
- হারুন : আবুল আতাহিয়া, তোমাদের মত কবি এবং বাদক সঙ্গে থাকলে আর খেলাফৎ চলবে না। মশ্কুর, তোমার তলওয়ার নামাও। কিন্তু মনে রেখো, তাতারী তোমাকে যা দিয়েছি, তা আর কেউ পেলে আবার আমার গোলাম হতে চাইত। এত বাগ্বাণিচা বান্দী গোলাম ধনদৌলত। খবরদার আর নেমকহারামির অপবাদ নিজের মাথায় ঢাল্বে না। আজ তোমাকে মাফ করলাম। কয়েকদিন পর আবার আস্ছি, তোমার হাসি আমরা শুনব। মনে রেখো...।

১৩

কাল রাত্রি। মজ্জুর জায়গা পরিচিত বাণিজ। ঘুঁঝরের আওয়াজ শোনা গেল। অনেকক্ষণ। হয়ত কয়েক শতাব্দী। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সময়ের পাখনা ছিড়ে যায়। শতাব্দী মুহূর্তের মধ্যে গুহায়িত হয়।

ঘুঁঝরের আওয়াজ থেমে গেল। তারপর রুম্বুম রিনিঠিনি রব ওঠে। সে শুধু পা ফেলার অনুমতি হিসেবে। যে-পায়ে ঘুঁঝুর এতক্ষণ মুখের ছিল, সেই যুগল চরণ এখন হাঁটার কাজে নিয়োজিত।

রুম্বুম... রুম্বুম... রিনিঠিনি... হঠাৎ সেই শব্দও নির্বাপিত।

তাতারী হঠাৎ চকিত কর্তৃ উচ্চারণ করলে, “তুমি কে... তুমি কে? কে তোমাকে এখানে পাঠালে?”

— জনাব তাতারী, বান্দীকে মাফ করবেন। আমার নাম বুসায়না। আমাকে আমিরুল মুমেনীন পাঠিয়েছেন।

তাতারী : তুমি কে?

বুসায়না : আমার নাম বগ্নাদে জানে না, এমন ইন্সান ত কম আছে। আমি রোক্তাসা (নর্তকী) বুসায়না।

তাতারী : কি চাও?

বুসায়না : খলিফার হুকুম, আমি যেন আপনার খেদমৎ করতে পারি।

তাতারী : বুসায়না, খেদমতের জন্যে এখানে বান্দা-বান্দী আছে।

- বুসায়না : কিন্তু তারা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না। আপনার মুখের হাসি কে যেন কেড়ে নিয়েছে। আমি এসেছি আপনার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে।
- তাতারী : বুসায়না, তাই কী তোমার এই লেবাস?
- বুসায়না : কি দেখলেন, জনাব?
- তাতারী : লেবাস দেহ-আবরণের জন্য। তোমার লেবাস দেহ উলঙ্গার্থে। এর সাহায্যে তুমি আমাকে আনন্দ দেবে?
- বুসায়না : জনাব, রোক্ষাসা আপনাকে জাগিয়ে তুলবে।
- তাতারী : তার চেয়ে তুমি আমাকে ঘূম পাড়িয়ে যাও বুসায়না, তোমার যেহেবানী কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার চোখে ঘূম নেই। ঘুমের ঘোরে থাকি। কিন্তু শিরা-উপশিরা বিশ্রাম নিতে পারে না। কটক-মুকুট মাথায় হজরত ঈসা, যীশুস্ত্রীষ্ট অঘর। আমার কটক-শয্যা আমাকে কি দেবে?
- বুসায়না : খলিফা সেই জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনার কালো ঠেঁট বর্ধার কালো মেঘের মত। ও তে চুম্বনের বিদ্যুৎ-ই শুধু শোভা পায়।
- তাতারী : না। সরে যাও, বুসায়না। তুমি আমাকে বেইজ্জাঁ করতে এগিয়ো না।
- বুসায়না : বাস্তীর গোনা মাফ করবেন, জনাব।
- তাতারী : তুমি আমার পাশ থেকে সরে ঐ দিওয়ানে বসো।
- বুসায়না : কেন?
- তাতারী : তুমি আমাকে আনন্দ দিতে পারতেনা।
- বুসায়না : সমস্ত বগ্নাদ শহরে বুসায়নার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর আপনার মুখে এই কথা!
- তাতারী : আনন্দের উপকরণ তোমার কাছে নেই।
- বুসায়না : কেন নেই?
- তাতারী : মানবীর যৌবনই কি যথেষ্ট? তাহলে জননী-রূপে সে কিরূপে মর্যাদা পায়? ও কি! তোমার সদ্বিয়া খুলে ফেলছ কেন? জানো, জননীর খোলা স্তন বহুদিন আমি পান করেছি। বুবালাম, তোমার তৃণে আদিম কয়েকটা শর আছে মাত্র।
- বুসায়না : জনাব, এগিয়ে আসুন। নতজানু এক নারী আপনাকে আহ্বান দিচ্ছে। আমার এই যৌবন- কে আপনি বেইজ্জাঁ করবেন না।
- তাতারী : বুসায়না, তুমি ত মোড়-জানু। অঙ্গসঞ্চিক্ষণে আনন্দ-আহরণ আমার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়— জন্মদের কাছেও না। আমি মানুষ। আমার মন প্রয়োজন হয়!
- বুসায়না : সে-মন এখন প্রয়োজন নয় কেন?
- তাতারী : বুসায়না, সময়-ও মানুষের সৃষ্টি। মানুষ আছে বলেই সময় আছে। সময়ের-ও প্রয়োজন হয়।
- বুসায়না : সে-সময় এখন নয়?
- তাতারী : না। তোমার খোলা বুক ওড়নায় ঢাকো। নারীর বিবসনা হওয়ার প্রয়োজন

আছে। কিন্তু সে কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হওয়ার অধিকার আছে; তা-ও শুধু প্রেমে। একটি মানুষ যার সান্নিধ্যে তার অস্তিত্ব অর্থবান হয়— তেমন মানুষের জন্যে। জমিন-দরদী দেহকান (চারী) যেমন নহরের পানি নিজের জমির জন্য বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখে, প্রেমিক-নারী তেমনই সমস্ত লজ্জা-সংকোচ একটি হৃদয়ের জন্য সঞ্চিত রাখে। তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও ত সওদাগরের দোকান, লেবাস আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সন্তা নয়। যে নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-জাতির শিশু-কে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে, যে নারী শাশ্বত মানবতার জননী— বসুন্ধরার অনন্ত অঙ্গীকার, সে অত সন্তা হয় না, বুসায়ন। তুমি ভুল ঠিকানায় এসেছো। যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তারাও পৃথিবীর ঠিকানা জানে না।

- বুসায়না : আমাকে আপনি বেইজ্জৎ করবেন না।
তাতারী : না বুসায়ন। প্রতিদিন কিছু দীরহাম ছুঁড়ে ফেলে, যারা তোমাকে বেইজ্জৎ করে আমি তাদের যত তোমাদের অসম্মান করতে শিখিনি। আমি গোলাম। দীরহাম দিয়ে সব কিছু কেনার পাগলামি থেকে অস্তত আঘাত আঘাত আমাকে রেহাই দিয়েছেন।
বুসায়না : না, জনাব। আপনি গোলাম নন! অভীভূতের কথা ভুলে যান। আপনি আমাকে ইজ্জৎ-আবৃক্ষ দিয়েছেন। কিন্তু তুর বদোলত...
তাতারী : কাঁদছো কেন, বুসায়ন। কাঁজো চোখের পানি— আর সে পানি যদি শিশু কি আওরতের হয়, আশ্রিতে করতে পারি না। কাঁদছো কেন?
বুসায়না : জনাব...
তাতারী : কি বলো।
বুসায়না : জনাব, বুসায়নার পায়ের তলায় বগ্দাদের আমির-ওমরাদের ফরজন্দ্রা কত চোখের পানি ফেলে যায়। দরবারের ষড়যজ্ঞ, ঈর্ষা, দ্ব্দবা, লোভে-থকা, বিবি-ক্লান্ত কত আমির রঙ্গে বুসায়নার পয়ঝারে হাঁফ ছাড়তে আসে— সেই রোক্তাসা আজ কাঁদছি না, হাস্তি।
তাতারী : কিন্তু হাসি তোমাকে প্রতারণা করছে।
বুসায়না : কাঁদছি। হ্যাঁ, কাঁদছি। কারণ এই বয়সে ধন-দৌলতের আলবুরুজ পাহাড়ে উঠে, কেউ মৃত্যু চোখে দেখতে চায় না।
তাতারী : মৃত্যু?
বুসায়না : হ্যাঁ, মৃত্যু। কাল ফজরে, আপনার বাগিচায় আমি কতল হয়ে যাব। মশ্কুরের তলওয়ারের তেজ একটি নারীর হল্কুম (গ্রীবা) ছেদে অপারগ তা উন্মাদও বিশ্বাস করবে না।
তাতারী : কিন্তু মশ্কুর তোমাকে কতল করবে কেন?
বুসায়না : খলিফার হকুম। আমিরুল মুমেনীন বলেছেন, আমি যদি আপনার খেদমত করতে না পারি, ফজরে আমার গর্দান যাবে।

- তাতারী : তুমি এই বাজি ধরলে কেন?
- বুসায়না : আঘাবিশ্বাস ছিল। সমস্ত বগ্নাদ আজ লোভের দরিয়া। এখানে কে শুষ্ঠ থাকতে পারে? শান্খওক্ত, দ্বন্দবা তারই শিকার সমস্ত মানুষ। তারা কোনদিন মানুষ ছিল ভুলে গেছে। আমি ত বগ্নাদের বাসিন্দা। আমি আর নতুন কি হবো? তাই আঘাবিশ্বাস ছিল। আর থাকবে না বা কেন? কত আমির-ওমর দেখ্লাম। কাঁচা দীরহাম আর কাঁচা গোশ্চতের খরিদ্দার। কতজনকে ফতে করলাম। তার জন্য ইলেম লাগে না, সাধনা লাগে না— একটু হাসি, একটু লেবাস এডিক-ওদিক। ধন-দৌলত বিনা মেহনতে আসে। এখানেও বিনা মেহনৎ। শুধু জয় আর জয়। বাজি ধরেছিলাম। হেরে গেছি। কাফ্ফারা (প্রায়চিত্ত) দেব বৈকি! আর কাঁদব না।
- তাতারী : কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দেব না।
- বুসায়না : কেন?
- তাতারী : তুমি মহিয়সী নারী। হয়ত বাঁচার খাতিরে বগ্নাদের ঐ দরিয়ায় ভূব দিয়েছিলে। কিন্তু সামান্য ভাসমান কাঠের টুকরো দেখে তুমি মাটির মানুষ, ডাঙায় ওঠার চেষ্টা পাচ্ছো। তোমাকে মরতে দেওয়া পাপ।
- বুসায়না : কিন্তু কে আমাকে বাঁচাবে? আপনাকে আর বেইজ্জৎ করতে পারব না।
- তাতারী : সেইজন্যেই ত সোজা উপায় পেয়ে গেছি।
- বুসায়না : সোজা?
- তাতারী : হ্যা, বুসায়না, তুমি আমার মত আঘার ব্যাধিগ্রস্ত। ঐ দেওয়ালে তলওয়ার লট্কানো— আমাকে কতল করো। এ জায়গা আমার কাছে অসহ্য, শাসরোধী।
- বুসায়না : তাহলে পালিয়ে যান্ত না কেন? আপনি ত গোলাম নন।
- তাতারী : বাহু হা, বুসায়না। এই ধন-দৌলত দেখে সেই রাতে ভুলে ছিলাম। পরে সব বুঝে ভাবলাম পালাই! বাদ মগ্রের শহরের ফটক থেকে বেরুতে যাব, দেখ্লাম শান্তি। বললে, এই শহরের বাইরে যেতে পারবেন না। খলিফার ছুকুম। আমি কেমন স্বাধীন, বুঝেছো বুসায়না? এই বান্দী বান্দা মুজ্রানী ইমারতের মধ্যে আমি স্বাধীন। একটা মোরগকে কতগুলো মূরগীর সঙ্গে খুল্লার মধ্যে রেখে দেওয়ার মত। তোমার মেহেরবানী আমি ক্ষেয়ামত তক্ক, রোজ হাশরের দিন পর্যন্ত ভুল্লতে পারব না। আমাকে কতল করো। এই নাও তলওয়ার।
- বুসায়না : না বেরাদর, আপনাকে মরতে দিতে পারব না। বগ্নাদের সাহারার মধ্যে এই একটি ওয়েসীস আমি পেয়েছি, তা নাস্তানাবুদ করতে পারব না।
- তাতারী : তবে?
- বুসায়না : সব মাথায় পেতে নেব। কত কালিমা ত সারা জীবন বইলাম। খুনেই তা সাফ হতে পারে। আসুক মশ্রুর, তার জন্য অপেক্ষা করব।
- তাতারী : না বুসায়না। জীবন অনেক মূল্যবান। তা-ই আঘাহত্যা করি নি। আঘাহত্যা

ভীরু বৃজ্জীলের কাজ। মানুষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। সে পিছু হটে না। জন্মের যেমন লেজ গুটিয়ে পালায়, তেমন পালায় না। কিন্তু বুসাইনা, তোমার আত্মার সঙ্কান আমি পেয়েছি। তুমি এখান থেকে যেয়ো না। আমি কাল ফজরে জবাব দেব, হয়ত মুখ হাসিশূন্য, কিন্তু জবাব দেব আমি। মশ্কুর...। একি, বুসাইনা কোথায় গেল?...
মোহাফেজ... মোহাফেজ...

তাতারী : বুসাইনা কোথায় গেল?

মোহাফেজ : এই ত এখানে ছিল।

তাতারী : দ্যাখো, কোথায় গেল। ওর পায়ে ঘুঁঁতুর আছে। যেখানে যাবে, বাজ্বে।

মোহাফেজ : ঘুঁঁতুর? এই ত পড়ে আছে গালিচার উপর।

তাতারী : কখন খুললে, আশৰ্দ্ধ! যাও, ওর খৌজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো।

মোহাফেজ : যো হকুম, হজুর।

১৪

সরাইখানায় তারা গজল শুনছিল।

কত দূর থেকে আসে লু-হাওয়াজ তীর
সে কি তোমার নিঃশ্বাস সাক্ষি,
আমার কদমে জিঞ্জির
কত আমির তোমার উমেদার
এ দীল সংগেহুন, বেকারার
সুমসাম রাতে আহাজারী সার,
পাথরে কুটা ফুটা শির।
আমার কদমে জিঞ্জির।

রূবাবের আওয়াজ শুধু এই স্বরে বিশ্বন্তার আমেজ ছুইয়ে যায়। বগ্দাদের সরাইখানার অঙ্ককার। গায়ক হয়ত আদেশ দিয়েছিল আলো নিভিয়ে দিতে।

গজল অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। যেন আজ আর শেষ হবে না। শ্রোতারা বুঁদ। বিরহীর আর্তনাদ সকলের বুকে জারিয়ে গেছে। এখনে সবাই প্রেমিক। ঝাপসা অঙ্ককারে শুধু বহু মানুষের আন্দাজ পাওয়া যায়।

হঠাৎ একজন হো হো শব্দে চতুর্দিক সচকিত করে হেসে উঠল।

আসরে ফাটল দেখা দেয়, তাই বহু শ্রোতাই বিরক্ত!

সত্ত্ব গায়কের গজল থেমে গেল পরিবেশ মোতাবেক। তার কষ্ট থেকে আর রাগ বেরোয় না— যা রাগিণীর পুরুষ রূপ। গোৰাঢ়ুত তার গলার আওয়াজ।

—আবুল আতাহিয়া, বেয়াদবের মত হাস্তো কেন?

—আবু নওয়াস, মাথায় জম্জমের ঠাণ্ডা পানি ঢালো।

নওয়াস : এমন গজলটা ধরেছিলাম। সব জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলে।

- আতাহিয়া : তার মালিক তো স্বেফ আল্লা। আমি তো বান্দা।
- নওয়াস : তোমার এমন আক্ষেল বলেই তো তেমনি কবিতা লেখো।
- আতাহিয়া : তোমার আক্ষেল আছে, শৃঙ্খিশক্তি আছে?
- নওয়াস : আল্লা মাথার খুলিটা এখনও শূন্য করে নেন নি।
- আতাহিয়া : নিয়েছে। টের পাও নি।
- নওয়াস : দ্যাখো, এখনই লড়াই বেধে যাবে।
- আতাহিয়া : তাতো বাধবেই। নাদানকে নাদান বল্লেই, তার গলা থেকে গান বেরোয় না।
- নওয়াস : আমি নাদান?
- আতাহিয়া : প্রায়। পুরো নয়। সেদিন যে বল্লে, তুমি জীবনের কবি, জীবনের গান গাও; আর আমি মৃত্যুর কবি, নিরাশাবাদী অগ্যরহ। আরো কি কি বল্লে। আজ তুমি কি গজল গাইছ?
- নওয়াস : উঃ, আবুল আতাহিয়া। তোমার মাথার খুলিটা হেকিমকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নাও। ওটা খালি হয়ে গেছে, টের পাও নি।
- আতাহিয়া : এই বুঝি জীবনের গান?
- নওয়াস : বিরহে দুঃখ আছে। দুঃখ কি জীবনে আসে না? এতে জীবন-বহির্ভূত কি দেখলে?
- আতাহিয়া : মৃত্যু কি জীবনে আসে না?
- নওয়াস : আসে। সে একবার মাত্র। তাই নিয়ে হাজার বার নাকী কাল্লা কাঁদতে হবে না কি, তুমি যা করো?
- আতাহিয়া : নওয়াস, দুঃখের গান প্রাণওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে। আজ তুমি যে-বিরহের গান গাইলে এমন মজা আর কোনদিন পাইনি। তোমার কবিতা ফিকে লাগে এর কাছে।
- নওয়াস : আবুল আতাহিয়া, তুল করো না। দুঃখ আর মৃত্যু এক জিনিস নয়। দুঃখের গান গাই দুঃখকে দূর করার জন্যে, দুঃখের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারব, তার জন্যে। যারা এই জীবন জীইয়ে তুলতে পারে না, তারা কবিতা লেখে শকুনদের জন্যে। পারশীরা শকুনের কাছে যেমন মড়া ফেলে দেয়, ওই কবিরা তেমন কবিতা ছুঁড়ে দেয় পাঠকদের জন্যে। আজান দিয়ে মুসল্লি ডাকে, তুমি কবিতা দিয়ে মানুষ ডাকার বন্দোবস্ত করো। তুমি—
- আতাহিয়া : থামো, থামো। এলাম দু-দণ্ড মওজ করতে, তুমি কি যে কচ কচ শুরু করে দিলে। তৌবাঞ্ছফেরকল্লা।
- নওয়াস : শয়তান তোমার কাছাকাছি থাকে কি না, তাই তোমার বার বার আস্তাগ্ফেরকল্লা পড়তে হয়।
- আতাহিয়া : হাহ হা, আমি তো শয়তানের কাছেই বসে আছি, ঠিক বলেছো।
- নওয়াস : শয়তানই বিশ্বস্তির আগে প্রথম ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগসাধন করেছিল। সেই যুক্তিই মানুষের সভ্যতার উন্নতির অন্যতম বড় উপাদান। মনে রেখো আবুল

- আতাহিয়া : আতাহিয়া । মাঝে মাঝে শয়তানেই হয়তো আসল মনুষ্যত্বের সূচনা ঘটে ।
- আতাহিয়া : শয়তানের যুক্তি দেবেই তা বোধা যাচ্ছে ।
- নওয়াস : আতাহিয়া, যুক্তির পেছনে কি থাকে জানো?
- আতাহিয়া : না ।
- নওয়াস : তা তোমার জানার কথা নয় । যুক্তির পেছনে থাকে যুক্তির স্বপ্ন । এই যুক্তির স্বপ্নই মানুষকে মানুষ বানায় । আমি তাই দুনিয়ার তামাসা ভাল করে দেবি ।
- আতাহিয়া : নওয়াস, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা দায় । কারণ, চোর আর ছেনাল কারচুপিতে খুব দড় ।
- নওয়াস : আতাহিয়া, আজ কমে গালাগাল দাও । আমি আজ মওজে আছি । আমার আর এক মজলিশ বাকী আছে ।
- আতাহিয়া : তোমার সঙ্গে আজ রাত কাটাচ্ছি না ।
- নওয়াস : নীরস তুমি । মওজ দেখলে তোমার দীল বাতাসে কাঁপে । কিন্তু বদ্ধ, জীবনকে খুঁজে পেতে হাটে হাটে ঘুরতে হয় ।
- আতাহিয়া : কিন্তু তুমি যে শধু রূপের হাটে ঘুরে বেড়াও ।
- নওয়াস : রূপের হাট-ই আসল হাট । মানুষ যদি তা না আবিষ্কার করত, এই দুনিয়ার বাঁচার আর কোন মজা থাকত না । ফল তো বনে ফোটে । কিন্তু তাকে আমরা সাজিয়ে ফোটাতে চাই । তাই বাগান করি । রূপের নেশা থেকেই কাজের উৎপত্তি অথবা কাজ থেকে রূপের নেশার উৎপত্তি... আর কাজই সমস্ত সংসারকে চালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে । তোমার মত নিকর্মারা আকাশের দিকে তাকায় । কাজের রূপে হিতালি পাতিয়েই তো ইন্সান এগোচ্ছে । যখন আর ওই দুই খৌট একত্রে মেলাতে পারে না, তখনই মানুষ হয় ইব্লিশ । মুনাফেকীর (ভগ্নামি) জন্ম সেইখানে ।
- আতাহিয়া : কিন্তু নওয়াস, জাহেলী (অজ্ঞতা) থেকেও তো মুনাফেকীর জন্ম হতে পারে ।
- নওয়াস : তা হয় । কিন্তু জাহেলী তো একটা তাসীর (ফল) । তুমি কেমন মা-বাপ-ইয়ার-দোস্ত-মুলুকে মানুষ, তার উপরও অনেকটা নির্ভর করে ।
- আতাহিয়া : কিন্তু এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?
- নওয়াস : কেন?
- আতাহিয়া : এলাম, দু-দণ্ড মওজ করব । তুমি পান করবে, আমি গান শব্দ করব । সে জায়গায় এসব কি শুরু করলে?
- নওয়াস : রুহ সাফা (আত্ম-পরিষ্কার) পানি ত তোমার জর্ঠরে যায় না, তাই আমার জায়গাটা তোমার ঠিকানা-মত নয় ।
- আতাহিয়া : না, ইয়ার । আবার গজল গাও ।
- নওয়াস : কিন্তু গজল আর জমবে না ।
- আতাহিয়া : কেন?
- নওয়াস : কল্পনার বোরারকে (স্বর্গীয় বাহন) চড়ে, তুমি দুনিয়ার তাবৎ সুলতানার

- (রানী) সঙ্গে ‘জেনা’ ব্যভিচার করতে পারো, আর এ খাহেশও স্বাভাবিক।
 কিন্তু মাটির উপর পড়লে, বিবিরও মত নিতে হয়।
- আতাহিয়া : লা-হাওয়া, লা-হাওলা। বাঁচাও প্রভু শয়তান থেকে।
- নওয়াস : সত্যি।
- আতাহিয়া : কিন্তু আমি বলছি, তোমার কল্পনা যদি ভেঙে থাকে, জোড়া দাও।
- নওয়াস : তা আর সম্ভব নয়। দ্যাখো আবুল আতাহিয়া, তুমি আর যাই করো আমার
 সঙ্গে বাজি ধরো না। খোদ্ আমিরল মুমেনীন আমার সঙ্গে বাজি ধরে প্রায়
 হারতে বসছেন।
- আতাহিয়া : তোমার সঙ্গে বাজি?
- নওয়াস : তারই ফয়সালা আছে কাল। পরে সব শুনবে। আজ থাক, চলো ওঠা যাক।
- আতাহিয়া : আবু নওয়াস, বগ্নাদ তোমাকে চেনে না, তাই তোমার এত বদ্নাম।
- নওয়াস : বক্ষ মহাপুরুষদের অনেক দেরীতে চেনা যায়। চলিশ বৎসর লেগে গিয়েছিল
 হয়রত মুহাম্মদ (দঃ) কে জানতে। তাই বলে আমি একটা বিশেষ কিছু...
 তা মনে করো না। এক দেশে বাদশার নাম ছিল হবু। মন্ত্রীর নাম ছিল
 গুব। মহাপুরুষেরা নবুয়ৎ (নবীত্ব) পায়, আমি এবার গবুয়ৎ পেয়ে যাব।
- আতাহিয়া : হা-হা-হা, আবু নওয়াস। তোমাকে ঠিকমত বুঝি না, তবু বুকে বুক মিলাতে
 ইচ্ছা করে।
- নওয়াস : খবরদার। এর নাম বুৎ-পরাণ্তি—প্রতিমা পূজা। ও মানুষকে জাহানামে
 নিয়ে যায়। অর্থাৎ ধর্মসের শৈথী। বুঝবে, তবে বুকে বুক মিলাবে। সব
 জিনিস তুমি যুক্তি দিয়ে গুরুত্ব করবে, নচেৎ তুমি ও বুৎ-পরাণ্তি (প্রতিমা
 পূজক)—সে তুমি মুসলমানই হও আর ইহুদীই হও। না, আর কথা না।
 ওহে সরাইওয়ালা তোমার শরাবের দাম কাল নিও।
- সরাইওয়ালা : আচ্ছা জনাব। আস্সালামো আলায়কুম।
- উভয়ে : ওআলায়কুম আস্সালাম।

১৫

বেগম জুবায়দা দাঁড়িয়েছিলেন, যেখান থেকে একদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল
 মেহেরজান। বাগানে তেমনই অঙ্ককার। সাদা পাথরের রাস্তা হয়ত কিছুটা আভাস দিয়ে
 যায়। হয়ত মেহেরজান এই পথেই আবার ফিরে আসবে। মালে-গনীমতের মধ্যে এমন
 উপহার পাওয়া যায়? কথাটা একবার বেগমের মনে জাগল। তিনি পায়চারী করতে লাগলেন।
 কালো বোরখা পরিহিতা এক নারী হঠাৎ পেছন থেকে তাঁকে ডাক দিলে ফিসফিস
 কর্ত্তে :

- বেগম সাহেবা।
- কে তুতী?
- জী, বেগম সাহেবা।

তুঁতী মহলের ক্রীতদাসী। বোরখা খুলে ফেলেছে সে ততক্ষণে!

—কোন খবর পেলি?

—না, বেগম সাহেবা। এই বিরাট মহল। যেখানে শত শত গোলাম আর বান্দা, সেখানে খবর পাওয়া মুশকিল।

—আমি ত আর কিছু চাই নে। কেমন আছে, এইটুকু খবর পেলেই খুশি।

—বেগম সাহেবা, আপনি ওকে বড় ভালবাসতেন।

—তা ত বাসতাম। পরের দৃঢ়খ মুছে নিতে পারলে রুহে আঘায় কত যে শান্তি, তা যদি মানুষ জান্ত।

—বেগম সাহেবা, আপনি ফেরেশ্তা। বেহেশ্তের হুর দুনিয়ায় এসেছেন।

—যা, কি-যে সব বলিস্। পানির জন্য মানুমের কত কষ্ট। আমি একটা নহর কাটাৰ ঠিক করোছি।

—বেগম সাহেবা, সবাই আল্লার কাছে হাত তুলে আপনার জন্যে দোয়া মাঙবে।

—তুই মেহেরজানের খবর আন্তে পারলি না।

—বেগম সাহেবা, এই মহলের ব্যাপার ত আপনি জানেন। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সকলে যে-যার স্বার্থ নিয়ে আছে। মেহেরজান... এখানে না-ও থাকতে পারে।

—ই। তুই যা। খবরদার, এ-খবর কেউ না জানে।

—খোদার কসম, বেগম সাহেবা। আপনি মাঝেক্ষণ্য সমান। আমার কাছ থেকে কোন খবর আল্লার ফেরেশ্তা পর্যন্ত বের করতে পারবে না।

তুঁতী চলে গেল।

বেগম সাহেবা দাঁড়িয়ে রইলেন খুন্দুর মতই অনড়। উৎকর্ণ। বাতাসের ঈষৎ শব্দ তাঁকে উচ্চকিত করে তোলে।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মেহেরজান। তাঁকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তাঁর একমাত্র দুশ্মন দুরন্ত যৌবন। সেই যা ভয়। নচেৎ এমন নিংভাজ অঙ্ককারেই ত সে ফিরে আসবে।

বেগম জুবায়দা বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

১৬

মোহাফেজ এবং হারুনৰ রশীদ।

—মোহাফেজ?

—আমিরুল মুমেনীন, আপনার বান্দা।

হারুন : গোলাম তাতারীর খবর কী? গোলাম এবার হাসছে?

মোহাফেজ : না জাঁহাপনা।

হারুন : এত দূর হিমাকৎ— আস্পর্ধা!

মোহাফেজ : জাঁহাপনা, গোলাম চুপচাপই থাকে। আহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সে-খবর দিতে আমি আসি নি।

হারুন : তবে তুমি কি খবর নিয়ে এসেছো?

- মোহাফেজ : জাঁহাপনা, বুসায়না আঘাত্যা করেছে!
- হারুন : বুসায়না আঘাত্যা করেছে!
- হারুন : বাগিচার এক গাছের ডালে ঝুলছিল, আজ বিকেলে দেখা গেল। আমরা কেউ খৌজই পাইনি।
- হারুন : বুসায়না আঘাত্যা করেছে, না, গোলাম তাকে খুন করেছে?
- মোহাফেজ : জাঁহাপনা, সব খবর আমার জোনা নেই। কাল রাতে তাতারী আমাকে ডেকে বললে, বুসায়না কোথা গেল খৌজ কর।
- হারুন : বুসায়না, রাতে গোলামের কাছে ছিল না?
- মোহাফেজ : না জাঁহাপনা।
- হারুন : মশ্রুম, মশ্রুম।
- মশ্রুম : জাঁহাপনা।
- হারুন : এখনই কোতোয়ালকে ডাকো। শুনেছো, বুসায়না আঘাত্যা করেছে।
- মশ্রুম : এখনই শুন্লাম।
- হারুন : যাও, কোতোয়ালকে খুনের তদারক করতে বলো। আমি এখনই বাগিচায় যাব।
- মশ্রুম : আস্সামায়ো তায়তান।
- হারুন : মোহাফেজ, এতদূর আস্পদ্ধা গোলামের। গোলামকে আবার গোলাম বানাব। তার দেহ টুকরো টুকরো করব না। ছিড়ে ছিড়ে তিলে তিলে পশ্চপক্ষী পোকার আহার আনাব। হাবসী গোলামের এত সীনার জোর? মোহাফেজ...
- মোহাফেজ : জিল্লাহ।
- হারুন : গোলাম এই খবর জানে?
- মোহাফেজ : আলস্পানা, গোলামের কাছে এই খবর যাওয়া মাত্র সে ত পাগলের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, তারপর দৌড়ে গেল সেই গাছের নিচে। অন্যান্য গোলামের সাহায্যে গাছ থেকে লাশ নামিয়ে সে ত ছাত্রিপেটা শুরু করল, আর হাউ হাউ কান্না। জমিনের উপর কি পট্কান খাওয়া। বহেনের জন্যেও ত কেউ এমন করে না।
- হারুন : তাজব ব্যাপার। মশ্রুম ফজরে গিয়ে শুনে এসেছিল, বুসায়না নিজের মাকানে ফিরে গেছে। মাকানেও ছিল না।
- মোহাফেজ : জাঁহাপনা, গোলাম বুসায়নার গোসলের ব্যবস্থা করছে।
- হারুন : কিন্তু সকালে মশ্রুমকে গোলাম বলেছিল, বুসায়নাকে সে জায়গা দেয় নি ঘরে।
- মোহাফেজ : আলস্পানা, আল্লা এর মাজেজার রহস্য জানে।
- হারুন : বাগিচায় আর কেউ আছে?
- মোহাফেজ : জাঁহাপনা, বগ্নাদে বুসায়নার রূপের খ্যাতি কে না শুনেছে। ধনদৌলতের রোশ্নাই-ও তার কম নয়। সমস্ত বগ্নাদ আজ বাগিচায় ভেঙে পড়ছে।

- লাশের পাশে পাগলের মত কাঁদছে আপনার গোলাম তাতারী।
- হারুন : মশ্কুর, কোতোয়াল পাঠিয়ে বাগানের ভিড় হটাও। আমি খোদ্ যাব।
- মশ্কুর : জাহাপনা, এই মোহাফেজকে বিদায় দিন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।
- হারুন : যাও, মোহাফেজ।
- মাহাফেজ : আস্সালামো আলায়কুম ইয়া আমিরুল মুমেনীন।
- মশ্কুর : জাহাপনা, গোলাম খুন করে ওকে গাছে ঝুলিয়ে দেয় নি ত?
- হারুন : নিমিকহারামকে দিয়ে কি না সম্ভব! গোলাম একটা পাথরের পিণ্ড ছাড়া আর কি। বুসায়না যে ওর কাছে ছিল না, তাও সত্য। মোহাফেজের জবানী তার প্রমাণ। হয়ত বুসায়না বাজি ধরে হেরে গিয়েছিল। তাই তোমার তলওয়ারের ভয়ে গাছে ঝুলেছে।
- মশ্কুর : ওর মাজেরা আলেমুল গায়েবই জানেন।
- হারুন : চলো, সরেজমিন তদারক করা যাক। কিন্তু তার আগে মশ্কুর, সেই বান্দীর বাচ্চা, বান্দরের বাচ্চাকে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বলো। একদম ‘হাবিয়া’ কয়েদখানায়। পোকামাকড় বিছুর সঙ্গেই জিন্দেগানী চলার উপযুক্ত ও একটা কমিনা-কমজাত। নওয়াসের কাছে আমাকে বেইজ্জৎ করে ছাড়ছে। এত বেসুয়ার মালমাত্রাবালিক করে দিলাম। তবু গোলামের বাচ্চা হাসল না। তবে হাসি আমি আদায় করব। যাও, মশ্কুর। আমার প্রতিটি লফ্জ শব্দ যেন ঠিক্কাটিক পালন হয়।
- মশ্কুর : আস্সামায়ো তায়তান।

১৭

আবু নওয়াস হাঁটছিল।

পাশে দজ্জলা বয়ে চলেছে। যেমেন গোধূলির ঝিলিমিলি। এখানে শহর থেমে গেছে। বেবহা ময়দানের প্রারম্ভ। মরুভূমির অংশ বিশেষ। তবে এখানে আবাদ আছে। আর আছে খুর্মী গাছের সারি।

নদীর উপর শুফাদারেরা শুফা বেয়ে চলেছে। কোন কোন শুফা বোঝাই তরমুজ, তামাক কফি। সন্ধ্যার আগে বাপসা স্থিমিত এই জীবন-লীলার দিকে নওয়াসের কোন লক্ষ্য নেই। বালু-তীর। খালি পায়ে হাঁটার জন্য মনোরম। নওয়াস তাই হাঁটছে। তীরে দজ্জলার ঢেউ এসে লাগে, কখনও কখনও নওয়াসের পায়ে আছড়ে পড়ে। কবি একটু চমকায় মাত্র। তারপর হাঁটতে থাকে। কোন কিছুর দিকে তার আকর্ষণ নেই। উটের কাফেলা চলেছে দূরে দূরে। গোধূলির অঙ্ককারে খেজুর বীথির পাশে পাশে এই দৃশ্য অবসরভোগীর আশীর্বাদ। কিন্তু নওয়াসের চোখ আজ কোন বস্তুর উপর এককভাবে বিন্দ হয় না। দৃষ্টি স্পর্শ করে, গ্রহণ করে না কিছুই।

নওয়াস যেন আজ অনন্তের মুসাফির। তাড়াহড়া নেই, ক্ষিপ্তা নেই। আরো—
আরো কিছু আছে চোখে দেখাৰ। তাই হঠাৎ একগতার প্ৰয়োজন-বোধ লাগে না।

নওয়াস হাঁটছিল। দজ্জলা সৈৰৎ শাস্তি, সৈৰৎ নীৰব। তবু মানুষেৰ মেহনতেৰ নানা পট
তো সাজানো। নওয়াস তা দেখতে প্ৰস্তুত নয়।

মৰণভূমিৰ বুকে কি সে কোন পানশালাৰ খৌজ পেয়েছে? না, এই বালুৱ চাঁচৰ রাজ্যে
পানি স্বপ্ন-মাত্ৰ। পানশালা ত বেহেশ্ত।

আৱ শহৰেৰ শ্ৰেষ্ঠ পানশালা ত সে ছেড়ে এসেছিল গোধূলিৰ পূৰ্বে।

আকাশে নক্ষত্ৰ ফুটতে থাকে এক এক কৱে। নওয়াস সেদিকে একবাৰ তাকিয়ে
দিগন্তেই কি যেন খুঁজতে লাগল। পানশালাৰ পৰ নারী নওয়াসেৰ অষ্টিট। কিন্তু মানবীৰ
কোন প্ৰয়োজন নেই তাৰ। চাঁদ-সড়কেৰ রোকাসাদেৱ উঁচু বুক আজ তাকে বাধা দিতে
পাৱে নি।

হঠাৎ থামল নওয়াস। দজ্জলাৰ কুলুকুল-স্বৰ শুধু তাৰ কানে আসে। আৱ কোন শব্দ
সে কান দিয়ে গ্ৰহণ কৱতে পাৱে না।

দিগন্তে দিকে নওয়াসেৰ দুই চোখ— অক্ষকাৱে যেন প্ৰশ্ৰে জবাৰ খুঁজছে। প্ৰশ্ৰকাৰী,
উত্তৰদাতা উভয়ই সে নিজে।

নওয়াসেৰ দুই ঠোটে হঠাৎ মনু হাসিৰ আঁচড় দেখা গেল। তাৰপৰ বেশ জোৱেই
হেসে উঠল সে।

আনন্দলিত মন তখন ঠোটেৰ কিনারায় প্ৰতিকৰণি তোলে : নওয়াস, নওয়াস। আৱো
হাসো, হাসো। দুনিয়ায় তোমাকে সকলে শৱাবী-মদ্যপ বলেই জানবে। আৱ জানবে কবি-
কুপে। বলবে, ব্যভিচাৰী নওয়াস। তোমাৰ কলঙ্কই বেঁচে থাকবে, তোমাৰ অস্তিত্ব থাকবে
না। কেউ জানবে না, তুমি কেন কলঙ্কেৰ কালি-বোৰা নিজেৰ মুখে মাথায় তুলে নিয়েছিলে?
হাসো, হাসো, নওয়াস।

নওয়াস সত্যি নিজেৰ মনে হাসতে লাগল। তাৰপৰ চুপ কৱে গেল। গম্ভীৰ তাৰ
মুখাবয়ব।

খেজুৱেৰ বীথি এখানে বাপসা, আকাশেৰ গায়ে এসে যিশেছে।

আৰাৰ নওয়াস সোচ্চার বলতে লাগল : আমি ও মানুষেৰ মনেৰ অক্ষকাৱে এমনই
আকাশ রচনা কৱে যাব। মৃত্তিকা-জাত, তবু আস্মানেৰ সঙ্গী। আমাৰ কলঙ্ক কেউ
বুঝবে না। জীবনেৰ দিকে দিকে হে অমৃতেৰ পুত্ৰ, অঘসৰ হও। মৃত্তিকা থেকে আকাশে
পাড়ি দাও— কিন্তু তোমাৰ দুই পা সব সময় যেন মাটিৰ উপৰ থাকে। এইভাৱে
আকাশও তোমাৰ কাছে ধৰা দিয়ে যাবে। কিন্তু তোমৰা তা কৱো না। আকাশেৰ খৌজে
এগোও, এদিকে পৃথিবীতে হারিয়ে যাও। তোমাদেৱ মানুষ বলেই আৱ কেউ চেনে না।
তুমি পৃথিবী-বিশ্বত, তাই মনুষ্যত্ব-বিশ্বত। নওয়াস তাই কলঙ্কেৰ কালি মেখে নিলে।
শিব-হাল নওয়াস। আবে-হায়াৎ বিলিয়ে দিয়ে জহুৰ নিজে পান কৱলে। শূন্য আকাশ
তোমাদেৱ কাছে এত প্ৰিয় যে, বৈচিত্ৰ্য-গৰ্ভা পৃথিবীৰ দিকে তাকালে না। তাই কবি
নওয়াস তাৰ কবি-ব্ৰত ধাৰণ কৱলে—। হোক পাঁক, সহজ আনন্দ— এই সহজ
আনন্দেৰ দিকে আগে মানুষকে টানো— জীবনকে ভালবাসতে শিখুক মানুষ। তাই ত

শরাব-সাকী আমার কাব্য প্রাত্যহিকতার প্রতীক। কাকে বোঝাব এই কথা?— একটি মানুষ-যদি পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচার অভিলাষী হয়, নওয়াসের কলঙ্ক সার্থক। সূর্যের মত আমার জন্য থাক কলঙ্ক জুলা আর জুলা— তোমাদের জন্যে থাক শুধু প্রাণদাত্রী আলো আর আলো। চতুর্দিকে কালিমা-ময় জাল বিছিয়ে অঙ্গার কী হীরককে জ্যোতিহীন, না নির্মল্য করতে পারে? কিন্তু নওয়াস, তুব— তবু, তোমার হৃদয় আবেগ-উদ্বেলিত কেন? শান্ত হও, মন। রাত্রি নামে গোধূলি শিখরে—

নওয়াস হঠাতে অল্প জায়গার মধ্যে পাগলের মত পায়চারী করতে লাগলো। অঙ্ককার চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। নওয়াস তারই কয়েদখানায় হঠাতে চিংকার দিয়ে ওঠেঁ: না, না।

সে জানে এই কষ্টস্বর কারো কাছে পৌছাবে না। তবু থেকে গেল সে, বুকে অস্থিরতা সত্ত্বেও। আবার শহরের দিকে মুখ ফেরায় আবু নওয়াস। রহস্যময়ী দীপাবিতা বগ্নাদ আবার হেসে উঠেছে। সেখানেই ত সে ছুটে যাবে। জীবনধারা থেকে আঁজলা পান না করলে ত তার ত্রুষ্ণা মিটবে না। মানুষের জীবনই মদিরা বিশেষ, তাই ত সে মদিরায় জীবনকে ঝুঁজেছে।

বগ্নাদ-অভিমুখী নওয়াস। দজ্জলা হয়ত জোয়ারে উত্তাল। তার পদধনি বার বার শয়ে তেহাই মারছে। গজল গাইছে গুফাদারেরা দল বেঁধে। সুরের খেই পাকড়ে শুন শুন করতে লাগল আবু নওয়াস।

জীবনের সবক নিতে বগ্নাদেই ত তাকে স্তুরে যেতে হবে। বিরাট মরুভূমি আর শূন্যতার উপাসনা তার ব্রত নয়।

আবু নওয়াস জোর পা ফেলতে লাগলুন।

শহরের দরওয়াজার কাছাকাছি দজ্জলার বুকে বিপণী-সারির আলো পড়েছে।

নওয়াস ভাবলে, “দজ্জলা ত নন্দি নয়— আমার বুক। সম্মুখে কোথাও অঙ্ককার আছে বলে কী এই নন্দীর স্বোতন্ত্র শহরের আলোন্নাত এক জায়গায় থম্কে দৌড়ায়? অঙ্ককারের রহস্য কী তাদের টানে না?... আমি নিজেই এক দজ্জলা।”

হাঙ্কা বুকে হাসল আবু নওয়াস। অতঃপর নিকটস্থ এক পানশালায় ঢুকে পড়ল, সেখানে আবুল আতাহিয়া তার প্রতীক্ষার্থী বসে ছিল।

—এসো, এসো। কোথায় ছিলে তুমি?

—হারিয়ে গিয়েছিলাম, আতাহিয়া।

আতাহিয়া : তুমি দেখছি আর এক মেহেরজান।

নওয়াস : না, আবুল আতাহিয়া। সত্যি হারিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিজেকে ঝুঁজে পেয়েছি। এই ঝুঁজে পাওয়ার আনন্দটুকু আজ পান করব। আমার শরাবের প্রয়োজন হবে না।

আতাহিয়া : বেশ, তবে চলো, ওঠা যাক। বগ্নাদের নৈশ স্নোতে অবগাহনের পর আজ ঘরে ফিরব। এসব জায়গা আমার ভাল লাগে না। তোমার জন্যেই শুধু আসা।

নওয়াস : বেশ, তাই চলো।

লোহ গরাদের ওপারে আকাশ।

শুধু কি আকাশ? পৃথিবী নিজের অন্তর্হীন বিস্তার অবীকারের জন্য গগ্নির মধ্যে বিচ্ছার আতসবাজি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এগোয়। থামতে চাইলেও থামতে পারে না। তার শ্রেষ্ঠ সভান মানুষের মধ্যেই, তাই পৃথিবী ভেঙে ভেঙে টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোজার মত। খুঁজে পাওয়ার পর আবার ছড়ানো। ঝর্ণা-উৎসারিত ছ্রাকার জলবিন্দুর উঠানে-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে। তাই গরাদের ওপাশে শুধু আকাশই অস্তিত্বের ইশারা জাগায় না, ধেয়ে আসে চূর্ণিত পৃথিবী, টুকরো-টুকরো রঙ্গীন কাঁচের মত অন্তর্হীন বর্ণসজ্জায়— পলানুপল, দণ্ড-প্রহর, অহনিশ।

গরাদের ওপারে তাই ত মানুষ মাথা কোটে। নিষ্প্রাণ পাথরেও চেতনার প্রলেপ আরোপ করে। মেজে-মেজে হৃদয়কে করে তোলে অমলিন নিদাগ আরুশি। সেখানে অস্ততঃ পৃথিবীর ছায়া পড়ুক।

গরাদের এপার এবং ওপারের দূরত্ব-পার্থক্য মুছে দিতে তাই নবেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। ধারা-বিচ্ছিন্ন উপনন্দী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে। তরঙ্গ-কল্লোল একক শব্দে কখনও মুক্তি পায় না।

ওইখানে হাবসী-মূখের দিকে তাকাও। কোড়াহত্তু ও-মুখ কি অনড় বৈরে অবিকল? না। কৃষ্ণ হাবসীমুখ সফেদ আরমেনী মূখের আদলেকী ভূবে যাচ্ছে না? আরুশির সমতল রূপান্তর ধরে রাখছে না শুধু।

তুমি হয়ত দেখতে পাও না। কারণ তুমি সেই নবেন্দ্রিয়ের অধিকারী নও। তার চেয়ে গরাদের প্রাচীরেই কান পাতো, পাষাণেও চেতনা-প্রবাহ আছে।

অভিশঙ্গ বগ্নাদ এখনও নিদৃশ্যমাহিত। তার ঘূম যেন কেয়ামতের পরও ভাঙবে না।

বগ্নাদের এই সরাইখানার প্রবেশ-পথ খুবই সক্রীয়। মালিক একটা ছোট গালিচার উপর উপবিষ্ট। পিছনে মোটা গের্দা। সামনে রূপার নল-সংযুক্ত হুঁকা। আনমনা ধূমপান করছিল সে।

কিন্তু এই প্রবেশ-পথ পার হয়ে গেলেই সরাইয়ের আসল চেহারা দেখা যায়। শিক্ষিত আলোয় বিরাট হলের মধ্যে নৈশ-বিলাসীরা বসে আছে। কেউ নিঃসঙ্গ। কেউ দল-বাধা। এখানে কফি-শরাবের মজলিশ গুল্জার। কল-গুঞ্জনের বিভিন্ন গ্রাম সমস্ত কক্ষে নিনাদিত। মন্দু ফিসফিসানি থেকে হাহহা— হৈহো রব, সবই এই জায়গায় সাজে। কোনায় কোনায় নর্তকীদের নাচ, মাঝে মাঝে ঘুঁঁতুর ও তাম্বুরীগের আওয়াজের সঙ্গে হঠাতে ঢেউ তুলে যায়; তা আছড়ে পড়ে নানা বিভঙ্গে। কেউ শুধু তাকিয়ে দেখে আবার জামে ঠোঁট নামায়, কেউ তালি-সংযোগে চীৎকার দিয়ে ওঠে, “মারহাবা, মারহাবা।” যেন কেয়ামৎ হঠাতে দেখা

দিয়ে অস্ত পালিয়ে গেল। পৃথিবী আবার আনন্দে নির্বিবাদ।

অন্যান্য দিনের মত আজও সরাইখানা এতক্ষণ শুল্জার ছিল। তারপর আওয়াজের তোড় কমে গেছে। কিন্তু কথার তোড় থামছে না। অবিশ্য লয় মৃদু, খাদ-অভিমুখী।

সরাইখানার মাঝখানে একটি পাথুরে-মাটির ছোট উঁচু চুবুতর। তার উপর এতক্ষণ কয়েক জন বসে বসে কফি পান করছিল। এক জন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলঃ সাবাস, আবু নওয়াস, সাবাস।

তারপর সমস্ত সরাইখানায় ওই একই নাম ঘুরে ঘুরে আসে। আবু নওয়াস। আবু—আবু নওয়াস। আবু নওয়াসের কি হবে?

নতুন কয়েকজন আগন্তুক এসে পড়ল। সরাইয়ের গুহায়। হয়ত এই স্থিতি ভাবের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। সরাইখানায় কি কেউ আসে গৃহোচিত নীরবতা উপভোগে? সকলের তরঙ্গে গা ঢেলে সবাই স্নানার্থী এইখানে। শ্রিয়মাণতা এখানে নিষিদ্ধ, পাপ।

আগন্তুক একজন সরাইয়ের মাঝামাঝি এসে চিংকার দিয়ে উঠলঃ গোটা বগ্দাদ কি আজ মৃত না কোন কেয়ামত খবর পাওয়া গেছে— যার জন্যে সরাইখানা আজ ঠাণ্ডা গোরস্থান?

চারিদিক থেকে চোখ এই চ্যালেঞ্জ-দাতার উপর পড়ল।

প্রথমে অনেকে প্রশ্নটা বুঝতে পারে না। উত্তর-প্রার্থীর উদ্দেশ্য কি? কি জবাব চায় সে?

আবার শোনা গেল কর্কশ কষ্টস্বর, “বগ্দাদ কিম্বত না কেয়ামতের প্রতীক্ষার্থী?”

এইবার কয়েকজন কফির, পেয়ালা ঠোঁট থেকে নামিয়ে নওজোয়ানের দিকে তাকায়। বিরক্ত হয় অনেকে। সরাইয়ের হাওয়া যেন এই তরুণ আগন্তুক বিষয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম কোনা থেকে আর এক যুক্ত দাড়িয়ে জবাব দিলে, “আপনি অন্ততঃ বসে পড়ে প্রমাণ দিন যে, আপনি মরেন নি।”

—কিন্তু বগ্দাদ মরে গেছে

—না।

—তবে এই সুম্মাম ভাব কেন?

—বগ্দাদ তার যৌবনের উৎসব পালন করছে। বগ্দাদের নওরোজ আজ।

—নওরোজ কি এইভাবে পালিত হয়? গোরস্থানের স্তুতায়?

—বগ্দাদ মরে গিয়েছিল। আজ বগ্দাদ বেঁচে উঠেছে। তাই আমার হল্লোড়ে মেতে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে রাজি নই। আপনার ভাল না লাগে অন্য সরাই দেখুন। বগ্দাদে তার অভাব নেই।

—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

—বগ্দাদ দুনিয়ার শয়তানদের কাছে একটা ধাঁধা। আর তুমি এত সহজে বুঝে ফেলবে, নওজোয়ান?

—মেহেরবানী করুন, আপনাদের এই প্রহেলিকা আর সহ্য করতে পারছি নে।

—আজ বগ্দাদ বেঁচে উঠেছে।

—কবে তার মৃত্যু হয়েছিল?

—তার যৌঁজ পান নি, টের পান নি?

—ব্যাপার কি, ভাই?

—আজ বগুড়াদ বেঁচে উঠেছে। আপনি তো জানেন, বুসায়না খুনের ইন্সাফ হচ্ছিল আজ আমিরূল মুমেনীনের দরবারে। আমির-ওমরাহ-কাজী সবাই বললে, হাব্সী তাতারী এই খুন করেছে। খুন কা বদলা খুন। গর্দান নেওয়া হোক হাব্সীর।

তখন সরাইয়ের আর এক কোনায় অন্য দুই নওজোয়ান চিৎকার দিয়ে উঠল, “থামুন—থামুন।” তাদের প্রসারিত করতালু আর আঙুলের দিকে সকলের দৃষ্টি আবার ধাবিত হয়।

“থামুন, থামুন”, রবে দুইজনে এগিয়ে এলো, দুই নওজোয়ান। তারপর তারা বললে, “আজ আমরা দুইজনে দরবারে ছিলাম। সব কথাই মনে আছে। আমাদের একজনকে খলিফা আর একজনকে নওয়াস মনে করলেই আপনারা গোটা দরবার চোখের সামনে দেখতে পাবেন।”

“বেসক-নিচয়-নিচয়,” সমর্থনের রব উঠল চারিদিক থেকে। “এতক্ষণ তো শুনছিলাম, এবার চোখেও দেখতে পাব।” জনান্তিকে একজন প্রস্তাৱ করলে, “চতুরটা ছেড়ে দিন। ওখানে খলিফা বসুন। আর নওয়াস নিচে দাঁড়াক। সকলের দেখতে সুবিধা হবে।”

—নিচয়, নিচয়।

প্রস্তাৱ-মত মণ্ডল সজ্জিত হতে আর বেশি বিলম্ব ঘটে না। তারপরই সরাই দরবারে পরিণত হয়। আগম্বন্তক দুইজন তখন অভিনেতা।

নওয়াস : জাহাপনা—

আমিরূল : কি নওয়াস?

নওয়াস : জাহাপনা, বান্দার গোলামুখ মাফ করবেন। বুসায়না-হত্যার বিচার আমি এতক্ষণ নিজের চোখে দেখলাম। কিন্তু এতে খুনের কোন প্রমাণ হয় না।

আমিরূল : প্রমাণ হয় না?

নওয়াস : না। এক জনের জান্ম ‘হালাক’ (ধ্রংস) করার আগে সমস্ত নিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া উচিত। কারণ, আমরা কেউ জানের মালিক নই। প্রাণ-ধ্রংস সহজ, সৃষ্টি অনেক কঠিন কাজ।

আমিরূল : তুমি কি বলতে চাও?

নওয়াস : এই বিচার ভুল, আলস্পানা।

আমিরূল : কেন ভুল?

নওয়াস : প্রমাণ নেই। কেউ চোখে দেখে নি।

আমিরূল : সব সময় চোখে দেখার প্রয়োজন হয় না। সাক্ষীসাবুদ এবং ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

নওয়াস : বিচারের ক্ষেত্রে আন্দাজের কোন জায়গা নেই।

আমিরূল : বুসায়না কি খামাখা মারা গেল?

নওয়াস : খামাখা না, আলস্পানা। কিন্তু হাব্সী জওয়ান তাকে খুন করে নি। আর এতো খোদুকসী— আঘাত্যার ব্যাপার।

আমিরূল : কিন্তু গোলাম নিজের সাফায়ে একটা কথা পর্যন্ত বললে না, মুখ খুললে

- নওয়াস : না। তা কি অভিযোগ শীকার নয়?
- নওয়াস : না জাঁহাপনা। আর শীকার করলেও ক্ষেত্র অনুযায়ী অনেক সময় খুন শীকারকারীর উপর বর্তায় না। বেটার হত্যাপরাধ অনেক সময় কি পিতা নিজের কাঁধে তুলে নেয় না?
- আমিরুল : কিন্তু এই গোলাম সব কিছু করতে পারে।
- নওয়াস : না, জিল্লাহাহ। ও কালো গোলাম কালো পাথর। স্তুর্দ্র। কালো পাথর কোনদিন নকল হয় না। সাদা আর ঝলমলে পাথরই সহজে নকল করা যায়।
- আমিরুল : আবু নওয়াস, তুমি কি বলতে চাও, আমার বিচার ভুল?
- নওয়াস : হ্যা, আলস্পানা।
- আমিরুল : ভুল? আবু নওয়াস, তোমার জিভ সামলাও।
- নওয়াস : জাঁহাপনা, ভুলকে ভুল বলা কবিদের ধর্ম। আমরা শুধু সুন্দরের পৃজারী-ই নই।
- আমিরুল : আমি ভুল বিচার করি?
- নওয়াস : জিল্লাহাহ, ইন্সান ভুল করে বসে বৈকি। আমরা জানি, আমিরুল মুমেনীন ফেরেশতা নন।
- আমিরুল : নওয়াস, চুপ—চুপ! তোমার বেয়াদবি আমি ক্ষমা করব না।
- নওয়াস : জাঁহাপনা, আলহাঙ্কো মোরুরুন—সুন্ত তিক্ত পদার্থ, তা আপনি জানেন।
- আমিরুল : আবু নওয়াস, তুমি হৃদ ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমার কাজী-আমির-ওমরা—এত লোক, যারা প্রতিদিন বিচার করে তারা ত বিচারে কোন ভুল দেখল না।
- নওয়াস : জাঁহাপনা, তারা যখন আক্ষণ্যার চোখ দিয়েই দেখে, তখন নিজেদের চোখ ব্যবহার করে না। আমরা যখন নিজেদের চোখও দেখার কাজে লাগায়, তখন আপনার চোখের বিলিক তারা আগেই দেখে নেয়।
- আমিরুল : উপস্থিত এত শরীফ মানুষদের তুমি বেইজ্জৎ করছ, আবু নওয়াস।
- নওয়াস : না জাঁহাপনা। নওয়াস মদ্যপ। মাতালেরা দুনিয়ার কারো উপর শক্রতা করে না— এক নিজের উপর ছাড়া। কাউকে বেইজ্জৎ করা আমার খস্লতের বাইরে।
- আমিরুল : অর্থাৎ আমার ইন্সাফ ভুল।
- নওয়াস : হ্যা, আলস্পানা।
- আমিরুল : খামুস্, নওয়াস। তোমার বুকের পাটা আল্লার জমিন ছাপিয়ে যাচ্ছে। বেয়াদব ইন্সানকে আমি মাফ করি না। তোমাকেও মাফ করব না। শুধু এক শর্তে, তুমি ক্ষমা পেতে পারো— এই উপস্থিত শরীফ ব্যক্তিদের কাছে যদি মাফ চাও। নচেৎ—
- নওয়াস : নওয়াস আপনার দরবারে কোন শুনা করে নি, জাঁহাপনা।
- আমিরুল : তুমি মাফ চাও।
- নওয়াস : বে-কসুর নিরপরাধ কিভাবে ক্ষমা চাইবে?
- আমিরুল : মাফ চাও।

- নওয়াস : আপনি আমাকে এই কাজ থেকে মাফ করুন।
- আমিরুল : নওয়াস, তুমি বেয়াদব নও শুধু। না-ফরমান। গোলামের সঙ্গে তোমারও গর্দান ধূলায় লুটিয়ে পড়ুক—। মশ্রুর—
- নওয়াস : জাঁহাপনা, আপনার যা মরজী। কিন্তু জাঁহাপনা মনে রাখবেন, আপনার সাধের বগ্নাদকে ঝংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আজ আমি আমার গর্দান বাড়িয়ে দিলাম— কারণ এই বগ্নাদকে আমি ভালবাসি, আমার জন্মতৃষ্ণি বগ্নাদ। ভবিষ্যতের একটি মানুষ অস্ততৎ বলবে, বগ্নাদ অবিচারের কাছে মাথা নোয়ায় নি। জাঁহাপনা—
- আমিরুল : মশ্রুর একে আজ কয়েদখানায় রাখো, কাল দরবারে আবার নতুন বিচার হবে এই না-ফরমান, অবাধ্য কবির।
- নওয়াস : জাঁহাপনা, একটা কথা বলবার দাবি জানাচ্ছি। বগ্নাদকে আপনি যেমন ভালবাসেন, তেমনি আমিও ভালবাসি। কিন্তু আপনার বগ্নাদের কোন ঐশ্বর্যই টিকবে না। ঢিকে থাকবে শুধু বগ্নাদের বিবেক এবং বিবেক-সাধনা। ও কেউ ঝংস করতে পারে না। ঝংসস্তুপের নিচে পড়ে থাকলেও ওর কষ্টমনি অনাগত মানুষ শুনবে— তারা বগ্নাদকে বাঁচিয়ে তুলবে। তাই আজ অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালুম। যে-বীজ আপনি রোপণ করেছেন, তাই একদিন বগ্নাদকে গ্রাস করবে। তাই আবু নওয়াস আজ কবন্ধ সাজল। নিজের হাতে নিজের গর্দানকে গেনুস্যার মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে যেন বগ্নাদের বিবেক আবার চীৎকার দিয়ে উঠতে পারে, “আমি কবি, চিরস্তনের কষ্টস্বর! মশ্রুরের তলওয়ার, আমিরুল মুমেনীনের জুকুটি-দণ্ড কবির হল্কুমের (গ্রীবা) নিকটে পৌছাতে পারেন্মা। বগ্নাদের প্রেম আমাকে বানিয়েছে কবি, বগ্নাদের প্রেম আমাকে করে তোলে শহীদ। কবিরা নিত্যকার শহীদ— কারণ, জীবনকে সব সময় তারা পিছনে ফেলে চলে। জীবন থেকে জীবনাত্ম। কবিরা তাই মাত্র একটি বার পুনরুজ্জীবনের স্বর্গলোভী শহীদ নয়। তারা বাঁচে, আবার শহীদ হয়; শহীদ হয়, আবার বেঁচে ওঠে। জীবন-মৃত্যুর সাময়িক ফারাকে তাই তারা বিহ্বল হয় না, শক্তাত্মসে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে না। কবিমাত্রই রক্তবীজ, বিবেকের নিষ্কাম সাধক। চলো মশ্রুর। নিয়ে চলো। তোমার তলওয়ারের ধার এতদিন কোন মানুষ স্পর্শ করে নি। এবার অস্ততৎ সে কলক থেকে রেহাই পাবে। আদাব, আমিরুল মুমেনীন।”

“আরো বললাম, মশ্রুরের সঙ্গে যেতে যেতে”— হঠাৎ সরাইখানার আর এক কোনায় দেখা গেল, এতক্ষণ ভিড়ে দণ্ডয়ামান এক ব্যক্তি প্রথম বজার বাক্য সমাপ্তি-মাত্র কথা বলতে বলতে অঘসর হচ্ছে। ভিড় ঠেলে এগোয় সে। মুখে কথা, “বললাম, বগ্নাদের নর-নারীর কান্নায় আমি কাঁদি, তাদের আনন্দে আমি হাসি— তারাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তারাই আমার কবিতুকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের জীবনযাত্রার ধারাই আমার রসের উৎস। মশ্রুর আমার কোন দুঃখ নেই। বগ্নাদের বাসিন্দা আমার ভীরুক বুকে সাহস যোগায়। তাদের কথা আমার ঘুমন্ত কথাকে জাগিয়ে তোলে। তাই মৃত্যুতে

আমার দুঃখ নেই। কারণ, বগ্দাদের বঙ্গুগণ—।”

বজ্ঞা ততক্ষণে অভিমেতা-নওয়াসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সকলে আনন্দে চীৎকার দিয়ে ওঠে, “আবু নওয়াস, আবু নওয়াস।”

“বগ্দাদের বঙ্গুগণ, তোমাদের ভালবাসায়, তোমাদের কবি আবার তোমাদের মাঝখানে ফিরে এসেছে। আমিরুল মুমেনীন পরে নিভৃতে মশূরকে আমার সামনে বললেন, “একজন নিরীহ কবিকে খুন করে— বগ্দাদবাসীদের আমি কি জবাব দেব? তাই বঙ্গুগণ, তোমাদের নিকট, তোমাদের নিঃশ্বাসের উত্তাপে চাঙা আবু নওয়াস ইথানে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর পর ফেরেশ্তা যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি বগ্দাদে না বেহেশ্তে যেতে চাও? আমি জবাব দেব, বগ্দাদে।”

“আহ্লান্ সাহ্লান ইয়া আবু নওয়াস, স্বাগতম, হে আবু নওয়াস”। চারিদিক থেকে রব ওঠে।

“কিন্তু, বঙ্গুগণ, সরাইখানা নীরব কেন? জল্লাদের হাতে যদি আমার গর্দান যেতো, তোমরা কি সরাইখানা জমিয়ে তুলতে না? একটি মানুষের মৃত্যু এভাবে দেখা উচিত নয়। আমি ত জীবনের কবি। তোমাদের স্তুতি দেখলেই আমার আঢ়া বিষণ্ণ হয়ে পড়ত। আকাশের কোন নক্ষত্র থসে গেলে কি অন্যান্য তারা নিজের কর্তব্য তুলে যায়? রবং সেই শূন্য জায়গা পূরণে এগিয়ে আসে নব উজ্জ্বলতায়।— এসো, সরাইখানা আমরা আজ ভর-পেয়ালা করে তুলি। নতুন গজল শোনাব আমি। আনন্দ কর, বগ্দাদবাসী। মওজ-তরঙ্গ তোলো অঙ্গ-সমন্দৃ, চিন্ত অরণ্যে, রূবাব পাহুংপঞ্চমে—”

সুরে, সুরায়, নৃত্য চতুর্জ্জলতায়, স্বর-মুভির প্রিছন্দতায় সরাইখানায় আবার বন্যা ডাকল। উচ্চ চতুরে উপবিষ্ট নওয়াস।

আনন্দস্ন্মোত নানা দিক থেকে ভেই খানে আছড়ে পড়ছে।

নওয়াসের সম্মুখে পানপাত্র।

কিন্তু তার দুই চোখ বিবাগী। এই প্রাণ-প্রবাহে কি যেন বার বার ঝুঁজতে লাগল।

২০

আমিরুল মুমেনীনের মহল।

নিশ্চীথ রাত্রি।

—কে?

—মশূর, জাহাপনা।

—গোলামকে এনেছো?

—হাঁ, জাহাপনা।

—ওকে পৌছে দিয়ে, তুমি বাইরে যাও। ওর সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।

—আস্মামায়ো তায়াতান।

(শৃঙ্খলাবন্ধ তাতারীর প্রবেশ। সমস্ত শরীর কোঢ়াঘাতে জর্জর। দেহ প্রায় ত্বকহীন। কপালে, গওদেশে দগ্ধদগে ঘা) তাতারী, জানি, তুমি আমার

- কথার জবাব দেবে না । কিন্তু আজ খলিফারপে আমি তোমাকে ডাকি নি ।
- তাতারী** : [কষ্টে ঘড়ঘড় শব্দ । শ্বাস-কষ্ট ।]
- হারুন** : আজ তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বঙ্গু-রূপে তোমাকে এইখানে ডেকে এনেছি । তুমি দেখছো, বাইরের বাতাসের কত দাম । আমি তোমার সমস্ত মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত । আমাকে ভুল বুঝো না ।
- তাতারী** : [খলিফার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল । কিন্তু চোখ স্ফীত । ফলে তাকানো কষ্টকর ।]
- হারুন** : তুমি একটিবার হাসো । তা-হোলে তুমি যা চাও, তাই পাবে । আমার সুদক্ষ হেকিম রয়েছে, তারা শরীর সাত দিনে আবার পূর্বের মত চাঙ্গা করে তুলবে । তোমার একটা হাসি শুধু প্রয়োজন । জবাব দাও ।
- তাতারী** : [নিরুৎসুর]
- হারুন** : আবু নওয়াসের কাছে আমি অপদস্থ । তুমি নাকি আর কোনদিন হাসবেই না । কিন্তু কেন? কেন তুমি জীবনের পেয়ালা এমনভাবে পায়ে ঠেলে দিচ্ছ? তুমি নওজোয়ান । জীবনের সমস্ত সড়ক তোমার জন্য দু'পাশে ফল-ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে । আর তুমি নিজের দুই চোখ যেন অঙ্ক করে দিয়েছ । কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখো নি । কেন? এই নিশ্চিথ রাত্রি, কেউ শুনবে না । তুমি শুধু জবাব দাও, আমি পাক ক্রেস্টান ছুঁয়ে কসম করছি— তোমার নালিশের ভিত্তি আমি উপড়ে ফেলাতে চেষ্টা পাব । তস্বী হাতে কস্বীর মত আমাকে ভও মনে করো না । আমার কসমের দাম আছে ।... তবুও তুমি নিরুৎসুর! কি চাও তুমি? একটা গোলামের যা কাম্য, তার চেয়ে তের চের বেশী, অনেক কিছু তৃষ্ণাকে দিয়েছিলুম, তুমি নিলে না । এত জুলুম সহ্য করছ, অথচ তোমার কথা যেখানে কাজে পরিণত হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে... সেই সুযোগ তুমি নিছ না । আমি নিজে ভেবে পাই নে । তোমরা কি আর কোন ধাতৃতে গড়া? একটা জবাব দাও...[পায়চারী রত] একটা জবাব... একটা হাসি... আচ্ছা, হাসি জাহানামে যাক, একটা জবাব দাও । আমি তোমার সব অপরাধ মাফ করে দেব । যা চাও তাই পাবে । সময় দিলুম... বুবোছি, তুমি ... নির্বাক থাকবে, হাসবে না ... বেশ । যাও । তোমাকে তিন দিনের মেয়াদ দিলুম । শুধু একটি হাসি হেসে তুমি জীবনের সবকিছু অধিকার ফিরে পেতে পারো । নচেৎ আরো শাস্তি— হ্যাঁ, শাস্তি— যা কোনদিন তুমি কল্পনাও করো নি । তোমাকে ভেবে দেখার সময় দিলুম ।..
- (হাতাতলি প্রদান) মশ্রুর—
- মশ্রুর** : জাহাপনা!
- হারুন** : মশ্রুর, গোলামকে নিয়ে যাও ।
- মশ্রুর** : আসসামায়ো তায়াতান ।
- হারুন** : মশ্রুর,— না থাক, আর একদিন বলব ।
[সকলের প্রস্থান]

নহরে জুবায়দার তীর। বিকাল বেলা। খর্জুরবীথির পাশে একটা টিলার উপর আতাহিয়া ও আবু নওয়াস উপবিষ্ঠ।

আতাহিয়া : নহরে বাতাসের দোলা লাগছে, দ্যাখো দ্যাখো, নওয়াস।

নওয়াস : নারীর মেহ পানি-রূপে এখানে বিগলিত হয়ে থারে পড়ছে, আতাহিয়া।
আহ, মানবের প্রেম-মমতা যদি এমনই রূপ পেতো!

আতাহিয়া : কিন্তু তুমি দিন দিন এমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছ, আমার আর ভাল লাগছে না, আবু নওয়াস। তুমি আর উচ্ছলিত ঝর্ণা নও।

নওয়াস : আতাহিয়া, সাহারা মরুর অনেক নিচে পৃথিবীর বুক যে-পানি সঞ্চিত রেখেছে— তা কি শাস্তি, অনুচ্ছল?

আতাহিয়া : তা নয়।

নওয়াস : মাঝে মাঝে উপরে সব শুকিয়ে ফেলতে হয়, ভেতরে সরস তাজা থাকার জন্য।

আতাহিয়া : কিন্তু আমি তোমার শুক্রতা সইতে পারি নে। উপরিভাগ শুকিয়ে ফেলতে যে অনেক কষ্ট, নওয়াস।

নওয়াস : তা ত হবেই। সকলের কথা তোমাকে মুখ দিয়ে বলার ভার যে নিয়েছ, বস্তু। তোমার একার বোৰা ত হালকা। কিন্তু শত-সহস্রের বোৰা যখন তোমার কষ্টে চাপে— তখনকে চায় শুকিয়ে সাহারা হতে? কিন্তু প্রাণধারা সঞ্জীবনের জন্য এই বিশুষ্ণুতাই মাঝে মাঝে বেছে নিতে হয়।

আতাহিয়া : চলো, কোন সরাইখনায় যাই।

নওয়াস : আমি এখন সরাইখনার দর্শক, শরীকদার নই।

আতাহিয়া : তুমি চলো।

নওয়াস : দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে মেলাতে হয় তবেই জীবনের শতদল ফোটে। চলো।

আতাহিয়া : কিন্তু চুপ করে যেয়ো না। তোমার কথাই ত আমি শুনতে চাই।

নওয়াস : তা হলে এই বুকে কান পাতো, মুখের দিকে তাকিয়ো না।

আতাহিয়া : যথাদেশ। তা-ই শুনব বস্তু। চলো, তার আগে কোন পানশালার ওতে আড়াল হয়ে নিই।

নওয়াস : চলো।

সময়, গোধুলি বেলা। স্থান, কারাগারের চতুর। হারুনর রশীদ, মশুররের প্রবেশ। চতুরের পাশে দণ্ডয়মান তাতারী ও কোড়াদার। তাতারীর হাতে-পায়ে জিঙ্গির। কোড়াদারের হাতে

চাবুক। চতুরের দুই ভাগ। একদিক উঁচু। অন্যদিক কয়েদীর অবস্থানভূমি। সেদিকটা নিচু।

হারুন : তাতারী, তিনি দিনের জায়গায় তিনি বৎসর কেটে গেল। তোমার জীবনের মেয়াদ বহু দিনদিন বাড়িয়ে দিয়েছি। আজ কিন্তু আমি বোঝাপড়া করতে চাই। বাজি ধরে, বস্তুদের কাছে আমি হেরেছি। কিন্তু আর না...। তোমাকে আমি শেষ সুযোগ দিতে চাই। জবাব দাও...

[তাতারীর দিকে তাকাল। সে নিচল পাথরের মত দশায়মান। সমস্ত শরীরে চামড়া নেই বললেই চলে। অবয়ব কিন্তু পূর্বের মতই আছে। নির্যাতনে তা ক্ষয়ে যায় নি। তাতারী অবশ্য পৃথিবীকে আর সম্পূর্ণ দেখে না। দুই ক্ষীতি ভুরু চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। চাবুকের আঘাত-ফল।]

জবাব দাও... আবু নওয়াস বলেছিল, তুমি কালো পাথর। সত্যই তুমি কালো পাথর। তোমার শরীর কি ফুলাদের মত ইস্পাতে গড়া? চাবুকের ঘায়ে তুমি নাকি আর্তনাদ পর্যন্ত করো না। সত্যি কোড়াদার?

কোড়াদার : জাঁহাপনা, বহুদিন আপনার নেমক খেয়েছি। কিন্তু এমন হিমাকাণ্ডয়ালা কয়েদী আমি কোনদিন দেবি নি। পিটে পিটে ওকে দুরস্ত করলেও, ও শব্দ করে না, আওয়াজ তোলে না।

হারুন : কি করে?

কোড়াদার : দেখবেন, আলস্পানা?

হারুন : হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত এসেছি।

কোড়াদার : তবে দেখুন—

[কোড়া চালায়। অব্যক্ত ফুর্ণায় তাতারী শুধু দক্ষ অভিনেতার মত মুখমণ্ডল বিকৃত করে, আর হাঁপায়।]

হারুন : খামুস, কোড়াদার! আর কি করে?

কোড়াদার : জাঁহাপনা বেহুশ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও গোঙায় না, আর্তনাদ করে না। জনাব, এ কয়েদী ইন্সান নয়। জীন, দেও বা পাথর।

হারুন : যা কোড়াদার, তুই বাইরে যা। কোড়া মশুররের হাতে দে। যে হাতে মশুরর তলওয়ার চালায়, সেই হাতে আজ কোড়া চালাবে।

কোড়াদার : জো হজুর, জাঁহাপনা।

[মশুররের হাতে কোড়া-প্রদান এবং প্রস্থান।]

মশুর : আলস্পানা, কয়েদীর সমস্ত শরীর থেকে প্রায় খুন ঝরছে, ওর উপর আর কোড় চালানো বৃথা। বেহুশ হয়ে যাবে। আর কথা বলা চলবে না— যে জন্যে আপনার এখানে আগমন।

হারুন : বেশ, কোড়া ফেলে দাও। তবে রাখো, দরকার হোতে পারে।— তাতারী, মনে রেখো আজ তোমার কেয়ামৎ। আজরাইলও (যমদৃত) আজ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। জবাব দাও— জবাব দাও। বেতমীজে গোলাম তবু স্থির নিচল দাঢ়িয়ে রইল। মশুর এই বেতমীজের জিভ টেনে ছেঁড়ার আয়োজন করতে হয়।

- মশ্রুর : তা হোলে কি কথা-বলা সহজ হবে, জাঁহাপনা?
- হারুন : হঁ, মশ্রুর, সেও এক সমস্যা। ইন্সামের সঙ্গে লড়া যায় কিন্তু এ ত পাথর—(পায়চারী-রত) গোলাম, তোমাকে শেষ সুযোগ দিলাম। নচেৎ— তারপর মশ্রুর তার কাজ শুরু করবে... জবাব দাও... (তাতারী নির্বিকার। শারীরিক যন্ত্রণায় শুধু মুখ কুঁচকে নিঃশ্বাস নেয় আর ফেলে) না, মশ্রুর—
বৃথা কালক্ষেপ।
- [হাততালি দিল। দুই জন প্রহরীর প্রবেশ]
- প্রহরী : জাঁহাপনা।
- হারুন : ওই কামরায় একজন জানানা অপেক্ষা করছে, তাকে নিয়ে আয়।
- প্রহরীদ্বয় : আস্সামায়ো তায়াতান।

(প্রস্থান)

- হারুন : (অঙ্গুলি নির্দেশ) এক আজব সমস্যা।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, সমস্যা জীইয়ে রেখে লাভ কি? আপনি শুধু হকুম দিন।
- হারুন : মশ্রুর, তার জন্য এত ব্যক্তি কেন? আমি ভাবছি—
- মশ্রুর : আলস্পানা, কি ভাবছেন?
- হারুন : ভাবছি, এত দৈহিক যন্ত্রণা এরা সহ্য করে কিভাবে?
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, আবু নওয়াস বলে— মানুষ আনন্দাতীত আরো কিছু পায়, যার কাছে এই যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা মধ্যে হয় না।
- হারুন : আনন্দাতীত— ও একটা পার্শ্বের প্রলাপ। আবু নওয়াসই তা বলতে পারে।
- মশ্রুর : আমি কিন্তু এই কয়েদীকে দেখে তা প্রায় বিশ্বাস করতে বসেছি।
- হারুন : তুমিও বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছে।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, অথবা এরা বোধ হয় মানুষ নয় অথবা মানুষ যা দিয়ে তৈরি এদের উপাদান তার চেয়ে আলাদা।
- হারুন : তোমার পাগল হতে বেশি দেরী নেই। এই দ্যাখো...
[এতক্ষণ তাতারী দাঁড়াইয়াছিল। শরীরে বোধ হয় অব্যক্ত যন্ত্রণা, তাই ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। জায়গাটা বালুময়। হতব্যক্তির রক্ত পরিষ্কারের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা। তাতারী বসিয়া পড়িল। তারপর দুই গোড়ালি চাপিয়া ধরিয়া মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে শুঁজিয়া দিল। সবই নিঃশব্দে ঘটে।]
- মশ্রুর : জাঁহাপনা—
- হারুন : আস্তে আস্তে, মশ্রুর।
[দুই জন ফিস্ফিস কর্তৃ কথা বলে।
আস্তে, একটু বিশ্রাম নিক্।
- মশ্রুর : ওর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।
- হারুন : আছে। একটু তেজ সম্পত্তি করে নিক্।
- মশ্রুর : জাঁহাপনা, তেজের উৎস আনন্দ। ওর তেজ হ্যাত সেই এক জায়গা থেকেই আসে।

- হারুন : মশ্কুর। তুমি বড় বাজে বকো। শুধু দেখো, দেখো। ওর তেজের সব
পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আজ। এই গোলাম—
[কথার ছেদ পড়ে। মেহেরজানের প্রবেশ। পরনে রেশমি লেবাস। ঘোবন
সর্বাঙ্গে ক্ষমাপ্রাপ্তীর মতো লুটাইয়া পড়িতেছে। চোখেমুখে হাসির খিলিক
ছাপাইয়া ওঠে। আঙ্গ-রমণীর মতো চলাফেরা।]
- মেহেরজান : জাহাপনা, কোথায় আপনার তামাশা? আমি—
- হারুন : [হঠাতে পেছন ফিরে] ধীরে, আস্তে—
[এবার সকলে খুব নিচু গলায় সংলাপ-রত]
- মেহেরজান : বচ্ছ আচ্ছা। কিন্তু আপনার তামাশা কোথায়? আমি ত কোতোয়ালের
মাকানে বসে বসে হয়রান। শেষে আপনার ডাক যে পড়ল, তার জন্য
শুক্রিয়া, ধন্যবাদ—
- হারুন : তামাশা নিশ্চয় দেখবে।
- মেহেরজান : কিন্তু কোথায়?
- হারুন : আছে, বেগম সাহেবা।
- মেহেরজান : কিন্তু কই?
- হারুন : [উপবিষ্ট তাতারীর দিকে নির্দেশ] ওই—
- মেহেরজান : ও কে?
- হারুন : একটা নাফরমান, অবাধ্য কয়েদী। আমার কথার কোন ইজ্জৎ রাখে না।
- মেহেরজান : ওর গর্দান দু-টুকরা করেন। ওর অপরাধ কি?
- হারুন : তার শুমার নেই।
- মেহেরজান : তবু—
- হারুন : আমার অবাধ্য গোলাম।
- মেহেরজান : চাবুক লাগান।
- হারুন : তা-ই লাগিয়ে লাগিয়ে ত শরীরের ওই দশা।
- মেহেরজান : বেশ করেছেন। কিন্তু গোলামটা কে?
- হারুন : বলছি, সব বলব তোমাকে।
- মেহেরজান : কে এই গোলাম, মশ্কুর?
- হারুন : মশ্কুর ওর নাম জানে না।
- মেহেরজান : তা মশ্কুর নিজের মুখেই বললে পারে। গোলামটা কে?
- হারুন : তুমি এগিয়ে গিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা কর না।
- মেহেরজান : বেশ।
- [অগ্সর হইয়া চতুরের কিনারায় আসে, তারপর বেশ জোরেই ডাক দেয়।
এরপর স্বাভাবিক কষ্টে সব সংলাপ]
- কে— তুমি কে?
[হাঁটুর মধ্যে মুখ গৌজা তাতারী প্রথম 'ক' শব্দে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত মাথা
কোলে। তারপর ধীরে ধীরে মেহেরজানের দিকে দৃষ্টি-নিবন্ধ রাখিয়া খাড়া

হয় ।]

তুমি কে?

[তাতারী উদ্ভান্তের মত জিঞ্জির-বাঁধা দুই হাত তোলার চেষ্টা করে] কে তুমি?

[কোন জবাব আসে না । পেছনে ফেরে মেহেরজান] কে এই গোলাম, আমিরুল মুমেনীন?

হারুন : তুমিই জিজ্ঞেস কর, জবাব নাও ।

মেহেরজান : (মুখ ফিরাইয়া) তুমি কে? জবাব দাও । জবাব দিচ্ছ না কেন? (আবার খলিফার দিকে) কে এই গোলাম, জাহাপনা? ও জবাব দিচ্ছ না ।

হারুন : জবাব আদায় কর ।

মেহেরজান : তুমি কে?

[তাতারী নিরুপ্তর]

হারুন : এ-কে চেনো না?

মেহেরজান : না ।

হারুন : মশ্রুর, হাহ হা, মশ্রুর ।

[হাসিতে লাগিল । বাধা]

মেহেরজান : হাসি বন্ধ করুন আমিরুল মুমেনীন, কে এই গোলাম?

হারুন : তুমি এ-কে চেনো না?

মেহেরজান : দুনিয়ার তামাম মানুষ কি আন্তর জানা যে এ-কে চিন্ব?

হারুন : হাহহা ।... জিজ্ঞেস কর ও তোমাকে চেনে কি না ।

মেহেরজান : জাহাপনা, কয়েদখানার এই অঙ্ককারে এই বুঝি আপনার তামাশা? আমি বাইরে চললাম ।

হারুন : তা যাও । কিন্তু তার জন্যে সারাজীবন আফসোস করতে হবে ।

মেহেরজান : কেন?

হারুন : তুমি ওকে চেনো ।

মেহেরজান : চিনি?

হারুন : হঁ । ওই কোকড়া-কঠিন চুলের দিকে তাকাও । গায়ের চামড়া তো আর কালো নেই । চুল ঠিক আছে ।

মেহেরজান : তুমি কে কয়েদী? জবাব দাও ।

হারুন : হাহ হা । চার বছর ধরে আমরা জবাব পাই নি, আর তুমি । এই কয়েক লক্ষ্যায় উত্তর পাবে!

মেহেরজান : কিন্তু এ কে? আমি চিনতে পারছি নে, জাহাপনা ।

হারুন : হাহ হা । চিনতে পারলে না? গোলাম তাতারীকে আজ চিন্তে পারলে না, মেহেরজান?

মেহেরজান : তাতারী... তাতারী... কিন্তু তাতারীর এই দশা কেন?

হারুন : নাফরযান অবাধ্য । তাই—

- মেহেরজান : নাফরমান। কি ওর অপরাধ?
- হারুন : মুখের কথা বঙ্গ করেছে। ওকে কি না দিয়েছিলুম। বাগবাগিচা তয়খানা, বাঁদী গোলাম ইমারৎ—সব ইন্কার ঘূণা করলে। বঙ্গ করলে মুখের কথা। তাই চার বছর ধরে, তিলে তিলে শায়েস্তা হচ্ছে—
- মেহেরজান : ইন্কার করলে?
- হারুন : হ্যা।
- মেহেরজান : ইন্কার করলে [একটু অগ্রসর হয়, পরে পেছনে ফিরিয়া]... জাহাপনা, যে নাফরমান তাকে কতল করেন নি কেন?
- হারুন : হিমাকতের শাস্তি দেব বলে।
- মেহেরজান : সে শাস্তি ত অনেক পেয়েছে। আজ এখনই ওকে কতল করুন। হ্রকুম দিন, মশ্রুরকে।
- হারুন : তা তোমার পরামর্শ হবে না, মেহেরজান। আজো ও কথা বলুক, ওর সব অপরাধ আমি মাফ করে দেব।
- মেহেরজান : তাতারী, কথা বল, জবাব দাও। খোদ আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন। কথা বল। তোমার সমস্ত শরীর জখমে-খুনে জারেজার। এই জর্জর দেহের যন্ত্রণা আর কেন সহ্য করবে? কথা বল।
 (তাতারী নিরুত্তর)
- হারুন : হাহ হা। জবাব আদায় কর, মেহেরজান।
- মেহেরজান : তাতারী, খোদার ওয়াস্তে—একবার কথা বলা। বল... [হারুনুর রশীদ হাসিতে লাগিলেন। হাসি প্রাপ্তিলে] জাহাপনা, ওকে কতল করুন। ওর এই কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। হ্রকুম দিন মশ্রুরকে।
- হারুন : না, মেহেরজান। কতল আমি ওকে করব না। জীবনকে যে পাশার ঘূটি বানাতে পারে এত সহজে, তাকে হত্যা করব না। তিলে তিলে দক্ষে দক্ষে—
- মেহেরজান : না, জাহাপনা, এত নিষ্ঠুর হবেন না। দয়া করুন।—
 [নতজানু]
 আমি আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইছি, ওকে কতল করুন।
- হারুন : না, না— তা হবে না।
- মেহেরজান : হবে না?
- হারুন : না।
- মেহেরজান : (উদ্ব্লাঙ্গ) হবে না... [তাতারীর দিকে অগ্রসর] কথা বল, তাতারী। তুমি এমন নির্বোধ কেন? স্বপ্নভাগার পর স্বপ্নে-দেখা ধন-দৌলত হারানোর শোকে কেউ কোনদিন কাঁদে নাকি— এক নির্বোধ ছাড়া। নিজেকে কেন এইভাবে চুরমার করে ফেলছ? কথা বল। আমিরুল মুমেনীন ওয়াদা করেছেন... কথা বলো... আমি তোমার দিকে চেয়ে রইলাম, কান পেতে রইলাম...
 [তাতারী নিরুত্তর। খলিফা হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামার পর, মেহেরজান

ধীরে ধীরে অগ্সর হয়, একদম তাতারীর কাছে বালুভূমির উপর] কথা
বলো, আমি অনুরোধ করছি। কথা বলো....
তুমি যা বলতে, তুমি কি এত যন্ত্রণা বুকে আজও তাই মনে রেখেছ। তুমি
বলতে, “মেহেরজান, গোলামের মহর্বৎ আর এক আলাদা চিজ। তা
আমির-ওমরার মহর্বৎ নয়। তারা দৌলতের কদর বোঝে। আর দৌলতের
বড় শুণ হল বিনিময় আর হাতফেরী হওয়া। হস্তান্তর ছাড়া তার শুণ প্রকাশ
পায় না। আমির-ওমরার মহর্বৎ এই হাতফেরীর মহর্বৎ। গোলামের
প্রেম ক্রুবতারার মত স্থির— আকাশের একটি প্রান্তে একাকী মৌন—
অবিচল— (রোকন্দ্যমান) তুমি তেমনই অবিচল আছ। কিন্তু আমি... আমি
ত বিনিময়ের ভাঁটিতে সিদ্ধ হয়ে গেলাম। আর বাস্তী খাক্লাম না।
কোড়াঘাতের এত ব্যথা বয়েছ, এস মুছিয়ে দিই মুছিয়ে নিই—

[মেহেরজান হস্ত প্রসার মাত্র]

- হারুন : শান্তী শান্তী—
[দুই প্রহরীর প্রবেশ]
শান্তী, যা এই বিবি সাহেবকে বাইরে নিয়ে যা।
মেহেরজান : [আর্তস্বর] না, না।
হারুন : সরম করিস নে, প্রহরী। দুইজনে দুই হাত ধর।
[তথাকরণ, টানিতে অগ্সর]
মেহেরজান : [পচাতে মুখ] তোমার যন্ত্রণা মুছে নিতে পারলাম না, তোমার নির্মল দেহ
স্পর্শের যোগ্যতা আমাকে নেই ... নাই বা স্পর্শ করলাম এই কলঙ্কিত
হাতে [চীৎকার] তাত্ত্বারী— তাতারী—
[কারাগার হইতে অপস্থয়মান মুখ, শেষবার মেহেরজান ডাকে : তাতারী]
তাতারী : (সেই দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ) মেহেরজান, মেহেরজান (তারপরই) শোন, হারুন
রশীদ—
হারুন : বেতমীজ, জাহাপনা বল।
মশ্রুর : বেয়াদব। বল আমিরুল মুমেনীন।
তাতারী : শোন, হারুনর রশীদ—
হারুন : কোড়াদার মশ্রুর, মশ্রুর, কোড়া চালাও। বেয়াদব, বেয়াদব—
[কোড়া চালাইতে থাকে সেই অবস্থায়]
তাতারী : শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা
চলে। বাস্তী কেনা সম্ভব—। কিন্তু— কিন্তু— ক্রীতদাসের হাসি— না—
না— না— না—
[পতন ও মৃত্যু, বেগে আবু নওয়াসের প্রবেশ]
নওয়াস : আমিরুল মুমেনীন, হাসি মানুষের আঢ়ারাই প্রতিধ্বনি।

[এই খানে পাত্রলিপি ছিল]

অসমাঙ্গ

শব্দপঞ্জী

	অ	
অগয়রহ		ইত্যাদি
	আ	
আক্ষেপমন্ত্ৰ		বৃক্ষিমান
আজৱাইল		যমদূত
আবে-হায়াৎ		যে-জল-গানে অমরত্ব মেলে
আলস্পানা		জগৎ পালক
আকুদ		মন্ত্রপূত বিবাহ
আদম সুরত		কালপুরুষ
আস্সামায়ো তায়তান		শ্রবণ অর্ধ পালন
আলহামদোলিয়াহ		আস্তার জন্য প্রশংসা
আধিক্রম মুমেনীন		মুসলমানদের শাসক প্রধান
আলিশান		খুব ঝলমলে
	ই	
ইনসান		মানুষ
ইনাম		পুরস্কার
	উ	
উম্দা		ভাল
উমেদাব		প্রত্যাশী
	ক	
কওম, কৌম		গোষ্ঠী
কাফ্তান		আস্তিন
কুওৎ		শক্তি
কোড়া		চাৰুক
	খ	
খোয়ার		শূন্য
খোয়ারি		তন্ত্রা
খোদ্রুক্ষী		আত্মহত্যা
খোশবু		সুগঢ়
খুল্লা		দৱমা
খামুস		চূপ
খস্মৎ		ৰভাৰ

গীবৎ	পরনিদ্বা
গোর্দা	উঁচু বালিশ
গোত্ৰ	মাংস
গেন্দুয়া	খেলার বল
	চ
চিজ	জিনিস
	জ
জেনা	ব্যতিচার
জেল্দ	মলাট
জেদা	জীবিত
জিমুয়াহ্	আন্দোল ছায়া
জিম্মা	সংরক্ষণের দায়িত্ব
জাহেল	অভ্যান
	ত
তেলেস্মাণ	যাদু
তৌবান্তাগফেরল্প্তা	শয়তান থেকে মুক্তি দাও, আহ্মা
তিনকা	থড়
তরীবত	স্কৃতি, প্রাচুর্য
	দ
দোষ্ট	বন্ধু
দহুসৎ	ভয়
দাফন	কবর দেওয়া
দারাখৎ	বৃক্ষ
দ্বিদ্বা	প্রতিপত্তি
দীরহাম	মৃদা
দন্তুর	নিয়ম
	ন
নুকল্পাহ্	দেবজ্যোতি
নেকাব	ঘোমটা
নেমক	লবণ
নসীব	ভাগ্য
নকুর	ভৃত্য
নাকুরমান	অবাধ্য
নিষ্ঠ	নেই
	ফ
ফরমাবদার	অনুগত
ফলসাফা	ফিলজফী, দর্শন
ফরজন্দ	ছেলে
ফেরেশতা	দেবদৃত

মেহেরবানী	দয়া
মুজরানী	নর্তকী
মহবৎ	প্রেম
মালে গনীমৎ	ধর্মযুদ্ধে প্রাণে মাল
মজুর	উদ্দেশ্যিত
মাওলা	প্রভু
মারহাবা	সাবাস
মোহাফেজ	রক্ষক
মোজেজা	অলৌকিক শক্তি
মেহ্মান	অতিথি
মহবুবা	প্রিয়তম
মুসল্লী	নমাজী
মাকান	ঘর

র

রসুমৎ	বাস্তরশয্যা
কুবাব	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
রোক্তাসা	নর্তকী

ল

লাহাওলা	শয়তান থেকে বাঁচার মন্ত্র
লেবাস	পোশাক
লুৎ	পয়গম্বরের নাম

শ

শান-শওকত	চাকচিক্য, আড়ম্বর
----------	-------------------

স

সংগ্রাম	সহোদর
সীনা	বুক
সাফ্ফাহ	রক্তপিপাসু
সবুৎ	প্রমাণ
সদ্রিয়া	জামা
সুম্মাম	নিখুম
সীনা-ব-সীনা	বুকে বুকে
সঙ্গেসার	পাথর দ্বারা চূর্ণ
সরম	লজ্জা

হ

হিমাকৎ	আশ্চর্য
হাবিয়া	নরক বিশেষ
হৱ	অল্পরী

চৌরসঙ্গি



কান্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল ।

হোটেলে বসে বসে অশ্বোয়ান্তি পোয়ানো কাঁহাতক আর ভাল লাগে? তাই সে আবার এক বোতল বীয়ারের অর্ডার দিলে । শ্রীমকালে দুপুরে এই পানীয় পেলে ক্লান্তি, খিচড়ানো মেজাজের খোচানি থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যায় । কান্তু হাঙ্গাক হোয়ে বসেছে, তা বলা চলে না । তবে মেজাজ বিগড়ে ছিল । এখন একটু পানী ঢাললে যদি সরস হয়, তা-ই করা যাক । অর্ডার দিয়েও কিন্তু মনে মনে সে ইতস্ততৎ করছিল । তিন চার কাপ চায়ের পর আবার বীয়ার? তুরু কুঁচকে হোটেলের চারিদিকে কান্তু একবার তাকিয়ে নিলে । লোকজন বেশী নেই । এক কোগায় তিন তরঙ্গ চায়ের কাপ সম্মুখে শুলভানি করছে । হয়ত কলেজপলাতক ছোক্রার দল । লাঘুর সময় কিছু ভিড় জমেছিল । কান্তু কিন্তু কিছু খায়নি । তার দুপুরের আহার কোন কালে দুপুরে হয় না । তিনটো, কখনও কখনও চারটো বেজে যায় । আজ আবার ধারা বদলায়নি । কাউন্টারে এক বুড়ো কেশিয়ার সিগারেট টানছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে । কান্তুর হাই উঠল যেন তাকে দেখেই । তারও কিছু বিশ্বামূর বাড়া, শয়ন দরকার । সেই ভূমিকায় সে চেয়ারে আরো একটু হেলান দিতে দিতে পা ছড়ানোর সময় পাঞ্জুনের বেল্ট টিলে করলে ।

ইতিমধ্যে বয় বোতল আর গ্লাস টেবিলে রাখলে । গ্লাস-বোতলে একটা ঠোকাঠুকি হোয়ে গেল । শব্দ উঠল, তা যেন কাঁচ-জাতীয়, বরং ইস্পাতের । কান্তুর মনে হলো, দেশে আজকাল ভালই গ্লাসের কাজ চলছে । বয় দাঁড়িয়েছিল । কান্তু তার দিকে ইশারা করলে, কেটে পড়ো । মাল সে নিজেই ঢালবে । দেরী করলে না কান্তু । আবার সোজা হোতে হয় । বোতল কাঁ করে সে পানীয় ঢালতে লাগল । ফেনা উঠেছে প্রচুর । তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে কান্তু । আজ যেন আগেই মৌতাত লেগেছে । ঘুমঘুম কেন চোখ? হয়ত অনেকক্ষণ বসে থাকার জের । একটা ছাঁক ছাঁক শব্দ উঠল এই সময় । একটু সচকিত কান্তু । পরে লজ্জা পায় । হোটেলের বারুচিখানায় কী যেন ভাজা হচ্ছে । তারি শব্দ । এক রকম গন্ধ ভেসে এলো । ঘাস শুকিয়ে হঠাতে পানী ঢাললে যেমন বাস বেরোয় । কান্তুর শ্বাণ-ইন্দ্রিয় এবার টনটনিয়ে ওঠে । ছাই, আজ হোলো কী? মেজাজ ফিরে আসছে না । সব চেয়ে উন্নত, গ্লাসে ডুব দাও । এক গ্লাস বীয়ার কান্তু এক চুমুকে মেরে দিলে । তারপর আবার গ্লাস বোঝাই করতে লাগল । কিন্তু কী ভেবে অর্ধেক গিয়ে থামলে । কিছু বীয়ার বোতলে রইল । আবার ভাবলে সে, চীপুস্ কি কট্লেট অর্ডার দিবে নাকি? না, থাক । চুমুক কাজে লেগেছে । আরো কত কত হাই উঠত । কিন্তু সে-পথ বন্ধ ।

এবার ছোটা-সে-ছোটা এক চুমুক মেরে কান্তু গ্লাস নামিয়ে রাখলে । গোপে কিছু লেগেছে, মুছতে হোলো । মাথার উপর পাখা ঘুরছিল । তবু গরম যায় না । শার্টে বুকের

দু'টো বোতাম খুলে ফেললে কালু। আস্তিন গুটিয়ে নিলে। আবার চেয়ারে হেলান দিতে গিয়েও সে স্টান ঝুকে গ্লাসে মারলে চুম্বক। কিন্তু চুম্বক নয়, চুম্ব। ঠোটে আল্টোভাবে একটু তরল মেখে নিলে। গলার মধ্যে ক'ফোটা গেল, খোদাকে মালুম। বোধ হয়, বীয়ারটা বেশ একটু তেতো। তাই ঠোট কুঁচকালে কালু। চোখ ছড়িয়ে দিতে তার নজরে ধরা পড়ল, নতুন নতুন ইয়ারগুলো আকাশ অঙ্গি খাড়া। বাঙ্গা দেখায় কোন কোন দেওয়াল। দ্রুত বীয়ার পানের ফল, বোধ হয়। কিন্তু বাইরে রোদুর খা খা করছে। ও, আমার জীপটা গরম হোয়ে থাকবে। সীটও তাতা লোহা ঠেকবে বসার সময়। কোথাও ছায়ায় রেখে এলেই ভাল হোত। কিন্তু আলস্য এমন পেয়ে বসেছিল। কালু আর উঠল না। বরং পকেট থেকে সিগারেট বের করলে। দেশালাইয়ে ঠুকতে লাগল। মাথা একটু ভার-ভার। তবু বেশ আরাম পাওয়া যাচ্ছে। তাই আবার পা ছড়িয়ে দিলে কালু। তারপর ধীরে ধীরে সিগারেট টানতে লাগল। হোটেলে একটু চাষ্পল্য বাড়ল। গোটা তিনেক মেয়ে খেতে এসেছে। তারা চার পাঁচটা টেবিল ফারাকে গিয়ে বসল। কালুর ভাঁটা-ভাঁটা বিরাট চোখ, কুরতা ও হাসির সংমিশ্রণ সহ, তার বিরাট কদের সঙ্গে মানান-সই। এমন চোখ প্রায় বুঁজে ফেললেও কিছু না কিছু দেখা যাবে। সোজা তাকাতে তার লজ্জা লাগে। অপরের মাইয়া। বেরোক রাস্তায়। তা-তে কী। সরম যে-যার নিজের ব্যাপার। একজন ন্যাংটা হাঁটলে ত তার সামনে নিজেও উলঙ্ঘ চলা যায় না। মেয়েগুলো চায়ের অর্ডার দিলে। বোধহয়, টাইপিষ্ট। ফাঁকে এক কাপ চা খেয়ে সাঁচে। লাঞ্ছের সময় কাজের চাপে বেরোতে পারেনি। মেয়েগুলো বেহায়া নয়। একটুক ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করছে না। একটি মেয়ে হঠাৎ আর এক জনের কথায় হিল্পিল হেসে উঠল। কালু তখন প্রায় বেঁজা চোখ একটু বেশী করে খুলে দেখে নিলেও মুবতী মেয়ে। পঁচিশ হবে। কে জানে বিয়ে হোয়েছে কিনা। আগে এই শহরে স্বরোত দু'-চারটে হিন্দু মেয়ে। সব হাঁ করে চেয়ে থাকত। এখন মুসলমান মেয়েদেরই রকম দ্যাখো। আর হাঁ করতে হবে না। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে? ডাইনে বাঁয়ে আগায় পাছায়— চোখ খুলেছ কি মেয়ে, আর কওমী মেয়ে। মুসলমানগো অইল কী? হিন্দুদের এত গালাইলি ক্যান, ব্যাডারা? মেয়ে তিনটি তখন মুচকি মুচকি হাসছে নিজেদের মধ্যে। একটি চায়ের কাপ নামিয়ে অন্য একজনের থুঁবী নেড়ে দিলে। কালুর চোখ বুঁজে যায়। সুরজনের বিয়ে দিতে হয়। চৌদ্দ পড়েছে তার মেয়ে। অহন একটা ভাল দুলা পাইলে আর দেরী না। হাতী পোষা যায়, মেয়ে পোষা যায় না। শহরে কেলেক্ষারী বড় বেড়ে গেছে। কালু আবার গ্লাসে চুম্বক দিতে স্টান হোলো। না, এক বোতল ত কাবার, হ্যাঁ প্রায় কাবার। আর একটার অর্ডার দিলে তখনই। দু' বোতলেই জমে। বনিয়াদের উপর ঘর উঠে। মেশার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। মেয়ে তিনটে উঠে গেল। সময় পানীর মত খরচ হোয়ে যায়। অথচ সে বসে আছে সদুর অপেক্ষায়। যাক, বয়টা বড় কাজের, দেরী করেনি। বোতলের গায়ে হাত দিলে কালু। না, তেমন ঠাণ্ডা নয়। খৌজ দিলে বয়, ফ্রীজ কিছুক্ষণ আগে থেকে বিগড়েছে। শালা, মাথা বিগড়ে যাচ্ছে ত, শালাদের ফ্রীজ। এই ঠাণ্ডাতেই চলবে। সদু এলে রক্ষা। কিছুদিন কেমন যেন চলছে। দেশে কত ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে। পটেকে তা হোতে দোষ কী? কিছু বাবে পড়ুক। আমাদের মত গরীব গাড়লরা বেঁচে যায়। কালু বীয়ার ঢাললে নিজে।

বয় সরে গেছে। বখ্শীশের লোভ নেই তার। দুপুরে অনেক কামিয়েছে। এক সাহেব ত পুরো এক টাকা তস্তুরীর উপর রেখে দিয়েছিল। কেশিয়ার দেখেছে। ব্যাটার চোখ টাটায়। অথচ নিজে তিন শ' পায়, তার দিকে খেয়াল নেই। বয়ের মাথায় হাত বুলোতে ওস্তাদ। নতুন চাকরী পেতে ম্যানেজারকে পর্যন্ত কিছু খাওয়াতে হোয়েছিল। বয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে যখন আড়চোখে তাকিয়ে ছিল আর কালু বীয়ার ঢালছিল, তখন আরো কথা ওঠে মনে, যা না জানলেও দুনিয়ার কারো কোন ক্ষতি নেই। তবে মন চুপ থাকে না। কালুর একটু ঝিমবিঘ খোঁয়ারি লাগছে চোখে, তখন সেও ধানাইপানাই শুরু করলে, একদম বীয়ারের বৃহদের মত নিষ্ঠক। ব্যবসায় জোয়ার ভাটা আছে। খালি এস্টারিশমেন্ট খরচা অর্থাৎ মাথায় মাথায় ব্যবসা ঢালাতে গেলে যেটুকু খরচা লাগে— কর্মচারীর বেতন, ঘরভাড়া নিজের খাইখরচা অগ্যরহ— এসব চলে গেলেই, কে আর অত মাথা ঘামায়? এবার তবীলে টান পড়তে পারে। গত কঠাস গাড়ী ঠিক রেল বরাবর চলছে না। অবিশ্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। একটা কিছু করতে হয়। পা লম্বা করলে, কালু হেলান দিলে এবং তারপর আধখোলা চোখে পৃথিবী দেখতে লাগলে। হোটেলের আবার খিমোনি শুরু হয়েছে। খরিদ্দার একটা ও নেই। তিনটৈ বাজে। যত পারে বাজুক। কেশিয়ার একটু পক্ষীয়ম দিয়ে নিছে টেবিলের উপর এক পা তুলে। বয়-বর্গ কীচেনের ওধারে বোধ হয় খাচ্ছে। এই লোক-হীনতায় কালু খুব সোয়াস্তি পেতে লাগল। মগজেও কিছু গাঁজানি শুরু হয়েছে। আর কোন খিচড়ানি নেই মগজে। সদু যখন হয় অস্ট্রুক। আবার পুকুরের পুরাতন কুই নিজের ঘাটে এসে ঘাই মারছে। সদু, সদু, চুলোয়োক। আসবে, না হয় না আসবে। কালু আবার খাড়া বসল। বীয়ারের চুমুকের কাছে এখন নববিবাহিত বৌর ঠেঁটও পান্সে, ফিকে লাগবে। আনন্দ, আনন্দ। গ্লাস রাখিয়ে রেখেছে ঠেঁট থেকে কালু এই মাত্র। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বড় মাছি— কঁস্ট্রুলের সঙ্গে নয়, আমাশার রোগীর সঙ্গে যার বেশী দহরম-মহরম, সেই মাছি! ওয়াক্‌থুঃ। কাচুমাচু মুখ কালু সত্যি মেঝের উপর এক গাদা খুপু ফেলে নিলে। অবিশ্য মাছি এসেছিল। কিন্তু কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। গ্লাসে ত বসেনি। তবু 'কুয়' এসে গিয়েছিল। চঁট করে আবার গ্লাসে মুখ দাও। বমি, মাছি থেকে রক্ষা। চোখ বুঁজে বিশ সেকেন্ডের চুমুক মারলে কালু। শরীর একটু প্রসারণ চায়। লম্বা করো পা। বেল্ট ত ঢিলে করাই আছে। খোঁয়ারি একটু জেঁকে এলো। তখন কালু তা হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মাথা একটু খাড়া করতে গেল, কিন্তু অঙ্গের অন্যান্য টুকরো সায় দিলে না। একটু জিরোও। একটু আরাম করো। কালুর মনে হোলো তার লেবাস আর বদনে থাকতে নারাজ। সব খসে যাচ্ছে পাতলুন, শার্ট, জুতা। তাঁর লেবাস একদম বদলে যাচ্ছে। কিন্তু ধর্ম আছে শালীনতার নতুন কাপড় পড়িয়ে দিচ্ছে তাকে। একটা রং-ছুট লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, বজ্র ছিদ্রির নক্ষত্র গামছা কাঁধে। জায়গাও বদলে গেছে। এই হোটেলে— সে নেই।...

নর্দমার উপর মাছি। মোতো যত পারো মোতো। আর তাড়ি গিলে, না মুতে উপায় নেই। চাতালের উপর কালু, বসে আছে আরো অনেকে। সবাই তার মত। কেউ রিঙ্গা টানে, কেউ ঠেলাগাড়ী, কেউ মজুর কামীন, যোগাড়ী বা ঐ জাতীয়। দেশী তাড়ির এক

মহফিল গুলজার হোয়ে ওঠে সন্ধ্যার কিছু পরে। কালু বসে বসে তাড়ি খাচ্ছিল। মেটে ভাঁড় সামনে রাখা। সারাদিন রিঙ্গা টানার পর কিংবা টানার ফাঁকে এসব না হোলে তাগদ আসবে কোথা থেকে? কালু তখন বলত, ইঞ্জিনে কয়লা মারছি, বাই! কারণ, তার পরই আবার রিঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। অনেক সময় হয়ত মহার্জনের ভাড়া ওঁঠেনি তখনও, কাজেই শুধু বসে তাড়ি গিললে ত আর চলবে না। বউবাচ্চা উপেস করবে। আর যেদিন ভাড়া উঠে যেত, আরো দু-চার পায়সা বাড়তি থাকত, তখন মৌজ, মৌজ। চালাও নাও দাউদ্দান্ডি। এক দিকে ভাটির দোকানদার কলস থেকে তাড়ি ঢালছে। খরিদ্দার বে-যার বসে যাচ্ছে। বসবে বা কোথায়? একটা বেপিং তরে যায়। তখন সবাই চাতালে বসে। পাশা-পাশি ভাঁড় রেখে গপ্প চলে। হাড়-ভাঙা খাটুনি এখানে ডুবে যায়। দোকান্দার বেশ হঁশিয়ার লোক। চাতালে এক কোণা দিয়ে এক লম্বা ছ্রেণ বানিয়ে রেখেছে। কারণ, পানী খেলে পানী ছাড়তে হয়। তখন পাইপ খুলে দাও। বেশী তক্লীফ করতে হবে না। রাত্রেও এখানে কানা মাছি উড়ে আসে। কালুর চেষ্টে পড়ল ভাঁড়ে একটা মাছি পড়ে গেছে। তুলে ফেলে দিতে গেল। পাশের এক অচেনা লোক, সে এতক্ষণ বুদ্ধ তাড়ি খাচ্ছিল, কারো সঙ্গে মুখ খোলেনি। এহেন ব্যক্তি হঠাত হে-হে কর-কী কর-কী ধারায় চিঙ্গে উঠল? আরে ভাই, তোমার নসীব খুলছে। চার আনার তাড়ি, আর মাছি ফাউ। এমন সওদা কার কবালে কও জোড়ে? চুক্তুকু খাইয়া লও। কালু অবিশ্য তাড়ি ফেলে দেওয়ার কথা ভাবছিল। কিন্তু চার গঙ্গা পয়সা! নর্দমায় ফেলে দিতে বাধে, বেশ একটু বাধে। পাশে বসেছিল মোসলেম আলি, লোহার শুদ্ধামের ঝুঁজি। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাকে ষাট বছরের জয়ীফ বুড়ো দেখায়। চুল পেকে গোছে। গলার কঠা বেচপ বেরিয়ে এসেছে একদম থুঁনী-পার। সে বেঁতির উপর বসেছিল, হাতে ভাঁড়। এক দিকের পশ্চা তুলে সে আগে একটা সশব্দ বাঁকর্ম করে বিস্তু, তারপর নিজের মনে হি-হি হেসে উঠল। এমন হাসি, এবং কি বলতেও চায় সেই কথা আটকে গেছে। তাই তা তুলে ইশারা করে। তারপর তাল সামলে কালুর ভাঁড় তুলে নিয়ে বলে, তোমার মুখ দেখে বোৰা গেছে, তুমি এই লাইনে নতুন। আমার টাটকা ভাঁড়ে ডুব দাও, আমি তোমার মাছি খাব। তারপর ঢক্ঢক, এক চুম্বকে অনেকখানি গিলে উর্ধনেত্র হোয়ে রইল। একজন তখন নেপথ্যে রসিকতা করলে, পৌছে গেছে। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক কোন উচ্চস্তরে এখন সে আসীন বা উপস্থিত। জমায়েৎ চোখ তখন সব মোসলেম আলির উপর। কিন্তু জহুরী লোক। মণিমানিক্যের ঘলকে তার চোখ অভ্যন্ত। সুতরাং বেশীক্ষণ আর দামী পাখরের উপর নিবন্ধ থাকতে পারেনা। একটা ঢোক গিলে সে পাখুবর্তী সঙ্গীর জানুর উপর চটাং-শব্দে তালু মেরে গান ধরলে...

যেদিন থন লাঁ মরেছে

হইনি আর কারো কাছে...

কোরাস ধরবে কী, অন্যেরা হো-হো হেসে উঠল। মোসলেম আলির কোন দিকে ঝক্ষেপ নেই। তার বিরহিনী। বারাঙ্গনা মৃত প্রিয়তমের জন্য খেদ করতেই লাগল। তাড়ির আজড়ায় অসত্য ঝুট কিছু থাকে না। মানুষের মুখ থেকে যা বেরোয় তা অন্তর থেকেই বেরিয়ে আসে। ভাষা এখানে সত্যিই ভাষা। ভগামি নয়। ঝুট নেই। ঝুটা আর কী থাকবে?

অপরের চুমুক দেওয়া ভাঁড়। কিন্তু কালুর অত ঘিন ছিল না। তা-ছাড়া সেও পৌছব পৌছব করছিল। কিন্তু পারেনি। রাস্তায় তার রিঙ্গা অপেক্ষা করছে। কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে ত মহাজনের দণ্ড দিতেই হবে। বুজির রাস্তাও বঙ্গ। এই ডাঙা বা ধর্মির জন্য কালু ঢুবতে পারছিল না। নচেৎ মন কী আর ছুটি, না, সাঁতাব কাটিতে কখনও বিমুখ থাকে। এমন পাশাপাশি যেসাঘেসি উত্তাপ ত কোথাও মেলে না। উঃ, আলির গান চলেছে ত চলেছেই। বেটা ছেলের গলায় মেয়েছেলের গান কী সাজে? একজন মন্তব্য করতে মোসলেম আলী থামল। কিন্তু একদিকে তরু বেধে গেল জোর। বেড়ির চইলত ক্যামনে? দুই দল হোয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। একদল বললে, বেড়ি পুঁজি ভাঙ্গাইয়া খাইত। অন্যেরা মন্তব্য করলে, মহাজন না, হে বেড়ি গতর খাড়ায় আমাগো লাহান, পুঁজি থাইকব ক্যামনে? ফয়সালা হয় না। হল্লা অত বেড়ে যায়, এখনই না পুলিশ এসে পড়ে। ভাটিখানার কর্মচারী, মালিক এখানে কমই আসে, অভয় দিলে, কেউ আসবে না। কিন্তু মওজের স্নোত একদম একথাতে নয়, বহু থাতে বইতে লাগল। কেউ তবলা বাজায় আর একজনের পিঠে, কেউ ধেইধেই নাচে। সাবাস, সাবাস, ছাঃ বেড়ি, ছন্দরক্ষী করতালি— শব্দেও মওজ ওঠে। চতুর্বের দুই ভাগ। মাঝখানে ফুট চার আন্দাজ ফাঁক, যাতায়াতের পথ। একদিকে দেওয়াল জুড়ে দোকানদারের রঙমঞ্চ এবং সামান অর্থাৎ তাড়ির কলস-বৃন্দ। আজ রঙমঞ্চে রং চড়েছিল। কর্মচারী একবার চেখে দেখেছে বৈকি নিজেদের মাল। চেউ যখন ওঠে, নৌকার গলুই না ভিজে পাবে কী? কিন্তু এই সময় একস্তুন খরিদ্দার আসাতে সবাই তাকে অভিনন্দন দিলে, এসো-এসো রবে। একজন ভুঁয়ে করেই বললে, ‘আ যা মেরী বালামওয়া’। আগম্বন্ত গরীব বী। হাজারা না বালাকোটের অধিবাসী, আল্লাকে মালুম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কী করে, হয়ত খুন বা আর কিন্তু করে, এই বাঙ্গলা মন্দুকে ছিটকে পড়েছিল। নানা জীবিকায় মজেছে। দরোয়ানী, কাপড়-ফেরি, বাবুটিগিরি, মুটেগিরি— এমন ধারা পেশায় কিছু বাদ দেয়নি। শেষে ফেঁসে গেল যশোর শহরে এক কুলীর মেয়ের সঙ্গে। পঁচিশ ছাবিশ বছর কেটে গেছে। গরীব বীর পাঠানতু ঘুঁচে গেছে। কালো হোয়ে গেছে রোদ-বৃষ্টি আর বিবির পয়জারে। যারা ওর বৌকে দেখেছে তারা বলে পাংলা এক-হারা চেহ্রার বেড়ি। কিন্তু পাঠান তার কাছে একদম কেঁচো। যাদু-টোনা না মহুবৎ— খোদা, খোদা তুমই সব জানো। কিন্তু গরীব বী নামে যা সামাজিক মর্যাদায়ও তা-ই থেকে গেছে। অনেক পঞ্জা লড়েছে সে নসীবের সঙ্গে। সে নড়েছে, নসীব নড়েনি। এই কালীটোলার এলাকায় তাকে দেখবে। বাচ্চাগুলো কিছুটা বাপের আদল পেয়েছে। কিন্তু খাবার ত পায় না। গরীব বী পর্যন্ত মুলুকী সহ্বতে এই তাড়িখানার সাগরেদ। একটু টান আলাদা। নচেৎ চমৎকার বাঙ্গলা বলে। আর চেহ্রা পুড়ে গেছে রোদে, স্কুধায়। তাই ওকে আর দশ জন থেকে এই জমায়েতে আলাদা করা যায় না। তার ঢাঙা তালগাছ চেহ্রা অবশ্যই চোখে জানান দেয়। গরীব বী ঢুকেই স্তুক। জোর মওজ জমেছে। কিন্তু সে প্রায়-হাঁক মেরে বললে, ‘এই মাগীর ভাই... লোগ।’ যশোরের জামাই। সেই সুবাদে সে ইয়ারদের সঙ্গে এই রসিকতা প্রায়ই করে। মোসলেম আলি তখন বী সাহেবকে তজনী প্রথমে বাড়িয়ে পরে বড়শীর কাঁটার মত করে অভ্যর্থনা জানায়। এসো, এসো। আ যা মেরি সেইয়া... মোসলেম মোল্লার ঘাড়ে গানের তৃত চেপেছে। গরীব বী তার কাছে যাওয়া মাত্র সে

নিজের ট্যাক থেকে পয়সা বের করে এক ভাঁড় তাড়ি নিয়ে এলো না শুধু, সবাইকে ডাক দিলে, ‘ভাইসব, নিজের গ্লাস ভাঁড় সব উঁচু করেন।’ কী ব্যাপার? একদম স্তুত একক্ষণের জমাট হল্লা। ভাইসব...। ব্যাপার কী? মোসলেম এক কালে বাবুটি ছিল, সাহেবদের অনেক খাইয়েছে পিলিয়েছে অর্থাৎ পান করিয়েছে, আজ ইয়াদ পড়ে গেল। মোসলেম আলি আর সে চাকরী পায়নি। কারণ তার হাতে শ্বেত ধবল। আজ মনে পড়ে গেল, চীৎকার: ভাইসব আমি ‘চিরিস’ ‘চিরিস’ বলব তারপর এক সঙ্গে যে-যার ভাঁড়ে মুখ দেবেন। সাহেবরা ‘চীয়ার্স’ বলে, দেশী এবং বিলাতী সাহেবরা। মোসলেম আলি দেশী করে নিয়েছে ভাষা। গরীব খাঁ এক ঢেকেই নিজেকে ফিরে পেলে। এমন ঢালাও খাতির আর সে কোনদিন পায়নি। গ্লাস নামল, ভাঁড় নামল জমিনে। প্রথমে গরীব খাঁ-ই মুখ খোলে। সেত এই শাদীর মহফিলে ‘দুলা’। চেনা-শোনা সবাই তাকে খাতির করতে এক-পা বাড়িয়ে আছে। ঠোঁট জিভ দিয়ে মুছতে মুছতে সে গমগমে গলায় একটু হাঁকা আওয়াজেই বললে, “তারপর বিবির ভাইলোগ...” সবাই হেসে উঠল। কিন্তু মোসলেম আলিকে আর রোখা যাবে না। তাকে সং. সংগীত দুই ধরেছে। সে সুর ভেঁজে উঠল :

আমি মাগীর ভাই

গোটা রাজ্য চালাই...

কোরাস ধরে নিলে কয়েক জন সঙ্গে সঙ্গে। ধেই ধেই নাচও শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন কোমর জড়াজড়ি, নাচছে। ওদের হিঁশ আবুরেশী নেই। গরীব খাঁ পর্যন্ত কোরাসে যোগ দিয়েছে আর মাঝে মাঝে হাসছে। না, ষেটো মওকা-মাফিক আ গয়া। মনে মনে গরীব খাঁর আন্দোলন ওঠে। কাল্পন নেশা জয়েছে। কিন্তু আর বেশী দূর তার পক্ষে তখন অসর হওয়া সম্ভব নয়। ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে সে কিন্তু কোরাস থেকে কেটে পড়েছে। গানের কী জোর। সবাই না গাইলেও ষেটো নাড়েছে। নচেৎ বুকের ভেতর ত কিছু আন্দোলন তৃলছেই। ...‘গোটা রাজ্য চালাই’... বলন থামতে চায় না। কিন্তু কাল্প দু-তিন বার খুব জোরে জোরে নিষ্পাস নিলে, নেশা আর না মগজে ঢেকে। সর্বনাশ হোয়ে যাবে। বাড়ি ফিরতে কিছু হাঁটতে হয় রিঙ্গা গ্যারেজে রাখার পর। তখন যদি মাথা পা টলে-টলে, পুলিশ পাঁচ-আইনে দিতে পারে। অন্যথায়, রাস্তায় হয়ত সারা দিনের কাষাই রেখে যেতে হবে। যেখানে রোজগারের গোড়া সেখনেই শেষ। কিন্তু মোসলেম আলি গৃহিণীর ভাতাদের আস্পদ্ধা এত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার মধ্যে ডুব দিতে মন হাসফাঁস করে। আর না। ঢের হোয়েছে, এবার উঠে পড়া উচিত। সেই সময় গরীব খাঁ আবার এক লম্বা-চওড়া হাঁক মারলে “এই মাগীর ভাইলোগ আওর এক ভান্ড... ফিন্ জল্দি।” কাল্পন পাত্রে কিছু তলানি পড়ে ছিল, সে এগিয়ে দির্ঘি। আর নেশা না। বরং পাঠানের উপর দিয়ে যাক। বিবির পয়জার সব চেয়ে মিষ্টি। এমন ধাঁধাঁর কথা ব’লে একদিন সে মজলিস মাতিয়েছিল। আজ কাল্প কথাশুলো স্মরণের চেষ্টা করলে বেশ মাথা চুল্কে চুল্কে। কিন্তু কিনারা করতে পারে না। আবার দু’ দম নিষ্পাস টানলে সে জোরে। মাথা একটু ঝিমবিম করছে। নেশা না পেয়ে বসে। ফেরার সময় কি যেন কিনে নিয়ে যেতে হবে গিন্নী বলে দিয়েছিল। চুলোয় যাক সংসার। মাথা মুণ্ড এত হিসেব করে দুনিয়ার বাস চলে? সকালে উঠলেই যত বায়নাক্ষা। তখন রোজগার আর খরচে মেলাতে হয়। কাল্প ফলে বেশ চাঞ্চা হোয়ে উঠেছিল। যেন

কিছুই যায়নি। হারাম তাড়ি না গিলেও উপায় নেই। নচেৎ শরীর বিমবিম করে। আবার নেশায়ও মাথা বিমবিম। হাঁয়েও যা, না-হয়েও তা। শালার দিগ্ন্দারী যে দুনিয়ায় কত রকম, লেখাজোখা কঠিন। আসর ভয়ানক গর্মে উঠেছে গরীব ঝা-কে কেন্দ্র করে। কিন্তু কালু আর এই জনতার মধ্যে নেই। পরিষ্কার মাথায় সে চারিদিকে তাকায়। আর একজন লোক তার মত নির্বিকার বসে আছে চাতালের বাম-কোণায়। প্রৌঢ় বয়স। খুণ্ডনীর উপর মাত্র এক গোছা সাদা খাটো দাড়ি। মাঝামাঝি দোহারা চেহরা। মুখে বেশ কিছুটা কাঠিন্যের ছাপ, তার কালো শরীরের ফেমে আরো প্রকট। লোকটা কিন্তু বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে। অনেক সময় অপলক নয়ন। চোখাচোখি হোতে কালু লজ্জা পায়। সে ত আর ঘেটুর দলের পোলা নয়। আরো কয়েক দিন ওকে দেখেছে এখানে, আর ওই একই জায়গায়। আলাপ হয়নি। লোকটার গতিবিধি অসোয়াস্তিকর ঠেকে কালুর। হঠাৎ সমস্ত পরিবেশ তার কাছে মনে হয় তেতো, তেতো। ওয়াক, খৃঃ। লোকটা আবার বেহায়ার মত তার দিকে চোখ ফেলেছে। অন্য সময় একটা খৌজ নেওয়া যেত কাছে গিয়ে আলাপ মারফৎ। কিন্তু আর এখানে এতটুকু মন টিকছে না। রিঙ্গা রাস্তায় ফেলে এসেছিল। মাত্র এক টোক গিলে যেমনার কথা। দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল। তবে আজ রোজগার পুষিয়ে গেছে। খান্কার পুৎ মহাজনকে টাকা দিয়ে গাড়ী গ্যারেজে রেখে ঘরে ফিরতে পারলেই সব ঠিক থাকে। বসে থাকতে ইচ্ছে হয় খুব। কিন্তু আর না। প্রৌঢ় লোকটার হোল কী? না, আলুর দোষ ছিল, এখন নেশায় পেয়ে বসেছে। গরীব ঝা তখন মালাকাঙ্গী গ্রাম্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছে ধেই ধেই ন্যূন্য সহ। খৃঃ। সত্যি এক পাশে একস্তুশ খুশু ফেললে। কালু এখনও চাইছে নাকি? হঠাৎ পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে কালু ধরা পড়ে গেল। ধারণা ঠিক। আলুয় পেয়েছে নাকি হারাম-জাদাকে?...

পরদিন আবার নেশার কিছু হল্লা বঁয়ে গেল। সেই লোকটা তখনও এসে পৌছায়নি। তার বরাদ জায়গা খালি পড়ে আছে। কালুর অসোয়াস্তি লাগে। লোকটার হন্দিস নিতে মন চায়। অথচ আজ গায়েব। যাক, চুলোয় যাক। কত স্যাঙ্গাং আসে যায়। বুড়ি-গঙ্গার মত কত মড়া ভেসে আসছে আর যাচ্ছে। এত ভেবে কী লাভ? ভাঁড়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সেঁধোয় সেদিন কালু। চুমুক জোরে মারে না। গোলাপি আসতেও সময় গেল। নেশার ধর্ম আছে। বেবেয়াল করাই তার ধর্ম। সুতরাং নেশা আসেও বেবেয়াল। কোন ঠিক নেই, কখন ভর করবে। কোণার ফাঁকা জায়গাটায় কিন্তু কালুর বার বার চোখ ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে আছে সে। হঠাৎ খুপ করে স্নামালেকুম শব্দে তার পাশে একজন লোক বসে পড়ল। সেই লোকটা! আজ সে স্বাভাবিক মানুষ। পেটে পানি পড়েনি। এক নিমেষে কালু তাকে তলিয়ে দেখে নিলে। অসীম ধূর্তা তার চোখে। চোখের বিলিক অসহ্য। যেন কাউকে বিধতে পারে সে কেবল দৃষ্টির সাহায্যে। তবে ঠোটে হরদম এক রকমের মাখন হাসি লেক্ষে রয়েছে। এখানে অভ্যর্থনাই বড় কথা। বুপো গৌফ নয়। ছোট ছোট করে কাটা। তাই হাসি সহজে বেরিয়ে আসে। নিমেষেই এসব ঘটছে। সালামের জবাব দিয়েছিল কালু। তার পর ভ্যাবাচ্যাকা। আর কী বলবে বা আবার জিজ্ঞাসায় কী জবাব দেবে তা হন্দিস করতে পারেনি। কিন্তু লোকটা চট করে এক ভাঁড় নিয়ে তার পাশে

এসে বসে পড়ল। কাল্পন তখন হুশ হয়। লোকটা দু'টো বিড়ি বের করে একটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, “কিছু মনে করো না।” বয়স বেশী। সুতরাং তুমি সমোধনে রাগ হয়নি কাল্পন। অবিশ্য কত খানকীর পৃথক তার বয়সের ইজ্জত রাখে না, পেশা রিক্সাওয়ালা ব'লে। দশ বছরের ছেলে পর্যন্ত ডেকে বসে, এই ভাড়া যাবে? আর সাহেব খানকীয় পুত্রো ত ‘ভাড়া যাবি’ আকসার বলে, যদিও বয়স তাদের বেশী হবে না। বেশী হোলেই বা কী? জানাশোনা নেই অথচ এমন ডাক দিতে ও-শালারা যেমন অভ্যন্ত, আমি হালাও শুনতে অভ্যন্ত। ইষ্টেমাল ভালই করেছি। কিন্তু প্রৌঢ়জনের গলার সঙ্গে বুকের ঘোগ আছে। গাল দিলেও গোস্বা বেরোবে না। সুতরাং আলাপ হোতে আর কতক্ষণ লাগে? এখানে সবাই আসে হারানো একটা কিছু যেন পেতে। হাল্পাক অনেকক্ষণ গাড়ী টেনে টেনে, মনের হান্দিস পাওয়া যাচ্ছে না। চলো, এক কেতা মাল টেনে আসি। আর সংসারের দিগন্দারীতে অস্তির, চারিদিক ছেঁড়াছেঁড়। চলো, ভাটির ঘাটে। একদফা নিম-গোসল হোয়ে যাক। হায় ফুর্তি, লে ফুর্তি। কাল্প যেন লোকটার ভেতরের গুৰু পায়। অবিশ্য তার আগে জহুরী জহরৎ চিনে ফেলেছে। ইতিমধ্যে চুম্বকে চুম্বকে দুজনেই অভ্যাসারে কতদূর এগিয়েছে খেয়াল করতে পারেনি। নামে ত দু'জনকে কবেই চিনে ফেলেছে। প্রৌঢ়জনের নাম বেচু সর্দার। সে কিন্তু কাল্পন আসল পরিচয়ে আদৌ আগ্রহী নয়। আগে তুমিকা পেতে নিয়েছিল সর্দার:

‘তোমাকে মাটির বলব।’ মাটিরের অপদ্রংশ। কাল্প সেদিন দিল-খোলা হাসি হেসেছিল। জীবনে যে কখনও মক্তবের উঠান মাড়ায়নি, তার বাই মাটির। কিন্তু অপর দিকে তখন সাফাই গাইতে কসুর করে না, “মানিক কি জানে সে মানিক?”

“তা ক্যামনে জাইনব?”

“তুমি মানিক। আমি বলব : মাটির

কাল্প সেদিন অবাক না হোয়ে পারেনি। কি পেয়েছে লোকটা তার মধ্যে? আজ তেমন নেশা করেনি যে হঠাৎ আলুর বদনাম দেওয়া যায়।

হাম-পেয়ালা ভাব জলদি জমে উঠল। সর্দার জিজ্ঞেস করেছিল, “মাটির, তুমি কী করো?”

“রিক্সা টানি।”

“রিক্সা?”— তারপর মুখ কুঁচকে এমন জ্বরুটি করেছিল সর্দার, আজও প্রায়ই তা চোবের উপর জানান দিয়ে যায়। হেসেছিল এই সময় বেচু মিয়া। জোরে নয়। অবিশ্য, ব্যঙ্গ, ঘৃণা সব মিলে যেন সেই শব্দের মধ্যে শুঁতোগুতি করেছিল। আবার তার জিজ্ঞাসা—

“তুমি রিক্সা টানো? পাহালওয়ান দিয়ে ধাইয়ের কাজ?”

কথাটা বুঝে উঠতে পারেনি কাল্প। কেন সে কি হাইকোটের জজ হবে নাকি? বিদ্যা নেই। বুদ্ধি থাকলেই বা কী? এবার সর্দার চুপ। মিটিমিটি হাসছিল তার মুখের দিকে চেয়ে। কাল্প আরো অবাক। নেশা ত পায়ের তলায় আছে। খুব জোর হাঁটুতক উঠেছে। আকেল শুম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাকে গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরোচ্ছে বা ঢুবাচ্ছে। তারপরই বেচু মিয়া তাকে ডাঙা দেখায়।

“আমার কথা হচ্ছে। তোমার শরীর ত নয়, ইস্পাত। তুমি ত ফুলাদ, মাটির। তুমি রিক্সা টানব কেন?”

“একটা কিছু করন ত লাগে”।

লাগে। হাঁচা কথা। কিন্তু যেখানে ভোং লাগে সেখানে ঘোং জড়বে নাকি?”

“তয়—”, আমতা-আমতা করেছিল সেদিন কালু। আরো জেঁকে বসল সর্দার, “তুমি গাধা নও যে ধোপার ঘাটে খাটবে। তুমি জঙ্গের ঘোং, ময়দানে লড়বে।”

আবার বিশ্বয়ের পানীতে ঠাণ্ডা কালু। সাপের চোখে পাথীর চোখ পড়েছে। চুপ করে যেতে হয়। সর্দারের মুখের দিকে চাওয়া ছাড়া কোন কাজ থাকে না। সামনে তাড়ির ভাঁড় আল্লা-আল্লা করে।

কিন্তু লোকটার পাঞ্চাতে দেরী হয় না। এবার মৃদু হাসি ছিটোয় সে। তারপর এত মোলায়েম কষ্ট মৃদু অথচ খোলতাই করে, “মাষ্টর, তুমি রিঙ্গা টানবে। তার নতিজা কী? ‘নতিজা?’”

“আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার নতিজা, খালি পেট থেরে মেরে নানা রোগ জুটোবে। বউ-বাচ্চা উপোস করবে, নিজেও একদিন ভাটিখানা থেকে কাবর-খানায়।”

শিউরে ওঠেনি সেদিন কালু। হয়ত গায়ে জোর আছে বলেই পাঞ্চা দিয়েছিল সোজাসুজি, “হালাল রঞ্জি হালাল কামাই করি। আল্লা দেখবেন।”

সর্দার খুপু ফেলেছিল উঠানে এক গাদা। এবং ঠোঁট দুটো যথাসম্ভব বাড়িয়ে ঝুঁ-শব্দ তুলেছিল নাক দিয়ে। আবার কষ্ট সতেজ, “হালাল কামাই? হালাল রঞ্জিতে এই মুলুকে কোন হারামজাদার দিন চলে? হালাল... হালালের আর...।” সব কথা কালুর মগজে সেঁধোয়নি। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। কারণ, সর্দারের মুখ আবার চালু, “মাষ্টর, তুমি নিজেকে চেনো না। আমার চুল গোদে পাকেনি। জীবনে কত কী দেখলাম। তুমি ত সেদিনের পোলা।”

নিজের আক্তেলের উপর আস্তা পাকলেও কালু আর মুখ খুলতে পারেনি। বারেক সর্দার এক ভাঁড় তাড়ি এগিয়ে দিয়েছিল। তাই মুখ আবার ফাঁক হয়।

মানুষে মানুষে ফাঁক কিন্তু আর বেশী দিন রইল না। সর্দার তার জীবন বদলে দিলে। তার দেওয়া মাষ্টর নাম সার্থক। যদিও ইলেম সর্দারই দান করেছিল তা-কে।

হাতে খড়ি হোলো। ছিচকে চুরি দিয়ে আরম্ভ। হাত পাকাতে হয় নাকি প্রথমে এই ভাবে। ধীরে ধীরে তরক্কি। সর্দারের মতে প্রথমেই গাছের মগ্নালে উঠতে গেলি নির্যাত ঠ্যাং ভাঙবে। সেই জন্যে রশ্মে রশ্মে। কিন্তু চেলা গুরু-হত্যা করে বসল। দেখা গেল, সে কয়েক মাসে ওস্তাদের বাঁয়ে ত যাইয়ে না, বরং সমান সমান। ছেট চুরি বক্ষ হোয়ে গেল। গক্কমুষিক মেরে হাত নাকি শরীফ লোক দুর্গন্ধ করে না। যাদের আক্তেল কম, পাঁয়তারা কম বোঝে, তারা কি করে খাবে? আল্লা জান দিয়েছে সবার। বেচু সর্দার তাই ছিচকে চুরির দিকে আর শিষ্যকে যেতে দিল না। এদিকে রোজগার বেশ বেড়েছে। অস্তৎঃ রিঙ্গা ঠেলার চেয়ে এত বেশী যে, খোঁয়াব মনে হোতে পারে। আর যখন নসীব খোলে তখন কত দিকেই না তার দরজা বের হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগল ইউরোপে। তার চেউ দিকে দিকে লাগতে বাধ্য। সুতরাং এদেশেও লাগতে বাধ্য। ইউরোপের বুটের নীচে গোটা এশিয়া। এক দাঁড় এলো। নানা রকমের চুরি হঠাতে গঁজিয়ে উঠল। এবার দু’ হাতে কামাও। অবিশ্য তখনও ডাকাতির খেয়াল কারো হয়নি। চুরি করো, তবে বড় চুরি। কম্বে কম

এক থাবায় যেন পাঁচ হাজার ওঠে। আর এমন পেশায় বাঁচতে পেলে কিছু গুণগিরি করতে হয়। সেখানেও কালু ওস্তাদের চেয়ে টেক্কা মারলে। দু'জনের সুবাদ তখনই চিড় খেতে লাগল। এক বিছানায় দু'-সতীন কী করে শোয়া? কোন কিছু বলা-কওয়া। নেই বেচু সর্দার একদিন নিরুদ্ধেশ হোয়ে গেল। কালুর জানার কথা নয়, ডাঙ্কার জানে পুরাতন সিফিলিস রোগ সর্দারের মাথায় তখন নানা রকমের পোকার বাসা বানিয়ে ছিল। তার পূর্বে গুরুর হালচাল দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হোয়েছিল কালুর। সর্দারের বোধ হয় মাথা খারাপ হোয়ে গেছে।

একদিন সে বললে, “মাষ্টর, চুরি করে আমাদের ত পেট ভরছে, কিন্তু বহু লোক তো ভূঁখা থাকছে। লাভ কী চুরি করে?”

“সকলকে খাওয়ানোর ভার আস্তার, আপনি আমি কী করব?” কালুর উত্তর।

“কিন্তু ভূঁখা মরবে। কবে আস্তা খাওয়াবে, তার জন্য বসে থাকব?” কেমন নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সর্দার।

এসব মন্তিক-বিকৃতির লক্ষণ। অথবা বেশী বয়স বিধায় বোধ হয়, বৈরাগ্য দেখা দিয়েছিল। বুড়ো কালে নাকি এমন হয়। কস্বী তস্বী টেপে তখন। আরো আলামৎ, সর্দার তাড়ি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে, ধরলে হইক্ষি। এবার হইক্ষি পর্যন্ত ত্যাগ করলে। তার কয়েক দিন পরে একদম উধাও। মুষড়ে পড়েছিল। গুরুর কথা কানে বাজত, “মাষ্টর, মনে শান্তি পাইলেই। পেটের জন্যে গেরস্ত্র সর্বনাশ করি, নেশায় নেশায় একটা কিছু হোয়ে যায়, কিন্তু মন বসে না কেন? ... চুরি করে নিজে না হয় বাঁচলাম, কিন্তু দুনিয়ায় ত আরো মানুষ আছে। সবাই চোর বললে কী বোঝা হাজ্বা হবে? লোম ছিড়লে মড়া হাজ্বা হয়?...” এখন সব মারফতী কথা বেচু সর্দারের মুখে। কালু প্রথমে মনে মনে হাসত। কিন্তু স্টিয়ো নিরুদ্ধেশ হওয়ার পর মাঝে মাঝে কত দিন না সে বিমিয়ে পড়েছে। ছেড়ে দিলে কী হয় এই সব রাহাজানি, খুনখারাবী? কিন্তু খাব কী? কিন্তু এমন প্রশ্ন সাময়িক কালুর কাছে। তার তাজা রক্তে হৃদয় কত বন্যা ডাকে, তখন ওসব বুজুর্কী তৈ পায় না। গুরু বিদায়ের পর কালু ব্যবসায় আরো মন দিলে। সকলে তাকে ভয়-শ্রদ্ধায় বা যাই হোক, আদরেই ধরা যাক না, মাষ্টর ডাকে। গুরু গেছে, তার দেওয়া খেতাব মেটেনি। বরং সার্থকতা আরো ফলতে শুরু করল। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে জার্মান, ইংরেজ, রুশ, আমেরিকা, তামাম পৃথিবী। কত কী ওলট-পালট শুরু হোয়ে গেল। কালু তা হাড়ে হাড়ে টের পেলে। গুণ নাম তার শুধু নিজের মহল্যায় আটকে ছিল না। লোকে ভয় করত বৈকি। কিন্তু মনে মনে যে ছোট-লোক ভাবে, দূর ছিঃ করে? একটা খটকা। ‘বেঁচে লাভ কী’ যদি মানুষের ভালবাসা না পাই? ওস্তাদের শেষ দিক-কার কথা মনে পড়ে যেত। কিন্তু খটকা মুছে গেল একদিন, সে গুণ হোক আর যা-ই হোক, সে সম্মানে কারো ছোট নয়। সমাজে যারা ইঞ্জিনের চিল্কোঠায় বসবাস করে, তারাও তাকে কম সমীহ করে না। ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটে যায় :

পুরাতন শহরে মাত্র তিন কামরায় আরো পুরাতন বাড়ীতে তখন কালু বউ আর মেয়ে নিয়ে থাকত। রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্য চুনকাম মারফত পুরান জীৱন্তা হটিয়ে দিয়েছে

সে। আশেপাশে সব বস্তী। দু'একজন অবস্থাপন্ন লোক আছে। তারা ছোটখাট ব্যবসাদার, ধনী কসাই বা ঐ কিসিমে পড়ে। জোরেসোরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লেগেছে। দেশময় জিনিসের টানাটানি। কাপড়, চাল, ধান, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের টানাটানি। তার ফল, জান্ম নিয়ে টানাটানি। ইঞ্জৎ নিয়ে টানাটানি। এই সোজা কথা লোকে কিছুটা বুঝতে শিখেছিল। তাই স্থানীয় এক কাপড়ের কলে ধর্মঘট চলতে থাকে। কালুর কাছে এসব খবর কোনদিন আসেনি। তার নিকট সংবাদ এলো। কিন্তু সূত্র আলাদা। একদিন তার বাড়ির সামনে এক ঢাউস গাড়ী এসে ব্রেক কষ্ট। দু'জন লোক নামলেন। পরণে শার্ট কামিজ। একজনের হাতের আঙ্গিন গুটানো। রূপালি চেন-বাঁধা দায়ী সোনালি রঙের ঘড়ি চকচক করছে। উভয়েই তন্দুরস্ত শরীর। জেল্লা ফেটে বেরুচ্ছে। কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে দিয়েছিল কালু। রাস্তায় গাড়ী আর অচেনা দুই ব্যক্তি দেখে সে ঘাবড়ে যায়। তার দুর্ক্ষর্মের কিছু হিসিস পেয়ে এন্কোয়ারীতে এসেছে নাকি এরা? পাপ চাপ থাকে না। কথাটা ফলছে নাকি এই কলিকালে? একটু উঠিপ্পি চোখে আর মনে মনে হিসেব-নিকেশের দ্রুত মেশিন চালিয়ে যেতে কালু জিজ্ঞেস করেছিল, “কা'কে চান?”

“আপনি কি, কালু সাহেব?”

মিয়া থেকে এক লাফে সাহেবে উত্তরণ তার জীবনে সেই প্রথম। আরো উত্তরণ ঘটেছিল পরে আন্দেশা সহজে শুছে যায়। কালু স্বাভাবিক গলায় জবাব দিয়েছিল, “জী”।
“আপনাকে দরকার আছে একটু”।

“আসুন”। ব'লে ফেলেও কালু মনে মনে বেঙ্গলসরমেন্দা হয়। এই সাহেবদের বসতে দেওয়ার মত ত তার জায়গা নেই। ধনী লোকের বাড়ী সে বহু দেখেছে নৈশচর জীবনে। কোচ, সোফা, কাপেট তার অজানা কিছুমুঝ। একবার ত উচু পায়াওয়ালা সোফায় তার নসীব খুলে দিয়েছিল। এক বাচ্চা ছেলে তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। রাত্রে ভেতর থেকে শিকল খুলে দেয়। তারপর বেশ দিউয়ের চুরি করতে পেরেছিল তারা। চারটে চেয়ার অবিশ্যি তার বসার ঘরে আছে। ময়লা পালিশচট্টা। যাহোক, আসুক। মেহমান মানুষ।

চা খেতে চায়নি তারা। তবু কালুর জিদের কাছে তাদের হার মানতে হয়। তাদের বিনয় এবং কাচুমাচু ভাব সেদিন কালুকে হয়রান করে তুলেছিল। এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। অবশ্যই আছে। দা এবং কুমড়ার রেস্তা। এখন ত হরি এবং হর যেন দুই পক্ষ। বেশীক্ষণ অঙ্ককারে ঝুলতে হয়নি কালুকে। চা-পানের সময় ধীরে ধীরে তারা এই গলিগন্তব্যের উদ্দেশ্য খোলাসা করল। কাপড়ের কলে এক মাস ট্রাইক চলছে। তারা মালিক এবং ম্যানেজার। উভয়ে কালুর দ্বারস্থ। এমন ব্যবসার সঙ্গে কালুর কোন পরিচয় ছিল না। সে-রীতিমত হক্চকিয়ে যায়। সে কী করতে পারে? কিন্তু পরে আলাপ-আলোচনায় জেনেছিল, তার খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত। তার সঙ্গেপাঙ্গদের নিয়ে সে তাদের নানা-ভাবে ধর্মঘট ভাঙ্গার হাতিয়ার হোতে পারে। নতুন জগৎ এবং রোজগারের জগৎ কালুর সম্মুখে। সে তবু কিছু হিসিস করতে পারে না। সব যেন ভানুমতীর বাজি। এই শরীর মানুষদের কাছে তার খাতির এত। স্বর্ণময় সিগারেট-কেস থেকে আধেয় বের করে তাকে উপহার দিতে মালিক নিজে এতটুকু ইতঃস্তত করলে না। এত ইঞ্জৎ আল্লা তার জন্য গোপনে জমিয়ে রেখেছিলেন? সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা! ম্যানেজার নগদ

দু'হাজার টাকা তার সামনে রেখে বলেছিল, “আপনি রেখে দেন, আপনার যোগাড় যন্ত্রে দরকার হবে।” মানুষের মর্যাদা নেই? টাকাই সব? এই মাত্র খাতিরা লোকের কাছ থেকে টাকা নেওয়া কালু মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি। অপর পক্ষে ভাবলে, দর কষাকষি করছি। আরো দু'হাজার রাখলেন মালিক নিজে। ধাঁধাঁয় ঘোরে কালু। এদের কী করে বুঝাবে, সে শুণা, চোর, বদমাস— সব কিছু। কিন্তু টাকার সঙ্গে তার এমন সম্পর্ক কোনদিন আজো ঘটেনি। হার মেনেছিল কালু। টাকা নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। রোজগারের অনেক দরজা। সেই সাত্ত্বনা। স্ট্রাইক ত ভেঙে গেলই। কালু মালিকদের সংস্পর্শে আরো ঘনিষ্ঠ। তাদের দ্রয়িংরুম ডিনার-টেবিলে সেও আমন্ত্রিত। ম্যাপ্ফেষ্টোর থেকে ট্রেনিংপ্রাণ্ড ইঞ্জিনীয়ার পর্যন্ত তাকে সমীহ করে। হঠাৎ-হঠাৎ টাকার প্রতি নেশা থাকে না আর কালুর। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে হনিস পায়। সব ব্যবসার নিক্ষি উপর। তার ক্ষমতা আছে, তাই তার খাতির। লোকে বলে শুণামি ঘৃণ্য। কিন্তু শরীফ লোকই যখন শুণা পোষে তখন এখানে অবজ্ঞার কী থাকতে পারে? আর এক সমাজের স্তরে তার জ্ঞানগা আছে কয়েক মাসে কালু বেশ উপলক্ষ্মি করেছিল। আগে হঞ্জায় হঞ্জায় প্রায় থানার বড় বাবুকে সালাম দিতে হোতো। এখন তিনিই তার হাত তোলার আগে হাত তুলে বসেন। চেয়ার থেকে উঠে বলে, ‘বসো, কালু মিয়া।’ এখানে এখনও মিয়া পদবী মৌরসী আছে। তবে খোদাই ইচ্ছা। এখানে কলের সাহেবদের সম্মোধন একদিন শোনা যাবে বৈকি। পুরাতন শহরেই সে বাড়ী বদলাল। আরো একটা কামরা বেশী। বাতাস বেশী। তবে পরিষ্কাশ পূর্বের মত। ভদ্রলোকদের সঙ্গে তার মহৱৎ গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাশাপাশি থাকায় তার পোষাবে না। সে ত মূর্খ। এই খোচানির থেকে রেহাই পেতে কালু সত্য একটা মাষ্টার রেখে দিলে। লুকিয়ে লুকিয়ে সে পড়ে আর হাতের লেখা লেখে। বেশী ত চায় না। নাম-সই করতে পারলেই যথেষ্ট। যোটামুটি বাংলা খবরের কাগজ পড়া আর ইংরেজীতে নামসই রশ্ম করতে তার বেশী দিন যায়নি। তবু ভদ্রপাড়ায় গিয়ে থাকার কথা কালু ভাবতে পারে না। মনের কোণাচে কোথায় যেন বাধা। তার লুঙ্গি, পাজামা খসে খসে পাতলুনে পৌছানো প্রায় শুয়োপোকার প্রজাপতি হওয়ার কথা। সবই পালাক্রমে। সবই কিছু রোজগার আর কিছু মনের তাগিদ, সংসর্গের তাগিদ। শরীফদের সঙ্গে উঠাবসা করতে হয়, তখন লেবাস বদলাবে বৈকি। কিন্তু তার শিকড় ত আরোও নীচুতলার লোকের সঙ্গে। তাই চটচট কিছু করেনি কালু। সঙ্গীদের চোখ না টাটায়। ওরা পাছে না ভেবে বসে, মাষ্টর আর তাদের নিজের লোক মনে করে না। এমন ধারণা জন্মালে একদিন ঘাড় ঘটকে চলে যাবে। ভূতের দলে থাকতে গেলে শিব হোতে হয়। সব জানো অথচ কিছু জানো না। ভান আর ভাং দুই দরকার। ভাং ভুলে থাকার জন্যে। ভান নিজের ভেতর টাকার জন্যে। এমন দো-টানায় পড়ে বহুবার কালু ভেবে ছিল, তার চেয়ে রিঙ্গা টানাই ভাল ছিল। এত ঝক্কি পোয়াতে হোত না। কিন্তু রাস্তা এতদূর অতিক্রম করে এসেছে যে, আর ফেরার প্রশ্ন অসম্ভব কল্পনা মাত্র। সুতরাং ভূত নাচাতেই হবে সারা জীবন। সাহেবরা তাকে নিয়ে এমন নাচের মহড়া দিচ্ছে নাত? এমন কথাও মনে উঠেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু তা ভেবে লাভ নেই। খাও, দাও, কামাও। ফুর্তি করো। মেয়ে মানুষের নেশা কেন যে কালুকে পেয়ে বসেনি সে কোনদিন বলতে পারবে না। তাই সময় কাটে কম। লেখাপড়া শিখে একটা উপকারণ হোয়েছে গোয়েন্দা কাহিনী

সে খুব পড়ে। মাষ্টারি রাখতে গেলে এসব জানা দরকার। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে আঙ্কেল লাগে। অবিশ্যি রূপার পাতের কাছে সব মিয়া বশ। কিন্তু বই পড়তে ভালবাসত কালু। খবরের কাগজ সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। আর তাকে রণক্ষেত্রে যেতে হয় না। সেনাপতি লড়াইয়ের ময়দান থেকে বহু দূরে থাকে। কৌশল, পায়তারা যোগানোই তার কাজ। যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষ লাগল। তখন ক'দিন কাগজ পড়ে আরাম পাওয়া যেত না। খালি মৃত্যু, মৃত্যু। কিন্তু রোজগার বেশ বেড়ে গিয়েছিল তার। দেশে চুরি-ভাকাতি এত বেড়ে গেল, শহরে এত রাহাজানি হোতে লাগল যে ইংরেজ, বিদেশী সরকার তারও টনক নড়ল। একদিন খবরের কাগজ দেখে কালু বেশ অস্ত্রিহু হোয়ে পড়েছিল। এই জন্যে তার ধারণা, লেখাপড়া না শেখাই ভাল। মনের উপর চাপ পড়ে, ঝঝঝাট বাড়ে। দেশে নাকি নতুন আর একটা আইন হচ্ছে। গুণ্ডা-আইন আগেও ছিল। এবার তার সঙ্গে নতুন খেই জুড়ছে কর্তৃপক্ষ। এলাকার সৎ, গণ্যমান্য লোকদের ইশারায় শুধু সন্দেহের বশেই যে-কোন লোককে গুণ্ডা ব'লে গ্রেঞ্জার করা যাবে। শুধু সন্দেহের বশে? বেশ কথা ত? লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ? যে কেউ যে কারো নামে উক্ষে দিতে পারে। তার জন্যে এমন বিচার ব্যবস্থা? অবিশ্যি আইন-সভায় আইন পাশ হোলে তারপর বলবৎ করার প্রশ্ন। ভাবনা চিন্তার পানী সূতৰাং বেশী দূর গড়িয়ে লাভ নেই। কালুর সঙ্গীরা পর্যন্ত শুনে হয়রান। রুজি রোজগার যাবে না শুধু, বাল-বাচ্চা পর্যন্ত মরবে। মাষ্টার মুরুবি। চিন্তিৎ, কিন্তু সর্দারি রাখতে অভয় দিয়েছিল, ঘাবড়ে যেয়ো না।

দুনিয়ার মানুষকে সব ফেরেশ্তা বানানোর জেনে এখনও কেউ করেনি। কালুর মাথায় তখন খেলেছিল কাপড়ের কলের সেই মালিকেন্ট কথা। তিনি ত আইন-সভার সদস্য। আর বিশিষ্ট মেমুর। তাকে ছাড়া আইন পাশ হবে নাকি? দেখা যাক। দেখতেই গিয়েছিল সে। খাতির তার কমেনি, যদিও তার ডাক্ষিণ ঘন আর পড়ে না। কর্তা নিজেই ড্রনিং-ক্রমের ভেতর আর এক ছোট কামরায় তাকে চা খাইয়েছিল। তারপর আসল কথায়। কর্তা প্রথমে বিশ্বাস করেনি। শেষে হেসেছিল। আইন পাশ করতে হয় বৈকি। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা নচেৎ থাকে কী করে? কিন্তু তার ত ভোট আছে, দ্ব্দ্বা আছে। কালু আঙ্গুল দিয়েছিল ওইখানে। সেদিন কর্তার জবাব শুনে থ' বনে গিয়েছিল। এই ব্যক্তিও অসহায় হোতে পারে নাকি? এত ধন-সম্পদ, রব্বদ্ব প্রতিপত্তি। সেও অসহায়? কানে কথাটা বাজে।

“মিয়া, আমি সরকার পক্ষীয় লোক, কথা ঠিক। কিন্তু সরকার যদি কিছু করতে চায়, আমি বাধা দিতে পারব না।”

“কেন, সাহেব।”

“আমারও ত দশজনকে নিয়ে কারবার? ওদের কথা না শুনলে মার কথা ওরা শুনবে কেন?”

“আপনার আবার কার কথা শোনা লাগে?”

“লাগে। আমাকেও ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে হয়। যুদ্ধের সময়, দেখছ পদে পদে আইন। চালের কন্ট্রোল আগে কোন বাপের জমানায় শুনেছিলে?”

“তা শুনিন।”

“এখন শুনছ। এখন গভর্নমেন্টের কথা আমি না শুনলে ওরা আমার কথা রাখবে

কেন?” কালু সেদিন সব হাদিস করতে পারেনি। তবে বুঝেছিল, দুনিয়াটা আরো জটিল। কত গাছের শিকড়, কতো রকমে, কত দিক দিয়ে জড়াজড়ি করে চলেছে। তা অত সহজে চোখে পড়ে না।

“তাহোলে আমরা মরব?”

“মরবে কেন?”

“একটু শক (সন্দেহ) হবে, আর ধরে নিয়ে গারদে পুরবে।”

“মগের মূল্যক নাকি?”

“তাছাড়া কি? বিচার হওয়ার আগেই গারদ। মগের মূল্যক না?”

“কিন্তু তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?” কলের মালিক বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল।

আরো কী বলত, কিন্তু কালু মাঝখানে বেড়া তোলে, “সাহেব, আমাদের আর আপনাদের দরকার নেই।”

“কে বললে নেই?”

‘তাই ত মনে হয়। আছা, না হয় আপনাদের নেই দরকার থাক। কিন্তু আপনাদের কোন উপকারে কি লাগিনি। সেবার শবগঞ্জের মিটিংটা যে ভেঙে দিলাম, শুধু আপনার কথার উপর। আপনাদের বিরুদ্ধে পার্টি একটা কথা আর বলতে পারলে না। উল্টে ওদের মাইকটা পর্যন্ত উধাও হোয়ে গেল। বলুন, আমরা নাথাকলে, আপনাদের পার্টি এতদিন টিকত?”

কালুর চ্যালেঞ্জ-রঙিত স্বর সেদিন ছোটকামরার মধ্যে আটক থাকেনি। ম্যানেজার পর্যন্ত ড্রয়িং-রুম থেকে ছুটে এসেছিল। মগে থেকেই কিছু আঁচ করতে পেরেছিল বোধ হয়। তাছাড়া, কর্তা একদম জ্যান্ত প্রেস্কুর সাপের সঙ্গে মুখোমুখি। কখন কী করে বসে কে জানে। ছোট লোক ত। ম্যানেজার কালুর আরো অভিযোগ কান পেতে শুনেছিল প্রথমে। সোজা কথা, “স্যার, এক মাঘে শীত পালায় না, আমাদের দরকার পড়বে একদিন না একদিন।”

কিন্তু ম্যানেজার বিলেত ফেরৎ। সে আবার হেসে উঠেছিল, কালুর কাঁধে হাত রেখে। তখন মালিক কী বলতে গেলে, তাকে থামিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজার, “স্যার, আমি ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আছা, কালু সাহেব, আইন ত দেশে কতই আছে।”

“তা আছে।”

“সব আইন মত কাজ হয়?”

“তা হয় না।”

“তবে আর ঘাবড়াচ্ছেন কেন। তাছাড়া আপনাকে ধরছে কে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে?”

“কিন্তু জনাব, আমার দলবল নিয়ে আমি। তারা ছাড়া আমি কে?”

“তাদের ব্যবস্থা আপনি করবেন। আপনার ব্যবস্থা যেমন আমরা সব সময় করতে প্রস্তুত আছি। এই রকম দুনিয়ার ধারা। শিকলের আংটার মত। আমি আপনাকে ধরে আছি, আপনি আমাকে ধরে আছেন, আর একজন আর একজনকে ধরে আছে। এই ভাবে

চলছে দুনিয়া।”

“কিন্তু স্যার, আইন করবেন আপনারা আবার আইন ভাঙবেনও আপনারা। তবে ওটা করার দরকার কী?”

মালিক তখন এগিয়ে আসে দার্শনিক হাওয়ায়, “কালু, সাহেব, এই হচ্ছে দুনিয়া। কোথা দিয়ে যে কী হয়, কেউ জানে না। জানেন তিনি—,” তারপর চোখ বুজে তর্জনী উর্ধ্বে তুলে উচ্চারণ করলে, “সব তাঁর ইচ্ছে। তুমি আমি কি? কিছু না। পুতুল। তিনি সুতো নাড়েন, আমরা নড়ি।” সত্যি এই কথা, লাখ কথার মধ্যে এক কথা। অনেক অঙ্গোয়াস্তি ছিল, কিন্তু কালু, সেদিন আর তেমন উদ্বেগের মুখে পড়েনি। তার নিরাপত্তা যখন আছে, দলের মাথার উপর ছাতা আছে। সত্যই ত সে বিরাট বটগাছ ছাড়া আর কী? তলায় কতজন আশ্রিত। বটগাছেই যখন ঝড় লাগছে না, তখন ওদের আর কী ভয়? আর মাসে মাসে তাকে কিছু মরবলি দিতে হয়। অবিশ্যি মুগ্র-কাটা বলি নয়। এই ধরন আলাদা। কালুর সেকথা মনে উঠলে বেশ হাসি পায়। কাছে লোকজন থাকলে সেই হাসি গৌপের আড়ালে খেলে যায়। থানার এক বড় বাবু ছিলেন। চুরি বেশী বেড়ে গেলে, তিনি ডেকে বলতেন, “কালু মিয়া, এলাকাটা যে তোমাদের একদম রাজত্ব বানিয়ে নিলে।” কথার মাত্রা মাত্র। ইঙ্গিত বুঝে নিতে কালুর বিলম্ব ঘটত না। মানীর মান মানী জনেই রাখে। ওদের প্রয়োজন হয় উপরালার কাছে মুখ রক্ষা। দেখা গেল, দলের দু'জন ধরা পড়ে গেছে। শাস্তি হোয়ে যেত এক বছর, দু'বছর জেল। তখন তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হোত যদিন না বেরিয়ে আবার তাঁরা রোজগার করে। বালবাচা সবায়ের সমান। কেউ কোন দিন বলতে পারবে না, কালুকারো পরিবারের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছে। গুণ্ডা-আইন পাশ হোলে ধরে নেওয়া যাবে, ধরচ কিছু বাঢ়বে। বুকির ব্যবসায় গায়ে আঁচ লাগতে দেবে না, এমন হয় না। সেদিন ওঠার পর ম্যানেজার নিজের গাড়ী ড্রাইভ করে’ যে জায়গায় কালু নামতে চায় তাকে এমন জায়গায় পৌছে দিলে। রাস্তায় আর বেশী কথা হয়নি। তার মত জাহেল লোক দুনিয়ার কত রূপ না দেখতে পেল। আজ পেটের ভাতের অভাব নেই। আল্যার কাছে শোকর। দুনিয়ার কত মার, কত প্যাচ। রিঞ্জা টানলে এসব ত সে দেখতে পেত না। নিজের রাশভারী ব্যক্তিত্ব সেদিন যেন নতুন ধরা পরেছিল কালুর কাছে। বাড়ী পর্যন্ত আসেনি সে। পথে এক জায়গায় নেমে পড়েছিল। সামনে পার্ক। দুপুরে খিলমিল গাছের ছায়া, নানা রকমের সবুজ লতার বেষ্টনী, শাপলা ভরা ঝিলের হাওয়ার স্পর্শ লাগুক তার গায়ে। যত এগোও, তত ঝঝঝট। এখানে এখন লোকজন কম। এমন নির্জনতার মধ্যে কালু সারা সকাল তলিয়ে দেখলে। কিন্তু তল পেলে না। কিন্তু একটা অতি-চাপা খুশীর ভাব তাকে বেশ উদাস করে রেখেছিল। আজ ট্যাঙ্কি না এনে সে ভালই করেছে। খুব জোর স্পৰ্শে চালাত গাড়ী। জোর, জোর, জোর। এ্যাক্সিডেন্ট করে বসত হয়ত। তখনও তার নিজের গাড়ী হয়নি। হব-হব করছে। কিংবা সামর্থ্য থাকলেও কিনতে ভয় পেত। আশপাশের লোক কি বলবে? পাড়ায় থাকলে কানাঘুষা, চোখ-টানাটানির প্রতি সম্মান রাখা উচিত। অবিশ্যি যখন পাড়ায় থেকেও তুমি অনেক উপরে-উপরে ওড়ার কুণ্ড পাবে, তখন কিছু যথেছাচারী হোতে পারো। তাই এক ট্যাঙ্কিওয়ালা ছিল তার তাঁবে। চোরাই মালপত্র সরাতেও গতির সাহায্য চাই। নচেৎ

বেগতিকে পড়বে। তাই চারচাকাবাহী ইঞ্জিন দরকার। অনেক কিছু দরকার। সবই পেশার চরিত্র অনুযায়ী। অন্ততঃ একজন স্যাকরা ত লাগে। সোনা আর গহনার ফারাক কালু কাজে নেমে বুঝতে শিখেছিল। সোনা আল্লার মিয়ামৎ, আল্লার দান। তার মালিক স্বয়ং খোদা। কিন্তু গহনার মালিক তিনি নন। গহনা শহরে কোন বাসিন্দার। নর, নারী যাই হোক। এই পার্থক্য না-বোঝার ফলে একবার বহুৎ গচ্ছা, বহুৎ দাঁড় (দণ্ড) দিতে হোলো। মুছুরী, পেশ্কার, নাজির, উকীল সব খেয়ে ফেললে, প্রায় এক শ' ভরি সোনা। সেই প্রথম প্রথম ব্যবসা। এত গলির হনিস সে জানে না। তখনই সে বুঝেছিল, চড়ই পারী, ছাতার পারী, কাক-চিল, বাজপারীর তফাণ। তার যত চড়ইরা এক দানা ক্ষুদ পেলে খুশী। কিন্তু যত পারীর শ্রেণী বাড়ে, আহারের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়। এক শ' ভরি সোনা খেয়ে ফেললে মাত্র কয়েক জনে। তার রোজগারে কত ঝুঁকি ছিল। হাতে এলে এক বছর নিচিস্তে বসে খেত। কিন্তু হাতে এসেও ফকে গেল। কানাঘুষায় সে উনেছিল, উকীল সাহেবকেও উপরে ভাগ দিতে হয়। অর্ধাং দুনিয়ার যয়দানে বহু তীর্থ, বহু মাজার। সিন্নি দিয়ে যাও, দিয়ে যাও। শেষ পর্যন্ত তোমার কিছু নাও থাকতে পারে। কিন্তু উপরে ঝুঁকি ক্রমশঃ করে আসে। কালু জানে, ধরা পড়লে নির্ধাং তিন বছর শ্রীঘরে ঢুকিয়ে দিত। হাতেনাতে ধরা পড়েনি। তাই রক্ষা। কিন্তু ভাসা-ভাসা অপরাধের জন্য তার এক তাল সোনা চলে গেল। অথচ যারা আসলে খেলে, তারা কোন কসুর করলে না। সেই ধাঁধায় এখনও কালু ঢুকে আছে। কোন কৌতুহলেই বেরোনোর। কিন্তু একদিন, টাট্কা সেদিন শুধু প্রশ্নটা সামলে খাড়া হোয়েছিল। অবিশ্য সে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু অপরাধের প্রশ্নয়-দান ত অপরাধ। তবে?.... কিন্তু সেদিন প্রসন্ন পার্ক কালুর মৃত্যার উপর কোন আলোকপাত করতে পারেনি। কারণ, সকালের রহস্য-ঘোর তার চেয়ে অনেক বেশী অঙ্ককার-লিঙ্গ আশপাশের বৃক্ষরাজির সঙ্গে একাত্ম কালু নিজের জৈবিক তাগিদে সিগারেট ফুঁকেছিল এক, দুই, তিন— হয়ত আরো। তখন অবসরের মাত্রাও খুব কম নয়। কালু, তাই ভাবতে পারত। ছেলেবেলা থেকে তার এমন অভ্যেস। গ্রামজীবনের ক্ষেত্র থেকে নানা দুর্বিপাকে বিহিন্ন, শহরতলীর পার্কে এসে কালু যেন সৃষ্টির রহস্য বুঝতে চায়। ভেতরের চাপা খুশী এক একবার উপরে ঘাই তুলে স্টান তেসে থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু সব ঘুলিয়ে যায় কালুর চোখে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু দেখতে তার মন বিমুখ। আমগাছগুলোতে একটা বড় ঝিঁঝি পোকা হঠাৎ-হঠাৎ ডাকতে গিয়ে কিড়িড়িড়ি কী রকম একটা বিকট শব্দ তোলে। কালুর তন্ত্যাতা ঢিড় খায় না সহজে। তখন ভুঁক কুঁচকে সে জোর দুই দমকা নিঃশ্বাস নিল। একদা নেশা বেড়ে ফেলার জন্যে প্রয়োজিত অন্ত। কাজ হোলো খুব সহজে। হোটেলে গিয়ে এক টেক বীয়ার পানের পর শিশ্যদের সঙ্গে কাজকর্মের খতিয়ান শুরু করলেই এই জাতীয় অঙ্গোয়াস্তি পালাতে রাস্তা পাবে না। হাই তুলে উঠেছিল কালু, পার্কের বেঞ্চে ছেড়ে। আবার চাপা খুশীর পোচ দুনিয়ার দেওয়ালে। নিকটস্থ একটা রিঞ্চায় চেপে হকুম দিয়েছিল কালু, ‘হোটেল মমতাজে যাও।’ অর্ডার হাঁকার পর তার চোখে পড়ে, রিঞ্চালক বুড়ো। পঞ্চাশের কম নয়। তখনই আবার হকুম, ‘থামান, মিয়া সাহেব।’ নেমে পড়েছিল কালু। তারপর চালকের হাতে এক টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল, ‘মিয়া সাহেব, আপনার

কামের ক্ষতি করলাম। আমি অহন যামু না।” রিঙ্গাচালক ত থ’। খামাখা সে টাকা নেবে কেন? সে জবাব দেয়, “টাকা দ্যান ক্যাতা?”

‘মিয়া লন, রিঙ্গায় উড়ছি ত।’

‘এক টাকা নিয়ু, ক্যা?’

‘কত নিতা চান?’

‘এক পয়সাও না।’ চড়তেন হে আলাদা কথা ছিল।

‘চড়ছি ত।’

‘সাব, আমার গায়ে মানুষের চাম নাই? ভুলে চড়ছেন, দুই গজ যায় নাই। ভাড়া নিয়ু, কি কল? আপনের টাকা আপনে লন।’ টাকা এগিয়ে দিয়েছিল রিঙ্গাওয়ালা। কিন্তু কালুর জিন ধরে গিয়েছিল। বললে, রিঙ্গা যখন সে চড়েছে ভাড়া দেবে বৈকি।

‘এরে রিঙ্গা চড়ন কয়?’

‘তয় কি কয়?’

‘সাব, আমার সময় যায়। অত হজ্জুৎ করার সময় নাই। লন আপনের টাকা। ভিক্ষা দিয়া অপমান করবেন না।’

কালু কিন্তু টাকা না নিয়েই আবার পার্কের দিকে এগোয়।

রিঙ্গাওয়ালা তখন হেঁকে বলে, “সাব আপনের নোট এই রাস্তার উপর রইল। আমি ছুঁতে পারুম না।”

সত্যই সে কাগজের নোটখানা পীচ-ঢালা রাস্তার উপর রেখে দিয়েছিল। মৃদু বাতাসে তা কালুর দিকে উড়ে উড়ে এগোতে থাকে কেন। কালু তখন পেছনে না তাকিয়ে পারে নি। সত্যি নোটখানা রাস্তায় পড়েছে, একটু একটু উড়ে যাচ্ছে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল কালুর। সে রাস্তা থেকে নোট ভুলে নিয়ে আবার রিঙ্গাওয়ালার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বেশ চড়া গলায় তখন বলে, “ভাড়া নেবেনা কেন?”

“ভাড়া ত হয় নাই।”

“রিঙ্গায় চড়েছি না?”

“হে ত চড়ছেন।”

“তয় ভাড়া লন।”

“এক টাকা নিতে পারি না।”

“কত নিতা চান?”

“চার আনা নিতা পারি। যা ভাড়া অয়।”

“তাই লন।”

রিঙ্গাওয়ালা টাকা নিয়ে বারো আনা, একটা সিকি, একটা আধুলি কালুর হাতে দিলে। পকেটে ফেলে কালু এগোয় আবার পার্কের দিকে। রিঙ্গাওয়ালা চেয়ে থাকে। হ্যাত ভাবে, লোকটা বোধ হয় পাগল অথবা পাগল হওনের পথে। কালু নিজের মেজাজের জন্য কোন লজ্জাবোধ করে না কিন্তু তার মনে হয়, পার্কে কিছুক্ষণ বসে থাকলে তার মাথার মধ্যে আরো জট ধরে যেতে বাধ্য। এই সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখা গেল

পার্কের উত্তর কোণে, সীট ছেড়ে সেই দিকে ছুটে গিয়েছির কালু। পার্কের ভেতর দিয়ে রাস্তা। এখানে বিজন ছায়ায় বসে বসে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে, একটা সুখ ছিল। তার বাল্য জীবনের উপর অনেক পলিমাটি পড়ে গেছে। পলিমাটি, পাঁক। একটা ফাটল ধরল যেন সেইখানে হঠাতে এই তাতা দুপুরের রোদে। পাশে খিলটা আয়নার মত সূর্যের আলো প্রত্যাখ্যান করছে চতুর্দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে একবার কালু। কিন্তু তার সময় নেই। একটা হাঁক দিয়ে ফিটন থামাতে হয়। নচেৎ হঠাতে যানবাহনের জন্য আরো না হেঁটে উপায় নেই। কিন্তু কালু হাঁক দিতে গিয়ে বুঝতে পারে তার কষ্টের তাগদ সে যেন কোথাও ফেলে দিয়ে এসেছে। তার গমগমে গলার আওয়াজ সম্পর্কে সে অতি আস্থাবান। তার ধরকে কারো পিলে চমকাবে না, বিশ্বাস করা কঠিন। কত গৃহিণী সুড়সুড় চাবি খুলে দিয়েছে, তাকে আর হাত দিতে হয়নি পর-স্ত্রীর গায়ে। প্রায় একটা ক্ষুদ্র দৌড় মেরে দিলে কালু। পরিচিত রাস্তা ছেড়ে সে কেয়ারীর অলিগলি দিয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটা নয়, ছোট দৌড়। কারণ, ফিটনখানা নিজের মনে এগিয়ে চলেছে। কু-পথ, কিন্তু কাটা-খোঁচা থাকার সংস্কারণ নেই। কিন্তু এক দিকে হাওয়া-সেবীরা খোপের আড়ালে মুতে যায় স্বচন্দে। তেমনই জায়গায় এসে পড়ল কালু। এখানে মাছি ভ্যানভ্যান করছিল। নাকে বিশ্রী গন্ধ যায়। ঠোট কুঁচকে রেহাই নেই। একটা মাছি জেট-প্লেনের মত ডাইভ মেরে গেল একদম কানের গোড়া ঘেঁষে।

থুঃ থুঃ...

মাস্টর...!

কে তাকে ডাকে?...

মাস্টর...!

কে?

হঠাতে চোখ কচ্ছাতে কচ্ছাতে কালু খাড়া হোয়ে বসে। জানুর দিকে তার হাত স্বতন্ত্রভাবে চলে যায়। জীনের সাদা পাঞ্জুনের জমিন বুঝতে দেরী হয় না। হাই তুললে কয়েক বার কালু। তারপর থুঁমী তুলে প্রশ্ন-কর্তাকে দেখে সে। একটু বিড় বিড় শব্দেই বলে, “সদু।”

জী, মাস্টর।

কালু, দেখলে, সহকর্মী দাঁড়িয়ে আছে। সদু বেশ খর্বকায়। কিন্তু এমন সুগঠিত দেহ, যেন ছোট কাঠের একটা মুণ্ড। এই শরীরে আবার সেও পরে খাকী পাঞ্জুন। ফলে, দেখতে আরও নাটা মনে হয় তাকে। সদুর গায়ে সাদা হাফশার্ট, দুদিকে বুক পকেট। কালু তার দিকে বার বার চোখ ফেললেও তার যেন খোয়ারি কাটছিল না।

সদু নাড়া দিলে, “মাস্টর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না কি? আপনার বোতলে বীয়ার পড়ে আছে। গ্লাসেও খানিক। আইয়া দেহি দুই চোখ বুইজ্যা আছেন।”

“হ্যাঁ।” কালু, এবার সটান বসে গ্লাসে এক চুমুক দিলে। হাই তুললে দু-তিন বার, দুই দিকের বাজু আন্দোলিত করে। আবার কথার খেই ধরলে সে, “হ্যা, একটু নিম-খোয়ারি খোয়ারী লেগেছিল। বসো, তোমার খবর কী?”

সদু আদেশ পালন করলে। সামনে এক চেয়ারে বসে পড়ল।

কানু অবসাদ মুছে ফেলতে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করলে, “তোমার খবর কী? কিছু সংক্ষান করতে পেরেছে?” দেশালা’য়ের কাঠিখানা জুলছিল। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে কানু সদূর দিকে তাকালে।

“হ, খোঁজ পাইছি, কিন্তু আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নাই। চলেন পরে সব কইমু, বড় দেরী করে ফেললাম।”

“সেই ভালো। চলো, উঠে পড়া যাক। তুমি কিছু বীয়ার খাবে নাকি?”

“না, মাট্টের। একটা গ্লাস আন্তা কই। ওটুকুতেই হৈব।”

সদু নিজেই হাঁক দিলে, বয়।

গ্লাস এলো।

তারপর ঘট্ ঘট্ পানের পালা। হোটেল ছাড়লেই যেন দু'জনে বাঁচে। ব্যস্ততায় তারই নমুনা।

বয় বিল নিয়ে এলো। কানু ইশারা করলে, এখন যাও। পুরাতন খরিদ্দার। এক সময় মিটিয়ে দিয়ে গেলেই হয়। উঠল দু'জনে।

একটা জোলা পান্নার দরজা আছে হোটেলের প্রবেশ-পথে। সদু তা খুলে ধরতেই কানু গট্ গট্ এগিয়ে গেল।

একটি পত্র :

প্রিয় আমদানী,

...আমার নিজের ওকালতি আমি নিজেই শুরু করছি। তোমার সাদামাটা পত্রে আমি অবাক হইনি, যেমন আমার আগেকার চিঠিতে তোমার অবাক হওয়ার কিছু নেই। যোগাযোগ মিসুরীর সুতোর মত জিনিস। খুব সুস্থ। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সব মিটির বাঁধনের গোড়া ওইখানে। আমার হাসি পায়, তোমার পত্রের কথায়। চলিশের উর্ধে গেলেও আমার নাকি আকর্ষণ এখনও কমেনি। তোমার চোখকে সালাম। তোমার চিঠি পাওয়ার পর একচুটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। আমার দশ বছরের ছোট ছেলেটা পেছনে এসে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, ‘মা কী করছে?’ ঘুরে পড়ে ওকে কয়েকটা চুমু দিতে দেরী করিনি। মনের আনন্দের প্রকাশ এইভাবে হয়। তুমি কাছে থাকলে কী করতাম, খোদাকে মালুম। কিন্তু তোমার কথায় সব সময় যেমন থাকে, বেশ বাড়াবাড়ি ছিল। বয়সের ছাপ আমার চেখের কোণায়। মুটিয়ে গেছি স্বামীর গোয়াল-ঘরে টুঁকে। জাবনা প্রচুর পরিমাণে পাই। আজ আমাকে তুমি খুব গদ্য-গদ্য পাবে। কারণ কী জানো? কলিশন বা সংঘর্মের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। তোমার সুরে তার আভাস। এই স্বীকারোক্তির পেছনে তুমই সাহস যুগিয়েছ। আর হাসি লাগে কেন জানো? দু'-জনেই শিয়েছিলাম ইত্তাহিমের পঞ্চদশ বিবাহ বার্ষিকীর পার্টিতে। অর্থ সেইখানে দু'-জনে পরম্পরাকে আবার মনে মনে বিয়ে করে বসলাম। উল্টো আনন্দের ব্যাপার। তোমাকে ব্যাপারটা বলে রাখা ভাল। ইত্তাহিম পার্টি দিয়েছিল রাধিকার প্রেমে নয়, তার চোখ ছিল অর্জুনের উপর। ব্যবসা ত তার ক্রমশঃ চন্দ্রকলার মত বৃক্ষি পাচ্ছে। পদে পদে মুরুক্ষী ছাড়া চলে না। নতুন এক মুরুক্ষী দরকার। তুমি লক্ষ্য করে থাকবে, প্রে-ফ্যানেলের

পাঞ্জুন আর চেক টুই'ডের কোট পরেছিল এক ভদ্রলোক, চোখে বীমলেস সোনালি চশমা, দাঁত-গুলো উচু-উচু গোলগাল মূখ, চাপা পুরুণী দেখলে মনে হয়, পৃথিবীর চাচাতো ভাই, তাকে পাকড়াও করাই ছিল ইব্রাহিমের আসল মন্তব্য। দেখলে না, বার বার হইস্কির গেলাস-ভরে দিছিল। চিংড়ি-ভাজা অবিশ্য টুথপিকে গাথা, তবুও নিজে সামনে প্রেট না ধরে, নিজের হাতে তুলে ধরছিল। ইব্রাহিমের বৌর কাছে শুনেছি ওই অর্জনের এক অবিবাহিত বোন আছে, কলেজে পড়ে, ইব্রাহিম চায় তার এক খালাতো ভায়ের সঙ্গে জোড়া বেঁধে দেয়। অনেক রকম ব্যাপার আছে। উপরের, তলার, মধ্যের। সে-কথা যেতে দাও। আমি কিন্তু ইব্রাহিমের যত দোষ থাকে (সে বলে, সব মিয়াকে হাত করা যায়, কায়দা জানা চাই— কে কিসে পটে। কেউ রূপে মজে, কেউ রূপেয়ায়) তার কাছে আমরা ঝণী, বিশেষ ভাবে ঝণী। তোমাকে কোথায় পেতাম। জীবনের একটা পর্যায় এসেছিল। ইঁপিয়ে পড়তাম। সব আছে, অথচ কিছু নেই। এই ফাঁকা-ফাঁকা ভারের দৌরায় তুমি কিছুটা বুবোছ। আমি ত মেজাজ ঠিক রাখতে পারতাম না। কখনও বাড়ীর হজুরের সঙ্গে এক দফা লড়ে গেলাম। কখন চাকর-চাকরানীদের ধম্কালাম। আর গত এক মাস জানাশোনা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে, ঘন-কষাকষি হোয়ে গেল। একটা ছুতো পেলেই ঝগড়া। সময় কাটে না। সময় কাটাতে সঞ্চায় কারো ড্রয়িং-রুমে হানা দাও। তারপর কথায় কথায় কিছু বেঁধে গেল। একটা নমুনা দিলে বুবোবে। নাম বলতে পারব না, ধরে নাও পদি-পিসী। আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল সারা ইন্সুল জীবন। এখন হাজ্ব্যান্ড ভালই পেয়েছে। আমরা দু-জনে একদম গলাগিল ভাবে সেদিন ঝগড়া বাধল, কি নিয়ে জানো? একটা ফিল্যোর এ্যাকটিং নিয়ে। সে যা বলে, আমি বাগড়া দিই। শেষে ঝগড়াই করে বসলাম। অথচ কোন কারণ নেই। ফিল্যোখি এই মাত্র। তার ও বা কী বোঝে, আমি বা কী বুঝি? বেশ চড়াচড়া ব্যক্তিগত অক্ষমণ পর্যন্ত হোয়ে গেল। বারেক কারো কর্তা কাছে ছিল না। সেই থেকে আর তার বাড়ী যাইনি। এখন ভাবছি, একদিন গিয়ে মাফ চেয়ে আসব। মন ভরা থাকলে, ভরা থিলের মত, ঝিরিঝিরি বাতাস, সময় সর্বদা ধরা পড়ে, দেখায় সুন্দর। কিছু মনে করো না, অনেক লম্বা লম্বা চিঠি লিখছি আজকাল। তোমার সময় যাচ্ছে অনেক। কিন্তু আমাকে একটু খামখেয়ালী হোতে দিলে কী তোমার কোন ক্ষতি হবে? তা-হোলে জানিয়ে দিও। কিন্তু জানো, আমার মুখ থেমে গেছে। আজকাল আর তোড়ে কথা বলি না। জরুরী দু-একটা। কিন্তু তোমাকে লিখতে বসলে, হাজার হাজার বাক্যি কোথা থেকে এসে জুটে ভেবে পাই নে। তোমার সঙ্গে বসে দু'দশ ঘণ্টা আলাপ করব, তারও যো নেই। সবুর,...হতভাগী...সবুর।

হ্যা, তোমাকে একটা অনুরোধ। আমাদের প্রেম পরিণত বয়সের। এ ত আর ছোকরা বয়সের মর্জায়েংগা-মর্জায়েংগা ভাব নয়। খবরদার কোন উচ্ছাস দেখিও না কোন সময়। আমার স্বামী আছে, যেমন তোমার বউ আছে। তার উপর ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেই কলেজে পড়ে। সুতরাং বহু দিক রক্ষা করে চলতে হবে। ভাঙা নৌকা, পক্ষা কাঠ, বাতাস বেশী, কিনারায় বাঘ। কত দিক তাল সামলে চলা। দোহাই, উচ্ছাস দেখিও না। অনেক লোকের ভিড়ে কাজের ভিড়ে হঠাতে আড়চোখে একবার দেখে নেব: তুমি আছো— হয়ত দৃষ্টি বিনিময় হবে বা হবে না— কিন্তু সেই পরম সুখ। গোটা দুনিয়া তখন ভেসে বেড়াচ্ছে

সুরের হিল্লোলে ।

আর তুমি এমন হাসাতে পারো । আমাকে একদম গোকুর সাপ বানিয়ে দিয়েছ ।
এবার সত্য দণ্ডন দ্বারা তোমার কিছু মাংস তুলে নেব । তখন বুঝবে নাম নিয়ে খেলার
মজা । আমি কুব্রা...Cobra কোব্রা নই ।

জলদি জবাব দিও ।

ইতি

তোমার

কোব্রা

পুন :— চিঠিপত্র সাবধানে রেখো । এখন ব্ল্যাক্মেল করতে পারলে অনেক বেকারের
কিছু সুরাহা হয় । শহরের যদি বাইরে যাও, আগে জানিও । তুমি বাড়ীতে নেই, অথচ চিঠি
যাবে, তা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ।

কুব্রা

উক্ত পত্রের উত্তর :

আমার কোব্রা

...ফঁস্ফঁস... তোমার পত্র । তারিখ দাওনি । ঠিক করেছ । অনন্ত কালের কোন এক
বিন্দু থেকে যেন লিখছ । তোমার কথা পাঠাচ্ছ ।...স্বীকার করতে আপনি নেই, ইদানীং
আমার মনে প্রশঁস উঠেছিল । লেখাপড়া শিখে চাকরী করতে পারতাম । গেলাম আন্তর্জাতিক
ব্যবসায় । আমদানীকারক, ইস্পোর্টার । জানেচিত, নসীব আমার খুলে গেল । অনেক কিছু
পেলাম । কত বঙ্গ, সম্পদ, আয়েস-আরাম কিন্তু কিছু দিন থেকে আমারও মনে হচ্ছিল,
জীবনে আর কিছু কী নেই, যা আমি কৈছিন? অনেক জড়-দ্রব্য আমারও নেই । তার জন্যে
আফসোস ছিল না । তোমার মত মনের কোণায় শূন্যতা জমে উঠত । তখন মন কি যেন
খুঁজছিল । আমার ত অবাক লাগে । প্রেমে-পড়ার একটা প্যাটার্ণ আছে । কাঁচা বয়স,
অনেক স্বপ্ন, বাসনা কামনার জড়াজড়ি, কল্পনার ছড়াছড়ি । আমি ব্যবসাদার মানুষ । টাকা
আনা পাই গণি । সেখানে ওসব জমায়েৎ হয় না । ইত্বাহিমের কিছু খুৎ আমার মধ্যেও
পাবে । বহু অফিসারের বৌকে ভাবী ডেকেছি, বাজার-সরকারী করেছি প্রথম পন্তের
যুগে । আজ আর আমার সে সব দরকার হয়না । কিন্তু খালিখালি ভাব জেঁকে বসল । আমি
খুশী, তুমি মনের রেওয়াজে আঁঘকে ওঠো না । টাকা-পয়সা একটু বেশী হোলে এসব
আসবেই । সাফল্যের মধ্যে কিছু গেঁজে-ওঠা উপাদান আছে । এই গাঁজানির ফেনা চট্ট
করে মিলিয়ে যায় না । পেটের মধ্যে মাথার মধ্যে ‘ফুট’ তোলে, ঠিক ফলুই মাছের মত ।
তখন তা থামাতে হয় । অনেক ভেবেচিত্তে বিশেষজ্ঞরা শরাবের কেন্দ্রা বানিয়েছিলেন ।
'কেতাবুল আশ্রাবা' বা পানী সমন্বয় কেতাব আরব দেশে প্রথম লেখা হয় । নিচয় তারা,
না করে পারেন নি । মোদ্দা কথা, তুমি শরাব পানকারীকে শুকর মনে করো না । দেশী
রমণী হোলেও তুমি কলেজ পড়েছ । তোমার অনুভূতি চতুর বেশ প্রশংসন । নচেৎ আমাকে
এত নিকটে জায়গা দিতে না । অবিশ্য উচ্ছাস আমাকে ঘায়েল করেছিল, এখন স্বীকার
করছি । তুমি বলবে, জয়ের পর পরাজয় স্বীকার । না, না । রমণী-বিজয়ে অনেকে মাতে,

নিজের পৌরষের প্রতি শ্রদ্ধায় নয়, নিতান্ত খেয়ালে। সে-খেয়াল ঠিক বীরের নয়, কাপুরুষের। কাপুরুষ নিজের শক্তি সম্পর্কে আস্তাহীন। কাজেই জুজুৎসুর পাঁচ কম্বে, কি আরো কোনো কোশলে সে জিতের পথ প্রশংস্ত করে। বীরের ধর্ম তা নয়। সেদিন পার্টিতে একদম লনের কোণায় যে হাসি উঠছিল, তার মূল কেন্দ্র বহু নারী-জয়ী এক সাহেবের পরাজয়ের কথা। পকেট, সব কাপড় চোপড় পর্যন্ত মেরে নিয়ে গিয়েছিল। শেষে হোটেলের চাদর জড়িয়ে তাকে পালাতে হয় চুপিচুপি ম্যানেজারের কাছে দাস্থৎ রেখে। তুমি শুনলে হয়ত হাসতে। কারণ, তুমি সারল্যে বিশ্বাসী। অকপট হওয়ার মত দুনিয়ায় নাকি আর সুখ নেই। কিন্তু আমি ত পারছি না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমি তোমার স্বামীর দাবীদাওয়া কী করে মেটাও? কত অকপট হোতে পারো? যাক সেকথা। তোমার দর্শন-চিন্তা মাঝে মাঝে উৎকট ভাবে পেয়ে বসে। ছোট শহরে যাওয়া যায় বা কোথা? তবু তুমিই একমাত্র শরণ। সেদিনের মত সিনেমার টিকেট করে পাশের সীটের নম্বর আমাকে জানিয়ে দিও, আমি কিনে নেব। সঙ্গে ছোট বাচ্চাকে নিতে ভুলো না। ছোট শহর। কয়েকবার পাশাপাশি দেখলেই কানাঘুষা শুরু হবে। আমি অনেক সাবধান। সভ্য যুগে শালীমতা প্রচুর বাড়ে, কিন্তু আদিমতা করে যায় না। আসরের চাট্টনি হিসেবে নর-নারীর সম্পর্ক যেন এদেশেই সব চেয়ে উপাদেয়। বুড়োগুলো পর্যন্ত ওই এক জায়গায় জিভ-ঠোট আল্টো ভাবে রেখে পুরাতন দিনের মজা লোটে। তোমাকে চিঠি লিখতে বসে একটা অস্ত্রিতার হাতছানি অনুভব করি। তাই কথার খেই রাখা দায় হচ্ছে। দেখছ না, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম। আসল কথা, শূন্যতা। অথচ আজ আমার ফাঁকা-ফাঁকা ভাব নেই মনের কোথাও, এতটুকু। দু'জনের এই মিল বজায়ি থাকলেই আমরা নিজেদের খুঁজে পাব। সম্প্রতি আমার ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে মাল আনাই। গভর্নেন্ট অনেকগুলো আইটেম কেটে দিয়েছে। আমার পকেটে বেশ ঘা লাগবে। অন্য সময় হোলে আমার ঘুম হোত না। কত ছুটাছুটি করতাম এই অঙ্গোয়াস্তি নিয়ে। কাঁকে ধরব এই ঘাটতি-পূরণে। কে লাইসেন্স বেচবে। অথবা হঠাত রাতারাতি কোন ভাবীর দেবর সেজে, সব যে তার অফিসার স্বামী বা চক্রবীর লোককে বলে দেবে, আমাকে উদ্ধার করতে। এমন শত ঝুঁকি। তখন রাত্তায় সুন্দরী যেয়ে ঢোকে পড়লেও আমার কোন প্রতিক্রিয়া হোত না। একেই বলে আঘাতিক মৃত্যু। পৃথিবীর রূপরস গন্ধ থেকে বঞ্চিত। মনে করো না, সুন্দরী যেয়ে দেখলেই আমি হেদিয়ে পড়ব। তা না। পথচারী হিসেবে তুমি রূপের প্রশংসা করবে ত। আগেকার যুগে এটা পাপের সামিল হোত। না, আমি তা পাপ মনে করি না। একটা ভাল পেটিং দেখে যতটুকু প্রতিক্রিয়া হয়, একটা জীবন্ত মানুষকে দেখে যদি তোমার তা না হয়, তুমি মানুষকে অপমান করছ। এসব আমি ইদানীং বুঝতে পারছি, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর। হ্যাঁ, উঃ, বড় রাস্তা-ছুট খানা-খোল্দলের দিকে ধাইছি। আমার ব্যবসার বেশ ক্ষতি যাচ্ছে। কিন্তু কী মনে হয়, জানো? আমার সব চলে যাক। আমি দেউলিয়া হোয়ে যাই, আমার কোন দুঃখ নেই। তোমার একটু সান্নিধ্যই সব। সম্পদে তার দাম যাচাই হয় না। তুমি ভাবছ, আমাকে কবিত্ব ধরেছে। ভুল করবে। কাল একটা 'ডৌলে' বেশ কামিয়ে নিলাম। এক জনের এ্যাড্ভার্স লাইসেন্স আমি কেনার কথা বলে রেখেছিলাম। কিনিনি। আর এক খরিদ্দার পেলাম। শতকরা বিশ বিশ মুনাফা দিতে চায়। সময় নিলাম দু'দিন।

কারণ, আসল জিনিস ত তখনও বায়নার সিকেতে ঝুলছে। এই সময়ের জন্য কিছু বাহানা ধরতে হয় তা ধরলাম। আমাদের জগতে ফেরেশ্তা ঢোকে না, নিশ্চয় বুঝছ। এসব ধড়িবাজি যদি রঙ না করো, লাল বাতি জ্বালাতে হবে ফার্মে। মজা শোনো। আমি গেলাম, আমার বায়না-দেওয়া পার্টির কাছে। সবাই গুৰু পায় এই জগতে। সে একটু লেগে খেলালে। হঠাতে আজই ‘টীল’ ক্লোজ-করার কি দরকার? মনে রেখো, এই সব নাটকে, অদ্ভুতার ত্রিশূল চূড়ায় সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সার্কাসে সেই দড়ির খেলা। টেনশান বা বিততি আসল ধর্নি। একটু এদিক ওদিক হোতে পারো না। তুমি যেন এক ফেরেশ্তা। তোমার মত অদ্ভুলক পৃথিবীতে বিল, জন্মায় তার চেয়ে কম। হাসি-হাসি মিষ্টি মুখ, বিনয়, সিগারেট-খয়রাত, সারল্যের পানীতে সর্বদা চোখ রসের হাঁড়ির মধ্যে দুই রসগোল্লার মত ভাসা। এসব করেও সেদিন কুল পাছিলাম না। কারণ কি জানো? সবাই এ জগতে শেয়ান। আইস্বার্গের মত অল্প ভেসে, ডুবে থাকে প্রায় সব। দেখা হোলে বলব, শেষে মকেল কি ভাবে টোপ গিল্লে। তবে থ্রি, তিন পার্সেন্ট আরো বেরিয়ে গেল। অথচ বায়না ছিল মুখে মুখে। সুতরাঙ্গ আমাকে কবিত্বে পেয়ে বসেনি। তুমি নারী জয়ের কথা লিখেছ। সে অনেক সহজ আমাদের জগতে প্রচুর গোলকধীর্ঘা, বহুৎ অক্কার গলি, বহুৎ মেহনৎ। মোটামুটি ভাল স্বাস্থ্য আর কিছু, নিরাপত্তা থাকলে, একটা মেয়ের জন্য কি এত কাঠখড় পোয়াতে হয়? যত্নগার হয়ত ভেদ আছে। কিন্তু তফাত বেশী না। জুরে পড়ে ছট্টফট, আর ছোকরা প্রেমিকের বিরহীলা। ছট্টফটামিতে ফারাক কথা যায়, কিন্তু তা কৃত্রিম। কাষ্টমে একটা মালের সুস্ক অনেক বেশী মিয়েছে। তখন দৌড়াদৌড়ি করে কমাতে যে ছট্টফটানি, তা হৃদয়জ যত্নগার চেয়ে কী ক্রম? কারণ, সব যাতনার গোড়া ত হৃদয়। ...তোমার মতই আমার অবস্থা। তোমাকে লিখতে বসলে কথা সব ছুটে-ছুটে আসে। কোথা থাকে এরা? কোথা ছিল এতদিন? আমার আনন্দ কোথায়, জানো? আমি নিজেকে দেখতে শিখছি। আগে ত নিজের দিকে তাকাতাম না। দৈনন্দিন যা কাজ, কেবল তার তোড়ে ভেসে যাওয়া। আমার সময় ছিল না, অভ্যাস ছিল না নিজের প্রতিমূর্তি নিয়ে খেলা করার। এই জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার কাছে আমার অশেষ ঝণ। আত্মদর্শনের প্রয়োজন আছে, বুঝতে শিখছি। নচেৎ বেঁচে মজা পাওয়া যায় না। ওই ভাবে নিজেকে নিজে মানুষ গড়ে তুলতে পারে। নচেৎ জবড়জংৎ তুমি একটা কিছু হোতে পারো। মানুষ না। শিল্পী যেমন রঙের পোচে পোচে তার মানস-জগৎ গড়ে তোলে, মানুষের ক্ষেত্রেও তা-ই হওয়া উচিত। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর ত কখনও এ সব চিন্তা মাথায় দেকেনি। এই আবার তুমি সুযোগ দিলে।...

দোহাই, আমাকে আর রিক্ত, পাথেয়-শূন্য করে চলে যেয়ো না তুমি...

আচর্য, সংসারে আমি এখন ভয়ানক খাপ খেয়ে গেছি। অবিশ্যি, তোমাকে মিথ্যে বলব না, স্ত্রী আর আমাকে জাগায় না। কিন্তু হঠাত— হঠাতে মেজাজ খারাপ করে বসতাম, তার গোড়া বক্ষ করে দিয়েছি, অক্রেশ। এই হচ্ছে মনের শক্তি। আচর্য, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমার এসব ক্ষমতা ছিল না। মেজাজ ঘরে টগ্বগিয়ে উঠত। অথচ জানেভা, ব্যবসার জগতে মেজাজ অবাস্তর। একদম ঠাণ্ডা মাপজোক আরো ঠাণ্ডা ভাবে করার জন্যে তুমি উত্তর-মেরুর অতি জমাট পাহাড় হও। এই দোটানায় টানাটানি আমি

ঘরে কিন্তু বইতে পারতাম না। অনেক সময় বিকালে চা না খেয়েই ক্লাবে চলে যেতাম। যতক্ষণ কাটে। আমি কিন্তু এখন লনে বসে থাকি। ছেলেপুলেদের হল্লায় যোগ দিই। কতো রকমের জীবন-উপাদান তুমি এত সহজে বিলিয়ে দিতে পারো। আমার গোটা পরিবারের তার জন্যে তোমার কাছে কতো ঝণী এক দিন এটা ওদের জানিয়ে আসা উচিত। কিন্তু তা আর হবে না। বাধা কোথায় তুমি জানো। তাই আমিই তোমাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এখন ভাবি, তোমার সঙ্গে সুন্দর অতীত কৈশোরে কেন দেখা হোল না? অনুত্তাপ নতুন, কিন্তু ঘা পুরাতন।

চিঠি দিও। সাক্ষাতের ব্যবধান কিপ্পিং আরো সংকীর্ণ করতে পারো না?

ইতি—

তোমার
সয়ীদ

কাল্পন বৈঠকখানার দুই ভাগ। পাশাপাশি দুই কামরা। সামনের দিক বলা চলে ড্রয়িং রুম। খুব দামী নয়, মাঝামাঝি কেতার সোফা আছে, চেয়ার আছে, মায় সাইড-টেবিল সহ। একটা গোলাকার টেবিলে ফুল্দানি রাখা থাকে কখনও তাজা, কখনও কাগজের ফুলসজ্জিত। কিন্তু পাশেই আবার যে কামরা তাও দহলিজ বা বৈঠকখানা। একদম সোজা ফরাসপাতা। দুটো তাকিয়া আছে পাশে। কাল্প ইঁখানে বসেই সেব চেয়ে আরাম পায়। অবিশ্য অনেক সাহেব-সুবো তার কাছে আসে, কেউ উমেদন্তি, কেউ স্বেফ বায়নাদাতা। তাদের সঙ্গে সে বাইরের ড্রয়িং রুমে বসে। গোলাকার সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট এগিয়ে দেয়। অন্দরমহল থেকে চা আসে। আদর-আপ্যায়নের এই এক ছবি। আর ভেতরের দহলিজে তার পুরাতন লোকজন। নতুনও কিছু জুটেছে। কারণ, তিরিশ বছরে সে নানা খেল দেখেছে দুনিয়ার। এখনও পুরাতন সঙ্গী কিছু রয়ে গেছে। একদিক থেকে তারাই যেন কাল্পন নতুন খোলস ছাড়ার পথে বাধা। শুধু আইন পাশ হোয়েছিল সত্তি। তারপর আর ইংরেজ আমল রইল না। পুরাতন লীলাক্ষেত্র শহর ছাড়তে হলো। কিন্তু নতুন শহরেও তার ব্যবসা ঘাট্তি পড়ার কথা নয়। কারণ, স্বাধীনতার গক্ষে কি মানুষ তাড়াতাড়ি ফেরেন্তা বনে যাবে? কাল্প, সেই সুযোগে সৎ কিছু জীবিকার রাস্তা বানিয়ে নিয়েছিল। একটা বাড়ি কিনে ফেলেছিল পুরাতন পুঁজি দিয়ে। পরে একটা বানিয়ে নিয়েছিল। কয়েকটা ছোট খাটো দোকান হাতে এসেছিল, ভাড়া দেওয়া চলে। এই সব সাত-পাঁচ রকমের রোজগার। কাল্প তার সাবেক উৎপন্নি-স্টল একদম পুরোপুরি মুছে দিতে পারত। কিন্তু কাল করলে সঙ্গীর। এ যেন বাঘের পিঠে ঢ়ড়। নামার উপায় নেই, উদৱৰ্ষ হওয়ার ভয়। কিন্তু কাল্প অত কাঁচা ছেলে নয়। পুরাতন দু'এক জনকে একদম রাস্তা থেকে সরানোর জন্যে মাঝলায় ফেলে ফন্দী জুটিয়েছিল অতি উত্তম। কিন্তু তার ঝামেলা এত বেশী, কাল্প, আর সাহস করেনি। তার চেয়ে বেশ আছে ত সে। তার প্রাচীরে সঙ্গীদের চোখ টাটায়নি, এমন নয়। কিন্তু তাদের সংস্থান ত নেই। সুতরাং উভয় পক্ষের গরজ বিপরীতগামী হোলেও, তার মধ্যে একটা মিল ছিল— অন্য আবহাওয়া যেন কারো ধাতে সয় না। কাল্প দু'-কেতার

বসার ঘর, তার বিশিষ্ট প্রমাণ। যেখানেই যাও আবহাওয়ার মধ্যে যদি তুমি নিজেকে উপভোগ করতে না পারো, সে জায়গা ছাড়তে তুমি বাধ্য। কালুর হয়ত এই জীবনের সংস্পর্শে থাকার আরো কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আনন্দজ একেবারে তুল কেউ বলতে পারবে না। অথচ সে সংসারে নিতান্ত নির্বিশ্বাট। স্ত্রী এক মেয়ে বিহুয়েই খালাস। স্বাভাবিক পরিবার-পরিকল্পনা। আর গৃহিনী কৃচ্ছ্যতার শেষ মার্গ থেকে, প্রাচুর্যের আর এক শিখরে উঠেছে। সে স্বামীর সাতেপাঁচে নেই। মেয়ে আর এক চাকর ও চাকরানী নিয়ে দিন কাটায় নিজের মত করে। গল্পের বায় চাপ্লে চাকরানীর সঙ্গেই গল্প করে, মেয়ে যোগান দেয়। বৈঠকখানায় চা-নাস্তা পাঠানো ছাড়া স্বামীর গতিবিধি নিয়ে কালু মাথা ঘামায় না। মেয়েকে সে স্কুলে পাঠায়নি, কারণ হাল-আমলের চালচলন সম্পর্কে তার তেমন আঙ্গা নেই। স্থানীয় স্কুলের এক সাধারণ শিক্ষিকার কাছেই সুরঞ্জানের ইলেম মক্ষ চলে। কিছু বাংলা লেখা আর পড়া। খরচ-তেরিজ শেখা। মেয়েছেলে যেন সংসারের হিসেবটা রাখতে পারে। তাছাড়া নারী-ইলেম আর কতই বা কাজে লাগতে পারে? সুরঞ্জান বরং মাঝে মাঝে জিন্দ ধরেছে স্কুলে ভর্তি হবে। বাপের কাছে পাত্তা পায়নি। অবিশ্যি কালুর ইরাদা আছে, লেখাপড়া জানা ছেলেই সে জামাই করবে। যদি কোন ঘর-জামাই পাওয়া যায়, সব চেয়ে ভাল হয়। এখন খোদার মেহেরবানী। আশ্চর্য, ছেলের অভাব আবার কালু অনুভব করে না, যদিও স্ত্রীর হা-পিত্তেশ এদিকে চরম। স্বামী তাই একবার বলেছিল, আর একটা বটি নিয়ে এসে দেখতে হয়। গিন্নী পেছ পা নয়। কিন্তু আর একটা কেবল কালু না-পছন্দ। নয় শধু, রীতিমত ঘেন্না করে। সংসারে অশান্তি দ্রুই বিবি ঘরে রাখা আর সিথানে দু'টো গোকুর সাপ নিয়ে শোয়া একই কথা। কালুর তাই ধারণা। একটু আরাম আয়েসের দিকে তার বেশ নজর আছে। নরম বিছানা, পাখা, সুপাক ব্যঞ্জন। কিন্তু মেয়ে-মানুষে কখনও রুচি জাগেনি। বিয়ের আগে বার দুই মেঝেয়া ঘেঁটেছিল। মনে করলে, এখনও তার বয়ি পায়। তার দলের দু' একজন ময়ূর-উড়োয়, জানে কালু। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দলে নানা কিসিমের ঢিঙিয়া ত থাকবেই। এত মাথা ঘামালে তস্বী টেপার আখড়া বানাতে হয়।

হালফিল কালুর ডান-হাত বাম-হাত ছিল দুই জন। সদু এবং আফজল। শেষোক্ত ব্যক্তি, শুব পুরাতন সঙ্গী নয়। সদুর বিপরীত। সদু শুব সাহসী। তার আনুগত্য ঘোল-আনা। মাট্টরের জন্য জান্ দিয়ে দেবে। কিন্তু মাথা মোটা। আর আফজল চেহরায়ও সদুর উল্টো। সে ঢাঙা সুপারি গাছ, তেমনই চিকন। কাকাতুয়া নাসা। গলার কষ্টা বেচপ উঠে আছে। বেশীর ভাগ পাজামা শার্ট পরনে থাকে বলে, তাকে আরো কৃশ দেখায়। আফজল কিন্তু হিকমত জানে। কোন কাজে ঝাঁপ দেওয়ার আগে, সলা-পরামর্শ যথেষ্ট হয়। কিন্তু মাট্টর একমাত্র আফজলের রায়ে সায় দেয় বা বোঝাপড়া করে। পাখলা শরীরে ঝুপো গৌপে তা দিতে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে কালুর দিকে সে তাকায়, তখন শজ্জচূড় সাপের কথা মনে আসতে পারে। এক কালে চুগু খেত প্রচুর। যদিও বর্তমানে মাট্টরের সঙ্গে বীয়ার ছাড়া আর কিছু পান করে না, তবু প্রাচীন ধাক্কা গলায় এখনও লেগে আছে। আফজল যখন হাসে বা দ্রুত কথা বলে, তখন ক্যাং ক্যাং এক রকমের আওয়াজ তার গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে চিকিরী তারের আওয়াজের মত। অবিশ্যি কালুর ঘাঁটি আছে কয়েক

জায়গায়। অবসর কাটাতে সে এই সব এলাকায় টহুল মারে।

সেদিন নিজের বৈঠকখানায় তারা তিন জন জমায়েৎ হোয়েছিল কোন খোশ্গল্লে নয়। নেহায়েৎ এক কাজে। আজ কয়েক মাস থেকে পাঁয়তারা চলছে, বড়শী-শিকারীর চারা পাতার মত। কিন্তু এখনও খেঁচ-মারার সময় হয়নি। ফাঁৎনার দিকে সবাই তাকাচ্ছে বার বার।

কালু জিজ্ঞেস করলে, “খোঁজ নিয়েছ ঠিকমত?”

আফজল গৌপে তা দিছিল। আঙুলে ধৃত-গুল্ফ সহ জবাব দিলে, “এই বান্দা কাঁচা কাজ করে না।”

“টাকা ঘরে আছে। ঘরে রাখে?”

“আলবৎ।”

“কি ভাবে জান্নে?”

“উকীল সাহেব, তুখোড় ব্যক্তি। কত জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দহরম মহরম। ‘কেস’ কী আর সাধে আসে। আর ফুরোনে বা চুক্তিতে কামায। ফীয়ের ধার ধারে না। বাড়ীতে টাকা রাখে। অথবা গহনা বানায। গহনা আছে। এক দাউয়ে ছ-মাসের রোজগার।”

“এত খবর তুমি জানো?”

বৈঠকখানার কোণায় একটা ষ্টোভ রাখা ছিল মাথায় ডেগ্টী। সেদিকে চোখ রেখে আফজল বললে, “প্রমাণ দিছি।” তারপর সে উঠে ফৈল ষ্টোভের কাছে। পকেট হাতড়ায় আফজল। তখন সদুকে সমোধন করলে, “এই—তোর ম্যাচিস্টা দে।”

সদু এগিয়ে গেল।

কালু একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে। বেশী দেশী হয় না। নীল-শিখা তারপর লাল-শীমে ষ্টোভ হিস্হিস্ করে উঠল।

কালু সিগারেট ধরিয়ে একটু শৰীর হেলিয়ে সব দৃশ্য উপভোগ করে।

পাঁচ সাত মিনিট যায়। হঠাৎ ডেগ্টী থেকে বাংশের ধাক্কায় ঢাক্কনি উঠি-উঠি রব ছড়ালো, আফজল বললে, “সদু, একদিকে রুমাল দিয়ে চেপে ধর।”

সঙ্গীর সহযোগিতার সঙ্গে তাল রেখে আফজল একটা খাম বের করে ভাপের উপর ধূরলে। কয়েক সেকেন্ড। তারপর সদুকে ষ্টোভ নিভানোর আদেশ দিয়ে সে ফিরে এল কালুর কাছে। তার সামনে বসে খামের আল্গা মুখ চিরে একটা চিঠি বের করলে।

কালুর সিগারেটের মুখে তখন বহুৎ ছাই জমা হোয়েছে। বেশ কৌতুহলী সে।

আফজল এবার সদর্প, বেশ বাগিয়ে বসে সমোধন করে, “মাষ্টর, আমি চিঠিটা আগেই পড়েছিলাম তাকে আবার ফেলে দেব বলে। কিন্তু আপনার ঘট্কা থাকতে পারে।”

“কার চিঠি?”

“সবই বলছি। পড়ছি শুনুন।”

কালুর চেয়ে আফজলের পড়াশোনা বেশী। এখানে সে-ই প্রধান। কালু কোন আপন্তি তোলে না।

“হ্যাঁ, মাষ্টর”, রস জমাতেই যেন সে একটু থামলে তারপর বললে, “মাষ্টর...সব শুনে আপনার কাজ নেই...বেশ লম্বা চিঠি। আসল ঠিকানায় আপনাকে আগে পৌছে

দিই... 'সংসারে কত কী পাই'। প্রতি মাসেই কত গহনা উকীল সাহেব তৈরী করেন। কিন্তু অলঙ্কার দিয়ে আমার কী হবে? আর ত বয়স নেই যে দেহ সাজাব। এখন আমার দরকার শুধু মনের সজ্জা। তা-ই যখন মেলে না, গহনা বাল্ববন্দী আর নাড়াচাড়া ছাড়া আর কোন মাতনে মাতব? তুমি আমার যন্ত্রণা ধরতে পেরেছো যেমন আমি তোমাকে ধরতে পেরেছি। কেন এমন হয়? চিরাচরিত মানসিকতা?... মাট্টর?" পাঠ থামিয়ে আফজল আবার খেই ধরলে, "মাট্টর, আর শুনে কাজ নেই অনেক লম্বা লম্বা বাণ। আপনি হয়ত বুঝতে পারেন, আমি মাথামুগ্রু সাপ-ব্যাঙ কিছুই ধরতে পারিনি।"

মুখ তোলে আফজল। তখন কাল্প উৎসাহিত গলায় বলে, "পড়ো না ছাই।"

"তবে শুনুন... চিরাচরিত মানসিকতায় আমাদের গতিবিধির কি পরিমাপ হোতে পারে? শ্লীলতার এক নিবোধ মানদণ্ড— তা ও কায়া-সর্বশ— যার ভিত্তি পুরুষ প্রধান সমাজে...।"

"থামাও, থামাও। এসব খটরমটর শুনে লাভ নেই," রবে কাল্প থামিয়ে দিলে সঙ্গীকে।

"আমিও ছাই বুঝিনি। তবে দরকারী খবরটা পাওয়া গেছে আরো পাওয়া যাবে।" আবহাওয়া সামাল দিতে উচ্চারণ করলে সদু তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

"উকীলের বৌ ক'কে লেখে?"

"আর এক ব্যবসাদারকে। আশুনাই। ওরা বলে লভ।"

গাঢ়ীর একটা হাসির রেশ ঠোটে ছিটিয়ে কাল্প বললে, "উকীল জানে?"

"তা কী করে জানবে?"

"আচ্ছা—।" হেলান দিয়ে বসেছিল কাল্প। কেশ স্বাদ পেয়েছে বোৰা গেল।

"বেটীকে দেখেছো, বয়স কত?"

"বয়স চল্লিশ পার।"

"তৌবা, তৌবা।"

"মাট্টর সেখানেই আমাদের তুরঞ্চ।"

"কিসের তুরঞ্চ?"

"কার্য উদ্ধার এসব থেকেই হবে।"

কাল্প আবার সিগারেট নিজে ধরালে এবং ওদের বিতরণ করলে। আবার ভারিক্তি হাসি তার ঠোটে।

"হাসছেন কেন?"

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে কাল্প বললে, আমি ভাবি ওদের দৃঃখ কিসের? খাওয়া আছে, পরা আছে, তবু ওদের কিসের যন্ত্রণা?

'মাট্টর, আমি কি ভাবি জানেন? গতরে চর্বি জম্লেই মাথায় তখন ওইসব খেয়াল জাগে। বসে বসে খায়। আর ত কোন কাজ থাকে না। দুনিয়ার আর কোন মানুষ, কি মানুষের কি হচ্ছে সে সব নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। চর্বি জম্লেই— ব্যস।"

চিৎ তালু দ্রুত উপরে তুলে তা আবার উপুর করলে আফজল শেষ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে।

খেই ধরলে কাল্প "ব্যাস, কী?"

“ওই সব খটরপটুর। এদিক-ওদিক। মানে ছুটে বেড়াও। চর্বি হজম করো।”

“চোখের নেশা আছে, আফজল।”

“মাটির সেটা জোয়ান বয়সে হয়। এই বয়সে আমি বলি, চর্বির পয়দা বিমারী।”

কালু সন্দেহ প্রকাশ করলে না তেমন। কথার মোড় ফিরালে, “তুমি চিঠি পেলে কোথা?”

“আগে যেতাবে যোগাড় করতাম।”

“বেগ পেতে হয়নি?”

আফজল হি হি হেসে উঠল। কিঞ্চিৎ গলায় সিগারেটের ধোয়া লেগে যাওয়াতে বিক্রিক কাশির মধ্যে জবাব দিল, “মাটির, আপনি খুব আকেলমন্দ মানুষ। একটা কথা মনে রাখবেন—।”

“কী?”

“খালি পেটে বিবেক ছাড়া আর সব কিছু ঢোকানো সোজা।”

আফজল যেন একটা ধাঁধা ছাড়লে। তার ধোয়ায় কালু দিশা পায় না। সঙ্গীর চোখের দিকে চেয়ে থাকে কয়েক লহমা, তারপর আবার প্রশ্ন করে, “তুমি খোলাসা কথা বলো না। চলো, ‘বারে’ এক বোতল বীয়ার খাইয়ে দেব।”

“আহা, লোভ দেখালেন আপনি। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কী তা-ই?”

“তা হবে কেন?”

বেশ খুশী উচ্ছলে পড়ে আফজলের শীর্ণ দুই প্লাস্টিক। সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে সে জবাব দিলে, “মাটির, চিঠি কী করে যোগাড় করলাম। পিয়নদের ত দেখেছেন। মোটা তাজা পিয়ন এ-পর্যন্ত আমি দেখিনি। বোজগারে পেট ভরে না পেট নিচ্য খালি থাকে। এবার বলেন, একটা চিঠি, তাও আবার ফেরৎ দেব, জোর কয়েক ঘণ্টা দেরী। কে দেবে না? খরচ খুব করতে হয় না। আর মাটির—।”

কথা আর শেষ হয় না, আফজল তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ে। সদূর কাঁধে এক হাত রেখে তাল সামলাতে পারে না। তখন কালুর মৃদু হাসি বজায় রেখেই একটু ধমকের সুরে বলে উঠে, “আফজল মাথা গরম হোলো নাকি তোমার?”

অতি কষ্টে থামল আফজল। তারপর শান্ত গলায় উচ্চারণ করে “হাসছিলাম কেন জানেন? আমার এক মামার কথা মনে পড়ল।”

“মামার কথায় কি হাসি?”

“আছে। তিনি বলতেন, ব্যাটা কোনদিন ঘরের বৌর পেট খালি রাখিস নে, যদি সুখে সংসার করতে চাস্।”

কালুও এবার হেসে উঠে। আফজল এই সোয়াব থেকে নিজেকে কোন রকমে বাঁচিয়ে বলে, “তার ফল কী জানেন, মাটির?”

“কী?”

“মামার ছেলেমেয়ে ষোল কি সতর জন। মামী আঠারো নম্বর বিয়ানোর এক মাস আগে মামা মারা গেলেন। অনেক দিন বাদ হারাম-জাদার কথা মনে পড়ে গেল।”

কালু আবার গোফের ভেতর দিয়ে কিছু রসিকতার আমেজ চালিয়ে দিলে। এই সময়

হাই উঠল তার দুই তিন বার। বোধ হয় ক্লান্ত।

তাই আবার হাই তোলার রেশের মধ্যেই বললে, “আফজল, যৌজ খবর নাও। তারপর দেখা যাক। গাছে কাঁঠাল দেখে গোফে তেল দিয়ে কী লাভ।...হ্যাঁ, আমি আসছি। সবাই খেয়ে যাও।”

কালুর আতিথেয়তার এই এক দিক। দলবল নিয়ে না খেলে তার তৃণি হয় না। অবিশ্য বড় পার্টি তাকেও হোটেলে দিতে হয়। সে ত গরজের ব্যাপার। সামাজিকতা।

প্রিয় আমদানী...
...ওহো, তুমি বড় ভাবপ্রবণ হোয়ে ওঠো। বারণ করি, তবু শোন না। তুমি যতই বলো না কেন ব্যবসাদার হিসেবে তোমার চিন্ত নির্বিকার থাকে, আমার কাছে তা ফাঁকা ঠেকে। তোমার চিঠির পংক্তির ভেতর ভেতর আমি সহজে ঢুকতে পারি, মনে রেখো। তুমি যে বিলের মাছ আমি সেই বিলের বগা, ভুলে যেয়ো না। অবিশ্য কাছাকাছি এলে যদি হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলো, আমার কতই সুখ। স্মৃতির ভাঁজ খুলে খুলে এক রকম বাঁচাই এখন বাঁচতে হয়। কারণ, আর ত বয়স নেই। আমার এই আদিব্যেতার কথা প্রায় শোনো। কিন্তু আমি বলতে ছাড়ব না। দেহকে এখন সাজাতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ভয় পাই। দশ জনের চোখে কী রকম ঠেকব কে জানে? তুমি ভাবপ্রবণ ব'লে আক্ষরা দাও। যাক, তোমার কাছে আসন পাওয়াই বড় কথা। সেদিন হোটেলে দু'তিন ঘণ্টা কী ভাবে কাটল, আজও ধরতে গিয়ে হোট খাই। এই পিছলতা প্রেমের ছবির মত। একটার সঙ্গে একটা মিশে যায়। অথবা লাফ দিয়ে আর এক খেঁকে পাকড়ে ধরে। আমাদের এক অধ্যাপিকা ছিলেন, ইংরেজ মহিলা। আধুনিক কবিতা পড়াতেন। পরীক্ষার জন্যে মুখস্থ করতাম। বোঝাবুঝির অত ধার ধারিনি। মেঘে এম, এ পাশ! এখনও মূর্খের দেশে চোখ ছানাবড়া কপালে তোলে অনেকে। ডিগীর জন্যে তখন ওই এক লোভ ছিল। নচেৎ যদি বলো, আমি লেখাপড়া করতাম, ভুল করবে। ভদ্র মহিলা তখন আধুনিক কবিতার কারিগরী সম্বন্ধে খুব বলতেন। অচেতন মনে স্বপ্ন-পটের হাদিস নাকি কবিরা ধরতে যায়। তখন সেসব কথা, ছেঁদো বাক্যের মত এক কান দিয়ে চুকে আর কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। এখন বুঝতে শিখছি, তোমার কাছে গিয়ে। কিন্তু সব ত দেরীতে। এই দেশে দাদীরা কুড়িতে বুড়ি হোয়ে যেত। এখন ত বাইরের বাতাস আর কিছু খেতে পরতে শিখে ধাক্কিয়ে তিরিশ চলিশ করেছি। আর একটু ধাক্কা দাও, তখন চলিশ বছরে যেন সাবালিকা হই। তারপর কারো গলায় ঝুলে পড়ি। যখন সত্যি ঝুলতে চাইলাম, তখন দড়ি ঠিকই জুটল, (ভেবো না, তোমার খাড়া শরীরের প্রতি কটাক্ষ করছি) কিন্তু ফাঁসির মত তার মেয়াদ মাত্র তিন মিনিট। এখনে অবিশ্য দড়ি ছিঁড়বে আর আসামীও মরবে। তবে তুমি পুরুষ মানুষ, টাকার জোর আছে, বিকার হোলেও মনের বায়না মিটিয়ে রাখতে পারবে। আমি কি করব? ভবিষ্যৎ ভেবে আগেই মরে যাচ্ছি। কবি ভারত চন্দ্র কোন সহায় নয় এই ক্ষেত্রে। আবার বলছি, রাগ করো না, মরা কোটালে কেন বান ডাকল? মাঝে মাঝে মনে হয়, কিশোরীর মত দুঃসাহস দেখাই। হাঁপানী রোগীর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়ার খাহেস এসব পত্রেই মানায়। কাছে এসে আমাকে বেশী প্রলুক্ত করোনা। খামখা মামলায় জড়িয়ে

দেব। প্রেমে পড়লে নাকি বুদ্ধিলাশ ঘটে? দোহাই, সচেতন বীরের মত তৃমি মঞ্চ অধিকার করো। ঘূমের ঘোরে নয়। দর্শকদের হাতাতলির লোভ তোমার আমার কারো নেই। তবে একটা কাজ করো। তোমার কোন বক্ষ নেই, যার জীবন আমাদের মতো? তাহলে একটা এজমালী জায়গা বাড়ে, যেখানে কিছু সময় কাটে। মেয়েরা বৃদ্ধকালে সখির কাছে ঘোবনের অনাচারে খুলে ধরে। কিন্তু যখন বসন্তের মৌসুম, তখন একজনের কাছেই গুণ্ঠনায়। ঘূণাক্ষরেও অস্তরঙ্গ সঙ্গনীকে কিছু বলে না। পুরুষরা এদিকে দরাজ। বক্ষুর কাছে দুর্বলতা প্রকাশ দ্বারাই তারা সবল হোয়ে ওঠে। কালক্রমে সবই হবে। আমার দানী-আম্বা আমাদের দেখে হিংস করতেন, এখন দেখছি কপালে তা-ই লেখা আছে। তোমার পত্রের উপর আমার সময় বেশ কাটে। জবাব দিতে হয়, পড়তে হয়। কিন্তু তৃমি বহু, ব্যস্ত মানুষ বিরক্ত হও না ত?

জবাব দিও। যেন বুড়িগঙ্গার অনেক পানী তত দিনে গড়িয়ে যায় না।

আলিং...

তোমার

কেত্রা

মধু সর্পিনী,

.....পানী গড়িয়ে যাক। বুড়িগঙ্গা টিক্কাই আছে। তোমার কাছে কিছু লুকাতে পারব না, আমি যখন তোমার উল্টে পাল্টে পড়া পুরুষ। একটা ছোট নোংরামিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার গুদামে চুরি। কতগুলো মাল ছিল, যার আমদানী দু'বছর আগে নিষিদ্ধ হোয়ে যায়। এমন জিনিসের দাম চিত্তড় বাড়ে। বেড়েছে অস্ততঃ পঞ্চাশ শুণ। কিন্তু আরও বাড়বে। এখন খট্কা কোথায় পোনো। মাল গেছে যাক। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা গচ্ছ। অসুবিধা, চোরেরা যদি মাল বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে আর ধরা পড়লে তদন্ত হবে। তখন ত আমিও বাঁধা পড়ব। অবিশ্য হবে না কিছু। উলটে আরো পঁচিশ হাজার বেরিয়ে যাবে। সুতরাং গচ্ছ মোট ধরো, হাজার পঞ্চাশেক। এই ক্ষেত্রে কী করা যায়। চোরের কাছে আত্মসমর্পণ করাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুক্তি। কিন্তু চোরদের তৃমি পাচ্ছা কোথায়? হয়ত জানো, কারা চুরি করে, কিন্তু ধরার ত আইন নেই। দাগী আসামীরা কিছু সাহায্য করতে পারে। লিষ্টের জন্য পুলিশের কাছে গেলে। কিন্তু পুলিশ তোমাকে কেন খামখা দেবে? আর চাইবে কোন সূত্রে? এই ক্ষেত্রে আবার থানায় ডায়েরী করা চলে না। যেহেতু মাল চুরি গেছে স্বীকার করতে হ্য। বেশ জটিল সমস্যা। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে সূত্র ধরতে হোলো। মাল পাওয়া গেল। কিন্তু আমারও বিশ হাজার খসে গেল। আর পথঘাট এমন করে বাঁধা, এই পত্র হাত্তে আর কারো হাতে পড়লেও ক্ষতি নেই। কারণ, রক্ষণ আর ভক্ষণ যখন একত্রে চলে, তখন যেমন ভয়— নির্ভয়ও তেমি। আরো অনেক কেচ্ছা বলার আছে। তোমার কাছে গিয়ে যদিও মুখ বক্ষ হোয়ে আসে। আলিঙ্গনই মুখর হোয়ে থাকে রক্তের সর্বগামী তাণ্ডবে:... তোমার সঙ্গে কোনদিন রক্তারঙ্গি কিছু হোলে বিরক্তির কিছু ঘটবে না। আমিও পত্র লিখতে বসে বড় আরাম পাই। একটা আচম্ভ উদাসীনতা ধীরে ধীরে পেয়ে বসে। তখন কলম চলে কথার পায়ে পায়ে। আমি যেন নিমিত্ত। শুধু হাত দিয়ে

সাহায্য করি। পূর্বে ওই সব ঝামেলায় আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যেত। এবার বেশ নির্বিকারভাবে কর্তব্য করছিলাম। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়ায় এত ঝামেলা বাড়িয়ে অর্থ-উপার্জনে কী লাভ? তোমার সঙ্গে অকস্মাৎ এই সাক্ষাতের আগে আমি জানতাম না, জগতের মধ্যে আরো জগৎ আছে। বিশ্বাস করো, আমি সব গুটিয়ে আনছি। একটা মধ্যবিত্ত লোকের যতটুকু দরকার, তার বেশী আমি আর কিছুই রাখব না। ইত্রাহিমকে দেখবে সে যেতাবে দুদাঢ় এগোচ্ছে, নির্ঘাঁ মরবে। মানসিক প্রশান্তির চেয়ে কামা আর কিছু নেই। হাল্ফিল এসব আমি ভাবতে শুরু করেছি। সবই তোমার দৌলতে। দেশে মানুষের আয়েস-আরায়ের সামানা যেতাবে চচড় দশ বারো বছরে বেড়ে গেলো, দেশের সম্পদ কী সেই ভাবে বেড়েছে? নকল জীবনযাপনের ধারায় আমরাও নকল মানুষ। অথচ শহর ছাড়ালেই দেখবে দারিদ্র্যের কি কৃৎস্নিং চেহারা। গ্রাম কেন, শহরেই দ্যাখো। জিদের মাঠে মুসল্লীর চেয়ে ভিখিরীর সংখ্যা বেশী। তুমি হয়ত ঠাট্টা করবে, ভাবপ্রবণতার জোলাপ খেয়েছি। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, এসব আমার হালফিল বিকার— হ্যাঁ, তুমি বিকারও বলতে পারো। হয়ত তোমার বা প্রেমের সংস্পর্শে এসব তরুণসুলভ ভাবালুতার আমদানী। কিন্তু আমি সত্য কথা বলছি আমার একটা প্রাথমিক অতীত ছিল, যখন ক্লু-কলেজে পড়েছি। আমার প্রাথমিক অতীত— হ্যাঁ অতীতই বলব, যখন কেবল রোজগারের ধান্দা ছাড়া নিজেকে বাড়ানোর আর কোন কিছু আছে, আমি স্বীকার করতাম না। এবার অস্তিম অতীতের পালা। আমি খুব সীরিয়াস চিন্তা করছি। জানি না, নিজেকে গড়ে তুলতে পারব কি না। কিন্তু তোমাকে বলতে দোষ নেই। এখন মনে হয়, আমার সব অতীত যেন মিথ্যে। আমার কোন বন্ধু নেই, যার নৈকট্য তোমার মত মহৎ একটা কিছু আস্থাদ দিতে পারতো পারে। চল্লিশ উন্নর এতদিন পৃথিবীতে কি করেছি? হয়ত এসব আমার সাময়িক বিভ্রান্তি। পরে নিজের দিকে চেয়ে নিজে হাসব। কিন্তু এই মুহূর্তকে অস্বীকার করার তাগদ আমার নেই। প্রচণ্ড এক মানসিক অস্থিরতার গিরিখাদ-মুখে, তোমার সজীব সবুজ তরমূল ধরে আসন্ন মৃত্যু-পতনকে আমি যেন এড়িয়ে যাচ্ছি.....

ইতি তোমার সয়ীদ

“বেড়ী মরছে।”

সদু প্রায় চীৎকার দিয়ে উঠল। পুনরাবৃত্তি করলে সে “বেড়ী মরছে।”

আফজল একটা চিঠি পড়ছিল। কালু অন্দরে গেছে।

সদু আবার অনুরোধ করলে, “পড়েন, আফজল ভাই।”

“শোন..... তোমার অবহেলা আমি বুঝতে পারি। পার্টিতে অনেক লোকজন এসেছিল। এটা ঠিক সকলের দিকে নজর দেওয়া যায় না। হলোড়ে এমন হয়। কিন্তু তুমি আমাকে দেখে কেন মিহয়ে গেলে। সহজ-পাওয়া জিনিসের প্রতি এমনি ঘটে। আমি ভাবলাম তুমি আমাকে দেখোনি। তাই লনের দিকে এগিয়ে গেলাম, যেখানে আরো

তিনজন বস্তুর সঙ্গে বীয়ারে ঢুব দিছিলো। তখনও দেখলাম, তুমি বীয়ারে হলুদ রঙেই দেখছ। আমি তোমার সন্ধ্যাখণ্ডে ঘা দিতে পারতাম, কিন্তু এত যেচে, গায়ে পড়ে নিজের মান-খোয়ানোর গরজ বোধ করিনি। এই জন্যে ভাবালুতাবিলাসী মানুষদের আমি ভয় পাই। পদে পদে বারণ করেছি না। সহজ হও, সহজ হও। কিন্তু তুমি, তুমি। তাই তোমাদের জমায়েতে আর বেশীক্ষণ থামিনি। পার্টি যখন জমে উঠল, ভিড় বাড়ল, তখন মিসেস হারুনকে, সাধারণ সৌজন্য, বলে আসার দায়-সারা পর্যন্ত সারলাম না। সমস্ত রাটটা নিজের প্রতি দয়া করে কাটল। হয়ত সহজে তোমার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম বলে তুমি প্রতিশোধ নিলে। সম্পর্ক যদি তেতো মনে হয়, তুমি সোজা বলতে পারো, হাঁপিয়ে উঠেছ। পেশাদার যারা প্রেমিক, তাদের এই ধারা হয়...।”

“বেঢ়ী মরছে,” সদু আবার মন্তব্য করলে।

“শোনো, আরো মজা আছে,” আফজলের উত্তর।

তারপর সে আর একটা পত্র তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করলে।

“আরো চিঠি আছে নাকি, মিয়া বাই?”

“স্থানীয় চিঠি। একদিন দুদিন দেরী হোলে কী আসে যায় তাই ওদিকে কী হয়, তার দেখার জন্যে এই কাও।”

আফজল কথা শেষ করে, খাম থেকে অন্য পত্র পড়ে শোনাতে লাগল।

“.....তুমি ভুল বুঝেছ। কেব্রা নাম সার্থক। হঠাৎ ফোসফোস করে ওঠো। সেদিন মিসেস হারুনের পার্টির নিমিত্তিদের চেহ্রা দেরলাম। কাঁকে দাওয়াত দিয়েছে তা আমার জানার কথা নয়। আবহাওয়া আমার খুব ভাল লাগছিল না। হঠাৎ চলে-আসা শোভন নয়, তুমি যা পারলে। আমার ত্বরিজনেশ কানেক্ষান আছে। তোমার ওখানে বেশীক্ষণ থাকা আমি ও পছন্দ করতামসা। কারণ, ওদের অনেকেই তোমাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে মনে বিবৰ্ণ করে দেখত। বহুৎ প্রশংসার জালে জড়িয়ে যেতে। মিসেস হারুন এসব পছন্দ করেন। বহুবার দেখেছি। তিনি হামেশা মধুভাও খুলে রাখেন, মাছি যত পারে ভ্যানভ্যানাক। নচেৎ তিনি ‘গুথ’ পান না। কে কেমন লোক তাও ভদ্রমহিলা জানেন। পার্টি দেওয়ার সময় তাই বাছাবাছ লোকই ডাকেন। আমি সেদিন চাইনি তুমি এই পরিবেশে যাও বা থাকো। তোমার হঠাৎ অন্তর্ধান আমি বুঝি লক্ষ্য করিনি? তারপর স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। কিন্তু আমাকে এমন প্রতিহিংসাবৃত্তি পেয়ে বসেছিল, সেদিন ‘সাক্ষণ’ পাইপের মতই শরাব টেনেছিলাম, যেন মুখ খুলে যায়, রাখ— চাক— কিছু না আটকায়। চারপাশ থেকে মুতের গুঁক (বাথরুমে যাওয়ার মত পা কোথায়, সব ত টলোটলো) রজনী গঞ্জার সঙ্গে মিশে নাকে লাগছিল। বিপরীত মানসিকতার ছবি তুমি কল্পনা করতে পারো। এমন সব ব্যবহার করলাম যেন পার্টিতে আমাকে কেউ আর না ডাকে। এক মহিলা মুখে অনেকক্ষণ কাপড় গুঁজে বসেছিলেন। তার ব্লাউজের উদোম-পিঠ নিয়ে কিছুক্ষণ গবেষণা চলছিল। তিনি শুনেছিলেন বৈকি। অবিশ্যি আড়িপাতা শোনা। শেষে সিদ্ধান্ত হোলো The whole is known by the parts অংশ দিয়ে সমগ্রের পরিচয় পাওয়া যায়— এই হচ্ছে হেতু। মহিলা কৃষ্ণ। দেখা গেল, নিমেষে রক্ষিম বর্ণ। কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্টি ছেড়ে গেলেন। তোমাকে এইভাবে তাড়াতে হয়নি, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তুমি বলবে আমি দীর্ঘাস্থিত,

তা কী খুব অস্বাভাবিক? আমার কোন শীকারোকি জবানিতে কি তোমার বিশ্বাস নেই? তুমি খামখা রেঞ্জে ওঠো, আমার কোত্রা কি না...।”

“বেড়ী মরছে,” সদু তার ধূয়া অব্যাহত রাখলে।

“তোমরা কি বেড়ী-ব্যাড়া করো,” অন্দর থেকে বেড়িয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকতে ঢুকতে উচ্চারণ করলে কালু।

সদু-আফজল একটু সচকিত-ভাব কাটিয়ে উঠে প্রায় এক সঙ্গে জবাব দিলে “দুনিয়ার তামাসা দেখি।”

বসল কালু ফরাসের উপর। চিঠি তখনও আফজলের হাতে ধরা।

কালু শন্তব্য করলে, “এসব পড়ে কী হবে। এখন আসল বিজিনেসের কী খবর?”

মাথা চুলকে সদু জবাব দিলে, “মাষ্টার-বাই, যা-যা কইছেন, করছি।”

“খবর নিয়েছো?”

“হ।”

“উত্তর দিকের একড়া বাথ্রুম আছে, জানালা অইংগতে পারলে, বেবস্থা সব অইতে পারে।”

“বেশ। বিবি সাব কোন কামরায় শোয়, সাব কোথায় শোয়, জেনেছো।”

“হ। বিবি সাব ত সাহেবের লগে হর-রাত ঘুমায় না। মাঝে মাঝে সাব আহে বিবির কামরায়।”

“সেটাও খবর নিতে হবে। গহনার বাক্স কেম্বিয়ায় রাখে তাও জানা দরকার।”

“মোটামুটি জানছি।”

“বেশ। তবে লেগে পড়ো।” বাধা দিলে আফজল, “মাষ্টার, আর কয়েক দিন যাক। কাঁচা কাজ করব না। আর বেশ দাঁড়ান্তের জায়গা যখন।”

“বেশী দেরী ভাল না। তুমি কি চিঠি নিয়ে কিছু করতে চাও?”

“তৌবা। তাতে আমাদের কী নাফা? অনেক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। শহরে আরো চোর আছে।”

বিরক্তি প্রকাশ করলে কালু, “শহরে চোর থাকবে না ত কী, সব মুসল্লী হোয়ে যাবে?”

“আমার বলার তা উদ্দেশ্য নয়। দেখতে হয় আর কারো ওই বাড়ীর উপর নজর পড়ছে কি না।”

“পড়ে পড়ুক। আমরা আমাদের কাজ করে যাব।”

তারপর শুরু হোল দৈনন্দিন কাজের ফিরিণি। কে কোথায় কী করছে, কেউ ধরা পড়ল কি না। অনেক সময় যায় তাদের। অনেক সময় জামীনের জন্যে কালুকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। অবিশ্য এসব কাজ এখন তার কাছে সহজ। বাড়ীতে একটা টেলিফোন থাকলে হয়ত তেমন ছুটাছুটি করতে হোত না। কিন্তু কালু টেলিফোনের প্রতি কেমন অহেতুক ভয় পোষণ করে। কখন কী ঝামেলা বেধে যায়। কী ঝামেলা? তার কোন সুষ্ঠু ছবি নেই কালুর কাছে। শুধু মানসিক আশঙ্কা। নিছক অহেতুক।

সেদিন রাত্রে তিন জনেই বেরিয়ে পড়ল এক সঙ্গে।

জীপের সামনে বসল সে। ষ্টীয়ারিং ছাইল সদূর হাতে। পেছনে আফজল। সব সময়

ঘরে মন বসে না। কাল্পুর এই এক বাতিক আছে। শুধু শুধু জীপ হাঁকিয়ে ঘোরা। কখনও সঙ্গে কেউ থাকে, কখনও একদম এক।

সদূর রিপোর্টে কোন অতিশয়োক্তি ছিল না। সে হকুম-বরদার। এই কাজে তার আন্তরিকতা পুরোপুরি ভরাট।

কাল্পুর তাই চিন্তিত হোয়ে পড়ল। বিশেষতঃ গত তিন চার মাস তার দল ত বেকার। গোটা দুই সভাপতি ঠিকাদারী পেয়েছিল মাত্র। সেখানে টাকা আর কত পাওয়া যায়। তারপর সাহেব সুবোদের ব্যাপারে পরে হ্যাত আর কিছু দিয়ে পুষিয়ে যাবে, কিন্তু নগদে তার মূল্য শূন্য। রোজগার ভাল ছিল আগে। সবাই বেশী বেশী ভাগ পেয়েছে। চালচলন পকেটের অনুপাতে বেড়ে যায়। যে বিড়ি খেত এখন সিগারেট ধরেছে। আহারাদির ধারা নিশ্চয় তেমনই উপরে উঠে। হঠাৎ অভ্যস ত বক্ষ করা যায় না। মাস মাস দলের লোকদের মাসহারা টানতে হয়। অবিশ্য দাঁড় একবার না একবার মিলে যাবেই। কিন্তু ততদিন সবুর করতে গিয়ে ফতুর হোতে হবে না ত? তবে তার বাড়ী ভাড়া, দোকানপশরা আছে চালিয়ে নিতে পারবে। কখন-কখন সব ঠিকঠাক পরিকল্পনাও ভেস্টে যায়। রাত্রির অঙ্ককারে কারবার। ভয় কিছু আছেই। সুতরাং বিচারে ভুলক্রটি দেখা দেয়। কিন্তু এবার নিজে সে ছক কেটে দিয়েছিল ভুল হওয়ার কোন কথা নয়। তবু দাঁড় ফক্ষে গেল।

সদূর বললে, “উকীলের বাড়ীর চারপাশ আমাদের জানা। বাথরুমের জানালা ভেঙে চুকেছি। ছিটকিনিও খুলে ফেললে মাজেদ, (দলের অন্যতম সদস্য) কিন্তু তারপর—।”

“তারপর কী?”

“হঠাত হইসেল বাজল। বুর্বলাম বেশীতেক। সকলকে চম্পট দিতে হোলো।”

“সংকেত দেওয়ার জন্যে হইসেল দেওয়ার কথা ছিল?”

“না। আমরা একদম আপনার কথামত চলেছি।”

“হইসেল, একবার বা দু'বার বাজল?”

“দু'বার। প্রথম বারের জবাব দিলে দোস্রা হইসেল। তহন ক'ন কি সাহসে আর থাহি। পুলিশ ত হইসেল বাজায়।”

“ঘাবড়ে তুললি তোরা—”, কাল্পুর কপালের রগ কুঁচকে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

“অন্য কোন লোক আছে আশেপাশে মনে হোলো?”

“তা হৈছে। কিন্তু মাটির, আয়াগো মানুষও হৈতা পারে।”

“বোৰা দায়। আচ্ছা, ঘাবড়াস নে। দেখতে হবে কী ব্যাপার।”

কাল্পুর চিন্তার অশেষ কারণ ছিল। কারণ, নিশ্চিত কয়েক হাজার টাকার ‘হনা ত আঞ্চসাঁ হোত। সুতরাঁ কয়েক মাস খাতিরজমা। তাছাড়া এত চমৎকার পরিকল্পনা কী করে ভেস্টে যায়? জানালা ভাঙার সময় কেউ টের পায়নি। আসল সমস্যা ছিল সেখানেই। ছিটকিনি খোলা ত ছেলেখেলা ব্যাপার। অথচ তখনই গওগোল বাধল।

এমন সময় সদূর-দরজায় কড়ানড়ার শব্দ। উঠে গেল সদূর। ফিরে এলো, সঙ্গে আফজল। সে রীতিমত উৎসাহে টগ্বগ ফুটছিল। তার দীপ্তিমান মুখ দেখে কাল্পুর বিরক্তি ধরে। আজ তাকে বসতেও বলল না। অবিশ্য সম্পর্ক এত পুরাতন, লৌকিকতার বালাই

কবে উঠে গেছে। কাজেই সে কিছু মনে করবে না।

বসে পড়ল আফজল। মাষ্টরের চোখের দিকে চেয়ে সে নিভে যায়। এই মানুষ তার আজকের চেনা নয়। ভেতরে ভেতরে বেশ তেতে আছে অথবা কিছু নিয়ে এমন মাথা ঘামাচ্ছে যে এখন হাজার সুসংবাদ তার কানে ঢুকবে না।

আসর একদম স্তুক। এই অশ্বোয়াস্তি আফজলের পক্ষেই সব চেয়ে দুর্বিসহ। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল। কালুর মুখের দিকে বার বার চায়। তার মোটা ঠোট অর্ধ-উন্মোচিত, ঘাড় একটু কাঁ, চোখ আড়চোখে উর্ধগামী। কি ভাবছে কালু?

কিন্তু হাওয়া পাতলা হোয়ে গেল এক মিনিট পর। কালু, মুখ খুললে, “কি খবর আফজল?”

—মাষ্টর,—, মুখের কথা শেষ করে না আফজল। যদিও সে মাষ্টরের বিশেষ সহকর্মী, কিন্তু তায় তার কম নয়। মানিক পর্যায়ে পড়ে এই ব্যক্তি।

“দিন কাল খারাপ,” এইটুকু উচ্চারণ করে কালু, আবার কপাল কুঁচকায়।

সদু জবাব দিলে, “জী।”

আফজল চুপ করে রইল।

কালুও খুব শ্বেয়াস্তি বোধ করে না। পকেট হাতড়ালে সে। সিগারেট নেই। অন্দর থেকে আনতে হয়। কালু বাড়ীতে পুরুষ চাকর রাখেন্নাই। নানা গোপন কাজকর্মের হিসেব ফাঁস হোয়ে যেতে পারে। সকলের বাজার-হাটসেদু বা আর কেউ করে দেয়। সুতরাং সিগারেট আমার জন্যে তাকে উঠতে হোলো। যাওয়ার আগে বললে, “আমি কিছুক্ষণ গোসলখানায় আছি। আসছি। তোমরা গুঁজ করো।”

কালু অদৃশ্য হওয়া মাত্র আফজল জিজ্ঞেস করে, “মাষ্টর আজ খুব গম্ভীন, ব্যাপার কী?”

“আপনি বোঝেন না? ব্যবসা মন্দ।”

“আরে মন্দ কী?” আফজলের উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে, তা বজায় রেখেই সে বলে যায়, “এ্যায়সা দিন নেই রহেগা। ব্যবস্থা আরো পাকা করতে হবে।”

“কি রকম?”

আফজল খুশীতে ডগমগ পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলে।

সদু হতাশ। কাচুমাচু মস্তব্য করতে থাকে, “মিয়াবাই আপনের চিঠি থোন।”

সদু তখন উৎসাহিত হোয়ে ওঠে হিণুণ বেগে, দ্রুত বলে, “পড়েন, পড়েন।”

“শোনো..... তুমি লিখে হোটেলে মড়ার মত তোমার অপেক্ষায় শুয়ে রইলাম। সময়ের পাথর মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে গেলে বরং মঙ্গল ছিল। হৃৎপিণ্ড এমন অব্যবেক্ষ্য হোতে পারে, তা আগে জানতাম না। কিন্তু তোমার আসার সময় বয়ে গেল। বুঝলাম, তুমি আটকে পড়েছ কোন কাজে অথবা এই ভাবে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক করেছ যেন মৃত্যুকে আমি বার বার চেখে চেখে দেখি অথবা মৃত্যু আমার দেহ লেহন করে যায়...ইত্যাদি তুমি লিখতেও পারো এত সুন্দর। তুমি যে ব্যবসা জগতের লোক কেউ বলবে না। হঠাৎ উক্তার মত বোধ হয় ছিটকে পড়েছিলে।

যাক, সেকথা। শোনো, আর মন দিয়ে শোনো। রাগ করো না। আমি কোন কাজে আটকা পড়েনি। তোমাকে মৃত্যুর গারদে ঠেলে দেওয়ার দুরভিসংক্ষ যদি জাগে, আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। কসম খোদার। তোমাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নিরূপায়। আমি তোমার কাছে গেলে আরো বেশী কষ্ট পেতে অথবা উভয়কে ভয়নক এক ঘন্টার মুখোয়াথি বুঝতে হোতো... বুঝেছো? না, বুঝতে পারো নি...।

সদু খিক্খিক হেসে উঠল। সে হাসি ক্রমশঃ উচ্চমাগী। আফজল তখন ধমক দেয়, “এই হাসম ক্যা?”

হাসির চোটে সদু ফরাসে একটা ডিগবাজি দিয়ে নিলে। কালু নেই। কাজেই স্বাধীনতার মওকা।

“এই হাসিস ক্যা?”

“মিয়াবাই,” সদুর মুখে কথা আর বেরোয় না, কারণ হাসি সব চাপা দিয়ে ফেলে। শেষে আফজল কড়া ধমক দিতে থামলে উঠে সদু বলে, “কেন হাসি জানেন?”

“ক্যান?”

“বেঙীর রিতু অইছিল।”

“দূর শুয়ার—।”

আফজল সদুর পিঠে এক কিল বসিয়ে নিজেও বেহেল হাসির তোড়ে পলকে পা ফক্সে যায়। তারপর দুই জনেই হাসে। তার রেশ হয়ত ভেঙ্গে চলত যদি না কালুর কাশির শব্দ শোনা যেত। সে অন্দর থেকে ফিরে আসছে।

আফজলের হাতে চিঠি দেখে কালু বেহেলে উঠল, “আফজল, তোমার চিঠি থোও।”

কিন্তু এখন তুরুপ তাস আফজলের হাতে সে বাঁয়ে বইবে কেন? পাল্টা জবাব দিলে, “মাষ্টর, গোস্বা হবেন না। হদিস পেয়েছি।”

“কিসের হদিস?”

“সেদিন কেন ফেল্?”

কালু ধীরে ধীরে শান্ত। সিগারেট বাড়িয়ে দিলে দুজনকে। নিজে বসে ত পড়লাই।

এবার মোলায়েম গলায় জিজেস করে, “কী ব্যাপার আফজল?”

“আপনি ত চিঠি দেখতেই পারেন না।”

“মানে— কোন কাজ হচ্ছে না, তা-ই।” সিগারেট ধরাতে একটু সময় যায়। তারপর আফজল শুরু করে, “শোনেন... অনিদ্রা শুধু তোমার হয় না, আমাকেও চেপে ধরে। তবে তুমি নানাভাবে আমার সাহায্যকারী। কল্পনা করতে পারবে না। হ্যাঁ, বাজি। কিন্তু তোমার আদৃশ্য সাহায্য নানা পথে কাজ করে। সত্যি। তুমি আমাকে দিলে অনিদ্রা। তার ফলে, আমি একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেলাম...।”

কালু বাধা দেয়, “কি সব ঘ্যানৰ ঘ্যানৱ...।”

ধমক গায়ে না মেখেই আফজল পড়ে যায়, “আমার বাড়ীতে নির্যাত চুরি হোতো। কিন্তু আমি জেগে উঠলাম। অবিশ্য চোরই হবে। কারণ বাড়ীর চারিদিকে লোকের পাতালি। গভীর রাত্রে নিশ্চয় তুমি আমার জন্যে হন্তে বেরিয়ে পড়েনি বা বাগানে পায়চারী

করো নি । এমন করলে ত তোমার সঙ্গে আমার বনত না, এতটুকুও না । শোনো, পুরো ঘূমে ছিলাম না । একটা শব্দে জেগে উঠলাম । চোর আসবে ভাবিনি । কিন্তু আমাদের বাড়ীর পূর্বদিকে যে কলা-বাগান আছে তার ডেতর দুদাঢ় লোক-পালানোর শব্দ শুনে ভাবলাম, নিচয় চোর । উঠে টর্চ ফেললাম, কিছু দেখা গেল না । কিন্তু আর কি খাতিরজমা শোয়া চলে? ঘরদোর দেখতে হয় । নীচে বাথরুমের জানালা ভাঙা । চোর এসেছিল আর কী সন্দেহ থাকবে? তাই বলছিলাম, তুমি আমার ছায়ার মত আলোয় অঙ্ককারে...অঙ্ককারের ছায়া আছে বহু মূর্খ জানে না । তুমি আছো আমাকে ধিরে...!”

আফজল হঠাতে থেমে বলে, “আপনার আর কথা শুনে কাজ নেই । কারণ কাজের কথা পেয়ে গেছি ।”

কী ভাবে? জিজ্ঞাসু নেত্রে কান্দু ।

কথাটা মাষ্টর, খুব ঘন দিয়ে শোনেন, আফজল সোজাসুজি কান্দুর দিকে তাকায় এবং বলে পূর্বদিকে কলা বাগানে আমাদের কোনো লোক ছিল না । লোক এলো কোথা থেকে?

সদু সায় দিয়ে উঠল, হাঁচা কথা, মাষ্টর বাই, আমাগো কোন লোক রাখি নাই ।

“কারণ রাখার অসুবিধা ছিল । ওদিকে পাঁচিল বেশ উচু । বেগতিক দেখলে লাফিয়ে পালানো সহজ নয় । ঠ্যাং ভাঙতে পারে । তাই—, সদুর কথার খেই ধরে বলতে লাগল আফজল ।

কান্দু তখন সোজা উবু হোয়ে বসে আর দুই সহীর মুখের দিকে যথাক্রমে তাকায় । একবার এদিক, একবার ওদিক । বিস্ময়ের ধাক্কাপ্রস্তুতি সেও জর্খম, স্পষ্ট !

আছা—, শব্দ তুলে সে একটা তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে বসলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুললে, দলের সবাইকে জিজ্ঞেস করেছ?

মাষ্টর, দল আবার কী? এ ত মিটিং পও করা নয় যে অন্ততঃ দশ বারো জন লাগবে । মাত্র ছ’জন ছিলাম । সবাই উত্তর আঁকার পশ্চিম ধিরে । অন্য দিকে চের অসুবিধা । ওদিক থেকে কেউ চুরি করতে আসতে পারে না । আফজল বেশ দ্রুততার সঙ্গে মুখ থেকে কথাশুলো বের করলে ।

“ওদিকে কেউ ছিল না; ঠিক জানো?” কান্দু আবার প্রশ্ন তোলে ।

আফজল তাল্টোকা কঠ শব্দে জবাব দিতে দেরী করলে না,

“আঙ্গুলে গোণা যায় । কটাই বা লোক? তারপর আবার সন্দেহ?”

“আমার মনে হয়—”, আফজলের আমতা আমতা ভাব । আগে কান্দু তাকে পাতা দিতে চায়নি । সুতরাং নিজের মন্তব্য চট করে বলে না ।

তাগিদ দিলে কান্দু, “কী মনে হয়?”

“আমার মনে হয় আরো একদল চোর চুরি করতে এসেছিল । শেষের দিকে আফজল নিজের প্রতি বেশ সবল আস্থা ফিরে পায় । কঠে তার জানান্ পরিক্ষার ।

“আরো এক দল চোর?!” কান্দু, গোফে তা দিতে লাগল ।

সদু দুই পশ্চিমের কথা-কাটাকাটি দেখছিল, মুখ খুলতে সাহস পায়নি । এবার সেও ফুট, কাটলে, নিচয়, “আর এক হালাগো দল ।

“চিঠি তার প্রমাণ । আফজল প্রমাণ যেন হাতে নাতে দিতে চায় ।

“আরো এক দল—? কালু, বাক্য শেষ করে না, গোফের মধ্যে যেন সব রহস্য ঢুকে গেছে। তাই সেখানে আঙুর ঘোরাতে থাকে।

তাকে স্তুক থাকতে দেখে আফজল আরো জোর পেলে, “হ্যাঁ, মাটির এতে আর কোন সন্দেহ নেই।”

“পাড়ার ছেলেপুলে হোতে পারে। কলার কাঁদি চুরি করতে ঢুকেছিল,” মন্তব্য করলে কালু।

বেলুন যেন ফুটো হোয়ে গেল। আফজল একদম মিইয়ে যায়। কিছুক্ষণ চূপ থেকে পরে বললে, “এই জন্য আপনেরে মাটির কই। ঠিক বলেছেন।”

“হ। হালা পোলাপানের কাও হৈতে পারে। আজগুবি কিছু না। ফাঁরা পোলাপানরা এসব কইয়া থাকে। তা ভি ঠিক।” মন্তব্য সদূর।

কালু বললে, “ভেবে দেখি। আর তোমরা খোঁজ নাও, কলা-বাগানে পাকা কি কাঁচা কাঁদি ছিল কি না।

“বাইসাব, যদি বেয়াদবী মনে না করেন, আমার আর এক কথা মনে লয়,” অভয় প্রার্থনা করলে সদু।

“কও না, মিয়া। আল্লা হগ্গলের আকেল দিছে,” সদুকে সাহস দিতে কালু, ভাষা, স্বর পর্যন্ত বদল করে ফেললে।

“মাটির বাইসাব, কলা বন। নিশ্চিত রাইত। হাজুঁকা ফুর্তি করার ভি হওয়ার পারে।”

মাথা নেড়ে সায় দেয় আফজল।

কয়েক মিনিট চুপচাপ যায়।

শেষে কালুই বেশ চিন্তাবিত কঠে বলে, “সব খোঁজ নাও। তারপর দেখা যাবে। দুই দল চোর, বিশ্বাস হয় আবার হয় না। আজ্ঞা দেখি। আজ ওঠা যাক।”

আসর ভাঙার আগে এক দফ্তরিসিগারেট বিলি করে, যদি খাওয়ার বন্দোবস্ত না থাকে আজ কালু, তা ভুলে গেল। বোৰা যায় সে-ও চিন্তিত।

অমৃতময়ী কোত্রা,.....

.....দু'বছর গড়িয়ে গেল। কিন্তু মনের রংড়ানি অনেক অনেক দ্রুত চলে, তখন সাধারণ চেতনা দিয়ে আর তার পরিমাপ দুঃসাধ্য হোয়ে পড়ে। বরং স্বপ্ন দেখাই তখন যুক্তিযুক্ত। কালিদাসের মায়া না মতিভ্রম, প্রশ্নের জবাব এই উত্তর চলিশে এসে ধরতে পারলাম, অথচ ছাত্রীবনে কত আউড়েছি। তখন সুড়সুড়ির বেশী কীই বা পেয়েছি? এখন মনে হয় মহাকবিদের পাঠ পরিগত বয়সেই শুরু হওয়া উচিত। আমি ত ওপাট ঢুকিয়ে বসেছিলাম। ঢুকেছিলাম আর এক জগতে সেখানে রাণী এলিজাবেথকে শাদী করার আগে পর্যন্ত আর সম্পদ ত্বক্ষার শেষ ছিল না। ছোটো, দৌড়াও, আছাড় খাও, সর্বাঙ্গে চোট লাঙুক, মাথার খুলি এক দিক উধাও হোক, কেবল ধাও, ধাও। ওই ছুটছে মায়ামৃগ সর্ব সুখের আধার; সর্ব আয়েসের উপাদান, সর্বেশ্বর তোমার পাপ-পূণ্যের সুখের দুঃখের— কখনও রৌপ্য-চক্র, কখনও বিল-অফ-লেডিং বা এক্সচেঞ্জ, কখনও বীমার পাটা, বাটা, কমিশন-অমিশন, কানটোকা, সাস্পেন্স এ্যাকাউন্ট, ডিভিডেন্ড লভ্যাংশ, নাম-

ধাম-কাম মেমোরাওয়াম, হারানী বন্দর, সার্ভে, তুর্খোড় ইয়ার, আর-আর R.R. রেলওয়ে
রসীদ, আলকাত্তার ড্রাম, টাৰ্বাইন, তেলের গন্ধ, চীফ গেষ্ট, চাঁদা, মাদার্চোদ রাজপুরুষ,
শুষ, কোচ, উৎকোচ, বীয়ার সেসান, I.O.U. শুটিৰ পিতি.....

আমি পঞ্চবটী বনে ক্লান্ত এক লক্ষণ। তোমার সৌৱত অক্ষ্যাং কোন কোন বাতাসের
সঙ্গে এমন গাঠছড়া বাঁধলে? বেশ ত ছিলাম। বাঁচার জন্যে কোমলের সাধনার দরকার
আছে, আমার অগোচরে ছিল। থাকত। ক্ষতি কী? কত জনই ত আছে, মৃহূর্ত যদের কাছে
অনন্ত। যদের কাছে দল্টের সুযোগ মানবতার পরাকাষ্ঠা, পরম কাম্য। যেহেতু সম্মুখে
জিজ্ঞাসা নেই। (আমারও এতদিন ছিল না) নিজের গন্ধীর বাইরে আরো মানুষ বর্তমান—
যদের সংস্পর্শ ছাড়া তোমার মনুম্বত্ব বিকাশ অসম্ভব—তারা জানে না, বোঝে না, জন্মাবিধি
সম্মুখে সহজ আরামদায়ক কয়েকটা ধৰতাই বুলি বা চিন্তা পায়, ঠিক যেন গুৰুৰ সামনে
জাবনার ডাবা—এই ডাবায় তারা জাব্না খায় আৱ জাবৰ কাটে, আৱামেই ঘুৱোয়, জন্মৰ
প্ৰয়োজন যদুৰ। আমার আৱাম হারাম কৰে দিলে তুমি। ব্যবধানেৰ সাঁকো হয়ত চিৰদিন
ভাঙাই থাকবে। সাঁও-পাৱ হোতে হবে সকল যত্নণা-সমুদ্র। মনে হয়, তোমাকে ছিনয়ে
আনতে পাৱতাম, চাঁদ নও জানি। কিন্তু শশীকুপে আমাৰ আকাশে তোমাৰ উদয় ঘটলে
হয়ত সহজ হোত তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব কৱা। কিন্তু তুমি মানবী। প্ৰকৃতি তোমাকে
দেবীকুপে অবতীৰ্ণ কৱলে, হয়ত পাথৰেৰ মূর্তি, কেঁপোও বিৱাজ কৱতে। ভক্তেৰ কোন
অসুবিধা ঘটত না। পাথৰে মাথাকোটাৰ আনন্দদায়ক। কিন্তু ওই মানবী আকাৰ বিচ্ছিন্নতাৰ
মশাল কোনদিন নিভ্তে দেবে না। আকস্মিক আমি যেন ব্যাধিগত্ত।.....

রঞ্জেৰ মূৰ্ছন্যায় তোমাৰ দল্ট হাসিৰ বুনন, দল্টমান জতুগ্রহেৰ অভ্যন্তৰে ভিখাৰিণী ও
তাৰ পঞ্চপুত্ৰেৰ নিঃশঙ্খ ঘুমেৰ সহচৰ.....এসো

ইতি—

তোমাৰ সয়ীদ।

গলিৰ মুখে একটা ল্যাম্পপোস্ট ছিল। অন্ধকাৰ রাত্ৰে তবু রাস্তা আৱ দু'চার ঘৰ দেখা
যেত। আফজলেৰ পৰামৰ্শে নিভিয়ে দেওয়া হোয়েছিল। গোটা পাড়া ঘূটঘূটে অন্ধকাৰে
লেপা। এই সুযোগে মাজেড একটা পাইপ বেয়ে উঠেছিল। নীচে সদু দাঁড়িয়ে। অন্যান্য
সঙ্গীৱা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত। এই বাড়ীৰ হৱন-পাঁয়তাৱা আজ কয়েক মাস থেকে চলছে।
আজ সুযোগ।

সদু মাজেডকে বলেছিল, বেগতিক দেখলে সে নীচে লোহার পাইপে ইট ঠুঁকে তিন
বাৱ আওয়াজ দেবে। তখন সে যেন সৱসৱ নীচে নেমে আসে। উদ্দেশ্য ছিল ছাদে উঠে
চিলকোঠাৰ দৱজা খুলে নীচে নামবে। আৱ এক দৱজা খুলে দেবে অন্য এক সঙ্গী। চোৱা-
চাৰি নিয়েছিল সে। যদি কোন দৱজা তালা দেওয়া থাকে খুলতে কোন অসুবিধা থাকবে
না। আজ কেউ জীপ আনেনি সঙ্গে।

সদু নীচে অপেক্ষা কৱে। তাৱ পকেটে টৰ্চ আছে। মাৰে মাৰে জালবাৰ লোভ হয়।

কিন্তু এমন বোকামি তাকে পেয়ে বসে না। অঙ্ককার ঘরে টর্চ ফেলে ফেলে দেখাই নিয়ম। কেউ জেগে আছে কিনা। তাই টর্চে কম্জোর ব্যাটারী দেওয়া থাকে। আলো প্রথর হোলে শুমন্ত ব্যক্তির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তখন সব কাজ পও।

ফন্দী মাফিক কাজ ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট গেল। মাজেদ নিশ্চয় ছাদে উঠে গেছে। গাছ-চড়ায় তার সঙ্গে বানর লাগে কোথা। একটা খুটু শব্দ পর্যন্ত হোলো। সদু সন্তুষ্পিত কান খাড়া করে। উপরে দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দই হবে। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। বাতাসে কোথাও কোথাও গাছের পাতা নড়ছে। কিন্তু তার শব্দ মৃদু, কান খাড়া না করলে টের পাওয়া যায়। সদু তাই নিশ্চিন্ত। কাজ ভেতরে ঠিক এগোচ্ছে। তার কাজ পাহারা ও সঙ্গীদের সংকেত-প্রদান। কখনও সে ভুল করে না কত আসন্ন বিপদ এই সতর্কতার জোরে কেটে গেছে। আর যদি ঘাড়ে পড়ে যায় মসিবত, তার মোকাবিলার জন্যেও সে প্রস্তুত থাকে। দু'চার জন তার থাপড়ে কলাগাছের মত শয়ে যাবে না? ছুরি একটা আছে হাফ-প্যাটের পকেটে। কখনও ব্যবহার করতে হয়নি। দরকার হোলে এন্টেমালে শান দেওয়া লাগবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী ধারালো হোয়ে উঠবে। এই সব সাত পাঁচ ভাবছে সদু। সিগারেট খাওয়ার নেশা চেপে আসে এই সময়। বেকার কিন। কিন্তু কালুর কথা তখন মনে পড়ে: সব 'আমলের' (সাধনা) ব্যাপার। ঘটার পর ঘটা ঠাই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় জোরে নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত বিপদ আহবান— এসব সাধনা ছাড়া আর কী?

দশ মিনিট কেটে গেল। কারো কোন সাড়া নেই। কী ব্যাপার। সব শুম হোয়ে গেল নাকি? না, দলের কোন নিম্নক্ষেত্রাম বেসিমার্টি করেছে? এমন অলঙ্কুণে কথা মনে আনতে নেই। কালু বলে, সাহস করে যায়। সাহস গেলে আর এই সব কাজ করা চলে না। এই সব কেন, কোন বিপদেরই মোকাবিলা অসম্ভব।

সদু কেবল বার বার উপরের দিকে তাকায়। তার পকেটে এক ফালি ইট রয়েছে। আঙুল দিয়ে দেখে সে আর চোখ তেড়ে তেড়ে অঙ্ককারের ভেতর দিকে দেখার চেষ্টা পায়। উপরে আকাশ আর ছাদের কার্নিসের ঝাল্লা রেখা ছাড়া কিছু চোখে পড়েনা।

আরো তিন মিনিট পরে সদু অনুভব করে পাইপের উপরে যেন ঘস্ঘস শব্দ হচ্ছে। শক্তি, সন্তুষ্পিত সে উর্ধে চোখ মেলে। একটা গোল নিরেট ছায়া ক্রমশঃঃ নেমে আসছে। মাজেদ নিশ্চয়। কিন্তু নেমে আসছে কেন? অন্য এক খোলা দরজা দিয়েই তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা। তবে কী কোন বাগড়া বাধল। ক'মাস থেকে রুম্জির রাস্তায় এমি এক এক করে কাঁটা পড়ছে। মাষ্টর ত রেগেই থাকে। তার পকেট থেকে সকলের মাসহারা যাচ্ছে। মেজাজ একটু গর্মে ওঠে যদি, কারো কিছু বলার থাকে না। মাজেদ নামছে কেন?

সদু পকেটস্ট ছুরির বাঁটে হাত রেখে পাইপ থেকে একটু দ্রু সরে মোতায়েন হোয়ে রইল। বলা যায় না, নসীব খারাপ চলছে। যদি আর কেউ হয়। হয়ত এখানে নিঃশব্দে কিছু করতে হবে। এক হাতে সে বড় রুম্যালখানা পর্যন্ত বাগিয়ে রাখলে। অচেনা হোলে আগে ত শালার মুখের ছিদ্রি বক্ষ করতে হবে। তারপর অন্য মোকাবিলা।

কিন্তু সদুর এত ধানাই-পানাই অমূলক। ঝুপ শব্দে নামল লোকটা। তারপর সে ফিস্ফিস বলে, "সদুবাই, ওদিকে কেউ যায় নাই। ছিটকিনি খুলছিলাম এক ঘরের। তিন

জন ঘূমায়। উডলে একা সামাল দেওয়া যাইব না।”

“কেউ আহে নাই?”

“না।”

“ত গেল কুই হালারা।”

“কুয়ায় পড়ছে না ত? পুরাতন বাড়ি। উঠানে একটা কুঁয়া আছে। হালাদের পয়পয় কইয়া দিছি।”

না। গেল কুই?

সদু অধৈর্য হোয়ে পড়ে। আশঙ্কায় তার মুখ রাত্রির কালো আরো বাড়িয়ে দেয় নিশ্চয়।

শেষে সে বলে, অহন কী করতাম?

আবার উডি। দেইখ্য আসি।

“না, আর যাইও না। গতিক ভালা না।” দু'জনে কর্তব্যের পথ খোঁজে। অতি আশঙ্কিত। কিন্তু কুলকিনারা পায় না।

এমন সময় একটা চেলা তাদের সামনে ঠক শব্দে পড়ল। দু'জনে চমকে ওঠে।

কী ব্যাপার?

সদূর ত গায়ে ঘাম ছুটে যাওয়ার অবস্থা। মাজেড তার কাছাকাছি, সকল অর্থেই।

এত রাত্রে এমন গোল চেলা কারা মারে? টর্চ জ্বালিয়ে দেখার চেষ্টা পায় সদু। কিন্তু চেলা ঠিকরে একদিক চলে গেছে।

আরো দু'মিনিট গেল।

আবার একটা চেলা। এবার প্রায় সম্মুখ গায়ে পড়ে। সামনে পাঁচিলের ওদিক থেকে আসছে, না বাড়ির লোক অঙ্ককারে ছায়ামূর্তি দেখে আন্দাজে ছুঁড়ছে। হয়ত এরা টর্চ রাখে না।

আর শব্দ করা উচিত নয়। এখন উদ্ধারের রাস্তার কথাই ভেবে রাখা প্রথম কর্তব্য। কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীরা যে উপরে বা ঘরের মধ্যে থেকে গেল। তাদের দশা কী হবে? সদু ভাবলে, বেঙ্গমানীর চেয়ে গোনা (পাপ) আর নেই। বিপদ না দেখে সে সঙ্গীদের খামখা ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে না। যা-হয় তা-ই হোক। চোরের শাস্তি জেল। বেশ, তার জন্য সে প্রস্তুত। এখন দেখা উচিত চেলা কোথা থেকে আসছে। সদু চোখ কান মন সর্ব ইন্দ্রিয় খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। চেলার আগম-দিক নির্ণয়ই এখন প্রকৃত বিপদ এড়ানোর উপায়।

আবার চেলা পড়ল।

সদু দিক ভুল করে নি।

দু'জনে অঙ্ককারে এই বাড়ির পাঁচিলের গা বেয়ে পশ্চিম দিকে এক সরু মুখে এসে পড়ল। চেলা এই পাশ থেকেই গেছে। এদিক বেশ অঙ্ককার। পুলিশের টহল কালেভদ্রে পড়ে। সেদিক থেকে নিরাপদ।

কিছু এগিয়ে সদু দেখে একটা রোয়াকের উপর চারজন শয়ে আছে। অবিশ্যি দূর থেকে সদুর চোখে পড়েছিল, একজন মাথা তুলে তুলে দেখছে আবার মেঝের উপর মাথা রাখছে, ঘুমোনোর কায়দায়। কিন্তু কাছে আসতে ওই মাথা তোলাতুলি বক্ষ হোয়ে গেল।

সদুর সন্দিক্ষ চোখ তাই এখানে এসে জরীপ শুরু করলে। পকেট থেকে টর্চ বের করলে কয়েক বার, বেশ ভীক্ষ দৃষ্টি চালিয়ে দেখার পর।

টর্চ জ্বলেই সে উচ্চারণ করলে, অবিশ্য ফিস্ফিসানির সামান্য চড়া সংক্ষরণে, “এই হালারা এহানে করতাছ কী?”

চারজনেই উঠে পড়ল।

উদ্বেগ, আশঙ্কা, বিপদ মুক্তির আনন্দ সব একত্রে ঘোরালো জট পাকিয়ে উঠে সদুর ডেতর।

হঠাতে মুখ খুলতে পারে না সে।

তাকে ওই চারসঙ্গী আর মুখ খুলতেও দিলে না।

নেপথ্যে এক জন বলে উঠল, “এখানে আর না। যে-যার রাস্তা ধরো। একত্রে এত লোক দেখলে, পুলিশ এই রাত্রে শশুর বাড়ী থেকে ফিরছ মনে করবে না। যে-যার রাস্তা ধরো। আশপাশের লোক উঠে পড়লে আরো বিপদ। এক এক জন সরে পড়ো আলাদা আলাদা রাস্তায়।”

বক্তা আফজল।

প্রিয় সয়ীদ,

তুমি ক্রমশঃঃ ফিলজফিয়ে হোয়ে উঠছ। আর বৈরাগী। আমি বৈরাগিনী হোলে তুমি কি খুশী হবে? তখন আমিণ্ডে সব ব্যাপারে নিঃস্পৃহ হোয়ে উঠব। জীবন কি তাঁতে জমবে? তুমি যদি এত ভাড়াভাড়ি আস্মানে ওঠো, আমি জমিন থেকে কী করে নাগাল পাব? তোমার শরীর খুরাপ হচ্ছে না ত? অবিশ্য আমার কাছে তোমার দৈহিক কোন খুঁৎ ধরা পড়ে না। প্রেম অক্ষ কিন্তু তুমি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও। অনেক সময় বৈরাগ্য আসে স্রেফ দেহের কারণে। আমার ত ভয় হয়, আর প্রথম থেকে এই ভয় পাচ্ছি, তুমি বড় বেশী আবেগের চাকায় নিজেকে ছেড়ে দাও। বোঝা গেল, ব্যবসায় তোমার ঠিক মন পুরোপুরি বসেনি, হয়ত তুমি নিজের অজানিতে সব কিছু করে যেতে। ব্যক্তিত্বের অনেক টুকরো থাকে। সব ফালি এক রকম রঙে রঙিত হোয়ে উঠে না। আমার কথাগুলো তোমার কাছে খুব গদ্য-গদ্য (সেই পুরাতন চিঠি দ্রষ্টব্য) ঠেকতে পারে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে তাল মিলাতে কিছু ছন্দ-পতন রাখতে হয়, নচেৎ আর দশজনের সঙ্গে হাঁটা যায় না। গুটিয়ে নেওয়ার বয়স থাকে। সে এত জল্দি কেন? তোমার একখনা মটোর বাদ, সব নাকি বেচে দিয়েছ শুনলাম। আহা, আমাকে যদি বিয়ে করো, তোমার গৃহিণীর জন্য মটোর লাগলে, আমার জন্য লাগবে না? পূর্বে দাদার আমলে যারা দুই বিবি করত, তারা প্রত্যেক স্ত্রীকেই বোঝাত, ‘তোমরা দু’জনে যেন আমার দুই চোখ। উভয়ের সাহায্যেই দুনিয়া আমার কাছে ধরা দেয়। এক চোখ তাড়াভাড়ি অক্ষ হোয়ে যায়, কারণ দৃষ্টিশক্তির বহুল খরচে। সুতরাং ইত্যাদি ইত্যাদি...’। তুমি তেমন দু’চোখ করলেই পারো। অবিশ্য তখন আমরা তোমাকে চার চোখ দেখাব (আঁখ দেখায়েগা), তা আগে থেকে বলে রাখা যেতে পারে। একটু মাটীতে নামো। হঠাৎ-হঠাৎ-জাগা খেয়াল, বলো, এই বয়সে পোষা মানায় না।...পার্টিতে আমাকে মিসেস আতহার আলি বা আতহার উকীল বলেই ডেকো,

যদি প্রয়োজন হয়। হঠাৎ তোমার দেওয়া জৈব-নামে ডেকে, বসো না। তোমাদের মত আবেগ সর্বস্বদের দিয়ে বড় মুশকিল। আমাদের দেখাশোনাটা একটু কমিয়ে দেওয়া যাক। বলছি না তোমার আবেগের নদীতে বাঁধ দাও। তবে ভাদ্রের কোটাল আসতে দিও না। দু'কুল ছাপিয়ে গেলে গেরস্থর দুর্দশা হয় অশেষ। তৃমি বুঝি গ্রামে থাকোনি কথনও?

সময় মত কুঞ্জে আসব বৈকি। আমার সৈনিক উপঙ্গণ প্রতীক্ষা জানে না।

ইতি—

কেত্রা

সুণঃ— সামনে সঙ্গাহ। একটা মজা এবং অনেক চুমু তোমার প্রতীক্ষায়।

“মাট্টর বিশ্বাসই করবে না।” আফজল বললে।

তারা পাঁচজনে জমেছিল এক গোপন আন্তর্নায় মাজেদের বস্তির বাড়ীতে। এখানে কালেভদ্রে দরকারে কাল্পন এসে জোটে অবিশ্য বিশেষ জরুরী অবস্থায়। নচেৎ কোন শুণ্ঠ পরামর্শের জন্য কাল্পন বাড়ীই তোফা আশ্রয়।

সদু জবাব দিলে, “তা ঠিক। আজকাল আমি ভাবি, নসীব। চার পাঁচ বার দাঁউ গেলগ্য। কারণ কী?”

আফজল আর হেতু-অবিক্ষারের মনোযোগী নয়। সে বললে, “তোমরা শোনো তা হোলে বুঝতে পারবে।”

“কন্ত,” সদুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

“সব ঠিক-ঠিক চলছিল। মাজেদ-চিলেছাদ দিয়ে উঠে এলো। তা দেখিনি। তবে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ বুঝতে পেরেছিলাম। আমার কান রাত্রে আর অঙ্ককারে অনেক বেশী খাড়া থাকে। কিন্তু শুনলাম ত পালানোর সময়। আর কেন নীচে নেমে দৌড় দিতে হোলো, তাও শোনো। চোরাচাবি দিয়ে বার-বারান্দার দরজা খুলে আমরা শোয়ার কামরায় পৌছলাম। গরমের দিনে এই ব্যবস্থা ওই বাড়ীর। এবার কামরায় চুকব। তখন দেখি না টর্চ বাতি জুলে উঠল। ভাবলাম সেরেছে। টের পেয়ে গেছে বাড়ীর লোক। কিন্তু তা না। দেখলাম সবাই ঘুমোচ্ছে। আর দু'টো লোক টর্চ ফেলে দেখছে। এত আজব ব্যাপার। তখন চট করে আমরা কামরা থেকে বেরিয়ে একটা থামের আড়াল হলাম। দেখা যাক কী হচ্ছে। কিন্তু আজব ব্যাপার। ওই লোক দু'টো হয়ত আমাদের গায়ের গন্ধ কি, কিছু টের পেয়েছে, তারা কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। আমাদের উপর টর্চ ফেললে পর্যন্ত। আমরা ক'জন তখন একে অপরের গায়ের উপর যে়াঘেষি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তামাসা দেখছি। ওদের একজন আমাদের দেখলেও। কিন্তু ভান করলে যেন দেখেও দেখলে না। রহস্যময় ব্যাপার। তারপর দু'জন দুদাঢ়ি সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল। নীচে দৌড়ানোড়ির শব্দ। দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করছে। আমরাও চুকতে পারি। কিন্তু আবার চুকব কোন সাহসে? নীচে ওসব কিসের শব্দ?”

সামান্য দম নিলে আফজল। সদু তাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে। মাজেদ ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। সেও একটা সিগারেট নিলে এবং সকলের মুখে আগুন

সরবরাহ করলে।

একরাশ ধোয়া ছেড়ে আফজল বলতে লাগল, “এমন ব্যাপার ত কখনও ঘটেনি। মনে রেখো, মনের মধ্যে হিসেব চলছে একদম ঢাকা-মেলের মত। ওরা কারা? ওরা ত আমাদের লোক নয়। এই বাড়ীর মিস্ট্রী-কামীন হোতে পারে। কিন্তু এত রাত্রে এখানে টর্চ হাতে আসবে কেন। সব ধূধূ। আমাদের ওরা দেখেছে নির্ধারণ। কিন্তু কিছু বলল না কেন? আমার ইচ্ছা করছিল, ঘরে চুকে দেখা যাক। কিন্তু—।”

আফজল সিগারেট এক টান দিয়ে নিলে, গৌফ সরিয়ে। ঝুপো ডালপালা খালি ঠোটের উপর এসে পড়ে কিম।

“হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঘরে চুকব। কিন্তু শোয়া একজন হঠাতে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে আর বিড়বিড় কী যেন বললে। হয়ত ঘুমের ঘোরে কথা। কিন্তু আমি তা তখন ভাবতে পারলেও, খামখা দৃঃসাহস দেখাতে পারি নে। তা-ও দেখাতাম, যদি না একজন বলে উঠত ‘এই সরে শো’। তোর ঠ্যাং এদিকে এসে গেছে। ঘরে ক’জন লোক আছে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ আমরা আমাদের টর্চ বাতি আর জুলিনি। কোন ফ্যাসাদ জোটে কে জানে। কিন্তু নীচে তখন বেশ পা-তালির শব্দ। আমাদের ধরার ষড়যন্ত্র করছে না ত। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়। এই অবস্থায় আর দেরী করা চলে না। তখন পালাতে হোলো। দুয়ার খোলা ছিল নীচে। আমরা পাঁচিল টপকে পিঠ্টান দিলাম।”

সবাই চুপ। সদু কি যেন জিজ্ঞাসার জন্যে মুখ খুলিবে, তার আগেই আফজল আবার খেই ধরলে, “নিজেরা ত পালিয়ে এলাম। এখন তোমাদের কী দশা হবে? সেই তরাসে ত আবার জান যায়। কী করে তোমাদের খুরঙ্গ দিই। তোমরা ত বাড়ীর পেছনে। শেষে এদিকে এসে ওই ফন্দী জুড়লাম। চেলা ঝরো। সংকেত ত ছিল না। হঠাতে চেলার চোটে যদি তোমাদের আকেল ফেরে।”

“আচ্ছা।” সদুর যেন বহু দিনের নিরুদ্দেশ ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল।

আফজল আরো যোগ করে, “তারপর কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়। যাক, এক জনের রোয়াক পাওয়া গেল। যেন মুসাফির, যাওয়ার জায়গা নেই, হঠাতে শুয়ে পড়েছি। সেখান থেকে ক’টা চেলা মারলাম।”

“আপনি কি আমাদের দেখে দেখে তাক করছিলেন?” সদু প্রশ্ন তুললে।

“একদম আনন্দাজে। তবে একটা আঁচ আছে ত।” জবাব দিলে আফজল, যেন এই মাত্র সে বিপদের মুখ থেকে ফিরে এসেছে।

মাজেদ তখন শব্দ করলে, “কিন্তু—।”

“কিন্তু কী?”

“মাট্টর ত রেগে বোম হোয়ে যাবে।” গোফে তা দিলে আফজল এবং মাট্টেং বাণী ছাড়লে, “সে আমি তাকে বুঝিয়ে দেব। এ ত আর তোমাদের মত কাঁচা লোকের কারবার না। আমি সঙ্গে ছিলাম।”

সদু কথাটা যেন বুঝে উঠতে পারেনি আনমনা বলে চলে, ‘নসীব... হালা নসীব।’

মাজেদ রীতিমত চিন্তাবিত। বহুদিন বেকার। কারণ, কাজে ফল দর্শে না। সে সমস্যার তলায় যেতে চায়। তাই বললে, ‘কিন্তু হোয়েছিল কী?’

ঠেঁটের উপর ঠেঁট অনেকটা নিরাসভিত্তির ভঙ্গীতে উত্তর দিলে আফজল, “খোদাকে মালুম !” তবে আমার কী মনে হয় জানো?”

“কী?”

“আরো একদল চোর ওই বাসায় ঢুকেছিল।”

সদূ মাথা নেড়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোর দিয়ে, যা তার ধাতের ব্যাপার নয়, বললে, “আপনি প্রতিবার ওই এক কথায় বলেন, মাষ্টর বিশ্বাস করবে না।”

“বিশ্বাস না করলে, আমি কি করতে পারি? কিন্তু নিশ্চয় আর এক দল চোর ঘরে ঢুকেছিল। যারা ঢুকেছিল তারা চোর।”

“চোর ত আপনাদের দেখে কিছু বলল না কেন?”

“তাদের বুঝি জানের ডর নেই?”

“কিন্তু—”

“কিন্তু কী?”

সদূ আফজলের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলে খুব সহজে, “না হয় দু-দল চোর আছে। কিন্তু একই দিনে, একই বাড়ীতে একই সময়ে?”

“তা হোতে পারে। দুনিয়ায় এমন কোন ঘটনা নেই হোতে পারে না। হয়ত আছে। গাধা মানুষ হয় না। কিন্তু এরকম ব্যাপার ত হোতে পারে। একই দিনে একই সময়ে একই বাড়ীতে—।”

সদূ আরো আপন্তি তুলতে গেল। কিন্তু আফজল বয়সে বড়, মূরুক্ষীর চালেই বললে, “জান্তি কথায় ফায়দা নেই। এখন মাষ্টারকে কেন্দ্রে ধাক। সে যদি কিছু করতে পারে। দিন কাল খারাপ, বড় খারাপ।” শেষে কর্তৃপক্ষের অতি হতাশামণিত।

ওঠার আগে সবাই চা খেলে এবং আরো এক দফা সিগারেট ওড়ালে।

প্রিয় কোত্তা,..... মাফ করো আমার অকারণ বাচালতা। যত দিন যাচ্ছে আমি নিজের কাছে নিজে অপরিচিত হোয়ে উঠছি। কারো সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যেন আমার পক্ষে কষ্টকর। শুধু তোমার সান্নিধ্যে এলে আমার সব খেসারৎ মুনাফায় পরিণত হয়। সকল অপচয় যেন সঞ্চয়ের কড়ি রূপে আমার চিত্ত হিল্লোলিত করে যায়। এক কালে গৃহে সকলের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম। যার যা প্রাপ্য, দাও। কিন্তু এখন এক বিষণ্ণতায় আমাকে পেয়ে বসে। তখন তোমার সাহচর্য-স্মৃতি অবলম্বন করে আবার মনের জোর ফিরে পাই। যেন বাঁচার মন্ত্র তুমি। ক্লাব পার্টি আমার আর ভাল লাগে না। হঠাৎ-হঠাৎ পুরাতন অভ্যাসের বশে মজুকুর জায়গায় হাজির হই। কিন্তু বিরক্তিরা যেন ওৎ পেতে থাকে। একটু পরেই দলে দলে জোটে। তখন পদচারী, কিছু গুল্তনির আসরে অমনোযোগী শ্রোতা বা ওই জাতীয় আনন্দনার হাই তুলে সরে পড়তে হয়, আমার বরাদ্দ সময়েই বহু আগে। বিকার, বিকলতা শ্রেষ্ঠ্যাভাব— নানা বিশেষণ তুমি জুড়তে পারো। কিন্তু আমি আস্ত-অস্তিট। ধীরে ধীরে মনে হচ্ছে, আমার যন্ত্রণার শেষ কোথায়, আমার কাছে চিরদিন অজ্ঞাত থেকে যাবে। অথচ তোমার সংস্পর্শ একদম গুমোট দিনের পর বৃষ্টিবড়ের মত। অনেক সময় আমাদের কোন কথা হয় না তুমি জানো। বসে থাকা ছাড়া যেন আর সব কিছু

অপ্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে। অথচ ভরাট মনে হয় সন্ধ্যা, দুপুর— সিংদেল চোরের মত যদিও একটু অলঙ্কৃ ফাঁক-রচনার জন্যে আমরা দায়ী বা তৃষ্ণিত থাকি। আমার বাচালতা যত বাড়ছে তোমার পত্র তত সংক্ষিপ্ত। তুমি কি হিসেব-নিকেশ ছাড়া চলো না? ওসব কাজ ত আমি বহু বছর করে আসছি জীবিকার তাগিদে। কিন্তু এখন কোন হিসেবই আমাকে তাতায় না, শ্রেফ মেরু-তুষার করে ফেলে। কিন্তু তুমি যেন ধীরে ধীরে আমার জ্ঞায়গা নিছ। আমি অভিযোগ করছি না। তোমার তা মনে হোতে পারে। কোন ক্ষেত্রে গুটিয়ে গেলে অন্য কোথাও তার বিস্তার ঘটবেই। ছাত্রকালে কিছুদিন আমার বুদ্ধিজীবি হওয়ার স্থ চেপেছিল। বহু জ্ঞানীগুণীর আসরে যেতাম কল্পে পাওয়ার আশায়। অথচ এই খেয়াল কেন আজীবন পেয়ে বসল না? নানা পাকে বর্তমান পাকে জড়লাম, সাফল্যের চাঁদ হাতে পেলাম, আজ আবার অতীত ঝলক দিয়ে যায়। তোমার হাতে রাখী বাঁধতেই যেন আমার সর্বভূমিক্ষণ ওলট-পালট হচ্ছে। সুখ যন্ত্রণার কাছাকাছি। আমার যন্ত্রণা সুখের যমজ-ভগী আগে ত বুঝিনি। তাই অনুরোধ, নিপীড়কের ভয়াবহতা নিয়ে যদি কথনও অবর্তীর্ণ হও, অনুরোধ— মানবীর বেশে এসো না। সাক্ষাতের ব্যবধান যদিও সংকীর্ণ করতে বলব.....

ইতি
কেবল সয়ীদ

ঐ চিঠির জবাব্দি

হে সয়ীদ আমার অতি সংক্ষিপ্ত পত্র। তুমি এমন জটিল হোয়ে উঠছ, একটু সহজ হও। তোমাকে তাহোলে ধরা খুব সহজ হোয়ে পড়ে। কিন্তু তুমি আসমানে আমি জমিনে— এমন হোলে সঙ্গমস্থল কোথায় রচনা করবে? তুমি না প্রেমের ত্রিবেণী গড়তে চাও? তার জন্যে অত জোরে ছুটলে স্নোত কি করে নদীর মোহনায় চুকবে। হঠাৎ স্কুল-পলাতক বালক হোয়ে উঠছ। তোমার উদ্বামতা এখনও যায়নি কেন? যথাস্থানে যথা কথা!

ইতি,
তোমার ফোস

ত জীপ চালিয়ে যাচ্ছিল কালু।

নিশ্চিথ নগরী।

শহরের সড়ক স্টান পড়ে আছে। এত গভীর রাত্রে কোন পথচারী নেই। আওয়ারা দু' একটা কুকুর হঠাৎ রাস্তা মাড়ায়। কোথাও কোথাও তারা দল বেঁধে চীৎকার দেয় ধাবমান জীপ দেখে। জোৎস্ব থাকলেও মেঘ আকাশে। তাই আবছা চতুর্দিক। সব রাস্তায় এখনও আলোর ব্যবস্থা নেই এই শহরে।

ষ্টীয়ারিং এক হাতে ধরে অন্য হাতে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়েছে কখন কালু। স্পিডোমিটারের দিকে খেয়াল নেই তার। কত মাইল? বিশ-তিরিশ ষাট-স্কেল যাই হোক, তার কিছু আসে যায় না। আজড়ায় প্রচুর নেশার সামানা মজুদ ছিল। সে আছে কিন্তু

মাঝামাঝি স্তরে। তবু সে স্ত্রির নয়। মাথা দপদপ করছিল। মটোরের অন্তরাঞ্চার স্পন্দনের সঙ্গে তার যেন কোথায় যোগ আছে। ছায়ারিংডে হাত দিয়ে সে আস্ত্র হচ্ছে। এই নিউত্রিন নগরী চোখে কোন যান্ত জাগায় না। তার চোখে হয়ত রাস্তা দেখে। আর বেশী কিছু দেখার ইচ্ছা নেই তার। এ্যাক্সিডেন্ট এক আধটা হোতে পারে। কিন্তু মানুষ মরবে না। মরবে সে। সে ত মানুষ নয়।

অসাফল্যের পর অসাফল্য। দলের দাবীর কাছে হয়রানি। মাথা ঠিক থাকবে কেন? এসব চুকিয়ে-বুকিয়ে সে ত সাধারণ নাগরিক হওয়ার প্রার্থী। কিন্তু সুযোগ দেবে কে? উন্নদের কথা ঘনে পড়ল, “ব্যাটা যে সাপ পোষে, সাপুড়ে, সর্পঘাতেই তার মৃত্যু হয়, অপমৃত্যু।” এত দিন সে গুণা পুষেছে। আজ গুণার মুখেই সে শুনেছে অকাট্য চরম কথা। তার কথাগুলো কানের পটে গন্গনে কাঠ-কয়লার মত ছাঁকা দিচ্ছে : ‘মাটির, দোষ আমাদের নয়, রোজগার হচ্ছে না। বৌ-বেটীকে ত খাওয়াতে হয়। অথচ আপনি হাত ভারী করেছেন। আমরা মানুষ, না কি? আপনার হুকুমে কি কাজ করিনি? আমাকে নিয়ে আপনি যা কিছু করতে পারেন। পুলিশে দিতে পারেন। আপনাকে আর পুলিশ স্পর্শ করবে না, আপনার মর্যাদা অনেক উপরে উঠে গেছে। আমাকে মারতে পারেন, কাটতে পারেন। সব পারেন। তবু বলব, আপনি আর মানুষ নেই। আমার বৌ-বেটী নেই? সেকথা ভাবলেন না। দেশে কলকারখানা হচ্ছে, আপনার ব্যবসা কে ঠেকায়? আমরা মরব। বেশ...।’

এই ধারা হাজার ধারার ধারালো লাভ। ব্যাটোকে সে খুন করতে পারত। তার জন্যে নিজের হাত ওঠানোর কোন দরকার নেই। ইশ্বরাই যথেষ্ট। কিন্তু না, আর নরহত্যা নয়। বেটো আখেরী দোহাই মেরেছে, তার স্ত্রীকুম্রী আছে। যাক, যাফ করে দেওয়া যাক। দলে আসতে চায়, আসবে। না আসে, না আসুক। পিপড়ে। ক্ষতি কি করবে? কার কাছে নালিশ করবে? সেও জানে, কত বেচারা সে।

কিন্তু কী কথাগুলো বললে। অসহ, অসহ। দিনের বেলা হোলে এইটুকু জীপ চালাতে সে এ্যাক্সিডেন্ট না করে পারত না। ভাগিয়ে রাত্রি। মাত্রার বোৰা নামবে কী? এই সব ক্ষেত্রে দিয়ে একদম সাধারণ গেরহুর জীবনযাপনই ভাল। একটা ব্যবস্থা তার করতেই হবে। কিন্তু এই শহরে সম্ভব নয়। হয়ত এই দেশেই সম্ভব নয়। আর কোথাও। সুরঞ্জানের বিয়ে দেবে সে। কোন সৎ শিক্ষিত দুলা। চাকরী করা লাগবে না। দেখে-শুনে খেতে পারলেই হোলো। আর বৌ যদি তার সঙ্গে থাকে থাক। নচেৎ সে একাই চলে যাবে যঙ্কা শরীফ। আর ফিরবে না। শুধু নামে চলছে। গায়ে আর ত আগের জোর নেই। আর রক্ত-গরম কাজে জড়াবে না সে। কিন্তু বাঁচতে গেলে রক্ত গর্মাতে হয়। কেঁচোর মত বাঁচতে চেয়েছিল সে। কেউ বাঁচতে দেয় নি। পায়ের তলায় ফেলে রংগড়েছে। আট বছরের বালক পর্যন্ত ‘এই রিকশাওয়ালা যাবি’ তুই-তোকারি দিয়ে ডাকতে দিখা দেখায়নি। আজ সে আপনি। কারণ, সাপ। ছোবল দিতে পারে, ফোস করতে পারে। আর কেবল গর্জন নয়। প্রয়োজন-মত রক্ত বর্ষণ। তাই সে সম্মানিত আপনি। হঠাত অট্টহাস্য করে ওঠার প্রত্যন্ত চাগান দিয়ে ওঠে ভেতরে, সব ভেঙে-চুরে ফেলার সখ জাগে কালুর। অথচ কতদিন কত প্রচণ্ড নেশার মুখে সে নিজেকে বলি দিয়েছে। এমন অস্বাভাবিক কিছু মনে জাগেনি।

দ্রুত একটা মোড় ঘোরাতে হোলো। এত জোরে সে গাড়ী ঘোরায় একটা ল্যাম্পপোষ্টে লাগতে পারত। লাকুক। কালু ত মানুষ নয়। বেটার আস্পর্দ্ধা, মুখের উপর এমন কথা বললে।

শহরের ভেতরে এই জায়গাটা নির্জন। অনেক দিন থেকে ফাঁকা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এখানে অস্থায়ী বাসিন্দার যাতায়াত ছিল। কিন্তু গত তিন বছর ধাঙড় পল্লী-কাপে এলাকা বিখ্যাত হোয়ে, উঠেছে। সুন্দর সড়ক। কিন্তু তার পাশে নর্দমা, কাদা, ওয়োরের পাল, হাড়-জিরজিরে বাচ্চা, হাড়গিলা অকালবার্দ্ধক্যের শীকার মেয়ে-মরদ— সব তুমি দেখতে পাবে।

মটোরের সঁ-সঁ-রব ছাড়িয়ে কালুর কানে যায় তুমুল হটগোল চলছে নিকটে কোথাও। তুমুল অট্টহাস্য, উল্লাস, চেঁচামেটি বা ঐ জাতীয় কোন হটরোল। শ্বীড একটু কমিয়ে ফেললে কালু। এক-দম দশ মাইলের নীচে। তারপর কান খাড়া করে সে। বুঝতে একটু দেরী হয় না : ধাঙড় পল্লীতে পচাই কি হাড়িয়া খেয়ে জোচ্ছনা রাত্রে সবাই ফুর্তিতে মেতেছে। ব্রেক কবলে কালু। আবার সজাগ কান। এবার সবই স্পষ্ট শুনতে পায় সে। মেঘের ধাঙড়ুর ডুগড়গি বাজিয়ে সমবেত কঞ্চে গান করছে। মাঝে মাঝে ধূয়ার কায়দায় এহচে, এহচে-রব অথবা চীৎকার, নিদ্রিত নগরীর শুক্রতার বুকে বিলিক মেরে উঠেছে, তার দপাদপি-রত মাথার রংগের মত। সামনে একটা দেশওয়ালের আড়াল ছিল। তাই কালু কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু জমাট আওয়াজের ধোঁকা বিচ্চি ঐক্যতানের মত তার কাছে হঠাৎ এসে আবার রেশ-রেখে-রেখে সরে যান্তি। বেহালার তারে কে যেন ঘষে ঘষে ছড় টানছে। ককিয়ে কান্নার মত এই শব্দ হঠাৎ গবিনীর সদস্ত চৰণ-নিক্ষেপের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। আবার যাত্রা শুরু হয়। যখন সমুদ্রে, প্রপাত জোয়ার-স্ফীত নদীর মোহনা— সব একত্রে বাতাসে গোঙানির রূপ ধারণ করে। কালু স্তুত, জীপের মত। একটা সুখের স্পর্শ, অবসাদ-মুক্ত বিশ্বামৈর সুস্মৃতি তার সারা দেহে। তার ইচ্ছা হয় ওইখানে ছুটে যায় ওই আসরের শরীক, জীবন যেখানে লুটপাট হচ্ছে। এই পল্লীর চেহরা সে জানে। নোংরা এবং দীন। তারই ভেতর প্রাণোল্লাসের এই জাগরী উঠেছে। খেতে দোষ কী। সে ত মানুষ নয়। ছেঁড়া-ছেঁড়া অনুভূতির আঘাত তাকে আরো লোভাত্তুর করে তোলে। সেই মুহূর্ত তাকে ঠেলে নিয়ে যায় নানা খামখেয়ালীর আস্তাকুঁড়ে। এমন ধাঙড় হোলে ক্ষতি কি ছিল? গোলাপি নেশার আমেজের ভেতর যৌথ উদ্দাম সঙ্গীত, ঢোলের রব, হটরোল মিশে যায়। কালুকে কে যেন আকর্ষণ করে। এইখানে জীপের উপর সে নিঃসঙ্গ। নির্জনতার পাহারায় আবদ্ধ। মুক্তি-প্রার্থনার সকল উৎকোচ তাকে হিড়হিড় টানতে থাকে। বসে-বসে পায় এক রকমের বুঁদ শান্তির স্পর্শ, ওই আসরে চুকে-পড়ার সুখদ আলিঙ্গন। একটা ট্রেন হইশেল বাজিয়ে কোন দিকে যেন চলে গেল। অগোচর হাত উঠে আসে তার মাথায় চীয়ারিং হইল থেকে। ট্রেন তার মাথার ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে ডা-ডা-ডি-ডি-কো-টা ডি-ডি-কো-টা করতে করতে। কানের পাশ থেকে এক ঝাঁক শালিখ পাখি কিচির মিচির উড়ে গেল। এইখানে বসে থাকলে সে হাঁটফেল করবে। ধাঙড়-পল্লী মওজে ডুবে যাচ্ছে। বিরাট শিশু গাছের একটা কয়েক কাঠা-জোড়া ছায়া পুলিশের মত হেলে-দুলে খৈনী টিপে টিপে

এগিয়ে আসছে। ছায়া অথবা পুলিশ।

কালু জীপ থেকে নামল না। একটা সুর্কির রাস্তা আছে ধাঙড় পল্লীর ভেতর ঢুকতে। প্রায় নিঃশব্দে ষাট দিয়ে হেড্লাইট বা জ্বালিয়ে সে আরো এগিয়ে গেল। দেওয়াল আর তার বরদাস্ত নয়। সব দেওয়াল ভেঙে যাক। পচাই খাওয়াই তোফা। একটু গন্ধ লাগবে। কিন্তু কী আরাম, কী আরাম। কালীটোলার সেই তাড়িখানা কি আছে? সেই শহরে একবার গিয়ে দেখে এলে হয়। গরীব খা কি বেঁচে আছে? সাবেক উত্তাপ যেন সব ওইখানে অপেক্ষা করছে। হল্লা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। জীপ থামিয়ে এবার কালু দেখতে পায়: আসু। পাশেই কালো কালো এত রঙ। একটা নর্দমার মধ্যে কটা শয়োর চরছে। কালুর গা ঘিনঘিন করে না। চরছে চুরক। শয়োরগুলো বুঝি তার মত রাত্রে কম ঘুমোয়? ওদিকে আসুর ভরপূর। দশবারো জন মেয়ে-মৰদ ভাঁড় থেকে হাড়িয়া থাচ্ছে আর কোরাসে গান ধরছে। যার মুখ পানে রত, সে গলা দিচ্ছে না। কিন্তু ভিড়ে দু' এক জন বাদ গেলে ক্ষতি কি? দুটো মেয়ে ধেই ধেই নাচছে কোমরে হাত দিয়ে। একটা বোঁটকা গন্ধ এলো। রাস্তার পাশে একটা পাঁটা ব-ব-ব ডেকে উঠল, তারপর ফ্রেক্ষুন্থ নিঃশ্বাস ছাড়ে। আসুরের পাশেই প্রায় বিশ বর্গ হাত জুড়ে শয়োর-চষা কর্দমাঙ্গ জায়গা চাঁদের আলোয় চক্চক করছে। গায়ক ও নর্তকদের কোন খেয়াল নেই। বেহঁশ সবাই। এক যুবক উঠে মেয়েদের কোমর ধরে নাচতে লাগল। কালু ভাবলে জীপ কোন রকমে আরো কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। আসুরে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু এখানে এলো ঝুঁটি আর এগোতে দোষ কী? জীপে বসে বসে নিজের মধ্যে সে বিচরণ করে। যেদিকে চায় শুধু ছায়া, তরুণতা, ফুল, পাখির ডাক। এই মাত্র পৃথিবীর জন্ম হোলো। সূর্য উঞ্চছে। কালু দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীকে দেখছে। শুহার মত মেটে ঘরগুলো এত নীচ। যান্ত্রিক সেঁধোয়া কী করে, ওর ভেতর? ঝুপড়ি ঝুপড়ি কত সারি। চাঁদের আলোয় সব ঘোন সুচে গেছে। কোন শিল্পীর আঁকা ছবি যেন বিক্রীর জন্যে সারি সারি সাজানো। একটা কুকুর পর্যন্ত লেজ নেড়ে নেড়ে পাড়ার আনন্দের শরিক। আসুরের পাশে শয়ে আছে। গন্ধ আসে। বিকট গন্ধ। পচুয়ের গন্ধের কাছে কিছুই এগোতে পারে না। নাচ এবার উদ্বাম পর্যায়ে। তেমনই ঢোলকের শব্দ। গায়করা বেহঁশ। তা বোঝা গেল, গানের মধ্যেই এক পাশে যখন এক যুবক আর যুবতীর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হোলো। অবিশ্য নাচের মধ্যেই। তার পর যুবতী জোর করে যুবকের কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিলে যুবক তার কটা-বঙ্কন ছাড়তে চায় না কিন্তু সবল মেয়ে এক ঝিঁকা মেরে নিজেকে সরিয়ে নিলে সহজে। কথা কারো থামে না। কালুর কান খাড়া। দেবতার মত সে পার্থিব লীলা দেখছে। শুনতে পায় সে সবই।

যুবতী : কিরে, তুই কহে হামার মুহে গন্ধ।

যুবক : সাচ।

যুবতী : হাসপাতালের ডাগ্ন্ডর বাবু কইত হামার মুহে গোলাপ ফুল রাহে।

যুবক : চূপ, রাজমোতিয়া।

যুবতী : চূপ করেগা কাহে? ডাগ্ন্ডর বাবু হামার বদন দাবা কর দেখা। কহে ফুল। তুই মেহতর কহে, আমার সুরৎ নাহি। আরে....

যুবক : চূপ কর, রাজমোতিয়া....

- যুবতী : ডাগ্নদর বাবু, শরীফ আদমী। কিমৎ জানে হে।
- যুবক : আয় আয় নাচ কর, রাজমেতিয়া...
- যুবতী : তুহার সংগে নাচেগো? থৃঃ। হাসপাতালের দাগ্নদর বাবু হামার কিমৎ জানতা।
- যুবক : এই শালী, চুপ কর।
- যুবতী : বেসৈমান ডাগ্নদর বাবু বদলী লে লিয়ে ভাগল্বা। হামার... তু হামার সুরৎকা বদনামী করে...

মেয়েটা একদম মাতাল হোয়ে গেছে। আসর থেকে ছিটকে পড়ে। যুবক তাকে ধরে রাখতে চায়। সে রাস্তার দিকে এগোয় আর বলতে থাকে, “হামার সুরতের বদনামী... দেখ অঙ্গা, দেখ অঙ্গা।” তারপর সে বুকের কাপড় খসিয়ে ফেললে। চাঁদের আলোয় আবছা সব বোঝা যায়। মেয়েটা যুবককে টেনে হিঁচড়ে এগোতে থাকে, সমস্ত আসরে একটা ছন্দ পতন ঘটল সহজে। কেউ কেউ গানে তখনও মন। কিন্তু অধিকাংশ উঠে পড়েছে। মেয়েটার পেছন পেছন তামাসা দেখে। চুলি কেবল তার বাদ্য ছাড়ে না। ডুগ্ ডুগ্ শব্দ বেজেই চলে।

কালু নির্বিকার। সে যেন শিশু, চেয়ে আছে। সকলে এই রাস্তার দিকে মুখ নিয়েছে। মেয়েটা চীৎকার করছে, “আরে হামার ডাগ্নদর বাবু!...” তারপর সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

হেড লাইট জালিয়ে ফেলেছে হঠাতে কালু নিজের অজানিতে। চাঁদের আলো ছিটকে চোরের মত স্ট্রকে পালায়। তীব্র আলোয় কালুর জোখে পড়ে, চারিদিকে কি কৃৎসিত আবর্জনা। রাস্তার ধারেই কত জন মুভে রাখে। মাটি ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ ত অত সহজে যায় না। তিন চারটে শয়োর বাচ্চা গাঁও গাঁও ক্ষয়েছে একটা ঝুপড়ীর পাশে। ন্যাকড়া ঝুলছে কতগুলো বাখারীর তৈরী জানালার উপরে কাচা গোবরের গাদি কয়েক হাত দূরে। গাঘিনঘিনিয়ে ওঠে।

হেড-লাইটের সামনে এসে দৌড়িয়েছে একদল মেয়ে মরদ। হঠাতে সব স্তর। যেন মৃত্যুর মুখোমুখি।

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, “কোন আপ?”

“পুলিশ” কালুর মুখ দিয়ে কথাটা হঠাতে বেরিয়ে যায়।

কয়েক জনের হাত জোড় হোয়ে যায় ওই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে।

আর কোন শব্দ নেই।

এতক্ষণ প্রাণেদ্বামতার নায়ে-ন্যূন্য চলছিল, সব বরফের প্রান্তর। মেয়েটা শুধু দপাদপি করছে। কিন্তু বক্স মুখ। সেই প্রথম চীৎকার দিয়ে উঠল, “এই বাবু সাব...।”

চুপ, চুপ, সম্মিলিত বারণ ধ্বনি।

“এই বাবু সাব, হামার সঙ্গে সাঙ্গ করবে, এই সাব... গোড় পড়ে...।”

“চুপ, চুপ।”

এক জন মেয়েটার মুখ চেপে ধরেছে। তবু বিকৃত শব্দ বেরিয়ে আসে ফাঁকে ফাঁকে, “সাঙ্গ... গোড়... পড়ে।”

কালুর ইচ্ছা করে, এখনই জীপ চালিয়ে দিতে পারত সে সব মানুষগুলোর উপর। আর তারপর এক শ' মাইল স্পীডে সে ধাক্কা খেত পুরাতন শাহি আমলের ওই দেওয়ালের

সঙ্গে। সব শেষ তারপর। তার নেশা যেন এতক্ষণে জমে উঠেছে। সেই প্রকৃত মানুষ। উল্লেক তাকে সন্ধ্যায় গাল দিয়ে গেছে। সে ধাঙ্গের পল্লীতে আসেনি। সেই একমাত্র মানুষ। কিন্তু এরা কি? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে বোবা শিশুর মত জোড়া জোড়া চোখ। ওরা কী?

স্বরূপ চিরে ধরলে কালু। প্রায় চীৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করে সে, “তোরা চুরি করতে পারিস না?”

“চুরি?” এই কথা জবাব নয়। কালুই আবার প্রশ্ন সজীব রাখতে উচ্চারণ করে, “চুরি?”

কিন্তু অপর পক্ষ নীরব। হেড-লাইটের আলোয় দেখা যায়, বিস্ময়ের তীরন্দাজ কাউকে ঘায়েল না করে যায়নি।

তেতে ওঠে কালু। তার মাথা আবার দপ্ত দপ করছে। এখনই জীপ চালিয়ে সব শেষ করে ফেলবে সে, এক্ষনি। কর্কশ গলায় সে পুনরায় বোমা ফাটায়, “চুরি করিস না কেন তোরা? এই জানোয়ারের মত থাকিস।”

“জবাব দে।” আবার কালুর বাক্যের জের।

এইবার একজন মাত্র টেক্ট দিয়ে উচ্চারণ করে “চুরি”।

আবার স্বরূপ।

হাকিমের মত কালু সাক্ষীদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

চুরি!!!

এক বুড়ো ধাঙড় এগিয়ে এলো। বোধ হয় প্রত্যার মোড়াল। মাথার চুল ঘাড়ের দিকে এক-দুইশি জায়গায় আছে, নচেৎ নেড়া। শায়ের চামড়া এত চিলা, ছাগলে খেতে পারে। কৌপিন বস্ত্রমাত্র পরিধানে। সে গোটা প্রত্যার মুখপাত্র। অন্ততঃ এই মুহূর্তে তার কোটের গত চোখে কি ছিল, বোঝা দায়। প্রিট্যাপিট চাউনীটা ঠিক আছে।

সে বললে, “চুরি?”

“হ্যা, হ্যা, চুরি?”

বুড়ো একটু দম নিলে।

একটু ঘাড় কাঁধ করে বললে, “চুরি? চুরি করব? হাতে ভগবান কুঠ (কুঠ) দেগা নেই? ভগবান হ্যায়।”

তারপর উর্ধ্বেন্ত্র বুড়ো চল্লিকা-খচিত বিরাট-নীল আকাশের দিকে চাইলে। বিড়বিড় কি বললে সেই জানে।

এক সেকেন্ড যায় না। একটু ব্যাক করে কালু জীপ সাঁ সাঁ চালিয়ে দিলে। মাতাল, উদোম মেয়েটা পেছনে এবার গলা ফাটিয়ে চীৎকার দিতে থাকে, “বাবু হামার সঙ্গে সাঙ্গ করেগা....?”

আলিস-ভাঙ্গ নিদিত মহানগরী পাশ ফিরছে আবার ঘূমের জন্য।

জীপের চাকার তলায় পীচের রাস্তা থেকে থেকে কাঁপতে লাগল।

পরদিন সন্ধ্যায় আফজল ও সদু গিয়েছিল খৌজ-খবর দিতে। কালু গোসলখানায়। তারা অপেক্ষা করে।

আফজল আসর জমিয়ে তোলে সহজে। সেও মুষড়ে পড়েছে।

সদু হতাশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আবার পশ্চ নিজের দিকে টেনে আনে, “তাই
ত—।”

আফজল তার দিকে চেয়েও দেখলে না, বারবার কালুর আগম পথের দিকে তার দৃষ্টি।

সময় সকলের কাছে ভাবী। তা বুঝতে দেরী হয় না। আফজল অবিশ্য আরো হদিস পেয়েছে। আজ কালুর সামনেই খোলাসা করবে। তার পকেটে একটা চিঠি কাঁটার মত খচ্ছ বিধিহৈ। এখন কালুর উপর সব নির্ভর।

সদু গুমোট কাটাতেই অহেতুক অকারণ মুখ খোলে, “আফজল ভাই, কিছু বোঝার পারি নে। যেহানে হাত দিই সেহানেই হালা গোকুর সাপ।”

“নসীব, মিয়া,” উচ্চারণ করেই আফজল চটাস্ শব্দে তার কপাল থাপড়ালে।
‘আপনেও তা-ই কন।’

“হ্যাঁ। এত আক্রেল খরচ। নাফা শূন্য। কপাল থাপড়াব না ত কী করব?”

“আমাদের মরণ।”

“তবে মাষ্টর একটা কিছু উপায় বাংলাতে পারে। কাবেল লোক। উভয়েই তারপর চুপ হোয়ে যায়। পকেট হাতড়ে আফজল দেখলে সিগারেট পর্যন্ত নেই। তার মেজাজ আরো খচে যায়।

কিন্তু কালু আসামাত্র সে সপ্রতিভ হোয়ে উঠল।

সদু অবিশ্য পূর্বেও মিতভাষী ছিল, আজ তার রদবদল দেখা গেল না।

কালু বৈঠকখানায় ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে, “চা খাবে ত?”

“তা আর খামু না।” সদু যেন জয়ার্টো মুখ থেকে দ্রুত ছুঁড়ে দিলে।

যাক, মাষ্টরের মেজাজ ভালই নেই। আজ একটা সুরাহা করতে হবে। নচেৎ মান ইজ্জৎ কিছুই বাঁচেনা। কাল যে একটা অগ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেল অতি-পুরাতন এক দলীয় লোকের সঙ্গে তার কারণ, আর কিছু না, এই অসাফল্য। রোজগার যখন বদ্ধ, তখন মায়ামহকরতের ঘরেও তালা-চাবি পড়ে।

কথাবার্তার ফাঁকে কালু নিজেই এক সময় চা বয়ে নিয়ে এলো। পুরুষ চাকর ত নেই। এদিকে কালুর ভদ্রতায় দলের সকলে মুঝে।

আফজল হাওয়া অনুকূল দেখে পার তুলতে গেল।

‘মাষ্টর, আর একটা সন্তুকের জবাব পাইছি।’ সে বললে।

‘কি?’

“ওই আতহার উকীল আর এক মাইয়ার লগে ফাঁসছে।”

“তুমি ঠিক জানো?”

“হ্যাঁ। এই দেখেন—।”

উচ্চারণের পর আফজল পকেট থেকে পত্র বের করতে গেল। কিছুটা ভেতরে, কিছুটা হাতে। এই অবস্থায় কালু বাধা দিলে, “থোও মিয়া, চিঠি। মুখে বলো।”

একটু অপ্রতিভ আফজল তবু তাল সহজে সামলে নিয়ে বলে, “উকীলের বউ প্রেম করে ইস্পোর্টারের সঙ্গে। আর উকীল মজেছে এক বিধবার সঙ্গে, যার বহুৎ সম্পত্তি।”

হাত নেড়ে কালু এক তাছিল্যের ভঙ্গী করলো ঠোট সংকুচন-সহ। সেই সঙ্গে বললে, “মিয়া ওসব কথা আর শুনিয়ো না। আমাদের লাভ কী? আমাদের দেখতে হবে কিসে দাঁড় বাগানো যায়।”

“কখন কী কাজে লাগে কে জানে।”

“আমাদের কী কাজে লাগবে। আর প্রেমট্রেম ওই সমাজে পানাপুকুরে ঢেলা- ফেলার মত। ফাঁক, তার পর যেই-কে সেই, যেমন আগে তেমনি পরে। শামুকের মুখ-খোলার মত। খুলতেও দেরী নেই, বুঁজতেও দেরী হয় না।

সদুর ঠোট মুছিকি হাসি খেলে যায়। মনে মনে ভাবে, সাধে কি আর মাষ্টর বলে সবাই।

তঙ্গের প্রার্থনার মতই সদু আউড়ে যায়, “মাষ্টর-বাই, আমাগো ত মরণ। কিছু হাদিস করার পারি না।”

“কিছু ভাবতে হবে না”, অভয় মুদ্রা রচনা করলে কালু করতালু আর অঙ্গুলী সংযোগে। আবার সোচার, “কিছু ভাবতে হবে না। এবার আমি যাব সঙ্গে।”

আফজল ত যেন লাফিয়ে ওঠে খুশীর চোটে। সে বলে, “আপনি যাবেন?”
“হ্যাঁ।”

‘তা-হোলে আর কথা কী।”

“দেখছি আমি না গেলে আর চলছে না।”

আফজল একটা সিগারেট প্রার্থনা করলে। তার নেশা লেগে গেছে। তার আকেল কিছু কম নয়। কিন্তু বার বার ফেল মেরে সে হাতাপি হোয়ে পড়েছিল। এবার তার বিদ্যে কম নয়, তা-ও যাচাই হোয়ে যাবে এই ফাঁকে। আফজলের উৎসাহের গোড়া নানাদিকে।

“কিন্তু—”, কালুর খটক।

“কি কিন্তু?” আফজল কথাটা ঝুক নেয়, যেন আছার খেতে গিয়ে সামনে যা পায় ধরেছে।

“তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।”

“একটা কেন শত কন, বান্দা পেছ-পাও অইত ন।” সদুর উৎসাহ এইভাবে দীপ্ত হয়ে উঠল।

“একটা কাজ। অবিশ্য পরে তোমাদের সব বাণ্ডলে দেব।” কালুর মুখের দিকে সদু ও আফজল এমন অপলক চেয়ে থাকে। মুখ থেকে কখন কী বেরোয় যেন তাদের দৃষ্টি না এড়ায়।

“চুরি করব কোথায় জানো?”

“কোথায়?” সদু ও আফজলের জবাব এক সঙ্গে ঠোকাঠুকি থায়।

“এই আত্মার উকীলের বাড়ীতে।”

“আচ্ছা।”

আফজল সন্দেহের দোলায় চেপে বসে।

“সত্যি?” সদুর প্রশ্ন।

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু। এক জায়গায় দুইবার।”

“ক্ষতি কি। মাল ঠিক জায়গায় আছে। তা ত আর বিবি নয় ঘোরা ফেরা করবে এদিক ওদিক।”

কান্দুর জবাবে দুই সঙ্গী হেসে ওঠে। পরে তার অনুসরণ করে।

“এখন আমাদের কাজ কী?” দুই জোড়া জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে কান্দু শাস্ত গলায় বলে, “খুব ভেবে-চিন্তে পা ফেলেফেলে এগোত হবে। তবে আপাততঃ একটা কাজ তোমরা করবে।”

“বলুন।”

“বাড়ীর পাশের গলিতে আমার জীপটা এই রাত দশটা নাগাদ নিয়ে যাবে। তারপর ভান করবে, খারাপ হোয়ে গেছে। বনেট খুলে পানী খাওয়াবে। কলকজা একটু নাড়াচাড়া করবে। শেষে আশে পাশের লোক জানবে, গাড়ীটা খারাপ। একজন পাহারা দেবে। বলবে, মালিক এসে নিয়ে যাবে আর একটা গাড়ীর পেছনে বেঁধে।”

“বেশ।”

“পরে আমি গিয়ে ওই গাড়ীতে বসব। নম্বর পাল্টে দিও। তোমরা বাড়ীতে চুকবে। আমার হাতে ছাইশেল থাকবে। একটা পি সিটি দেব। সেটা পালিয়ে গাড়ীতে আসার ইশারা। বুঝেছো?”

“জী।”

“মাজেদ ত আছেই। সাহসী ছেলে। চাবী খাঁকি খবর দিও। আচ্ছা নাম দিয়েছ তোমরা। চাবী খী। আয়রন সেফের চাবী গুলো খট্টেট খুলে ফেলে। ওকে দরকার। ব্যাটা পাকা জহুরী।”

আফজল যেন ‘ওহি’ শুনছে। এমন অনুপ্রাণিত সে এবার নাটকীয় স্বরে বলে উঠল “আচ্ছা, উকীলের বিবি, এবার দেখিয়ে দেব, শামীকে ফঁকি দিতে পারো, আর আমাদের পারবে না।”

নোঙ্গা দিলে কান্দু, “এখন থেকেই এত উৎসাহ দেখিও না। যে ভাবে দিনকাল চলছে, তড়পানো ভালো নয়, আফজল মিয়া। ধীরে।”

সদূর নানীর কথা মনে পড়ল। অলঙ্কুণে কথা বলা নিষেধ। কিন্তু মাট্টরকে ত সে বারণ করতে পারে না।

তার উৎসাহের তলায় তাই একটা সন্দেহ লেন্টে রইল। মুরুবীদের কথা কি জানি কী হয়?

এই অভিযানের উপর তাদের সকল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আতহার আলি উকীলের বাড়ীর আকার সেকেলে। কিন্তু তেতুর হালফিলের কাছাকাছি যায়। কারণ আছে। বাড়ীটা তিনি তৈরী করেননি। কিনেছিলেন। কেনারও ইতিহাস আছে। সাবেক মালিকরা বিপদে পড়ে পানীর দামে বেচে দেয়, মাত্র বিশ হাজারে। আতহার আলী নগদ পনর হাজার টাকা আর পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়েছিলেন। এই চেক আর ক্যাশ হয়নি। সাবেক মালিকদের অনেক শরীক ছিল। মামলা করতে গেলে নানা ফ্যাক্ড়া এসে জোটে। সুতরাং তারা আর মামলা করতে সাহস পায়নি। উকীলের বিকল্পে কেস, কুমীরের বিরুদ্ধে জলে লড়াই? বর্তমানে লক্ষাধিক দামের বাড়ীর মর্যাদা দিতে কিন্তু আহাতার আলী

কসুর করেনি। অনেক অদলবদল ঘটল বাড়ীর ভেতরে, কিছু-কিছু বাইরে। পূর্বে মেথর-সাফ পায়খানা ছিল। উকীল তার জায়গায় ‘সুয়ারেজ’ যোগ করলে। কোন কামরার সঙ্গে বাখ্রুম ছিল না। এখন প্রায় প্রতি কামরার সঙ্গে যুক্ত বাখ্রুম। এমন নানা পরিবর্তন। কোন কোন জায়গার জানালা পর্যন্ত বদলে গেছে। মোটামুটি আন্দাজ করা যায়, আধুনিকতার নানা উপসর্গ এসে জুটেছে।

দোতলা বাড়ী। উপরে চারখানা কামরা। নীচে পাঁচখানা। উকীলের চেবার বৈঠকখানা ছাড়া আরো তিনখানা কামরা। দুটো বেডরুম, একটা খাওয়ার ঘর। রান্নাঘর আছে আলাদা উঠানের এক কোণে। আতহার আলী কিন্তু এই সরঞ্জাম পছন্দ করে। নচেৎ একবার তার মনে হোয়েছিল, পাকের ঘর দূরে হোলে বর্ষাকালে অসুবিধা। কিন্তু কী ভেবে সে আর ও-মুখ হয়নি। খরচও আছে নৈচা-খোল বদলাতে।

উকীলের শোয়ার ঘর উপরে। গৃহিনী বেশ আয়েশী। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়। তাই নীচেই তার কামরা। এই কামরা বাড়ীর মধ্যে আবার সবচেয়ে বড়। বেশ এলিয়ে-মেলিয়ে থাকা যায়। খাট আল্না, আয়রন সেফ, ড্রেসিং টেবিল পাতার পরও জায়গা খোল্তাই। পূবদিকে একটা ছোট জানালা ছিল আরো বড় জানালার পাশে। উকীলগৃহিনী কৃব্রা তা চওড়া করে নিয়েছিলেন।

বাড়ীর আর একটি হিসিস আপনাদের সহ্য করতে হবে। কারণ পরে বুঝতে পারবেন। বাড়ীর পঞ্চিম দিকে বারো-চৌদ্দ ফুট চওড়া গলি আছে। অবিশ্য গলির শাখা-উপশাখা অনেক। এদিকে একটা ছোট ফটক আছে। অসেল বড় গেট উত্তর দিকে। পূর্বে লন, কলাগাছের বন এবং উচ্চ পাঁচিল। দক্ষিণে একটা পুকুর আছে। অবিশ্য শরীক অন্য। জায়গার দাম বেশী। তারা এখন পুকুর ভৱান করেছে। এক কোনে মাটি পড়েছে অনেক। খোলামেলা এই কামরায় উকীলের স্বত্ত্ব সাধারণতঃ ঘুমোয়। উপরে যায় না, তা নয়। উকীল সাহেবে ও গৃহিনীর মর্জিন উপর নির্ভর করে। ছোট ছেলেমেয়ে তার পাশে থাকত। কিন্তু এখন ন্যাটাপ্যাটা কেউ নেই, তারা উপরে থাকে।

সেদিন উকীল-পত্নীর ঘূর্ম ধরতে বেশ সময় গেল। অনেক কিছু ভাবতে হয়। সংসারের চিন্তা যাদের থাকে না তাদের অন্য চিন্তা থাকে। মনের উপর কেবল মহাপুরুষেরা চোখ রাঙাতে পারে। নচেৎ পাহাড়ে ধূস নামার মত তাবনা যখন শুরু হয়, কার সাধ্য রোখে। সেই জন্যে বিছানা আরামের জায়গা মনে করা উচিত নয়। কাঁটা না থাকলেও গজাতে পারে, পাশ ফিরে শুয়ে দ্যাখো। ব্যবহার জীবির বউকে সেদিন অনেক সওয়াল জওয়াবের ফেরে পড়তে হয়, শ্বাসীর যা আদালতে ঘটে। তাই ঘূর্ম হটে গেল। ঘূর্মকে থাটে ফিরিয়ে আনতে কি করতে হোয়েছিল মিসেস কৃব্রা আলির মনে নেই।

কিন্তু যখন ঘূর্ম ভাঙল, তখন আঁথকে উঠেই সেই ছুচ করে গেল। তার পর নিশ্চিহ্নস্তের মত সে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কামরায় সে আর একা নয়। তার সামনে এক ব্যক্তি। হাতে বাড়িয়ে আছে আর চাপা স্বরে বলছে, “গোলমাল করো না, যদি ভাল চাও।”

কামরায় অতি ক্ষীণ পাঁচ পাওয়ারের বালবের আলো আর কতদূর এগোবে।

মিসেস আলির বুঝতে দেরী হয়নি, কি ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে। তার দরজা হাঁ-হাঁ করছে। কে কখন খুলল, খোদা জানে।

মিসেস আলি বয়ঙ্কা গৃহিনী। প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠেন, যদিও আততায়ীর দিকে তাকিয়ে মাথা সামান্য কাঁপে। বাইরে তুমুল অঙ্ককার। তাই ঘরের ক্ষীণ আলো সবল। চোখের পক্ষে বেশ সাহায্যকারী।

আততায়ী মুখ খুললে, “চাবি দাও। গহনা আয়রন সেফে আছে না আর কোথাও রেখেছো?”

নির্বাক মিসেস আলী। চাপান্বর হিংস্র জন্মের দন্ত-কিড়মিড় গোস্বার কাছাকাছি।

ফিস্ফিস্ শব্দে বলে, “জবাব দাও।”

তবু কুব্রা আলি চুপ।

“আর বেশি দেরী করতে পারব না। যদি মুখ না খোল তোমাকে তল্লাসী করে ছাড়ব। গায়ে হাত দিলে কি ভাল হবে? আর যদি চেঁচাতে যাও, আমার হাতের কুমালে সব আটকে দেব। গলা টেপার দরকার হোলে তা-ও করব। এখন ভালয় ভালয়,” আততায়ী হাত বাড়ালে আবার বললে, “চাবি দাও।”

মিসেস আলিকে নীরব থাকতে দেখে ছায়ামূর্তি আবার উচ্চারণ করলে, “সিধে আঙুলে ধি না উঠলে আমরা আঙুল বাঁকাতে জানি।”

অন্য দিকে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না দেখে ছায়ামূর্তি মিসেস আলির হাত ধরে হেঁচকা-টান দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের হাত বাড়ালে। সে সামান্য পিছিয়ে আঁতকানো অব্যাহত রেখে জবাব দিলে, “না, না।”

আততায়ী বললে, “এই ত মুখ খুলছে। অড়িতাড়ি করো, না হোলে আমি তোমার কাপড় খুলে ছাড়ব। চাবি দাও।”

“না, না।” সাবেক পুনরাবৃত্তি।

“আমি এ বাড়ির জামাই না, দুঃঢার দিন থাকব। শিগ্গীর করো।”

বাপসা আলো। আততায়ী টঁচের আলো ফেলে নিলে একবার চারিদিকে।

হঠাৎ মিসেস আলির চোখে পড়ে, তার বাথরুমের দরজা সামান্য খোলা। সেদিক থেকে একটা লোক কামরায় সন্তর্পণে চুকল। সে কিন্তু এগিয়ে এলো না, ঘূপ্তি মেরে দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় দলের লোক। লোকটা ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রইল। মিসেস আলি আরো হক্চকিয়ে যায়।

আবার দুবী ওঠে, “চাবি দাও। বেশ সময় যাচ্ছে।”

ছায়ামূর্তি তাই শেষ সতর্কতা ছাড়লে, “আমি বাধ্য হব, তোমার ইঞ্জে ধরে একটু টানাটানি করতে।”

“চাবি আমার কাছে নেই,” হঠাৎ মিসেস আলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

“কুটু বলছ না ত?”

“না।”

মিথ্যে বলো না। পরে পস্তাবে।”

“আমার কাছে নেই।”

“কার কাছে, বলো শিগ্গীর।”

কিন্তু তখন মিসেস আলি মাথা নীচু করে কাঁপতে থাকে। অবিশ্য খুব ভয় পেয়েছে

সে বলে মনে হয় না।

“আমি এক দুই তিন গুণব। তার মধ্যে যদি চাবি না দাও, আমার যা দাওয়াই আমি লাগাব। আখেরে পন্তে মরবে।” আততায়ী উচ্চারণের পর একটু থেমে শুরু করলে, “এক— দুই— তিন।”

যেন তবলায় শ্মের টাটি পড়ল। মিসেস আলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “আমার কাছে চাবি নেই। চাবি আমার কর্তার কাছে।”

“কর্তা কোথায়?”

“ওই যে, আঙুল বাড়িয়ে মিসেস ঘৃপ্টি-মারা লোকটাকে দেখায়। এতক্ষণ তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। লোকটার পেছনে নজর যাওয়ার কথা নয়। সে চট করে ঘোরা মাত্র লোকটার আবছা মূর্তি দেখতে পায়। আর কোন সময় নষ্ট করে না আততায়ী। সে ধাঁ ছুটে গিয়ে লোকটার মুখে এক ঘুষি চালিয়ে বলে, “মজা দেখছিলে?”

অপ্রত্যাশিত আঘাত। ঘৃপ্টি-মারা লোকটা প্রস্তুত ছিল না। সে এক ঘা খাওয়ার পর কিন্তু পাল্টা দিলে উল্লে ঘুষি। তারপর শুরু হোলো ঘুষাঘুষি। উভয়ে পকেটে হাত দিতে যায়, বৈধ হয় পিস্টল কি ছুরি আছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর ঠেলায় সুযোগ আর কারোর আসে না। সুতরাং শুরু হয় এলোপাতাড়ি ঘুষো ঢঢ়চাপড়, লাথি-ল্যাঙ। উভয়ের হাতের টর্চ ঠক্টক্ক শব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। দুই জংলী মোষ যেন জঙল তোলপাড় শুরু করেছে।

ঠাওর করতে পারে না মিসেস আলি, ঘটনায় ক্রীস্টাইচে। কিন্তু দুই কুস্তিগীরের প্যাঁচ কক্ষাকষি দেখতে দেখতে তারও মগজের কোষ ক্রমশঃ খোলতাই হোতে থাকে। সেখানেও প্যাঁচ শুরু হয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লড়ছে। রীতিমত্ত ফাইট।

এই সুযোগ।

মিসেস আলি খোলা দরজা দিয়ে এক দৌড়ে বেরিয়ে, পাশেই সিঁড়ি পথে উপরে উঠতে উঠতে চীৎকার করতে থাকে, “চোর, চোর!”

দু’ মিনিটের মধ্যে গোটা বাড়ি জেগে উঠল। উপরে শোনা যায় আতহার আলী উকীলের বাজখাই গলা, “বন্দুক, বন্দুক।”

চীৎকার, দৌড়াদৌড়ি, হড়াহড়ি, ক্রমশঃ একের পর এক বাতির আবির্ভাব? উকীল চীৎকার দিতে লাগল। আশপাশ পর্যন্ত ক্রমশঃ জেগে উঠে।

লোকজন জমা হোয়ে যায় দশ মিনিটের মধ্যে।

বন্দুক হাতে উকীল নীচে নেমে এসে দেখল, বেড়ান্মে দুটো টর্চ পড়ে আছে। এবারও বাথরুমের জানালা ভাঙ।

সরু গলির ওপাশ থেকে কয়েকটা সাহসী কলেজের ছেলে ছুঁটে এসেছিল।

তারা বললে, গোলমালের মধ্যে, লোক বোঝাই দুটো জীপ সাঁ সাঁ গলি থেকে বড় রাস্তার দিকে বেরিয়ে যেতে ওরা দেখেছে। হয়ত চোরের দল।

তাদের আন্দাজ মিথ্যে নয়।

একটা জীপের পেছনে আর একটা ছুটল। পেছনের জীপে হয়ত পুলিশের দল। কাজেই অদৃশ্য হোয়ে যেতে হবে নিমিষে। নচেৎ এত লোকজন নিয়ে ধরা পড়ার চেয়ে

মৃত্যু ভাল । সুতরাং ছোটো, ছোটো ! স্পীডের শেষ প্রান্তে থেকে চালাও, চালাও । শহর ছাড়িয়ে গ্রাম পথে বিশ মাইল যাওয়ার পর চৌরাণ্টা মিলবে । তখন কোন এক দিকে গেলে পুলিশে কিছু করতে পারবে না ।

আর পেছনের জীপ ভাবছে, ওদের ধরতেই হবে । কেন পালাচ্ছে? কোথাও কিছু করে এসেছে নিশ্চয় । কিন্তু বেকলু ত প্রায় একই পাড়ার বিভিন্ন গলি থেকে ।

কখন শহর পার হোয়ে গেছে তারা । অঙ্ককার রাত্রি । মাঝে মাঝে হেড লাইট জুলাতে দুই জীপই বাধ্য । ফলে অঙ্ককার আরো বাড়ে । তারি মধ্যে দেখা যায় নিশ্চিত কৃষকপঢ়ী, নালা, ডোবা, বাথানে বিচুলি উপভোগ-রত গরু, গাছপালা । নচেৎ সবই ঝাপসা । গাছপালার অস্তিত্ব দেওয়ালের মত । বাতাসে কেবল এই গুমোট ভাব দূর হয় ।

ভোর হতে হয়ত আধ ঘটা দেরী । অনেক দূর এক জীপ আর এক জীপকে অনুসরণ করে এসেছে । দুই জীপে দেখা যায় দুই ড্রাইভার কিন্তু মুখোস পরা । কারণ কী? দুই দলই চৃপচাপ ।

কিন্তু ভোরের মতো দেখা গেল, সামনের জীপ যেন গতি শুথ করছে । খুব জোর পেচিশ তিরিশ মাইল । ফলে পিছের জীপ ক্রমশঃ তাদের কাছাকাছি এগিয়ে এলো । কিন্তু এক শ' গজের ব্যবধান সামনের জীপ অব্যাহত রাখে কমতে দেয় না । তখন সামনের জীপে কথা বলাবলি শুরু হোয়েছে ।

পেছনের জীপকে স্পীড কমাতে হয় কথা শোবাক্ষে জন্মে ।

খোলা জীপে দাঁড়িয়ে একজন মুখ দুই তালুর মধ্যে রেখে হাঁক দিচ্ছে, “তোমরা এই গলিতে কী করতে গিয়েছিলে?”

পেছন থেকে কথাটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায় । তখন পেছনের একজন আরোহী দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয়, “তোমরা ওই গলিতে কি করতে গিয়েছিলে?”

এবার এইভাবে মুখ-মা কে জবাব আদান-প্রদান শুরু হয় । দুই গাড়ীর স্পীড কমে এসেছে ।

সন্তুষ্টের জীপ : তোমরা আগে জবাব দাও—

পেছনের জীপ : না, তোমরা আগে জবাব দাও ।

সন্তুষ্টের জীপ : আমরা নিশ্চয় তস্বী তেলাওয়াৎ করতে যাই নি ।

পেছনের জীপ : আমরা কি সিন্ধি দিতে গিয়েছিলাম?

সন্তুষ্টের জীপ : তবে কি করতে গিয়েছিলে?

পেছনের জীপ : চুরি । আর তোমরা?

সন্তুষ্টের জীপ : হেই কর্ম ।

দুই জীপে তখন তুমুল হাস্যধনী ওঠে ।

সন্তুষ্টের জীপ : তবে আর হয়রান হোয়ে লাভ কী?

পেছনের জীপ : এতক্ষণ আমরা কেনই বা হয়রান হোলাম?

সন্তুষ্টের জীপ : সকাল হোয়ে আসছে আমরা গাড়ী খামাচ্ছি । তোমরা ব্রেক কষো ।

পেছনের জীপ : বহুৎ আচ্ছা ।

দুই জীপ থেমে গেল বেবহা মাঠের মাঝখানে । কয়েকটা ঝাঁকড়া গাছে জায়গাটা

অঙ্ককার। ভোর রাত্রে চাঁদ উঠেছিল। ক্ষীণ চাঁদ। তবু মুখ দেখার জন্যে যথেষ্ট।

দুই জীপ থেকে নামল দুই ড্রাইভার। তারাই মুখোস পরেছিল। আর সকলে মুখোসহীন।

দুই দলের নেতৃত্ব যে শুই দূজনের, তা বুঝতে দেরী হবে না। কারণ, অন্যান্যরা তাদের পেছন পেছন থাকছে।

সন্ধুখ ও পশ্চাত জীপের ড্রাইভার-দ্বয় মুখোমুখি হওয়া মাত্র আসসালামু আলায়কুম উচ্চারণের পর তারা মুখোস খুলে ফেললে। একজনের মাথায় কিণ্ঠি টুপি। অপর জন শূন্য শির, গলায় টাই। একজন পরেছে পাজামা পাঞ্জাবী। অন্যজন পাঞ্জুন এবং কামিজ।

কর্মদণ্ডন করতে করতে টুপিধারী বললে, “আমাকে হয়ত চেনেন না। আমি কালু। লোকে বলে কালু গুণ্ডা।”

“আপনি। কালু ভাই? আমি গফুর। লোকে বলে গফুর বদমাস।”

“আশ্চর্য।”

“তাজ্জব, তাজ্জব।”

“কি কাও?”

“কি মসিবৎ?”

গফুর বয়সে কিছু ছোট। এখনও তার মুখে পৌঢ়ত্বের ছাপ পড়ে নি। সে প্রাথমিক বিশ্বয় কাটিয়ে উঠে বললে, “ভাই কালু ভাই, আর কাঁত বেশী নেই। এখানে কোন কথা হোতে পারে না। সব শহরে গিয়ে। সমস্যা বুঝেছেন?”

“বুঝেছি না?”

“এখন আলাদা আলাদা রাস্তায় কাপড়-চোপড় বদলে যে যার আস্তানায় ফিরে যাই। তিন দিন পরে।”

“তিন দিন পরে কেন?”

“হ্যা, আমি তিন দিন বড় ব্যস্ত থাকব। তিন দিন পরে রাত্রি সাড়ে আটটায় কাবেরী হোটেলে, আপনাদের দাওয়াৎ থাকল, সেখানেই সব ফয়সালা হবে। তাই ভাবি কেন এত মার খাচ্ছি। আর কথা বাড়াব না।”

“আমিও তাই ভাবি।”

বাধা দিলে গফুর, “ভাই-সাহেব, সব কথা তিন দিন পরে। আর সময় নেই।”

অবিশ্য ষ্টোয়ারিং ছাইলে হাত রেখে ষ্টার্টের পর আবার এন্ডেলা দিয়েছিল গফুর, “ভাই সাহেব ভুলবেন না। রাত্রি সাড়ে আটটা হোটেল কাবেরী।”

“ভুলব? মোটেই না।”

কালুর জবাব সব গফুরের কানে যায়নি। তার আগেই সে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল।

দুই জীপ ধূলো উড়িয়ে আবছা অঙ্ককারে মিলিয়ে গেল।

প্রিয় সয়ীদ,

তোমাকে চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন হোয়ে পড়ল। ছোট পত্রে তোমার মন ভরত না। এবার পত্র বড়। কারণ, কথা অনেক। আর তোমাকে অনেক কথা কি ভাবে বলব,

এক সমস্যা। মুখোয়াখি একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু আমার মুখ তুমি হয়ত আর দেখতে চাইবে না। তাই পত্রেই কয়েকটা কথা খসড়ার মত টেনে যাব। তুমি নিজের বুদ্ধিযোগে সব বুঝে নিও। হয়ত তোমার কিছু অসুবিধা ঘটবে। কিন্তু নাচার। আমার কোন ক্ষেদ নেই, তুমি মনে করো না। জীবনের ধারা এমনই। এক রাস্তায় যেতে চাই। কিন্তু এগিয়ে গেলে এত চৌ-মাথা, মোড় পড়ে, তখন ঠিক করা কঠিন কোন দিকে যাব? কারণ, তোমাকে রাস্তা আর আকর্ষণ নাও করতে, পারে। এই রকম ক্ষেত্রে কেউ কেউ দিশেহারা, হয়ত আর কোন দিকে পা বাড়ায় না। কিন্তু সময় ত ধাক্কা দেবে। তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও চোখ অস্ত্রিল হোয়ে ওঠে। আর এক রকমের চলা তখন শুরু হয়। তার বাহন চরণ নয়। কিন্তু এই চলার ধাক্কা আরো কঠিন। আমি তাই নিজেকে আর মনের কাছে সোপরদ করতে নারাজ। বরং আর দশ জনের কাছে নিজেকে সঁপে উদ্ধার পাওয়ার মধ্যে মঙ্গলের আভাষ পাই।

সব কথা তোমার কাছে হেঁয়ালি ঠেকতে পারে। কিন্তু কোন অঙ্ককার আমি রাখব না। সরাইখানায় এক রাত্রির হঠাৎ-জাগা খেয়াল যেমন বহুকাল পরে তোমাকে লজ্জা বা আনন্দ দিতে পারে গুণাগুণ অনুযায়ী, আমার মনে হয় দুনিয়াকে এমন সরাইখানা ধরে নিলে, নিশ্চয় কোন গোলমাল থাকে না কোথাও। কিন্তু দুনিয়ার মোহ কম চিন্তার্কর্ষক নয়। তখন এক মৃহূর্ত যদি আনন্দের পথ খুলে দেয় আর অনন্তের পথ বক্ষ হোয়ে যায়, তবু মানুষ ক্ষতি স্থীকার করতে প্রস্তুত থাকে। মার্লো যখন একটি মাত্র চুম্বনে অমরত্বের দাবী জানিয়েছিল, তার মধ্যে এই রকম একটা গৌজামিল ছিল। তাহলিমনে করো না আমার ভীমরতি ধরেছে আর তাই তোমার সমীপে নানা সমস্যা তুলছি। অকপটে স্থীকার করতে হয়, আমাদের এখন ভীমরতি নয়, হিম-রতির বয়স। তাই হিমাক-শিনিকাশের দিকে মন স্থতঃই ধায়। তোমার উড়ু উড়ু ভাবালুতা পরিণত বয়সের ফসল নয়। বরং ঠাণ্ডা রক্তের কর্ম।

আমার জীবনের উপর দিয়ে তিনি চার দিনের মধ্যে কয়েকটা বাড় চলে গেল। তাই তোমার কাছে কিছু কথা বলার জন্য একটা ভনিতা করলাম। মন দিয়ে শুনবে, আর সেই মত সুশীল সুবোধ বালক হোয়ে উঠবে। উদ্বামতা শয়তানের বিধি, মানুষের নয়।

আমার বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল। কেবল উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছি। সে এক হাসির ব্যাপার। তুমি অপরের মুখে শুনে বেশ কিছু গর্ববোধ করবে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার আকেলের জোর অত নয়। তবে ধাক্কার মুখে পড়লে বোধ হয়, আকেলের উৎস খুলে যায় ওই ভাবে। একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। অবিশ্য গহনার প্রতি লোভ আমার খুব কম। মেয়ে আছে, ভাল-মত বিদায়ের জন্য কিছু সঁপ্রয় আগে থেকে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে গহনা উপহার দেয়, আমি তার গহনার বেশী কিছু না। অবিশ্য পুরুষেরা অলঙ্কার পরে না। অপরকে সাজায়। অনুভূতির হেরফের। আমি তার শীকার হইনি কোনদিন। তুমি কথায় কথায় উপহারের কথা তুলেছিলে, তোমাকে ধমকে দিয়েছিলাম। মনে আছে? সুতরাং চোরের উৎপাতে আমার কিছু আসে যায় না।

আর এক কাজ কে করল, আমার জানা নেই। বোৰা যায়, আমাদের গতিবিধি তাদের কাছে স্পষ্ট। খরগোসের মত চোখ বুঝলে অদৃশ্য হওয়া যায় না। আমরা অদৃশ্য শক্রের কাছে বাঁধা পড়লাম। গোপনীয়তা মূল্যহীন। অথচ চোখ ঠেরে সব সময় আমরা

এগিয়ে যাই। সভ্যতার মাপকাঠি মেলে চলার সার্থকতা কি? এই রকম বয়সে ভাবনা আমাকে বেশ উৎপীড়িত করত, তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর। কিন্তু হাজার বেড়াও শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। নসীবের ফের। তুমি হয়ত বুঝতে পারছ না, আমি কি বলতে চাই। তোমার চিঠি আমার উকীল সাহেবের হাতে গিয়ে পড়েছে। আমার চিঠি খুলবে, তেমন অসভ্য সে নয়। তার নামে সোজা গেছে। অর্থাৎ তোমার চিঠি খুলে শুধু মিসেস শব্দটা ঠিকানা থেকে তুলে দিয়েছে। বিভাট সোজা। তারপর, ঘটনা সব তোমার কাছে লিখছি।

কোট থেকে উকীল ফিরল। বিকালে এসে চা খায়। দেখলাম মুখ থ্যাথ্। চাকরের সামান্য ক্রটি দেখে কড়া চীৎকারে এক ধর্মক দিলে, যা তার অভ্যাস নয়। বুবলাম, একটা কিছু হোয়েছে এমন আশঙ্কার পূর্বাভাস অনেক সময় এমই আসে। অবিশ্যি আমি তার জন্যে বেশী মাথা ঘামাই নে। সন্ধ্যায় এক বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে নিজের কামরায় বই পড়ছিলাম। সামনে টেবিল-ল্যাম্প, হঠাৎ পায়ের আওয়াজ। অতি পরিচিত শব্দ। কাজেই পিছন ফিরে অদ্রতা রঞ্চা করলাম, “কি খবর?”

উকীল কোন জবাব দিলে না। সুটসুট এসে আমার সামনে তোমার লেখা চিঠিটা মেলে ধরলে, তখনকার অবস্থা তোমাকে আর না লেখাই ভাল। আমার চোখে আর কিছু দ্রষ্টিশক্তি ছিল, সন্দেহের ব্যাপার। উভয় পক্ষ চৃপ্চাপ। যেকোন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। অবিশ্যি আশেপাশে ছেলেমেয়েরা আছে, কাজেই নাটক যাই হোক, গলার আওয়াজ খাটো থাকবে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। উভয় পক্ষ নীরব। কারো মুখ দেখছি না। জবাবের জন্য সবাই প্রস্তুত।

মুখ খুললে উকীল, “তোমার মন্তব্য কী?”

চট করে জবাব দিতে পারলাম না। আবারও ওই প্রশ্ন। ভাবলাম, জবাব দিতে হয়। কিন্তু গলায় বাধতে লাগল। কি জবাব দিব? হ্যাঁ, আমার রাখা-ঢাকা কিছু নেই। তোমার পত্রে আমার সাবেক কথা আছে, আমার চিঠির নানা প্রসঙ্গ-উল্লেখ। সুতরাং সাফায়ের সব পথ বঙ্গ।

আবার প্রশ্ন, “তোমার মন্তব্য কী?” একদা ঝানু পাবলিক প্রসিকিউটারের সওয়াল অনুভরিত যাচ্ছে, আদালত হোলে ত ছাদ ভেঙে পড়ত।

আমি টেবিলের সমতলে আধবোঝা চোখের দৃষ্টি ফেলে পাথর হওয়ার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। ফরিয়াদের মুখের দিকে চেয়ে দেখার তখন একটা উৎকট সখ চেপেছিল। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। আবার সেই প্রশ্ন, “তোমার মন্তব্য কী?”

আমি নীরব দেখে কর্তা মেঝেময় পায়চারী করলেন কয়েক মিনিট। বুবলাম, মগজে গুল্মাছুট খেলা চলছে। আমি তখন মনে মনে কর্তব্য স্থির করছিলাম। শক-থিরাপির কথা মনে হোলো। পাগল সারানোর একটা বিশেষ দাওয়াই। কিন্তু আমি নিজেই তড়িৎ-আহত। হাত নাড়তে পারছিলাম না। একবার আড়চোখে চেয়ে নিলাম। উকীলকে ত তুমি দেখেছে। লম্বা চওড়া সুগঠিত দেহ। বয়সের মাপে পাকা চুল একটু বেমানান। কিন্তু সেদিন চুল উক্ষোখুক্ষো, বেশ উত্ত্বান্ত ঠেকছিল, কখন চিঠি পেয়েছে কে জানে? কিন্তু এ্যাক্ষন যেন কত কালের। ওই অবস্থায় আবার এলো ঠিক আমার পেছনে। আমি টের পাচ্ছি। নিজে চোখ বুঁজে বসে আছি তখন। ডাঙা পেটা করবে না ত? বাপ চাচাদের আমলে নাক কেটে

নিত অসতী স্ত্রীর। তা-ই করবে? এমন অবস্থায় সভ্য-অসভ্য ফারাক থাকে না। গুলি করে মারবে না ত? আমি ত ভয়ে কাঠ। তবু হৃশি হারিয়ে ফেলিনি, অবস্থার মোকাবিলা ঠিক করতে পারব।

আবার প্রশ্ন, “তোমার মন্তব্য কী?”

আমি চুপ করে রাখলাম। সে পেছনে থাঢ়া। আততায়ীর এমন অবস্থা আরো বেশী বিপজ্জনক। মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায়, কি ঘটছে বা ঘটবে। তখন অত ভয় থাকে না। এখানে তোমার চোখ থেকেও নেই।

আমি তখন ধীরে ধীরে টেবিলের ড্রায়ার খুলতে লাগলাম। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করতে হোলো। কারণ, বেশ কিছু নীচে অন্য একটা খাতার মধ্যে রেখেছিলাম। একটু উপুড় হোয়ে পড়েছি। এই সময় যদি ঘাড়ে এক লাথি মেরে দেয়। তাই হঠাৎ বাম হাত ঘাড়ের উপর রাখলাম। তোমাকে সব কথা খুঁটিয়ে লিখছি। তুমি সব জানো। নিজেই বিচার করতে পারবে।

এবার প্রশ্নের ধারা বদলে গেল। শুরু হোলো স্বগতোক্তি, “এই বয়সে এই তোমার কাও। লজ্জা করল না? ছেলে-পুলে সমাজে মুখ দেখাবে কী করে? তোমার সেই সরম নেই। তাই ব'লে সবাই বে-আবু ন্যাংটা নয়। ... তোমাকে বিন্দু মাত্র আমি কোন দিন অবিশ্বাস করিনি। অথচ তুমি বিশ্বাসঘাতকতায় পাকা। আমি একটা ভোদাই। লোক আমাকে যা বলে বলুক। বৌ ত একটা চালুনি, তলায় অনেক ছিন্দ...”।

এই সময় আমার গোষ্ঠা উঠে গিয়েছিল। আমি একটা পত্র হাতে চট করে ঘুরে, অবিশ্য চেয়ারে বসে বসেই, চীৎকার দিয়ে উঠলাম, “ছেট লোকের মত মুখ ছুটিয়ো না।”

“আরে আমার ভদ্রলোকের ভদ্র স্ত্রী সঙ্গী মহিলা—,” অপর পক্ষ পাল্টা দিয়ে উঠেছে।

“গলা বাড়িও না। ছেলেরা স্বত্ত্বাল আছে।” উকীল তখন ব্যঙ্গস্বরে খেঁকিয়ে উঠল “সরম লাগে, বিবি সাব? সরম? কাপড় তুলতে সরম ছিল কোথায়?”

একদম পেরেকের মাথায় হাতুড়ির পেটা পড়েছে। আমি নিমেষের জন্য থ’ বনে গিয়েছিলাম। কিন্তু মরদ বাপে আমাকেও জন্ম দিয়েছিল। আমি তিড়িৎ লাফে চেয়ার থেকে উঠে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। দুইজনের চোখে আগুন সমান। উকীল ঠোঁট কামড়ালো গোষ্ঠা বুঝতে। তখন আমি হামলা শুরু করলাম।

আবার টেবিলের দিকে ফিরে উকীলের উপপত্নীকে লেখা চিঠিটা মেলে ধরে গলায় যথারীতি ঝাল মাখিয়ে বললাম, “এই চিঠি কার? কোন সত্য পুরুষের?”

জঁকের মুখে লবণ পড়ল। কিন্তু তখনই সর্প দেহ ধরে তা এগিয়ে এসে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর নিজের মাছি-বসা লেজে যেমন কামড় দিতে যায় কুকুর, ঠিক সেই মত ভঙ্গীতে মোচড় মেরে উকীল হাঁকলে, “এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?”

“আমার চিঠি তুমি কোথায় পেলে?” পাল্টা দিতে আমার দেরী হয় না।

“আমি আমি....,” উকীল হোচট খায়।

আমি কোপ মারলাম, “জী— জী— জী—।”

গলায় লঙ্ঘা ঢোকানো ছিল বলা বাহুল্য। তারপর মঞ্চ খালি হোতে থাকে।

আমার চোর আততায়ীর মত এই আততায়ীও দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তার

গমন-পথে আমার চোখ জুলতে থাকে। কুমীরের চোখে বুলেট বেঁধার ত্প্তি তখন আমার শিকারী মুখে।

ভাবলাম, নাটকের আরো অঙ্গ আছে যবনিকা-পাতের আগে। কিন্তু সেদিন রাত্রেই নাটক ফুরিয়ে গেল। গর্ভাঙ্কের ছায়াও দেখা গেল না।

পেছন থেকে আমার ঘাড়ে হাত রেখে, উকীল এসে বললে, Forgive and forget, ক্ষমা করো, ভুলে যাও। ইংরেজী বাংলা এক সঙ্গে।

খাপে চুকে গেলাম। তলওয়ারের খিলিক বাইরে কেউ দেখার আর থাকলো না,—
থাকবে না—

তাই ত তোমাকে পত্র।.....

তুমি নিজেই বিচার করো। লেবু আরো নিঙড়ালে আরো তেতো বেবুবে। বয়সের দোহাই তোমাকে আর দেব না। জীবন মৃত্যুর সংস্করণে থাকার একটা আনন্দ আছে। কিন্তু বিততি বা টেনশন সব সময় মন বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষেময় কেউ বলবে না। আর নিভৃতি একবার চুরমার হোয়ে গেল, ভাঙার রনন কী দিয়ে ঢাকবে? আমি অনেক ভেবেছি। নতুন করে জীবন গড়া যায়, তার জন্য উদ্যম প্রয়োজন। আমি সত্য ঝান্ত। তুমি অনুগ্রামিত ব্যক্তি, তোমার কথা আলাদা। পুরাতন সংসারই আমার স্বর্গ এখন থেকে।

আমি জানি, তোমার কষ্ট হবে। আমার জন্যে কারো শিরঃ পীড়া থাকবে, এই অসোয়াস্তি খুব সুখের নয়। তুমি সংসারে একদল আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পর যেমন সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলে তা-ই আবার খুঁজে পাও, খুঁজে নাও, আরো গভীর ভাবে। আমার শুভেচ্ছা রইল।

বাইরের জীবন আমি এবার একদম প্রটিয়ে ফেলব। তোমার কাছে আমার শেষ পত্র।

ইতি—

আর কেত্রা নয়

মাঝারি গোছের হোটেল কাবেরী। সামান্য অজায়গা গলি ঘুঁজি পার হোয়ে চুকতে হয়, তাই আভিজ্ঞাত্যহীন। নচেৎ আরামের উপাদান কম নেই এই হোটেলে। আর অঙ্গে ‘বার’ থাকায় রসিক জন ডুব দিতে আসে। তারা গলির কথা ভাবে না। ডাইনিং রুম আজ বেশ সজ্জিত। বেলুন, রঙীন কাগজের শিকল, কিছু রঙীন বাল্বের সংযোগ ঘটেছে। ফলে, অন্যান্য দিনের তুলনায় হোটেলের যা রং খুলেছে, কোন খরিদ্দার নাক সিঁটকাতে পারবে না।

মাঝখানে একটা বড় টেবিল রাখিত। সাধারণতঃ কোন অর্ডার এলে তখন এই ব্যবস্থা হয়। আজ দেখা গেল, দশ বারো জনের উপযোগী প্লেট ইত্যাদি আগে থেকেই রাখা। ফুলদানি দুটি থেকে মাধবী ও বিভিন্ন ফুলের গুঁজ বেরুচিল।

ধীরে ধীরে আরো খানাপিনার সরঞ্জামে টেবিল পূর্ণ হোতে থাকে। বিরিয়ানীর ডিশ এখনও রাখা হয়নি। কিন্তু টিকিয়া, চাটনী মজুদ। পাছে ঠাণ্ডা হোয়ে যায়, তাই কোর্মা, রেজালার ডিশ দেখা যাচ্ছে না। এই হোটেল মোটামুটি খুব জনবহুল নয়। আজও তথেবচ। তবে খরিদ্দার লেগেই থাকে। আসছে, কেউ যাচ্ছে।

ম্যানেজারকে দেখা গেল খুব শশব্যস্ত। সে সহকর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছে নানা রকম। এই টেবিলের উপর তার কড়া নজর। এক দিকে টেবিল কেন্দ্রের নীচে একটু সামান্য ভাঁজ ছিল, তা সে নিজেই পরিপাটি করে দিলে। রেকর্ডে এতক্ষণ গান বাজছিল না। ম্যানেজার ভাল ভাল গজল দিতে বললে। যদি গ্রাহকরা প্রার্থনা করে, কাওয়ালী চলতে পারে। সুতরাং কিছু রেকর্ড যেন আগে থেকে মজুদ রাখা হয়। নির্দেশের পর নির্দেশ চলে। কিছু ভাল ভাল দামী গ্লাস পর্যন্ত এসে পৌছল। বয়-বৃন্দ অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একদম টাট্কা ধোয়া লেবাসে আচ্ছন্ন।

মেহমান মেজবান, অতিথি বা অতিথি-সৎকারকদের তখনও দেখা নেই। নেপথ্যে এন্তেজামে কিন্তু পাক্কা হচ্ছে।

ঠিক সওয়া আট্টার সময় গফুর এসে পৌছল। আজ তার পরনে সুট। টাই সমন্বিত। মাথায় সাদা কারাকুলী টুপি। তার সঙ্গিদের দু'একজন পরেছে পাঞ্জুন। অন্যান্যেরা পাজামা পাজাবি। ধোপ-দুরস্ত বদন সকলের।

গফুর হোটেলে ঢোকামাত্র ম্যানেজার তার কাছে ছুটে গেল। হাত কচ্ছানি সহ অনুরোধ করলে, “গফুর সাহেব, আপনি এন্তেজাম দেখে যান।”

দু'জনে এগিয়ে এলো টেবিলের ধারে। গফুরের হাতের একটা দামী পাথরের আংটি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। সে ঘুরে ঘুরে দেখে শোনে বললে “বিলাতী বিয়ার পেয়েছেন ত?”

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে বাক্য খসিষ্যেন যন্ত্রণামুক্ত হोতে চায়। উচ্চারণ করে, “আপনার কথা আমি ভুলিনি। জানি দেশী জিনিস আপনার কাছে কচুর লতি, খামাখা মুখ কুটোবে। আমি পাঁচ কেস মজুদ রেখেছি।”

“বহুৎ আচ্ছা।” সেহের থাপ্পড় গিয়ে পড়ল ম্যানেজারের পিঠে।

সে আরো তুরিয়ানন্দে মুখ খোলে, “শুধু তা-ই? স্যার, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন আছে পাঁচ পদ। আর—।”

কথাটা গফুরের ঠোটে সংক্রমিত, “আর—।”

“আরো গোটা ক্ষটল্যান্ড তখন আমার টকে। যা চান। মায় ‘ক্ষচ এল’ অর্থাৎ ‘গোরা তাড়ি’ পর্যন্ত আছে।”

“আপনি সত্যি কাজের লোক। আমাকে গেটে যেতে হয় আমার মেহমানেরা এবার এসে পড়ে আর কি। আট্টা পঁচিশ।” গফুর শাটের আন্তিমের তলায় ঢাকা তার সোনালি রঙের ব্যাস্ত বাঁধা সোনালি ঘড়ির দিকে চাইলে। কুর্ণিশের ভঙ্গীতে রাস্তা ছেড়ে দিলে ম্যানেজার।

সময়-জ্ঞান হোয়েছে এদেশে, না বলে উপায় নেই ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা কালু, সদু, আফজল, চাবী খাঁ ও আরো দুজন এসে উপস্থিত।

অভ্যর্থনা করলে গফুর, “আসুন ভাই আসুন।” করমর্দন চলে বেশ তিন চার মিনিট।

আজ কালু পরেছে পিরহান পাজামা, মাথায় সাদা টুপি। তার গেঁফটি বেশ পরিপাটি করে ছাঁটা। বোঝা গেল কালুও মঞ্চ-সচেতন। সদু তার নাটা শরীরে পাঞ্জুন চড়িয়েছে। আর সকলে পাজামা পাজাবি।

গফুর ত ঢলে পড়েছে, এমনই বিনয়-গদগদ। সামনে প্রসারিত করতালু অভ্যর্থনার দিকশূল বানিয়ে সে কালুকে টেবিলে পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সদু আফজলের কানে কানে ফিসফিস করলে, “আচ্ছা শরিফ লোক।” এই সব হোটেলে সদুর একটু বেশী পালা পড়ে, কারণ সে মাষ্টারের লোক। অপরে কক্ষে পায় বছরে একবার দুবার। তাদের এই পরিবেশ ধাতব্দ হোতে কিছু সময় যায়। কিন্তু আফজল চালাক মানুষ। সে হক্কিয়ে যায় না চাবী খার মত।

পাশাপাশি বসল গফুর এবং কালু। আর সকলে যে যার জায়গায়। ম্যানেজার গফুরের কানে কানে এই সময় ফিসফিস কি যেন বললে। গফুরের হাত-নাড়া দেখে বোঝা গেল, তার সম্মতি আছে।

এবার দুই বয় এলো একটা ট্রে মধ্যে দুবোতল শরাব সাজিয়ে। এক কোণে রাখলে। টেবিলের কোণে নয়, দেওয়ালের পাশে রাখিত একটা ছোট টেবিলের উপর। সেখান থেকেই পরিবেশন চলবে।

এই সময় গফুর জিজ্ঞেস করে, “কালু ভাই, আপনার পানি না বরফ?”

“পানি দিয়ে খায় তরল লোক। আমি কড়া মানুষ, আমার বরফ লাগে।” হাসতে হাসতে জবাব দিলে কালু।

তখন গফুর হাঁকে, “বয়, বরফ লাও।”

“জী” রবে ছুটে এলো ম্যানেজার, এতক্ষণ সে স্ক্রিউন্টারে হিসাব না কি দেখছিল।

গফুর বললে, “আপনাকে না। ভাই সাহেবের বরফ এন্টেমাল। বরফ আছে ত?”

ম্যানেজার একটু মাথা ঝুকিয়ে জবাব দিলে, “স্যার, আপনি যদি হুকুম দেন, গোটা হিমালয় আপনার পায়ের তলায় রেখে দিবো।”

হেসে গফুর উত্তর দিলে, ‘অত দুরকার নেই। সামান্য বরফের বন্দোবস্ত করো।’

ম্যানেজার চলে যেতে গফুর আবার কালুকে সম্মোধন করে, “ভাইসাব, ম্যানেজার বেশ কাবেল। তবে বাড়িয়ে বলা ওর এক মুদ্রাদোষ।”

কালু কিন্তু বললে, “আমি বীয়ার কম থাই। হুইকিং দিয়ে শুরু করব না আজ। ওদের সঙ্গে একটু বীয়ার খাওয়া যাক।” কালুর সঙ্গীদের দিকে তজনী বাড়ায়। অবিশ্য কথাটা সে বলে খুব মন্দ কষ্টে।

ম্যানেজার আবার গফুরের কাছে এসে বলে, “স্যার, আমাকে এই হোটেলের মালিক মনে করবেন না। মনে করবেন, আপনার নফর। যখন যা” দরকার আমাকে ডাক দেবেন।”

“আচ্ছা, আচ্ছা”, বিব্রত গফুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ম্যানেজার চলে গেলে আবার কালুর প্রতি সম্মোধন, “ভাইসাব, কিছু মনে করবেন না। এই ম্যানেজার আরো বহুবার আসবে। ওই এক দোষ বাড়িয়ে বলা। অথচ কাবেল আদমী। এম.এ. পাশ। এই হোটেল ওর জন্যে দাঁড়িয়ে গেল।”

খানা পরে।

তার আগে পিনা শুরু হোলো।

ডাচ বিয়ারের খোশবৃত্তে ভরে উঠল টেবিল। এই গঙ্কের জন্য নাকের ট্রেনিং লাগে। কালু সামান্য বাহাদুরি নিতে এক ঢেঁকে এক গ্লাস পার করে দিলে। সেদিক থেকে গফুর

মিতাচারী। সে ছোট চুমুক মারলে মাত্র।

দুই রাউন্ড গ্লাস পূর্ণ হোতে মুখ একটু একটু খুলতে লাগল। এই সময় কালু জিজ্ঞেস করে, “আপনার কোন লোকের সঙ্গে আমার লোকের মারামারি হয়? ওই যে উকীলের কামরায়।”

“মহিলা”, ডেকে উঠল গফুর। গ্লাসে মুখ ভুবিয়ে ছিল এক ব্যক্তি। সে এই শব্দে চমকে উঠল, চুমুক ভুলে গিয়ে গফুরের দিকে তাকায়।

আহ্বানকারী তখন বলে, “ভাই সাহেব তোমাকে দেখতে চায়।” লোকটা বিস্মিত চোখ।

তখন কালু বলে, “ভাই মহিলা, তুমি ওই (অঙ্গুলি-নির্দেশ) মাজেদের পাশে গিয়ে বসো। দ্যাখো ত চিন্তে পারো না কি?”

পুরাতন কথা উঠতে টেবিলে হাসির মৃদু হররা বয়ে গেল।

মহিলাক মাজেদ পাশাপাশি বসে। একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর তারা যে ভাবে বীয়ার টানতে লাগল, দেখার মত। দুজনেই শক্তিধর। পাঁচলা কাপড় অনেক ভাঁজে ভাঁজে রাখলে তখন শক্ত হয়। ওরা বীয়ারের তরলকে সেই ভাবে রাখতে লাগল।

ঘট্টা দুই গেল পিনার পর্যায়। টেবিল গরম হোয়ে উঠেছে। কেউ তেমন উচ্চ-রব নয়। কিন্তু কথা চলছে নানা পর্যায়ে। হাম্পেয়ালা ইয়ারী আবহাওয়া কোন ফাঁক অন্ততঃ আর নেই।

সাড়ে দশটার সময় গফুর হাঁকলে, “খানা লাগাও।”

অবিশ্যি কাজু-বাদাম, পাঁপর ভাজা, আলুচিপি, বেশ এক প্রস্থ উদরস্থ হোয়ে গেছে। এত জল্দি খানা না দিলেও চলত। কিন্তু খেতে ত হবে। আর আসল কথা তখনও বাকী।

ম্যানেজার ছুটে এলো এবং বললে, “কথা শোনা আর তামিলের মধ্যে আমি কোন ফারাক দেখি না।”

“বেশ। এখন খাবার দিন।” মৃদু হাসলে গফুর।

বিরিয়ানীর ডিশ থেকে ভাপ আর গুঁস সমান তালে বেরোয়। গফুর বিসমিলা করতে অনুরোধ জানায়, হ্রদ্যতার সৌরভ সঙ্গে এসে যেশে। চাট্টনী ছিল সাত পদ। কিন্তু সবাই লুক্মা তুলেছে কি তুলেনি এমন সময় আর এক ডিশ এলো। তখন গফুর উঠে দাঁড়ায়। নিজের হাতে সেই ডিশ টেবিলের উপর রাখলে, বয়-কে আর এগোতে দিলে না। সামনে দুটো টার্কি রোস্ট।

গফুর বসে পড়ে কালুকে সমোধন করে, “ভাই সাহেব, শুধু আপনার জন্যে।”

কালু ভাবে এত কী খাওয়া যায়। সে মুখ খুলতে গেল, গফুরের কথায় অন্যেরা অপরাধ নিতে পারে, তাই বোধ হয় কথা চাপা দিতে চায় কালু। কিন্তু গফুর তাকে এগোতে দিলে না।

মৃদু হেসে বললে, “ভাই সাহেব আমরা সবাই খেয়ে দেখব, কেমন হোয়েছে। কিন্তু এই টার্কি মুগী আমাদের দেশে ত হর-হামেশা পাওয়া যায় না। আপনার সম্মানে এই দুটো টার্কি যোগাড় করেছি। আমার বেশ ঝঁঝাট গেছে এই সামান্য মুগীর জন্যে।”

কালু গফুরের দিকে তাকিয়ে বড় আপ্যায়িত বোধ করে। কি কথা বলবে তার বিনিময়ে,

নিজে ঠিক করতে পারে না। এই ইতস্ততের পর বলে, “এত ঝামেলা করেছেন কেন?”
“ঝামেলা কী? আপনার জন্যে এ ত সামান্য কিছু। টার্কি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।”
“পেলেন কোথায়?” কালু জিজ্ঞেস করে।

“ভাইসাব, সে-এক ইতিহাস। শেষে খোঁজ পেলাম আমার এক আমেরিকান বন্ধুর বাড়ীতে আছে। মুগ্ধ পোষার সখ খুব তার, জানি। কিন্তু টার্কি,” গড়গড় মুখ থেকে কথা বের করতে শিয়ে একটু হোচট খায় গফুর এবং আবার খেই পাকড়ে বলে, “একটা কী আপনার সামনে ধরা যায়? যাক, ভদ্রলোক বটে মার্কিনগুলো। দু'টোই দিয়ে দিলে।”

খাওয়া কিন্তু দ্রুত চলে। গফুর অবিশ্বিত কালুর দিকে বিশেষ নজর। নিজের হাতে রোটি কেটে ছিঁড়ে তুলে দিতে লাগল। আর কয়েক মিনিট পরপর, “ভাই সাব, এই আর থোড়া পোলাও, আর একটা থোড়া টিকিয়া কাবাব, একটু চাটনী...”, ইত্যাদি শোনা যায়।

শরাবের মৌতাতে আহার একটু বেশী হয়। সদু এখানে চ্যাম্পিয়ন। সে নাকি শুধু ত্তিরিশটা টিকিয়া কাবাব উদরস্থ করেছে। অনুপাত অন্যান্য দিকেও সমান। চাবী খাঁর মাঝে মাঝে পেট ব্যথা করে। সে আজ অসুখের কথা তুলে গিয়েছিল। কালু আজ খেতে পারে নি বেশী। প্রথমতঃ আতিথেয়তার ধাক্কা আর দ্বিতীয়তঃ পিনার দিকে সে বেশী দৃষ্টি দিয়েছিল।

সিগারেটের ধোয়ায় টক্টকে লাল কাগজের জিঞ্জিরগুলো পর্যন্ত গোলাপি দেখায়। যথারীতি দেশী রেওয়াজ অনুযায়ী পঁচিশ মিনিটে আস্ত্রীয় খত্ম। যেন ভাগাড়ে একটা গুরু আর হাজার শকুন। সুতরাং যত শিগ্গীর পারে পেটে ঢেকাও। দেশের বাইরে ত নয় হোটেল কাবেরী। মেহ্মান মেজবান সবাই দেশী লোক। সুতরাং পাট ঝট্টে চুকে গেল।

বয়েরা টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল। সবাই ছাদের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরায়। ভরা পেট উর্ধ্ব লোকে নিয়ে যায়। বাস্তু যদিও উর্ধগতি, অধগতি দুই হোতে পারে।

গফুর স্তুকতা ভাঙলে, ভাই সাহেব, এবার কি খাবেন? কফি না আর এক দফা হুইকি?”

“রাতের খাওয়ার পর আমি আর ড্রিষ্ট করি না,” কালু জবাব দিলে। জায়গা-মাফিক কথা বলা সে বহু আগেই রঞ্জ করেছে। ইংরেজি শব্দটা নতুন নয় তার কাছে।

সদু কিন্তু মাষ্টরের মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হোলো। আরো এক দফা সাঁতার কাটতে পেলে ক্ষতি কি ছিল?

গফুর এবার বলে, “ভাই সাহেব এবার আমাদের কথা শুনু করতে হয়।”

“নিচ্য! ” মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে জবাব দিলে কালু।

“ভাইসাব, আমরা এখানে সবাই হাজির হোয়েছি বিশেষ কাজে। আপনারা সবাই মন দিয়ে শুনবেন।”

সকলে উৎকর্ণ। কেবল চাবি খো চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে রইল। তার ঘুম এসে গেছে। কিন্তু নাক ডাকছে না। মাজেদ তার পাঁজরায় একটা আঙুলের খোঁচা দিলে। সে চমকে চোখ খুলে। কিন্তু বুঁজতে বিলম্ব করলে না।

গফুর এবার কিন্তু টাই-পীনের উপর হাত রেখে অধৈর্য গলায় বললে, ‘ভাইসাহেব’ আমাদের আসল কথা শেষ করে নিতে হয়।”

কালু তার দিকে ঈষৎ মুখ ঘুরিয়ে ফিসফিস জবাব দিলে, “এখানে কথা বলব? আরো খরিদ্দার আছে—।”

তখন গফুর জোরে হেসে উঠল। বেশ হাসলে সে। তারপর থেমে মুখ খুললে, “ভাই সাহেব, আপনি চীৎকার করে কথা বলুন।”

“কাছে যদি পুলিশ থাকে।”

“কিছু ঘাবড়াবেন না। এ আমাদের এলাকা। জজ থাকলেও ভয় নেই। যা খুশী বলুন। খরিদ্দার দেখছেন। থাক না ওখানে পুলিশ কি আর কেউ। সবাই এই বান্দাকে জানে।”

তর্জনী যোগে নিজের বুকের প্রতি ইশারা জানায় গফুর।

কালু তখন শুরু করলে, “আমাদের সমস্যা খুব সহজ। তার ফয়সালা আরো সহজ।”

“আপনি অভিজ্ঞ মূরুবী। আপনিই সব বলুন।”

“না, না, গফুর ভাই। আমার ভুল হোতে পারে। আমি জাহেল লোক, বুঝি কি?”

“না, আপনিই বলুন।” কালু আর বসে থাকে না। সে উৎসাহিত, দাঢ়িয়ে উচ্চারণ করে, “গত দুবছর থেকে দেখছি, যেখানে কিছু দাঁড় আছে অর্থাৎ নাফা বেশী হবে, সেখানে হাত দিলেই হাতে ছোবল পেতে হয়। তাই না?”

মাথা নাড়লে অন্যান্যেরা, কেবল সরল সায় দিলে গফুর “ভাইসাব, সাধে কি আপনাকে মূরুবি বলছি। আমার মনের কথা টেনে বলেছেন।” উত্তেজনার চোটে গফুরও খাড়া হোয়ে যায়।

কালু বলতে থাকে, “ছোবলের চোটে জান যায়। বুজিরোজগার আল্লার মেহেরবানী। আল্লার এই মেহেরবানী থেকে খারিজ হোলে আর দুনিয়ায় বাঁচা যায় না।”

“নিশ্চয় নিশ্চয়, আলবৎ খাঁটি কথা কোথা কথার এক কথা” ইত্যাদি ধ্যায় উঠল।

কালুর নিজের কথায় মোতায়েন, “তখন বড় হয়রান পেরেসান হোলাম। এতদিনে বুঝতে পারলাম। যেখানে আমরা হাত দিই সেখানে আরো আরো কেউ হাত রাখে। হয়ত না জেনেই রাখে।”

“সকলের মনের কথা টেনে বলছেন, বাহ্বা বাহ্বা,” গফুর চীৎকার দিয়ে উঠল।

“এখন বোৰা যায়, সেখানে এক হাত আমার, আর এক হাত আমার সহোদর ভায়ের।”

“আহু, কি কথা। মধু, মধু!”

কালু সামান্য থামে। সকলের দিকে তাকিয়ে নেয়। তখন কথা গুছিয়ে বলার আরো প্রেরণা পায় সে, “সুতরাঙ্গ কাইজ্যা ভায়ে ভায়ে। এক ভায়ের নাম গফুর, আর এক ভাই, যার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে।”

অনেকে টেবিল থাপড়ে তারিফ প্রকাশ করে। বেশ একটু শব্দ ওঠে।

গফুর কালুর হাত টেনে নেয় নিজের করতালুর মধ্যে এবং বলতে থাকে মৃষ্টিবন্ধ দুই হাত শ্রোতাদের সামনে তুলে, “এই সেই দুই হাত।”

আবার হাত-তালি এবং টেবিল-ত্বলার বোল ওঠে।

কালু আর হাত সরায় না, বলতে থাকে, “এই সমস্যার ফয়সালা আগেই বলেছি খুব সোজা। আমার ভাই বাতিয়ে দেবে।”

“না, বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের মুখ খোলা নিষেধ।” গফুর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ

করলে ।

“তবে শুনুন,” গফুরের করতালু আরো শক্ত করে ধরার পর কালু সরব হয়, “আমি জাহেল আদ্মী । ঠিক হয়ত বলতে পারব না, গোনা খাতা (অপরাধ) মাফ করবেন । আমি বলব, ভা’য়ে ভা’য়ে বিবাদ মানে বরবাদ ।”

আবার হাত-তালি ।

“হ্যাঁ, এই বিবাদ মানে বরবাদ । তা হওয়া উচিত নয় । আমরা বহু বরবাদ হোয়েছি । আর না । আমি বলব, আসুন আমরা শহরটা ভাগ করে নিই । পূর্ব দিক যদি আপনারা নেন, আমরা পশ্চিম দিক নেব । আর আপনারা পশ্চিম দিক নিলে আমরা পূর্বদিক । এই ভাবে শহর ভাগ হোলেই সব গওগোল চুকে যায় । তখন ভা’য়ের হাতে ভায়ের হাত ঠেকবে মহৱৎ, ভালবাসায় । এক জনের মুখের ভাত কেড়ে নিতে নয় ।”

টেবিল বেজে ওঠে ।

কালু কারো দিকে না চেয়ে উর্ধনেত্র প্রেরণাদীণ্ঠ কষ্ট বিস্তার করে, “সুতরাং, হ্যাঁ আমি জোর দিয়ে বলব, শহর ভাগ হোক । খোলা কথা, তোমরা একদিকে চুরি করো, আর আমরা এক দিকে চুরি করি । ফ্যাসাদ থাকবে না ।”

গফুর যেন লাফিয়ে ওঠে । তারপর কালুকে বুকে টেনে নেয় গভীর আলিঙ্গনে বাঁধতে ।

কালু ঈষৎ বিব্রত বোধ করে এবং বলে, “এবার গরীবের কথাটা আপনারা ভেবে দেখুন । আমার কথা শেষ কথা মনে করবেন না ।”

গফুর আলিঙ্গনাবন্ধ অবস্থায় সম্মোধন করে, “আর কোন কথা নেই । আপনি কোন কথা বলেছেন ।” উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে মুখ ঘৃন্তিয়ে সে আবার শুধোয়, “তোমরা কি বলো?”
“শেষ কথা, চমৎকার ফয়সালা ।”

উভয় ভ্রাতা এবার আলিঙ্গন মুক্ত

গফুর বললে, “ভাইসাব, আঞ্জি সব কথা শেষ করুন । এখন সীমানা ঠিক হোক ।”

কালু জিজ্ঞাসনেত্র, শুধায় “আমি বলব?”

“নিশ্চয় ।”

“না, আপনি বলুন ।”

“না, না ।”

“আপনাকেই বলতে হবে । বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই মুখ খোলে না ।”

“তবে গরীবের কথা, শুনুন ।”

“না, শুনব না । গরীবের কথা শুনব না । আমার মিয়া ভাইয়ের কথা শুনব ।” গফুরের কষ্টস্বর ।

কালু ঈষৎ হাসে । গফুরের আন্তরিকতা তাকে স্পর্শ করেছে । সে বলে, “বেশ । আমি বলছি, কলন্দর পত্তির সোজাসুজি যে রাস্তা গেছে একদম রেল-লাইন পার হোয়ে, ওই সেখানে ভাঙ্গা মন্দিরটা পড়ে আছে, চেনো ত?”

“চিনি, চিনি । কইয়া যান ।” সম্মিলিত রব ।

“ওই রাস্তাটা, একটু বেঁকেছে পূর্ব দিকে, সেখানে কি বলে— হ্যাঁ, হাওয়া বাজার— এই হাওয়া বাজার ছাড়িয়ে নদীর ধার পর্যন্ত সীমানা রেখা মনে রাখেন, আপনাদের

সীমানা। ওদিকে মন্দির আর এদিকে একটা মসজিদ আছে পুরাতন। তার পূর্বদিক
আয়াদের, আর পশ্চিম আপনাদের।

“কিয়া বাং, কিয়া বাং রবে” চীৎকার দিয়ে উঠল গফুর। সে আজানিতে বসে পড়েছিল।
আবার দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশভঙ্গী বলে, “আমরা বড় ভায়ের এই আদেশ মেনে
নিলাম।”

“বহুৎ খুব, বহুৎ খুব” রব হোটেলময় ধ্বনিত হয়।

অনেক রাত্রে এই আসর ভাঙল।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অঙ্গীর আনিলা রাত্রি।

কালুকে তার জীপে যেতে দিলে না গফুর। সদু ওই গাড়ী চালিয়ে যাক আর সকলকে
নিয়ে।

গফুরের লাল ‘বুইক’ গাড়ী অপেক্ষা করছিল হোটেলের সামনে।

দরজা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বললে, “আসুন, ভাই সাব। আজ আমি আপনাকে
পৌছে দেব। আমি আপনার ড্রাইভার আজ থেকে। আমাকে শুধু মনে রাখবেন।”

“চলো।” গফুরের পিঠে হাত রেখে মেহান্ত কষ্টে জবাব দিলে কালু।

আফজল আজ বেদম শরাব পান করেছিল। মাজেদ তাকে ধীরে ধীরে জীপে তোলে।
নেশার ঝোকেই সে হেঁকে উঠল। “সোব্হান আল্লা, সোব্হান আল্লা।”

মসজিদ আয়াদের— সীমানা। সীমানা ঠিক থাকলে আর ঠোকার্তুকি লাগবে না।

শওকত ওসমান

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন ॥ ২ জানুয়ারি, ১৯১৭। পাড়া : মেহেদী মহল্লা। গ্রাম : সবলসিংহপুর। থানা : খানাকুল।
মহকুমা : আরামবাগ। জেলা : হগলী। রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ। রাষ্ট্র : ভারতবর্ষ।

পিতা ॥ শেখ মহম্মদ এহিয়া। মাতা : গুলেজান বেগম।

শওকত ওসমান সাহিত্য ক্ষেত্রের ছফ্ফনাম। আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান।

শিক্ষা ॥ প্রথমে মক্তব, সবলসিংহপুর জুনিয়ার মদ্রাসা এবং পরে ১৯২৯-এ কলকাতা মদ্রাসা-এ^১
আলিয়ায় ভর্তি হন সঙ্গে শ্রেণীতে। নবম শ্রেণীতে এ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখায় স্থানান্তর। ১৯৩০-এ
প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬
সালে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস। ভর্তি হন অর্থনৈতিতে বি.এ. অনার্স ক্লাসে। ১৯৩৯ সালে
বি.এ.পাস। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ.।

পেশা ॥ ১৯৪১-এ কলকাতায় গর্ভনন্দেষ্ট কর্মসূচি কলেজে প্রত্নতাত্ত্বিকের পদে যোগদান। ১৯৪৭-এ^২
দেশ বিভাগের সময় অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত কর্মেই পূর্ববঙ্গে অপশন দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারী
কর্মসূচি কলেজে যোগদান। ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজে বদলি হন। ১৯৭০ সনে সহকারী অধ্যাপক
পদে উন্নীত। ১৯৭২ সালে ১লা এপ্রিল চাকরি প্রোগ্রাম হবার আগেই অবসর নেন, যাতে পূর্ণকালীন
সাহিত্য-চর্চা করতে পারেন। চট্টগ্রামে বসবাস করতেন ৩৪ বি চন্দনপুরায় এবং ঢাকায় নিজ বাসগৃহে
৭ এ মোমেনবাগ, ঢাকা ১২১৭ ঠিকানায়।

পরিবার ॥ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বামটিরা প্রামের জনাব শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান
বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।
জ্যোত্পুত্র বুলবন ওসমান, দ্বিতীয় পুত্র আসফাক ওসমান, তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস ওসমান, চতুর্থ পুত্র
মরহুম তুরহান ওসমান, কন্যা আমফিসা আসগার, কনিষ্ঠ পুত্র ঝাঁ-নেসার ওসমান, সর্ব কনিষ্ঠা
কন্যা মরহুমা শারমনি ওসমান।

বিদেশ ভ্রমণ ॥ পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক, ইরান, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স।

পুরস্কার ॥ ১৯৬২ সালে আদমজী, ১৯৬৬ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব
পারফরমেন্স পদক, ১৯৮৩ একুশে পদক, ১৯৮৬ নাসিরদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮৮ মুক্তধারা পুরস্কার,
১৯৯৬ মাহবুব উল্লাহ ফাউণ্ডেশন পদক, ১৯৮৯ ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১ টেলিশিস্
পুরস্কার এবং ১৯৯৭ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

মৃত্যু : সকাল ৭.৪০ মিনিট, ১৪ই মে ১৯৯৮, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা।

সাহিত্য-কর্ম

উপন্যাস ॥ বনি আদম ১৯৪৬, জননী ১৯৫৮, ক্রীতদাসের হাসি ১৯৬২, চৌরসঙ্গি ১৯৬৬, সমাগম ১৯৬৮, রাজা উপাখ্যান ১৯৭০, জাহাঙ্গৰ হইতে বিদায় ১৯৭১, দুই সৈনিক ১৯৭৩, নেকড়ে অরণ্য ১৯৭৩, জলাংগী ১৯৭৪, রাজসাক্ষী ১৯৮৩, পতঙ্গ পিঞ্জর ১৯৮৩, আর্তনাদ ১৯৮৫, পিতৃপুরুষের কথা ১৯৮৬, নষ্টভান অষ্টভান ১৯৮৬, রাজ পূরুষ ১৯৯২।

ছোট গল্প ॥ পিঙ্গরাপোল ১৯৫০, জন্ম আপা ও অন্যান্য গল্প ১৯৫২, সাবেক কাহিনী ১৯৫৩, প্রস্তর ফলক ১৯৬৪, উত্তশ্শ ১৯৬৮, তিন মীর্জা ১৯৮৬, মনিব ও তাহার কুকুর ১৯৮৬, পুরাতন খজর ১৯৮৭, দীর্ঘেরের প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৯০, হস্তান্তর ১৯৯১।

কাব্যগ্রন্থ ॥ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ১৯৮২, শেখের সমরা ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯২।

নাটক ॥ তক্ষ র লক্ষ্ম ১৯৪৪, বগদাদের কবি ১৯৫০, আমলার মামলা ১৯৫২, কঁকরমনি ১৯৫২, জন্ম-জন্মান্তর ১৯৬০, এতিমখানা ১৯৬৪, তিনটি ছোট নাটক ১৯৮৯।

শিত সাহিত্য ॥ ওটেন সাহেবের বাংলো ১৯৪৪, তারা দুইজন ১৯৫৪, মসকুইটোফোন ১৯৫৭, ডিগবাজী ১৯৬৪, প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প ১৯৬৯, সুন্দে মেম্ম্যালিস্ট ১৯৭৩, ছোটদের নানা গল্প ১৯৮২, ছোটদের কথা রচনার কথা ১৯৮৩, পঞ্চসঙ্গী ১৯৮৭।

প্রবন্ধ ॥ সমুদ্র নদী সমর্পিত ১৯৭৩, ভাব-ভাষা ভাবনা ১৯৭৪, ইতিহাসে বিস্তারিত ১৯৮৫, সংক্ষিতির চড়াই উৎরাই ১৯৮৬, মুসলমান মুনসের রূপান্তর ১৯৮৬, পূর্ণ স্বাধীনতা চৰ্ণ স্বাধীনতা ১৯৯০, উপদেশ-কুপদেশ ১৯৯১।

আত্ম-জীবনীমূলক রচনা ॥ স্বজন স্বহ্যাম ১৯৮৬, কালরাত্রি খণ্টিত্র ১৯৮৬, মন্তব্য মৃগয়া ১৯৯০, অনেক কথন ১৯৯১, উডবাই জাস্টিস মাসুদ ১৯৯৩, শৃতিখণ্ড : মুজিবনগর ১৯৯৩, উত্তরপৰ্ব : মুজিবনগর ১৯৯৪, অন্তিমের সঙ্গে সংলাপ ১৯৯৪, সোদরের ঘোঁজে স্বদেশের সঙ্কালে ১৯৯৫, পোন্টে গ্যালারি ১৯৯৬, আর এক ধারা ভাষ্য ১৯৯৬।

অন্যান্য রচনা ॥ হণ্ডম পঞ্চম ১৯৫৪, সম্পাদনা : ফজলুল হকের গল্প-প্রতিভা প্রজ্ঞালিত নিমেষে নির্বাসিত ১৯৮৩, সমালোচনা : Eyeless in the urn by Sanjib Datta ১৯৮৩।

অনুবাদ ॥ নিশো (উপন্যাস) ১৯৪৮-৪৯, টাইম মেশিন ১৯৫৯, পাঁচটি কাহিনী (লিও টলস্টয়) ১৯৫৯, স্পেনের ছোটগল্প ১৯৬৫, পাঁচটি নাটক (মলিয়র) ১৯৭৮, ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (নাটক) ১৯৭৩, পৃথিবীর রসমঞ্চে মানুষ ১৯৮৫, সন্তানের শীকারোক্তি (অমৃতা পৃত্তম) ১৯৮৫।

ইংরেজীতে অনূদিত ॥ Janani (জননী), State Witness (রাজসাক্ষী), Laughter of Slave (ক্রীতদাসের হাসি), God's Adversary and Other Stories (দীর্ঘেরের প্রতিদ্বন্দ্বী), Bankajol (জলাংগী)।